পরিচয়

শ্রাবণ । ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ **সূচীপত্র** ১৩৬৮

236522

সম্পাদক

গোপাল হালদার। ম লা

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স

থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-সাহিত্য

রক্তকরবী — নূতন সংযোজনযুক্ত সংস্করণ। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত। মূল্য ৪·৩০

শ্যামলী — চিত্র-সম্বলিত নূতন সংস্করণ। মূল্য ৫·০০

বীথিকা — দশটি নূতন কবিতা সংযোজিত। মূল্য ৩·৭৫, কয়েকটি রঙিন ও একবর্ণা চিত্রে শোভিত। মূল্য ৬·৫০

জীবনস্মৃতি — নূতন সংযোজনযুক্ত সংস্করণ। অতিরিক্ত চিত্রসংযুক্ত। সটীক সচিত্র ও বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় সহ। মূল্য ১২·০০, মুগা ও চামড়া বাঁধাই ২০·০০

শেষসপ্তক — এই গ্রন্থে মুদ্রিত দশটি গদ্যকবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ বা রূপান্তর এই সংস্করণে সংযোজিত। সচিত্র। মূল্য ৪·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০

স্ফুলিঙ্গ — পরিবর্ধিত সংস্করণ। ৬২টি নূতন কবিতা সংযোজিত। মূল্য ৩·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০

পলাতকা — চিত্র-সম্বলিত নূতন সংস্করণ। মূল্য ২·৭৫

বলাকা — রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা এই সংস্করণে সংযোজিত। মূল্য ৩·৭৫

কালান্তর — দেশনায়ক, মহাজাতি সদন, প্রচলিত দণ্ডনীতি, নবযুগ, প্রলয়ের সৃষ্টি, হিজলি ও চট্টগ্রাম। ছয়টি প্রবন্ধ এই সংস্করণে প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল। মূল্য ৫·৫০

ভারতপথিক রামমোহন রায় — বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ভাষণে প্রাপ্ত রামমোহন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তির সংকলন। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·০০

খৃষ্ট — খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও ভাষণের সংকলন। মূল্য ২·৫০

...ত্রা

...ত্রাবলী — ছিন্নপত্র গ্রন্থের পূর্ণতর সংস্করণ। ১০৭টি নূতন পত্র সংযোজিত। মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১০·০০, কাপড়ে বাঁধাই ১২·৫০

কাদম্বিনী দেবী ও শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্রের সংকলন। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·৩০

পূর্বপ্রকাশিত দুই খণ্ড একত্রে গ্রথিত। ডায়ারির প্রাথমিক খসড়াটি ...আন্ত সংকলিত, পূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। মূল্য ৫, বোর্ড বাঁধাই ৬·৫০

...র প্রথম ইংলণ্ড গমন ও প্রবাস যাপনের সচ্ছন্দ বিবরণ। ...৫০, বোর্ড বাঁধাই ৬·০০

...প্রকাশিত, স্বল্প মূল্যে প্রচারিত
...ন বিচিত্রা পুনর্মুদ্রণ করা হচ্ছে।

...ভারতী

'সিন্ধুসভ্যতা' নামে পরিচিত। সিন্ধুসভ্যতার ইতিকথা সম্বন্ধে দেবীবাবু তিনটি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন :

"এক ॥ সিন্ধু-সভ্যতা শুধু সুপ্রাচীন নয়, সুউন্নতও ছিল—বৈদিক সাহিত্যের চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং বৈদিক-সাহিত্যে প্রতিফলিত মানব-উন্নতির চেয়ে অনেক বেশি উন্নতির পরিচায়ক।

"দুই ॥ যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা এ সভ্যতা গ'ড়ে তোলেন নি। সিন্ধু-সভ্যতা একান্তই আর্য-পূর্ব। স্বভাবতই এ সভ্যতার স্মারকগুলির মধ্যে বৈদিক প্রভাবের বা আর্য অবদানের চিহ্ন নেই।

"তিন ॥ কিন্তু উত্তরকালে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে—বিশেষত জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে—সিন্ধুযুগের ধ্যান ধারণা ও পূজা-উপাসনার সাদৃশ্য অত্যন্ত নিকট। অতএব অনুমান হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুদূর সিন্ধুযুগ থেকে একটি মূলধারা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং তার উপর বৈদিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই।"

সিন্ধুযুগে ভারতীয় সমাজ যে উৎপাদন-বণ্টন-সামাজিক সংগঠন ইত্যাদির দিক থেকে উন্নত ছিল এ অনুমান আজ বহু ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা সমর্থিত। এ গবেষণা আজও অসম্পূর্ণ, সুতরাং ইতিহাসের চূড়ান্ত রা[illegible] আজও স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো লেখক সিন্ধুসভ্[illegible] উন্নততর উপাদান থেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে এই সভ্যতা প্রা[illegible] নয় বেদোত্তর। গবেষণারত ইতিহাস-বিজ্ঞানীদের কাছে [illegible] একেবারেই অপাংক্তেয় এবং অর্বাচীনসুলভ উদ্ভট কল্পনার[illegible] ধারণা যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা পরোক্ষভাবে আর্যজাতি[illegible] জাত্যাভিমানী রক্ষণশীল প্রচেষ্টারই সহায়ক। এ [illegible] বলা অনাবশ্যক।

প্রগতিশীল ঐতিহাসিকেরা এইরূপ অনু[illegible] দ্রাবিড়-সভ্যতা এবং সভ্যতার নিম্নস্তরে [illegible] বিধ্বস্ত হয়েছিল। পরবর্তী যুগেও এই [illegible] দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির [illegible] চন্দ এবং অধ্যাপক কোসাম্বীর [illegible] সিন্ধুসভ্যতা ছিল "[illegible]

পশুপালননির্ভর।" সিন্ধুসভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক, কিন্তু বৈদিক সভ্যতা ছিল একান্তভাবেই গ্রাম্য।

অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ যে অপেক্ষাকৃত অবনত সমাজ কর্তৃক বিধ্বস্ত হতে পারে ইউরোপীয় ইতিহাসেও তার নজির আছে; যেমন, রোমান সভ্যতা বর্বরদের আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু কোনো সমাজ কেবলমাত্র বহিরাক্রমণে ধ্বংস হয় না, যদি না আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ববিকাশের ফলে তা বহিরাক্রণের আগেই ধ্বংসমুখী হয়। রোমান সাম্রাজ্য বর্বর আক্রমণের জন্য ধ্বংসের পথে প্রস্তুত হয়েছিল আভ্যন্তরীণ কারণে,—অর্থাৎ, দাসভিত্তিক সমাজের অবক্ষয়ের ফলে। সিন্ধু সভ্যতাও যে বহিরাক্রমণের আগেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে অবক্ষয়িত হচ্ছিল সে সম্বন্ধেও শ্রীচট্টোপাধ্যায় পাঠকদের অবহিত রেখেছেন।

কিন্তু বহিরাক্রমণ প্রমাণ করার দিকেই তাঁর মনোযোগ সর্বাধিক, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বজনিত অবক্ষয় সম্বন্ধে দেবীবাবু খুব অল্প কথাই বলেছেন। এ বিষয়ে তথ্যের অভাব এবং গবেষণার ত্রুটি অবশ্যই তাঁর পথে অনুত্তরণীয় বাধা, কাজেই সেজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, গবেষণার বিষয়বস্তু এবং বৈজ্ঞানিক অনুমান হিসেবেও এই বিষয়ের প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি তাঁর কাছ থেকে দাবি করা অসঙ্গত নয়।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখযোগ্য যে সিন্ধু সভ্যতা থেকে বৈদিক সভ্যতার
...শে দার্শনিক চিন্তাধারার যে উৎকর্ষ দেখা যায় সে সম্বন্ধেও
...য় কিছু কিছু আলোচনা করেছেন, কাজেই তাঁর আলোচনায়
...াদের পদ্ধতি যে মোটামুটি নির্ভুলভাবে অনুসৃত হয়েছে এ
...হ নেই। এখন প্রশ্ন এই যে সিন্ধু-পূর্ব আর্যসমাজ
...ঋগ্বেদ রচনার সময় আর্যসমাজ নিশ্চয়ই সিন্ধুসমাজের
...ত, নতুবা ঋগ্বেদ কখনও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক
... বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে

...চিত এই সুবিশাল সাহিত্যের মধ্যে
...ছিল। এবং একথা কল্পনা করবার
... যুগ ধরে বৈদিক মানুষদের
...েকছিল। অতএব,

ওই সুদীর্ঘ যুগে বৈদিক মানুষদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং চিন্তা-চেতনায় যে-পরিবর্তন ঘটেছিল তারই ধারাবাহিক এবং সাহিত্যিক নিদর্শন ওই বেদ—আর কোন মানবজাতির ইতিহাসে এ-জাতীয় এমন বিস্তীর্ণ নিদর্শন অবশ্যই পাওয়া যায় না। এবং এই কারণেই প্রাচীন কালের সমাজ-বিকাশ ও চিন্তা-বিকাশ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বৈদিক সাহিত্যের মূল্য সত্যিই অতুলনীয়।"

সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়, বৈদিক সমাজের চেয়েও উন্নত সিন্ধুসভ্যতার কোনো সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের নজির কেন পাওয়া যায় না? তৎকালীন 'ধর্মবিশ্বাসের' যে নজির পাওয়া যায় তা কি বৈদিক যুগের ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে উন্নত পর্যায়ের?

এবার ভারতীয় দর্শনের মূল ধারাগুলি সম্বন্ধে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করা যাক।

সিন্ধুসভ্যতার সময়ই শক্তিপূজা, তান্ত্রিক সাধনা এবং সাংখ্যদর্শনের বীজ উপ্ত হয়েছিল এরকম একটি সিদ্ধান্তের সপক্ষে ঐতিহাসিক উপাদান আছে বলেই লেখকের বিশ্বাস এবং তাঁর এ বিশ্বাসের সপক্ষে পূর্বলিখিত 'লোকায়ত দর্শন'-এ তিনি যথেষ্ট তথ্য পেশ করেছেন; 'ভারতীয় দর্শন,' ১ম খণ্ডে, এ বিষয়ে সামান্য কিছু প্রাথমিক আলোচনা আছে। লেখক এই আলোচনার মধ্যে দেখিয়েছেন যে সিন্ধুসমাজ ছিল প্রধানত কৃষিপ্রধান ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। পরবর্তী আর্যসমাজ ছিল প্রধানত পশুপালনভিত্তিক এবং পিতৃতান্ত্রিক। এই দুই যুগের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এই দুই ভিন্ন সামাজিক অবস্থার মানসিক প্রতিফলক। লেখকের এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত। সাংখ্য দর্শন বাস্তবিকই তন্ত্রের ক্রমবিকাশ কিনা অথবা তান্ত্রিক সাধনা আদৌ সিন্ধুসমাজের প্রধান অবদান কিনা এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার ঐতিহাসিকেরাই করবেন। কিন্তু শিবশক্তির উপাসনা সিন্ধুসভ্যতায় বিদ্যমান ছিল এবং তার সঙ্গে তন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শক্তিপূজার উৎপত্তি হয়তো মাতৃতান্ত্রিক সিন্ধুসমাজেই হয়েছিল এবং সাংখ্য দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বৈদিক যুগেও সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। আবার এই দুই দর্শনের সঙ্গে তন্ত্রের প্রত্যক্ষ যোগ লাভ থাকতে পারে; এমনও হতে পারে যে সিন্ধুযুগেই হোক আর বৈদিক যুগেই হোক, সামাজিক অবক্ষয়ের একটা বিশেষ দুর্গত অবস্থায় তান্ত্রিক সাধনার উৎপত্তি। আবার, সিন্ধুসভ্যতা যতই উৎকৃষ্ট হোক, সে সমাজেও

উৎপাদন কৃষিভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও সেটা ছিল লৌহযুগের পূর্ববর্তী যুগ এবং সে সমাজের কৃষিও যে ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের সে কথাও শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেছেন তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে। সুতরাং তাদের সংস্কৃতির মধ্যেও বর্বর যুগের অবশেষ ছিল, ছিল অনিয়ামক যৌনজীবন—যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং তান্ত্রিকশাস্ত্র হয়তো বা তারই প্রতিফলক। এমন অনেক কিছু অনুমান করা যেতে পারে আবার এমন অনেক বিষয়েই শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি গবেষণা শুরু করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক, তাঁর অনুসন্ধান নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক। প্রাচীন সামাজিক পরিবেশ বুঝবার জন্য যে সমস্ত উপাদান ব্যবহারযোগ্য তা তিনি ব্যবহার করেছেন এবং আধুনিকতম ঐতিহাসিক আবিষ্কারের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার বাস্তবভিত্তি অনুসন্ধান করে যদি কোথাও কোনো ভুল করে থাকেন তো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহসই তিনি দেখিয়েছেন। সুধী সমাজের সরকারী ভাষ্য নির্বিচারে মেনে না নিয়ে মৌলিক গবেষণায় ভুল করার সাহস কেউ না দেখালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অসম্ভব। একথা দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

এই সমস্ত স্বীকার করেও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি সমস্যা থেকে যায়: ইতিহাসে দেখা যায় যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে, বর্বরতার নিম্নস্তরে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ উদ্ভূত হয়েছে বর্বরতার উচ্চস্তরে এবং সভ্যতার উন্মেষের সময়। অবশ্য আধুনিক আবিষ্কার অনুসারে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিকশিত হয় এরকম সরল ধারা অনুসারে ইতিহাস সর্বত্র অগ্রসর হয় নি। কিন্তু তা হলেও সমস্যা এই যে পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজের চেয়েও মাতৃতান্ত্রিক সিন্ধুসমাজ অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছিল কেন এবং কেনই বা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজেই দার্শনিক চিন্তা অনেক বেশি অগ্রসর। এই সমস্যার উপর শ্রীচট্টোপাধ্যায় কোনো আলোকপাত করেন নি এবং এই সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট গবেষণা আবশ্যক। এ সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন দেখি যে উপনিষদে শ্বেতকেতুর বাল্যকালেও উদ্দালকের পরিবারে মাতৃতান্ত্রিকতার অবশিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ বিদ্যমান। এ থেকে এরূপ অনুমানেরও কারণ আছে যে সিন্ধুতীরে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় হয়তো তা মাতৃতান্ত্রিক এবং আদিম কমিউনিস্ট সমাজ ছিল, ক্রমশ তার পরিবর্তন

ঘটেছে। তা যদি হয় তাহলে সিন্ধুতীরে জয়ের সময় থেকে বৈদিক সাহিত্য রচনার কাল এই দুইয়ের ভেতর একটা বিরাট যুগের ব্যবধান থাকবার কথা। দেবীবাবু যথার্থই বলেছেন—"সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য সুদীর্ঘ যুগের রচনা; তাই এ সাহিত্যের অংশবিশেষে এমন সুপ্রাচীন কালের স্মৃতি সংরক্ষিত হতে পারে যখনও বৈদিক সমাজের চূড়ান্ত পুরুষপ্রধান রূপ সুপরিস্ফুট হয় নি।" এ কথাও সত্য যে বৈদিক সাহিত্য রচনার বহুপূর্বে সিন্ধুতীরে আর্যদের বসতি বিস্তার হয়েছিল। তা যদি হয়ে থাকে তো এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসের আগেই আর্য নামে পরিচিত এক বর্বর যাযাবর জাতি ঐ সিন্ধুতীরেই বাস করত, তারা একেবারে বহিরাগত নাও হতে পারে। এমনকি হতে পারে না যে পরবর্তী কালে বহিরাগত পশুপালক যাযাবরগণ তাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল ?

কাজেই আদিম যুগের চিন্তাধারা কেবল সিন্ধুসভ্যতার আদিম মানুষের নয়, আর্যদেরও আদিম যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই চিন্তাধারাই জাদুবিদ্যা নামে পরিচিত। ধর্মের উৎপত্তির আগে জাদুই ছিল অতীতকালের সামাজিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য এবং জাদু থেকেই ধর্মের বিকাশ। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আলোচ্য পুস্তকে কতকটা ঠিকই বলেছেন যে "জাদু আর ধর্ম এক নয়", কিন্তু তিনি আবার বলেন: "অতএব জাদুবিশ্বাসের মূলে প্রাকৃতিক কার্য-কারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত একটি আদিম ও অস্ফুট বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই দিক থেকেই মন্তব্য করা হয়েছে যে আদিম জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মের বদলে বরং বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসেরই সাদৃশ্য অনুমেয়।" তাঁর এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়; জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে যেটুকু কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান তা ধর্মবিশ্বাসেও আছে। জাদু এবং ধর্ম, উভয়েই প্রাকৃতিক পদার্থের ওপর অপ্রাকৃতিক শক্তি আরোপ করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ভৌতিক কার্যকারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা পূরণ করে অন্ধবিশ্বাস। এই দিক থেকে জাদুর সঙ্গে ধর্মেরই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, বিজ্ঞান তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম জাদুরই ক্রমিক পরিণতি কিন্তু বিজ্ঞান তার বিরুদ্ধে একরকমের বিদ্রোহ। একদা ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুর কাজ করেছিল দর্শন, আধুনিক যুগে মার্কস এবং এঙ্গেলসই দর্শনকে বিজ্ঞানে পরিণত করেন।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও আলোচ্য পুস্তকে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই দেখিয়েছেন যে বৈদিক এবং বেদোত্তর যুগে দর্শনের দুইটি

ধারা বিদ্যমান ছিল—একটি আস্তিক এবং অপরটি নাস্তিক, আস্তিক মানে বেদবিশ্বাসী এবং নাস্তিক মানেই বেদবিরোধী। ঈশ্বরে বিশ্বাসীও বেদের অভ্রান্ততায় এবং অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী হলে নাস্তিক বলে গণ্য হয়েছে। লোকায়ত, সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক অবৈদিক বা বেদবিরোধী দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লেখক কেবল বৈদিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত পূর্বমীমাংসা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, অন্যান্য দর্শন সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাবে। আলোচ্য পুস্তকে লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব হল বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত ভাববাদের ক্রমবিকাশের সূত্র অনুসন্ধান। ঋগ্বেদের ভিতর অপরিস্ফুট ব্রহ্মবাদ উপনিষদে সুপরিস্ফুট "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মে" পরিণত হয় কিন্তু উপনিষদেও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের লক্ষণ আছে। একদিকে ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি অবৈদিক দর্শন এবং অন্যদিকে উপনিষদ এই দুয়ের মধ্যে পূর্বমীমাংসা যোগসূত্র রচনা করেছে। ন্যায়-বৈশেষিক পার্থিব জগতের বাস্তবসত্তায় বিশ্বাসী কিন্তু সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। পূর্বমীমাংসা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তার মতে ঋগ্বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থিত হয় নি।

ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন—

"অতএব ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে ব্রহ্মের গরিমা বিরল নয়, কিন্তু তার মধ্যে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের আভাসও নেই। কেননা ব্রহ্ম বলতে মূলতই অন্ন বা ধন, ব্রহ্মগরিমার অর্থ অন্নগরিমা বা ধনগরিমা।"

"উপনিষদের যুগেও যে বাস্তবিকই এ জাতীয় একটি আদিম বস্তুবাদ প্রচলিত ছিল—যে বস্তুবাদ অনুসারেই অন্নই পরম-সত্তা বা চরম সত্য—এবং উপনিষদের ভাববাদী দার্শনিকরা যে সচেতনভাবেই মতবাদটি প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন, বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকেও তা অনুমিত হয়।"

প্রাচীন ভারতে ভাববাদের এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ঋগ্বেদেও প্রকৃতি সম্বন্ধে কল্পনার যে উৎকর্ষ দেখা যায়, যেমন উষাসূক্তে প্রভাত বর্ণনায়, তা ঠিক আদিম বস্তুবাদের সঙ্গে খাপ খায় না। ঋগ্বেদে উৎকৃষ্ট ভাবাত্মক কাব্য এবং নিঃকৃষ্ট প্রার্থনা উভয়ই বিদ্যমান। কাজেই আদিম বস্তুবাদ থেকে ভাববাদের ক্রমবিকাশ ইউরোপে যেভাবে হয়েছিল, প্রাচীন ভারতে হয়তো ঠিক সেভাবে হয় নি। আশা করি শ্রীচট্টোপাধ্যায় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন।

প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা

রণজিৎ দাশগুপ্ত

এক

অতীতের সত্য আবিষ্কার এবং অতীতের আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ-বিপথ চিনে নেওয়ার আগ্রহ মানুষের মনে স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা আজও অসন্তোষজনক। অবশ্য এ-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একদা যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন তার কারণ বর্তমানে নেই। কেননা কিঞ্চিদধিক দেড়শো বৎসর ব্যেপে স্বদেশী ও বিদেশী মনীষীদের অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা, নিরলস গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতের বস্তুগত ও আদর্শগত জীবন সম্পর্কে বহু বৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে। তথাপি একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনো অত্যন্ত অস্বচ্ছ, নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই পরিস্থিতির মুখ্য কারণ যথোপযুক্ত মাল-মসলার অভাব। অনেক বিষয়েই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, লিখিত ইতিহাসের সমর্থন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের বিরলতাহেতু প্রাচীন ভারতীয় ইতিবৃত্তের অনুশীলন পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত। পরিণামে অনেক অনুমান সঙ্গত মনে হলেও নিশ্চিত সাক্ষ্যের অভাবে ইতিহাসের সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি পর্বের যোগসূত্র বিলুপ্ত। কিছু অনুমান শুদ্ধ-কল্পনাশ্রয়ী। আবার, বহু সমস্যাই অমীমাংসিত ও দুঃসমাধেয়।

দুই

শ্রীযুক্ত দেবরাজ চানানা এ রকম একটি জটিল বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন তাঁর নতুন প্রকাশিত গ্রন্থে *। বিষয়টি হল প্রাচীন ভারতে দাস-প্রথা। এ সম্বন্ধে আলোচনার অসুবিধা একটু বেশি। কারণ তথ্যের দৈন্য-জনিত অসুবিধা তো রয়েছেই। অধিকন্তু এক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে ভারতবিদ্যার

* Dev Raj Chanana : Slavery in Ancient India. People's Publishing House. Rs. 10·00

গবেষকদের একাংশের প্রাচীন ভারতকে মুগ্ধতার সঙ্গে আদর্শান্বিত করে দেখার প্রচেষ্টা, সে-সমাজ ও ইতিহাসকে শ্রেণী ও সামাজিক সংঘাত-মুক্ত এবং ইতিহাসের সর্বজনীন নিয়মবহির্ভূত বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দাসপ্রথা সম্পর্কে অপক্ষপাত কল্পনা-শূন্য ইতিহাস রচনার অন্তরায়।

তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, এ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ কোনো আলোচনা হয় নি। সে আলোচনা হয়েছে এবং তাতে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে দাসের প্রচলন যে ছিল সে বিষয়ে বহু ভারতবিদই একমত। এমনকি বৈদিক সমাজেও দাসশ্রমের ব্যবহার ছিল—একথা পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁর 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস'-এ উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এই দাসপ্রথার ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব কতখানি ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রধানত দুটি চিন্তাধারা নজরে পড়ে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেম্ব্রিজ ইতিহাসমালায় অধ্যাপক এ. বি. কীথের আলোচনা থেকে জানা যায়, ঋগ্বেদ পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের কালে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতক—খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক) কৃষিকার্যে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দাসদের ক্রমবর্ধমান নিয়োগ ঘটেছে। প্রসিদ্ধ জার্মান ভারততত্ত্ববিদ আর. ফিক সিদ্ধান্ত করেছেন, বৌদ্ধ যুগে বৃহৎ ভূম্যধিকারী ও ধনী বণিকমাত্রেই উৎ-পাদনের কাজে দাসশ্রম ব্যবহার করত।

পক্ষান্তরে, রিস ডেভিডস দম্পতির অভিমত হল, দাসদের সংখ্যা বেশি ছিল না। তাদের নিযুক্তও করা হয়েছিল প্রধানত গৃহস্থালির কাজে-কর্মে। তাদের প্রতি মালিকের আচরণও মন্দ ছিল না। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গবেষকদের মধ্যে অধ্যাপক ডি. ডি. কোশাম্বী, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের বিশ্লেষণও অনুরূপ। শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে অবশ্য মহাভারতের সমাজে দাসপ্রথার বিস্তৃতির কথা বলেছেন। কিন্তু তিনিও ইঙ্গিত করেছেন, দাসদের প্রধানত নিয়োগ করা হত গার্হস্থ্য কাজে।

তিন

সন্দেহ নেই, ভারতসন্ধানীদের উপরোক্ত গবেষণায় প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা সম্বন্ধে বহু সত্য ধরা পড়েছে। তবু একথা মানতে হবে, এঁদের প্রায় কারুর ক্ষেত্রেই দাসপ্রথাটা আলোচনার লক্ষ্য নয়। সে আলোচনা এসে পড়েছে অন্য

কোনো বিষয়ের চর্চা প্রসঙ্গে। ফলত দাসপ্রথার বিষয়ে এঁদের বিচার-বিবেচনা অসম্পূর্ণ ও আংশিক, সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি যথেষ্ট শক্ত নয়।

দাসপ্রথা সম্পর্কে গবেষণার এই পশ্চাৎভূমিতে শ্রীদেবরাজ চানানার গ্রন্থের প্রকাশ বিশেষভাবেই অভিনন্দনযোগ্য। এই গ্রন্থের মুখ্য বিশেষত্ব হল, এটিই প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার বিবর্তন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ পরিচয়দানের সর্বপ্রথম প্রয়াস। এবং শুধু দাসপ্রথা কেন, আসলে প্রাচীন ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কোনো রকম দ্বিধা না-রেখেই বলা যায়, আলোচ্য পুস্তকটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষক ও নিয়মিত ছাত্রদের কাছেই শুধু নয়, আমাদের মতো অনধিকারী সাধারণ পাঠকবৃন্দের কাছেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমাদৃত হবে।

বৌদ্ধযুগের (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক—খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) উত্তর-ভারত, বিশেষত মধ্যদেশ বলে কথিত অঞ্চল অর্থাৎ গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরাংশে দাসপ্রথার বিকাশ শ্রীচানানার কেন্দ্রীয় আলোচ্যবস্তু। এ আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ তিনি সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সমাজ এবং মহাকাব্য দুটির কালে দাসপ্রথা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে সে বিষয়ে বিবরণ উপস্থিত করেছেন। বৌদ্ধযুগের অব্যবহিত পরেই বা দাসপ্রথায় কি কি পরিবর্তন এল সে বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।

দাসপ্রথা সম্পর্কে শ্রীচানানা তথ্য ও বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন মৌলিক সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থসমূহ থেকে। অবশ্য এজন্য তিনি মুখ্যত নির্ভর করেছেন ত্রিপিটক, বিশেষত জাতকের কাহিনীসমূহের উপর। কেননা সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় পালি সাহিত্যে সমাজের আটপৌরে জীবনের সংবাদ ও বর্ণনা বিস্তর।

এ দুটি সূত্র এবং নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদির নিদর্শন থেকে গ্রন্থকার দাস-প্রথার বিষয়ে নানা খুঁটিনাটি তথ্য ও বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে, বহু সংবাদ ও ঘটনা একত্র করে সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থশেষে রয়েছে অতি মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী এবং গবেষণালব্ধ ফলগুলির বিস্তারিত সূচক। এ দুটির সঙ্গে মূল আলোচনাকে একটু মিলিয়ে দেখলেই শ্রীচানানার নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আর এটি গ্রন্থকারের পক্ষে খুবই বড় কৃতিত্বের কথা যে, তিনি পূর্বনির্ধারিত কোনো সিদ্ধান্তের কাঠামোতে তথ্য-গুলিকে পুরে দেন নি। বরং তথ্যের নিরাসক্ত ও যুক্তিসহ বিচার-বিশ্লেষণেই তিনি যত্নবান। এরই ভিত্তিতে তিনি উপনীত হয়েছেন সিদ্ধান্তে। কোনো

কোনো বহুল প্রচারিত ধারণাকে খণ্ডন করেছেন সাহসের সঙ্গে। ভারতীয় সমাজপদ্ধতিতে দাসপ্রথার বিশিষ্ট স্থান সম্পর্কে করেছেন নতুন আলোকপাত।

চার

শ্রীযুত দেবরাজ চানানা প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার ইতিবৃত্তান্ত শুরু করেছেন সিন্ধু উপত্যকার অর্ধ-ঐতিহাসিক সভ্যতার বিবরণ দিয়ে। মর্টিমার হুইলার, স্টুয়ার্ট পিনট, গর্ডন চাইল্ড প্রমুখ ভারতবিদ্যাবিদদের আলোচনার উল্লেখ করে শ্রীচানানা সিদ্ধান্ত করেছেন, উৎপাদন ব্যবস্থার বেশ কিছুটা অগ্রগতি এবং তৎসহ শ্রেণীসমাজের উদ্ভব ভিন্ন মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতার আশ্চর্য উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সমাজে দাসপ্রথার উদ্ভব ঘটেছিল কি? এ প্রশ্নের তর্কাতীত কোনো উত্তর নেই। তবে, শ্রীচানানার মতে, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার নদী সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্নসমূহ বিবেচনা করলে অনুমান করা সঙ্গত, সেখানে মজুরীভৃত্য কিংবা দাস (যুদ্ধ-বন্দী, ঋণ-দাস) অথবা উভয়েরই চলন ছিল। আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ শতকে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও দাসপ্রথার অবশেষ টিকে ছিল, এটা নানা কারণেই মনে হয়।

বৈদিক সমাজ সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলছেন, ঋগ্বেদে যে সমাজচিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, শ্রমবিভাগ সবে শুরু হয়েছে, কায়িক শ্রম তখনো অবমাননাকর নয়। তবে ভারতে প্রবেশের আগেই আর্যদের মধ্যে দাসের সীমাবদ্ধ প্রচলন ছিল, একথা বেদের কোনো কোনো সূক্ত থেকে সুস্পষ্ট।

কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কের প্রধান পরিবর্তন সূচিত হল ভারতে নবাগত আর্যদের কাছে আদি অধিবাসী কৃষ্ণকায় অনার্য 'দাস' ও 'দস্যু'দের পরাজয়ে। বিজিত কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা হয় অন্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা বিজেতা আর্যদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। কৃষ্ণকায় 'দাস' ও 'দস্যু'রা পরিণত হল আর্যদের সম্পত্তিতে—গোলামে। পরিণতিতে দাস ও গোলাম হয়ে উঠল সমার্থবাচক শব্দ। দাসেদের ভাগ্য সর্বতোভাবেই হয়ে পড়ল মালিকের মর্জির উপর নির্ভরশীল। গৃহস্থালির কাজে তো বটেই, সেই সঙ্গে গো-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি-উৎপাদন ইত্যাদিতেও এদের নিয়োগ করা হত। তাছাড়া এরা ছিল মালিকের দান-দক্ষিণার সামগ্রী। ছান্দোগ্য উপনিষদে

তো প্রভুর বিত্তের পরিচায়ক হিসেবে গোরু, ঘোড়া, হাতি, জমি, বাড়ি, সোনা এবং স্ত্রী-দাস—এ সব কিছুকেই এক সঙ্গে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

বৈদিক সমাজের এই দাসপ্রথা সম্পর্কে যা বিশেষ লক্ষণীয় তা হল ঐ সমাজে মালিক ও গোলামের শ্রেণীবিভাগ মূলত আর্য ও অনার্যের ethnic বা জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যের অনুসারী।

কালক্রমে কিন্তু প্রভু ও গোলামের এই জাতিগত পার্থক্যের সীমারেখা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা রামায়ণ-মহাভারতের নায়করূপে রাম ও কৃষ্ণের উল্লেখ পাই, যাঁদের চামড়ার রং আর যাই হোক সাদা নয়। আবার, এরকম দাসের উল্লেখও পাওয়া যায় যারা কৃষ্ণকায় নয় (পৃঃ ১০৬)। মহাকাব্য দুটির সমাজে দাসের অস্তিত্ব যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তারা সম্ভবত কেবলমাত্র গৃহকর্মেই নিযুক্ত হত। তার অতিরিক্ত বিশেষ কোনো গুরুত্ব অর্জন করা দাসপ্রথার পক্ষে সেযুগে সম্ভব ছিল না।

পাঁচ

বস্তুতই সে যুগের ধন-উৎপাদন ব্যবস্থায় দাসদের স্থান ছিল গণ্ডিবদ্ধ। কেননা সেটা ছিল ব্রোঞ্জ যুগ, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি ছিল ব্রোঞ্জ নির্মিত। এমন অবস্থায় উৎপাদনের প্রসার ও উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি এবং শ্রেণীশোষণের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত।

লোহার ব্যবহারের শুরু আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১০০০ শতকে। লোহার তৈরি হাতিয়ারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন। অরণ্যবাধা অপসারণ করে কৃষির বিস্তার হয়ে ওঠে সহজ-সাধ্য। উন্মুক্ত হয় উৎপাদন ও উদ্‌বৃত্তের প্রসারের সম্ভাবনা। ফলে দাস-প্রথাও হয়ে ওঠে বেশি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রক্রিয়ারই পরিণতিস্বরূপ ভারতে দাসপ্রথার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে। ত্রিপিটক থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শ্রীচানানা দেখিয়েছেন যে, তৎকালীন সমাজে দাসপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত।

এ যুগের দাসপ্রথার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, মালিক ও দাসের বিভাগ আর বৈদিক যুগের মতো জাতিগত পার্থক্যের ফল নয়। এ সমাজে দাসপতি

ও দাসদের মধ্যেকার ভেদের প্রকৃত ভিত্তি economic factors বা অর্থ-নৈতিক উপাদানসমূহ।

অবশ্য মল্ল, ভজ্জি, শাক্য প্রভৃতি aristocratic oligarchy বা অভিজাত সাধারণতন্ত্রগুলিতে অনড় সামাজিক স্তরভেদ দানা বেঁধে উঠেছিল। এখানে ক্ষত্রিয় রাজন্য ও অভিজাতবর্গ শাসকশ্রেণী—ব্রাহ্মণ ও বণিকদের অধিকার সীমাবদ্ধ। বিশেষ বিশেষ জাতিগত লক্ষণাক্রান্ত জনগোষ্ঠী গোলাম বলে পরিগণিত। অন্যদিকে, কাশী, কোশল, মগধের রাজতন্ত্রগুলিতে সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণীবিন্যাস কিন্তু এরকম অনমনীয় ছিল না। সেখানে দাসপ্রভু ও দাসের বিভাগ নির্ধারিত হত জাতিগত ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে নয়, তা হত অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবে। এবং এই শেষোক্ত প্রভাবটিই মুখ্য হয়ে ওঠে রাজতন্ত্রের কাছে অভিজাততন্ত্রের পরাজয়ে।

দাসশ্রমের ব্যবহার ছিল বিবিধ। রাজতন্ত্রে স্বাধীন নাগরিক ও ভৃত্যদের সঙ্গে গোলামেরাও সৈন্যবাহিনীভুক্ত হত। রাজপ্রাসাদে, অভিজাত পরিবারে, ধনীগৃহে, গৃহস্থালির সর্ববিধ কাজেই দাস-দাসীদের ব্যাপক নিয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে রয়েছে। অন্তঃপুরিকাদের এক বিরাট অংশই ছিল দাসী। প্রভুর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া থেকে শুরু করে সন্তানদের স্তন্যদান, গৃহ পরিচর্যা, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন, জলতোলা ইত্যাকার নানা কাজ এরা করত। অনুরূপভাবে, দাসদের কাজও ছিল বিচিত্র ও শ্রমসাধ্য।

তবে এ যুগের দাসপ্রথা সম্পর্কে যা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় তা হল ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনোৎপাদনের কাজে 'দাস-কম্মকার' অর্থাৎ গোলাম ও ভৃত্যদের ব্যাপক নিয়োগ। বণিকদের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে দাসশ্রমকে ব্যবহার করার বহু নমুনাই শ্রীচানানা উল্লেখ করেছেন।

ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল কৃষি। ধনী ভূম্যাধিকারীর অস্তিত্ব ছিল গরিব ও মাঝারি চাষীর পাশাপাশি। এদের অনেকে ছিল বিপুল ভূসম্পত্তির, এমনকি হাজার হাজার 'করিস' (একর ?) জমি ও গোটা গ্রামের মালিক। এদেরই ক্ষেতে-খামারে ভৃত্য ও দাসরা কাজ করত, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাত। ব্রাহ্মণেরাও যে জমির মালিক হত এবং সেই জমির চাষে দাসদের নিযুক্ত করত, শ্রীচানানা সে অনুমান করেছেন জাতক, ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত নানা বিবরণ থেকে (পৃঃ ৪২, ১৫৭)।

তিনি দেখিয়েছেন, রাজন্য ও অভিজাতবর্গ, শ্রেষ্ঠী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ঐশ্বর্যের অন্যতম মূল ছিল দাসশ্রম। থেরিগাথায় 'দাসগাম' বা গোলাম অধ্যুষিত গ্রামের উল্লেখ থেকে দাসপ্রথার ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্য বিস্তারে নগরের বিকাশ ও ধনী বণিকদের শক্তিবৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে এবং তজ্জনিত জীবন ও সম্পত্তির বর্ধিত নিরাপত্তার ফলে সেই প্রক্রিয়া আরও পুষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠী ও ভূস্বামীদের ঘটে আরও সমৃদ্ধি। কেন্দ্রীভূত শাসনের বর্ধিত ব্যয় নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই দাসশ্রম নিয়োগের সংবাদ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। রাজার খামার, কারখানা ও খনিতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ গোলাম নিয়োগের উল্লেখ রয়েছে সেখানে। দাসপ্রথা হয় আরও সংহত। ঐ একই সূত্র থেকে জানা যায়, দাসপ্রথা সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলি আরও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, সেগুলির মধ্যে একটি ঐক্যসাধিত হয়। দাস সংগৃহীত হত বিবিধ উপায়ে। সংগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে ত্রিপিটকে দাসদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আবার, অর্থশাস্ত্রে রয়েছে ন' রকম দাসের কথা—উদর-দাস, দণ্ড-প্রণিত (শাস্তিপ্রাপ্ত), ধ্বজ-হৃত (যুদ্ধবন্দী), গৃহে জাত, লব্ধ, ক্রীত ইত্যাদি।

কি সম্পর্ক ছিল দাসপ্রথার সঙ্গে বর্ণাশ্রম প্রথার? এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের বিবরণাদির থেকে বোঝা যায়, মগধ সাম্রাজ্যে শূদ্ররাও আর্য হিসেবে গণ্য হত। এবং শূদ্রমাত্রই দাস, কিংবা দাসমাত্রই শূদ্র বলে বিবেচিত হত না। অবস্থাবিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরাও দাস অবস্থায় পতিত হত।

"ন হি আর্য্যস্য দাসভাব"—কৌটিল্যের এই উক্তির ভিত্তিতে কেম্ব্রিজ ইতিহাসমালায় সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আর্যরা কখনো দাসত্ব বরণ করত না। অধ্যাপক কোশাম্বীও একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রীচানানা উপরোক্ত উক্তিটির প্রসঙ্গ নির্দেশ করে বিশদ আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিপাদন করেছেন, সাধারণত আট বৎসরের কম বয়স্ক আর্যসন্তানকে দাসরূপে নিয়োগ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অর্থেই এই উক্তিটি করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, এই উক্তির আপাত অর্থ ও ব্যাখ্যাটি ভ্রান্ত (পৃঃ ৮৯, ৯৯)।

বৌদ্ধযুগে দাসদের আইনগত অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা কি ছিল? সমস্ত বিবরণের থেকেই এটা সুস্পষ্ট যে, গোলামরা ছিল অন্য যে কোনো

অস্থাবর সম্পত্তির সমতুল্য—হস্তান্তরযোগ্য এবং হাটবাজারে ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী। দাস-দাসী এবং তাদের সন্তানদের জীবন ও ভাগ্য ছিল প্রভুর খেয়াল-খুশির মুখাপেক্ষী। উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম, অপ্রচুর ও নিকৃষ্ট খাদ্য, নানাবিধ পীড়ন—এই ছিল দাসদের বিড়ম্বিত ভাগ্য। ক্রোধের বশে দাস-হত্যা বা দাসীর নাক-কান কেটে ফেলার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে পালি গ্রন্থাদিতে। কিন্তু এ সবের জন্য মালিকের শাস্তিবিধানের বা দাসের উপর প্রভুর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী কোনো আইন ও ব্যবস্থার উল্লেখ ত্রিপিটকে নেই।

তবে এ অবস্থার বিরুদ্ধে দাসদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছিল প্রচুর। বিনয় পিটকে আছে, শাক্যবংশীয় মালিকদের বিরুদ্ধে দাসরা বিদ্রোহও করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র এই একটি বিদ্রোহেরই উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এটি সম্পর্কেও তথ্য বিরল।

দাসপ্রথা সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীচানানা দেখিয়েছেন, গৌতম বুদ্ধ দাসদের প্রতি দয়ার্দ্র ও মানবিক আচরণের জন্য মালিকদের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো মৌলিক পরিবর্তনের আভাস-মাত্রও তাঁর বাণীতে অনুপস্থিত। বরং তিনি দাসদের পরামর্শ দিয়েছেন ধৈর্য ও সততার সঙ্গে কর্তব্যসম্পাদন এবং প্রভুর প্রতি আনুগত্য রক্ষার জন্য। কোনো পলাতক দাসকে ধর্মসঙ্ঘে গ্রহণে কিংবা স্থান দানে বুদ্ধ রাজী ছিলেন না। তাছাড়া বৌদ্ধ মঠগুলিতে দাস নিয়োগ করা হত, এটাও নানা তথ্য থেকে মনে হয়। শ্রীচানানা অবশ্য এই তথ্যগুলি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বুদ্ধদেবের উপরোক্ত মনোভাবের হেতু নিরূপণেরও প্রয়াস পেয়েছেন (পৃঃ ৬০-৬৩)।

অবশ্য যে কোনো কারণেই হোক বুদ্ধদেবের পরবর্তীকালে গোলামদের আইনগত মর্যাদার উন্নতি ঘটেছিল। নির্দিষ্ট মেয়াদের গোলাম ও আজীবন গোলামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখার কথা কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। অর্থশাস্ত্রেই পাওয়া যাচ্ছে, দাস-দাসীদের প্রতি মালিকদের আচরণবিষয়ক নানা বিধি-নিষেধ জারীর কথা। নাবালক আর্যসন্তানকে দাসরূপে নিয়োগ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কথা তো একটু আগেই বলা হয়েছে। এতদ্ভিন্ন ঘৃণ্য ও নোংরা কাজে দাসদের নিয়োগ করা নিষিদ্ধ ছিল। দাসীর উপর বলাৎকার করলে সে যে মুক্তি পেত শুধু তা নয়, মালিককে জরিমানাও দিতে

হত। প্রভুর ঔরসজাত দাসী-পুত্র পেত প্রভুর আইনগত সন্তানের সব রকম অধিকার। এ রকম আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দাস-দাসীরা পেয়েছিল মৌর্যযুগে। মুক্তিলাভের শর্তসমূহকে করা হয়েছিল শিথিল। মুক্তিমূল্য গ্রহণ করেও গোলামকে মুক্তি না দিলে মালিককে অর্থদণ্ড দিতে হত। ইত্যাকার অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্রে।

দাসপ্রথার এই বিস্তৃতি ক্ষুণ্ণ হয় মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে। অনেকগুলি খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের দেশজোড়া প্রসার হয় ব্যাহত, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা হয় বিপন্ন, নগরগুলির গুরুত্ব আসে কমে। স্বভাবত এই পরিস্থিতি দাসপ্রথার বিস্তারের পক্ষে অনুকূল নয়। পরবর্তীকালেও দাসের প্রচলন যে ছিল তার নমুনা পাওয়া যায় মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকারদের রচনায়। কিন্তু দাসশ্রমভিত্তিক উৎপাদনের গুরুত্ব হ্রাস পেল। পরিবর্তে বর্ধমান গুরুত্ব লাভ করল ছোট ও মাঝারি চাষী এবং প্রজা দিয়ে জমির আবাদ।

ছয়

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই শ্রীচানানার গ্রন্থের মূল্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর। একটি স্বল্পালোচিত জটিল বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুশীলনের প্রয়াসে এবং অনুসন্ধানের দিগন্ত প্রসারে তাঁর সার্থকতা। সংগৃহীত তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলি যে প্রাচীন ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক হবে তা সুনিশ্চয়।

অবশ্য শ্রীচানানার কোনো কোনো অনুমান ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে। এখানে তার কয়েকটি উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রথম কথা হল, তিনি প্রধানত পালি সাহিত্যের ভিত্তিতে বৌদ্ধযুগের সমগ্র উত্তর-ভারতের সমাজপদ্ধতিতে দাসপ্রথার ভূমিকা ও গুরুত্ব নির্ণয় করেছেন। কিন্তু তা কি সত্যিই করা যায়? ত্রিপিটকে তো প্রায় শুধুমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকার (তাও আবার নির্দিষ্ট অঞ্চলের) বৃত্তান্ত রয়েছে। এটা বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে, প্রায় একই কালে রচিত ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রগুলিতে বর্ণাশ্রম প্রথার পক্ষেই আনা হয়েছে নানা যুক্তি ও ব্যাখ্যা, সেখানে দাসপ্রথার উল্লেখ যৎসামান্য। সূত্র সাহিত্যের রচনা-অঞ্চল যে উত্তর-পশ্চিম ভারত ও অন্ধ্র অঞ্চল তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণের অপেক্ষা রাখে।

বৌদ্ধযুগের অভিজাততন্ত্রগুলিতে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী গোলামে পরিণত হয়েছিল—এটি শ্রীচানানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ অতি ক্ষীণ—পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সামান্য আভাস রয়েছে। তাছাড়া সবকটি রাজতন্ত্রেই দাসপ্রথা যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছিল, এ সিদ্ধান্তেই বা তিনি কোন্ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উপনীত হলেন? ভূস্বামীরা অন্যকে দিয়ে জমি চাষ করাত, এ মর্মে সংবাদের থেকেই তিনি অনুমান করেছেন কৃষিতে দাসের ব্যবহার (পৃঃ ৪৩)। কিন্তু অন্যেরা যে প্রজা কিংবা ভূমিদাস নয়, গোলাম—এ অনুমানের জন্য উপরোক্ত সংবাদটিই কি যথোপযুক্ত? অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর বন্দীদের একাংশকে দাসবাজারে পাঠানো হয়েছিল (পৃঃ ১০৮), এ সংবাদেরই বা উৎস কোথায়?

এ সবের থেকেও গুরুতর হল শ্রীচানানার ইতিহাস রচনার রীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্ন। তাঁর আলোচনায় ইতিহাসের গতিছন্দকে, সমাজ-বিকাশের চঞ্চল প্রবহমান ধারাকে খুঁজে পাওয়া কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য। তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন, নানা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, কৌতূহলোদ্দীপক বহু সংবাদ পেশ করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সবই হয়েছে শুধু fact-এর পসরা সাজানো। অথচ এ তো জানা কথা যে fact-এর নির্বিচার পরিবেশন ইতিহাস নয়, ইতিহাস রচনার প্রথম ধাপমাত্র। নানা সংবাদের মূল্যবিচার ও ব্যাখ্যা, বিভিন্ন তথ্যের যোগসূত্র ও কার্যকারণ সম্পর্কের আবিষ্কার ইতিহাস রচনার মূল কথা। কিন্তু রচনার যে প্রসাদগুণ, ঐতিহাসিকের যে প্রশস্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, নানা তথ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত সূত্রের যে অন্বেষণ থাকলে ইতিহাস সামগ্রিক ঐক্য ও সজীবতা লাভ করে আলোচ্য গ্রন্থে তার অভাব পীড়াদায়ক।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে শ্রীচানানা অনেক সময়ে তথ্য এবং সে তথ্যের উৎসগুলির কালানুক্রম সম্পর্কেও উদাসীন। তিনি ঋগ্বেদের সমাজচিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। অথচ ঋগ্বেদ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের রচনাকালের ব্যবধান কয়েক শতক। ত্রিপিটক গ্রথিত হয়েছে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর বেশ কিছু পরে। সুতরাং বুদ্ধের জীবনকালীন সমাজের চিত্র এতে কতখানি হয়েছে এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কি সত্যই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে রচিত? এতে কি কেবলমাত্র তৎকালীন সমাজেরই পরিচয় আছে, না,

অন্য কোনো সমাজের বর্ণনাও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে? আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এ সব প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু শ্রীচানানা এ সব প্রশ্নের আলোচনা পরিহার করেছেন।

শ্রীচানানা কোথাও তাঁর ইতিহাস রচনার পদ্ধতিটিকে সুস্পষ্ট করেন নি। তবে মনে হয় তিনি ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার অনুসারী। কিন্তু এ পদ্ধতির অনুসরণ ও প্রয়োজনে তিনি যথেষ্ট নিশ্চিত নন, কিছুটা বোধহয় দ্বিধাগ্রস্ত। প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার ন্যূনাধিক তিন হাজার বৎসরব্যাপী বিবর্তন তাঁর আলোচ্য বস্তু। কিন্তু এ বিবর্তনের অন্তর্নিহিত সূত্রটি কোথাও প্রকট নয়। ঋগ্বেদের আমলের কৌম সমাজে কেন এবং কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে দাস-প্রথার উদ্ভব ঘটল? সে যুগের দাসেরা কি গোড়াতে কৌম সম্পত্তি ছিল, না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল? অধ্যাপক কোশাম্বী তো প্রথম সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তীকালে, বিশেষত বৌদ্ধযুগে, দাসপ্রথার ব্যাপ্তি ঘটল কেন? এর দ্বারা সিদ্ধ হল কোন্ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন? উপরন্তু এটা যদি সত্য হয়, বৌদ্ধযুগে দাসপ্রথার বিস্তৃতি প্রধানত গাঙ্গেয় উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল, এবং এ অনুমানের কারণ খুবই জোরালো, তবে তারই বা হেতু কোথায়? এ প্রথা উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী হাতিয়ার এবং সমাজের মানসলোকের উপর বিস্তার করল কি প্রভাব? শ্রীচানানার মতে মৌর্য সাম্রাজ্য-পরবর্তীকালে দাসপ্রথার বিস্তৃতি ক্ষুণ্ণ হয়। এর কারণ রাজনৈতিক পরিবর্তন হেতু জীবন ও সম্পত্তির অনিশ্চয়তা। কিন্তু দাসপ্রথার অস্তিত্ব প্রকৃতই ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলে তার কারণ হিসেবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলা কি যথেষ্ট? কোনো অর্থনৈতিক কারণ ছিল না তো? আর মৌর্য পরবর্তী যুগে দাসপ্রথা যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তারই বা নিদর্শন কোথায়? এ সব কোনো জিজ্ঞাসার সমাধানই আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সর্বোপরি কথা হল, দাসপ্রথা বলতে শ্রীচানানা ঠিক কি বুঝিয়েছেন? সেটাই কি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের, অন্তত বৌদ্ধযুগের সমাজের mode of production, সে-সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক, ও আর্থিক বিধি-বন্দোবস্ত? আসলে কি সেযুগে slave society বা পুরোদস্তুর দাসসমাজেরই বিকাশ ঘটেছিল? এ সব বিষয়েও শ্রীচানানা অস্পষ্ট।

অবশ্য শ্রীচানানার সমগ্র আলোচনার থেকে প্রতীয়মান হয়, দাসপ্রথাই

প্রাচীন ভারতের কোনো পর্বে mode of production ছিল, এটা তাঁর সিদ্ধান্ত নয়। বরং তিনি বলেছেন যে, ভারতে দাসপ্রথা ব্যাপকতম বিস্তৃতির কালেও ক্লাসিকাল দাস সমাজের সমতুল্য নয়। গ্রীসে বা রোমে খনিতে, কৃষিতে, বাণিজ্যে, কারিগরী শিল্পে অর্থাৎ ধনোৎপাদনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে দাসশ্রমের যে প্রাধান্য ছিল তা ভারতবর্ষে কোনো কালে ছিল না। এ দেশে জলবায়ু মৃদু, জমি পেলব ও উর্বর, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য অজস্র। তদুপরি বিশাল দেশে পালিয়ে গিয়ে বা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে জীবনধারণের সুযোগও বর্তমান। সব মিলিয়ে শোষণের তীব্রতা এবং উৎপাদনের কঠোরতা ও পরিশ্রম এখানে কম।

কিন্তু দাসপ্রথা প্রাচীন ভারতের কোনো পর্বেই mode of production নয়, প্রধান উৎপাদন সম্পর্ক নয়, এই যদি শ্রীচানানার বক্তব্য হয় তবে অনিবার্যভাবেই সিদ্ধান্ত করতে হয়, সে সমাজে আর কোনো আর্থিক বিধি-বন্দোবস্ত ছিল। তাহলে সেটি কি? অনেক ভারততত্ত্বান্বেষী তো মনে করেন যে, এশিয়াটিক সামন্তপ্রথা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামপঞ্চায়েতই খ্রীঃ পূঃ প্রথম হাজার বৎসর এবং নানা রকমফেরের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রায় দু হাজার বৎসরের আর্থিক বিধি-বন্দোবস্ত। এটাও তাঁদের প্রতীতি যে, এই বিশেষ সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরেই দাসপ্রথার উদ্ভব ও সহাবস্থান ঘটেছিল। স্বভাবতই অনুমান করা যায়, এশিয়াটিক উৎপাদনপদ্ধতি ও দাসপ্রথার মধ্যে ঘটেছিল পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত। এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাত নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল ভারতীয় সমাজদেহ ও তার শ্রেণীবিন্যাসকে। কি ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত ঘটেছিল, তা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ সবই সন্ধানের বিষয়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাগুলিই একেবারে অনুপস্থিত।

অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থের এ সব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ঐতিহাসিক উপাদানের দৈন্য অনেকাংশে দায়ী। আর সে কথা মনে রাখলে কোনো ভাবেই শ্রীচানানার গবেষণার মূল্যকে লঘু করা সম্ভব নয়। দাসপ্রথার ইতিবৃত্ত রচনায় পথিকৃতের ধন্যবাদ শ্রীদেবরাজ চানানার প্রাপ্য।

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস

সুনীল সেন

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জাতীয় আন্দোলনের যে ইতিহাস* লিখেছেন তা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায় এবং পড়তে ক্লান্তি আসে না। তাঁর ভাষা অনবদ্য, অনিমিত্ত উচ্ছ্বাস বা অনিয়ত মন্তব্য প্রায় নেই; যা আছে তা ঘটনার বিবরণ এবং বিশ্লেষণ। জাতীয় আন্দোলনের যে সমস্যা (বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা) বারে বারে উত্থাপিত হয়েছে, তার সমাধানের ইঙ্গিত সাধারণত অনুপস্থিত। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। আধুনিক যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রবীণ লেখকের পরিচিতি নবীন লেখকদের উৎসাহিত করবে।

প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি সংক্ষেপে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রাক-কংগ্রেসী যুগের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, 'হিন্দু মেলার' প্রতিষ্ঠা, লীটনের দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করে আইন পাশ ইত্যাদি বিষয়গুলি এই অধ্যায়ের প্রধান আকর্ষণ। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (তিনি 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন) প্রসঙ্গে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা আদৌ তর্কাতীত নয়। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা থেকে যে সব নতুন তথ্য পাওয়া গেছে, তার ব্যবহার লেখক করলেন না কেন, এ প্রশ্ন থেকে যায়। "মোট কথা, মুষ্টিমেয় লোক বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল" (পৃঃ ২৮)—এই ধরনের উক্তি আধুনিক গবেষণা অগ্রাহ্য করেছে। মহাবিদ্রোহের আলোচনা মাত্র দু পৃষ্ঠা স্থান পেয়েছে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে একটা সংগঠিত রূপ দেবার প্রচেষ্টা শুরু হয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা থেকে—এ কথা সকলের সুবিদিত। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে হিউম সাহেব এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের কার্য-

---

*ভারতে জাতীয় আন্দোলন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থম। দশ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

কলাপ সম্বন্ধে এড়িয়ে যাওয়া হয়। শ্রী মুখোপাধ্যায় তা করেন নি। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে বাঙালীদের না দেখে চব্বিশ বৎসরের যুবক কবি রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখেছিলেন ("সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কই রে বাঙালি কই"), তার উল্লেখ ইঙ্গিতপূর্ণ (৩৮-৩৯)। 'বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন,' 'জাতীয় শিক্ষা', 'স্বদেশী আলোড়ন', 'কন্‌গ্রেসে ভাঙন', 'অসহযোগ আন্দোলন', 'আইন অমান্য আন্দোলন'—এই কয়টি অধ্যায়ে শ্রী মুখোপাধ্যায় ভারতবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বিবরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

লেখকের মতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। তিলকের 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন, মহারাষ্ট্রে গো-বধ নিবারণী-সভা স্থাপন, শিবাজীর ভগ্ন 'ভবানী মন্দিরের' সংস্কার-কে তিনি "এক দেশদর্শী ধর্মীয়তা" বলে মনে করেন। "অখণ্ড ভাবময় জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী এই মনোভাব" (৭৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে হিন্দু জাতীয়তার সুর তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। "তিনি মুসলমানদের প্রতি সর্বত্র সুবিচার করেন নাই বলিয়া যে অভিযোগ আছে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে দৈব ও অপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তিনি বিশেষ এক প্রকারের হিন্দুত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা যুক্তি-বিরোধী, বিজ্ঞান-বিরোধী রাহস্যিকতা" (৭৯)। বঙ্কিমের "নব্য হিন্দুত্ব" পরবর্তী যুগে বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দ্বারা (৮০)। "স্বামী বিবেকানন্দ দেশের কিশোর মনের মধ্যে দেশভক্তি ও স্বধর্মে মতি আনিলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁহার উদাত্ত বাণী দেশবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল, মর্মে আশ্রয় পাইল না" (৮০)। শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিষ্যদের কাজকর্ম সীমিত হল সমাজকল্যাণে ও শিক্ষাপ্রচারে, এবং "সেই শিক্ষায়তনগুলি হইল শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ধর্ম-সাধনা প্রচারের কেন্দ্র—যাহাকে বিশেষ ভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্মই বলিতে হইবে" (৮০)। শ্রদ্ধানন্দ স্বামীর হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রম, বিবেকানন্দের বেলুড়ে মঠ, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপন প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—"ভারতের তিনটি পর্বের প্রতীক ইহারা বৈদিক, ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক। সকলেরই উদ্দেশ্য ভারতের আত্মার অনুসন্ধান এবং সেইজন্য এই তিন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তিন মনীষীই অতীত ভারতের দিকে মুখ ফিরাইয়া,

"হিন্দুত্ব কি" তাহা আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন" (৮২)। অরবিন্দ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"অরবিন্দের ধ্যাননেত্রে দেশ ও দেবী মাতৃমূর্তিতে প্রকাশিত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বন্দেমাতরম্-এর মন্ত্রদ্রষ্টারূপে অন্তর হইতে শ্রদ্ধা করিতেন। শিবাজীর 'ভবানী দেবী' তাঁহার আরাধ্যা। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ হইতেই ধর্ম ও রাজনীতি তিনি মিশাইয়া লইলেন" (১০৫)।

অপরদিকে সার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমান সমাজ বিকাশমান জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াল। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ স্থাপিত হল ঢাকা শহরে। "এখন হইতে ভারতের রাজনীতি ত্রিধারায় প্রবাহিত হইল—কন্‌গ্রেসী সর্বভারতীয়তা, তথা-কথিত জাতীয়তাবাদীদের হিন্দুসর্বস্বতা এবং মুসলমানদের ইসলাম-সর্বস্বতা ; ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তা বা জাতীয়তা-মুখর ধর্মীয়তা ভারতকে ধীরে ধীরে বিভক্ত হইবার দিকে লইয়া চলিল" (১২২)।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির আবির্ভাব এবং ভূমিকা শ্রী মুখোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে গান্ধীজির আবির্ভাব থেকে জাতীয় আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের শুরু—যে অধ্যায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে আজও জ্যোতির্ময়। লেখক সুন্দরভাবে এই দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন—"গণসংযোগের দ্বারা গণআন্দোলন সৃষ্টি ছাড়া বিপ্লব সম্ভব হইতে পারে না। রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজির প্রবেশমুহূর্ত হইতে আরাম-কেদারাশায়ীদের রাজনীতি-চর্চার অবসান হইল" (১৪১)। ক্রমে ক্রমে "পুরাতন কন্‌গ্রেসী দলের মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাজনৈতিক আকাশে আলোকহীন তারকার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন" (১৫৭)। আন্দোলনের মধ্য থেকেই নেতার জন্ম হয় ; যে নেতা যুগধর্ম বুঝে এগুতে অক্ষম, আন্দোলন তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজি যে পথ অনুসরণ করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত কতটা সাফল্য অর্জন করেছিল ? গান্ধী-আরউইন চুক্তি কি আন্দোলনের কোনো বিজয় সূচিত করে ? তখন ক্রমাগত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ঘটবার কারণ কি ? এই পট-ভূমিতে নবীন নেতা জহরলালের আবির্ভাব এবং করাচী কংগ্রেসে 'মৌলিক অধিকারসমূহ' সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন (যে প্রস্তাবে সর্বপ্রথম কংগ্রেস

যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ, কৃষিসংস্কার, শ্রমিকদের বিবিধ অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য রাখল) প্রভৃতি কি জাতীয় আন্দোলনে নূতন দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে না? দুঃখের বিষয় আলোচ্য বইতে এই প্রশ্নগুলি আদৌ উত্থাপিত হয় নি। স্বভাবতই শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ তাঁর লেখায় গুরুত্ব পায় নি।

ফেডারেশন শাসন প্রবর্তন এবং "আপোষ নয়—সংগ্রাম" প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাই-কমাণ্ডের মতবিরোধের তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। হাই-কমাণ্ড "কী ভাবে সুভাষকে অপদস্থ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে কোনো ক্রুটি করিলেন না" (২০৫)। রবীন্দ্রনাথ সুভাষ সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য গান্ধীজিকে পত্র দেন ; গান্ধীজি তাঁর মতে অবিচল থাকেন (২০৬)। সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে প্রভাতকুমার ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি লিখছেন "সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের ছাত্র এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞ—তিনি কী করিয়া ভাবিতে পারিলেন যে, যে-জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া গত পাঁচ বৎসর চীনের উপর পাশবিক দৌরাত্ম্য করিতেছে, যে-জাপানী আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া অতর্কিতভাবে পার্ল হারবার ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে,···সেই লুব্ধ পরস্বাপহারক জাপানীরা ব্রিটিশদের হাত হইতে ভারত উদ্ধার করিয়া সুভাষ-চন্দ্রের হাতে উহা সমর্পণ করিয়া দেশত্যাগ করিবে!···সাম্রাজ্যবাদী রাজ-নীতিজ্ঞরা এমন বৈদান্তিক নহেন যে, যে-দেশ রক্ত দিয়া অর্থ দিয়া জয় করিবে —তাহা অপরকে ভোগের জন্য ছাড়িয়া দিয়া আসিবে!" (২৮৩) সুভাষ-চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও তাঁর যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে এমন সুনির্দিষ্ট সমালোচনা পড়ে কোনো কোনো মহল আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের মতো ক্রোধে ফেটে পড়তে পারেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

চিত্ত ঘোষ

প্রৌঢ়ির প্রান্তে উপনীত অমিয় চক্রবর্তী সম্ভবতঃ বর্তমানে বাংলাদেশের অগ্রজতম আধুনিক কবি। তাঁর কাব্য রচনার বয়স ইতিমধ্যেই উত্তরতিরিশ। এই সময়কালে নিজ বাসভূমে এবং প্রবাস-প্রব্রজ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিতে বিপুল বৈচিত্র্য সঞ্চিত হয়েছে এবং সেই অসামান্য ফলশ্রুতি তাঁর কবিতায় বহুরূপে বিকীর্ণ। এই নবসম্ভার যে বাংলা কবিতায় নতুন দুর্লভ সংযোজন তা সর্বজনস্বীকৃত। এবং তিনি কবিযশপ্রার্থী মাত্রেরই আরাধ্য না হলেও অবশ্যই সশ্রদ্ধ আলোচ্য।

অমিয় চক্রবর্তীর প্রধান চারিত্র্যগুণ এই যে তিনি যুগপৎ দেশী এবং সর্বদেশী। তাঁর মতো জগৎযাত্রী হওয়া তাঁর সমসাময়িক আর কোনো কবির পক্ষে হয়তো সম্ভব ছিল না। যে কোনো পরিবেশে, যে কোনো পরিমণ্ডলে, অপরিচিতের সঙ্গে সহজেই একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা, এমন সদাপ্রস্তুত মন আর কারো নেই। আত্মীয়তাই তাঁর অন্তরের মূলমন্ত্র। সেজন্য কংগোতীরে, স্তিমিত রৌদ্র, চন্দ্রাক্ত সন্ধ্যায়, যুগোস্লাভিয়ার শৈলপথে ফলের বাগানে, গণ্ডোলাদোলা ভিনিসের স্বপ্ন শহরে, সর্বত্র, পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁর অবারিত, অনায়াস বিচরণ।

অমিয় চক্রবর্তীর সন্ত সবুজ, প্রস্ফুট-পদ্মচিহ্নিত কবিতার বইয়ে* চোখ রেখে, প্রথম পাঠ সমাপ্ত করে, একথাই মনে হবে, যে, প্রৌঢ় প্রবাসী কবির পক্ষে কবিতার বইয়ের 'ঘরে ফেরার দিন' নামকরণ শুধু উপযোগী নয়, যথার্থও। এই নাম একদিকে যেমন পরবাসীর গৃহমুখী বিধুরতা ব্যক্ত করেছে অন্যদিকে এই তিনটি শব্দের সমবায়ে দীর্ঘ পরিক্রমাক্লান্ত অন্তর্যাত্রীর আলয়ে প্রত্যাবর্তনের আকুলতাও ব্যঞ্জিত। আর এক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সম্ভবত ভবিষ্যতেরও সেতুবন্ধ ঘটার সেই অনন্য তালিকা, যার কোনো একটি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা ক্ষমতাবানেরও অনায়ত্ত।

---

*ঘরে ফেরার দিন। অমিয় চক্রবর্তী। নাভানা। সাড়ে তিন টাকা।

কুঁয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি
আপনজনকে ভালোবাসা
বাংলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি ফেরার আশা।

('বড়বাবুর কাছে নিবেদন'—'মাটির দেয়াল')

এই সব ঘোষণা থেকে এ প্রতীতি জন্মে যে অমিয় চক্রবর্তী অনিকেত নন। ঘরবাড়ি তাঁর একটা ছিল এবং এখনো আছে আর তার ভিৎ খুব শক্ত। তাই ঘরছাড়ার দিন ডেকে নিয়ে গেলেও ঘরে ফেরার দিন আসে, আসেই।

পৌঁছতে হবেই বাড়ি
কেনা বেচা শেষ ক'রে
গান কণ্ঠে ভ'রে

('কংগো নদীর ধারে')

'ঘরে ফেরার দিন'-এ সন্নিবিষ্ট বহুবিচিত্র কবিতায় অদৃষ্টপূর্বকে নয়, পরিচিত, প্রত্যাশিতকেই পাওয়া গেল। অমিয় চক্রবর্তীর বিশিষ্ট মেজাজ, নিজস্ব ঘরানা, ঘরোয়া উত্তাপ আর সেই কঠিন সারল্য—সবই। আর কেতাবী ও দেহাতী শব্দ মিলে মাঝে মাঝে তাঁর অভ্যস্ত অভিনব রচনারীতি, যাতে কেতাবীর কেতা যায়, দেহাতীর গ্রাম্যতা থাকে না, এক অন্য তৃতীয় জন্ম নেয়।

জুতো খুলে কী আরাম (যদিও নরম
চামড়া বশ-মানা) বর্মে আঁটা দুটি পদ
এবার পেলরে ছাড়া সারাদিনে ; কম
দামী নয় সন্তুপি, তবু সে আপদ

('ক্লান্ত অপিস ফেরতা নরেন')

অথবা

বিদ্যুৎ-করাত চিরে শাসিত বৃক্ষের শরীর
বানাই বুকের তক্তা, মাথায় পল্লব চুল নড়ে
আরণ্যিক মৃত্যু শেষ, শুধুই হিল্লোল হাওয়া লেগে।

('সূত্রধর-সংবাদ').

উপরন্তু এও লক্ষণীয় যে দ্বন্দ্বে দোলায়িত এবং সংশয়ে হতাশায় মাঝে মাঝে

রিদ্ধ হলেও জীবনের ওপর এখনো তিনি আস্থা খোয়ান নি। এবং মানুষের পীড়ন, নিগ্রহ তাঁর সজীব হৃদয়কে যে সহজেই উদ্বেল করে, আলোড়িত করে এবং সেই তাড়নায় যে তাঁর কণ্ঠ থেকে তীব্র ধিক্কারও ধ্বনিত হয় তার প্রমাণ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় নিবদ্ধ।

ছিন্নবাঁচা বন্দী জনতার
কোথাও খনিতে লুপ্তি, কারা খাটে কলে ;
কালো ত্বক বিধিদত্ত, নির্যাতিত নিগ্রো শোধে তারি
আমৃত্যু ভীষণ দাম অপমানে রাত্রিদিন।
অধম বণিক ঘোরে সাম্রাজ্যপাপের মূর্খ দাপে।

('পর্তুগীজ আঙ্গোলা')

সমগ্র উপনিবেশ আফ্রিকা জুড়ে আজ যখন নৃশংসতম নরমেধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন মৃত্যুকে অমরতা দিয়ে মুক্তিযজ্ঞের অনির্বাণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, তখন লিওপোল্ডভিল বা নাইরোবিতে অবস্থানকালে লেখা এমন সব কবিতা বিবেকবান মানুষের মথিত আবেগের শুদ্ধ প্রতিধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত হবে। হৃদয়ের এই গুণ আরেকবার প্রমাণিত করল যে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারের অক্লান্ত বাহক। এবং মানুষের কল্যাণ সাধনার সহযাত্রায় তিনি যথেষ্ট নির্দিষ্ট না হলেও এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে তিনি সর্বসময় মানুষের সপক্ষে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রবলতা নেই, প্রচ্ছন্নতাই তাঁর স্বভাব। তাঁর কবিতায় আহত আত্মার আর্তনাদ নেই। আত্মপীড়নের রক্তাক্ত মুখচ্ছবি নেই। বেদনায়ই তিনি সর্বাধিক ব্যক্ত। সেজন্য মনে হতে পারে যে বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী হলেও তিনি তার সহোদর নন। কিন্তু উপাদানের অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যে এবং তার ব্যবহারে আধুনিকতা কখনো কখনো প্রায় আতিশয্যের সীমান্তবর্তী।

গ্রীন-মেন-এ ফিরি, চিনি ক্যাম্পিনো
চলেছি অন্ত কেন্দ্র
ফেলে এরোড্রাম, বাতিজ্বালা ঘর
জ্যাজ, রাঙা-কার্ড, বিদেশী দুপুর ;

('উড়ন্তি')

তাঁর কবিতার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সর্বাধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে ভিন্ন

গ্রামে, অন্য শহরে, দেশান্তরে তিনি যত সহজে গিয়েছেন, থেকেছেন, অক্লান্ত অন্তরে সর্বক্ষেত্র থেকে আহরণ করেছেন বিচিত্র বস্তু, তত সহজেই গৃহীত সামগ্রীর তুচ্ছতম অস্তিত্বকে অলঙ্কারের মতো ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু এই সহজতা প্রবঞ্চক। এই সারল্যের তলবর্তী দৃশ্য জটিল রেখায় আচ্ছন্ন। এবং মাঝে মাঝে তার স্বরূপ শুধু স্বল্পক্ষম বুদ্ধি ও উপলব্ধিরই অগোচর থাকে না পরন্তু এ বিষয়ে পারঙ্গম, পারদর্শী বহুবিদের প্রচেষ্টাকেও হার মানায়। আসল কথা এই যে অমিয় চক্রবর্তীর জগৎ অপরিমেয়। এবং বহু বিষয়ে কিছু কিছু জানাশোনা না থাকলে শুধু কাব্যামোদী পাঠকের পক্ষে তাঁর কবিতার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি মিতাচারী, সংকেতাশ্রয়ী, আভাসপ্রিয়। তাঁর কবিতার বিচ্ছিন্নতা বা অসংলগ্নতা আধুনিক জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এবং নিসর্গে আকর্ষণ থাকলেও নগরেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব। ফলে নাগরিক জীবনের চিত্রই তাঁর কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। আর সেই পটাশ্রিত এমন আধুনিক স্তবকে তাঁর বৈশিষ্ট্যে সার্থক-ভাবে অভিজ্ঞাত :

হাজার হাজার বার
চিনি না ছড়িয়ে চা তৈরি করা
জামার বোতাম না হারানো, ভরা
পকেটে কলম, কলমে রিফিল ; বুকে
বেপরোয়া তবু অতিসাবধানী ট্রাফিক-পেরোনো রীতি
জাগায় না বেশী প্রীতি,
ও পাড়ার ছেলে ডাক নাম জানা তার
প্রতিদিনে এই প্রতিদিন উদ্ধার।

('আরো')

অবশ্য এসবের মাঝে মাঝে এমন কবিতাও তিনি লেখেন যার লঘু সঞ্চার ও লিরিক কান্তি অত্যন্ত উপভোগ্য। তার একাধিক নিদর্শন এই বইয়ের কবিতায় পাওয়া যাবে। এবং সমগ্রভাবে এইসব কবিতা পাঠান্তে স্বতঃই মনে হবে, কি আশ্চর্য কৌশলে বিদ্যার গুরুভার থেকে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতাকে বাঁচালেন।

পরিশেষের কথা এই যে অমিয় চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত চৈতন্যে আশ্রিত।

বাইরের আঘাত যখনই দুঃসহ হয়েছে তখনই তিনি মানস গভীরে "ব্যাকুল মধুর শান্তি" খুঁজেছেন।

সেই ধ্যানসরোবরে
চারিদিক হতে মেঘ ছায়া ফেলে
শীতসূর্য খোলে দিন
আকাশ-আয়না হাওয়া স্বর্ণ ঝরা।

('মানস সরোবর')

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে তাঁর গায়ে যৌবনেই রবীন্দ্রনাথের সৌরতাপ লেগেছিল। এবং প্রধান আধুনিক কবিদের অন্যতম হলেও রবীন্দ্রপ্রভাবের বিরুদ্ধে মুক্তি-যুদ্ধে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তিনি কখনো গলা মেলান নি। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম কবিতা রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে সেই মহাকবির উদ্দেশে নিবেদিত। প্রকারে অবশ্য অমিয় চক্রবর্তী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এযুগের চাঁদ-সদাগর। বাংলা কবিতায় তাঁর তুল্য নিরীক্ষা কম কবিই করেছেন। তবু মনে হয় সূর্যাবর্তই হয়তো তাঁর আদি বাসভূমি। বহুদিন আগে প্রথম প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ইংরেজী সমালোচনায় আধুনিক কবিদের সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ যে মন্তব্য সুধীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"Whatever claim to progress his successors may choose to prefer on their own behalf, even in the realm of feeling, they have not yet trodden a path which had not been explored previously by Tagore. All that has happened since is the breakup of his illimitable domain into small holdings, that under the best tenants have been more intensively cultivated than befoere."

কবিতা-প্রসঙ্গ

রাম বসু

কবিতা জীবন্ত বলেই তার রহস্য এখনও মানুষের অনায়ত্ত। কোনো একটি বিশেষ সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা কঠিন। সংজ্ঞা সীমিত। কিন্তু জীবন অপরিসীম। তাই সংজ্ঞায় সমগ্রের ধ্যান অসাধ্য। অথচ, মানুষের মনের স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্তই হয়তো, প্রতি যুগেই মানুষ কবিতার রহস্যের তল পেতে চেয়েছে সংজ্ঞার আধারে। এমনকি যে ঋষির মুখ থেকে প্রথম শ্লোক উদ্গত হল তিনিই অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, এ কি! সেই প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। আর, পাওয়া যায় না বলেই বোধ হয়, হিন্দু ঋষি কবিতাকে ব্রহ্মস্বাদের তুল্য বলে মনে করেন। সম্প্রতি এলিজাবেথ সিওয়েল কবিতার সংজ্ঞা নিরূপণে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন*।

কিন্তু শ্রীমতী সিওয়েলের কাছে কবিতা ঠিক ব্রহ্ম নয়, সে 'মিথ'। এই শব্দটি সিওয়েলের কাছে বীজমন্ত্র। এই শব্দের অলৌকিক বিভায় কবিতার সমগ্র দিগন্ত উদ্ভাসিত। মানুষের চেতন ও নিশ্চেতন, দেহ ও মন, দৃশ্য ও অদৃশ্য, এক কথায় বোধের সমগ্রতা বাস্তবে ফিরে আসে মিথের আভায়।

অবশ্য কবিতার ব্যাখ্যায় মিথ শব্দটি অনেক আগেই এসেছে। কিন্তু সেখানে সে পুরাণের গণ্ডী পার হতে পারে নি। আক্ষেপ শোনা গেছে আধুনিক জীবন থেকে মিথ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। স্বদেশে ও বিদেশে কবিরা যোগাযোগের সেতু হিসাবে পুরাণ থেকে চরিত্র এনে তাকে প্রতীকের মহত্ত্ব আরোপ করতেও চেয়েছেন। বলা বাহুল্য সুফল হয় নি।

কিন্তু সিওয়েল মিথ শব্দটিকে পুরাণ বা উপকথার স্তর থেকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট। তাঁর কাছে মিথ সেই "activity between mind and language whereby the mind invents the new modes and methods to understand new things." মিথ তাই সর্বব্যাপ্ত বোধ যার

---

*Elizabeth Sewell: The Orphic Voice—Poetry and Natural History. Yale University Press. $ 7'50.

ওপর ভর করে মানুষের বুদ্ধি শব্দের দিব্য সেতু পার হয়ে অখণ্ড বাস্তবতার সন্ধান পায়। সিওয়েল জোর দিয়েছেন তাই অখণ্ডতার ওপর। মিলের অন্বেষণই তার প্রাণধর্ম। সমস্ত বিশ্ব ও সৃষ্টি চলেছে পরম মিলনের দিকে। মিথের মতন 'ইউনিটি' শব্দটিও সিওয়েলের কাছে গূঢ় অর্থে দীপ্যমান।

এই সমস্ত ভাবনা-প্রতিভার প্রতীক হয়ে আসে 'অরফিউস'। অরফিউস সুরের যাদুতে সম্মোহিত করেছিল দ্যুলোক-ভূলোক। নরকের দ্বার হয়েছিল মুক্ত। প্রাণ দিতে হয়েছিল বন-কন্যার হাতে। কবিতার কাজও এই তিনটে। বস্তুবিশ্ব সম্মোহিত করে কবিতা। সে নিয়ে যায় অসম্ভবের সীমান্তে। এবং তার প্রভার প্রখরতায় পুড়ে যেতে হয় কবিকে। কবিতাই অস্তিত্বের সমগ্রতা এবং সেজন্য অরফিউসই তার প্রতীক। সিওয়েল এখানে বেশ দুঃসাহসিক। অরফিউসই কবিতা। কারণ তার সুরের মন্ত্রে প্রাণ পেল বস্তু ; জড় ও জীবন। কাজ ও ভাবনার মধ্যে যে ফাঁক, দেহ ও মনের মধ্যে যে দূরত্ব, দৃশ্য ও অদৃশ্যের যে ব্যবধান তা ঘুচে যায় অরফিউসে এবং কবিতায়। সমগ্রতা উদ্ভাসিত হয় মিলিত ছন্দের বন্ধনে।

সাম্প্রতিক মানুষ বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতাকে বিধিলিপি বলে ভাবতে অভ্যস্ত। ভগ্ন, ছিন্ন, গৃহহীন, নিরাশ্রিত মানুষ নিরক্ত মনের অন্ধকার সুড়ঙ্গে মাকড়সার জাল বোনাই অবিনাশী কবিতা বলে ভেবে অভিভূত। এই যুগে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা না করে, বরং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষর মিল ঘটাতে চেয়েছেন। শ্রীমতী সিওয়েল এইজন্য বোধ হয় ধন্যবাদের পাত্র।

প্রত্যক্ষ মিথ্যা নয় বলেই বিজ্ঞান অভিষিক্ত হয় সিওয়েলের চিন্তায়। কবিতা ও বিজ্ঞান সহোদর। সৃষ্টিতত্ত্বের বিরাট রহস্যের তারা দর্পণ। তাঁর এই মত প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম। তিনি বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ এবং কবিতাকে সংশ্লেষণ হিসাবে দেখতে নারাজ। দুটি কাজ একই। "Science can not be set against poetry because they are structurally similar activities." অঙ্ক শব্দের বিপরীত নয়। কারণ অঙ্ক ও শব্দ একই—"instrument for myth in the mind." আবিষ্কারই এদের কাজ। এরা একটা "mythological situation" আবিষ্কার করে। কেউ শব্দ দিয়ে, কেউ সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু লক্ষ্য তাদের এক। জগৎ ও জীবনকে নতুন ভাবনায় দীক্ষিত করা।

বিজ্ঞান আলোচনায় জীববিজ্ঞানে সিওয়েলের বিশেষ আগ্রহ। নিত্য বিবর্তমান জীবন ও তার রহস্য নিয়ে জীববিজ্ঞান মুগ্ধ। কবিতাও তাই। কারণ কবিতা হল "language in a condition of myth-making metaphor."

বিজ্ঞান ও কবিতাকে একই কর্মকাণ্ডের শাখা হিসেবে প্রমাণ করে শ্রীমতী সিওয়েল পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের তিনশো বছরের প্রিয় ও পোষা ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। যোগ্যতর ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই সিওয়েলের এই প্রতিপাদ্যকে বিচার করবেন। সাম্প্রতিক জীবনে বিজ্ঞান ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইতিমধ্যে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কাছে এই সিদ্ধান্ত প্রায় তর্কাতীত সত্য যে মানুষ যতই বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বুদ্ধিকে আয়ত্ত করছে, ততই সে নৈতিক ও কবিতার মহত্ত্ব হারাচ্ছে। কারণ যে যন্ত্রকে সে আবিষ্কার করেছে তার জীবনের কল্যাণের জন্যে, কালক্রমে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ সেই যন্ত্রের চাকর হয়ে পড়েছে। সে নিজেও হয়ে গেছে যান্ত্রিক। এই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে শ্রীমতী সিওয়েল যে উক্তি করেছেন তা নিশ্চয়ই গভীর বিবেচনার যোগ্য।

এই সুদীর্ঘ পুস্তকে শ্রীমতী সিওয়েল একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যাকে এক কথায় বোধ হয় বলা যায় "organic totality." এবং এটি-ই অরফিউসের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে যাঁরা স্বীকার করেন, অন্তত স্বীকার করেন বলে সিওয়েলের ধারণা, তাঁদের আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কবি আছেন, আছেন বিজ্ঞানী। বেকন, শেকৃস্পীয়র, এরাসমাস, ডারউইন, ভিকো, গ্যেটে, ভিক্তর হুগো, শেলী, এমারসন, রিলকে প্রভৃতি সম্পর্কে সিওয়েল এই দৃষ্টি থেকে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বিপদ বোধ হয় এখানে। তাঁর বৈদগ্ধ্যের প্রখরতায় চোখ ধাঁধায়। ফলে বেশ অনেক কিছু অস্পষ্ট থেকে যায়। কিন্তু বিস্ময়ও লাগে এই ভেবে যে বাস্তবকে এমন সমগ্রতায় দেখবার চেষ্টা হচ্ছে যখন মানুষের পরাজয় কারো কারো কাছে প্রায় সুনিশ্চিত। বিজ্ঞানের এক শাখার সঙ্গে অন্য শাখার সম্পর্ক ক্ষীয়মান। শিল্পের এক মাধ্যমের সঙ্গে অন্য মাধ্যমের যোগাযোগ লুপ্ত হবার পথে। সে সময় শ্রীমতী সিওয়েলের ধারণা অভিনন্দন-যোগ্য। অবশ্য সমগ্র চেতনার মধ্যে হোয়াইটহেডের প্রভাব বর্তমান। এবং বোধ হয় এই জন্যই বইটার দাম আরো বেশি।

চিত্রকল্পের সেই বিস্মৃতপ্রায় আন্দোলন

তরুণ সান্যাল

ডি. এইচ. লরেন্স আমাদের দেশে অধুনা সংবাদ-শিরোনামায় জনপ্রিয় নাম। ওল্ড বেইলী তাঁর অসংক্ষেপিত লেডী চ্যাটার্লীর প্রেমিককে মুক্তি দিলেও বোম্বাই আদালত তাকে অন্তরীণ রাখবার আদেশ দিয়েছেন। ডেভিড হারবার্ট লরেন্স প্রচলিত উক্তি-প্রত্যুক্তির সাধারণ্যে সেক্সকে উর্দ্ধে স্থানদানকারী ঔপন্যাসিক বলেই সমধিক পরিচিত। অবশ্য সংস্কৃত পরিবেশে লরেন্স তাঁর সাহিত্যজগতে পদক্ষেপের পর থেকেই আলোচ্য ব্যক্তি এবং তাঁর কবিতার বিষয়েও কৌতূহলের শেষ নেই। ডি. এইচ. লরেন্সকে চিত্রকল্পধর্মী (imagist) কবিদের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁকে ইমেজিস্ট আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত অনেক কবি বলে দেখা বোধ হয় ভুল হবে। আসলে ১৯১৪ সালে লরেন্স-কে এমন একজন প্রতিভাশালী যুবক বলে মনে করা হত যে, ইমেজিস্টরা তাঁর কবিতাকে তাঁদের সংকলনে স্থান দিয়ে মনে করতেন "a writer of genius who would certainly achieve fame and would therefore shed glory on the whole imagist movement।" শ্রীমতী অ্যামি লাওয়েলই লরেন্সকে, তাঁর "The morning breaks like a pomgranate / In a shining crack of red" পঙক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে ছিলেন যে লরেন্স আসলে একজন ইমেজিস্ট কবি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতা ইমেজিস্ট সংকলনে অন্তর্ভুক্তির দাবি করেন। এই অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ১৯২৯ সালের মে মাসে লরেন্স গ্লেন হিউগসকে* বলেছিলেন যে তাঁকে ইমেজিস্ট বলে চিহ্নিত করবার জন্য মূলত দায়ী এজরা পাউণ্ড। বলেছিলেন "In the old London days Pound wasn't so literary as he is now. He was more of a mountenbank then. He practiced more than he

* Glenn Hughes : Imagism and the Imagists : A Study in Modern Poetry. Bowes & Bowes. 42 sh.

preached, for he had no audience. He was always amusing।" এজরা পাউণ্ডের তৎকালীন চরিত্রের এই বিশেষ চিত্রণ অবশ্য বিতর্কসাপেক্ষ, তথাপি ১৯৩০ সালেও যে Imagist Anthology প্রকাশিত হয়, তার কবিতালিকায় রিচার্ড অ্যালডিঙটন, জন করনস, এইচ. ডি. (হিলডা ডুলিটল), জন গোল্ড ফ্লেচার, এফ. এস. ফ্লিন্ট, ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, জেমস জয়স, উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়ামস্ প্রভৃতির সঙ্গে ডি. এইচ. লরেন্সকেও দেখা যায়। এবং ১৯৩০ সালেই ডি. এইচ. লরেন্সের মৃত্যু হয়। লরেন্স ইমেজিস্ট আন্দোলনে ছিলেন কিনা বিতর্কসাপেক্ষ হলেও, ইমেজিসম্ যে একদা একটি কাব্য-আন্দোলন ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও ত্রিশ বা চল্লিশের কোনও কোনও কবি সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কখনও এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এলিঅটের প্রতি মুখ ফেরাতে, অনেকেই অজ্ঞাতে তাঁর পূর্বসূরী—যাঁদের সঙ্গে এলিঅটের পরবর্তী-কালে কোনও সম্পর্ক ছিল না—সেই ইমেজিস্টদের, বিশেষভাবে 'ইমেজিস্ট' এজরা পাউণ্ডের বহু তৎকালীন মতামতকে মেনে নিয়েছিলেন। তথাপি ইমেজিস্ট আন্দোলন আমাদের দেশে সুপরিচিত আন্দোলন বলে আমরা মেনে নিতে পারি না।

বস্তুত ইমেজিসমের ক্ষেত্রে প্রভাব ও স্ফূর্তির উৎস ছিল দুদিকে। ক্লাসিক্যাল প্রভাব এসেছিল গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, চীনা ও জাপানী কাব্য থেকে। আধুনিকতার ছাপ এসেছিল ফরাসী কাব্য-আন্দোলন থেকে। যাঁরা ইমেজিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা যে সবাই একইভাবে প্রেরণা বা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা নয়। স্পষ্ট ঘের (hardness of outline), চিত্রকল্পের স্পষ্টতা, স্বল্প ভাষণ, ইঙ্গিতধর্মিতা এবং ছন্দের অধীনতা থেকে মুক্তি—প্রভৃতি সূত্রগুলি তাঁরা ক্লাসিক্যাল গ্রীক, চীনা ও হিব্রু কবিতা থেকে পেয়েছিলেন। ফরাসী প্রভাব তাঁদের নিও-ক্লাসিসিজমের অংশভাগী করে নিঃসংশয় করে তুলেছিল। এবং মতবাদ নিয়ে ফরাসীসুলভ হৈচৈ করবার পদ্ধতিটিও তাঁরা অনুপ্রেরণার মতো লাভ করেছিলেন। অবশ্য ইমেজিস্ট আন্দোলনের পূর্বসূরী ফরাসী প্রতীকতার আন্দোলন—সিম্বলিজম, মনে রাখা দরকার।

প্রতীকতার বিষয়ে পরিচিতি দিতে হলে আমাদের ১৮৬০-এর দশকের দিকে ফিরে তাকাতে হবে, যখন কিছুসংখ্যক উদ্ধত তরুণ রোমানটিসিজমের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পারনাশানস্ (Parnassions) গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। ফরাসী কবিদের স্বভাবটাই একটু কুঁদুলে। কোনও মতবাদ নিয়ে লড়াই না করা পর্যন্ত তাঁদের স্বস্তি হয় না। ১৮৬৬-১৮৭৬, এই দশ বছরের পারনাশানস্‌গণ রোমাণ্টিকদের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে Le Parnasse Contemporain নামে তিনটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। যাঁরা এই সঙ্কলনের কবি, তাঁদের মধ্যে মালার্মে, ভের্লেন প্রভৃতি আমাদের দেশে অধুনা কিছুটা শোনা বা কোনও কোনও মহলে পরিচিত নাম। এঁদের লক্ষ্য ছিল আঙ্গিকের অনিবার্যতা (exactness of form) এবং বাস্তবতা (objectivity)। বাস্তববিষয়গুলি তাঁরা বর্ণনামূলকভাবে যেমন প্রকাশ করতেন, তেমনি অন্তরঙ্গ দিকগুলি, বিশেষত আবেগকে তাঁরা অনুপস্থিত রাখতে বিশেষ করে সচেষ্ট হতেন। পারনাশানসদের বাস্তবতার দিকটি অনেকের শেষ পর্যন্ত পছন্দসই হয় নি, ফলে জনৈক প্রথম যুগের পারনাশান-প্রবক্তা 'শার্ল বোদলেয়ারের দুজন' শিষ্য ভের্লেন ও মালার্মে প্রতীকধর্মিতা বা সিম্বলিজমের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। প্রতীকধর্মিতার মূলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আর্তুর র‍্যাঁবোও কম অনুপ্রেরণা ছিলেন না। ১৮৮৫ সালে জঁা মেরে (Jean More'as) সিম্বলিজম নামটি ব্যবহার করলেন। ১৮৮৫-১৯০০ পর্যন্ত ফরাসী কবিতায় সিম্বলিজম সবচেয়ে শক্তিশালী কাব্যাদর্শ ছিল। ইতিমধ্যে প্রতীকতার আন্দোলনের প্রবক্তাদের রচনা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, ফলে ১৮৯১ সালে জঁা মেরে ইস্তাহার বের করে ক্লাসিসিস্টদের একত্রিত করলেন। যাঁরা আরও র‍্যাডিক্যাল, তাঁরা কাব্যবক্তব্য ও আঙ্গিকের আরও অভিনবত্বের দিকে এগোলেন। এলেন কিউবিস্টরা (অ্যাপলনিয়র, ম্যাক্স জেকব, আঁদ্রে স্তালমঁ), ফ্যানট্যাসটিস্ট-রা এবং ইউন্যানিমিস্টরা, দাদাবাদীরা (এঁদের মধ্যে ছিলেন ককতু, আরার্গঁ অনেকেই), তারপর অতিবাস্তববাদীরা—ইত্যাদি ইত্যাদি পালাক্রমে। ব্রের্তঁ এবং আরার্গঁ অতিবাস্তবতা ও দাদাবাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিলেন।

ব্রিটেনে টি. ই. হিউমই (T. E. Hulme) আসলে ইমেজিস্ট আন্দোলনের নাটের গুরু। দর্শনগতভাবে নন্দনতত্ত্বের বিশেষ বিদ্যা, বিভিন্ন ভাষার কাব্যে পারদর্শিতা, বের্গস'র সান্নিধ্য এবং আপন ব্যক্তিত্বের অস্থিরতা তাঁকে ইমেজিস্ট আন্দোলনের নেতা করে তুলেছিল। হিউম ১৯০৮-১৯১২ পর্যন্ত ব্রিটেনের লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের এক বিশাল অংশের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তাঁর

মতামত ও আক্রমণকারী ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে হিউমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যাকব এপস্টাইন বলেছিলেন: "He was capable of kicking a theory as well as a man downstairs when occasion demanded." হিউম প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন এবং ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিহত হন।

শ্রীযুক্ত এফ. এস. ফ্লিন্ট এই আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেন: "I think that what brought the real nucleus of this group together was a dissatisfaction with English poetry as it was then (and still alas !) being written. We proposed at various times to replace it by pure *vers libre*...in all this. Hulme was ring leader. He insisted too on absolutely accurate presentation and no verbioge...(Egoist, May, 1915). এজরা পাউণ্ড ২২শে এপ্রিল, ১৯০৯ সালে দলে যোগ দিলেন। পাউণ্ড তখন "was very full of his troubadours।" ১৯১২ সালে পাউণ্ড টি. ই. হিউমের সম্পূর্ণ কাব্যসঞ্চয়ন প্রকাশ করলেন—পাঁচটি কবিতা ও তেত্রিশ পঙক্তিতে। তার মুখবন্ধে লিখলেন: "As for the future, Les Imagistes, the descendants of the forgotten school of 1909... have that in their keeping।" ব্যস, ইমেজিসমের দল তৈরি হয়ে গেল। ইমেজ শব্দটির সংজ্ঞাগত অর্থও পাউণ্ড উপস্থাপিত করলেন। হিউমের অধিকখ্যাত Autumn কবিতাটি উদ্ধৃত করা যাক:

> A touch of cold in the autumn night—
> I walked abroad,
> And saw the ruddy moon lean over the hedge
> Like a red-faced farmer.
> I did not stop to speak, but nodded,
> And round about were the wistful stars
> With white faces like town children.

হিউমের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিতর্কের কারণ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তিনি একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করে গেলেন।

১৯০৯ সালে পাউণ্ড হিউমের সঙ্গে যোগ দেন। আমেরিকা থেকে হিল্ডা ডুলিটল ১৯১১ সালে লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন। অ্যালডিংটনকে দলে ডেকে

নেওয়া হল। দুজনেই *vers libre*-তে কবিতা রচনা শুরু করলেন এবং বিবাহবন্ধনে মিলে গেলেন। ইতিমধ্যে ১৯১২ সালে চিকাগো ট্রিবিউনের শ্রীমতী হ্যারিয়েট মনরো চীন দেশে কবিতার সমাদর দেখে ফিরে এসে, উৎসাহিত হয়ে ১০০ জনের কাছ থেকে ৫০ ডলার করে চাঁদা নিয়ে ১৯১২ সালের অক্টোবরে 'Poetry: A magazine of verse' বের করলেন। পাউণ্ড তার বিদেশী প্রতিনিধি হলেন। ১৯১৩ সালে পাউণ্ড ঐ পত্রিকায় ইমেজিস্টদের একটি গোষ্ঠী বলে পরিচিতি দিলেন, তাঁদের নীতিগুলি যথাক্রমে বলা হল:

> "1. Direct treatment of the 'thing' whether subjective or objective.
>
> 2. To use absolutely no word that does not contribute to the presentation.
>
> 3. As regards rhythm, to compose in sequence of musical phrase, not in sequence of metronome."

ফ্লয়েড ডেল চিকাগো ট্রিবিউনে কী কী ইমেজিস্টদের পক্ষে স্মরণীয় তার তালিকা দিলেন। যেমন:

যে সমালোচকেরা উল্লেখযোগ্য কিছু লেখেন নি, তাঁদের কথায় কান না দেওয়া।

যা ইতিমধ্যে ভালো গদ্যে লেখা হয়ে গেছে, নয়নভোলানো পদ্যের ছন্দোবন্ধনে তাকে সাধারণ কবিতায় রচিত করার কোনও প্রয়োজন নেই।

যত বেশি সংখ্যক বড় শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যায়, ততই ভালো, কিন্তু হয় তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা দরকার, নইলে গোপন করা প্রয়োজন।

বিশেষত আজ যা বিচার করতে ক্লান্তি বোধ হয়, আগামীকাল জনসাধারণ তার জন্য ক্লান্তি বোধ করবে।

কবি তাঁর মনে সুচারু শব্দসীমাসমূহ (cadences) আবিষ্কার করেন, বিদেশী ভাষা থেকে আবিষ্কার আরও চমকপ্রদ কেননা শব্দগুলির অর্থ শব্দের গতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য, বলে মনে হতে পারে…গ্যেটের গীতিকবিতাগুলিকে আবেগহীন শীতলতার সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করে তাদের অঙ্গীকৃত শব্দমূল্য, সিলেবল্গুলি হ্রস্ব দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত নিষ্পিষ্ট এবং মুক্ত, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি-ইত্যাদি বুঝে নিতে হবে।

কবিতা যে সঙ্গীতের উপর নির্ভর করবে এমন নয়, কিন্তু যদি তা কখনও নির্ভর করে, তবে যেন তা বিশেষজ্ঞকেও মোহিত করার ক্ষমতা রাখে।

প্রতি পঙক্তি যেন পঙক্তি-সমাপ্তিতে একেবারে থেমে না যায়, পরবর্তী পঙক্তি যেন পূর্বের পঙক্তির ছন্দের তরঙ্গের উত্থানের সহিত উত্থিত হয়। অবশ্য কবি যদি কোনও বিলম্বিত স্তব্ধতা আনতে চান, সে হল আলাদা কথা।

"The musician can rely on pitch and the volume of the orchestra. You cannot. The term harmony is misapplied to poetry ; it refers to simultaneous sounds of different pitch.... A rime must have in some slight element of surprise if it is to give pleasure"...ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্র এজরা পাউণ্ডেরই মতাদর্শের প্রতিধ্বনি। পাউণ্ড ইমেজ বলতে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা অদ্যাবধিও বহুকথিত সেই সংজ্ঞা "Image, that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time···. It is the presentation of such "complex" instantaneously which gives that sense of sudden liberation ; that sense of freedom from time limits and space limits ; that sense of sudden growth, which we experience in the presence of the greatest work of art." এবং "It is better to present one Image in a life time than to produce voluminous works।" ইয়েটস্ অবশ্য এ ক্ষেত্রে বলবেন : "The only real Imagist was the Creator of the Garden of Eden."

ব্রিটেনে তখন নতুন কবিতা আন্দোলনের বেশ বোলবোলাও। ১৯০৯ সালে ফোর্ড ম্যাডক্স হুবার (এখন ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড) 'English Review' বের করলেন। তিনি পাউণ্ড, ফ্লিন্ট এবং লরেন্সের রচনা পত্রস্থ করেছিলেন। বছরখানেক পরে পত্রিকাটির হাত বদলের ফলে নতুন কবিতা-আন্দোলন বেশ আঘাত পেল। রক্ষণশীল পত্রিকাগুলির সঙ্গে লড়বার জন্য শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ সালে ছোট্ট একটি পত্রিকা ইমেজিস্টরা হাতে পেলেন। ইতিমধ্যে 'Poetry Review', এবং ঐ পত্রিকার উত্তরাধিকারী 'Poetry and Drama'—হ্যারল্ড

মনরোর পোএট্রি বুকশপের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্রিকায়—তাঁরা কিছুটা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

তারপর সেই মজার ঘটনাটি ঘটল। ১৯১৩ সালের জুন মাসে 'The New Free Woman: An Individualist Review' পাক্ষিকপত্রটি প্রকাশিত হল। শ্রীমতী হ্যারিয়েট উইভার এবং শ্রীমতী ডোরা মার্শডেন মহিলা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। এই দুজন বয়স্কা কুমারীর একজনের ছিল দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ অপর জনের বার্কলীয় মেটাফিজিক্সের দিকে প্রবণতা। শ্রীমতী উইভারের কিছু পয়সাকড়িও ছিল। ইমেজিস্টদের পত্রিকাটি চোখে পড়ল। পাউণ্ড ঐ দুজন দর্শনাবিষ্ট মহিলাকে বোঝালেন, বোধ হয় ভজালেন, যে একেবারে আধুনিক মন নিয়ে পত্রিকা বের করা উচিত। ফলে ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে গেল। রিচার্ড অ্যালডিঙটনের সহকারী সম্পাদনায় (শ্রীমতী মার্শডেন নামে সম্পাদিকা রইলেন, কৌতূহলী পাঠকেরা তাঁর লেখা সম্পাদকীয় বাদ দিয়েই পত্রিকাটি পড়তেন) 'Egoist' প্রকাশিত হল, অবশ্য 'An Individualist Review' নামটি যুক্ত থাকল।

প্রথম সংখ্যা 'Egoist' প্রকাশিত হল ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি। ১৯১৫ সালে তা মাসিক পত্রিকা হল, ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে পত্রিকাটি উঠে গেল। ইতিমধ্যে সহকারী সম্পাদনায় রিচার্ড অ্যালডিঙটনের সঙ্গে এইচ. ডি.-র নাম দেখা গেল, ১৯১৭ সালে তাঁদের দুজনের নামের বদলে সহকারী সম্পাদক হিসাবে দেখা গেল নতুন নাম—টি. এস. এলিঅট।

ইতিমধ্যে 'Egoist' প্রকাশের পর দামাল পাউণ্ড একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হলেন। অ্যালডিঙটনের দশটি কবিতা, এইচ. ডি.-র সাতটি কবিতা, নিজের ছটি কবিতা এবং আরও অন্যান্যদের কিছু 'ইমেজিস্ট' কবিতা নিয়ে প্রকাশ করলেন 'Des Imagists : An Anthology'. ব্রিটেনে বইটাকে সবাই প্রায় বাঁকা চোখে দেখলেন, শুধু 'Morning Post'-এ একটা ভালো সমালোচনা ছাপা হল। অপমানিত ক্রেতারা হ্যারল্ড মনরোর পোএট্রি বুকশপে বইগুলি ফেরত দিয়ে গেল।

যাই হোক, বইখানি প্রকাশের পর পাউণ্ডের ইমেজিসমের প্রতি ব্যগ্রতা কমে গেল। তিনি নতুন আন্দোলন Vorticism নিয়ে মেতে উঠলেন। তাঁর নতুন ইস্তাহার 'Blast'-এ লিখলেন ফোর্ড ম্যাডক্স হুফার, রেবেকা ওয়েস্ট, এজরা পাউণ্ড, জ্যাকব এপস্টাইন, যদিযে-ব্রেজকা এবং টি. এস.

এলিঅট। দল ভাঙাভাঙি সম্পূর্ণ হল। পাউণ্ডের এই আন্দোলনের প্রতি মোহ কাটলেও উপযুক্ত সময়ে ইমেজিস্ট আন্দোলনের রক্ষাকর্ত্রী হলেন শিক্ষিতা অভিজাত অ্যামি লাওয়েল, যিনি "Smoked cigars and worshiped Keats"। বার্কলী হোটেলের আকর্ষণ কেনসিঙটনের তরুণ কবিদের কাছে স্বর্গ বলে মনে হল। (এলাহি ভোজের বদলে যেন) অ্যামি লাওয়েলকে দলনেত্রী বলে মেনে নেওয়া হল। বছরে বছরে ইমেজিস্টদের সঙ্কলন বেরোবে বলে জানান দেওয়া হল। এবং ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭-তে সঙ্কলন প্রকাশিতও হল। পাউণ্ডকে নেওয়া হল না। পাউণ্ড ব্যঙ্গ করে এই আন্দোলনের নাম দিলেন অ্যামিইজম। অবশ্য পাউণ্ডের মতে "Imagism was a point on the curve of my development. Some people remained at that point. I moved on।" যে ছজনকে ইমেজিস্ট বলে ঢাক পেটানো হল, তাঁদের তিনজন ব্রিটিশ, (অ্যালডিঙটন, ফ্লিন্ট এবং লরেন্স) বাকি তিনজন মার্কিন (এইচ. ডি., ফ্লেচার এবং লাওয়েল)। নীতি বলে মানা হল :

১। চলতি কথা থেকে শব্দ চয়ন, অবশ্যম্ভাবী বা প্রায় অবশ্যম্ভাবী শব্দ ব্যবহার, অলঙ্কারময় শব্দ বর্জন।

২। কবিতা রচনায় ছন্দগত স্বাধীনতা প্রয়োজন। পুরাতন ছন্দ পুরাতন মেজাজেরই প্রতিধ্বনি করে। নতুন শব্দের ধ্বনির সীমানা নতুন চিন্তার বাহন। সেজন্যই *vers libre* ব্যবহার প্রয়োজন।

৩। কবির বিষয় নির্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। সেজন্য আধুনিক জীবনের এরোপ্লেন, মোটরগাড়ি নিয়ে বাজে কবিতা লেখার চেয়ে অতীতের বিষয়বস্তু নিয়ে ভালো কবিতা লেখা ঢের বেশী মূল্যবান।

৪। চিত্রকল্পের বিষয়ে একেবারে নিবিড় রূপদান প্রয়োজন। Cosmic ধোঁয়াটে কবি হওয়ার মানে কবিতার সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে ফানুস রচনা।

৫। কবিতা হবে দৃঢ় পীনদ্ধ, স্পষ্ট এবং অবধারিত।

৬। ঘনত্বই কবিতার নিশ্চিত সারাৎসার।

১৯১৭ সালে যদিও এই সিরিজের শেষ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১৯৩০ সালে পুনরায় নতুন একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হল। 'Imagist Anthology : 1930'-এ কবিতা লিখলেন এবার অ্যালডিঙটন, কোর্নোস, এইচ. ডি., ফ্লেচার,

ফ্লিন্ট, ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, জয়েস, লরেন্স এবং উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস। ভূমিকা লিখলেন ফোর্ড ম্যাডক্স এবং গ্লেন হিউগস।

১৯৩০ সালের 'Imagist Anthology'-তে অন্যতম ভূমিকা লেখক গ্লেন হিউগসের 'Imagism and the Imagist' সত্যই উপাদেয় গ্রন্থ। ১৯৬০ সালে দীর্ঘদিন পরে, বইটির পুনঃপ্রকাশ ঘটল। বৈঠকী ঢঙে লেখা হলেও আন্দোলনের ইতিহাস, সূত্রপাত, তার প্রতিক্রিয়া, গদ্যপদ্যের বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ইতিহাস সম্মত চমৎকার আলোচনা করেছেন। আজ ইমেজিস্ট আন্দোলনের অনেক নামই নানা কারণে নানা দিকে তর্কসাপেক্ষ। তবুও ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কয়েকজন কবির ভূমিকা তিনি অত্যন্ত সুপরিচিতভাবে চিত্রিত করেছেন। লরেন্স, পাউণ্ডের ব্যক্তিগত দিকগুলিও যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি প্রত্যেকের বিষয়ে বিচারও প্রায় বিতর্কহীন করে তুলতে চেয়েছেন, যেমন কাউকে বিদ্রোহী, কাউকে যথার্থ ইমেজিস্ট বলেছেন। লরেন্স, তাঁর মতে "The passionate Psychologist" এবং এজরা পাউণ্ড "Poet, Pedagogue" ও "Propagandist", অতঃপর etc. দিতে ভোলেন নি।

ইমেজিস্ট আন্দোলনের ভস্মাবশেষ নিয়ে টেমসের জল বহু বছর ধরে সমুদ্রে মিশেছে। তবু আধুনিক নতুন কবিতার প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে তাঁদের নেতৃত্ব, বহু ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যবস্থাপত্রের সতর্কবিচার অদ্যাবধিও নতুন কবিদের শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে আছে। ১৯৩১ সালের পর বইটির ১৯৬০ সালে নতুন সংস্করণ প্রকাশ আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। বহু বিতর্কসাপেক্ষ বিষয়ের ইতিহাস চোখের সম্মুখে রক্তমাংস পেয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। বইটির সুধীমহলে পরিচিতি, বিশেষভাবে তরুণ কবিদের নিকটে, প্রার্থনীয়।

এ যুগের কবিতা

কৃষ্ণ ধর

কার্ল মার্কস ইয়োরোপের প্রধান ভাষাগুলি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি প্রায়ই একটি কথা বলতেন—একটি বিদেশী ভাষা জীবন-যুদ্ধের একটি হাতিয়ার—বিদেশী ভাষার অনভিজ্ঞতা থেকে মনস্বী মার্কসের এই উক্তির যাথার্থ্য বেশি উপলব্ধি করছি। বিশেষতঃ কবিতার রসাস্বাদনে ভাষান্তরণ এক দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক। কবির অনুভূতি নিজস্ব ভাষাকে অবলম্বন করেই কাব্যের শরীরে রূপ নেয়। ভাষার নিজস্বতার যে চিত্রময়তা, তার দেশজ ঐতিহ্যে জড়িত বাক ও অর্থ, অনুবাদে কখনই যথার্থভাবে সংক্রামিত হয় না।

এ যুগের কাব্য আন্দোলনে দেশ ও কালের সীমাবদ্ধতা ক্রমশ ঘুচে যাচ্ছে। ইয়োরোপের প্রধান ভাষাগুলিতে, ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন, স্পেনিশ, রুশ ও ইতালীয়, গত এক শতাব্দী ধরে কবিতার যে ব্যাপ্তি, নানাবিধ দুরূহ পরীক্ষার কাঁটাতারের বেষ্টনী অতিক্রম করে অপেক্ষমান জনসাধারণের কাছে এসে পৌঁছেচে, আমরা বাংলাদেশে, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারে লালিত হয়েও, সেই বৃহৎ ব্যাপ্তির দিগন্ত থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। আলোচ্য গ্রন্থটিতে* ইয়োরোপের ও আমেরিকার প্রধান ছয়টি ভাষার উল্লেখযোগ্য কবিতা আন্দোলনের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কালের সীমা বিগত অর্ধ শতাব্দী। বাংলাদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রেও বিগত পঞ্চাশ বছর নানাদিক দিয়ে অতীব উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার পরিপূর্তি এবং নব্য কাব্য আন্দোলনের সময় সীমাকেও এই অর্ধ শতাব্দীর গণ্ডিতে চিহ্নিত করলে ক্ষতি নেই। ইয়োরোপীয় কবিকুলের দুঃসহ বিষাদ, যন্ত্রণা ও গভীর অর্থে আনন্দের ক্ষীণ অংশভাগী হয়তো আমরাও হয়েছি। তবে আমাদের কাব্যের উৎস প্রতীচ্যভূমি ততটা নয়, যতটা রবীন্দ্রনাথের চিত্তভূমি। আধুনিক কালের

---

*J. M. Cohen: Poetry of This Age (1908-1958). Arrow Books Ltd., London. 5 sh.

একগলা কলরবের গভীরে বসবাস করেও একথা বলতে লজ্জা নেই, বাংলা কবিতা এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে যথার্থরূপে অতিক্রম করতে পারেনি। আমরা যখন রবিপ্রদক্ষিণে অনুভূতির পরিমাপে ব্যস্ত, ইয়োরোপ খণ্ডে সে সময়ে কাব্যের চিরন্তন দুর্গে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করছেন নতুন স্বপ্নাবিষ্ট কবিকুল। এক অন্ধ নিয়তির আহ্বানে আজ থেকে এক শতাব্দী আগে শার্ল বোদলেয়র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফরাসী কবিতায় তিনি আনলেন এক নতুন শিহরণ, যা ভূতের গল্প আর সাহিত্যিক কচকচানিতে অভ্যস্ত প্যারিসে এনে দিল অনাস্বাদিত চমক। এই প্রতীকী কাব্য আধুনিক কবিতা আন্দোলনের একটি প্রধান ও জরুরী উপকরণ। বোদলেয়রের কবিতায় আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতায় এই নতুন, তির্যক বক্তব্যের সবল আত্মপ্রকাশ। কিন্তু লক্ষ্যে তিনি পৌঁছুতে পারেননি। পৌঁছুবার তাগিদও ছিল না তাঁর। কারণ তিনি জানতেন, "প্রকৃত যাত্রী তারাই, যারা শুধু চলবার জন্যই শুরু করে যাত্রা ; হাল্কা বেলুনের মতো তাদের হৃদয়, নিয়তি থেকে সরে আসে না তারা। কিন্তু সব সময়েই তারা বলে, চল বেরিয়ে পড়ি, কোথায় যাব তা জানিনে, জানবার দরকার নেই।" (লে ভয়েজ)

আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিরা কিন্তু বোদলেয়রের মতো এতটা বেপরোয়া নিরুদ্দেশযাত্রী নন। ইয়েটস এবং রিলকে উভয়েই অন্ততঃ জানতেন, খণ্ডিত হলেও, সত্যকে তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। রিলকের কবিতায় এই মহৎ আবিষ্কারের প্রক্রিয়া কাব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়েই যেন স্বতঃউৎসারিত। ইয়েটস্‌ও শেষ পর্যন্ত অস্পষ্টতা থেকে বেরিয়ে এসে এই সত্য জেনেছিলেন যে জড় জগতের অন্তহীন অগ্রগমন সময়ের অনুসঙ্গী হলেও তার পশ্চাতে রয়েছে এক অগ্নিশিখা যার উত্তাপে ছাই হয়ে যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। এলিয়ট কিন্তু অন্য সুরে কথা বললেন। বোদলেয়রের মতোই তাঁর অন্বিষ্ট কিছুই নেই, যাত্রা করাটাই সবচেয়ে জরুরী। 'ফোর কোয়ার্টেট'-এ তিনি মোহমুক্ত হয়েই বলেছেন ; "তোমরা যারা স্টেশন থেকে যাত্রা করলে আর যারা টার্মিনাসে পৌঁছুলে তারা এক লোক নও।"

কবিতার স্বপ্নজগতে বিচরণশীল এই কবিদের বিষণ্ণ প্রতীতি, হতাশা এবং সকরুণ অসহায়তার ফলে ইয়োরোপের মনে এসেছিল এক চরম নৈরাশ্য। অথচ কবিদের কাছেই অনেক অনুচ্চারিত, অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরের আকাঙ্ক্ষায় বারংবার জনসাধারণের উপস্থিতি। দুর্ভাগ্যের বিষয় শার্ল বোদলেয়র কিংবা

স্তেফান মালার্মে সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। ইয়েটস্, রিলকে এবং তাঁর জর্মন সহযোগী স্টেফান জর্জ অনেক সময় সেই প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করে সাফল্যের আলোকে কবিতাকে উজ্জ্বল করেছিলেন।

গ্যটের পর স্টেফান জর্জই (১৮৬৮-১৯৩৩) জর্মনদের মধ্যে সবচেয়ে 'ইয়োরোপীয়' কবি। জর্জ আদর্শবাদী। কবি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। নবজীবনের প্রবক্তা হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনি সগৌরবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে উঠল কয়েকটি শরতের গীতিগুচ্ছ, ভার্লেনের প্রভাব যাতে সহজদৃষ্ট।

রাইনার মারিয়া রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬) জাতিতে জর্মন হলেও ফরাসী প্রতীকী কবিদের দ্বারাই প্রভাবিত। গ্যটে ও হোল্ডারলিনের ছায়া মাঝে মাঝে রিলকের কবিতায় পড়েছে। কিন্তু তাঁর মৌল প্রেরণা ফরাসীদেশের শক্তিমান প্রতীকী কবিকুল। জর্মন ভাষার পুরুষালী দার্ঢ্যে তিনি ফরাসী নমনীয়তা আনবার সার্থক চেষ্টা করেছেন। মিস্টিক আমেজ তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় লক্ষণীয়। কিন্তু রাশিয়ার বিশাল গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করবার পর রিলকের কবিতার গুণগত পরিবর্তন আসে অস্বাভাবিক প্রত্যয়ে। মৃত্যুর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ রিলকের কবিতায় ছড়িয়ে থাকলেও জীবনের অনিবার্য অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর কাম্য। ঈশ্বরের কাছে রিলকের এই প্রত্যক্ষ প্রশ্ন অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত হয়েছে : "তুমি কী করবে, ঈশ্বর, যদি আমার মৃত্যু হয়। আমি তোমার পানপাত্র (যদি আমি ভেঙে যাই), আমিই তোমার পানীয় (যদি আমি নষ্ট হয়ে যাই ?) আমিই তোমার আভরণ, তোমার পণ্য, আমাকে হারালে, তোমার উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ।" স্টেফান জর্জ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে অবশেষে কলাকৈবল্যের কারুকার্যের অন্তরালে নিয়েছিলেন আশ্রয়। রিলকে জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন সৃষ্টির প্রক্রিয়ারূপে। কবি হিসেবে তাঁর সমস্যা ছিল অন্তরজগৎ ও বাইরের জগতের ঐক্য সাধন, নতুনতর প্রতীকের সাহায্যে এই সত্যকে দৃপ্তবাক্যে প্রকাশ করা। জর্মন কাব্যের ঐতিহ্যে রিলকের পরিশ্রমী প্রচেষ্টার তুলনা বিরল। ভাষা ব্যবহারে তাঁর কুশলতা পরবর্তী জর্মন কবিদের কাছে এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। ফরাসী দেশে যেমন ছিলেন লাফর্গ। অবশ্য লাফর্গের কাছেও রিলকের ঋণ কম নয়।

তরুণ বয়সে ভালেরি (১৮৭৫-১৯৪৫) পাঠ নিয়েছিলেন মালার্মের কাছে। তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছে মালার্মের প্রভাব তাই সহজেই আবিষ্কৃত। কিন্তু

গভীরতর প্রয়াসে তিনি পরে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করেন। মালার্মের রোমান্টিক আশ্রয়ী কবিতার ঐতিহ্য থেকে মুক্ত হয়ে ভালেরি ধ্রুপদী ঐতিহ্যে তীব্র, তীক্ষ্ণ ছন্দে ও ভাষায় লিখলেন কবিতা। ভালেরি অনেক বেশি চিত্ররূপময়। বিমূর্ত শব্দসৃষ্টিতেও তিনি সমান কুশলী। ভালেরির জীবনের অম্বিষ্ট কাব্য সৃষ্টি। তাঁর নার্সিসাস শান্ত গোধূলির আলোতে দীঘির কালো জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ। কিন্তু তার মন ব্যথিত হয়ে ওঠে যখন সে জানে এই জলে আরও মানুষ তাদের মুখের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করেছে। ভালেরি জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন ; তার সূক্ষ্মতম সঙ্গীতের সুর আহরণ করেছিলেন সুরহীন অন্য মানুষের শ্রবণকে তৃপ্ত করার জন্য। জর্জ, রিলকে ও ভালেরি—এই ত্রয়ীর প্রচেষ্টয়ে ইয়োরোপে প্রতীকী কাব্য আন্দোলনের পুনর্জন্ম ; ফরাসী কাব্যের আঙিনা পেরিয়ে এই কাব্যধারা ইয়োরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। তন্মধ্যে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবেন রাইনার মারিয়া রিলকে।

এই শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ দিকে ইয়োরোপে কাব্য আন্দোলনে নতুন পরীক্ষার অনুগামীরা প্রকাশ করলেন 'ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো' (১৯০৯)। কাব্যে শব্দখেয়ালীই এঁদের লক্ষ্য। উচ্ছৃঙ্খল, অভাবিত ও অশ্লিষ্ট শব্দ প্রয়োগে কাব্যকে পুরাতনের শৃংখল বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্যই এঁদের উচ্চকিত প্রয়াস অপ্রত্যাশিত সমর্থন পেল ফরাসী কবি আপোল্যনেয়রের। আপোল্যনেয়র প্রতীকীদের প্রভাব খর্ব করবার জন্য ফিউচারিস্টদের এই দুর্বার আন্দোলনে সহযোগিতা করলেন। শব্দের স্বাধীনতাই ছিল এই আন্দোলনকারী কবিদের মুখ্য ঘোষণা। এই আন্দোলনের অনুগামী ইতালীয় কবি গিয়েসপে উনগারেত্তি (জঃ ১৮৮৮) এ যুগের কবিতা আন্দোলনে স্মরণীয় পুরুষ। শব্দ ব্যবহারের পরিমিতি, অযৌক্তিক শব্দ বর্জন এই নতুন কবিগোষ্ঠির কাব্যে এক শুদ্ধতা এনেছিল। উনগারেত্তির কবিতায় এই পরিমিতি অসাধারণ সাফল্যে দীপ্ত। মুসোলিনীর দাপটে তিনি স্বেচ্ছায় স্বদেশ থেকে নির্বাসন নিয়ে ব্রেজিলে চলে যান। ১৯৪২ সালে আবার ফিরে আসেন স্বদেশে। ফ্যাসিস্তদের সর্বনাশা নীতিতে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি ও মানব সভ্যতার সমূহ ধ্বংসের চিত্র ভবিষ্যৎ বক্তার মতো তিনি তুলে ধরেন তাঁর কবিতায়।

রাশিয়ায় ফিউচারিস্ট আন্দোলনের ইস্তাহার ঘোষিত হয় ১৯১২ সালে। তার উদ্ধত নামকরণ : 'গণ রুচির গালে একটি চাপড়'। তাঁরা সদম্ভে

ঘোষণা করলেন : "আধুনিকতার নৌকো থেকে ঠেলে ফেলে দাও পুশকিন, দস্তয়ভস্কি আর তলস্তয়কে..."। রুশ ফিউচারিস্টদের প্রধান প্রবক্তা ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি (১৮৯৪-১৯৩০) হলেন বিপ্লবের প্রধান কবি। বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে নবজীবনের দৃপ্ত অভিযান মায়াকভস্কির কবিতায় লাল ফৌজের দুঃসাহসিক অগ্রযাত্রার মতোই দুর্বার স্রোতে ধাবমান। মায়াকভস্কির কবিতার সঙ্গে বাংলাদেশের পাঠকদের পরিচয় নিবিড়। মায়াকভস্কির কণ্ঠে বিপ্লবীর স্পর্ধা গগনস্পর্শী। শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারেও তিনি নতুন রুশ কবিতার স্বীকৃত পথিকৃৎ। কবিতায়, যদি শব্দটি সুপ্রযুক্ত হয়, 'ভায়োলেন্স' মায়াকভস্কির চেয়ে সার্থক আন্তরিকতায় অন্য কোনো কবি এই শতাব্দীতে প্রয়োগ করতে পারেন নি। অথচ জীবনের সূক্ষ্মতম অনুভূতিও মায়াকভস্কির কবিতায় হীরকের দীপ্তি নিয়ে বারবার প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

বরিস পাস্তেরনাক (১৮৯০-১৯৬০) স্নায়ুযুদ্ধের দৌলতে বিশ্ব পরিচিত। পাস্তেরনাক সমকালীন কোনো কাব্য আন্দোলনের সহযাত্রী ছিলেন না। তবে কবিতার ভাষা পুনর্গঠনের জন্য ফিউচারিস্টদের দাবির প্রতি ছিল তাঁর নীরব সমর্থন। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে পাস্তেরনাকের পরিশ্রমী প্রয়াস অনেক সময় পুরো কবিতাটিকেই চিত্রকল্পে উন্নীত করেছে। পাস্তেরনাক মূলতঃ প্রকৃতির কবি। চিত্রকরের মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সুরকারের মতো ঐক্যসাধনের দক্ষতায় তিনি এক একটি কবিতাকে নিটোল সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। গভীর দার্শনিকতায়, জীবনের প্রতি বিশ্বাসে তিনি অবিচল। প্রকৃতির অদৃশ্য শব্দ, অন্তঃপুরচারী চিন্তা এবং অলক্ষ্য বিকাশের গোপনচারী ধারাকে তিনি মানব মনের বিবর্তনের সঙ্গে অনেক সময় আশ্চর্য আন্তরিকতায় গ্রথিত করেছেন। এলিয়টের মতো তিনি অনির্দেশ্যবাদী নন। 'মাই সিস্টার লাইফ' কবিতায় তিনি রাত্রির ট্রেনে দূরযাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে পথচলার আনন্দই, লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেয়ে বেশী। কিন্তু যে মন নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন, ঠিক সেই মন নিয়েই পৌঁছুতে চান গন্তব্যস্থলে। ডাঃ ঝিভাগোর কবিতা-গুচ্ছে পাস্তেরনাক স্তিমিত অথচ স্থিতধী; জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি আরও প্রগাঢ়।

স্পেনে ত্রিশের দশকের শ্রেষ্ঠ কবি ফ্রেডেরিগো গ্রাৎসিয়া লোরকা (১৮৯৯-১৯৩৬) এবং রাফায়েল আলবের্তি (জঃ ১৯০৯)। ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোর দস্যু-

বাহিনীর হাতে গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকেই লোরকা নিহত হন। মৃত্যুর এই বিয়োগান্ত মর্মবেদনায় লোরকা ইয়োরোপে ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধের প্রতীকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। লোরকা আন্দালুসিয়ার লৌকিক আদিম আবেগ কাব্যে রূপায়িত করেছেন। তদোপরি লোরকা ছিলেন সুদক্ষ নাট্যকার। অগ্রজ কবি হুয়ান র‍্যামন হিমেনেথের অনুগামী রূপেই লোরকা স্পেনের কাব্য আন্দোলনে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর কবিতার ব্যাপক এবং প্রচণ্ড চিত্রকল্প রচনার শক্তি হিমেনেথের (১৮৮১-১৯৫৮) শান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতাকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর লৌকিক জীবনের উত্তাপকে স্পর্শ করেছে। স্পেনীশ লোকজীবনের সার্থক রূপকার গ্রাৎসিয়া লোরকা। ১৯৩১ সনে স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর লোরকা সরকার কর্তৃক নাট্যপ্রযোজক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে-সময়েই তিনি গ্রামাঞ্চলে অভিনয়োপযোগী বিখ্যাত নাটকগুলি রচনা করেন। লোরকার নাটক, তাঁর কবিতার মতোই একটি জাতির সার্বিক প্রতিরূপ। লোরকা এবং আলবের্তি উভয়েই স্পেনের জাগ্রত গণ-আত্মার প্রতিভূ। ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটরদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইয়োরোপে যে প্রতিরোধের কাব্যআন্দোলন গণতন্ত্রকামী মানুষের মনে ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই দুই কবি, নিশ্চিতরূপে, তার পুরোগামী ভেরীবাদক।

এই প্রতিরোধের কাব্য ফ্রান্সে নতুনতর শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করল পল এলুয়ারের (১৮৯৫-১৯৫২) কবিতায়। কমিউনিজমের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্বতন সুরিয়্যলিস্ট কবি পল এলুয়ার নাৎসী কবলিত প্যারিসের প্রতিরোধ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন তাঁর আশ্চর্য কবিতার চিত্রকল্পে, আবেদনে এবং সুগভীর ব্যঞ্জনায়। ১৯৪৩ সালের অন্ধকার দিনগুলিতে এলুয়ার স্বপ্ন দেখছেন নতুন উষার :

"ভাইগণ, এই সকালটা তোমাদের, পৃথিবীর সমতলে এই সকালটাই তোমাদের শেষ সকাল, এখানে তোমরা শয্যা পেতেছ : ভাইগণ, এই দুঃখের সাগরের ওপারে এই সকালটা আমাদের।"

ক্রুশবিদ্ধ ইয়োরোপের মানবাত্মার জয়গান মুখরিত হয়েছে এলুয়ারের কবিতায়। প্রতিরোধের অপূর্ব শক্তিশালী কবিতাতেও এলুয়ারের চিত্রকল্প আশ্চর্য প্রাণবন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কবিতাগুলিতে এলুয়ার অত্যন্ত সার্থকতায় ব্যক্তিগত চিত্রকল্পের সঙ্গে জনবোধ্য চিত্রকল্পের আশ্চর্য

সংযুক্তি ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এলুয়ারই শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ কবির সম্মান পাবার যোগ্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এলুয়ারেরই সহযাত্রী লুই আরাগঁর কবিতা সশ্রদ্ধায় স্মর্তব্য। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁর নামোল্লেখ করেন নি।

ইতালীর আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি সালভাতোর কোসিমোদো (জঃ ১৯০১) এলুয়ারের মতোই প্রতিরোধের কবিতায় ফাসিস্ত মুসোলিনীর আমলে জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। প্রতীকে ও চিত্রকল্পে এলুয়ারের মতোই কোসিমোদো আধুনিক। অথচ চিরকালের আবেদনে তাঁর কবিতা উজ্জ্বল। যুদ্ধের সময়ে রচিত একটি কবিতায় তিনি বলছেন :

> "হে সন্তানগণ, ভুলে যাও, মৃত্তিকা থেকে রক্তাক্ত মেঘ উঠছে আকাশে, ভুলে যাও তোমাদের পিতাদের : ভস্মস্তূপের আড়ালে ডুবে গেছে তাদের সমাধি।"

কোসিমোদো জীবনের প্রতিশ্রুতির কবি। নিরলংকার তাঁর ভাষা। তিনি যুদ্ধের বীভৎসার মধ্যেও স্বপ্ন দেখেছেন নির্ভয় এক পৃথিবীর।

লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি পাবলো নেরুদা (জঃ ১৯০৪) ইয়োরোপীয় ট্রাডিসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নেরুদার রাজনৈতিক সচেতনতা, স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং শোষিত জনগণের স্বপক্ষে তাঁর সংশয়হীন বক্তব্য স্বভাবতই গ্রন্থকারের পছন্দ হয়নি। তথাপি তিনি এই শক্তিমান কবিকে উপেক্ষার শীতলতায় বর্জন করতেও পারেন নি। নেরুদার রাজনৈতিক কবিতাতেও মানব ইতিহাসের ব্যাপক পরিধি কাব্যকলায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের উপকরণে প্রসারিত। স্পেনের গৃহযুদ্ধে লোরকার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময়ে তিনি মাদ্রিদে ছিলেন। লোরকার মৃত্যু নেরুদার মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি সে সময় থেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কবিতে পরিণত হন এবং মার্কস্‌বাদে অবিচল বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। নেরুদার কাব্যে লাতিন আমেরিকার সভ্যতা এবং লোকায়ত সংস্কৃতি বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত।

মায়াকভস্কির মতোই তিনি মানবতাবাদী, উচ্চকণ্ঠ এবং ভাষা ব্যবহারে অপূর্ব শক্তিমত্তার অধিকারী।

বর্তমান গ্রন্থে ব্রিটিশ কবিদের সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা রয়েছে। টি. এস. এলিয়ট, সিটওয়েল রবার্ট গ্রেভস, ডিলান টমাস, অডেন, ম্যাকনিস ও ডে, লুইস, আলোচ্যদের অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন কবিদের মধ্যে এজরা পাউণ্ড ও রবার্ট ফ্রস্ট

এ যুগের কবিতা আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এঁদের কাব্যকলা, জীবনদর্শন এবং রচনা সৌকর্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলার উৎসাহী পাঠকদের পরিচয় রয়েছে। বিশেষ করে এলিয়টের প্রভাব আধুনিক বাংলা কাব্যে অগ্রজদের মধ্যে প্রায়শই অনুভূত।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে: 'আমরা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?' আমার মনে হয় এ প্রশ্নের ইঙ্গিত শুধুমাত্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার কবিতা পাঠকদের কাছেই নয়, সকল দেশের উৎসাহী ও অনুরাগী পাঠকদেরই একটি বড় জিজ্ঞাসা। এযুগের কবিতার অন্বিষ্ট কী? হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতোই আমাদের এই জিজ্ঞাসা বারবার সমুদ্রতটে উচ্চারিত হবে: "বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?"

ব্রিটেনে যুদ্ধের সময়ে নব্য-রোমান্টিক আন্দোলন আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভের্নন ওয়াটকিনস্, জর্জ বার্কার ও ডব্লু. এস. গ্রাহাম প্রমুখ তরুণ কবিরা এই নতুন পরীক্ষার পুরোগামী।

ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও কবিতার রূপ ও রীতির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। ফরাসী কবিতায় আবার ফিরে এসেছে স্যুরিয়ালিজমের প্রভাব। নাৎসী যুগের অন্ধকার উত্তরণ করে জর্মন কবিতায় শোনা যাচ্ছে এলিয়ট, এলুয়ার, মায়াকভস্কি ও নেরুদার কবিতার প্রতিধ্বনি। রিলকে ও ট্রাক্লের কবিতার প্রতি এযুগের জর্মনরা নতুন করে মনোনিবেশ করেছেন।

একমাত্র স্পেনে, ফ্রাঙ্কোর ডিক্টেটরি শাসন, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ এবং নিপীড়নের ফলে, প্রতিরোধের কবিতার সুর এখনও প্রতিধ্বনিত। কিন্তু নেরুদা কিংবা মায়াকভস্কির মতো প্রত্যক্ষ বিপ্লবের আহ্বান সে-কবিতায় নেই। মানবমর্যাদার সপক্ষে এ যুগের স্পেনের তরুণ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোসে হিয়েরো (জঃ ১৯২২)।

যুদ্ধোত্তর যুগে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়কদের মানবতাবিরোধী মারণাস্ত্র অভিযান, স্নায়ুযুদ্ধ এবং সর্বনাশা ধ্বংসের অশুভ পদধ্বনিতে স্বভাবতই ইয়োরোপ ও আমেরিকার কবিদের মন আচ্ছন্ন। এই সংকটের যুগে বাস করে কবিদের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা জাগলেও, তার কাব্যগত রূপ নেবে মানবিক প্রেম, অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যের নিরাভরণ প্রকাশে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সংকটের ছায়া দূর হতে না হতেই নতুনতর সংকট পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছে।

সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্ময়কর অগ্রগতি, শক্তিবৃদ্ধি এবং মানবিক

মূল্যবোধের অভ্রান্ত স্বীকৃতিই এই হতাশাম্লান যুগে কবি ও সাহিত্যিকদের একমাত্র আশার আলোক। বর্তমান গ্রন্থকার সেদিকে কোনো ইঙ্গিত দেন নি। তবে তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যায় যে বর্তমান সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আধুনিক কবিদের কমিউনিকেশনের ভাষাকে করতে হবে সরল ও সহজবোধ্য। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সহস্র হৃদয়ের সংবাদী করে তোলাই আজকের যুগের কবিতার লক্ষ্য। কবিকে আজ আর ভবিষ্যদ্বক্তার ভূমিকা গ্রহণের দাবি না করে বৃহৎ জনসমষ্টির হৃদয়ের কথা, প্রেম, জীবন ও মহত্তর অনুভূতির কথাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কাব্যের প্রকরণে সহজ, সরল, নিরলংকার ভাষায় বলতে হবে। সেখানেই কবিতার মুক্তি এবং কাব্যের ভবিষ্যৎ।

মধুসূদনের কবিতা

দেবদত্ত নিয়োগী

মধুসূদনের কাব্যে গীতিপ্রবণতা আছে, এ কথা নতুন কিছু নয়। বালক রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা থেকে আজ পর্যন্ত রসিকরা এ বিষয়ে একমত। কিন্তু মধুসূদনের গীতিধর্মকেই মুখ্য আলোচ্য করে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এই প্রথম রচিত হল। আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ লিরিক—এমন কবিতা মধুসূদনের আছে। কিন্তু তার উপর নির্ভর করেই সমালোচকরা মধুসূদনকে গীতিধর্মী বলেন নি, অন্যান্য রচনার মধ্যে এই লক্ষণ যথেষ্ট আছে বলেই তাঁরা এই অভিমত পোষণ করে এসেছেন। সেই দিকটাই আলোচনা করেছেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। বইটিতে* চারটি ভাগ আছে। প্রথমভাগে গীতিকবিতা এবং মধুসূদনের সঙ্গে সমসাময়িক সাহিত্যধর্মের যোগ আলোচিত হয়েছে। 'তিলোত্তমা সম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর গীতিধর্মও লেখক দেখিয়েছেন। পরের ভাগগুলিতে যথাক্রমে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র আলোচনা। সুতরাং এই বইতে মধুসূদনের প্রতিভার এই দিকটার যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

মধুসূদনের জীবনীর পাঠকরা জানেন, দোষই বলি আর গুণই বলি, অসংযম তাঁর স্বভাবের একটা লক্ষণ। এমন আত্মহারা কবি আমাদের দেশে কমই জন্মেছেন। তাঁর রচনার মধ্যেও এই অসংযমের সাক্ষাৎ যথেষ্ট পাওয়া যায়। অসংযমের জন্যই মেঘনাদবধের মূল কাহিনীতে ভারসাম্য বিচলিত এবং এরই জন্য বীরাঙ্গনার একাধিক চরিত্র প্রতিষ্ঠিত আদর্শ থেকে স্খলিত। অসংযম শিল্পকলার দিক থেকে দোষের হতে পারে কিন্তু কাব্যে ভাবের দিক থেকে সব সময় দোষের বলে গণ্য করা যায় না। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল ভাববস্তুর মধ্যে আবেগের বন্যা আছে কিন্তু সেই আবেগই সৃষ্টি করেছে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যকে। আধুনিকতম কালের বুদ্ধিবাদী কবিদের বাদ দিলে

---

* **গীতিকবি শ্রীমধুসূদন।** ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। সৃষ্টি প্রকাশনী। পাঁচ টাকা।

এতকাল অনুভূতিবাদী কবিদের কাব্যে আবেগ সার্থক গীতিকাব্যকে সম্ভব করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে রেনাশাঁস-পরবর্তী সাহিত্যে অসংযমকে প্রধান লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আজ আর কেউ সন্দেহ করে না। এ কথাও সত্য যে কবিচিত্তের এই অসংযত আবেগ নাটক মহাকাব্য এমনকি উপন্যাস প্রভৃতি কাহিনীমূলক রূপ-রীতির বাইরে বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ লিরিক কবিতায় পরিণত হয়েছে। আগে কাহিনীমূলক সাহিত্যের মধ্যে স্থানে স্থানে এই আবেগ আত্মপ্রকাশ করেছে, পরে কাহিনীকে একেবারে বাদ দিয়ে নিছক আত্মভাবকে নিয়ে কাব্য রচনা হয়েছে। এইজন্য সাহিত্যতত্ত্বে একটি বহুপ্রচলিত মত, ক্লাসিকের মধ্যে রোম্যান্টিক চেতনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ দুটি বিরোধী নয়।

কিন্তু বিচার্য এই যে গীতিধর্ম ও গীতিকবিতা কি এক বস্তু? মহাকাব্য প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ কাহিনীর মধ্যে আমরা যা পাই, তাকে কি গীতিধর্ম বলব, না গীতিকবিতা বলব? অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বিস্তৃত বিশ্লেষণের পর যখন বলেন "মধুসূদনের প্রতিভা খণ্ড গীতিকবিতা রচনারই প্রতিভা, মহাকাব্যের সুদীর্ঘ কাহিনী রচনার প্রতিভা নহে"—তখনও সংশয় দূর হয় না। চতুর্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের শেষ ফসল সত্য, কিন্তু ধারাবাহিক ক্রমে শেষ বলেই কি প্রমাণিত হয় যে এখানেই কবির প্রতিভা স্বাভাবিক স্ফূর্তি পেয়েছে? কবিতা হিসাবে যে এই সনেটগুলি উৎকৃষ্ট নয়, একথা শুধু মোহিতলালই বলেন নি, অধ্যাপক ভট্টাচার্যও তা স্বীকার করতে বাকি রাখেন নি। এই কবিতাগুলিতে ব্যক্তি-মধুসূদনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়—এই পর্যন্ত বলা যায়।

এমন একদিন ছিল যখন সাহিত্যের বহিরঙ্গ আকৃতিটাই সমালোচনাতে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হত। মানববুদ্ধি ও মানব অভিজ্ঞতার বহুধা বিস্তারে আজ সাহিত্যের শ্রেণীলক্ষণকে মুখ্য চিন্তনীয় করে রাখা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার মধ্যে এবং অনুভূতির জগতে যে জটিলতা ও মিশ্রণ চলেছে, প্রকাশের রীতিতে তা দেখা দেয়ই। উপন্যাসের মধ্যে কাব্য, নাটকের মধ্যে গীতিধর্ম, প্রবন্ধের মধ্যে গল্প, গল্পের মধ্যে প্রবন্ধ—এ সব লক্ষণ এখন আর দুর্লভ নয়। কোনো রচনা কোনো বিশেষ শ্রেণীর মানদণ্ডে সার্থক কিনা, এ প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাড়া আর বিশেষ ওঠে না।

অনুভূতির এই মিশ্রণ ঘটতে আরম্ভ করেছে রেনাশাঁসের পর থেকেই বিশেষ করে। ব্যক্তিত্বের বন্ধন মোচনের ফলে মনের ভাগাভাগি ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে ; লেখকের ব্যক্তিভাবটাই প্রাধান্য পেতে থাকে। এই ভাবেই সৃষ্টি হল রোম্যান্টিক সাহিত্যের।

এই জন্যেই মধুসূদন ক্লাসিক্যাল মহাকাব্যকে সামনে রাখলেও শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য লিখতে পারলেন না। শাস্ত্রের সূত্রকে বারবার লঙ্ঘন করে গেল আত্মপ্রক্ষেপণের অবচেতন বাসনা। মধুসূদনকে তাঁর যুগ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এর ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত হয়। বলা প্রয়োজন, এ কথাটা সাহিত্য সূত্রের নির্বিচার অনুসরণে বলছি না। মধুসূদনের জীবনই আমাদের এদিকে সবলে আকৃষ্ট করে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মধুসূদনকে যুগ প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত করে সেভাবে আলোচনা করেন নি। তাতে দুটি প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। প্রথমত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধিকার ও ভাববস্তুর পূর্ব সূত্র তিনি পেয়েছেন ভারতচন্দ্রের কাব্যে। দ্বিতীয়ত বীরাঙ্গনা কাব্যের একাধিক নায়িকাকে প্রাচীন কাহিনীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে দেখে তিনি পীড়িত বোধ করেছেন। মধুসূদন ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে নায়িকার আদর্শ পেয়েছেন কথাটা নতুন শোনালেও সম্পূর্ণ সম্ভব। এ দিক দিয়ে অনুসন্ধান আমাদের বাকি ছিল। ভারতচন্দ্রের ভাষার উপকরণ দিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন, এ কথাটিও সম্পূর্ণ সত্য না হলেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। মধুসূদনের কাল পর্যন্ত ভারতচন্দ্র ছিলেন অনুকরণযোগ্য শ্রেষ্ঠ কবি। সেই হিসাবে ভারতচন্দ্রের প্রভাব স্বাভাবিক ও সঙ্গত। লেখক যে মিল দেখিয়েছেন তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু এটাও ঠিক যে মাঝখানে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ আমাদের মনের জগতে আদর্শের পরিবর্তন না ঘটালে ভারতচন্দ্রের পরেই ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনার সৃষ্টি হত না। ব্রজাঙ্গনার বিরহকে লেখক বিরহ বলে স্বীকার করতে চান নি। তাঁর মতে বৈষ্ণব পদাবলীতেই আছে সত্যকার বিরহ। আমাদের মনে হয় ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে পদাবলীর বিরহ মিলনেরই নামান্তর।

ব্রজাঙ্গনার বিরহই বরং বেশি বাস্তব, বেশি দুঃখকর, না পাওয়ার বেদনা এখানেই তীব্র। কারণ এখানে কোনো আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা নেই। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের আধুনিকতা এখানেই। ব্রজাঙ্গনার রাধা পদাবলীর শ্রীরাধা নন।

এই পার্থক্যের ইঙ্গিত অধ্যাপক ভট্টাচার্য দিয়েছেন তবে কারণ নির্দেশ করেছেন ভারতচন্দ্রের প্রভাবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিবেচ্য, ভারতচন্দ্রের কাব্যে মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটছিল বলে অনেকেই মনে করেছেন। তাঁর কাব্যেই মানুষকে দেবতার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেতে দেখা গেল। এই মানবধর্ম বা হিউম্যানিজম্ কি আধুনিক সংস্কৃতির মানবধর্মের অনুরূপ? ভারতচন্দ্রের নায়িকার প্রভাব যদি ব্রজাঙ্গনায় পড়েও থাকে তবু এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনীয় থেকে যায়।

বীরাঙ্গনা কাব্যকে গীতিকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওভিডের জীবনকথার বিস্তৃত অবতারণা করে লেখক দেখিয়েছেন মধুসূদন কতখানি তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। এই আলোচনা অভিনব এবং চিন্তার উজ্জীবক। ওভিডের পত্রে মানব হৃদয়ের কতকগুলি শাশ্বত বৃত্তিকে উপজীব্য করা হলেও কবি তাঁর সমকালীন সামাজিক পরিবেশ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েই কাব্য লিখেছিলেন। বীরাঙ্গনা রচিত হয়েছিল ওভিডের অনুকরণে তাই এতে ভারতীয় সংস্কারের যথেষ্ট অভাব আছে। রুক্মিনী পত্রটি ছাড়া বীরাঙ্গনার অন্য পত্রগুলি অভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত। অধ্যাপক ভট্টাচার্য এই কথাগুলি মনে রেখে বীরাঙ্গনার চরিত্র আলোচনা করেছেন। আমাদের মনে হয় এই জন্য তাঁর বিচার কিছু বাধাগ্রস্তও হয়েছে।

ওভিডের অন্ধ অনুসরণটাই কি বড় কথা? ভারতীয় নীতিবোধকে মধুসূদন সম্মান করেন নি। কিন্তু তা ছাড়াও জীবনের ধর্মে আরও কিছু বাকি থাকে এবং সেটাকে স্থূল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কারণ সেটা জীবনের সত্য। পুত্রশোকাতুরা জননী জনা যে "উচ্চ ক্ষাত্রনীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াও মহাভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নারীচরিত্রগুলিকে নিতান্ত হীন ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন" এতে এবং তাহার "লালসাময়তা"য় সমালোচক ওভিডের প্রবল প্রভাব অনুমান করেছেন। নারীহৃদয়কে কবি যে নূতন দৃষ্টিতে দেখেছেন এর মূলে শুধুই ওভিডের প্রাণহীন প্রভাব ছিল না, ছিল জীবনের মুক্ত উপলব্ধি। যে কারণে মেঘনাদবধের প্রমীলা বধূ হয়েও অশ্বারোহিনী সেই একই কারণে জনা জননী ও রানী হয়েও ক্রোধে আত্মহারা —অর্থাৎ সেই প্রতিহত নারীহৃদয়ের আবেগ। এই প্রতিহত রূপ দেখিয়েছিলেন মহাকবি মহাভারতের দ্রৌপদীর মধ্যে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য

যথার্থ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সেই সমান্তরাল দৃষ্টান্তটি এনেছেন এই প্রসঙ্গে। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ থেকে গেল, এত বড় সমর্থন পেয়েও সমালোচক মধুসূদনের সৃষ্টিকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। মানব চরিত্রের বাস্তব রূপটিকে কিছুতেই তিনি গীতির ঊর্ধ্বে ভাবতে পারেন নি। বীরাঙ্গনার আলোচনায় এই দ্বিধার পরিচয় স্পষ্ট। আধুনিক যুগের জীবনবোধ যে নূতনভাবে রূপ নিতে চলেছে, এই কথা বিশ্বাস করলে সত্যই আর দ্বিধা থাকে না। এই জীবনচেতনা থেকেই কবির ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপলব্ধি বল সঞ্চয় করে এবং তার থেকেই গীতিকবিতার জন্ম হয়। মধুসূদনের কাব্য বিচার করতে গিয়ে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণকুশলতার পরিচয় দিয়েও দ্বিমনস্কতার হাত থেকে মুক্তি পান নি।

একশো বছরের বাংলা কবিতা

বার্ণিক রায়

যুগের দিশারী কবি-মনে পরিবর্তনের আনন্দ কাব্যসৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণা, পরিবর্তনের স্রোতে ব্যক্তিত্বের আলোড়ন জ্যোতির্ময় সত্তার প্রকাশকে বিচিত্র শোভন ও স্বচ্ছ করে তোলে। কিন্তু প্রত্যেক যুগেই চারিত্র্যপ্রধান কবি-আন্দোলনে একটি যুগবৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় এই চারিত্র্যই বুঝি কবিতা, কিন্তু যে ব্যক্তিত্বে nexus of essence-এর অভাব, যা আমাদের সত্তাকে আলোড়িত করতে পারে না, সুপ্ত বাসনা সংস্কারকে পৃথিবীর বিচিত্রতর মানব ও প্রকৃতিলোকের মায়ায় দীপ্তিমান ও দ্যুতিমান করে তুলতে পারে না, আমাদের আত্মচৈতন্যের বিস্তৃতির মধ্যে গভীরতর ব্যঞ্জনার সুরভি আনতে পারে না, তাকে কবিতা বলা সাজে না। কবিতায় শিক্ষানীতি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যক্ষ স্থান নেই, রাজনীতির রণধ্বনিও এখানে মুখ্য নয়, পাঠকের ব্যক্তিত্বে আনন্দ ইম্প্রেশন সক্রিয় করে তোলাই কবি-ব্যক্তিত্বের প্রধান কাজ, একটা এফেক্ট সৃষ্টি করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য। ফিলিং ও ইমোশন গভীরতর ব্যঞ্জনা সংকেতে উদ্দীপিত হলেই সূক্ষ্মরহস্যের লীলারস হৃদয়কে বিস্ফার করে তোলে, এটা নির্ভর করে কবির আত্মিক ব্যক্তিত্বের আলোড়ন, অনুভব সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে। কবিতার সার্থক সংজ্ঞা সম্ভব না হলেও এই জাদুস্পর্শী আনন্দবেদনার পার্থিব সত্যতা একান্ত অনিবার্য। এটি নির্ভর করে কবির সততা, আত্মপ্রকাশ ক্ষমতা, বিচিত্র অভিজ্ঞতার ওপর।

১৮৬১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কবিতার মধ্যে যুগের পরিবর্তনে অনেক ঘোলাজল নোনাজল ও মিষ্টিজলের স্রোত এসেছে*। কিন্তু কবিতা-বিচারের মানদণ্ড আঙ্গিকে কিছু পৃথক ঘটালেও রসের দিক থেকে তেমন কোনো মারাত্মক পরিবর্তন আনে নি। এবং এও সত্য যে তা আনতে পারে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'শতাব্দী শতক' কবিতার

---

* প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত **শতাব্দী শতক** এবং জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত **বাংলা সনেট** অবলম্বনে।

সংকলন গ্রন্থে বাংলাদেশের এই বিচিত্র কাব্যস্রোতের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সংকলনে প্রত্যেক কবিরই পূর্ণাঙ্গ রূপ নেই, কিন্তু কালের দিক থেকে একটা পরিবর্তন অনায়াসেই পাঠক লক্ষ্য করতে পারেন, হয়তো এমন অনেক কবিতা আছে, যাকে তাঁরা প্রতিনিধি স্থানীয় মনে করেছেন, তা নয়। কিন্তু তবু, এঁদের সংকলনে এই একশো বছরের পরিবর্তমান জীবনধারার সঙ্গে কবিতার পরিবর্তন দৃষ্টিগোচরে আসে। বলা বাহুল্য, সংকলনে কবির ও কাব্যের বস্তুভূমিক বাস্তবতার চেয়ে সংকলনকর্তার রুচি ও মর্জিই বিশেষ প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তাঁদের রুচি ও মর্জির অনুকরণে এই সংকলনের মধ্যে একশো বছরের বাংলা কবিতায় যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তাই আলোচিতব্য।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যাঁরা কবিতা রচনা করেছেন, তাঁদের কাব্যে তেমন লিরিক আবেদন, বা একান্তই আত্মচিত্তকে প্রসারিত করে দেবার বিপুল প্রেরণা নেই, বরং বস্তুভূমিকতা, নারীর দেহে সাম্রাজ্য বিস্তার কল্পনা, ঘটনা ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ ধারণাগত অনুভব, প্রায়শ নীতিমূলক চেতনা, নতুবা নবীন সেনের সেন্টিমেন্টাল উচ্ছ্বাস, দাম্পত্যজীবনকে কেন্দ্র করে গৃহিণীর মধ্যেই রোমান্টিক বিদেশিনীর প্রত্যক্ষ ছায়াপাত—এগুলিই স্থান পেয়েছে। এহেন মধুসূদনের মধ্যেও লিরিক কল্পনাকে গ্রাস করেছিল চেতন-অবচেতনের বস্তুভূমিক এপিককল্পনা। ফলে সনেটের রূপকল্পেও ব্যক্তির মনের ও হৃদয়ের প্রেম ভালোবাসার অকুণ্ঠ অনাবৃত ও জ্যোতির্ময় প্রকাশ সম্ভব হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের অধিকাংশই প্রেম নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, বিষয়বৈচিত্র্য কয়েকজনের মধ্যে দেখা গেলেও শৃঙ্গারই এখানকার সংবাদী সুর। এবং এই শৃঙ্গারে দেহকে অস্বীকার করবার কোনো সলজ্জ আত্মঅধ্যাস ছিল না, বলদেব পালিত ঘোষণা করে বলেছেন, "'তব দৃগঞ্জনযোগে এ প্রেম সঞ্চার / তবে কেন না পাই ও দেহ রাজ্যভার"। গোবিন্দ দাস চীৎকার করে বলেছেন, 'আকণ্ঠ লইব চুষি যত ইচ্ছা তত খুশি চুষে নিব মেদমজ্জা চুষে নিব হাড়"। ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবিতায় একটা ফিলিং আছে, কিন্তু ইমোশন নেই। ফলে বাইরের বস্তুজগতের সংযোগে কবিমনের ঈষৎ অভিঘাতই ধারণার প্রকাশে রূপ পেয়েছে। অনেকের রচনায় আঙ্গিক ও বিষয়, ভাষা ও বক্তব্য মেলে নি, রোমান্টিক লিরিক উচ্ছ্বাসকে ক্লাসিকের স্থিরতা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর

সামাজিক নৈতিকতা সে-যুগের কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকট। হেমচন্দ্রের বহুখ্যাত কবিতায় সদ্যোবিধবা রমণী পূর্বপ্রিয়তমকে বলছে, "ছিলাম তোমার আমি, তুমিই আমার স্বামী ফিরে জন্মে প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে"। প্রিয়তমের কাছ থেকে বদনচুম্বন লাভ করেও হিন্দু সংস্কার-আচ্ছন্ন নারীর এই উক্তি সে-যুগের নীতিকেই প্রকাশ করছে। আধুনিক লিরিক কবির কাছে বদনচুম্বনের পর যে মনোভাবে কাব্যের বাক্‌প্রতিমা গড়ে উঠত, তাতে বিশ্ব সৃষ্টির অপূর্ব রাগিণী ব্যঞ্জনাগর্ভে স্পন্দিত হত।

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার ভিত্তিপথ রচনা করেছিলেন যথাক্রমে বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ। পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা সড়ক পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে লিরিক উচ্ছ্বাসকে সুদূর দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রনীলিমা এনে দিলেন। পূর্বযুগের বস্তুভূমিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বিহারীলালই তাঁর কাব্যের অগ্রদূত। বিশ্বসৃষ্টির লীলায় স্বতঃউৎসারিত বিস্ময়ই বিশ্বের রহস্য পাপড়ি খুলে ধরেছে, বিশ্বধ্বংসের মধ্যে চির শান্ত বিশ্বাসের অরুণের টিকা ললাটে নিয়ে তিনি জন্মেছেন, এই কারণেই সপ্তর্ষি হিমাদ্রি বনস্পতি উন্মত্ত তরঙ্গভঙ্গ সকলের সঙ্গেই তাঁর আত্মার যোগ স্থাপিত হয়েছে, ক্ষণকালের মধ্যে মহাকালের অদৃশ্য চক্রধ্বনি তিনি শুনতে পান।

রবীন্দ্র-মধুচক্রকে কেন্দ্র করে যে মধুকর বৃত্তিপরায়ণ পঙ্ককবি অক্ষম অনুকরণে ভাব ও ভাষার গল্তিক প্রয়াস করেছেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্র বাগচী ও করুণানিধানই ঈষৎ কাব্যপ্রতিভার বলে স্মরণীয়। যদিও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দের শিশুমন ভোলানো জাদু অনেকের মধ্যে প্রভাবপাত ঘটিয়েছে, তার ফলে করুণানিধানের কবিতার আঙ্গিক ভাবের সঙ্গে যৌপপদ্য লাভ করে নি। কিন্তু অদৃশ্য অসীম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভাবনীয় অনির্বচনীয় জগদাতীত রহস্যমায়ামধুর জীবনদৃশ্যের রূপ চিত্রায়নে রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ব্যক্তিত্বের যে সক্রিয়তা অনিবার্যভাবে লক্ষণীয়, তা এঁদের মধ্যে অনেকাংশেই পঙ্গুব্যর্থতায় পর্যবসিত।

আধুনিক যুগের যুগসন্ধিক্ষণে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ও মোহিতলালের নাম স্মরণীয়। যতীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবাদী আস্তিক মনে দার্শনিকতা, যুগ-সচেতনতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপপরায়ণতা যতখানি, সেই পরিমাণে কবিচিত্তের স্বগতবাণী ও অনুভব অনুচ্চারিত। নজরুলের গানে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ পেলেও কবিতায় যুগ ও জীবনের সামগ্রিক গভীরতা অননুভূত।

মোহিতলালই এঁদের মধ্যে কাব্যগুণে সমৃদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর গোবিন্দ দাসের দেহবাদ, ভিলোঁর নারীবাস্তবতা, ভ্যালেরির রক্তদেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, তদুপরি রোমান্টিক অলৌকিক আকৃতি সব মিলে তাঁর কবিচিত্তকে দীপ্তি দিয়েছিল, এই দীপ্তিই বস্তুভূমিক সংকেতে রূপ পেয়েছে। যতীন্দ্রনাথের 'কর্মকার' কবিতাটি একটি রূপক, কিন্তু মোহিতলালের 'বসন্তবিদায়' কবিতায় চিত্রগুলি সংকেতে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। কবির ব্যক্তিগত বসন্তবিদায় প্রকৃতির বসন্তে সুন্দর সংকেতিত হয়েছে। যৌবনবসন্তে ভাবনা অলীক, সেটিই সংকেতে প্রকাশ করলেন :

লয়ে ফাগুনের চূত মঞ্জরী
অলকে পরিনু—অলি-গুঞ্জনে অলীক ভাবনাতুর।

মর্ত্যপ্রেমিক কবির জীবন-উপলব্ধি সংকেতে ইঙ্গিতে প্রসঙ্গে চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে :

আমি মরণেরে, তার নীলতনু ঘেরি জীবনের পীতবাস
পরায়ে, সাধাব হৃদয়-রাধারে কত না করেছি আশ।

বলতে গেলে জীবনানন্দ দাশ থেকেই আধুনিক কবিতার যুগলক্ষণ প্রকট হয়েছে। যুগের হতাশা জ্বালা ব্যর্থতা যন্ত্রণা যুগসচেতনতা অনিকেত মনোভাব, চেতন অবচেতন মনের বিকৃত লীলা, নৈরাশ্য নৈরাজ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে। এযুগের প্রায় কবিই রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারীর আশ্চর্য গান শুনতে পেয়েছেন, সাবিত্রীপ্রসন্নের মতো "কোরকে কোরকে তার কীট জাগে অতি ভয়ংকর" মনে করেছেন, বিমল ঘোষের "রক্তগোলাপ বুকের রক্তমোছা রুমাল" হয়ে উঠেছে। এই যুগসচেতন হতাশ্বাসের পেছনেই রয়েছে এক অব্যক্ত অন্ধ বেদনার অসীম আকৃতি। এবং যুগসচেতন কবির ব্যক্তিত্ব জীবনানন্দের মতো শুধু এই বলে কবিচিত্তকে সান্ত্বনা দেয় নি, "দীনতা অস্তিমগুণ, নক্ষত্রের আলো"। তাঁরা সাম্যবাদীর মতো এই হতাশ্বাস জ্বালা ব্যর্থতার মধ্যেই নবীন জীবনের আবির্ভাবকে সম্ভাবিত করতে চেয়েছেন, সমর সেনের মতো কবিও নববর্ষের প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন :

অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সস্তার নতুন সূর্য ওঠে
কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়

সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার
গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে।

মঙ্গলাচরণের 'জননীযন্ত্রণা' ও সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'টালা ট্যাংকে' কবিতা দুটিই বিষয় ভাববস্তুর দিক থেকে, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় বিশ্বাসে চমৎকার সংকেত-আবেগে প্রকাশিত। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের শান্ত স্থির চিত্রের শেষে জীবনের প্রত্যয় আবেগ চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে; "টলোটল ঝলোমল ধীর জল শীতল উজ্জ্বল"। মঙ্গলাচরণের সমগ্র কবিতায় হৃদয়াবেগ সঞ্জীবিত, প্রতীকে বিস্তারিত, ভাষার সুরে সংকেতিত, ঐতিহ্যভাষায় স্পন্দিত।

এই সঙ্গেই আছে প্রেমের নিরুদ্বেগ শান্তি, 'হে পদ্মার' মতো কবিতায় স্থির নৈর্ব্যক্তিক ভাবচিত্র। অচিন্ত্য সেনের মতো "বুকের কাছে সহসা পাখার নাচ" শুনতে পেয়েছেন অনেকে, অমিয় চক্রবর্তীর মতো "এই মাটি চষেই ফসল বানাতে" চেয়েছেন, অনেকে অজিত দত্তের মতোই এই ধরণীকে গভীর বন ভেবেছেন—যেখানে নৃত্যমত্ত সহস্র পরীর ও নিশাচরীর পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের মতোই নির্জন যৌবনের আবির্ভাবে আত্মহারা হয়েছেন। তবে ক্লান্তসুরে ঘুমিয়ে পড়বার চেতনা প্রায় অনেকেরই। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন অজ্ঞাত রহস্যদেশে নবীন সবুজ দেশের মায়ায় যাত্রা করেছেন, তেমনি প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ক্লান্ত নাবিকের মতো গতযামিনীর কালি নিয়ে গ্রামের শুরুতে পাহাড়তলীর সরু একফালি জমি খুঁজেছেন। এই ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রানুসারী কবিতাও কবিতার জন্যেই চোখে পড়ে। জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ ও তাঁদের মিলিয়ে মিশিয়ে অক্ষম অত্যাধুনিক কবিরা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট নিরুত্তাপ আঙ্গিকসর্বস্ব অনেক কবিতাও রচনা করেছেন, আনন্দ বাগচীর কবিতা তার একটি নজির।

জীবনানন্দ থেকে তরুণতর আধুনিক আশিজন কবির রচনায় বিষয়বৈচিত্র্যের চেয়ে আঙ্গিকবৈচিত্র্য বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয়। গদ্যছন্দকেই চোখের দেখাতে মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে বিচিত্রতর করা হয়েছে বেশি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুক্তক পয়ারের প্রভাব এযুগে যত বেশি, তত আর কারো নয়। অক্ষম সনেটও সুরহীনভাবে প্রকাশ পায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রাদুর্ভাব প্রায় নেই বললেই চলে। এযুগে পয়ারজাতীয় অমিত্রাক্ষরই লক্ষিতব্য। ভাষা সৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনের, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের স্ল্যাঙ্‌ও প্রয়োগ

করা হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়, "চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল", আ মরণ! পোড়ার মুখ লক্ষীছাড়া প্রজাপতি! বসন্তের পেলবতার সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের আঘাত এমন বৈপরীত্যের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কিন্তু কবিতার প্রকাশে কি বাধা দেয় না। "কাঠখোট্টা গাছ", "সময়ের দিনরাত্রি ডোরা-কাটা বাঘছালে বসে জীবনের ইস্কুল-পালানো?" "কর্কটুকু খুলে", "থোলো থোলো কালো আঙুরের মত রাত, পাতাগুলি কেটে দেয় হাওয়ার করাত", "জ্বরের চিতায় দেহটা পুড়ছে, তার নির্ধূম শিখায় খুলবে না কি সৌরপদ্মের পাপড়ি" প্রভৃতি ভাষা-সংকেত-রূপক-ইমেজ ব্যবহার করায় ভাষার সীমাশক্তি অনেক দূর এগিয়েছে। তবে বিদেশী কবিতার আঙ্গিক অনুসরণ করতে গিয়ে ভাবকে অনেকে চেপে মেরেছেন। ফলে ছোটরূপ পাওয়া যায়, কিন্তু কবিতা পাওয়া যায় না। এযুগেও চার-পাঁচজন কবি ব্যতিরেকে আইডিয়া ইম্‌প্রেশন ফিলিং-এর ওপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তাঁদের অনাবৃত ব্যক্তিত্ব এড়িয়ে বুদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু তাতে চিত্ত গভীরভাবে নাড়া দেয় না, মনে হয় জীবনানন্দ ও দিনেশ দাশের মধ্যেই বস্তুরূপ সংকেতের আবেগে ভাষা রূপ পেয়েছে সার্থকভাবে, তাঁদের শত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ক্ষণিকে আমাদের অন্তর্জগতে নিয়ে যায়। আর এ সংকলনে অনেক কবি আছেন—যাঁরা কবিতা লিখতে হয় বলেই কবিতা লেখেন।

সংকলনে রবীন্দ্রনাথের 'বিস্ময়' কবিতাটি গ্রহণ শিল্পরুচিসম্মত নয়, যদিও তত্ত্বগ্রাহ্য, জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কেও সেই একই কথা। এই সংকলনে অনেকের কবিতাই আছে—যাতে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু কাব্যরূপ প্রকাশ পায় নি। বিষ্ণু দের কবিতায় আইডিয়া ইমপ্রেশন আছে, কিন্তু কবিতা কতখানি প্রশ্ন উঠবে অনিবার্যভাবে।

তথাপি এজাতীয় কবিতা সংকলন ধন্যবাদার্হ। সংকলনকর্তারা দুজনেই কবি, সুতরাং কবির দৃষ্টিতে একশো বছরের কবিতার রূপ ও পরিবর্তন কতখানি তা বুঝতে কষ্ট হয় না তাঁদের চোখ দিয়ে দেখা সত্ত্বেও।

জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত বাংলা সনেটে একশো বছরের সনেটের বিচিত্র রূপ রীতি প্রকাশ পেয়েছে। লিরিকের অন্য অনেক আঙ্গিক লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সনেটের ঐতিহ্য আজও প্রবহমান।

জীবেন্দ্র সিংহরায় ভূমিকায় সনেট সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে উজ্জ্বল কবিকৃতি সনেটে কবির গভীর রসচেতনা আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের পরিমিতি বোধ ও ভাস্কর-সুলভ শিল্পদক্ষতা থাকা চাই। সনেটে লিরিক প্রেরণার ঝোঁক ক্লাসিক্যাল সংহতির দিকে হওয়া চাই। সংযম সুন্দর ভাবরূপই মনোহরণ করে বেশি। টেকনিকের যাথার্থ্যের ওপরই সনেটের সিদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। পৃথিবীতে তিন প্রকার সনেট তাঁর মতে আদর্শস্থানীয়, পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীয়রীয় ও ফরাসী দেশের বিদ্রূপের কবি Bellay-র সনেট। বাংলা দেশের একশো বছরের প্রায় সব কবিদের সনেটই সংকলন করেছেন, কিন্তু জীবনানন্দের সনেট বর্জন করেছেন, এর পেছনে জীবেন্দ্রবাবুর যুক্তি হল, "জীবনানন্দ দাশের চতুর্দশপদীগুলিরও সনেট হিসাবে নানা দোষ আছে—চরণগুলি অতি দীর্ঘ ও দুয়ের অধিক পর্বসমন্বিত, মাত্রাযোজনাও সর্বত্র বিচারসম্মত নয়।" মাত্রাবৃত্তে রচিত ছন্দে সনেটকেও তিনি বর্জন করেছেন নাচুনে ছন্দ বলে। রবীন্দ্রনাথের সনেটগুলিকে তিনি খাঁটি সনেটের পর্যায়ে ফেলেন নি। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন: "সনেটের উজ্জ্বল রূপায়ব নির্মাণ করতে হলে শুধু রোমান্টিক মনের আত্মস্থতা থাকলেই চলে না, অনেকখানি ভাবকে স্বল্পতর ভাবনার সংহতি দিয়ে একটা নিরেট মূর্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলার জন্ত গভীর ও গম্ভীর, সত্য ও সরল পরিমিতি ও চিরায়ত চেতনা থাকা চাই (তবে মহাকবির ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি আর সনেটের ক্লাসিক্যাল ঝোঁক-এর পার্থক্য মনে রেখেই এই কথাগুলো বলা হল)। রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না আর ছিল না বলেই খাঁটি সনেট তাঁর হাতে গড়ে ওঠে নি।" জীবেন্দ্র সিংহরায় সনেটে ভাবের আবর্তন নিবর্তনও আবশ্যিক বলে স্বীকার করেছেন।

টেকনিকের বিচারে জীবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই মতে। কিন্তু একটি প্রশ্ন, কবিতা যে আঙ্গিকেই হোক, তা কি শুধু আঙ্গিক-সর্বস্ব কথা। রবীন্দ্রনাথকে সনেটকার হিসাবে স্বীকার না করলে পাশ্চাত্ত্যের অনেক কবিই বাদ যান। আর জীবনানন্দ সনেটে যে-একটি সঙ্গীত প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তা তাঁর ঐ আঙ্গিকেই সম্ভবপর। সনেটে তার যথাবিহিত মিল মাত্রা মেনে চলতে হবে—এমন কোনো কথা নেই। যে-কবি নিহিত টেকনিকে সঙ্গীত প্রকাশ করতে পারেন, তিনি সার্থক অঙ্গ ও অন্তরের সামঞ্জস্যে। কিন্তু অনেকে সনেটের সঙ্গীতাত্মক অখণ্ড ভাবময় মানসী প্রতিমার

আত্মার নিরাভরণ ও নিরাবরণ প্রকাশ করতে পারেন ঈষৎ মিলবৈচিত্র্য ঘটিয়ে, স্তবকবিন্যাস না মেনে, স্বরূপের দিক থেকেই তাকে কবিতা বলব এবং বিশেষ শ্রেণীর কবিতা বলব। আত্মকেন্দ্রিক মনের লিরিক সঙ্গীতই অখণ্ড নিটোল ভাবরূপে সনেটের সংযম সুন্দর আকৃতিতে প্রকাশ পায়। লিরিক সঙ্গীত যেখানে নেই অখণ্ড ভাবরূপের নিটোল সংযম সুন্দর সেখানে স্থাণু ও জড়। তাঁর সংকলনে এমন অনেক সনেট আছে, টেকনিকের দিক থেকে সনেট, ভাবস্বরূপের দিক থেকে ড্রাইডেনের invention বা wit-writing যাকে এযুগের ভাষায় eloquence বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের লিরিক সম্বন্ধে জীবেন্দ্রবাবু মন্তব্য করেছেন : "ভাবের অখণ্ডতায়, প্রকাশের গভীরতায় সেগুলি ঘনপিনদ্ধ অথচ স্বচ্ছরূপ লাভ করেছে।" এ গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও কি রবীন্দ্রনাথের সনেটকে বর্জন করব। বিন্যাসের দিক থেকে স্বতন্ত্র নাম দিলেও একে সনেট হিসাবে স্বীকার করব। আর আবর্তন নিবর্তন সনেটে অভাবি নয়। আসলে সনেটে ক্ষুদ্রধ্বনিময় সঙ্গীতে কবির ব্যক্তিত্বকেই আমরা স্পর্শ করতে চাই। Bellay-র কবিতার চেয়ে বোদ্‌লেয়রের Correspondence সনেটটি কাব্যসঙ্গীতগুণে আরো চমৎকার, অথচ তার উল্লেখ তিনি করেন নি। বলা বাহুল্য, সার্থক কবির হাতেই সনেটের সংযম-সুন্দর-রূপ ফুটে ওঠে, অন্যের হাতে টেকনিকের পাহাড়। সাধারণ কবিতার মতো সনেটেও কোলরিজের মতে থাকতে হবে এবং একান্তভাবেই থাকতে হবে : Could I revive within me / Her symphony and song. / To such a deep delight 'twould win me / That with music loud and long / I would build that dome in air / That sunny dome ; those caves of ice.

রবীন্দ্র-অভিধান

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

রবীন্দ্র-চিহ্নিত বৎসরের এখন মধ্যকাল। রবীন্দ্র-উৎসবের তরঙ্গ এখন উত্তুঙ্গ। নানা তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রকাশ। এই তরঙ্গ-শীর্ষে থেকেও ঘণ্টাবাদ্য-মাইক-ধ্বনির মধ্যেও অনেক-সময়ে আমাদের নিভৃত মনের কোণে এ কথা উঁকি দেয় যে অনেক কিছু যা করণীয় ছিল, তা করা হয় নি। পূর্ণতর রবীন্দ্র-জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য সংহত যৌথ প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেই; বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ, কার্যকলাপ ও সাহিত্যিক অভ্যর্থনার বিবরণের বৃহৎ একটা অংশ, এই সময় ভারত সরকারের সামান্য উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছ থেকে সংগৃহীত হতে পারত; ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সুষ্ঠু অনুবাদের ব্যবস্থা আজও হয় নি; রবীন্দ্র-কল্পিত জনশিক্ষার প্রসার রুদ্ধপ্রায়। এই গেল এক দিক। অন্য দিকে, অনেক উৎসব-অনুষ্ঠান আছে যার লক্ষ্যই সাময়িক। সুতরাং বৎসরব্যাপী দীর্ঘ তরঙ্গটি যখন অপসৃত হয়ে যাবে তখন আমাদের তীরভূমিতে কী পড়ে থাকবে তা বলা খুব মুস্কিল।

এই অবস্থার মধ্যে যাঁরা স্থায়ী ও পাকা বনিয়াদের কাজে হাত দিয়েছেন তাঁরা বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র। সোমেন্দ্রনাথ বসু এই রকম একটা কাজ শুরু করেছেন। একটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-অভিধান তাঁর অভীষ্ট। পাশ্চাত্ত্যের কোনো কোনো লেখক সম্পর্কে যেমন 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' জাতীয় গ্রন্থ আছে এরও পরিকল্পনা অনেকটা তেমনি।

বছর কয়েক আগে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন শুনেছিলাম অনুরূপ পরিকল্পনা তাঁরও ছিল। তিনি অবশ্য—হয়তো বার্ধক্যের জন্যেই নিজে করতে চান নি, করাতে চেয়েছিলেন। একদল তরুণ উৎসাহী কর্মী পেলে তাঁদের সাহায্য করবার জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। (সোমেনবাবু ভূমিকায় জানিয়েছেন

* **রবীন্দ্র-অভিধান** (প্রথম খণ্ড)। সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ। ছ টাকা।

যে তিনি পত্র-মাধ্যমে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য পেয়েছেন।) প্রভাতবাবু তাঁর এই পরিকল্পিত কোষগ্রন্থের নাম মনে ভেবে রেখেছিলেন, 'রবীন্দ্র-ভাব-সূচী'। বলা বাহুল্য, এ পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি।

কোষ-কেন্দ্র সংকলন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ, এবং সময়সাপেক্ষও বটে। এর দ্রুত সুষ্ঠু সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল সরকারের, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সাহিত্য পরিষৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু তাঁরা যখন নিদ্রাভিভূত, তখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ দুঃসাহসী হলেও কাম্য, দুর্বল হলেও প্রশংসার্হ। সেই দুঃসাহসিক প্রশংসনীয় কাজে হাত দিয়েছেন সোমেনবাবু।

এ কাজ যে কতটা সময়-শ্রম-সাপেক্ষ, তা এই খণ্ডটি দেখলেই বোঝা যাবে। এই খণ্ডটিতে অভিধানের মাত্র একটি বর্ণ 'অ' সমাপ্ত হয়েছে। বোঝাই যায়, চন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে সময় লাগবে।

এই ধরনের কাজে যে দুর্বলতা থাকতে পারে, কিছু বাদ পড়তে পারে, এ সম্পর্কে সোমেনবাবুও সচেতন। তাই তিনি পাঠকদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নতুন কথা শোনাবো এমন ক্ষমতা আমার নেই। কত মনীষী তাঁর কথা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর সৃষ্টিকে নানাভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছেন।···অল্পসাধ্যে সাগরসিঞ্চন দুঃসাহসের কাজ। তবু যাঁকে নিয়ে এই চেষ্টা তাঁর প্রতি একান্ত অনুরাগই এ কাজে হাত লাগাবার প্রেরণা। ভুল ত্রুটি থাকবেই।"

যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি গান, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও চরিত্রের তথ্যগত পরিচয় দান অভিধানাকারের উদ্দেশ্য, সমালোচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ভূমিকাতেও একথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমার সাধ্য অল্প। ভাব ও ভাবনায় যিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ তাঁর কি পরিচয় আমি দিতে পারবো। আমি শিক্ষক, ছাত্রদের নিয়ে আমার কাজ। তাই এই কথাই মনে হয়েছে এমন কিছু করা আমার দরকার যাতে পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথ পড়তে সাহায্য পান। তাই এই অভিধানের চেষ্টা। অভিধানের কাজ অর্থ পরিস্ফুট করা—সমালোচনা নয়। তাঁর বিভিন্ন রচনার অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। আশা করেছি প্রবেশপথে এই সাহায্যটুকু পেলে পাঠকদের নিজের মনের মত অর্থ ও রসগ্রহণের সুবিধা হবে।"

তা হলেও "বিভিন্ন রচনার অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা" করতে গেলে একটা

দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যাকারের থাকেই এবং সেই সূত্রে মতান্তরেরও অবকাশ থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সোমেনবাবু অতি উদার একটি দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন এইভাবে: "দেশাচার ও রক্ষণশীল ধর্মের গোঁড়ামী থেকে বাংলার নব জাগরণের নেতা রামমোহন মানুষের আচ্ছন্ন বুদ্ধিকে মুক্তির পথ দিয়েছিলেন। সেই মুক্ত বুদ্ধির প্রচণ্ড কর্মীরূপ দেখেছি বিদ্যাসাগরের মধ্যে—তারই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ বিকাশ দেখলুম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। মুক্ত বুদ্ধি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির মিলনে যে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির জাগরণ দেখলুম, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার তাই হলো যথার্থ পরিণতি।"

এরও পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আর একটি দিক—হয়তো মহত্তম দিক—থাকে, যেখানে তিনি শিল্পী। সেই শিল্পী-পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা দুরূহ, হয়তো অভিধানের সীমার কিঞ্চিৎ বাইরেও। তাহলেও সে-চেষ্টা সোমেনবাবু করেছেন। অন্তত সেই শিল্পীমহলে পৌঁছবার বাহ্য বাধাগুলিকে নিপুণভাবে সরাবার চেষ্টা করে পাঠককে সেই মহলের প্রান্তে এনে তার অন্তঃপুরের আভাস দিয়েছেন। এ কথা অবশ্য সত্য যে এ কাজ পূর্বসূরীরা অনেকটাই করে গিয়েছিলেন। সোমেনবাবু তাকে গুছিয়ে দিয়েছেন। তাতে সাধারণ পাঠকের প্রভূত উপকার হবে।

সোমেনবাবু মুখ্যত নিরঞ্জন-তথ্যাশ্রয়ী, অথবা উদ্ধৃতিচিহ্ন সম্বলিত অন্যমত-উদ্ধারকারী। একটি ক্ষেত্রে এর ঈষৎ ব্যতিক্রম ঘটেছে। কবিতাটি 'সানাই'-এর 'অপঘাত' (প্রথম পংক্তি : সূর্যাস্তের পথ হতে)। এটি কবি রচনা করেন ১৯৪০-এর ২৯শে মে। এই কবিতাটির আলোচনা সোমেনবাবু শুরু করেছেন এই ভাবে: "১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে কবি সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত ছিলেন। রাশিয়াকে তীর্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই রাশিয়া যখন ফিনল্যাণ্ডের মতো একটি ছোট দেশকে আক্রমণ করলো, বোমার দ্বারা বিধ্বস্ত করলো তখন তাঁর ধারণাতেও আঘাত লাগলো। অপঘাত সেই আঘাতের কথা।"

আলোচনা শেষ করছেন এই কথাগুলির পুনরুক্তিতে: "একদিন রাশিয়ার আদর্শ তাঁর মন স্পর্শ করেছিল—সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর ভাল লেগেছিল। সেই রাশিয়া যেদিন ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ডের উপর বোমাবর্ষণ করলো সেদিন তাঁর মনে আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করা কঠিন নয়। চৈত্রের দিনের এই টেলিগ্রাম একটি শান্তপরিবেশকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

মনের শান্তি নষ্ট হলো—এই নির্মমতায় বিক্ষুব্ধ কবির আর কিছুই বলার নেই।”

প্রথমত, দু বার প্রায় একই কথা বলার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিষয়ের গুরুত্বের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ। দ্বিতীয়ত, “সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর ভাল লেগেছিল”, একথা সঙ্কীর্ণতা-দোষ-দুষ্ট। কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল; কিন্তু শিক্ষা তো নিশ্চয়ই, রাশিয়ার সমাজের অন্যান্য অনেক বিষয়ও তাঁর প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু এহ বাহ্য। তৃতীয় এবং প্রধান কথা, ফিনল্যাণ্ড-বোমাবর্ষণের ঘটনাটি তার সামগ্রিক প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে রাশিয়া সম্পর্কে ঘৃণা বা বিরাগ জাগা সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক। এখানে অভিধানকারের রাজনৈতিক চিন্তার ছায়া পরোক্ষে পড়েছে। শেষ কথা, ফিনল্যাণ্ডের ঘটনার পরে, যুদ্ধের অবস্থা পরিষ্কার হলে, দেখা গিয়েছে কবির সোবিয়েতের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি অক্ষুন্ন ছিল। এ কথাটিও তাহলে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

নিছক সাহিত্য-প্রসঙ্গেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোমেনবাবু তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। নাটকের গান বা গল্প-উপন্যাস-নাটকের কোনো কোনো চরিত্র সম্পর্কে সোমেনবাবু তাদের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে মত দিয়েছেন। এটি বোধহয় অভিধানকারের কাজ নয়, সমালোচকের কাজ। এখানে মতান্তরের সম্ভাবনাও প্রবল থাকে, সোমেনবাবু তথ্যগুলিকে যথাযথ দিয়ে বরং পরিশিষ্টে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে ঐ বক্তব্যগুলিকে উপস্থিত করতে পারতেন।

সোমেনবাবুর লেখার ভঙ্গি—অন্তত এ বইতে—কিছুটা শিথিল। অতি-বিশদ ব্যাখ্যা করবার ঝোঁক—এর একটা কারণ। বহু চরিত্র-আলোচনায় সোমেনবাবু বিস্তৃত গল্পপটে তাকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এতে অবশ্য খুব প্রাথমিক ধরনের পাঠকের কতকগুলো সুবিধা আছে। তা সত্ত্বেও মনে হয়েছে যে ঐ জাতীয় অনেক যায়গা সংক্ষিপ্ত করা যেত এবং অভিধানের কাছে বোধহয় সেটাই কাম্য। পাতার কথা ভাবলেও এ কথাটা মনে হয়। এখানে দেখলাম কোনো কোনো ছোটগল্পের একটি চরিত্রের আলোচনায় তিনি দিয়েছেন তিন, চার বা হয়তো পাঁচ পৃষ্ঠা। এর বাকি চরিত্র এবং স্বয়ং গল্প যখন তাদের ভিন্ন ভিন্ন আদ্যক্ষরের সূত্র ধরে অভিধানে এসে আবির্ভূত

হবে, এবং ঐ অনুপাতে পাতা দাবি করবে, তখন একটি ছোটগল্পের আভিধানিক পরিচয় কী সুবৃহৎ হয়ে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। এমন লেখা নিশ্চয়ই থাকতে পারে যার দাবিই বৃহৎ, তার জোরেই সে সেটা আদায় করে নেবে। এদের কথা স্বতন্ত্র। সেক্ষেত্রে পাতা বেশি না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু বহু যায়গায় এত বেশি দাবি থাকবে না—বিশেষ করে যখন একটা গল্পের আলোচনা একাধিক দৃষ্টিবিন্দু থেকে অগ্রসর হয়ে করা হচ্ছে।

বাদ যা পড়েছে তার দুটো-একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করি, দু-একটি কবিতার বই আছে যাতে কবিতার কোনো নাম দেন নি কবি, নম্বর দিয়েছেন। স্বভাবতই প্রথম পংক্তি এর পরিচায়িকা। 'লেখন' বইটা আরো নিরাভরণ; নাম-পরিচয়হীন দু-চার লাইনের কবিতার সংকলন এটি। এর গুরুত্ব রবীন্দ্রসাহিত্যে কম, তবু অভিধানে তার স্থান থাকা উচিত। এই বইটি একেবারে অবহেলিত হয়েছে। 'কণিকা'-র দু-চার লাইনের কবিতাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং 'লেখন'-ও বাদ পড়া উচিত নয়। 'উৎসর্গে'র ৪৫নং কবিতাটি (অত চুপি চুপি কেন কথা কও) দেখতে পেলাম না। 'উৎসর্গে'র সংযোজন অংশের ১০ নং কবিতাটিও (অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে) নেই।

বানানে 'কর্চ্ছে', 'পার্চ্ছে' ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজন কী! রেফ্-এর সঙ্গে যুক্ত দ্বিত্ব-বর্জন আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এক্ষেত্রে সেটা রাখবার সার্থকতা দেখি না।

মুদ্রণ-প্রমাদ দুর্লক্ষ্য নয়, যা অভিধানে অবাঞ্ছিত।

শুধু 'অ'-র ঘরে দাঁড়িয়ে গোটা বই-এর বিষয়ে কিছু বলা অসম্ভব। কিন্তু সূচনা শুভ সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলিও যাতে ভালো হয়, তার জন্যই আমাদের এই সমালোচনা।

এই বিপুল ও মহৎ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সোমেনবাবুকে অভিনন্দন জানাই।

রবীন্দ্র-প্রতিভা ও রবীন্দ্র-চিত্রকলা

গোপাল হালদার

শোনা যায়, ইউরোপ-আমেরিকার সংস্কৃতিবাদীরা রবীন্দ্রনাথের নামই প্রায় আজ স্মরণ করতে পারেন না—রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে পরিচয় তো দূরের কথা। কথাটা অনেকাংশে পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে সত্য, এবং ঠিক তেমনি পূর্ব ইউরোপের পক্ষে সত্য নয়—এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ আছে। বলা হয় পশ্চিম ইউরোপের এই অজ্ঞতার কারণ তাদের ঔদাসীন্য বা বিমুখতা নয়; কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ও অন্যকৃত অনুবাদের ত্রুটি। কেউ কেউ আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন—কবিতার অনুবাদ হয় না। এই মৌলিক তর্ক এ উপলক্ষে নিরর্থক। কারণ, রবীন্দ্রনাথ কবিতা ছাড়াও আরও কিছু কিছু জিনিস লিখেছেন। অনুবাদের বাধা ডিঙিয়েও আমরা যদি ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের দানের পরিচয় গ্রহণে চেষ্টা করতে পারি, তা হলে 'পাশ্চাত্ত্য' পৃথিবীর বিপুলতর সাংস্কৃতিক-সমাজে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান মানুষের এত অভাব কেন, যে, তাঁদের মধ্যে দু-একজনও বাঙলা ভাষা শেখার ও তার থেকে অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না? এবং তদভাবে রসজ্ঞ পাঠকেরই বা এত অভাব কেন যে অনুবাদের বাধা ডিঙিয়ে রবীন্দ্র-গদ্য-সাহিত্যের রস গ্রহণে তাঁদের উৎসাহ নেই? মানতেই হবে—'পাশ্চাত্ত্য' রসিকদের এখনো পূর্বদেশীয় জ্ঞানী-গুণীর প্রতি অবজ্ঞা আছে। এ ক্ষেত্রে হয়তো আরও কারণ আছে:—পূর্ব-ইউরোপে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক সকল দেশে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে—কই, অনুবাদের বাধায় তো তাঁরা হার মানেন নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মানবীয় মাহাত্ম্য তাঁদের নিকট যেমন সশ্রদ্ধ আদরের বিষয়—'ফ্রি ওয়ার্লড্'-এর নিকট তেমনি তা দিনের পর দিন অস্বস্তিকর।

---

*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রমালা। ললিতকলা আকাদেমি। পঁচিশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রমালা। টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি। আট টাকা।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে মন্ত্রিবর হুমায়ুন কবীর সাহেবের ভূমিকাশুদ্ধ নির্বাচিত রবীন্দ্র প্রবন্ধ-খণ্ড ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদে এরূপ একখণ্ড রবীন্দ্র-সংকলন গ্রন্থ ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীও আমেরিকায় সম্পাদনা করেছেন। ইংরেজী জানি না, কিন্তু মনে হয় কোনটিই অযোগ্য অনুবাদ নয়। এ সব গ্রন্থের কতটুকু সমাদর হয়েছে আমেরিকায়? 'নিউ ইয়র্ক টাইম্স্' তো ভারতীয় সাহিত্যে জন্মান্ধ ভারতীয় যুবককে দিয়ে দু-চার লাইনে অমিয় চক্রবর্তীর সংকলন সমালোচনা করিয়েছেন, আর তাতে অবজ্ঞাভরে রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল করে দিয়েছেন। 'লাইফ্'-এর সাংবাদিক-সম্রাটরা শান্তা রামারাও-এর মতো এক বর্ণ-জ্ঞানহীন "বিদুষীকে" দিয়ে আজব রবীন্দ্র-কথা প্রচারিত করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে মনে হবে—'কোয়েস্ট' বা 'ফ্রিডম্ অব্ কালচার'-এর 'ফ্রি-ওয়ার্লডী' বাঙালী পাণ্ডারাও নিতান্তই দৈবক্রমে সুধীন্দ্র-বুদ্ধদেবীয় গবেষণা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন নি। এ বিষয়ে একটা 'মেথড্' আছে।

যাক সে তত্ত্ব, কিন্তু বিদেশীয়দের পক্ষে ভাষা না জেনেও কি রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় গ্রহণ অসম্ভব? সাহিত্য ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত, নৃত্য-নাট্য ও চিত্রকলায়ও আপনার প্রতিভার কিছু স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যও কি নিতান্তই 'দুর্গম'? তাও যদি হয়—রবীন্দ্র-চিত্রকলাও তাঁর আর এক পরিচয়—সে প্রতিভা তাতেও পরিদৃশ্যমান। দেশীয়-বিদেশীয় পংক্তিবিভাগ তো শিল্পকলার এই ক্ষেত্রে অন্তত অচল। সে সম্বন্ধে কি বিদেশীয়রা উদাসীন, না, দুষ্প্রাপ্য বলেই বৈদেশিক সাংস্কৃতিক জগতে তা অজ্ঞাত? সে অভাব তা হলে সম্প্রতি দূর হল—ললিতকলা আকাদেমি ও টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি (লিমিটেড্) সে বাধা সর্বসাধারণের সামনে থেকে অপসারিত করলেন। টাটা কোম্পানির প্রকাশনে আছে ১২খানি সুমুদ্রিত চিত্র। একাদেমির এই সাধারণ-লভ্য প্রকাশনে আছে ৪০ খানা চিত্র (বিশেষ প্রকাশন আমরা হয়তো চক্ষেও দেখতে পাব না)—তাতেও পৃথ্বীশ নিয়োগী মহাশয় একটি সুযোগ্য (কিন্তু সুখপাঠ্য নয়) পরিচয়-নিবন্ধ যোগ করেছেন। মুদ্রণে গ্রন্থ-সজ্জায় সব রকমেই তা সমাদর লাভ করবার মতো।

ইং ১৯২৮-এর কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথ যখন হঠাৎ চিত্রাঙ্কনে মেতে উঠলেন তখন আমরা অনেকেই কৌতুক বোধ করেছি, অনেকেই বিমূঢ় হয়েছি, কেউ

কেউ সেই কবি-কর্মকে "ছবিতা" বলে তখন মূঢ়তারও প্রমাণ দিতে ছাড়ি নি। একজন শিল্পরসিক সশ্রদ্ধ মনে ভিকতর হুগোর চিত্রকলার নিদর্শন সামনে নিয়ে ভাবতে বসেছিলেন—ফরাসী কবির সে প্রয়াসই কি রবীন্দ্রনাথকে নতুন পথে পদার্পণে উৎসাহ জুগিয়েছে? তাহলেও ফ্রান্সের শিল্প পরিবেশ আর বাঙলার শিল্প-পরিবেশ এক কেন, সমতুল্যও যে নয়! সংশয়মুক্ত তিনি হন নি। আরও দু-এক জন শিল্পরসজ্ঞ তখনকার দিনেও কবির কিছু কিছু চিত্রকে, কিছু কিছু প্রচেষ্টাকে যে সপ্রশংস চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, তাও সত্য। ত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর পরে আজ তাই শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর শিল্প-দৃষ্টিকে প্রশংসা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো সর্বগ্রাহ্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলা আজ এদেশেও সকল মানুষের বিশেষ দর্শনীয়; রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়ে তা আরও এক গুরুতর অভিজ্ঞান। চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে, শিল্পীসমাজে এককালের 'নব্যভারতীয় চিত্রকলা' পদ্ধতি—কতকটা ন্যায্যভাবে এবং আরও বেশি অন্যায্যভাবেই অবহেলিত। সেদিনের সেই 'নব্যভারতীয় পদ্ধতি'র স্থলে বোম্বাই-দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত 'মডার্ন আর্টের' চতুর ব্যাপারীরা আসর জাঁকিয়ে বসলেই বা কি? মানতে হবে শিল্প সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে—শিক্ষাও অগ্রসর হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সাধারণের পক্ষে শিক্ষার পথ—ছবি দেখা, বেশি করে ভালো ছবি দেখা, ভালো করে দেখা, জানা, বুঝা, বারে বারে দেখা। আর মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারি ও প্রদর্শনীর পরে মুদ্রিত প্রতিলিপিই শিল্পশিক্ষাগার ও শিল্পশিক্ষার বাহন।

ইং ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২০০০ (দু হাজার) ড্রয়িং ও চিত্র অঙ্কন করেন। তার প্রায় ১,৫০০ দেড় হাজার (না ১,৮০০?) বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র-সদন'-এ সংগৃহীত হয়ে আছে। কিন্তু তা যে যথোপযুক্ত ভাবে তালিকাবদ্ধ ও সজ্জিত হয় নি তা বুঝা যায়, কারণ চিত্রসংখ্যাও সঠিকভাবে স্থির হয় নি। তাছাড়াও অন্যত্র নানা প্রতিষ্ঠান ও ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের আয়ত্তেও কবির অনেক চিত্র আছে, তার কিছু চিত্র এ বৎসর কলকাতায় আকাদেমি ভবনে প্রদর্শিত হয়েছে—দেখবার সুযোগও অনেকে লাভ করেছেন। সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথের চিত্র দেখা এখনো এদেশে দুর্ঘট নয়, কিন্তু যে ভাবে দেখা সত্যকারের রসগ্রহণের পক্ষে প্রয়োজন—বারে বারে দেখা—

অনেকেই তা লাভ করতে পারেন না। কাজেই, মুদ্রিত প্রতিলিপি-মালার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিদেশীয় কেন, দেশীয় লোকরাও এই প্রতিলিপি-মালাদ্বয়ের জন্য প্রকাশকদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে—শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বহু সভা, গ্রন্থ ও পত্রাদি সেরূপ আয়োজন করেছিলেন। 'পরিচয়'-এ (মাঘ ১৩৬৭) শ্রীযুক্ত সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-চিত্রে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে যোগ্যতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন—পাঠকবর্গের তা স্মরণে থাকবার কথা। অন্তত আমরা দুর্বোধ্য কথা বা মামুলী ভাষ্য না বাড়িয়ে পুনর্বার সে প্রবন্ধ পাঠ করবার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করব।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রমালা যে প্রশ্ন খুব ন্যায়সঙ্গতভাবে মনে জাগিয়ে তোলে তাঁর কবিতা বা সাহিত্যে তার আভাস বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ চিত্রাবলী শুধু কলা-বিশারদদেরও যেমন একান্ত বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যের বিষয় হওয়া উচিত নয়, তেমনি চেতন ও অবচেতন মনের উৎসাহী সন্ধানীদেরও আপ্ত-বচনের বিষয় হওয়া ঠিক নয়। নিশ্চয়ই এ কলারও বিকাশ-ইতিহাস আছে। কবিতার লাইন কাটতে কাটতে যা এগিয়ে গেল জানা-অজানার কিম্ভূতের রাজ্যে—সেখানেই তার শেষ নয়।

> "This was, however, not a changeless state. Even the most persistent themes underwent a development in the direction of increasing characterization, and of importation of definite personality to each image. The development clearly moved away from the direction of abstraction." (Sri Prithvis Neogy)

কবির ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবেশের মধ্য থেকে স্মৃতি কী উদ্ধার করতে চেয়েছিল তা যেমন জিজ্ঞাস্য, তেমনি একথাও স্মরণীয়: ইং ১৯৩০—১৯৪১ পর্যন্ত কালটি রবীন্দ্র-চেতনা যুগ-চেতনার সংঘাতে-সংকটে কীভাবে মথিত, আলোড়িত হয়েছিল। সমগ্রভাবে না দেখলে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই প্রকাশও সম্যকভাবে দেখা হয় না। কারণ একথাটাও গভীরভাবেই সত্য: "Rabindranath Tagore had come to belong fully to the world of his time, the modern world." এই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ। বলা বাহুল্য এই মডার্ন ওয়ার্লড্‌ "ফ্রি" ওয়ার্লড্‌ তো নয়ই, তথাকথিত 'পাশ্চাত্য' জগতে নয়—তা, আধুনিক মানুষের জগৎ।

একটি সাম্প্রতিক উপন্যাস

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন দিন তিন রাত্রি* নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাম্প্রতিক উপন্যাস।

মনোমোহনবাবুর কলকাতার বাসায় তাঁর পরিবারস্থ পরিজনদের মধ্যে, পূর্ব সম্পর্কের সূত্র ধরে, দারোগা অসীম, রাইটার্স বিল্ডিংে কার্যব্যপদেশে, তিন দিনের জন্য অতিথি হয়ে উঠেছিল। অসীম ছিল মনোমোহনবাবুর বড় ছেলে শঙ্করের বন্ধু, পরে সে ভালোবেসে ফেলেছিল সেজ মেয়ে মানসীকে। অসীম দাশগুপ্ত, মানসী মুখোপাধ্যায়; এবং দাশগুপ্ত অসীম কাঞ্চন কৌলীন্যেও ন্যূন। স্বাধীন বিবাহের ওপর মনোমোহনবাবুর অসন্তোষ যথেষ্ট, সম্প্রতি-কালে সে অসন্তুষ্টির আরো বৃদ্ধি ঘটেছে পুত্র শঙ্করের স্বাধীন প্রেমজ বিবাহে। এবং তার পরিণতিতে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক-ছেদে, শঙ্করের পৃথক হয়ে যাওয়ায়—এই মনোভাব তিক্ততম হয়ে উঠেছে। মাধুরী মনোমোহনবাবুর মেজ মেয়ে। অসীমের সঙ্গে তার কোনো হৃদয়গত সম্পর্ক বর্তমান সাক্ষাৎকারের পূর্বে ছিল না। কেননা ও ছিল মানসীর ভাষায় "উদাসিনী"। এই পরিবারে, শঙ্কর না থাকা সত্ত্বেও, মানসীর সঙ্গে অসীমের সম্পর্কের কথা সকলের কাছেই প্রকাশিত থাকা সত্ত্বেও, অসীম তিন দিন তিন রাত্রি কাটাল। সেই তিন দিন তিন রাত্রিই উপন্যাস। মাধুরীর যে-আকর্ষণ সে অনুভব করল, মানসীর যে-নব রূপ সে আবিষ্কার করল—এবং উভয়ের টানাপোড়েনে যে-গ্রন্থিমোচন মাধুরীর হাত দিয়েই ঘটল—নরেনবাবু তা যথেষ্ট খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসটির প্রথমাংশে, অসীমের দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে মনোমোহনবাবুর পরিবারের নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে অসীমের পরিচয়লাভ বর্ণিত হয়েছে; ফাঁকে ফাঁকে জীবিকার সঙ্গে অসীমের অমিলটুকুও বলা হয়েছে। মানসী সম্বন্ধে অসীমের ব্যর্থতাবোধ থেকে, এবং মাধুরীর সাময়িক ভ্রান্তি-জাতীয় কিছু অন্যতর আকর্ষণে, শঙ্করের ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ থেকে ফেরার পথে, বৃষ্টির রাত্রে ট্যাক্সিতে মাধুরীকে অসীম চুম্বন করে—এইটা

* **তিন দিন তিন রাত্রি**। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। পাঁচ টাকা।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ বা মধ্যম ভাগ। এখান থেকেই সমস্যার ঘনীভবন। মাধুরী এবং অসীমের একত্র ট্যাক্সি ভ্রমণের রহস্য নারীসুলভ অনুমান ক্ষমতায় মানসী কিছুটা আঁচ করে। ঘুমের ঘোরে সে বলে ওঠে—"দিদি তুই কি করলি"? ভাই নন্দুর পরীক্ষায় ব্যর্থতাজনিত সাময়িক অন্তর্ধানের শেষে নন্দুর পুনরাবির্ভাবের পরে মাধুরী মনোমোহনবাবুকে বলে—মানসী আর অসীমের এক বছর হল বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মাধুরীর এই মহৎ মিথ্যোক্তির সাহায্যে ঘটনা মানসীর দিক থেকে সরল হয়ে গেল। সেই সরলীভবনের মধ্যেও কতখানি বেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা রইল সে কথা জানিয়েই উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নরেনবাবুর অনুচ্চভাষী, কিন্তু উজ্জ্বল গদ্য, কাহিনীর আধার হিসাবে সার্থক—যদিও এইবার তাঁর লেখায় কিছু কিছু মুদ্রাদোষ পরিলক্ষিত হয়েছে।

লেখকের দিক থেকে উপন্যাসটির ন্যায়-শৃঙ্খলা এই: অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, প্রতিযোগিতাবিমুখ যুবক। সে ভালোবেসেছে মানসীকে, যে মানসী আচার-আচরণে অনেক দৃঢ় এবং স্পষ্ট। মানসীকে বলিষ্ঠ মুঠিতে আঁকড়ে ধরার মতো সাহস এবং অভিপ্রায়—দুয়ের কোনোটাই অসীমের নেই। কাজের ছুতোয় কলকাতায় এসে মানসীদের বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণে তার অনিচ্ছা যে প্রবল হল না সেটার কারণ মানসীর প্রতি তার ভালোবাসা। মানসীদের বাড়িতেও যে তার জন্যে স্নেহাসন রচিত হল তার বিভিন্ন কারণ অমূলক নয়। মনোমোহনবাবু এবং সুহাসিনী দেবীর কাছে অসীম পারিবারিক আত্মীয়-তুল্য। যার কাছে শঙ্করের যাবতীয় দুর্ব্যবহারের কথা মন খুলে বলা চলে। মাধুরীর কাছে, মঞ্জুর কাছে, অসীম বোনের ভালোবাসার পাত্র। নন্দুর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু অসীম এ বাড়িতে এসে আবিষ্কার করল যে মাধুরী অনেক শান্ত করুণ—মানসীর উজ্জ্বল স্পষ্টতা তার কাছে প্রায় দুরাকাঙ্ক্ষার সামিল। মানসীর শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক প্রিয়গোপালবাবুরা অসীমের কাছে অনেক-দূরের-মানুষ। উপন্যাসের যা কিছু সমস্যা যথা মাধুরী-মানসীর দ্বন্দ্ব, তা এই পথ ধরে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও সমস্যার অন্য মুখটা মাধুরীর দিকে ফেরানো—তথাপি মাধুরীর আংশিক সাফল্যকে লেখক বড় বোনের আত্মত্যাগের ঊর্ধ্বে তুলতে পারেন নি। আবার, মনে রাখা দরকার অসীম-প্রসঙ্গেই দুই বোনের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে ম্লান ছায়া এসে পড়েছিল, তাই অসীমের নায়ক ভূমিকা এই উপন্যাসে শুধুই একটা উপায় নয়। অসীমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েই এই বোনেরাও স্পষ্ট হবে।

সেক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হবে অসীমকে কতদূর স্পষ্ট করে নরেনবাবু গড়ে তুলেছেন? অসীমের রূপের স্পষ্টতার জন্য তার জীবিকার ও জীবনের অসঙ্গতি, অমিল ও দ্বন্দ্বটুকুকে যে ব্যবহার করা প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে লেখক সচেতন ছিলেন। এবং তিন দিন তিন রাত্রির আখ্যানে বারে বারে ঘুরে ঘুরে দারোগা-অসীমের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। এইখানে, উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ভিত্তিভূমি রচনার সময়েই, লেখক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। অসীম নরেনবাবুর প্রিয়-নায়কমণ্ডলীর অন্তর্গত। ছিমছাম, শান্ত, ধীর, সৌখীন, ভদ্র, নাতি-উজ্জ্বল এবং নাতি-ম্লান, বাকপটু, মেয়েদের আদর আপ্যায়ণ গ্রহণ করার ও বহন করার ক্ষমতায় শরৎচন্দ্রের নায়কের স্মৃতি-বহ—এই হল অসীমদের পরিচয়। নরেনবাবু নায়কদের 'নায়কিয়ানা' এবং নায়িকাদেরও 'নায়িকা-পনা' পছন্দ করেন না। অসীম নানা চিন্তায় জটিল; সভ্যতা ও সমাজ সংক্রান্ত বিশেষ ভাবনায় ভারাক্রান্ত নায়ক নয়। এমনকি নিজেকে নিয়েও তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন-হীন এই নায়কের—গেরুয়া-পাঞ্জাবি গায়ে গৌরদেহ এই দারোগার, সমস্যাটা তাহলে কোথায়? সে ভাবছে যে মানসী তার কাছে দুরধিগম্য—কেননা সে অনুজ্জ্বল দারোগা। এই ভাবনার মূল কোথায়? এটা যে-প্রসঙ্গ-প্রকরণের পথে ব্যক্তির অনুভবগম্য বেদনার জন্ম দিতে পারে, তার অবর্তমানতায় সমস্ত জিনিসটাই হয়ে দাঁড়ায় এক তাৎপর্যবিহীন বেদনা। অথচ অসীম, সকল প্রশ্নচিহ্নের কবর ঘটেছে যার মধ্যে, যে ভাগ্যের কাছে সকল দিক দিয়ে মারখাওয়া, সে-ধরনের নির্বাপিত ভস্মশেষও নয়। সে ভস্মশেষ নিয়ে নাড়াচাড়া করাও নরেনবাবুর অভিপ্রায় নয়। তাই একদিকে অসীমের ব্যর্থতার চেহারা পঙ্গু—অন্যদিকে তার প্রেমের চেহারায়ও লুব্ধতার দৈন্য।

মাধুরী এবং মানসীকে চরিত্র-স্থায়ের কঠিন ভিত্তিতে স্থাপিত করলে, অসীম-ঘটিত দুর্বলতার হাত থেকে উপন্যাসটিকে অংশতঃ রক্ষা করা যেত। লেখকের দৃষ্টি সেদিকেও যায় নি। কতকগুলি ভালো ভালো 'পরিস্থিতি' আছে বটে, যেমন ছাদে বেড়ানো, তন্দ্রাতুর অসীমের কপালে মাধুরী বা মানসী কারো একজনের হাত বুলিয়ে দেওয়া (অসংখ্য পাঠক ও পাঠিকার কৌতূহল-বহ্নি এখানে লেলিহান হয়ে উঠবে—কে হাত দিয়েছে কপালে, মাধুরী না মানসী?), কিন্তু পরিস্থিতিগুলি জুড়ে জুড়ে তো চরিত্র রচিত হয় না। আমরা জানি না, মাধুরী-মানসীর অসীম ব্যতিরেকে সম্পর্ক কী,

পরস্পরকে তারা বোঝে কি না, বোঝার মতো কিছু আছে কি না। মাধুরীর বিয়ের ইচ্ছে আছে বোঝা যায়, রূপ আছে, বিয়ে না হবারও কিছু নেই, অসীমকে তার ভালো লাগাটা সত্যি ভালোবাসা কি না, মানসীর রূপ-বিনয়-লাবণ্যের অভাব থাকলেও অসীম আছে তার, তাহলে সমস্যাটা কোথায়—এ সমস্ত কিছুই এ উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। মনোমোহনবাবুর পরিবারে বাস্তবিক কোথাও সমস্যা নেই। ঘুম হয় না ভদ্রলোকের, তাই বকেন রাত জেগে। সে বকুনি থেকে কোনো বড় সমস্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। ছেলে বিয়ে করে স্বতন্ত্র দাম্পত্যজীবন যাপন করতে গেছে, কিংবা মেজ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না, ছেলে ফেল করেছে, মেয়ে প্রেম করছে—এগুলো শতকরা নব্বইটা মধ্যবিত্ত পরিবারের অবশ্য-বহনীয় ঝামেলা মাত্র। এর মধ্যে একটা উপন্যাসের উপযুক্ত প্রসঙ্গ কোথায়? কাজেই এটা একটা পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝির গল্প। বোনেদের মধ্যে কিছু মান-অভিমানের পালা, শেষ পর্যন্ত বড় বোনের প্রত্যাশিত উদারতায় যার অশ্রু-স্নিগ্ধ উপসংহার। অথচ তিন দিন তিন রাত্রির পরিবেশে সম্ভাবনা ছিল অনেক। অনেকেরই অনেক কিছু হতে চাওয়া, এবং না হতে পাওয়া ছড়িয়ে রয়েছে এই উপন্যাসে। কিন্তু তারা মূলতঃ রইল অব্যবহৃত। প্রতি মুহূর্তের সেই চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব এখানে জীবনের সুনির্দিষ্ট পটে সুলগ্ন থেকে, অথবা তাকে দীর্ণ করতে চেয়ে, ভাবনা-চঞ্চল নয়; অথচ সমস্যাসঙ্কুল ব্যক্তিত্বের চেহারাগুলিও প্রতিকূল পরিবেশে আত্মনিরীক্ষায় স্পষ্ট-রেখ হয়ে উঠল না।

গল্পভঙ্গিমার ঔজ্জ্বল্য নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যতম সম্পদ। তিনি বেশ ভালো করে বলতে জানেন। কম বলে অনেক বলার ব্যঞ্জনা আনতে পারেন। কিন্তু প্রসঙ্গজনিত দুর্বলতার যে ছাপ এই উপন্যাসে, তাকে গল্পভঙ্গিমা দিয়ে দৃঢ় করা যায় না। মুগ্ধতার আবরণ সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য সাধন করার অযৌক্তিক মনোভাব থেকেই জন্মলাভ করেছে—"পাতার আড়ালে বাসা। বাসার আড়ালে বাসনা।" অথবা "মন তখন তন্ময়, মানে তনুময়।" অথবা "বাক্য আর চুম্বনের অফুরন্ত সম্পদ অধর ছাড়া আর কিসে ধরে"—প্রভৃতি বাগবৈদগ্ধ্যের অকারণ ফুলঝুরি।

এক কথায় এ গল্প মাধুরীর গল্প। এবং মাধুরীর অভিজ্ঞতাও খুব বড় অভিজ্ঞতা নয়। অসীম এবং মানসী ব্যক্তিবিশেষ হয়ে উঠতে পারে নি। কাজেই সুলিখিত একখানি গল্প ছাড়া এক্ষেত্রে নরেনবাবুর দেয় কিছু ছিল না। গল্প-ভঙ্গিমা উপন্যাস-ব্যতিরিক্ত কিছু নয়, সারল্য মানে নয় বক্তব্যের অভাব—'রস' এবং 'চেনামহল'-এর লেখককে যখন একথা মনে করিয়ে দিতে হয়; তখন সেটা সমালোচকেরও দুর্ভাগ্য।

এই দশকে লেখা কয়েকটি গল্প

অমল দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন তরুণ লেখকের হাতে বাংলা ছোটগল্প নতুন চেহারা নিয়েছে, যার নাম শোনা যাচ্ছে নতুন রীতির ছোটগল্প। এই নতুন রীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালের নতুন বাস্তবতাকে প্রকাশ করার তাগিদেই এর উদ্ভব। এই রীতিতে গল্প শুধুই গল্প নয়, এমনকি হয়তো গল্প একেবারেই নয়। সেখানে মানুষের চিন্তাপ্রবাহকে এমনভাবে তুলে ধরা হবে, তার অন্তর্লোকের ঘাত-প্রতিঘাতকে এমন ভাবে উদ্‌ঘাটিত করা হবে, তার চলাফেরা ও আচার-আচরণের এমন একটি তাৎক্ষণিক পটভূমি রচনা করা হবে যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে সেই মানুষটির সম্যক পরিচয়। এমনকি এই দাবিও তোলা হয়েছে যে সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালের নতুন বাস্তবতাকে প্রকাশ করার এই হচ্ছে রীতি।

এই ভূমিকাটুকুর এজন্যে দরকার ছিল যে সম্প্রতি একটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে এই নতুন রীতির লেখকরাই অন্তর্ভুক্ত। বইটির নাম 'এই দশকের গল্প'*। সম্পাদক, বিমল কর। প্রকাশকের ঘোষণায় বলা হয়েছে—"সাম্প্রতিক কালের ষোলজন তরুণ লেখককে নিয়ে এই গ্রন্থ। যাঁরা সকলেই প্রায় এই দশকের মধ্য সময় থেকে লিখতে শুরু করেছেন। অতি স্বল্প সময়ে এঁদের সাহিত্য প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাই আঙ্গিক রীতি বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতর স্বাদের জন্য এই সংকলন অবশ্যই গল্প-পাঠকের কাছে প্রিয় হবে।" এই ঘোষণায় বা সম্পাদকের ভূমিকাতে কোথাও 'নতুন রীতি', কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু এই সংকলনের অন্তত তিনজন লেখক 'ছোটগল্প—নতুন রীতি' পত্রিকায় গল্প লিখেছেন। অন্যান্যরাও বিভিন্ন আলোচনায় এই রীতির লেখক হিসেবেই উল্লিখিত। কাজেই এই সংকলনটিকে নতুন রীতির

---

* এই দশকের গল্প। বিমল কর সম্পাদিত। পলাশী। চার টাকা।

ছোটগল্পের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নিলে অন্যায় করা হবে না। যদিও সম্পাদক বিমল কর ভূমিকায় বলেছেন—"'এই দশকের গল্প' প্রধানত তাঁদেরই গল্পের সংকলন, যাঁদের রচনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমি গত অর্ধদশক মোটামুটি পরিচিত। আমার সঙ্কীর্ণ পরিচয়ের বাইরে অনেক তরুণ লেখক আছেন, হয়ত তাঁদের মধ্যে সুলেখকেরও অভাব নেই—তথাপি এই ক্ষুদ্রায়তন সংকলনে তাঁদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করতে না পারার ত্রুটি দুর্ভাগ্যবশতই আমার।" এই অত্যন্ত বিনীত ত্রুটি-স্বীকারের মধ্যেও এই ঘোষণাটুকু পরোক্ষে থেকে যাচ্ছে যে গত অর্ধদশকের মোটামুটি উল্লেখযোগ্য নতুন-রীতির গল্পলেখকরা এই সংকলনে উপস্থিত আছেন।

এতদিন পর্যন্ত নতুন রীতির গল্পের সন্ধানে নানা পত্রপত্রিকা হাতড়াতে হত। বিমল করকে ধন্যবাদ যে তিনি যোলজন নতুন রীতির গল্পলেখককে একই মলাটের মধ্যে গ্রথিত করেছেন। অবশ্য তাঁর ভূমিকাটি যদি বিস্তৃততর হত এবং ভূমিকায় যদি তিনি এক-একজন লেখক সম্পর্কে এক এক লাইনে মন্তব্য না করে প্রত্যেকটি লেখা সম্পর্কে আলোচনা তুলতেন এবং বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যকে এই নতুন ধারার গল্প কি-ভাবে অনুসরণ করছে সে-সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতেন তাহলে বোধ করি সম্পাদকের দায়িত্ব আরো সুষ্ঠুভাবে পালন করা হত। তাঁর ভূমিকাটি প্রায় অনেকটা প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তির মতো, বিশেষত যখন তিনি বলেন "ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, গত পাঁচ বছরের বাংলা ছোটগল্পে যে ক'টি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই সেই সংযোজনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।" এ-ধরনের উক্তিকে শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জোরে পাঠকের ওপরে চাপাতে গেলে সম্পাদককে ছাপিয়ে প্রকাশকের গলাই জাহির হয়ে পড়ে এবং ফলে পাঠকের কাছে তার কোনো গুরুত্ব থাকে না।

অবশ্য এক হিসেবে এতে ভালোই হয়েছে। আরো ভালো হয়েছে গল্পগুলোকে লেখকদের নামের আদ্যাক্ষরের অনুক্রমে সাজিয়ে। গল্পগুলো পাঠ করার সময়ে পাঠকদের মনে কোনো পূর্বকৃত ধারণা প্রশ্রয় পাবে না।

আমি কিন্তু নতুন রীতির গল্প সম্পর্কে বিশেষ কতকগুলো ধারণা নিয়েই এই বইটি পড়েছি। এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, বইটি পড়ার পরে আমার সমস্ত ধারণা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। কেন, তা বলা দরকার। যে যোলটি গল্প এই সংকলনে ছাপা হয়েছে তার যে-কোনো একটিকে নতুন রীতির গল্প

বলে গ্রহণ করলে অন্য পনেরোটিকেই নতুন রীতির গল্প নয় বলে বাতিল করতে হয়। সম্পাদকের ভূমিকা থেকে জানা গিয়েছে যে তিনি এই সংকলনের জন্যে লেখা বাছাই করেন নি, বাছাই করেছেন লেখক। এবং তাঁর ধারণা—"এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই লেখকদের নিজস্ব শিল্প স্বভাব এবং কর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে," ইত্যাদি। অর্থাৎ, সম্পাদকের কাছে এই ষোলজন লেখকই তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষত্ব মণ্ডিত। অথচ পাঠক হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, এই ষোলজন লেখকের মধ্যে একমাত্র মিল এই যে এঁরা গত অর্ধদশকের মধ্যে লিখতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াচ্ছে যেন এই যে নতুন রীতির গল্পলেখক বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের সাহিত্যপ্রচেষ্টায় মিল লক্ষণগত নয়, কালগত। নইলে এই সংকলনে "সাবেকী" রীতিতে লেখা অতি-সরল ও অতি প্রকট রকমের উদ্দেশ্য-প্রবণ 'ফানুস' গল্পটি কি-ভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জানি না।

নতুন রীতির গল্পলেখকরা তাঁদের রীতি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে যা-কিছু বলেছেন তার সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে বাছাই করতে হলে এই সংকলনের একটিমাত্র গল্পই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। সেটি হচ্ছে দেবেশ রায়ের 'দুপুর'। এই গল্পটিতে কোনো কাহিনী নেই। আছে একটি দুপুর আর যতীনবাবু নামে চল্লিশোত্তর এক ভদ্রলোকের পুরো একটি সংসার। আর আছে দু-আনার ব্যাঙ বেহালার ধ্বনি। গল্পের পাঁচজন মানুষের চিন্তাভাবনায় এই দুপুর পাঁচটি বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে আর ব্যাঙ বেহালার সুরে মূর্ত হয়ে উঠছে পাঁচজন মানুষের অনেক চাওয়া ও যন্ত্রণা। যতক্ষণ এই দুপুর আর যতক্ষণ এই বেহালার সুর—ততক্ষণই এই পাঁচজন মানুষ আশ্চর্য এক ভাবনাবৃত্তে দোলায়িত হতে থাকে। এই দুপুর আর এই বেহালার সুর যেন মধ্যবিত্ত জীবনের অচরিতার্থ আশা ও অপূর্ণ কামনার প্রতীক। আর এই কারণেই "মাটির বেহালাটা নিজের ছোট দেহটাতে পাগলের মতো ঝড়ো সুরের আওয়াজ এনে বিদীর্ণ হয়ে, থেমে যাবার আয়োজন করছে যেন। ঝড়ের সঙ্গে লড়ছে যেন চড়ুই পাখি। হঠাৎ একটা ট্রামের জান্তব আওয়াজে মাটির বেহালার সুরটা নেমে গেল।" আর তখন পাঁচজনেরই মনে হতে লাগল, "বাড়ির কোনো এক খ্যাপা সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে, প্রতিদিনই তার আসার আশা, কোনোদিনই সে ফেরে না।" তারপরেই দুপুরটা ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে যায়।

এই গল্পটিকে যদি নতুন রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায় তাহলে নতুন রীতি সম্পর্কে আস্থাশীল হওয়া চলে। গল্পে কোনো কাহিনী নেই, কোনো সাস্‌পেন্‌স্‌ বা সারপ্রাইজ বা সিচুয়েশন নেই, এমনকি বলতে গেলে চিরাচরিত ধরনের আরম্ভও নেই বা শেষও নেই। শুধু পরিবেশ-রচনা ও চিন্তাপ্রবাহের মাধ্যমে যে এমন একটি বাস্তবকে এমনভাবে পরিস্ফুট করা চলে, তা এই গল্পটি না পড়লে বোঝা যাবে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি আশঙ্কার কথাও ব্যক্ত করতে হয়। পাঠক হিসেবে যতদূর কল্পনা করতে পারি, এ-ধরনের গল্পকে গল্পের নিজস্ব পরিমণ্ডল তৈরির জন্যেই খুব সম্ভবত মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী হতে হবে। অন্তত দেবেশ রায়ের যে-ক'টি গল্প আমি পড়েছি তাতে এর ব্যতিক্রম নেই। আর মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী গল্প অনিবার্যভাবেই গল্পের পরিসরকে সংকীর্ণ করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো বা সব গল্পকেই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে থাকে। প্রবাহমান জীবনকে, যে-জীবন রাজপথের মিছিলে সামিল হয় বা ময়দানে দাঁড়িয়ে লড়াই করে, তার প্রচণ্ডতা ও অমিতবিক্রমকে এ ধরনের গল্পে আনা যাবে কিনা তা এখনো দৃষ্টান্তসাপেক্ষ। হতাশা, ব্যর্থতা, ক্লীবতা, বা এ-ধরনের নঙর্থক দিকগুলোই যেন এ-ধরনের গল্পের মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় ভালো'। কলকাতার গত খাদ্য-আন্দোলন নিয়ে লেখা দু-একটি নতুন রীতির গল্প পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোনো গল্পেই খাদ্য-আন্দোলনের সেই বজ্র-নির্ঘোষ নেই। সেখানে অনেক মাজাঘষা করে ও পালিশ দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে মিনমিনে আওয়াজটুকু বার করা হয়েছে তা শোনার পরে খাদ্য-আন্দোলনের শহিদদের জীবনদান অকারণ বলে মনে হয়।'

এমনকি দেবেশ রায়ের মতো লেখকও 'দুপুর'-এর মতো গল্প সম্ভবত এই একটিই লিখেছেন। পরবর্তী কালের লেখা তাঁর যে-কটি গল্প আমি পড়েছি তার কোনোটিই 'দুপুর'-এর শিখর স্পর্শ করতে পারে নি। খুব সম্ভবত তা সম্ভবও নয়। এ-ধরনের গল্প কয়েকটি লেখা হবার পরেই লেখকের আর নতুন করে কিছু বলার থাকে না। আর সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালের বাস্তবতাকে প্রকাশ করার প্রকরণকে যাঁরা আয়ত্ত করেছেন বলে দাবি করেন তাঁদের নিশ্চয়ই চাষীমজুরের জীবন নিয়েও কিছু লিখতে হবে। নতুন রীতিতে চাষীমজুরের জীবন নিয়ে গল্প রচনা সম্ভব কিনা তা এখনো দৃষ্টান্তসাপেক্ষ।

একটু আগে যে বজ্রনির্ঘোষের কথা বলেছি তাকে যদি আক্ষরিক অর্থে

ধরতে হয় তাহলে গল্পের যে কি পরিমাণ দুর্দশা ঘটে তার একটি দৃষ্টান্তও এই সংকলনে আছে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'কোনো এক লেখক বন্ধুকে'। রীতির দিক থেকে এই গল্পটিতে নতুন কিছু আছে কিনা আমি ধরতে পারিনি। উত্তমপুরুষে পত্রাকারে লেখা এই গল্পটিতে পুরোপুরি একটি গল্পই বলা হয়েছে। কিন্তু তাকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে অগ্নিবর্ষী একটি বক্তৃতার মধ্যে। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় যে লেখক আশঙ্কা করছেন, পাঠক তাঁর গল্পের সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। ফলে গল্পের প্রতি লাইনের পরে তাঁকে প্রচণ্ড স্বরে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর সত্যিকারের ভালো গল্প আমি পড়েছি বলেই দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলো লিখতে হল। জানি না এই অতি-সরব হুংকার নতুন রীতির কোনো লক্ষণ কিনা। তা যদি হয়ে থাকে তবে এই রীতি তিনি যত তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করবেন ততই মঙ্গল।

আরো একজন শক্তিমান লেখকের ক্ষেত্রে এই নতুন রীতি দুর্লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছে বলে আমার ধারণা। তিনি হচ্ছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংকলনে তাঁর যে গল্পটি ছাপা হয়েছে সেটির নাম 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। এ-যুগের একজন তরুণ ও একজন তরুণীর গল্প। এক বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু কলকাতার ঊর্ধ্বশ্বাস ও রুদ্ধশ্বাস জীবন তাদের বিবাহিত জীবন-যাপনের সুযোগটুকুও দেয়নি। এই গল্পে পুরোপুরি একটি গল্প আছে, তার শুরু আছে বিস্তার আছে শেষ আছে, এমনকি শেষের দিকে অপ্রত্যাশিত একটি চমক পর্যন্ত আছে। অর্থাৎ গড়নের দিক থেকে পুরোপুরি "সাবেকী"। আর যদি পরিবেশনের দিক থেকেও তাই হত তবে এটি অনায়াসেই একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হতে পারত। কিন্তু এই গল্পটিতে এমন কয়েকটি নতুন-রীতি-সুলভ টুইস্ট আছে যেখানে পাঠককে হোঁচট খেতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

" 'আচ্ছা, আমি যদি চিৎকার করে লোক জমিয়ে বলি, এই যে দেখছেন ভদ্রমহিলা—ইনি আমার ধর্মপত্নী, তাহলে ?'

'পাগল বলে ধরে নিয়ে যাবে, এই আর কি।'

'তাহলে তো বেঁচে যাই।' কাঞ্চন হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারল না। রেখা ঠোঁট চেপে প্রশ্ন করল, 'আহা, অ্যাজমাটা আবার মাথাচাড়া দিল ?' কাঞ্চন বলল, 'জান, এই কথার খেলা সত্যি আর ভাল লাগে না।' রেখা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।"

রেখা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। এই ছোট্ট লাইনটির মধ্যে কাঞ্চন ও রেখার বঞ্চিত জীবনের যন্ত্রণাকে যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। এবং লেখক যদি এখানেই থামতেন তাহলে বোধ হয় ভালো হত।

কিন্তু তারপরেই আছে কাঞ্চনের বিপুল এক চিন্তাপ্রবাহ। এই চিন্তা-প্রবাহে সমাজ সংসার ও পৃথিবী সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারপরে শেষদিকে—"এ-যুগের নিয়তিই হল বাল্য এবং প্রৌঢ়তা—মধ্যিখানে বিশাল চড়ায় ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা, ভাললাগা ও কর্তব্যের বিরোধে আমরা পোকার মতো গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি—অথচ সামনে সমুদ্র ছিল। হায় রে সমুদ্র। নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়, রেখাকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়। আর পুঁথি থেকে তার সমর্থন খুঁজছি। আহ্, ফুলগুলি যেন আর পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার পুঞ্জিত নীরবতা। পুঞ্জিত, নীরবতা, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য। ফুটুক না ফুটুক। বসন্ত। আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। এই নিরালায়। আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে। দিনে দিনে অর্ঘ্য মম। দিনে দিনে রূপবতী হবে পৃথিবী। দিনে দিনে, দিনের পর রাত্রি। কিন্তু রাত্রির পর? রাত্রির পর?"

এই কথার পিঠে কথা সাজিয়ে যাওয়া আর টুকরো টুকরো কবিতার লাইন —এসব কেন? গল্পের পক্ষে এই লাইনগুলো কি অপরিহার্য? বরং আমার তো মনে হয়, গল্পের ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাঞ্চনের মানসিক যন্ত্রণার যে রূপটি ফুটে উঠেছে এবং তার ফলে পাঠকের সংবেদনশীলতায় যে সুরটি বেজে উঠেছে, এই লাইনগুলো সেখানে স্থূল হস্তক্ষেপ। অমলেন্দু চক্রবর্তী যেমন ভাবছেন যে বক্তৃতা দিয়ে পাঠকের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলবেন, দীপেন্দ্রনাথ তেমনি ভাবছেন যে কথার ফুলঝুরি দিয়ে পাঠকের কল্পনাকে দেদীপ্যমান করে তুলবেন। আসলে দুজনে যা করছেন তার ফলে পাঠকের সামনে অবরোধের প্রাচীর উঠছে মাত্র।

অথচ দীপেন্দ্রনাথের গল্পে এই কথার খেলাটুকুই নতুনত্ব। নইলে যে গল্পটি তিনি বলেছেন এবং যে-ভাবে বলেছেন, তা "সাবেকী" রীতির অনুসারী। এবং আমার নিজের ধারণা, পুরোপুরি একটি "সাবেকী" গল্প হলেই বোধ হয় গল্পটি দাঁড়াত।

আরো একটি খুব মোটা কথা আছে। এ-যুগের একটি তরুণ বিয়ের এক বছরের মধ্যেও বৌয়ের হাতে একবারটিও হাত রাখেনি, অথচ প্রায়ই

তারা একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে—এর ফলে ঘটনাটি যত না ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে তার চেয়েও বেশি লজ্জাকর। অন্তত দীপেন্দ্রনাথ এই গল্পে কাঞ্চনের জন্যে এমন একটুখানি শক্ত মাটি রাখেন নি যেখানে দাঁড়িয়ে সে এই তারুণ্যের লজ্জা থেকে বাঁচতে পারত।

আরো একটি কথা আছে। দীপেন্দ্রনাথের এই গল্পটি এবং অন্যান্য অনেক গল্পই একটিমাত্র চরিত্রের চোখ দিয়ে দেখা। উত্তম পুরুষে গল্প লেখার যেমন একটি সীমাবদ্ধতা আছে—এক্ষেত্রেও তাই। গল্প সাবজেক্টিভ হয়ে ওঠে। এই গল্পে কাঞ্চনের জায়গায় আমি এলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। চর্যাপদের হরিণীর অধিকাংশ গল্প সম্পর্কেও এই একই কথা। খুব সম্ভবত এই কারণেই উত্তমপুরুষে লেখা গল্পের মতো এসব গল্পেও লেখক নিজে কখনো প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন নি।

মতি নন্দী ও বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে নতুন রীতির লেখক কেন বলা হয় আমি জানি না। এই সংকলনে মতি নন্দীর 'চোরা ঢেউ' ও বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তোপ' গল্প দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমার তো মনে হয়, এই গল্প দুটি নতুন রীতির মূর্তিমান প্রতিবাদ। দুটি গল্পই চিত্রধর্মী, দুটি গল্পেই বিশেষ এক-একটি পরিবেশে একদল মানুষকে দেখানো হয়েছে। পুরোপুরি রক্তমাংসের মানুষ এবং সেই কারণেই তাজা ও সজীব। আর গল্প লেখার যে-ভঙ্গি আয়ত্তে থাকলে পাঠককে আচ্ছন্ন করা যায়—এই দুজন লেখকই তা আয়ত্ত করেছেন বলে মনে হয়, কারণ এই গল্প দুটি পড়ার সময়ে গল্পের রীতি নিয়ে মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। তবে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে তোপটি যদি আরেকটু সজীব হত তাহলে এই গল্পটি একটি স্মরণীয় গল্প হতে পারত বলে আমার ধারণা। মতি নন্দী সম্পর্কেও একটি বলার কথা আছে। পরবর্তীকালে তাঁর আরও গল্প আমি পড়েছি। আমার মনে হয়, তাঁর সম্পর্কে এই আশঙ্কার কারণ ঘটেছে যে তিনি এই চোরা ঢেউতেই আটকা পড়ে গিয়েছেন। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাঁর চলাফেরা। আরো ভালো গল্প লিখতে হলে তাঁকে এই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এই সংকলনের তরুণতম লেখক দিব্যেন্দু পালিত। কিন্তু 'দুঃসময়' নামে তাঁর যে গল্পটি পাওয়া যাচ্ছে তাতে অল্প বয়েসের ছাপ নেই। এমনি আরেকটি পরিণত গল্প শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আমার মেয়ের পুতুল'। এই দুজন লেখকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থাশীল হওয়া চলে।

সোমনাথ ভট্টাচার্যের 'হাউই' গল্পটি পড়ে বোঝা যায় যে এই গল্পের লেখক ক্ষমতাবান। পরিবেশ রচনার দিকে তিনি খুবই মনোযোগী এবং গল্পের বক্তব্যকে খুবই স্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে পারেন। এঁকে নতুন রীতির লেখক বলা হয় কিনা আমি জানি না। অন্তত 'হাউই' গল্পে নতুন রীতির কোনো ছাপ নেই। এঁর সম্পর্কেও আমরা আশা পোষণ করতে পারি।

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য নানা পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক। এই সংকলনে তাঁর 'প্ল্যাটফর্মের গল্প' পাওয়া যাচ্ছে। এই গল্পটিতে নতুন রীতি কিছু আছে কিনা আমি বুঝতে পারিনি। তবে উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে লেখা এই গল্পটিতে কোনো নতুনত্ব নেই। যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের লেখা আরো ভালো গল্প আমি পড়েছি।

বরং রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর' গল্পটি উদ্বাস্তু-জীবনের এক গভীর ক্ষতমুখের দিকে আরো স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। অবশ্য গল্পটি পড়ে মনে হয়, লেখকের দৃষ্টি যেন একটি আতসকাচের মধ্যে দিয়ে তার চরিত্রের ওপরে গিয়ে পড়েছে। ফলে চরিত্রের বিশেষ একটি মানসিকতা এত মস্ত হয়ে ফুটে উঠেছে যে অন্য সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সেইটুকুই প্রধান। তবুও দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বের জন্যে এই লেখক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'নকল নক্ষত্র' গল্পটি একটি দুরূহ প্রচেষ্টা। এই গল্পে একই মানুষের দুই সত্তাকে হাজির করে মানবিক সম্পর্কের কয়েকটি মৌলিক ধারণাকে যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে। লেখকের একটি স্পষ্ট বক্তব্যও আছে। গল্পটি সম্ভবত নতুন রীতির—একপাশের আমির সঙ্গে অন্যপাশের আমির পরিচয়। কিন্তু লেখকের দৃষ্টি চরিত্রের যতখানি গভীরে পৌঁছতে পারলে এ-ধরনের পরিচয় সার্থক হয়ে উঠতে পারে এ-গল্পে তার অভাব আছে। তবে লেখকের বয়স খুবই কম এবং এ-গল্পে তিনি যতখানি কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা চলে যে ভবিষ্যতে তিনি সার্থক পরিণতি অর্জন করতে পারবেন।

এই সংকলনে আরো কয়েকটি গল্প আছে যে-সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করাটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে বলে মনে হচ্ছে। খোলাখুলি স্বীকার করছি, আমি ভালো বুঝতে পারি নি। যোগ্যতর কোনো সমালোচক এ-দায়িত্ব পালন করবেন আশা করি।

স্তালিনের পরে

ননী ভৌমিক

শ্রীযুক্ত বোফ্‌ফা ইতালির নামকরা কমিউনিস্ট দৈনিকপত্র 'উনিতা'র বৈদেশিক সম্পাদক। ১৯৫৩ সাল থেকে পাঁচ বছর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে কাটিয়ে গেছেন উনিতার মস্কো সংবাদদাতা হিসেবে। স্তালিনের মৃত্যুর ঠিক পরেকার সেই কটা বছর তাঁর চোখে দেখা—যা নিয়ে অমন ভাবনা, পুনর্ভাবনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিহ্বলতাও দেখা দিয়েছিল বিশ্বের সোভিয়েত জিজ্ঞাসুদের মনে। কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের একটা দূরাগত সোরগোল পটচ্ছিন্ন সংবাদের অসংলগ্নতায় এবং ওদেশটা সম্পর্কে ধারাবাহিক অপরিচয়ের কুয়াশায় যে না-বোঝাব—এমনকি ভুল বোঝার সৃষ্টি করেছিল, সেটা আজ চারবছর পরে স্তিমিত বোধ হলেও, মনে হয় না কেটেছে। সকলেই এটুকু জেনেছেন যে একটা মোড় নিয়েছে ওরা। কিন্তু সেটা ঠিক কী, কেন, এবং কোন্‌দিকে—তার খবর নয় বোধ—এটা সুলভ নয়। থেকে থেকে দয়েৎসারের কাগুজে হুজুগে রোমাঞ্চিত হয়ে যাঁরা অনেক ঠকেছেন তাঁদের কাছে তাই বোফ্‌ফার বইটি* ভারী মূল্যবান মনে হবে। আমার কাছে তো আরো বেশি, কারণ বোফ্‌ফা যেখানে শেষ করেছেন, সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় সেখান থেকে শুরু। এবং আমার নিজের মনে পরের কয় বছরে যে দাগটা পড়েছিল, সানন্দে দেখা গেল সেটা মূলত বোফ্‌ফার কার্ডের সঙ্গে মিলতে বাধা পাচ্ছে না। যাঁরা বেছে বই পড়তে চান তাঁদের জন্য প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এঁকে ভরসা করা চলে। মস্কোর বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে এঁর মতো এত ঘুরেছেন, এত দেখেছেন সম্ভবত আর কেউ না। নিজের সাক্ষ্যে জানি, শুধু বিদেশী সাংবাদিক মহলে নয়, ওপক্ষের মহলে অর্থাৎ রাশিয়ার সরকারী প্রেস ডিপার্টমেন্টেও এঁর সত্যবাদিতা কতটা শ্রদ্ধেয় ছিল।

কিন্তু তার মানে অবশ্যই এই নয় যে বোফ্‌ফার সব উক্তি সমান গ্রাহ্য।

---

* Guiseppe Boffa: **Inside the Khrushev Era.** George Allen & Unwin. 25 sh.

কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সে দাবি করা সম্ভব নয় এবং বোফ্‌ফা নিজেও তা জানেন। জানেন বলেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের পালটা ধারণা পেশ করলেও তা নিয়ে কালক্ষেপ করেন নি, সেটাকেই বক্তব্য করে তুলতে চান নি। বরং তাঁর নিজস্ব মন্তব্যটাকে প্রতিক্ষেত্রে একটা মুক্ত প্রশ্ন হিসাবে ছেড়ে দিয়ে তিনি সব জোর দিয়েছেন সেই সব মূল কথাগুলোকেই খোলসা করতে, যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি একমত। যেমন গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে সোভিয়েত নির্বাচনপদ্ধতির কথায় এসে তাঁর ঝোঁক হয়েছে এই প্রশ্ন তোলার, সোভিয়েত ইউনিয়নে একক প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতির এখনো কি দরকার আছে? তাঁর ধারণা এমন নির্বাচনপদ্ধতি সম্ভব যাতে গণতন্ত্র আরো বিকশিত হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ উত্তর দিতে ভোলেন নি যে সে পদ্ধতি ঠিক কী হবে, আরো বেশি সংখ্যক নামের সুপারিশ, তল থেকে প্রার্থীদের আরো খুঁটিয়ে বিচার ইত্যাদি, তা "only the Soviets can decide." এবং সত্যিই তারা decide করছে। সম্প্রতি প্রাভদায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির যে খসড়া কর্মসূচি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আরো নানা কথার মধ্যে অতি স্পষ্ট করে এই নির্বাচনপদ্ধতির কথাটিও তোলা হয়েছে। কর্মসূচির তৃতীয় ভাগ 'রাষ্ট্র কাঠামো ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অধিকতর বিকাশের ক্ষেত্রে' প্রথম অংশ 'সোভিয়েতসমূহ এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতির বৃদ্ধি' শিরোনামায় পড়া গেল: "জনপ্রতিনিধিত্বের রূপ (forms) নিখুঁত করা ও সোভিয়েত নির্বাচন পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক নীতি বাড়িয়ে তোলা অপরিহার্য বলে পার্টি গণ্য করছে।" কী ভাবে? নির্বাচনের আগে সংবাদপত্রে এবং নির্বাচকদের সভায় প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও অন্যান্য গুণাবলীর বিচার ও সমালোচনাকে আরো ব্যাপক ও সর্বদিকব্যাপী করে। দ্বিতীয়ত প্রতি নির্বাচনের সময় পূর্বতন সোভিয়েত সভ্যদের অন্তত এক তৃতীয়াংশের জায়গায় নতুন লোক এনে। অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত একক প্রার্থী পদ্ধতি বদলের কথা ওরা ভাবছে না।

অর্থাৎ খুঁটিনাটিতে বিকাশটা বোধহয় হুবহু ঠিক তেমন নয় যা হলে বোফ্‌ফা পুরোপুরি খুশি হতেন, কিন্তু মূল ব্যাপারে বিকাশটা অবশ্যই হুবহু ঠিক সেই পথেই, যা চার বছর আগের অভিজ্ঞতায় বোফ্‌ফা গভীরভাবে আশা করেছিলেন।

একক প্রার্থী পদ্ধতির কথা বোফ্‌ফা তুলেছিলেন প্রসঙ্গত, কিন্তু ইংরেজ

প্রকাশকরা বইয়ের জ্যাকেটে তার বিশেষ উল্লেখ করেছেন স্বধর্মেই, কারণ বহুকাল যাবৎ সোভিয়েত গণতন্ত্রকে এই বলেই আক্রমণ করা হয়ে এসেছে ও হচ্ছে যে সেখানে অন্য দেশের মতো দু-তিনটি নয়, নির্বাচনে মাত্র একটিই প্রার্থী দাঁড়ায়। স্বভাবতই এ প্রশ্নের আলোচনা একটি পৃথক প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে। ইতিমধ্যে শুধু এইটুকু বলে রাখা যেতে পারে যে নির্বাচনের যে শেষ ধাপটায় আমরা একক প্রার্থীকে দেখি, সেটা শেষ ধাপ মাত্র, আমাদের দেশের মতো একক এমনকি সর্বপ্রধান ধাপও সেটা নয়। আসলে ওদেশে নির্বাচনের মূল কাজটা হয়ে যায় প্রার্থী মনোনয়নের মাধ্যমে। একটা নির্বাচনী এলাকায় দাঁড়াবার জন্য বিভিন্ন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করে কোনো ব্যক্তি নয়—বিভিন্ন সংগঠন, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন বা কারখানার সাধারণ সভা বা পার্টি কমিটি ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার হয় সাধারণ সভায়। ছোট সভা, বড় সভা, প্রতিনিধিত্বমূলক সাধারণ সভা ইত্যাদিতে যোগ্যতা বিচার ও সমালোচনার পর একটি প্রার্থীর নাম রাখা হয়, যে সর্বোত্তম। তারপর ভোট গ্রহণের দিন যে ভোট নেওয়া হয় সেটা আসলে তখন আর নির্বাচন নয়, মূলত এক ধরনের রেফারেণ্ডাম—বিভিন্ন সাধারণ সভা থেকে শেষ পর্যন্ত যে একটি লোকের নাম বেরিয়ে এল তাকে অধিকাংশ লোক সমর্থন করছে কিনা তার যাচাই মাত্র। সকলেই জানেন শতকরা নিরানব্বুইয়েরও বেশি লোকে ভোট দিয়ে তাদের সমর্থন জানান, তাতে শুধু এই প্রমাণ হয় যে সাধারণ সভাগুলি, সংগঠনগুলি জনসাধারণ থেকে কত অবিচ্ছিন্ন ; মাঝে মাঝে, কয়েক বছর আগে সত্যিই কোনো কোনো নির্বাচনে কোনো কোনো প্রার্থী শতকরা ন্যূনতম ভোট (শতকরা ৭০) পান নি। তাতে কী বোঝা গেল ? বোঝা গেল একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ সভা ও সংগঠনগুলির প্রার্থী মনোনয়নে ভুল হয়েছে। বেশ কিছু লোক তা পছন্দ করছেন না। এসব কেন্দ্রে ফের নতুন করে নির্বাচন হয়েছিল। বলা বাহুল্য ও-পদ্ধতি স্বভাবতই গড়ে উঠেছে সেখানে, যেখানে একটির বেশি রাজনৈতিক দল নেই, এবং সোভিয়েত দেশে রাজনৈতিক দল শুধু যে একটি তার কারণ সে দেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশ—অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলই আগে বা পরে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কার্যক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়েছে ; দ্বিতীয়ত তার সমাজ, কারণ বিভিন্ন দল থাকা সম্ভব শুধু পিছনে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকলে।

কিন্তু আগেই বলেছি, এ প্রশ্ন শুধু প্রসঙ্গত। বোফ্‌কার বইয়ের প্রধান আকর্ষণ অন্যত্র—২০তম কংগ্রেসের মূল ধারাটিকে ঐতিহাসিকভাবে হাজির করায়, তার পৌর্বাপর্য অনুধাবনে। সিধে কথায় তাকে বলা যেতে পারে স্তালিন-প্রসঙ্গ।

যুদ্ধের আগে থেকেই এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পরে সোভিয়েত দেশে এমন কতকগুলি ব্যাপার দেখা যেতে থাকে যা সমর্থনযোগ্য নয়। তার মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ঘটনা হল কারাবাস, নিপীড়ন, প্রাণদণ্ড, হঠাৎ এক-একজন লোকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ও তার সম্পর্কে আর কিছুই না শোনা—পার্টি ও সরকারের উচ্চপদস্থ অনেকেই যার কবলিত হন। পরে প্রকাশ পেয়েছে কতকগুলি ক্ষেত্রে এ দণ্ডদান সঠিক হলেও অনেক ক্ষেত্রে বহু নিরপরাধ আত্মবলি দিতে বাধ্য হয়েছে। দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন কেননা অনাচারের যূপকাষ্ঠে উৎসর্গিত ও পরে সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কিছু বিখ্যাত নাম অনেকেরই জানা। বোফ্‌কা নিজেও তাঁর পরিচিত দুয়েকজনের যে কাহিনী জানিয়েছেন তার দীর্ঘ অঙ্ক দুঃসহ নাটক আলোড়িত করার মতো। তার কারণ পীড়নের তীব্রতা ততটা নয়, যতটা এই নৈতিক জ্বালা যে নির্যাতনটা শত্রুর কাছ থেকে নয়, এসেছে সমাদর্শীদের কাছ থেকেই। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন বোফ্‌কা। সে যুগে গ্রেপ্তারের পর ভাগ্য ক্রমে কয়েক সপ্তাহ বাদে তিনি ছাড়া পেয়ে পান। স্তালিন তাঁকে বলেন, "রাগ করবেন না, বিপ্লবী হিসাবে আমি জীবনে ছয়বার গ্রেপ্তার হয়েছি, কয়েদ খেটেছি।" ইনি উত্তর দিয়েছিলেন, "সে কথা সত্যি, কিন্তু আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল জারের পুলিস, সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমায় গ্রেপ্তার করে আমাদেরই রাষ্ট্র। বলবই যে সেটা একেবারে অন্য ব্যাপার।"

যুদ্ধের আগে থেকেই কিছুটা এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পরেকার এই পীড়নাধিক্যের কথা শুনলেই ত্রৎস্কি বা কোয়েসলারকে মাফ করে দেবার প্রশ্ন আসে না। বরং স্তালিনের অন্যতম বৃহৎ কৃতিত্বই এই যে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রামে একান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রৎস্কির লেনিন-বিরোধী নীতি ও কার্যক্রমকে পরাস্ত করে সত্যিসত্যিই সমাজতন্ত্রের বনিয়াদকে পাকা করে দিয়েছেন তিনিই, তাঁর পরিচালনা। বুখারিনদের বিচারও অন্যায্য নয়, যদিও, বোফ্‌কা বলছেন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগটায় কেউ গুরুত্ব

দেন না। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে বহু কৃতী সামরিক জেনারেল ও পার্টি কর্মীর উচ্ছেদ (যুদ্ধের প্রথম অবস্থার বিপর্যয়ের তা একটা কারণ), যুদ্ধের পরে ১৯৪৮ সালের পর থেকে ফের স্বৈরাচারী দমনের পর্ব—এগুলি ঘটনা, ও সমর্থনীয় নয়। প্রশ্ন উঠবে, কে দায়ী? অনেক ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বেরিয়া দায়ী। কিন্তু শুধুই কি বেরিয়া? যে কথা ব্যক্তিগতভাবে কারো কারো মনে হলেও সচেতনভাবে কেউ ভাবতে সাহস করে নি, নির্যাতিত হয়েও বহুক্ষেত্রে একান্ত বিশ্বাসেই প্রতিকারের আবেদন গেছে যার কাছে, সেই স্তালিনের ভূমিকা বিচারে কিভাবে শেষ পর্যন্ত একটু একটু করে পৌঁছতে হয়েছে সোভিয়েত নেতা ও কর্মীদের। এবং বলতে হয়েছে, দায়ী ব্যক্তি-পূজা।

কিন্তু সমাজতন্ত্রে এমন ব্যাপার আদৌ ঘটতে পারল কী করে? এ প্রশ্ন না তুলে এগুনো যায় না। বোফ্‌কা এক্ষেত্রে চীনা কমিউনিস্টদের দার্শনিক বিশ্লেষণের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা দেখান, সমাজে বিরোধ আছে দু-রকমের, একটা বৈর-বিরোধ, আর একটা জনগণের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ বিরোধ। বৈর-বিরোধ আপোসহীন—সাম্রাজ্যবাদকে, গৃহযুদ্ধকে, ফ্যাসিস্ট আক্রমণকে সোভিয়েত যেভাবে অতিক্রম করেছে সেটা বৈর-বিরোধ নিরসনের পথ। যতদিন সাম্রাজ্যবাদী আবেষ্টনী ও দেশের অভ্যন্তরে বৈরশ্রেণী বা অংশ বিশেষ বর্তমান, ততদিন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৈর-বিরোধের আবির্ভাব হতে পারে ও তা নিঃসার্থে নির্মম দমনে মার্কসবাদীর আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে যখন বৈরশ্রেণীর অস্তিত্ব নেই, তখন জনগণের মধ্যেকার যে কোনো বিরোধকেই বৈর-বিরোধ নিরসনের পদ্ধতিতে সমাধান করতে যাওয়া ভুল। এই ভুল হয়েছিল স্তালিনের শেষদিককার আমলে, যে ভুলকে স্তালিন তত্ত্বে পরিণত করে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রাম বাড়তেই থাকবে।

বোফ্‌কা এই প্রসঙ্গে সোভিয়েতের ইতিহাস অনুসরণ করে দেখিয়েছেন, কীভাবে মূল গতি, মূল বিরোধের ক্ষেত্রে স্তালিন-পরিচালনায় পার্টি ও সোভিয়েত দেশ নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয় অসম্ভব হত যে নিঃসন্দেহ বৈষয়িক ভিত্তি ছাড়া—তার নির্মাণে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে, বৈজ্ঞানিক শক্তির সংহতি গঠনে সোভিয়েত দেশের কৃতিত্ব তর্কাতীত এবং তাতে স্তালিনের উজ্জ্বল ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় বিরোধের লক্ষণ আগাগোড়াই প্রকাশ পেয়ে এসেছে এবং তা নিরসনের স্তালিন পদ্ধতি প্রথম দিকে অনিবার্য বলে মানলেও ক্রমেই ক্ষতিকর এবং পরিশেষে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়। কতটা বিপজ্জনক, তা বোঝা গেছে গত যুদ্ধের প্রথম দিকটায়। যে পশ্চাৎপসরণকে নেপলিয়ন-কালের কুতুজভী পদ্ধতি বলে একটা ব্যাখ্যা গড়ে নেওয়া হয়েছিল সেটা যে আসলে কত এলোমেলো ও সর্বনাশা, তাব উল্লেখ করে বোফ্ফা বলেছেন, তবু যুদ্ধের মতো একটা ব্যাপারে বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের যৌথ প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল এবং স্তালিনের ভ্রান্তি থেকে চূড়ান্ত ক্ষতি হয়নি সেই কারণেই।

বিংশ কংগ্রেসে এই যেসব ঘটনা ও তথ্য আচমকা একসঙ্গে প্রকাশ পায় তার অপ্রস্তুত বিস্ফোরণে অনেকে হতভম্ব বোধ করেছেন। অথচ প্রশ্নটা বিবাদ বা মোহভঙ্গের নয়, বাস্তব কিছু ঘটনাকে বোঝার। কেউ কেউ ঢালাও রায় দিয়েছেন, এ সব ঐ ব্যবস্থারই দোষ। "বরং এই ব্যবস্থাই আমাদের বাঁচিয়েছে।" বোফ্ফাকে জবাব দিয়েছিলেন জনৈক সোভিয়েত সাংবাদিক। সোভিয়েত পার্টি ও জনগণের অভাবিত সাফল্যে এবং আরো কিছু নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির যোগাযোগে অনবধানে ব্যক্তিপূজা গড়ে উঠতে থাকলেও সামাজিক গতির অন্তর্বিধ একটা ধারা বারে বারে জানানি দিয়ে এসেছে। আজ সোভিয়েত দেশ যে দিকে মোড় নিয়েছে, তা আকস্মিক একটা ঘটনাচক্র নয়, তার উপকরণ জমে উঠছিল; জমে উঠতে পেরেছিল এই ব্যবস্থার সুবাদেই। ঠিক যে সময় পীড়নাধিক্যের শুরু ঠিক সেই সময়েই যে নতুন সোভিয়েত সংবিধান পাশ হয় (স্বয়ং স্তালিনেরই রচনা) তাতে গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষাকবচ অর্জিত হয় জনগণের জন্য। যুদ্ধের আগেই পার্টি কংগ্রেসে জ্দানভ পীড়নাধিক্যের প্রশ্ন তুলে তা বন্ধের প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন। এগুলি কি ঐ অন্তধারার প্রতিফলন নয়?

অবশ্যই মৃদু প্রতিফলন এবং যুদ্ধের ভেতর ও যুদ্ধের পরে স্তালিন পূজা এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছিল যে বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে তা আর একেবারেই খাপ খাচ্ছিল না। স্তালিন যদি না মারা যেতেন—এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, কারণ ইতিহাসের কারবার "যদি" নিয়ে না, "যা"—তাই নিয়ে। মোট কথা, বিংশ কংগ্রেসেই প্রথম নয়। স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকেই এই নতুন মোড় নেওয়া কার্যক্ষেত্রে শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'দুই নির্ধারক বছর' পরিচ্ছেদে

বোফ্‌ফা ধারাবাহিক বিবরণে দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রথম শুরু হল কৃষি পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা ও নতুন অনাবাদী জমি হাশিলের ডাক, সংস্কৃতিক্ষেত্রে আলোড়ন, 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় ক্রমেই প্রকাশ পেতে থাকল পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ওপর জোর, এবং অতঃপর পূর্বতন নির্যাতিতদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মালেনকভের পদত্যাগ, উর্ধ্বতন কমিটিতে মলোতভের সঙ্গে মতবিরোধ ও আন্তর্জাতিক নীতিতে নতুন ঝোঁক, কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই (১৯৫৫) অধিবেশনে মলোতভের প্রকাশ্য বিরোধিতা ও পরাজয়, শিল্পের অসন্তোষজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও রিপোর্ট—কোনো সন্দেহ নেই যে নতুন ধারাটা নতুন কায়দায় ধীরে ধীরে জয়ী হয়ে উঠছিল ও এগুচ্ছিল একটা সুনির্দিষ্ট আকারের দিকে।

বিংশ কংগ্রেসকে সে কাজ করতে হয়। খ্রুশ্চভের রিপোর্ট যেভাবে ও যে-ভাষায় প্রকাশিত হয় সেটা বোফ্‌ফার কাছে রুচিকর না ঠেকলেও তিনি এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে সে সময়টা সে পরিস্থিতিটা একটা একান্ত অবজেকটিভ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের সময় নয়—মূলত সেটা একটা সংগ্রামের রিপোর্ট, তার আঁকাড়া কোণগুলো যদি যথেষ্ট গোল না হয়ে থাকে তবে সেটা শুধু বোধগম্য না, সে অবস্থায় সম্ভবতঃ অনিবার্য।

এ বিস্ফোরণে শত্রুপক্ষ সানন্দে আশা করেছিল এবং মিত্রজনের সভয় আশঙ্কা ছিল রাশিয়ায় এবার একটা ওলটপালট হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পার্টির প্রতি স্তরে আলোচিত হয়, সত্যি কথাগুলো খোলাখুলি বলা হয়, একই সাধারণ পার্টি কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দেন পক্ষ প্রতিপক্ষ—এবং যাঁকে লোকে প্রায় দেবতা করে তুলেছিল তাঁকে মানুষ বলে পুনর্গ্রহণ করার আত্মিক যন্ত্রণা যতই হোক, জয়ী হল জীবন ; প্রায় বিনা-ভূমিকম্পে লোকে যে বিংশ কংগ্রেসকে মেনে নিতে পারল তার কারণ সোভিয়েতের মানুষ পেছন দিকে ততটা তাকায় না যতটা তাকাতে অভ্যস্ত সামনের দিকে এবং এই নতুন নীতিটাই নতুন যুগকে, নতুন জীবনকে প্রতিফলিত করতে পারছিল নিঃসন্দেহে।

আর একটা নতুন যুগ—পুরনো পঞ্জিকায় যা আঁটাছে এমন একটা নতুন পর্যায় যে সারা বিশ্বে এসে গেছে তার তাত্ত্বিক চেতনা পরে আরো সম্পূর্ণ হয়েছে ৮১ পার্টির দলিলে, এবং সম্প্রতি প্রকাশিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে।

এই প্রসঙ্গে খ্রুশ্চভের ব্যক্তিগত গুণাগুণের কথা না উঠে পারে না। পুরনো বহু জমকালো নামের বদলে কোথা থেকে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত এই অসুন্দর মজুরটি প্রতিনিধি হয়ে উঠল এই নতুন ধারার? উত্তরে একটা গল্প শুনুন। একটি সেলে আটক ছিল একজন সমাজতান্ত্রিক, একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট; একজন কমিউনিস্ট ও একটি বেঁটে ইহুদী। মাঝে মাঝে খাবারের প্যাকেট এলে তা সারা সপ্তাহ ধরে ঠিক হিসেব করে লোককে বেঁটে দেওয়ার মামুলী কাজটা নানা অজুহাতে কেউ নিলে না। অগত্যা সে ভার পড়ল বেঁটে ইহুদীটির ওপর। ইতিমধ্যে সকলে মিলে পালাবার জন্যে একটি সুরঙ্গ খুঁড়লে। কিন্তু কে আগে বেরুবে সুরঙ্গ দিয়ে, কেননা বেরলেই প্রহরীর গুলিতে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। এবারেও ভার পড়ল বেঁটে ইহুদীর ওপর। এবং এই ইহুদীটিই খ্রুশ্চভ। স্বভাবতই এটা গল্প, যদিও খ্রুশ্চভের নিজের বলা গল্প—কিন্তু একটা সত্যি এতে আছে। স্তালিন-পূজার কুফল সম্পর্কে অনেকেরই চেতনা এবং নতুন যুগের নতুন প্রয়োজন সম্পর্কে একটা ভাবনা থাকলেও ঝুঁকি নিয়ে লড়াইয়ের সামনে দাঁড়ান খ্রুশ্চভই। তাঁর এই একটা মস্ত সুবিধা ছিল যে তিনি রাজধানীতে ঘাঁটি গেড়ে আমলা-তান্ত্রিক লাল ফিতায় কখনো জড়াবার সুযোগ পান নি। তাছাড়া পশ্চিমী সাংবাদিকরা যা দেখে অনেক সময় অবাক হন, লোকটা কথা বলতে ভালোবাসে খুব, এবং আজীবন ও এখনো পর্যন্ত সোভিয়েত দেশের নানা অঞ্চলের নানা লোকের সঙ্গে কথা বলাবলি করার অপূর্ব সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক দ্বীপবেষ্টিত রাজধানী ও পার্টি শীর্ষের ভারিক্কি কামরায় যা সহজে পৌঁছত না, সোভিয়েতের সেই জীবন্ত বাস্তব সমস্যা, প্রশ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই লোকটি ছিল ওতপ্রোত—তাছাড়া, সংগঠনের এমন প্রতিভা ও উদ্যম, সাম্প্রতিক ইতিহাসে বোধ করি খুব বেশি দেখা যায় নি। তাই, অতি মার্জিত কানে খ্রুশ্চভের আলাপ সর্বদা মার্জনীয় বোধ না হলেও, ঈশ্বর করুন, দুনিয়ার মোড়ল মাতব্বর থেকে শুরু করে মুটে মজুর পর্যন্ত সর্বজনের সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করার এই নেশাটা যেন ভদ্রলোকের না কাটে, এই আশা করেছেন বোফ্‌ফা।

বিংশ কংগ্রেসের পর চার বছর কেটেছে। এই চার বছরে সোভিয়েত দেশে ভূমিকম্প হবার বদলে সোভিয়েত দেশই ভূমিকম্প জাগিয়েছে সারা বিশ্বে। রকেট, স্পুৎনিক, গাগারিন, তিতভ—এ সব কথা উচ্চারণও আজ

বাহুল্য। তবু চার বছর আগে যেখানে মস্কোর লোকজনের সঙ্গে খ্রুশ্চভ প্রসঙ্গে কখনো নীরবতা, কখনো বিহ্বলতা বা বিরাগ লক্ষ্য করেছি আজ চার বছর পরে যদি ঠিক উল্টো অভিজ্ঞতা হয়, খবরের কাগজে প্রকাশিত খ্রুশ্চভের মুতসই এক একটা উক্তি নিয়ে যদি মেট্রোর গোটা বেঞ্চের লোকদের উল্লসিত হতে দেখি, "সাঁচচা মুঝিক" বলে স্বতঃস্ফূর্ত বাহবা শুনি সাধারণের, তবে তার কারণ শুধু ঐ বৈজ্ঞানিক বাহাদুরিই নয়—কারণ দেশাভ্যন্তরে এই চার বছরে এমন কতকগুলি সংস্কার, যার তাৎপর্য বাইরে তত স্পষ্ট নয়—যেমন চাষের পুনর্বিন্যাস, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, স্কুলের নবায়ন এবং সব দিক দিয়ে জীবনের একটা নতুন হাওয়া। খ্রুশ্চভ আজ সোভিয়েত মানুষের কাছে ভারী প্রিয়।

কিন্তু, প্রশ্ন করবেন উন্নাসিক, নতুন ব্যক্তিপূজার শুরু নয় কি তা? এখনো পর্যন্ত বলতে পারি, না, যদিও ওদেশে সাংবাদিকতার বিশেষ ধরনটা আমার কাছে সব সময় নিখুঁত ঠেকে না। কিন্তু তবু, না—কারণ মূর্তি-পূজক শিবের মূর্তি ভাঙলেও চণ্ডী মূর্তি গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু মূর্তি পূজাকেই যদি ভাঙা হয় তবে তৃতীয় দেবতার আগমন সহজ নয়। এবং আশা করি, না—কারণ সম্প্রতি পড়লাম কজলভ প্রস্তাবিত ওদের পার্টির খসড়া গঠনতন্ত্রের সংবাদ। ব্যক্তি পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যৌথ নেতৃত্ব বজায় ইত্যাদি কথা ভুলে যাবার বদলে যতখানি সম্ভব সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থাই তা পড়ে দেখছি। এবং কিছুতেই না, কারণ সংবিধানই সব নয়—রাষ্ট্র প্রশাসনে ক্রমশই অধিকাংশ জনগণের অংশ গ্রহণই সর্বোত্তম গ্যারাণ্টি। এটা এক দিনের ব্যাপার নয়, নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সংগ্রামের ব্যাপার। এ সংগ্রাম যে ক্রমেই অবারিত হচ্ছে সে বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতায় আমি নিশ্চিত।

তাই খটকা লাগে, স্তালিন আমল সংজ্ঞা হিসাবে বাতিল হবার পরও বোফ্‌ফা কি সাংবাদিক চাঞ্চল্যপ্রিয়তার লোভেই বইটির নাম দিলেন খ্রুশ্চভ আমল?

একটি অভিনন্দনযোগ্য বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুকাল থেকে 'সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড' সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের ওপরে কয়েকটি মৌল গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তাঁদের এই সাধু প্রচেষ্টার ফসলরূপে অন্তত চারখানি ভালো বই আমরা হাতে পেয়েছি। যেমন বিমলকৃষ্ণ সরকারের 'কবিতার কথা', অজিতকুমার ঘোষের 'নাটকের কথা', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমালোচনার কথা' এবং সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'শিল্পতত্ত্বের কথা'। দেবীপদ ভট্টাচার্যের আলোচ্য বই 'উপন্যাসের কথা' এই তালিকায় আর একটি মূল্যবান্ যোজনা*।

উপন্যাস সাহিত্যের যে বিপুল ইতিহাস বেকার অর্ধেক জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে রচনা করে গেছেন, কিংবা যে বিরাট প্রয়াস রেখে গেছেন সেণ্ট্‌স্‌বেরি—সম্ভবত প্রকাশকের নির্ধারিত্র পত্র-সংখ্যার শাসনেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করা দেবীপদবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও—চল্‌তি প্রশস্তির ভাষাতে নয়—বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের দীর্ঘদিনের একটি অভাব 'উপন্যাসের কথা' অনেকখানি মোচন করল এ-কথা সানন্দে জানানো চলে।

হোমারের মহাকাব্য থেকে যাত্রা শুরু করে, আর্থারিয়ান রোমান্স আর 'আইস্‌ল্যাণ্ডিক সাগরে' পথ বেয়ে—মধ্যযুগীয় মূরবিজয় এবং প্রাচ্য-সাহিত্যের প্রতিফলনে—গিয়োভানি বোক্কাচ্চিয়োরও একশো বছর আগে কেমন করে ইতালীয়ান 'নভেলা'র অঙ্কুরে ইয়োরোপে কথা-সাহিত্য জন্ম নিল, সে ইতিহাস যেমন সুবিশাল তেমনি অসম্পূর্ণ গবেষণায় এখনো কুয়াশাচ্ছন্ন। তাই সঙ্গতভাবেই দেবীপদবাবু রেনেসাঁস যুগের অন্যতম সমুচ্চ চূড়া ফ্রাসোঁয়া র‍্যাব্‌লেই-কে দিয়েই তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। মানুষ সম্পর্কে যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ এবং পীড়নকারী শাসনশক্তি যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতি উদ্যত অভিযোগ রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ, উপন্যাসের প্রথম বাস্তব-ভিত্তি নিঃসন্দেহে তারই ওপরে গড়ে উঠেছিল। বোক্কাচ্চিয়োর নভেলা

* উপন্যাসের কথা। দেবীপদ ভট্টাচার্য। সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড।

সম্পর্কে কিছু পরিচিতি থাকলে মুখবন্ধটি হয়তো আর একটু স্পষ্ট হত, তবু র‍্যাবলেই থেকে যাত্রারম্ভ মোটের ওপরে শোভন হয়েছে বলা যায়।

তারপর ইংরেজী, ফরাসী ও রুশ সাহিত্যের ধারায় মূলত উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উপন্যাসের যে পরিচিতি লেখক রচনা করেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত অধ্যয়ন এবং মননশীলতার ফল। এত অল্প আয়তনের মধ্যে এই ব্যাপক আলোচনা প্রাণহীন নামপঞ্জী এবং লেখকপঞ্জীতে পরিণত হওয়ার বিপজ্জনক সম্ভাবনা ছিল। লেখকের সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুসমঞ্জস জাগ্রত বুদ্ধি সেই দুর্বিপাক ঘটতে দেয় নি। কোনো যুগের বা কোনো কালের সাহিত্য-সৃষ্টিই যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস নিরপেক্ষ নয়, তা যে যুগ-মানসের অপরিহার্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শস্য, এই দ্বান্দ্বিক সত্যটি সম্পর্কে লেখক পূর্বাপর সচেতন ছিলেন। তাই 'রোক্সানা' এবং 'মোল ফ্ল্যাণ্ডার্স'-এর সামগ্রিক তাৎপর্যটি তিনি সঠিকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। "Honesty is out of the question when starvation is the cause"—রোক্সানার এই স্পষ্টোক্তি অথবা নিজের অপরাধের সমর্থনে মোল ফ্ল্যাণ্ডার্সের হাহাকার : "Vice came in always at the Door of Necessity"—ইংরেজী উপন্যাসের প্রাগুষায় জীবনধর্মী এই শিল্প-পদ্ধতির মর্মকথা এদের মধ্য দিয়ে যে-ভাবে উচ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, দেবীপদবাবু সে নির্দেশ বিস্মৃত হন নি। রেস্টোরেশন, ফরাসী-বিপ্লব আর চার্টিস্ট্ আন্দোলনকে পটভূমিতে রক্ষা করে, মানবতা এবং প্রগতির মানদণ্ডে সারভাঁতেস্ থেকে অস্কার ওইয়াইলড্ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যের একটি স্বল্পরেখ অথচ প্রাণস্পন্দিত বিচার ও বিবৃতি তিনি উপস্থিত করেছেন। সুনির্বাচিত বিশিষ্ট গ্রন্থের বিশ্লেষণে তাঁর আলোচনা হৃদ্য হয়ে উঠেছে।

বাংলা উপন্যাসের আদি-পর্বও মূল্যবান। উপেক্ষিত 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'কে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি সৎসাহসী সত্য মন্তব্য প্রকাশ করেছেন (যেমন 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম' প্রসঙ্গে—পৃঃ ১৭৬-৭৮), বাংলা কথা-সাহিত্যে ব্রাহ্ম-সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করে রেখেছেন (পৃঃ ১৯৪)।

আধুনিক উপন্যাসের পরিচিতিতে লেখক একটু নিষ্করুণ। এই অংশের স্বল্পায়তন আমাকে পীড়া দিয়েছে। বোধ হয় পত্রসংখ্যার সীমাবদ্ধতাতেই আরিয়া রেমার্ক বাদ পড়েছেন, এরস্কিন কল্ড্ওয়েল্ আলোচিত অথচ

'লোনিগান'স্রষ্টা ফ্যারেল বর্জিত, হেন্‌রি মিলার, স্তেফান ৎস্বইগ্‌, আর্নল্ড ৎস্বইগ্‌ এবং ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কার সন্ধান পাই না—বুনিনের আলোচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ বই 'The Well of Days' অনুল্লিখিত। প্রসঙ্গত মনে পড়ল তুর্গেনেভের প্রসঙ্গে 'রুদিন'ও এইভাবে বাদ পড়েছে—অথচ চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে বোধহয় বাজারভের পাশেই রুদিনের স্থান। সার্ত্রের ত্রি-গ্রন্থের তৃতীয় বইখানিকে আমরা ইংরেজী অনুবাদে 'Iron in the Soul' নামেই পড়েছি, 'Troubled Sleep' নামে কি তার অন্যতর অনুবাদ হয়েছে ?

কিন্তু এগুলি নিছক খুঁটিনাটি মাত্র। দেবীপদবাবুর মূল্যবান গ্রন্থটির গুরুত্ব এতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। সাধারণ বাঙালী পাঠক তাঁর আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব-সাহিত্য সমুদ্রের গর্জন শুনবেন এবং সেই সমুদ্র অবগাহনে তাঁদের আগ্রহ জাগবে। তত্ত্বানুরাগীর পক্ষে বইখানি 'Ready Reference'-এর ভূমিকা নেবে এবং ছাত্রেরা এর সাহায্যে প্রভূত উপকৃত হবেন। স্বচ্ছ সাহিত্যিক ভাষায় এবং সুস্থ বলিষ্ঠ বিচারবুদ্ধিযোগে 'উপন্যাসের কথা' রচনা করে দেবীপদ ভট্টাচার্য সমগ্র বাঙালী পাঠকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন।

এই বইখানিতে তাঁর যে শ্রমশীলতা, পাণ্ডিত্য ও রসবোধ লক্ষ্য করা গেল, তাতে অতঃপর তাঁর কাছে উদারতর কোনো প্রকাশকের সহযোগিতায় একখানি অকুণ্ঠ বিস্তৃত বই আমরা নিশ্চয়ই দাবি করতে পারি।

ভাদ্র। ১৩৬৮

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দুর্গাদাস সরকার

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

কমলেশ সেন

সুশংকুমার মুখোপাধ্যায়

অরূপ বসু

বিমল চক্রবর্তী

শিবশম্ভু পাল

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মজুমদার

শচীন বসু

কজ্জল সেন

জ্যোতির্ময় বসু

সম্পাদক

গোপাল হালদার। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্র **সূচীপত্র** ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩১ ; সংখ্যা ২
ভাদ্র, ১৮৮৩ ; ১৩৭৮

টমাস মানের শেষ প্রবন্ধ

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

'কেমন করে বাঁচতে হবে, সভ্যতার এই মূল প্রশ্ন তো আসলে সমাজপটে ব্যক্তিমানুষের স্থান নির্ধারণেরই ব্যাপার। সমাজের বহুবিধ সম্বন্ধেই তো মানুষ বাঁচে, নিজের সঙ্গে অপরের, পরিবারের, গোষ্ঠী এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধপাতের সমস্যাই তো সভ্য মানুষের সকল প্রকার জিজ্ঞাসার মূল। এই সমস্যাকে আয়ত্ত করার চেষ্টার পরিণাম বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক তথা সমগ্র অস্তিত্বের শৃংখলা, প্যাটার্ন নিরূপণে।

ঐতিহাসিক নিয়মেই প্রতিটি যুগে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পুরনো প্যাটার্নের বিরোধ দেখা দেয়, কারণ তাতে মানবচৈতন্যের বিকাশের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে আসে, নিছক অভ্যাসের জের টানায় মনের মুক্তি মিলতে পারে না। তাই পুরনো প্যাটার্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায়, পুনর্বিচারে, আত্মোপলব্ধির সংঘাতজর্জরিত প্রয়াসে জীবনের নতুন ছক নির্মাণ। ভাঙাগড়ায়, অস্তিত্বের নতুন তাৎপর্য অন্বেষণে—সভ্যতার এই জটিল প্রক্রিয়ায়ই ব্যক্তিস্বরূপ তার যথার্থ প্রতিষ্ঠা-ভূমি খুঁজে পায়। দেশকালের সম্পর্কবিহীন তথাকথিত নিরংকুশ স্বাধীন মানুষের বাসা শুধু উদ্ভট, উৎকেন্দ্রিক কল্পনায়।

শিল্পসাহিত্যের স্তরে সভ্যতার এই প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি অবশ্যই জটিল হয়ে ওঠে। বিশেষত আধুনিক যুগের বহুধাবিভক্ত জীবনে অনিশ্চয়তাকেই সত্য এবং সমাজ ও ব্যক্তির গূঢ় ঐক্যের সমস্ত আবেগ প্রত্যয়কে মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। জীর্ণ সমাজের দেউলেপনায় কোনও ভবিষ্যতের স্থিরতায়

শিল্পী যদি মনকে বাঁধতে না পারেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অধিকার আমাদের থাকে কিনা, এ প্রশ্ন অনেকের কণ্ঠে শোনা যায়। সমাজ ধ্বসে পড়ছে, মানুষকে ধরে রাখার কেন্দ্রাতিগ শক্তি তার নেই, আধুনিক সভ্যতার পতনদশায় ইয়েট্‌স্‌-এর সেই বিখ্যাত মর্মোৎসারিত আর্তিই কি অনিবার্য নয়—

> Mere anarchy is loosed upon the world,
> The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
> The ceremony of innocence is drowned ;
> The best lack all conviction······

ইয়েট্‌স্‌ অবশ্য এখানেই থামেন নি, বেথেলহেম্‌-এ শিশুটির আবির্ভাবের মতোই আমাদের ক্ষয়দশায় আর একটি দিব্য প্রকাশের স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু অনেক শিল্পীর কাছেই তো সেটা অর্থহীন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই তো আমরা দেখেছি, কোনও কোনও কবি সাহিত্যিক সভ্যতা সম্বন্ধে আস্থা খুইয়ে অসম্বদ্ধতাকেই মেনে নিয়েছেন অমোঘ দুর্বোধ্য অদৃষ্টরূপে। তাঁদের মতে, গ্যেটের আলোকপিপাসা এখন অসম্ভব, একটি পথই শুধু আছে, সে পথ সূর্যের নয়, হিমশীতল অন্তহীন অন্ধকারের, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে শুধু হীন মৃত্যুর অশুভ চীৎকারই বুকে বাজে। জীবন বিচ্ছিন্ন কলাকৈবল্যের আত্মরতিতেই কেউ কেউ মুক্তি খুঁজেছিলেন। কিন্তু ক্ষণকালের মুক্তিও মেলে নি, আত্মক্ষয়ের গ্লানিই শুধু কপালে জুটেছে। প্রচণ্ড আক্রোশে নিষ্ফলতার ক্ষোভে শত্রু ভেবেই জীবনকে তাঁরা পরিহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ রামের মতোই বৈরী, শিল্পের মিনারকে নিশ্ছিদ্র করে তোলার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কঠিন প্রতিশোধ নিয়েছে। কেউ কেউ তো অবশেষে এই দ্বন্দ্ব সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাই করেছিলেন।

মহৎ শিল্পীদের উদাহরণ থেকেই জানি, জীবনের সমগ্রতার আস্তিক্য-বোধেই সমস্ত দ্বিধা সংশয় দ্বন্দ্বের যথার্থ রূপ ধরা পড়ে। সুস্পষ্ট সমাধান না মিলুক, আর সেটা অসুস্থ ভারসাম্যহীন সমাজে হয়তো খুব প্রত্যাশিতও নয়, কেমন করে বাঁচতে হবে এই প্রশ্নের মানবিক তাগিদই আমাদের আশ্বস্ত করে। সেই প্রশ্নের সততায়ই একটি রুগ্ন মানুষের প্রবল যন্ত্রণা আমাদের সমগ্র জীবনেরই রূপক হতে পারে। সাহিত্যে বিশ্বাসেরও সরলীকরণ চলে না।

টমাস মানের গল্পে উপন্যাসে অসুস্থ মানুষকেই দেখেছি বিভিন্ন চেহারায় এবং পটভূমিতে : বাইরে জীবনের সচল প্রবাহ, কিন্তু ভেতরে মৃত্যুর নিষ্ঠুর জীবাণু নিঃশব্দে ফুসফুস কুরে কুরে ক্ষয় করে চলেছে কি দিন, কি রাত্রিতে। অথচ অদৃষ্টের ট্র্যাজিক বিড়ম্বনায় সুস্থ মানুষদের তুলনায় জীবনের বোধ এত তীক্ষ্ণ, উৎসুক যে বাইরের হাসি গান স্বাস্থ্যপুষ্ট পেশীর চেকনাই তার সমস্ত স্নায়ুতে রক্তে চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীপকের আগুন জ্বালায়। ভাবতে অবাক লাগে, এই যন্ত্রণা ডি. এইচ্. লরেন্সের মতো মমতাবান শিল্পীকেও বিমুখ করে তুলেছিল। নিজস্ব মেজাজ রুচিতে মেলেনি বলেই লরেন্স টমাস মানের প্রতি কিছুটা অবিচারই করেন। ফ্লোবেয়ারের অস্বাস্থ্যবিলাসের সঙ্গে তুলনায়ই বোঝা যায়, মানের ব্যাধি-যন্ত্রণার অন্তর্লীন তাৎপর্য বোঝার ধৈর্য তাঁর হয়নি। তবে ১৯১৩ সালে এই জার্মান শিল্পীর ওপর তরুণ লরেন্সের প্রবন্ধটি লেখার সময় তাঁর রচনাবলীর অল্প কয়েকটিই প্রকাশিত হয়েছিল। এখন এই লেখকের মহত্ত্ব আমাদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট।

মানের আশেনবাখ্, স্পিজেল, টোনিও ক্রোগার, হান্‌স্ ক্যাস্টর্প্ প্রভৃতি চরিত্রগুলি সকলেই অসুস্থ। একালের আত্মসচেতন মানুষের যে ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার নেই, তাকে তিলে তিলে শরীরে ও মনে পুড়তেই হবে। কিন্তু ব্যাধি নিয়ে তাৎপর্যহীন নিঃসঙ্গতার বিলাস মান করেন নি, তাঁর ব্যাধির বিষমন্থনে জীবনের শুদ্ধতার অন্বেষণই লক্ষণীয়। টোনিও ক্রোগার গল্পটিই ধরা যাক। টোনিও বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারেই জন্মেছিল, কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হল। সে ভেসে বেড়াতে লাগল জীবনের এক তট থেকে আর এক তটে, গার্হস্থ্যজীবনের সুখশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। শিল্পের চর্চায় টোনিও তার স্বাস্থ্য শক্তি সব খোয়ায়, তার পরিবর্তে পায় জীবনকে দেখার, বোঝার প্রজ্ঞাদৃষ্টি। কিন্তু এর ফলে অপরদিকে দুঃসহ যন্ত্রণার পাকে পাকে জড়িয়ে যায় তার সমস্ত অস্তিত্ব। ঐ প্রজ্ঞার জগৎ থেকে তো তাকে মাঝে মাঝে নামতেই হয়, রক্ত মাংসের জীবনের দাবী তখন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। হৃদয়ে অপর একটি হৃদয়ের ভালোবাসার জ্বালাহর স্পর্শ নেই, যাকে অপরের জীবন পর্যবেক্ষণ করতে হয় তার ভালোবাসার অবকাশ কোথায়! তাই নিছক দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্যেই তাকে লালসার নরকে আশ্রয় নিতে হয়, তারপর সমস্ত শরীর মনে সেই ব্যভিচারের বিষজ্বালা। একদিকে শুদ্ধতার মানবিক আগ্রহ, অপরদিকে এই অসুস্থ জীবনের অসঙ্গতি,

এই টানাপোড়েনই কি শিল্পীর অদৃষ্ট? জীবনের রূপ ফোটাতে গিয়ে নিজের জীবনকে পোড়াতে হবে তার মতো অভিশাপ আর কি আছে!

আমরা দেখি, টোনিও ক্রোগাবের চৈতন্যে এই দীপকের জ্বালা এসে মেশে মল্লারের অশ্রুতে। তার মরুভূমির মতো তাপদগ্ধ শুষ্কজীবনে জলের কান্না যে কিভাবে লুকিয়ে ছিল, বিদেশে একদা যারা বাল্যবন্ধু এবং বান্ধবী ছিল, তাদের যৌবনোদ্ধত শরীর মনের উচ্ছ্বাস দেখে বুঝতে পারে। ওদের হাসি গান নাচে হৈহুল্লোড়ে অসংকুচিত প্রবৃত্তির আদিম স্বাস্থ্য প্রায় চোরের মতো আড়ালে দাঁড়িয়ে টোনিও দেখে ভাবে, জ্ঞানের সমস্ত বিড়ম্বনা এবং সৃষ্টির যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে ঐ সহজ জীবনকে যদি ধরা যেত, ঐ আনন্দোচ্ছল তরুণীটি যদি তার স্ত্রী হত, আর একটি সন্তান পেত, ঐ বন্ধুটির মতোই অমন সবল, স্বাস্থ্যদীপ্ত! ওদের জান্তব সত্তায় মন নেই, তাই একটি তৃষ্ণার্ত মনের দীর্ঘশ্বাস এত কাছে থেকেও ওরা শুনতে পায় না। টোনিও ক্রোগারও নিজেকে উদ্ঘাটিত না করে আড়াল থেকেই তার ঘরে চলে যায়। শুধু বোঝে, জীবনের এই অসঙ্গতিতে সহজের প্রতি অন্তর্বাহী মানবিক আকর্ষণই একজন সাহিত্যজীবীকে কবি করে তোলে। এ যুগের খণ্ডিত অস্তিত্বের পটে আত্মসচেতনতার, বুদ্ধি এবং হৃদয়ের সেতুবন্ধনের জন্য এমন মর্মান্তিক ব্যাকুলতার রূপ সত্যি দুর্লভ।

এই প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় নতুন করে পাওয়া গেল টমাস মানের শেষ প্রবন্ধাবলীর সংকলনে। সভ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা যে কত গভীর ছিল এই শিল্পীর জাগ্রত মননে, প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই সে প্রমাণ মেলে। শীলার, গ্যেটে, নীট্‌সে এবং চেখভ্‌-এর ওপর চারটি রচনাই মনন ও হৃদয়সংবেদ্যতার গভীরতায় আমাদের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে।

কাণ্টের দর্শনে প্রভাবিত হলেও শীলারের শিল্পীমন তাঁর দ্বৈতবাদে সায় দিতে পারে নি। কাণ্টের মতে, দৃশ্যমান সাধারণ আবেগ অনুভূতি এবং সর্বোচ্চ ন্যায়—মানুষ এই দুটো জগতের অধিবাসী। দৃশ্যমান জগতের কার্য-কারণশৃংখলায় সর্বোচ্চ ন্যায়ের হস্তক্ষেপের ফলেই মানুষের নৈতিক সত্তার উদ্ভব। কবির দৃষ্টি শুধু দৃশ্যমান জগতে নিবদ্ধ থাকে বলেই এই ন্যায়বিধৃত প্রকৃত সত্তা তার কাছে অপ্রকাশিতই থেকে যায়। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে

মানুষের সত্তার এমন দ্বিখণ্ডীকরণ গ্রহণীয় নয়, সমস্ত দ্বন্দ্ব অসঙ্গতিতেই মানুষ ও জগতকে ঐক্যের সমগ্রতায় বাঁধাই তো তার অন্বিষ্ট। স্বভাবতই আধুনিক সভ্যতার বিশৃংখলা শীলারকে ভাবিয়েছিল, সৌন্দর্যের সাধনায়ই তিনি জীবনের ভারসাম্য খুঁজেছিলেন। সৌন্দর্যের প্রাণই তো সামঞ্জস্য: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, ইন্দ্রিয়জবোধ আর নীতিচেতনা, ইন্দ্রিয়নির্ভর দেশকালে সীমিত, অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব এবং অনন্ত আকাশ-সন্ধানী বিশুদ্ধ সত্তা—শুধু শিল্পীর সৌন্দর্যের এষণায়ই তো এই দ্বৈত এক বিচিত্র সমন্বয়ে মেলে। শীলারের 'দি আর্টিস্ট্স্' কবিতাটিতে শিল্পের সেই সমন্বয়ের প্রশস্তির সূত্রে এই সামঞ্জস্যবোধই প্রকাশিত হয় স্তোত্রের সারল্য এবং গাম্ভীর্যে।

সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় এবং শিল্পসৃষ্টিতে এই পূর্ণতাকে শীলার অন্বেষণ করেছিলেন কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠায়, সহৃদয় বিশ্লেষণে টমাস মান আমাদের দেখান। ব্যাধিজর্জর শরীরের সমস্ত স্নায়ু বারবার অবসন্ন হয়ে আসে, মাঝে মাঝে উত্তেজক নেশায় নিজেকে চাঙ্গা করে নিতে হয়, তারপরেই গভীর অবসাদে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তবু জীবনের শিল্পরূপায়ণ বিষয়ে শীলারের মন আশ্চর্য সজীব, সচল। 'দি মেড্ অফ অর্লিন্স্'-এর ভূমিকায় তিনি বিষয় ও তার রূপারোপ সম্বন্ধে লেখেন, বিন্যাসের কোনও নির্দিষ্ট ধারণায় শিল্পীকে আবদ্ধ থাকলে চলবে না, প্রতিটি নতুন বিষয়বস্তুর জন্যে সাহসের সঙ্গেই নতুন আধার আবিষ্কার করতে হবে, রচনারীতি নিরূপিত হবে বিষয়বস্তু অনুসারেই। যে-কালে রোমান্টিক মত্ততার লক্ষণ বেশ ভালোভাবেই দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, সে-সময় বিষয়ের এই চেতনা লক্ষণীয়। মান ঠিকই বলেন, শীলারের 'আকাশনীল' আদর্শবাদের গতানুগতিক প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও আমরা বুঝি, মহৎ শিল্পী হিসেবেই তাঁকে প্রত্যক্ষ-জীবনের দিকে তাকাতে হয়েছিল। মান-এর মতে, 'রিয়ালিজ্ম্' শীলারের মহত্ত্বের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ, আর 'রিয়ালিজ্ম্' হচ্ছে জীবনের সঙ্গে মোকাবেলা করার শক্তি, সাহস এবং সংকল্পের একাগ্রতা। এখানেই হোয়েল্ডার্লিন্, যিনি তাঁকে কিছুকাল অভিভাবকস্থানীয় বলে মনে করতেন, তাঁর সঙ্গে এই শিল্পীর কবিস্বভাবের পার্থক্য। বাস্তবজীবনের সংঘাতে হোয়েল্ডার্লিন্ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, আত্মকেন্দ্রিক আবেগের তীব্রতায় আশ্রয় খোঁজেন, যাকে মান সঙ্গত কারণেই 'উন্মত্ততা' আখ্যা দেন। শীলার

নিজেই তো হোয়েল্ডার্‌লিন্‌ সম্বন্ধে বলেছেন, এই কবির জীবন নিজের মধ্যেই গুটিয়ে গেছে, সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের সেতুবন্ধনের ক্ষমতা তাঁর নেই।

শীলার যখন উনিশ বছর বয়সে মিলিটারি অ্যাকাডেমির ছাত্র, তখন কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে অতি সংগোপনে তাঁর প্রথম নাটক 'দি রবার্‌স্‌' রচনা করেন। তরুণ লেখকের যন্ত্রণা আর অপমানবোধের প্রবল আবেগে সে-যুগের সমস্ত অত্যাচার আর মেকি সমাজের ক্লেদাক্ত দিকগুলো এই রচনায় বলিষ্ঠ রূপ পায়। পরবর্তী কালের অন্যতম প্রধান রচনা 'ডন্‌ কার্লোস্‌'-এর কাব্যগৌরব পনরো বছর বয়সেই তাঁর মনে কিভাবে ভাষা সম্বন্ধে প্রবল আবেগ উদ্দীপিত করে, মান তার প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। একই সঙ্গে আত্মবিক্রীত সমাজের প্রতি কঠিন বিদ্রূপের ধিক্কার আর মহত্ত্বের তৃষ্ণা এই নাটকে প্রকাশিত। মান-এর মতে, শীলার এমন এক কবি যিনি স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই মহত্ত্বের আবেগে আমাদের চোখ দিয়ে জল ঝরাতে পারেন।

কাব্যের গুণকে ক্ষুণ্ণ না করে কিভাবে জনসাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করা যায়, একটি সমালোচনায় সে সম্বন্ধে শীলারের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, জনপ্রিয়তার লক্ষ্য আসলে শিল্পকর্মকে সহজ করে তোলার পরিবর্তে কঠিনই করে এবং সে দুরূহ পরীক্ষায় সাফল্য প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। জনসাধারণের হৃদয়ে বিভিন্ন আবেগের স্রোত প্রকাশের পথ খুঁজে মরে, যে কবি যথাযথ প্রকাশের সঙ্গেই তাদের শুদ্ধ, মহৎ রূপ দিতে পারেন, তিনিই জনসাধারণের আবেগ অনুভূতির প্রতিভূ। 'হ্বিলহেল্ম টেল' নাটকে শীলার নিজেই শিল্পকর্মের এই দুরূহতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত পরিণামে তিনি বিতৃষ্ণা বোধ করেছিলেন, কিন্তু জাতীয়তা ও স্বাধীনতার চেতনার ঐক্যসূত্র হিসেবে পরোক্ষভাবে তা তাঁর আবেগের স্বাভাবিক পটভূমি ছিল। 'হ্বিলহেল্ম টেল'-এ তার ছায়াপাত স্পষ্ট বলে সেযুগে কেউ কেউ রচনাটিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি, আর হিটলারি আমলে তো সেটি নিষিদ্ধই হয়।

শীলারের কবিকৃতির বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সঙ্গে গ্যেটের বন্ধুত্বের যে বিবরণ মান-এর কাছে থেকে পাই তাও কম আকর্ষণীয় নয়। এই বন্ধুত্ব সম্পর্কে একথা সুবিদিত যে গ্যেটের মহত্ত্ব স্বীকার করে নিলেও এবং তাঁর

ভালোবাসার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে শীলার সব সময়েই সচেতন ছিলেন। সেজন্য দুঃখও তাঁকে কম পেতে হয় নি। এই রুগ্ন লোকটির প্রতি বিপুল জীবনীশক্তির অধিকারী গ্যেটের হয়তো একটু অনুকম্পাই ছিল। শীলারের তুলনায় তাঁর ব্যবহার ছিল অপেক্ষাকৃত নিরুত্তাপ। ঠিক মতো প্রতিদান না পেয়ে অসুস্থ মানুষটি ছটফট করেছেন, ভেঙে পড়েছেন। তবে এই সম্পর্ক তাঁর নিজের দিক থেকেও যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বন্ধুর মৃত্যুর পর গ্যেটে অকুণ্ঠচিত্তেই স্বীকার করেন।

মৃত্যুর কিছু পূর্বে লেখা 'ডেমিট্রিউস' নাটকে বিশ্বাসভঙ্গ এবং মিথ্যাচারের ভয়াবহতা এমন তীব্রতায় প্রকাশিত যে টমাস মানের মনে হয়, শীলারের নিজস্ব রচনারীতি অপেক্ষা এর সঙ্গে যেন ক্লাইস্টের সাদৃশ্যই বেশি। ক্লাইস্টের মেজাজেই তো এই বীভৎস নিষ্ঠুরতা খাপ খায়। রচনাটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মান বলেন, নিজের ওপর আস্থা এবং মানবিকতায় বিশ্বাস যে শিল্পীর কাছে এত মূল্যবান, তিনিই যখন প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসহানির এই তীক্ষ্ণ নাটক লেখেন, তখন বুঝতে হবে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভয়াবহ কিছু আছে। আর নাটকটির রচয়িতা তো ঐ বিপজ্জনক চেতনা এবং তৎসঞ্জাত দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুরতার বিষয়টিকে আয়ত্ত করতে গিয়ে জীবনের শেষ শক্তিটুকুকে ব্যয় করে মৃত্যুর কাছেই আত্মসমর্পণ করেন। প্রবন্ধের লেখক অবশ্য প্রসঙ্গটিকে ছুঁয়ে যান মাত্র, এই নাটকের পশ্চাতে কবির কোন্ আত্মিক সংকট তথা সভ্যতার সমস্যা ছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন না বলে আমাদের আক্ষেপই থেকে যায়।

তবে এর পরে যে অকল্পনীয় কষ্টে, নিজের অসুস্থ শরীরকে প্রায় ধ্বংস করে শীলার সাহিত্যকর্ম করে গেছেন, তার উল্লেখ অবশ্যই আমাদের হৃদয় স্পর্শ না করে পারে না। 'ডেমিট্রিউস' রচনার অল্প কিছুকাল পরেই কবির মৃত্যু হয়, তারপর শবব্যবচ্ছেদে দেখা গেল, বাঁদিকের ফুসফুসটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট ; হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, মূত্রাশয় শরীরের প্রায় প্রত্যেকটি অংশ গুরুতর ভাবে জখম। তাঁর ক্ষয়প্রাপ্ত স্নায়ুগুলোয় যে নিদারুণ পীড়ন গেছে, এই বিবরণ থেকেই অনুমান করতে পারি।

শেষ বিচারেই দেখা যায়, এই ব্যক্তিটি নিজের ব্যাধি এবং সেই সঙ্গে সভ্যতার অসুস্থতাকে অতিক্রম করার চেষ্টায়ই রত ছিলেন। তাই গভীর

শ্রদ্ধায় একালের আর এক জীবনানুসন্ধিৎসু শিল্পীকে বলতে শুনি, যিনি নিজের ব্যাধিকে জয় করেছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে কান দিলে আমাদের এই ব্যাধিগ্রস্ত যুগের চিকিৎসকরূপেই আমরা তাঁকে পেতে পারি।

বিশ্বাসহীনতার মতো মানবতার এত বড় শত্রু আর নেই, মানবসভ্যতার ঐতিহ্যে এই আস্তিক্যবোধই শীলারের দান। তাঁর 'হ্বালেনস্টাইন' নাটকে বিশ্বাসঘাতক নায়কের মুখেই শুনি :

True faith, I tell you,
Must ever be the dearest friend of man ;
His nature prompts him to avenge its betrayal.

সমসাময়িক কালের ক্ষুদ্র চিন্তা, উৎপীড়ন, দুঃস্থতার গ্লানি মনকে পঙ্গু করলেও উচ্চতর এবং সর্বজনীন মানবিক বিষয়ের অভিনিবেশে সেই সীমাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে, শীলারের এই প্রত্যয়কে আমরা যেন নন্দনতত্ত্বের বিলাস বা জীবন থেকে পলায়ন না ভাবি, মান আমাদের সতর্ক করেছেন : এই প্রত্যয় তো জীবনের গভীর আগ্রহ থেকেই উৎসারিত।

লেখক নিজেও তো রোগজীর্ণ দেহের বোঝা বহন করেছেন আজীবন, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষের শরীর ও আত্মার শোচনীয় অপমৃত্যু দেখেছেন, তাই তো তিনি তাঁর স্বদেশের শিল্পীর ঔদার্য ও শুদ্ধ মনুষ্যত্বের অভীপ্সাকে এমন মূল্য দিতে পারেন। উপসংহারে তাঁর বিষণ্ণগম্ভীর আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর গভীর মানবিক উৎকণ্ঠায় আমাদের অভিভূত করে : পর পর দুটো মহাযুদ্ধে হিংস্র পাশবিকতায় লুণ্ঠন রক্তমোক্ষণে সভ্যতা ক্ষতবিক্ষত, বর্তমান যুদ্ধোত্তর বিশৃংখল অসুস্থ সমাজে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিবারণের নিরাপত্তা কোথায়, যে-যুদ্ধে সমস্ত কিছুরই ধ্বংস অনিবার্য। মনন এবং নীতিবোধের এই ব্যাপক অধঃপতনের যুগেই তো শীলারের সার্বজনীন শুভবোধের এত বেশি প্রয়োজন : আমরা যেন তাঁর মানবিকতার মহত্ত্বের কিছুটাও অনুভব করি, সৌন্দর্য, সত্য, আত্মশ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর পৌরুষের সংকল্পের অন্তত কিছু অংশও যেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অগস্টের দুপুরে জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট শহরে এক অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী যে সন্তানের জন্ম দেন, তাকে এত নীল এবং নির্জীব দেখাচ্ছিল যে প্রথমে মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীর আলোবাতাসের স্বাদ

পরিপূর্ণভাবে নেবার আগেই ওকে মাতৃজঠর থেকে সোজাসুজি কবরে ঠাঁই নিতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই নবজাত শিশুটির ঠাকুমার চীৎকার শোনা গেল : এলিজাবেথ, সে বেঁচে আছে! এ যেন শুধু ঘরের সংকীর্ণ সীমায় একটি নারীর কাছে অপর এক নারীর আশ্বাসমাত্র নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছে দুর্মর প্রাণশক্তির রক্তোচ্ছ্বাসেরই ঘোষণা। এই মর্তে যতদিন জীবন এবং প্রেমের অস্তিত্ব থাকবে, নিজের যন্ত্রণায় অবসন্ন না হয়ে জীবন নিজেকে ভালোবাসবে, বিতৃষ্ণায় নিজেকেই নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না রাখবে, ততদিন এখানে সেই বৃদ্ধা নারীর মুখোচ্চারিত অপরিমেয় প্রাণের আবির্ভাব-বার্তা ঘোষিত হবে : সে বেঁচে আছে!

এই গৌরচন্দ্রিকায়ই গ্যেটের জীবন ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধটির আরম্ভ। সত্যি, গ্যেটের সম্বন্ধে প্রথমেই তো মনে হয়, একটি ব্যক্তির আধারেই জীবনের এমন সম্ভাবনাশক্তি ও বিকাশের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। অক্ষয়বটের শক্তি নিয়েই এই পুরুষটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নিজের বিপজ্জনক ব্যাধি সত্ত্বেও বেড়ে উঠেছিলেন মাটি আর আকাশের সমস্ত দানকে আত্মসাৎ করে। তাঁর জীবনের আশেপাশে অনেক ঐতিহাসিক সংঘাত ও পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে : সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রাম, ফরাসীবিপ্লব, পটভূমিগত সমস্ত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বহন করে উনবিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব। এই ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখানে তাঁর হৃদয়মন ছিল চলিষ্ণু, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সদা উৎসুক। জীবনের শেষ চিঠিতে তিনি বন্ধুকে জানান, স্বকীয় প্রবণতা তথা চারিত্র্যকে ক্ষুণ্ণ না করে সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

এই আশ্চর্য প্রাণময়তার ইতিহাসকেই মান তুলে ধরেছেন। গ্যেটে-সম্পর্কিত যে কোনও আলোচনার প্রসঙ্গেই এলিয়টের বিনয়বাচন মনে পড়ে, এই শক্তিধর পুরুষের জীবন ও কর্ম এত বিচিত্র ও বিস্তৃত এবং বহুল আলোচিত যে তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলা দুঃসাধ্য। মান-এর প্রবন্ধেও নতুন কিছু নেই। কিন্তু আলোচনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনের নির্মলতা, সার্বভৌম উদার মানবিক দৃষ্টি এবং নির্মোহ আবেগ আমাদের সমস্ত মনকে টেনে রাখে।

গ্যেটের ব্যক্তিস্বরূপের শক্তির সঙ্গে তাঁর সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করতেও মানের ভুল হয় না। একদিকে তিনি যেমন মননের আকাশকে উন্মুক্ত

রেখেছিলেন, অপরদিকে তেমনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাধাও দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক জাতীয়তার আবেগকে ব্যাহত করার দিকেই তিনি ঝোঁকেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিরূপতা প্রকাশ করেন, মুষ্টিমেয়দের শ্রেণীই সকল শুভবুদ্ধির অধিকারী এ বিশ্বাসে তাঁকে নিশ্চিত হতে দেখা যায়। বিপ্লবের শুদ্ধিকরণের দিকে মানুষের আগ্রহে তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর মানবিকতায় এই বিপরীতমুখী টানের ফলে অনেক সময়ই তিনি স্ববিরোধী মতামত প্রকাশ করেন।

লেখককে অনুসরণ করে এই দ্বন্দ্বের সীমায়ই গ্যেটের মহত্ত্ব আমরা ভালো করে বুঝি। মহৎশিল্পীদের শিল্পসাধনা তো একদিক থেকে নিজেদের সীমার দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্ব অতিক্রমের ইতিহাস। গ্যেটে তাঁর সৃষ্টিতে শুধু অতীত ও বর্তমানকেই নয়, তাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎকেও বাঁধেন প্রাজ্ঞ মানবিকতায়। জীবনের অন্তিম পর্বেও আসন্ন মৃত্যুর অবসাদ তুচ্ছ করেই মানবসভ্যতা বিষয়ে চিরজিজ্ঞাসু সেই বিরাট মনের ভবিষ্যৎ বোঝার চেষ্টার মানবিকতা আমাদের মনকে সবল করে। বার্ধক্যের রচনা 'ভিলহেল্ম মাইস্টার'-এ গ্যেটের ব্যক্তির অসম্পূর্ণতার স্বীকৃতি অনুধাবনযোগ্য: শুধু সমষ্টিগতভাবেই মানব-সমাজের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

জীবনের শেষমুহূর্তে গ্যেটে নাকি বলেছিলেন, আরো আলো আসতে দাও। কথাগুলো প্রবাদবাক্যের মহিমা লাভ করলেও টমাস মান যথার্থই বলেন, গ্যেটের আসল শেষ কথা যা তিনি মৃত্যুর বিরুদ্ধে এবং জীবনের সপক্ষে সারাজীবন ধরে বলে এসেছেন, তা হচ্ছে এই, সবশেষে শুধু সামনের দিকেই চলা যায়!

কোনও বিশেষ মতবাদ, শুধু নিজের প্রত্যয়বিরোধীই নয়, ব্যক্তিগতভাবে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কি কঠিন সততায় তার প্রাথমিক ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে, মানকৃত নীট্‌সের জীবন ও চিন্তা বিশ্লেষণই তার অভিজ্ঞান। নীট্‌সে ফ্যাসিস্টদের আদিগুরু এবং তাদের জন্যই মানকে স্বদেশ ছাড়তে হয়। কিন্তু এই আলোচনাটির কোথায়ও ব্যক্তিগত জ্বালা ফুটে বার হয় নি, শিল্পীর ব্যক্তিগত আসক্তিহীনতা এবং অন্তর্দৃষ্টির দুরূহ পরীক্ষায় টমাস মান নিঃসন্দেহে গৌরবের সঙ্গে উত্তীর্ণ। এই নৈর্ব্যক্তিক

সভ্যতায়ই নীট্সের মতো অবক্ষয়ের প্রতিভা তথা আমাদের সভ্যতার সংকটকে বোঝা সম্ভব।

বালক নীট্সে ছিলেন নিতান্ত ভালো ছেলে, অতিমাত্রায় ধার্মিক, যার জন্যে ঠাট্টা করে তাঁকে ক্ষুদে পাদরি বলা হত। একবার তাঁকে তুমুল বৃষ্টিতেই মেপে পা ফেলে গম্ভীর চালে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়, কারণ স্কুলের নিয়মানুযায়ী রাস্তায় যে শালীনভঙ্গীতে চলাফেরা করতে হবে!

প্রথম জীবনেই নীট্সে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেন এবং সেই সঙ্গে আকাশস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষারও। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বুর্খার্টকে নীট্সে পিতার মতোই দেখতেন, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তাঁর কাছে এই তরুণ বন্ধুটির প্রবণতার তীব্রতাকে অস্বাস্থ্যকর এবং বিপজ্জনক ঠেকেছিল। বুর্খার্ট তাঁকে পরিহার করেন।

অতঃপর নীট্সের জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তার উপক্রমণিকা তিনি নিজেই বন্ধুর কাছে বলে গেছেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একুশ বছরের তরুণ নীট্সে একবার কোল্ন্-এ বেড়াতে যান, সেখানে শহরের দ্রষ্টব্যগুলো দেখিয়ে দেবার জন্যে এক গাইড নিযুক্ত করেন। সারা বিকেল ঘোরার পর সন্ধের সময় কোনও ভালো রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে বললে সেই "শয়তানের দূত" গাইডটি তাঁকে এক গণিকালয়ে নিয়ে আসে: "কুমারীর মতো বিশুদ্ধ" জ্ঞানচর্চার পথিক সোপেনহাওয়ার-এর ভক্ত ছেলেটি হঠাৎ দেখল, "পাতলা স্বচ্ছ পোশাকে আর ঝকঝকে গয়নায় ছটি প্রেতিনী তাকে ঘিরে ধরল উৎসুক দৃষ্টিতে। এই নরকের পেছনের দিকে ছিল একটা পিয়ানো, সেই সঙ্গের মধ্যে শুধু এরই আত্মা ছিল (নীট্সের নিজের কথায়)।" গণিকাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে নীট্সে পিয়ানোর কাছে গেলেন ও দু-একটি ঝংকার তুললেন। এতক্ষণ তিনি প্রায় মূর্চ্ছাতুর অবস্থায় ছিলেন, এবারে সেই ঘোরটা কাটল, রাস্তায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু কল্পনায় স্মৃতিতে এ দৃশ্যের অনপনেয়, সর্বনাশা প্রভাব থেকে গেল। ঠিক তার পরের বছরে তেমনি আর একটি নরকে গিয়ে নীট্সে তাঁর দেহে কুৎসিত ব্যাধির বিষ বয়ে নিয়ে এলেন, এবং পরের বছরে আবার সংক্রাম ঘটল। তারপর অসহনীয় রোগযন্ত্রণায় নীট্সের জীবন ক্রমাগত বিধ্বস্ত হতে লাগল।

কিন্তু ব্যাধি তো শুধু তাঁর শরীরে নয়, মনেও ছিল, ছিল সে-যুগের সামাজিক আবহে যার কাছে 'জরথুস্ট্র'-এর লেখক আত্মসমর্পণ করলেন। ফরাসী বিপ্লবের পর ইয়োরোপীয় সভ্যতায় যে সংকট দেখা দেয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় অনেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবুদ্ধির ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে প্রবৃত্তিমার্গে জৈবশক্তির উপাসনায়ই, জীবনবিদ্রোহী ইস্‌থেটিক রুচিতে আত্মরক্ষার পথ খুঁজেছিলেন, সেই ধারায়ই তো নীট্‌সে এবং পরবর্তীকালে কির্কেগার্ড, বের্গসঁ ইত্যাদিকে পাই। মান যথার্থই বলেন, নীট্‌সে ফ্যাসিবাদের জন্মদাতা নন, ফ্যাসিবাদই তাঁকে সৃষ্টি করেছে। নিজের লিখনপুণ্যে যিনি জার্মানভাষাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, নিউটনীয় কার্যকারণশৃংখলাবাদের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে পদার্থবিজ্ঞানে নতুন চিন্তার উন্মেষ সম্বন্ধে যে ব্যক্তিটি ছিলেন সজাগ, তিনিই অতিমানুষের শক্তিমত্তার এই অমানুষিক দর্শন প্রচার করলেন, যাতে অনেক মিথ্যাচার, বর্বর নিষ্ঠুরতা, হিংস্র উৎপীড়ন আশীর্বাদপূত হল।

নীট্‌সের মতে, মানুষকে বলি দিয়েই জাতি হিসেবে মনুষ্যসমাজকে টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব। খ্রীষ্টীয় ধর্ম এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিরোধী, সেইজন্যই তার প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ। জীবন এবং সমাজকে যুদ্ধের যন্ত্র হিসেবেই তিনি উল্লেখ করেন, এবং তাঁর বিকারগ্রস্ত ইস্‌থেটিক রুচিতে মনে হয়, যুদ্ধ-ব্যাপারটাতে একটা লোভনীয় চোখধাঁধানো গৌরব আছে। এখানেও মান কঠিন সংযমেই বলেন: কোনও কোনও সময় নিশ্চয়ই যুদ্ধের প্রয়োজন হতে পারে। ১৯৩৮ সালে হিটলারের সঙ্গে মিউনিকের শান্তিচুক্তিতে দেখা গেছে, সেই আপোসরক্ষার শান্তিবাদ ফ্যাসিস্টদের প্রতি সহানুভূতির ছদ্মবেশ মাত্র। কিন্তু যখন যুদ্ধে ব্যাপক নীতিহীনতা, প্রত্যেকটি পাশব, স্বার্থপর অসামাজিক প্রবৃত্তির নখরাঘাত দেখি, একটি সদ্যসমাপ্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ-শেষে এই পৃথিবীর একটি চিত্রের কল্পনা করি, তখন নীট্‌সের মতো যুদ্ধকে নিশ্চয়ই সাধ করে ডেকে আনার মত বাঞ্ছনীয় মনে হয় না।

আলোচনার শেষে তাই টমাস মান বলেন, আমাদের এখন প্রয়োজন মানসিক আবহের পরিবর্তন, মানুষ হওয়ার দুরূহতা এবং মহত্ত্বের নতুন উপলব্ধি, স্বকীয় চৈতন্যেই প্রত্যেকের একটি সার্বজনীন মৌলিক প্রবণতায় অংশগ্রহণ, যা শুধু অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার মন্থনেই সম্ভব।

আমরা মানি, শিল্পেই স্রষ্টা ও স্থষ্টির রসগ্রাহী উভয়েরই চৈতন্যের শুদ্ধি, বেদনার সমস্ত রক্তাক্ত কণ্টকই সেখানে পরম উপলব্ধির সমাহৃতিতে ধন্ত। কিন্তু অমানুষিক, ভয়াবহ শোষণ-শাসনেব অত্যাচারে, কুটিল ক্রূর লোভে সাধারণের জীবন যখন ছিন্নভিন্ন হয়, আঘাতের পর আঘাতে অবিরাম রক্তক্ষরণে মুমূর্ষু বোধই যখন মাঝে মাঝে অসহ্য জ্বালায় জ্বলে বা রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণায় একটু আলোবাতাসের জন্য মাথা কুটে মরে, তখন প্রত্যেক সৎ শিল্পীরই কি থেকে থেকে মনে হয় না, বাস্তবেব দায়ভাগ এতই মর্মান্তিক সত্য যে শিল্পের পরোক্ষ মুক্তি যেন মরীচিকার ছল, "জীবনের মৃন্ময়ে" "শিল্পের চিন্ময়" গড়ার আবেগ বঞ্চনামাত্র, অপরকেই শুধু নয়, নিজেকেও! এই নিষ্ফলতার যন্ত্রণায় শিল্পের তন্ময় ধ্যান থেকে তাঁকে বারবার ব্যর্থতার গ্লানিতে অস্থির হতে হয়। কিন্তু ওদিকে আবার তাপদগ্ধ জীবনের মাটি শিল্পের শুদ্ধ আকাশের জন্য আর্ত হয়ে থাকে, শিল্পীর চৈতন্যের প্রতিটি স্নায়ুতে কোষে কোষে তারই তো দুর্জয় প্রেরণা।

নিঃশেষে ক্ষয়ে গেলেও এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব থেকে কোনও সৎ শিল্পীরই পরিত্রাণ নেই এবং জীবন ও শিল্পের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের প্রখর চেতনাই তো তাঁদের মহত্ত্বের উৎস। এই যন্ত্রণাদায়ক বিড়ম্বনাই তো দেখি চেখভ কিংবা তলস্তয়ের জীবন ও শিল্পে, এবং অতটা তীব্র না হলেও আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথে।

তলস্তয়ের আড়ম্বরে নয়, নিঃশব্দে, হয়তো তাঁর থেকেও আরও তীক্ষ্ণতায় এই দহনে চেখভ পুড়েছেন আজীবন। দণ্ডিতদের নির্বাসনভূমি সাখালিন দ্বীপের ভ্রমণকে নরকে অবতরণের আখ্যা দিয়ে লেখেন: "আমার চারদেয়ালের সীমায় আবদ্ধ থাকলে কি জড়বুদ্ধি লোকই না থেকে যেতাম! এই যাত্রার আগে তলস্তয়ের ক্রুয়েটজার সোনাটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে করতুম, এখন সেটা তুচ্ছ, হাস্যকর ঠেকছে।" সত্যি, চেখভের কাছে ঐ চারদেয়ালের একাকীত্বের সীমা অসহনীয় লেগেছিল, কারণ, তাঁর ধারণায়, এই পৃথিবীতে, মানুষের মাঝখানে, জীবনেই সামাজিক কর্ম দ্বারা শিল্প-চর্চাকে সম্পূর্ণ করা দরকার। নিজে ডাক্তার হওয়ার দরুণ তাঁর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শরীর কিভাবে যে দিনের পর দিন ক্ষয়ে পড়ছে নিশ্চয়ই তাঁকে বুঝতে হয়েছে, তবু কষ্টকর সাখালিন ভ্রমণে জীর্ণ দেহকেই বিপন্ন করে তোলেন, সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ডাক্তার হিসেবে বিরামহীন কাজ চলে, নিজের জায়গায় কলেরা প্রতিরোধের কঠিন চেষ্টাও। এদিকে সাহিত্যখ্যাতি আস্তে আস্তে

ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু হৃদয় তাতে ভরে না, অস্থিরতায় বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই ক্রমবর্ধমান খ্যাতি নিজের সার্থকতা সম্বন্ধে শুধু সন্দেহই জাগায়, অনুতাপখিন্ন বিবেকে শুধু এই প্রশ্ন ঘুরেফিরে জাগে : "আমি কি পাঠকদের ধোঁকা দিয়েই চলেছি না যখন অত্যন্ত জরুরী প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই ?"

এই কথাগুলোই টমাস মানকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং তিনি চেখভ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত হন। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের বর্বর স্বেচ্ছাচারের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নেবার উপায় ছিল না। চেখভের পরিচিতদের মধ্যে অনেক গুণী ব্যক্তিই হতাশায় ভেঙে পড়েন, কেউ কেউ এই দুর্বিষহ জীবন সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যান, অনেকে মদের অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনায় নিজেদের ভুলতে চান, কারুর বা আত্মহত্যায় শোচনীয় পরিণাম ঘটে। শুধু ডাক্তারী বিদ্যার নিষ্ঠাবান চর্চায়ই নয়, আশেপাশের জীবনের ব্যঙ্গাত্মক নকশা রচনার খোশমেজাজেও দুঃসহতা থেকে কিছুটা মুক্তির অবসর খুঁজে চেখভ সেই সর্বনাশ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন।

কিন্তু কিছুকাল পরেই এই লঘু মেজাজের পরিবর্তে শিল্পের আগ্নেয় প্রেরণা, চেখভের নিজের ভাষায়, তাঁর বিবেকে নির্দয়ভাবে ঘা দিতে থাকল। তাঁর অগোছাল নকশাগুলোয় প্রায় তাঁর অজ্ঞাতসারেই এমন এক মৌলিক সুর ধ্বনিত হল যা উভয়ত তাঁর শিল্পচৈতন্য এবং বিবেক থেকে উৎসারিত : কৌতুকের মধ্যেই বাস্তব রূপ উদ্‌ঘাটন এবং জীবন ও সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষণ্ণ, তিক্ত সুর, মমতাময় অথচ সমালোচনায় তীক্ষ্ণ—মানের কথায়, এটাই তো 'সাহিত্য'। এই সুর "ভাষা, রূপ"—শিল্পাধারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত : সমালোচনাপ্রবণ এই বিষণ্ণ মানস, সুস্থ বাস্তব, সত্যের শুদ্ধতা, সুন্দর মহত্তর জীবন এবং শ্রেষ্ঠতর মানবসমাজের অন্বেষায় সেই বিদ্রোহপরায়ণতাই এবং শিল্পকর্মকে 'নিষ্ঠুর' জীবনপণ দায়িত্বরূপে গ্রহণ থেকেই তো চেখভের ছোটগল্পের ভাষার সংহত কঠিন দীপ্তি আসে। প্রায় পনেরো বছর পরে সঙ্গত কারণেই গর্কির কাছে ভাষাশিল্পী হিসেবে চেখভকে অদ্বিতীয় মনে হয়েছিল। এই রুশীয় শিল্পীর রচনা পড়েই তো টমাস মানের ছোটগল্প সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যবোধ দূর হয়, রূপপরিমিতিতেই যে কিভাবে এই শিল্পমাধ্যম এপিকের মহিমা অর্জন করতে পারে, তাঁর দৃষ্টান্তেই তিনি বোঝেন।

কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হবার পরও এই স্বভাবনম্র লোকটি আত্মবিশ্বাস খুঁজে পান না। অবশেষে, তুচ্ছ বিষয়ে তাঁর অনন্ত প্রতিভার অপচয় না ঘটিয়ে সত্যকারের শিল্পগুণসম্পন্ন সৃষ্টিতে মনোনিবেশের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে একদা বেলিনিস্কির, পরে টুর্গেনিভ এবং ডস্টয়েভস্কির বন্ধু বৃদ্ধ গ্রীগরোভিচ্ তাঁকে যে চিঠি লেখেন, তাতেই চেখভ উদ্দীপিত হন। উত্তরে তিনি নিজের আবেগ অসংকোচে ঢেলে দেন: "আমি প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম, আপনার চিঠি আমার মনে এক গভীর ছাপ রেখে গেছে।"

এর পর থেকে বলা যায় শিল্পকর্মে চেখভের অসাধারণ প্রযত্নের ইতিহাসের আরম্ভ। এ সময়ই তাঁর হাত থেকে 'ছ-নম্বর ওয়ার্ড'-এর মতো অসামান্য রচনা বেরিয়ে আসে। তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষদের জগতের নির্বুদ্ধিতা এবং দৈন্যে বিতৃষ্ণ হয়ে এক ডাক্তার তাঁর হাসপাতালের বিকৃতমস্তিষ্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছ-নম্বর ওয়ার্ডের এক রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, কারণ সাময়িক সুস্থতার মুহূর্তে ওর মতো জীবন সম্বন্ধে এমন মর্মবিদারী সত্য বলার মতো লোক তাঁর আশপাশে কেউ ছিল না। অবশেষে এই হীনতার জগৎ ডাক্তারকেই পাগল সাব্যস্ত করে গারদে পুরে রাখে, সেখানে অত্যাচারে তাঁর মৃত্যু ঘটে, মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে গল্পটির বিষয়বস্তু। মান বলেছেন, প্রত্যক্ষ কোনও অভিযোগ না থাকলেও স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের শেষভাগে রাশিয়ায় দুর্নীতি এবং অসহায়তায় সাধারণ মানুষের যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিল, গল্পটিতে সেই দুঃস্থ জীবন এত তীক্ষ্ণ প্রতীকী রূপ পায় যে তরুণ লেনিন এটি পড়ে তাঁর বোনকে বলেন: "গত রাত্রিতে গল্পটি শেষ করার পর আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছিলুম। ঘরে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি নি, উঠে পড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল আমাকেই যেন ছ-নম্বর ওয়ার্ডে পুরে রাখা হয়েছে।"

যে তীব্রতায় চেখভের গল্প দানা বাঁধে, দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবন নিটোল রূপ পায়, তার মূলে আছে সমসাময়িক জীবন সম্পর্কে শিল্পীর সদাজাগ্রত চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধ। শিল্পরূপের সঙ্গে যুগবিচারের দৃষ্টিভঙ্গির আত্যন্তিক যোগ এই শিল্পীর বিকাশে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়: সমাজের যে সমস্ত শক্তির স্থান হবে অতীতের ধ্বংসস্তূপে, আর যাদের ইঙ্গিত ভবিষ্যৎ যুগেরই দিকে—সেই কালচেতনা গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরূপে তাঁর কর্তৃত্ব অধিকতর পরিণত হয়েছে।

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত যতই আসন্ন হয়েছে, অবক্ষয়ের সন্ধিক্ষণে, অসংখ্য প্রাণের ভগ্নস্তূপ আর ব্যর্থতার হাহাকারের মাঝখানে চেখভ ততই প্রবল আবেগে সপ্রেম উৎসুক দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন কর্মিষ্ঠ সমাজের আবির্ভাবকে খুঁজেছেন, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারেও যার চকিত উদ্ভাসই হৃদয়কে আশ্বস্ত করে। তাঁর শেষ নাটক 'দি চেরি অরচার্ড', বিশেষত শেষ গল্প 'কনে'-তেই ব্যাপক ক্ষয়ের মধ্যেই সূর্যের আলোকসম্ভাবনায় উদ্বেল অঙ্কুর-প্রাণের উত্তাপ পাই। গল্পটির নায়িকা সুখী সচ্ছল পরিবারের মেয়ে নাদ্যাকে বাল্যসঙ্গী, তার স্রষ্টিকর্তার মতো যক্ষ্মারোগী, মৃত্যুপথযাত্রী, শাশা এই অস্তিত্বের মিথ্যাচার থেকে বেরিয়ে আসতে বলে, জীবনের আবর্জনা থেকে বার হওয়াই সব থেকে জরুরী। নাদ্যা সত্যি তার শ্রেণীজীবনের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিছুকাল পরে সে তার পুরনো বাড়িতে ফিরে আসে, এতদিনকার পরিচিত শহরের সমস্ত কিছুই তার কাছে জরাজীর্ণ মনে হয়, তাদের মধ্যে যেন হয় ধ্বংসের নতুবা নতুন উজ্জ্বল এক জীবনের প্রতীক্ষা। হতভাগ্য শাশাও তো তাকে বলেছিল: "তোমার শহরের একটি পাথরও অবশিষ্ট থাকবে না, ভিত্তিমূল থেকে সবকিছু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, তারপর যেন মন্ত্রের পরিবর্তনের মতোই ঝরনা বাগান নিয়ে বিরাট বিরাট সুন্দর বাড়ি উঠবে, নতুন ধরনের মানুষ সেখানে বাস করবে, প্রত্যেকেই জানবে কিসের জন্য তারা বাঁচছে, বাঁচার অর্থ কী।"

অবিশ্যি 'কনে'র মতো দু-একটি রচনা ছাড়া ভবিষ্যৎদ্রষ্টার এই প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ স্থিরতার চেয়ে জীবন সম্পর্কে চেখভের কঠিন প্রশ্নই বেশি মেলে, যার সততায় বীভৎকল্প অন্ধকারে ভবিষ্যৎকে অনুভব করি গূঢ় ইঙ্গিতে, অধিকতর যন্ত্রণার তীক্ষ্ণতায়। চেখভের জীবন ও শিল্পের সামগ্রিক বিচারে 'একটি ক্লান্তিকর গল্প'-কেই মানের কাছে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, এইটিই তাঁর প্রিয় রচনা। সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে তিনি এর তুলনা খুঁজে পান না। গল্পটির নায়ক এক বৃদ্ধ, অসুস্থ চিকিৎসাবিজ্ঞানী। জীবনের শেষভাগে আবিষ্কার করেন, কোনও কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের সংহতিতে তিনি জীবনকে বেঁধে রাখতে পারেন নি, ঘর এবং বাইরের অন্তঃসারশূন্য জীবনের গ্লানিতে, তুচ্ছ চিন্তায় নৈরাশ্যে এই বিস্বাদ জীবন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে এই আহত হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ পায়: একটি নির্দিষ্ট দর্শন ছাড়া সচেতন জীবন তো জীবনই নয়, বোঝা, দুঃস্বপ্ন মাত্র।

নিজের খ্যাতিও বঞ্চনা মনে হয়। গল্পের লেখকের আয়ুও তো এ সময় ফুরিয়ে আসছিল, আসন্ন মৃত্যুর পাণ্ডুর আলোকে আত্মসমীক্ষায় নিজের ক্রমবর্ধমান খ্যাতিকে অস্বস্তিকর ঠেকেছে, সমস্ত চৈতন্যে যক্ষ্মাবীজাণুবিধ্বস্ত ফুসফুসের পরতে পরতে সেই মর্মন্তুদ প্রশ্ন যা দিয়েছে অবিরাম: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার ক্ষমতা যখন নেই, তখন নিজের লিখন-নৈপুণ্যের দীপ্তিতে তিনি কি পাঠকদের ঠকিয়েই চলেছেন না? কেন তিনি লেখেন, কি তাঁর উদ্দেশ্য, বিশ্বাস। কোথায় তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের মূল ভাবনা যা ছাড়া সমস্ত কিছু অর্থহীন। আবার আমাদের স্মরণ করতে হয়, বুকের রক্ত যতই ঝরুক, ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতার এই প্রশ্ন থেকে শিল্পীর মুক্তি নেই। ভারতবর্ষের কবির মানসেও রূপনারায়ণের কূলে সত্তার প্রথম আবির্ভাবে যেমন, তেমনি অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়ও সেই একই প্রশ্নই জাগে, পার্থক্য শুধু এদেশসুলভ মন্ত্রোচ্চারণের শান্ত ভঙ্গিতে।

গোড়ার দিকে টমাস মান যে প্রশ্ন তোলেন, শেষভাগে তাতেই ফিরে আসেন। 'ক্লান্তিকর গল্প'-এর পণ্ডিত ব্যক্তিটি তাঁর মৃত বন্ধুর মেয়ে সমাজ-পরিত্যক্তা ব্যর্থ অভিনেত্রীটিকে গোপন ভালোবাসায় অভিষিক্ত করেছিলেন চারদিকের আত্মসুখসন্ধানী ইতরতার মাঝখানে তার বেদনাশুচি মনের স্পর্শ পেয়ে। সেও একদিন প্রবল সন্দেহ ও হতাশার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তার অভিভাবক জ্ঞানী ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করে: "আমি কি করব, আপনাকে অনুনয় করছি, শুধু একটি কথায় বলে দিন আমি কি করব?" এদেশের মেয়ে দামিনীও তো আত্মসচেতনতার যন্ত্রণায় জর্জরিত শচীশকে সেই কঠিন প্রশ্নই করে দুঃসহ ব্যাকুলতায়, শচীশের মতোই পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে অসহ্য কষ্টে বলতে হয়, আমি জানি না, আমার বিবেকের দোহাই দিয়ে বলছি, আমি জানি না। তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়েও তো এই জিজ্ঞাসারই দহন।

সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্বে মন্থিত অস্তিত্বের এই মৌল প্রশ্নই তো চেখভের অধিকাংশ গল্পের ধুয়ো। তৎকালীন রাশিয়ায় সত্য ও বাস্তব পরিবেশের যে দুর্বিষহ, জটিল বিরোধ ছিল, বিশেষ করে তাতেই তো সাধ ও সাধ্যের বিড়ম্বনা শিল্পীর পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পসাহিত্যের স্তরে উত্তর হাতে হাতে জুগিয়ে দেওয়া যায় না। জোড়াতালি দেওয়া সমাধানের স্থূলতায় নয়, ঐ সৎ, দধীচির অস্থির মতো কঠিন প্রশ্নেই তো জীবনের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে অনুভব করি, তার আগুনে নতুন সংগঠনের উদ্দীপনা পাই, আর বেদনার শেষবিন্দুতে যখন

সে জিজ্ঞাসা এসে থামে, তখন সে "কান্নার অতলজলে" "ভবিষ্যতের আনন্দ-ভৈরবী"ই কান পেতে শুনি।

সাধ ও সিদ্ধির দ্বন্দ্বময় প্রশ্নের আঘাতে হৃদয় হাহাকার করে উঠলেও চেখভ দিনের পর দিন অপরিসীম নিষ্ঠায় ধৈর্যে লিখে গেছেন নিজেকে পুড়িয়ে, ক্ষয় করে। গকি যথার্থই বলেন, সমস্ত সংস্কৃতির মূল ভিত্তিই যে হল কাজ, পরিশ্রম, চেখভ ছাড়া সেটা এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করার মতো লোক আর কাউকে তিনি পাননি। 'পরগাছা জীবনের আলস্যে তাঁর বিপুল ঘৃণা ছিল। সমাধান হাতের মুঠোয় না আসুক, নিজের কাজের মূল্য সম্বন্ধে সংশয়দ্বিধা যতই থাকুক, ঐ অন্তহীন যন্ত্রণায় সৎ শিল্পীকে গল্প বলে যেতে, সত্যকে রূপ দিতে হয় নিজের শেষ রক্তবিন্দুটি দিয়ে এবং সুস্থ, মহত্তর ভবিষ্যতের আবেগে বুক বেঁধে।

টমাস মানের আলোচিত চারজন ব্যক্তিই ছিলেন ব্যাধিগ্রস্ত, গ্যেটেকেও তো দীর্ঘকাল যক্ষ্মার বিরুদ্ধে যুঝতে হয়েছিল। শুধু দুর্জয় প্রাণশক্তিই তাঁকে অবসন্ন হতে দেয়নি। নীট্‌সের দেহমনের ব্যাধির অনিবার্য পরিণাম তো উন্মত্ততায়। আজকের ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমী সভ্যতার উচ্ছিষ্টবিলাসী শহুরে মহল থেকে যখন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, শিল্পী ও শিল্পের স্বাধীনতা শুধু আত্মরতির অস্বাস্থ্যকর চর্চায়, তখন মানের আলোচনায় ব্যাধির নিপীড়নের মধ্যেই গ্যেটে শীলার চেখভের মতো মহৎ শিল্পীদের দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত আমাদের মতো সাধারণদের আশ্বস্ত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই লক্ষ্য করি, ভেতর ও বাইরের দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়ায় যাঁরা অহংসর্বস্বতায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই পরিণাম ঘটেছিল ক্লাইস্টের আত্মহত্যায় বা হোয়েল্ডারলিনের উন্মাদরোগে। আত্মপরায়ণতার ব্যাধিতে শুধু আত্মার অপমৃত্যুই ঘটে। ভারসাম্যহীন অবক্ষয়িত সমাজে আত্মসচেতনতাও নিদারুণ ব্যাধির তীব্রতায়ই দেখা দেয়, কিন্তু এই আগুনে শিল্পী যখন পোড়েন, তখন একটি প্রাণের মধ্যেই তো নিজেদের নতুন করে চিনি। অপমৃত্যুর ব্যাধির পাশাপাশি, বিশেষত শেষ প্রবন্ধটিতে মান আমাদের দেখান, রোগজীর্ণ শরীরে মনেও সমসাময়িক সমাজের ব্যাধির যন্ত্রণা নিয়ে সচেতন সংবেদনশীলতায় জীবনকে তার দ্বন্দ্বসংঘাতে সমগ্রতায় গ্রহণ করেন নীলকণ্ঠ-শিল্পী, কেমন করে বাঁচতে হবে জীবনের সেই সমস্যাসঙ্কুল ক্ষুরধার জিজ্ঞাসায়ই ব্যক্তিজীবনের দুঃখবেদনার অমৃতরূপ দেন। এক মহৎশিল্পীর মননের আধারে আর মহৎশিল্পীর জীবন ও শিল্পের মানবিক তাৎপর্য ধরা পড়ে, সেই যুক্তবেণীতেই তো আমাদের চৈতন্যের মুক্তিস্নান ঘটে।

'Thomas Mann: Last Essays. Secker & Warburg. 21sh.

নেপথ্য থেকে

দুর্গাদাস সরকার

জাহাজে যে কয়লা ভাঙত অকস্মাৎ কাল গেছে মারা।
ডেকের ওপরে পোড়া ছন্নছাড়া মুখ যায় না চেনা,
দেখেও কে ভাবতে পারে এই সেই ইব্রাহিম শেখ।
দুবেলা যে এসে বসত, গল্প করত, সমুদ্রের ফেনা
মুখে ঘষে কালি মুছত, ছিল যার কিছুটা বিবেক,
সবাই ঘুমোলে পর রাত জেগে যে দিত পাহারা,
পাটাতনে অঙ্ক কষত কালি দিয়ে—দেশে কত দেনা,
দাঁতে ছিঁড়ত বাসি রুটি—আজ সে-ই মানুষ আরেক!

সমুদ্রের জলের গভীরে হবে কবর যদিও,
কালো শার্ট টানবে মাছে, হাঙরে লুঙিটা খাবে ছিঁড়ে,
তার মাংসে ভোজ দেবে সিন্ধুশকুন সাগরের তীরে,
অস্থিগুলো ভাসবে তবু। জাভা-চীন-মালয় বনিয়ো
ঘুরে-ফিরে মানুষের চিন্তায় জড়াবে। তারপর
হা হা করে হাসবে শুধু আমাদের অস্থির ভেতর।

দুই রঙ

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পেরিয়ে এসেছি সেই পদ্মদীঘি ;

সামনের আকাশে লাল ধুলো আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী
পাক খেতে খেতে
ফোটা শিমুলের রূপের টানে থমকে দাঁড়াচ্ছিল,
বধূর অসাবধানতার সুযোগে যেমন তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে পুরুষ
দেখছিল তেমনি করেই।

এলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল আবার :

এলো হাওয়ার মতোই উদ্দাম ঐ অশ্বত্থের ডালটা
যখনতখন মাতাল হয়,
পাতাগুলো এখনও ঘন সবুজ হয় নি—
জুড়িয়ে আসা গলানো লোহার যেমন রং—তেমনি দেখতে।

কারখানার কাজের ফাঁকে—হাসিঠাট্টার ঝঙ্কার,
খুনসুটি,
মান আর অভিমানের ছন্দ—
আর কেউ না দেখুক দেখেছে ঐ বুড়ো অশ্বথ গাছটা,
কিছু বলে না মাঝে মাঝে শুধু মাতাল হয়।

গলানো লোহার রং দেখে
মেয়েটার লোভ হয় ছুঁয়ে দেখতে,
'বাব্বাঃ, ইস—পুড়ে ছাই হয়ে যাব'—
মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় তক্ষুনি।
আবার কখনো বলে—'ঠিক সূয্যির মতন
যখন ডোবে তাল-বোনার ধারে।'

একদিন কেমন করে খানিকটা সূর্য চলকে পড়েছিল
আর সেই সঙ্গে চুল্লীর মুখ গিয়েছিল খুলে।

রঙের নেশায় না ভুল করে
মেয়েটি রঙের মাঝেই ডুবল,
মিশে গেল তারপর।
বুড়ো অশ্বত্থ তবুও মাতাল হয়।

মানুষ শহর সমুদ্র

কমলেশ সেন

দুহাত, হাতদুটো যখন স্থাপত্যের লাবণ্যে
উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর কথাগুলো
আকাশে-মহাকাশে দ্রাঘিমায় অক্ষাংশে
ভেঙে ভেঙে সূর্যস্তম্ভ
বিদ্যুৎ স্তম্ভ, অরণ্যে যেন, যেন অরণ্যের
গভীরতায় কথার শহর, শহরের কথা।

শহর, শহরের বুকে, বুকের কলিজায়
জলপ্রপাত হিমালয় সমুদ্র
ইস্পাত শহর ইস্পাত মানুষ
ভালোবাসার মানুষ।

মানুষ,
মানুষ শহরে
জলপ্রপাতে হিমালয়ে সমুদ্রে
মানুষের শহর, মানুষের জলপ্রপাত
মানুষের সমুদ্র হিমালয় মানুষ।

যদিও কথাগুলো, কথাগুলো সূর্যের উরসে,
ডুবে ডুবে আগুন, আকাশ গলে গলে
মাটির সমুদ্রে, পায়ের সমুদ্রে
কৃষ্ণচূড়ার সমুদ্র, সমুদ্রের সূর্য
হিমালয় রক্তগোলাপ, আগ্নেয়গিরির হিম্মত।

যদিও ভালোবাসার মেয়েগুলো
হিরণ্যগর্ভ, গনগন চুলের অরণ্য
অরণ্যের চুলে অগ্ন্যুৎপাত

ভালোবাসার মেয়েগুলো, ছেলেগুলো
ভালোবেসে, ভালোবাসতে বাসতে
অরণ্য, গভীর চোখের অরণ্য, মেঘডম্বরু
ভালোবাসার চকমক বিদ্যুৎ, ঠমক
গমক, পাখোয়াজ।

মানুষ, অগ্নিক্রান্ত মানুষ
বাতাসে, রক্তের বাতাসে
পেশীতে, গুরু গুরু চেতনা সংহাতে
সমুদ্র, সোনা সমুদ্র, জলোচ্ছ্বাস
ভালোবাসার বিদ্যুৎপ্রণাম, ভালোবাসার প্রণাম।

কথাগুলো কলিজার রং-এ ডুবে ডুবে
বিদ্যুৎ-ইস্পাত।

শান্তিনিকেতনে 'গান্ধী-পুণ্যাহে'র গোড়ার কথা

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনে ১০ই মার্চ তারিখে 'গান্ধী-পুণ্যাহ' উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ঐ দিনটির আরম্ভের কথা এবং গান্ধীজির সঙ্গে শান্তিনিকেতন ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সূত্রপাতের মোটামুটি একটা বিবরণ নীচে দেবার চেষ্টা করা হল।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসী সম্বন্ধে সেখানকার সরকার নানারকম অন্যায় নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ, অতিরিক্ত কর ইত্যাদি চালু করবার চেষ্টা করছিলেন, আর দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের নেতা মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সে-সকল অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম চালনা করে বারবার লাঞ্ছনাভোগ ও কারাবরণ করেছিলেন—এ সকল কথা আমরা শান্তিনিকেতনের সে সময়কার ছাত্র ও অধ্যাপকরা কিছু কিছু জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবদের কাছ থেকে। এ হল ১৯১৩-১৪ সালের গোড়ার দিককার কথা।

এই দুই মহাপ্রাণ ইংরেজ সবেমাত্র শান্তিনিকেতনে যাতায়াত শুরু করেছেন—আশ্রমের আদর্শের এবং গুরুদেবের প্রতি একটু একটু আকৃষ্ট হচ্ছেন। এণ্ড্রুজ সাহেব কয়েক বছর হল ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টীয় পাদ্রী—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ইনি পাদ্রীর চেয়ে খৃষ্টান বেশি।" ১৯০৪ সালে দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন্‌স্ কলেজে যোগ দিতে তিনি এদেশে আসেন। তাঁকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হয় কিন্তু এণ্ড্রুজ সাহেব তৎক্ষণাৎ সে-পদ প্রত্যাখ্যান করে সুশীল রুদ্রকে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে উপাধ্যক্ষ হলেন। তিনি বললেন, "ভারতবর্ষে আমি চিরদিন ভারতীয়ের অধীনে কাজ করব, তাদের উপরে নয়।" এই একটি ঘটনা থেকে ভারতবাসীর প্রতি তাঁর মনোভাব বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। ভারতবর্ষের সরকারী ও বে-সরকারী মহলে এণ্ড্রুজ সাহেব বিশেষ পরিচিত ও দীন দরিদ্র ভারতবাসীর অসীম দরদী

বন্ধু ছিলেন। বিলাতের এবং ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অনেকেই তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। এমনকি তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। সেইজন্য রাজদ্বারে এবং দরিদ্রের কুটিরে তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব সম্বন্ধে এত কথা বলা দরকার এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মধ্যে প্রথম যোগসূত্রের কারণ এবং আজীবন সেতু হলেন এণ্ড্রুজ সাহেব।

১৯১২ সালে গুরুদেব বিলাতে যাবার কয়েকদিন পরে তাঁর বন্ধু শিল্পী রদেনস্টাইনের গৃহে ইংরেজী গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধুমহলে পাঠ করে শোনান কবি য়েট্‌স্। এই পাঠসভায় এণ্ড্রুজ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তারপরই গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় আজীবন অকৃত্রিম বন্ধুত্বে পরিণত হয় একথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এ দিকে স্বদেশে ও বিদেশে লাঞ্ছিত দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি বেদনাভরা সহানুভূতিতে তাঁর যোগ ছিল মহামতি গোখ্‌লে প্রভৃতি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে।

এণ্ড্রুজ সাহেবের বিশেষ বন্ধু ছিলেন পিয়ার্সন সাহেব। তিনি দিল্লীতে এক ধনীপুত্রের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। ১৯১২ সালে যখন গুরুদেব বিলাতে, সেসময়ে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন দুজনেই ছুটি নিয়ে বিলাতে ছিলেন। এণ্ড্রুজ সাহেব গুরুদেবের কবিতাপাঠ সভায় উপস্থিত ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। একদিন তাঁর বন্ধু পিয়ার্সনকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি বাড়ি না থাকায় দেখা হয় না। শুনলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একজন ভারতীয় ছাত্র বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই সভায় গিয়ে দেখেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত। বক্তা হলেন 'আবোল তাবোল'-এর লেখক স্বনামধন্য সুকুমার রায়। বক্তৃতার পর পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে গুরুদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। এণ্ড্রুজ সাহেবের ফেরার আগেই পিয়ার্সন সাহেব ভারতে ফিরে শান্তিনিকেতন দেখবার জন্যে আসেন। দিল্লী যাবার আগে পিয়ার্সন সাহেব কয়েকবছর কলকাতায় লণ্ডন মিশনারি কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যাপনার কাজ করতেন। সেই সময়ে তিনি বাংলা ভাষা শেখেন। ইংরেজের মুখে বাংলা কথা শুনে আমরা খুব আমোদ অনুভব করেছিলাম এবং ভাষার দুর্গম বাধা না থাকায় তাঁর সঙ্গে আমাদের ভাব হতে একটুও দেরি হয়নি সে-কথা এখনও বেশ মনে আছে। পিয়ার্সন সাহেব কয়েকদিন আশ্রমে কাটিয়ে দিল্লী চলে গেলেন। এর কয়েক মাস পরে ১৯১৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এণ্ড্রুজ

সাহেব শান্তিনিকেতন দেখতে আসেন। এইভাবে এই দুই মহাপ্রাণ ইংরেজের রবীন্দ্রনাথ তথা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আজীবন যোগের সূত্রপাত হয়। তার ইতিহাস স্বতন্ত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা এবং মিঃ গান্ধীর নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ পরিচালনা বিষয়ে সঠিক খবরাখবর জানবার জন্যে এবং সেখানকার সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো সম্ভব কিনা এ সব বোঝাপাড়ার জন্যে মহামতি গোখলের অনুরোধে এণ্ড্রুজ সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়া ঠিক করেন। পিয়ার্সন সাহেবও বন্ধুর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই দুই বন্ধু আশ্রম থেকেই যাত্রা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা ও মিঃ গান্ধীর সংগ্রামের কথা আমরা সেই সময়েই কিছু কিছু জানতে পারি। আশ্রম থেকে তাঁদের যাত্রার তারিখ হল ৩০শে নভেম্বর ১৯১৩। ঐদিন সকালে আশ্রমবাসী সকলকে নিয়ে গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করলেন। বিদায়-সভায় পিয়ার্সন সাহেব বাংলায় বলেন, "আমার এবং আমার বন্ধুর একটিমাত্র কথা তোমাদের বলছি যে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে যে-শান্তি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি তা দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের কাজে সাহায্য করবে।" এখনও বেশ মনে আছে সভার পরে পিয়ার্সন সাহেব 'শান্তিনিকেতন'-অতিথিশালার দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন আর তাঁর সঙ্গে উঠতে উঠতে তাঁকে বলছি: "মিঃ গান্ধীর দলের লোকদের বলবেন যে তাদের এই সংগ্রামে তারা একলা নয়, আমরা সবাই মনে মনে তাদের সঙ্গে আছি।" তখন মিঃ গান্ধী বলতাম; গান্ধীজি বা অন্য সম্বোধন চালু হয় নি।

আফ্রিকায় চারমাস কাটিয়ে পিয়ার্সন সাহেব আশ্রমে ফিরে এলেন—এণ্ড্রুজ সাহেব গেলেন বিলাতে মার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। পিয়ার্সন সাহেব ৩১শে মার্চ ১৯১৪ বোলপুর এসে পৌছলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে আমাদের সঙ্গে গুরুদেবও স্টেশনে গিয়েছিলেন। আশ্রমে পৌছলে আমরা আমাদের প্রথামতো মাল্যচন্দনে ভূষিত করে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে গান গেয়ে তাঁকে সমাদর করে নিলাম। আমাদের অভ্যর্থনার পর পিয়ার্সন সাহেব বললেন যে এতদিন পরে আশ্রমে ফিরে এসে তাঁর খুবই আনন্দ হচ্ছে। যতদিন তিনি দূরে ছিলেন দিনরাত্রি আশ্রমের স্বপ্নই দেখেছেন। সেখানে এতদিন বাংলা ভাষা বলার সুযোগ পান নি। একবার একজন

বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সে মোটেই বাংলা জানে না কারণ তার জন্ম হয়েছিল ঐ আফ্রিকাদেশে।

এর পর প্রায় রোজই আমরা পিয়ার্সন সাহেবের কাছ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীর এবং ঐ দেশের অধিবাসীর কথা শুনতে লাগলাম। ঐ দেশের লোকেদের তৈরি অনেক জিনিসপত্র আমাদের দেখাবার জন্যে তিনি এনেছিলেন। যেমন তাদের নানারকম বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, গহনা ইত্যাদি। আমরা সেগুলো দেখে খুবই আনন্দ পেতাম।

একদিন তিনি আমাদের ইংরেজী সাহিত্য-সভায় দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বিশেষ করে সেখানকার প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা। কেন হাজার হাজার ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিল, ঐ দেশের সরকার ভারতীয়দের উপর কী কী নতুন আইন জারি করেছিলেন—আর ঐ সব জুলুম ও আইনের বিরুদ্ধে মিঃ গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন—ভারতীয় স্ত্রীপুরুষের কারাবরণ, লঞ্ছনার কথা আমরা সবিশেষ জানতে পেলাম। তাতে ঐ দেশের ভারতীয়দের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও সহানুভূতি হতে লাগল, আর তারা আমাদের আরও কাছে এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গান্ধী পরিচালিত ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেদের ও কর্মীদের কথাও আমরা জানতে পেলাম। গান্ধী-পরিবারভুক্ত হয়ে কয়েকটি ভারতীয় ছেলে মানুষ হয়ে উঠছিল—তাদেব মধ্যে গুজরাটী ও তামিল বেশি। ঐ ছেলেরা নিজেদের কাজ নিজেরাই সব করে, হাতের কাজ ও শিল্প শেখে, সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও করে, বাগান করে, রাস্তাঘাট তৈরি করে—সব নিজেরাই। সঙ্গে আছেন মিঃ গান্ধী ও তাঁর পত্নী কস্তুরাবাঈ এবং শিক্ষকরা। মিঃ গান্ধীর এই আশ্রমের ছাত্র, অধ্যাপক ও অন্যান্য অধিবাসীর মন্ত্র ছিল: ১। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ; ২। দুঃখকষ্ট বরণ করে নেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুতি ; ৩। কায়-মনোবাক্যে সত্যাগ্রহী হওয়া অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করে দাঁড়ানো আর সর্বতোভাবে সত্যপালন।

এই আশ্রমে একটি ছোট ছাপাখানাও ছিল—তার থেকে একটি ইংরেজী ও গুজরাটী ভাষায় খবরের কাগজ বার হত—নাম ছিল 'Indian Opinion'। ছেলেদের হাতের কাজের নিদর্শনও পিয়ার্সন সাহেব সঙ্গে এনেছিলেন। একটা চামড়ার কোমরবন্ধ দেখিয়ে বললেন, "এটা মিঃ গান্ধীর ছেলে রামদাসের নিজের হাতের তৈবি।" এণ্ড্রুজ সাহেব ঐ স্কুলের ছেলেদের

তৈরি চামড়ার একজোড়া চপ্পল কিনেছেন—তিনি নিজেও একজোড়া চপ্পলের অর্ডার দিয়ে এসেছেন।

সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালাবার সময় এই আশ্রমের অধিবাসী সকলেই কারাবরণ করেছিলেন। রামদাসের লেখা তার সুন্দর বৃত্তান্ত আমাদের সেই সময়কার হাতে লেখা ইংরেজী মাসিকপত্র 'The Asram'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে এণ্ডুজ সাহেব এদেশে ফিরে এসে ১৯১৪ সালের ১৭ই এপ্রিল আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন। তাঁকে আমরা যথারীতি অভ্যর্থনা জানালাম। গুরুদেব তাঁর উদ্দেশে যে বাংলা কবিতাটি লিখেছিলেন: "প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার, হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার"—তারই ইংরেজী অনুবাদ: "Friend, thou hast brought the water from the spring of life in the West, we salute thee" ইত্যাদি পাঠ করেন।

আশ্রমের ছেলেদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হল:

"We, the students of Brahmavidyalaya, Santiniketan, desire to express our deep love and appreciation of your great work in the service of our countrymen in South Africa. We realise how you have been taking the message of "Shanti" of the Asram. Wherever you have been, and how you have made our beloved Asram your shelter and inspiration.

"We welcome you back amongst us after this long separation with great joy, and hope that in years to come you will be kept in health and strength to carry on the work of the Asram."

এণ্ডুজ সাহেব আশ্রমে যোগ দিলেন বটে কিন্তু বাইরের এতরকম কাজের সঙ্গে যোগ ছিল যে তাঁকে অনেক সময়ে আশ্রমের বাইরে বাইরে থাকতে হত। কিন্তু যখন তিনি আশ্রমে আসতেন আমাদের নানা কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতেন। এমনকি আমাদের থাকবার একটা ঘরে (সত্যকুটিরে) তাঁর শোবার ও কাজ করবার একটা আস্তানা ছিল। সারাদিন নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁকে পড়াশুনা ও লেখার কাজ করতে দেখেছি। তারই মধ্যে আমাদের ইংরেজী ক্লাশ নিচ্ছেন, গুরুদেবের কাব্য ও ইংরেজী,

লাতিন, গ্রীক সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এ সবের ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও সিমলা, দিল্লী ঘুরে আসছেন। এরকম কর্মব্যস্ত লোক আমরা আর কখনও দেখি নি।

ইতিমধ্যে মিঃ গান্ধীর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেদের সঙ্গে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবের চিঠিপত্র চলছে—তাঁরা আমাদের কথা তাদের লিখছেন—তারাও জবাব দিচ্ছে। পিয়ার্সন সাহেবকে লেখা একটা চিঠি নিচে তুলে দেওয়া হল :

Dated 23-7-1914

Dear Sir,

Thanks very much for your kind letter. You must have expected the vote of thanks much earlier. But as we have not been able to do so we hope you will forgive us.

We see by your kind letter that you have praised us a great deal, and have given us a high position in the minds of our countrymen. But we think that we are not worthy of it, for whatever we have done it was our duty to do so. Therefore we feel certain that we are not worthy of praise. But if anyone was worthy of praise it is surely you two gentlemen who have helped the Indian Community by your great work. And whatever you people have done it has been done unselfishly and with great love. You may depend on it that your work will ever stand fresh and vivid in our mind.

We feel that had you two gentlemen not come here and charmed the Government and the people by your love and kind deeds, there would never have been such an early settlement. Therefore we woe to you people all the love and thanks we can give you.

Before this letter reaches you, you will have known that father, mother & Mr. Kellenbach have left for London and from there they intend coming to the dear motherland. We also expect to leave for India by the 6th August to have once more the fun and play which we had with you. You will be glad to know that your pair of sandals are ready and

they are with father. Before closing this letter our best prayer to the Almighty is that may He give birth many more Andrews and Pearsons like yourselves to help the poor Indian Community.

Will you please convey our love to the boys of "Shantiniketan" and "Gurukula ?"

Yours affectionately,
Devdas, Prabhudas,
Seepoojan, Bhoga,
Coopooswamy,
Revashankar,
Ramdas.

ঐ সময়ে এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে তারা লিখেছিল :

"We are most anxiously and impatiently looking forward for the blessed day on which we will have the pleasure of reading a message from those noble and beloved brethren, who, although so far away from us, had encouraged us, through their brave and noble work in that dark and stormy time of our struggle."

এণ্ড্রুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে মিঃ গান্ধীর একটা রফা হল। ভারতীয়দের মাথা-পিছু তিন পাউণ্ড অতিরিক্ত কর রদ হয়ে গেল। মিঃ গান্ধী সত্যাগ্রহ সংগ্রাম বন্ধ করে বিলাত চলে গেলেন সেখানে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা কায়েমী করার জন্যে। আর মনে মনে ইচ্ছা এবার দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ভারতবর্ষে ফিরে এসে বাস করবেন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে সরকারের বিপক্ষে লড়াইয়ে জয়লাভ করায় সারা ভারতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মুস্কিল হল তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেদের ও কর্মীদের নিয়ে। অধিকাংশ ছেলে পিতৃমাতৃহীন অনাথ। একটা কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় আস্তানা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই ছেলেগুলিকে ভারতবর্ষে এনে কোথায় রাখবেন এই হল সমস্যা। এদেশে এসে হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রমে কয়েকদিন কাটিয়ে দেখা গেল; সেস্থান বিশেষ উপযোগী মনে হল না। তখন এণ্ড্রুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় ফিনিক্স বিদ্যালয়ের

দল শান্তিনিকেতন আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এটা হল ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে (১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২১)। তখন সস্ত্রীক মিঃ গান্ধী বিলাতে।

এই সময়ে গুরুদেব মিঃ গান্ধীকে একখানি চিঠি লেখেন। এটাই বোধ হয় গান্ধীজিকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠি :

Dear Mr. Gandhi,

That you could think of my school the right and likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India has given me real pleasure and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be a great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shantiniketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form living link in the Sadhana of both of our lives.

Very Sincerely Yours
Sd/- Rabindranath Tagore

ফিনিক্স বিদ্যালয়ের দলকে থাকতে দেওয়া হল 'নতুন বাড়ি'র মাঝের কয়েকটা ঘরে। শান্তিনিকেতনের পূর্বসীমানায় বড় রাস্তার ধারে 'দেহলি' গৃহের সংলগ্ন কয়েকখানা খড়ের চালের ঘর এখনও আছে। এগুলোর নামই 'নতুন বাড়ি'। আশ্রম বিদ্যালয়ের একেবারে গোড়ার দিকে (১৩০৮-০৯ সালে) ঐ 'নতুন বাড়ি' তৈরি হয়েছিল গুরুদেবের পত্নী ও পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের থাকবার জন্যে। কিন্তু মৃণালিনী দেবী ঐ বাড়িতে কোনও দিন বাস করেন নি—কারণ আশ্রমে আসবার অল্পদিন পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাবার তিন মাসের মধ্যে তিনি দেহরক্ষা করেন। সেই থেকে 'নতুন বাড়ি' নামটি চলে আসছে এবং ঐ বাড়িতে আশ্রমের নানা কর্মী সপরিবারে বাস করেছেন, এখনও করছেন। এক সময়ে শিশুবিভাগের ছাত্ররাও থাকত। যা হোক, এই 'নতুন বাড়ি'তে গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা বাস করতে লাগলেন। ঐ বাড়ির উত্তর দিকের ঘরগুলোয় তাঁদের রান্নাবান্না আর উত্তরের বারান্দায় খাওয়া-দাওয়া হত। চাকর বামুন কেউ ছিল না, ছেলেরা ও শিক্ষকরা

একসঙ্গে সব কাজ করতেন। দলে ১৫।২০ জনের বেশি ছিল না। তাঁদের মধ্যে গান্ধীজির তিন পুত্র মণিলাল, রামদাস ও দেবদাস ছিলেন—আর ছিলেন ভাইপো মগনলাল। মণিলাল অল্পদিনের মধ্যে চলে যান। গান্ধীজির জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলাল মাঝে কয়েকদিনের জন্যে এসেছিলেন। তিনি কখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় যান নি—এদেশেই পিতামহীর কাছে মানুষ হয়েছিলেন।

সে সময়ে আমি ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্র অর্থাৎ বড় ছেলেদের দলে। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে ভাব হতে দেরি হল না। মিঃ দত্তাত্রেয় নামে একজন ভদ্রলোক কিছুদিন আগে থেকেই আশ্রমে বাস করছিলেন—তাঁর সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় ছিল—কারণ তিনি আমার সাহায্যে 'গোরা' বইখানা পড়তে শুরু করেছিলেন। তিনি গুজরাটবাসী—গান্ধীজির দলের সঙ্গে তিনি শীঘ্র ও সহজে মিশে গেলেন। মিঃ দত্তাত্রেয় বর্তমানে কাকা কালেলকার নামে খ্যাত। তাঁর বাংলা পড়ার উৎসাহ দেখে গান্ধীজির ছোট ছেলে দেবদাসও বাংলা পড়তে শুরু করেন। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গেও আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। তার থেকে অন্যান্য সকলের সঙ্গেও মিশে যেতে দেরি হল না।

আর একজন তামিল ভদ্রলোক কিছুদিন থেকে আশ্রমে বাস করছিলেন। তাঁকে আমরা মিঃ রাজাঙ্গম বলে জানতাম। গান্ধীজির বন্ধু রেঙ্গুন প্রবাসী ব্যারিস্টার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মেহ্‌তার তিনপুত্র ছগনলাল, মগনলাল ও রতিলাল এই সময়ে আশ্রমের ছাত্র ছিলেন। মিঃ রাজাঙ্গম এই ছেলেদের বিশেষ অভিভাবকরূপে দেখাশোনা করতেন—সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের অন্যান্য ছাত্রদেরও তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মতো জিতেন্দ্রিয় নিষ্ঠাবান ব্যক্তির আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল। মাঝরাত্রে ছেলেদের বিছানার পাশে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন। কেউ উপুড় বা চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে দেখলে তখনই অতি সন্তর্পণে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিতেন, দরকার হলে গায়ে কাপড় ঢেকে দিয়ে আস্তে আস্তে চলে যেতেন। এই মিঃ রাজাঙ্গমও ফিনিক্স বিদ্যালয়ের দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে ঐ দলের আগে থেকেই যোগ ছিল।

ইতিমধ্যে গান্ধীজি ও তাঁর সহধর্মিণী কস্তুরাবাঈ ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বম্বে পৌছবার পর তাঁরা জানলেন যে তাঁদের ছেলেরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে আছে। বম্বেতে কয়েকদিন থাকার পরে

গৃহ) দিক থেকে গান্ধীজি একলা আসছেন—খালি পা, গায়ে পাতলা একখানা চাদর আলগোছে ফেলা। 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা বাড়িতে তখন ছিল শান্তিনিকেতন পোস্টঅফিস (এখন সেখানে শিল্পসদনের দোকান)। পোস্টঅফিস থেকে 'নতুন বাড়ি'তে যাবার পথে আমতলায় আমাদের ক্লাশ হচ্ছিল। গান্ধীজি যেতে যেতে পিয়ার্সন সাহেবকে ক্লাশ নিতে দেখে ক্লাশের কাছে এগিয়ে এসে থামতেই আমরা সকলে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলাম ; পিয়ার্সন সাহেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতের বইখানা গান্ধীজির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন : "You please take this class।" গান্ধীজি অম্লান হেসে বললেন : "No, no, Mr. Pearson. I will always learn English from an Englishman. You better go on—I will sit with the boys"—বলেই আমাদের একটা আসনে বসে পড়লেন। পড়া যেমন চলছিল চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পড়া চলার পর পোস্টঅফিস থেকে শশী পিয়ন এক টেলিগ্রাম এনে গান্ধীজির হাতে দিল। টেলিগ্রামখানা পড়েই গান্ধীজি বলেন : "Gokhale is no more ! I must go at once !" বলেই তিনি ঘরের দিকে হন হন করে চলে গেলেন।

আশ্রমময় গোখলের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢং ঢং করে সভার ঘণ্টা পড়ল—আর সকল আশ্রমবাসী আমবাগানে মিলিত হলেন। গান্ধীজি গোখলের বিষয়ে কিছু বলে বললেন : "আমি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত যে তাঁর অবর্তমানে তাঁর Servants of India Society-র কাজের পরিদর্শনে সহায়তা করব—তাই আমি আজই পুণায় রওনা হচ্ছি।" তারপর আমাদের অধ্যাপক নেপালবাবু গোখলের জীবন ও কাজের কথা আমাদের বললেন। দেশের জন্যে তিনি কি করেছেন, তাঁর Servants of India Society কি এবং তার আদর্শ কি—সব কথাই আমরা জানতে পারলাম।

বিকালের গাড়িতে গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ পুণা রওনা হয়ে গেলেন, আমরা তাঁদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। মাথায় পাগড়ি, গায়ে ফতুয়া, পায়ে চপ্পল—শীর্ণদেহ, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—এখনও যেন চোখের উপর ভাসছে। সে তারিখটা ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫—আশ্রমে মাত্র তিনদিন ছিলেন। গান্ধীজির বয়স তখন হবে ৪৫ বছর। এবার গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা

হল না। গুরুদেব তখন কলকাতায় ছিলেন। গান্ধীজি পুণা রওনা হবার দিন দুই পরে গুরুদেব ফিরে এলেন। তখন তিনি স্কুলের কুঠি বাড়িতে থাকতেন। একটি নতুন নাটিকা ও গান লিখতে ব্যস্ত। তারই গানের আভাস মাঝে মাঝে আমরা পাই। একদিন গুরুদেব নাটিকাটি আমাদের কাছে পড়ে শোনালেন। প্রথমে তার নাম ছিল 'বসন্তোৎসব', কিন্তু পরে 'ফাল্গুনী' নামে পরিচিত।

দিন পনরো পরে ৬ই মার্চ, ১৯১৫ গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ আশ্রমে ফিরে এলেন। এইবার গুরুদেবের সঙ্গে গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাৎকার হল। এর থেকে দুজনের বন্ধুত্ব কীভাবে কোন্ পথে গেছে তা তাঁদের জীবনীপাঠক মাত্রেই জানেন।

ইতিমধ্যে আমরা শুনলাম আমাদের সব কাজ নিজেদেরই করতে হবে—জলতোলা, রান্না, বাসনমাজা, তরকারিকাটা, বাটনাবাটা সব কাজ—যেগুলো আগে ঠাকুর-চাকররা করত—এখন ঠাকুর-চাকর থাকবে না। গান্ধীজি নাকি এই প্রস্তাব করেছেন এবং গুরুদেব মত দিয়েছেন। অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্মী, বিশেষত যাঁদের কম বয়স, এই প্রস্তাবে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—কেবল জগদানন্দবাবু, কালীমোহনবাবু, শরৎবাবু প্রভৃতি কয়েকজন শিক্ষক এই ব্যবস্থার অযৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করে দূরে সরে রইলেন। আড়াইশো তিনশো লোকের রান্না, রান্নার বাসনকোসন মাজা—জলতোলা প্রভৃতি ভারী কাজ করে পড়াশুনা করা ও পড়ানো যে সম্ভব নয় তা তাঁরা আগে থেকেই বুঝেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্মী এই ব্যবস্থায় মেতে ওঠাতে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঠাকুর-চাকরদের বিদায় দিয়ে সকলে এই কাজে লেগে গেলেন। কুটনোকোটা, বাটনাবাটা, জলতোলা, বাসনমাজা, কয়লাভাঙা নানা কাজে ছাত্র-শিক্ষক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যেদিন এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় সে তারিখটা ছিল ১০ই মার্চ ১৯১৫—প্রতিবৎসর সেইজন্যে ১০ই মার্চ তারিখে আশ্রমে 'গান্ধী-পুণ্যাহ' উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

নেপালবাবু ও ক্ষিতিমোহনবাবু অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছেন বলে গান্ধীজির পরামর্শমতো খাদ্যের নানারকম ছাঁটাই করতে করতে রোগা হওয়ার পরীক্ষা শুরু করলেন। শেষকালে তাঁরা এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে তাঁদের সবল ও সুস্থ করে তুলতে রীতিমতো সময় লাগল।

এতদিন ঠাকুরচাকরের হাতে রান্নাঘর ও খাবার ঘরের ভার ছিল।

আমরা তো ঘণ্টা পড়লে লাইন করে নিজেদের থালা-বাটি নিয়ে খেতে যেতাম—আর খাওয়ার পর কুয়োতলায় গিয়ে নিজেদের থালা-বাটি মেজে নিতাম—চাকররা চৌবাচ্চা ভরে জল তুলে রাখত। রান্না ও খাবারঘরের বহুদিনের সঞ্চিত ময়লা চোখে পড়ত না। এখন নিজেরা কাজ করতে নেমে চারিদিকের নোংরা চোখে পড়তে লাগল। খাবারঘর বলতে কী ছিল বললে এখনকার ছাত্রছাত্রী তা কল্পনাও করতে পারবে না—শরকাঠির দেওয়াল-ঘেরা, টিনের ছাদওলা লম্বা একটা জায়গা ছিল আমাদের খাবারঘর—তার পাশে মাটির দেয়াল, খড়ের চাল দেওয়া একটা ঘরে ছোট ছেলেরা খেত—এই ঘরটায় আগে চাকররা থাকত—তাই এটার নাম ছিল চাকরদের ঘর। পরে ছেলের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এই ঘরটা হয় শিশু-বিভাগের ছেলেদের খাবার জায়গা। তবে দুটো খাবার ঘরের মেঝে ছিল পাকা—সিমেণ্ট-করা—কিন্তু মেঝের উপর কতকালের শুকনো ডাল ভাত তরকারির প্রলেপ পড়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। এখনও চোখের উপর ভাসছে—হাফপ্যাণ্টপরা, গেঞ্জিপায়ে, পিয়ার্সন সাহেব কী নিষ্ঠার সঙ্গে বহুদিনের সঞ্চিত ক্লেদ চেঁছে পরিষ্কার করতে করতে দারুণ গ্রীষ্মে গলদঘর্ম হয়ে লাল হয়ে উঠেছেন। আর একদিকে সন্তোষদা, নগেন গাঙ্গুলী মশায়, অসিতবাবু, প্রমোদাবাবু, প্রভাতবাবু প্রভৃতি শিক্ষকগণ রান্নার বড় বড় ডেক, কড়াই, গামলা মাজা নিয়ে বড় ছেলেদের সঙ্গে একযোগে হিমসিম খাচ্ছেন—এ দৃশ্যও ভোলবার নয়। বেগুন কেন ঝোলের মধ্যে ডুবছে না এই নিয়ে সকলের চিন্তার অন্ত ছিল না।

সকলকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গান্ধীজি ঘুরে ঘুরে কাজ দেখে বেড়াচ্ছেন। দেখে গেলেন রান্নাঘরের সামনে নালার মধ্যে বাসি ভাত তরকারি পড়ে রয়েছে। পরিষ্কার করে ফেলার জন্যে দু-একজনের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করে তিনি অন্যদিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখেন—নালার ভাত তেমনি রয়েছে। কাউকে কিছু না বলে নিজেই গান্ধীজি হাত দিয়ে ভাত ও ময়লা তুলতে বসে গেলেন। তখন অন্য সকলে এসে তাঁকে কোনও রকমে নিবৃত্ত করে তাড়াতাড়ি নালাটা পরিষ্কার করে ফেলল। তখন বোঝা গেল এই লোকটির কাছে কাজে শৈথিল্য চলবে না—সবাই সাবধান হয়ে গেল। কখন কোথায় কি ঘটে তার জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে রইল।

ঠাকুরচাকর তো বিদায় নিয়েছে—এমনকি মেথরও। তখন চারদিকে খোলা মাঠ ও অবারিত খোয়াই থাকাতে অধিকাংশ আশ্রমবাসীর কোনও কাজের জন্যে মেথর ছিল না বটে তবে আশ্রমসীমানার বাইরে রান্নাঘরের পশ্চিমে পাশাপাশি তিনটে খাটা পায়খানা ছিল—কোনও কোনও শিক্ষক এবং রোগীরা অসময়ে ব্যবহার করতেন। মেথর চলে যাওয়াতে পায়খানা পরিষ্কার করা নিয়ে সমস্যা হল। সকাল থেকে মেথরের অভাবে খাটা পায়খানার বালতি যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে। গান্ধীজি কাউকে কিছু না বলে নিজেই বালতি টেনে নিয়ে পরিষ্কার করতে চললেন। সন্তোষদা এবং আরও কেউ কেউ ছুটে গিয়ে তাঁর হাত থেকে বালতি নিয়ে পরিষ্কার করে আনলেন। সকলেই বুঝল এ লোকটির সঙ্গে কাজ করা কত শক্ত, না-করা আরও মুস্কিল।

আমরা যে-সময়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বাবলম্বী হবার প্রাণপণ চেষ্টায় মেতে উঠেছি, গুরুদেব সে-সময়ে আশ্রমের মধ্যে বাস করতেন না—তিনি থাকতেন সুরুলের কুঠিবাড়িতে। খবর সব তিনি রাখতেন, শুধু নিজে দূরে রইলেন। সন্ধ্যার দিকে আশ্রমে এসে বড় ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। বেণুকুঞ্জের বারান্দায় আমরা সব জড়ো হলাম—মাস্টারমশায়রাও এলেন। যে-কথাগুলি গুরুদেব বলেছিলেন তার যে-টুকু মনে আছে তা এই : "মিঃ গান্ধী তোমাদের সব কাজ নিজেদের করতে বলেছেন—তোমরাও শুনছি খুব উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেছ। এটা ভালোই হয়েছে। তবে এর মধ্যে অনেকখানি পরিশ্রম আছে এবং কিছুটা কষ্ট ও অসুবিধা যে নেই তা নয়। যিনি নিজে বরাবর শারীরিক পরিশ্রম করেছেন এবং অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, তিনিই আজ তোমাদের পরিশ্রম ও কষ্ট করার কাজে প্রবৃত্ত করেছেন—এটাই হয়েছে সমীচীন। আমি এ ব্যবস্থা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেও তোমাদের কখনও এরকম কাজে প্রবৃত্ত হতে বলতে পারি নি তার কারণ আমি নিজে কখনও হাতেকলমে শারীরিক পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত নই—তাই তোমাদের করতে বলার অধিকার আমার নেই। মিঃ গান্ধী যে তোমাদের বলেছেন সেটাই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তোমাদের পড়াশুনার হয়তো এতে কিছু ক্ষতি হবে কিন্তু নিজের কাজ নিজে করবার যে অভিজ্ঞতা তোমরা এই তরুণ বয়সে লাভ করছ তা তোমাদের জীবনে নিশ্চয়ই সার্থক হবে এ আমি বিশ্বাস করি···।" এগুলো ঠিক গুরুদেবের নিজের ভাষা যে নয় তা বলাই বাহুল্য। গত ৪৫

বছর ধরে যে কথাগুলো আমার মনের উপর রেখাপাত করে আছে উপরের কথাগুলো হল তারই প্রতিক্রিয়া।

সে সময়ে আশ্রমে ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্ররা 'জাত' রক্ষা করে আলাদা পংক্তিতে ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না খেতেন, অব্রাহ্মণ কোনও খাদ্য স্পর্শ করত না। যখন স্বাবলম্বন প্রথা শুরু হল তখন রান্নাঘরে যে-সব শিক্ষক ও ছাত্র 'জাত' মানতেন না তাঁরা রান্না করতে লেগে গেলেন। সুতরাং যে-সব ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্র আলাদা ব্রাহ্মণের রান্না খেতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের জন্যে হরিবাবু ও শাস্ত্রীমশাই যে আলাদা বাড়িতে থাকতেন তারই একটা ঘরে রান্না হতে লাগল। খুব সম্ভব সেখানে ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত থাকল—ঠিক মনে নেই। শাস্ত্রীমশাই চিরদিন স্বপাক আহারে অভ্যস্ত, তাঁর সম্বন্ধে এই স্বাবলম্বন নীতির কোনও প্রশ্ন ছিল না। ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্রদের আলাদা রান্না খাওয়া নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনা এমনকি মতদ্বৈধ হয়, সেকথা তখন আমরা টের পাই নি। রবীন্দ্রজীবনীপাঠে এখন জানতে পারি।

যা হোক, আমাদের স্বাবলম্বন প্রথা চালু করে দিয়েই গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ ১১ই মার্চ আশ্রম থেকে রওনা হলেন রেঙ্গুন যাবার জন্যে। আমরা তখন রান্নাবান্না, বাসনমাজা, বাটনাবাটা, কয়লাভাঙা, জলতোলা প্রভৃতি নিয়ে এতই ব্যস্ত যে কখন তাঁরা চলে গেলেন তা টের পাই নি। দিন কুড়ি পরে এপ্রিলের গোড়ায় তিনি রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেই তাঁর বিদ্যালয়ের দলকে নিয়ে হরিদ্বার চলে গেলেন। সেখানে সেবার কুম্ভমেলা হবার কথা—লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হবে। দেশের লোকের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যাবে এই আশাতেই গান্ধীজি সদলবলে সেখানে চললেন। কোনও বিদায়সভা হয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে ট্রেনে একখানা থার্ডক্লাশ কামরায় তাঁরা সকলে উঠে বসেছেন—ট্রেন ছেড়ে দিল—আর রামদাস, দেবদাস, কুপুস্বামী, প্রভুদাস প্রভৃতির সঙ্গে আর দেখা হবে না এই বেদনা-বোধটুকু মনে আছে। আর দেখাও হয় নি। তিন-চার মাসের মেলামেশা জানাশোনার অবসান হল।

গান্ধীজি যে-কাজে আমাদের লাগিয়ে দিয়ে গেলেন, তা আমরা প্রাণপণে করে যেতে লাগলাম।

আশ্রমে আমাদের খাওয়াদাওয়া ছিল খুবই সাদাসিধে। নিরামিষ তো

বটেই—মাংস, মাছ, ডিম কিছুই খাওয়া হত না। ছাত্র শিক্ষক এবং আশ্রমের অন্যান্য কর্মী সকলেই রান্নাঘরে একই আহার্য গ্রহণ করতেন। ভাত ডালের সঙ্গে একটা তরকারি আর আলুর সঙ্গে কখনও পটল, কখনও ওল, কখনও লাউ, কখনও ডালের বড়া দিয়ে একটা ঝোল। মাঝে মাঝে টক আর ঘোল বা দুধ। সে সব আমরা পরম আনন্দে খেয়ে তৃপ্ত হতাম। রান্নাঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল : "অন্নং ন নিন্দেৎ"—রান্না খারাপ হয়েছে কি মনোমতো হয় নি বলে অনুযোগ করেছি বলে মনে পড়ে না। সকাল বিকাল জলখাবার ছিল নানারকমের—ঠাকুরচাকরে দিত—কখনও লুচি ডাল, কখনও মোহনভোগ, কোনও দিন বা সিঙ্গাড়া কি গজা।

ঠাকুরচাকর যখন চলে গেল তখন দুবেলা ডাল ভাত তরকারি ঝোল রাঁধতেই আমাদের সব সময় যেত ও পরিশ্রম হত। দুবেলা আগের মতো জলখাবার করার সময় ও অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। তাই যে-সব জিনিস রান্না না করে খাওয়া যায়, যেমন চিড়ে, মুড়ি, ছাতু প্রভৃতি খাওয়ার ব্যবস্থা হল। বোলপুর বাজারে আমাদের দরকার মতো ছাতু, চিড়ে মেলা ভার। উৎসাহী তরুণ শিক্ষক প্রভাতবাবু কলকাতা থেকে ছাতু, চিড়ে বস্তাভরে কিনে আনলেন। পরের দিন সকালে দই চিনি দিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে ছাতু মাখা হল—কিন্তু মুখে দিয়েই সকলে থু থু করে উঠল—গলাধঃকরণ করা গেল না। তখন বোঝা গেল ছাতু বলে বস্তাবোঝাই যা এসেছে তা বেশন, ছাতু নয়। নিজেদের হাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় যে-সকল ছোটবড় গণ্ডগোল মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগল—এটি তার অন্যতম।

মিঃ গান্ধীর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের খাওয়াদাওয়া ছিল আরও সরল। দুপুরের আহার ছিল মোটা মোটা আটার রুটি আর তার সঙ্গে হয় ডাল কিংবা তরকারী—তার বেশি কিছু নয়। আর সন্ধ্যায় ছিল ফলাহার বা ছাতুমাখা বা ঐরকম সামান্য কিছু। গান্ধীজির উপদেশে তাঁদের দলে মিঃ কোটিয়াল বলে একজন মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষক-কর্মী ছিলেন। তাঁকে সকলে "আন্না" বলে ডাকতেন তাই আমরাও "আন্না" বলতাম। রাজাজয়, "আন্না" আর গান্ধীজির ভাইপো মগনলালের পরামর্শমতো সন্তোষদা দশ-বারো জন বড় ছাত্র নিয়ে খাদ্যসংস্কারক দল গঠিত করলেন। নবাগত তরুণ শিক্ষক প্রমোদাবাবুও

এইদলে যোগ দিলেন। আমরা ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতো খাওয়া শুরু করলাম। তাদেরই রান্নাঘরের পাশের একটা ঘরে হল আমাদের রান্নাঘর। রাজাজম, "আন্না" হলেন আমাদের পরামর্শদাতা। সকালে ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে পালা করে এসে মোটা মোটা আটার রুটি হাতে গড়ে চাকি বেলুনের ব্যবহার না করে এবং আগুনের উপর না সেঁকে কেবল তাওয়ায় সেঁকে রুটি তৈরি করতাম। এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে গরম তাওয়ার উপর রুটিটা চেপে ধরলে ফুলে ফুলে উঠত এখনও মনে আছে। তার সঙ্গে কোনও দিন শুধু ডাল, কোনও দিন বা শুধু একটা তরকারী। যতদূর মনে পড়ে নুন ও হলুদের গুঁড়ো ছাড়া আর কোনও মসলা ছিল না। সামান্য পরিমাণ তেল ও ঘি ব্যবহার করা হত। এ সব রসদ রান্নাঘরের সরকারী ভাড়ার থেকে আনা হত। সন্ধ্যার উপাসনার পরই রাত্রের খাওয়া শেষ করতে হত। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেরাও তাদের সান্ধ্যভজনের পর রাত্রির আহার শেষ করত। তাদের মতো আমাদের আহার্য ছিল দুটো কাঠালিকলা, গোটা দুই যষ্ঠি ডুমুর, ১০।১২ টা গোটা কাঁচা চিনাবাদাম, কখনও বা গোটা ২।৪ পিণ্ডি খেজুর। এই সামান্য আহারে আমাদের মতো উঠতি বয়সের ছেলেদের চলবে কেন? তার উপর সারাদিন পরিশ্রম। আমাদের দলের ছেলেরা বড় রান্নাঘরের কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল—আমাদের নিজেদের কাজে সময় কম যেত না। যাহোক রাত্রে ক্ষিধেয় আমরা অস্থির হয়ে পড়তাম। এইরকম ফলাহারে মাঝে মাঝে পেটের অসুখও দেখা দিতে লাগল। কিন্তু খাদ্য সংস্কার খুব বেশিদিন চলেছিল বলে মনে হয় না। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের দল হরিদ্বার রওনা হয়ে যাওয়ার ২।৪ দিন পরেই বোধহয় আমাদের পরীক্ষা উঠে গিয়েছিল—ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু স্বাবলম্বন প্রথা মাস দেড় দুই চলেছিল। ২৫শে বৈশাখ (৭ই মে ১৯১৫) গুরুদেবের জন্মদিনের পর আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেল। ছুটির পর আর এ ব্যবস্থা চলে নি। মনে পড়ছে ছুটির আগে 'ফাল্গুনী' অভিনয় যথারীতি হয়েছিল।

তখন রান্নাঘরে এক এক বেলায় আড়াইশো তিনশো লোক আহার গ্রহণ করত। ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া আশ্রমের সকল কর্মী তখন রান্নাঘরে খেতে পেতেন, তার জন্যে কাউকে কোনও পয়সা দিতে হত না। এত লোকের জন্যে রান্না-বান্না, বড় বড় হাঁড়ি কড়াই মাজা, জলতোলা প্রভৃতি কাজ ১৪।১৫।১৬ বছরের ছেলেদের পক্ষে দিনের পর দিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত করা সোজা

ছিল না। যদিও মাস্টারমশাইরা আমাদের সঙ্গে সমস্ত কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন—তবু ঠাকুরচাকর ছাড়া এ কাজ করা সম্ভবপর মনে হল না—তার উপর ছিল সকাল দুপুরে ক্লাশ করা। গ্রীষ্মের ছুটির পর আবার ঠাকুরচাকর ফিরে এসে নিজের নিজের কাজে বাহাল হল।

তবে আমাদের এই দেড-দুমাসের অভিজ্ঞতার যে কোনও মূল্য ছিল না আমাদের জীবনে তা বলতে পারি নে। এই উদ্যোগকে স্মরণ করে প্রতিবছর ১০ই তারিখে শান্তিনিকেতনে গান্ধীদিবস পালিত হয়—সেদিন ঠাকুরচাকব সবাই একবেলা ছুটি পায়—বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা সেদিন মনের আনন্দে রান্নাবান্না কাজকর্ম করে—এখন বড় বড় ছেলেমেয়ের অভাব নেই—তাব উপর মাত্র একবেলার কাজ—বিশেষ কিছুই মনে হয় না—অনেকটা পিকনিক করার মতো হেসেখেলে দিনটা কেটে যায়।

যিনি আমাদের স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন সেই গান্ধীজিকে এবং যিনি কখনও কোনও পরীক্ষা করতে পেছপা হতেন না সেই গুরুদেবকে 'গান্ধী-পুণ্যাহে' স্মরণ করে প্রণাম জানাই। আর যে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজের মধ্যস্থতায় এই দুই পুরুষের মিলন সম্ভবপর হয়েছিল সেই এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবকে এই সঙ্গে স্মরণ করি ও প্রণাম নিবেদন করি।

বলা বাহুল্য এর অনেক কথাই ৪৫ বছরের আগেকার স্মৃতি থেকে লেখা—তবে সেই সময়কার আমাদের ইংরেজী হাতের লেখা 'The Asram' নামক পত্রিকার পাতা উল্টে অনেক কথা মনে পড়ল। পত্রিকাগুলির কয়েকখণ্ড রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত আছে। আবও বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে বলা নিষ্প্রয়োজন যে অনেক কথা রবীন্দ্রজীবনী পড়তে পড়তে ঝালিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমার কাছে একটি অমূল্য সম্পদ গত ৪৫ বছর ধরে আছে তার বিষয় বলে আমার এই স্মৃতিকথা শেষ করব। হরিদ্বারের কুম্ভমেলার পরে গান্ধীজি আমেদাবাদের কাছে সাবরমতিতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন—সে কথা সকলেই জানেন। ১৯১৫ সালেব সেপ্টেম্বর মাসে পূজাব ছুটির সময় এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেব সাবরমতি আশ্রমে গিয়ে জুটেছিলেন। সেখান থেকে আশ্রমবাসী সকলে একখানা ছবির কার্ডে প্রত্যেকে নাম সই করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। গান্ধীজি তখন হিন্দী শিখতে শুরু করেছেন মাত্র, তিনি

হিন্দীতে নাম সই করেছেন। দেবদাস আমার কাছে বাংলা শিখতেন বলে তিনি বাংলায় নাম লিখেছেন।

Ahmedabad
Greetings from us all
Chhotolal

25 Sept
1915

पार्थसारथी
शिवपूजन
मो. क. गांधी
Magau bhai
Coopooswamy
Naranswamy
Phabhudas
কস্তূর গাংধী
দেবদাস
Maganlal Gandhi
Ramdas M. Gandhi
Balasubrai Rao
Anna
C. F. Andrews
W. W. Pearson

Sj Surit Kumar Mukherjee
Shantiniketan
Bolpur
Bengal

প্রবন্ধটিতে পরলোকগত লেখক শান্তিনিকেতনের আশ্রমের একটি পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। পরিচ্ছেদটি ক্ষুদ্র হলেও বিশিষ্ট। তথ্যগুলি সবই নতুন না হলেও কিছু কিছু নতুন এবং লেখকের মতামত নির্বিশেষে জিজ্ঞাসুদের পক্ষে স্মরণীয়, তথ্য হিসেবে মূল্যবান—সম্পাদক।

দেবদারু, ডবলডেকার এবং বিনোদ

অরূপ বসু

"দরজাটা দিয়ে দাও," মীরা বলল, "নীলা রইল, আমার দেরি হলে ওকে চা করে দিতে ব'লো।"

বিনোদ বলল, "আচ্ছা।" তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ওর অভ্যেসমতো মীরার হাঁটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পেছন থেকে দেখল; বরাবরই মীরা একটু পা টেনে টেনে হাঁটে, এখন ডান হাতে হলদে রঙের একটা মেয়েলী থলে, ডান হাতটা রোগা যেন শুকিয়ে গেছে। পিঠটার ঢালও আগের মতো নেই। কথাটা মনে হওয়ার পরই বিনোদ বিড়ি ধরাল, তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে চৌকিতে বসল। বিড়ির গন্ধ মীরার সহ্য হয় না, ভাগ্যিস সে এখন নেই।

মীরা চলে যাওয়ার পর বাড়িটা সত্যি সত্যি খালি হয়। দুপুর বেলার বাড়ি এত নির্জন! কলের মুখ শুকনো, পেতলের গায়ে বিষাদ ভরা, আর এঁটো বাসনপত্তরগুলো মাছের সরু সরু কাঁটায় ভরে গিয়ে নির্জন হয়ে যায়।

ঘরের জানালা তিনটে। তার মধ্যে দুটোই বন্ধ করা থাকে নর্দমার আর আবর্জনার গন্ধের জন্যে। এখন তিনটেই বন্ধ ছিল। দেওয়ালের রঙ এমনিতেই বহু পুরনো চটে যাওয়া, ম্যাটমেটে, বিশ্রী, দম আটকানো এক-রকমের হলদে। দেওয়ালের দিকে তাকালেই পচা ফলের খোসার কথা মনে পড়ে যায়। সেই দেওয়ালের মধ্যে ছায়া, আর ছায়ার মধ্যে দেওয়াল ঘড়িটা হৃৎপিণ্ডের মতো সর্বক্ষণ আওয়াজ করে চলেছে। এই দেওয়ালটা বিনোদের সহ্য হয় না। কেননা ওদিকে তাকালেই রোজকার অস্বস্তিটা ফিরে আসে। অবশ্য নিয়মিত বলে অস্বস্তিটাও তার অনেকখানি অভ্যেস হয়ে এসেছে, তবু রেহাই পাবার অনেক চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু পোষা বেড়ালের মতো অস্বস্তিটা ঠিক ফিরে আসে। অফিসপাড়ায় ঘোরাঘুরি করে ডালহৌসী স্কোয়ারে গিয়ে শুয়ে থেকেই—কলাবতীফুলের লাল ছোপ, বিদেশী

ব্যাঙ্কের লাল সোনালী লালে মেশানো পতাকা, আঙুলের মতো উঁচনো জাহাজের হলদে মাস্তল, ভিজেমাটির আঁশটে জলজ গন্ধ, শামুকের খোল, মাটিতে পড়ে থাকা পাথরের কুচি, কুটো, কাঠি আর দুপুরের সূর্য, আর ট্রামের অর্থহীন ঘুরে ঘুরে যাওয়া দেখতে দেখতে সময় কেটে যেত। তারপর বাড়ি ফিরত ট্রামের বাসের শব্দে বিষণ্ণ হয়ে, ভীড়ের ধাক্কায় ক্লান্ত হয়ে। কিন্তু মিছিমিছি হয়রান। কাজের বেলায় কিছু হয় না অথচ পয়সা নষ্ট হয় বলে মীরা আর এখন পয়সা দেয় না। আর ওরকম নাছোড় ঘোরাঘুরি করতেও চায় না বিনোদ। কী হবে? চাকরি হবে না এটা প্রায় সে একরকম ধরে নিয়েছে। বাড়ির সকলেও তাই।

মীরা ইশকুলে কাজ করে, সেলাই শেখায়। বিনোদের আর লজ্জা করে না, আগে করত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু যখন নীলা ছাড়া সকলেই দুপুরের আগে বেরিয়ে যায় অফিসে অথবা ইশকুলে, তখনই অস্বস্তিটা আস্তে আস্তে ফিরে আসে, অন্ধকারে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোল খায় চতুর্দিকে। সারা ঘরটা তারপর তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

বিনোদও চোখ ফেরাতে পারে না।

ছায়া আর ঘষা স্ফটিকের মতো আলো মিলে ঘরের জিনিসপত্তরগুলোর চেহারা তখন অপরিচিত গঠনের বলে মনে হয়। ঘরে একটা কমলা রঙের শাড়ি শুকোচ্ছিল। শাড়িটা নীলার। নীলা এখন বোধহয় ওঘরে শুয়ে আছে। জল খেতে ইচ্ছে করছিল, একবার ডাকলে হত। এ ঘরে কুঁজো নেই। কিন্তু তক্তাপোশ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না বিনোদের। থাক, সে ভাবল, না হয় পরে খাব। কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। এখন বৃষ্টি হলে বেশ হত। হয়তো এখন মেঘও করেছে বাইরে, ঘরের মধ্যে গরম লাগছে। কিন্তু জানালাগুলো বন্ধ। খুলতে ইচ্ছে করছে না।

ঘরের মধ্যে জিনিসপত্তরের হাট, ছড়ানো, ছত্রাকার করা। বিনোদের প্রায় মুখস্থ—আলনার পাশে বইয়ের তাক উপচে পড়েছে। নীচে খবরের কাগজের স্তূপ। সেই স্তূপ প্রায় তাকে এসে ঠেকেছে। তাক থেকে কিছুদূরে মালপত্তরের স্তূপ। কাঠের একটা মস্ত তোরঙ্গ, তার ওপর বিছানাপত্তর ডাঁই করা। তার পাশেই আবার আরেকচোট ট্রাঙ্ক আর সুটকেশের গাদা। একটা বেথাপ্পা রকমের কাঁথা ঢাকনি হিসেবে পাতা। ওই কাঁথাটা মীরার ঠাকুমার হাতের তৈরি। আরেকটু ডানদিকে দেওয়ালের গায়ে পেরেক পুঁতে তার

ওপর তিনটে কাঠের তক্তা পর পর দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তাক তৈরি করা হয়েছে—এসব ব্যাপারের কারিগরী বিদ্যে অবশ্য মীরার বাবার। সারা বাড়িতে জামাকাপড় শুকোনোর তার টাঙানো থেকে শুরু করে বালতি মগ ভেঙে গেলে পিচ অথবা ধুপ লাগিয়ে ফুটাফাটা বন্ধ করে দেওয়া, বিভিন্ন বিচিত্র আকারের তক্তা দিয়ে বাক্স তৈরি করা, টবে তুলসী কিংবা ফুলের চারা লাগানো, চৌকী কিংবা জানালা দরজার কোথাও জখম হলে কাঠের অথবা টিনের পটি মেরে সারাই করা, উঠোন সাফ করা—যাবতীয় কাজে উনি বিশেষজ্ঞ বিশেষ। মেরামতী কাজের জন্য কিংবা ভবিষ্যতে কোনও কাজে লাগতে পারে বলে সবসময়েই পুরনো এবং অকেজো বলে ফেলে দেওয়া পেরেক, টিনের পাত, দড়ি, টিনের কৌটো কাঠের বাক্সটায় মজুত করে রাখেন। তিনটে তাকের ওপর ছোট বড় নানান আকারের রাজ্যের টিনের কৌটো, শিশি, আয়না, চিরুনি, পানের বাটা সাজানো। কাঠের বাক্সটার ঠিক সামনে দেওয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গী; তার মধ্যে কালোর ওপর সোনালী কাজ করা জগন্নাথের পট, পাটল রঙের শাঁখ, বেগুনী রঙের মস্ত একটা কড়ি, লাল কাপড়ের গায়ে হেলান দিয়ে সাজানো পেতলের কয়েকটা মূর্তি। সমস্ত ঠাকুরের মাথায় সিঁদুরের গলা দাগ, সামনে ছোট ছোট থালায় বাতাসা দেওয়া। পিঁপড়ের সমস্তক্ষণ সেইজন্য জায়গাটা ভরে আছে। এঘরে বড় পিঁপড়ের উৎপাত। পিঁপড়ে দেখলে মেরে ফেলা বিনোদের অভ্যাস। কিংবা আঙুল কাছে এনে ভয় দেখানো—এটি তার ছোট বেলার স্বভাব। পোকামাকড় যেমন সে ভালোবাসত, তেমনি আবার মারত। ধুপদানী, প্রদীপদানী, একটা সরষের তেলের শিশি, সিঁদুরের কৌটো, চন্দনের পাটা, মাছের মতো দেখতে তামার কোশাকুশি, সমস্তক্ষণই জায়গাটা থেকে মিষ্টি আর পচা গন্ধ উঠছে। কালকে বাসে করে, কত নম্বর বাস? 33 CHETLA লাল রঙে লেখা? না, কালো। কুচ্ছিত চামড়ার গন্ধ রেল লাইনের পাশে। কী করে থাকে আশেপাশের লোক? বাসে কোনও লোকের মুখই মনে পড়ছে না, শুধু মনে আছে ড্রাইভারটা গীয়ার পালটানোর সময়ে ঘড় ঘড় করে বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছিল। কুলুঙ্গী ছাড়া এরপর রয়েছে জামাকাপড় ঝোলানোর একটা র‍্যাক, কলেজ স্ট্রীটে এগুলো বিক্রি করে, আজকাল কলেজ স্কোয়ারে কী ভীড়। আর ফুটপাথে জামাকাপড়ের হকারদের জন্য চলবার যো নেই। মাঝে মাঝে

পুলিশে ধরে নিয়ে যায় গাড়িতে চাপিয়ে, কিন্তু লোকগুলোই বা কোথায় যাবে? বাচ্চাদের প্যাণ্ট, আর মেয়েদের জামায় ঠাসা দোকানকটা, সেদিন মীরার জন্ত ব্লাউজ কিনতে গিয়েছিলাম, দোকানে কী বিশ্রীভাবে মেয়েদের বডিস সাজানো, দর্জিগুলো নেহাতই বজ্জাত, রাস্তার ছোঁড়া অথবা বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোই বা কম কী, নাঃ, দিনকাল ক্রমে খারাপ হচ্ছে, উঃ গতবছর কী রকম গুলি চলল শ্যামবাজারে, তিনদিন পাঁচমাথার মোড় দিয়ে কেউ হাঁটেনি, ঠিক এই সময়টাতেই আবার ব্যবসাটা গেল। উঃ মীরার সঙ্গে কদ্দিন শুইনি! দেওয়ালে অনেকগুলো ছবি টাঙানো, একটা আছে ওদের দুজনকার বিয়ের পরে তোলা, আর সব নানা রকমের ছবি, উপরদিকে মাথা তোলা শিয়ালের, জড়াজড়ি করে থাকা রাধাকৃষ্ণের, কাপড়ের উপর 'পতি পরম গুরু' সুতো দিয়ে লেখা, গান্ধীজীর, দুটো পাখির। ঘরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেমানান সেটা হল খয়েরী রঙের একটা পুরনো অরগ্যান। ওটা মীরার মা নাকি তাঁর বিয়ের সময় পেয়েছিলেন বাপের বাড়ি থেকে। উনি নাকি বেশ বড়লোকের মেয়ে ছিলেন, যখন মারা যান— আর মীরার বাবা তার তুলনায়, আর মীরা? অরগ্যানটা নির্জীব জানোয়ারের মতো পড়ে আছে, মাঝে মাঝে নীলা কিংবা শ্যামল বসে। শ্যামলই বেশির ভাগ বাজায়, ও এককালে পঙ্কজ মল্লিকের রেডিওর দলে ছিল, বি. এস. সি, পাশ করে লোয়ার ডিভিসন কেরানী, কিন্তু বড্ড বেশি কথা বলে আর বাপের কারিগরী বিদ্যের কিছুটা পেয়েছে। আঙুল মটকানোর মতো শব্দ করে একটা আরশোলা দেওয়াল থেকে লাফিয়ে খাটের ওপর পড়ে স্থির হয়ে বসে রইল। আবার জলতেষ্টা পেয়েছে, কী করি? নীলা পাশের ঘরে শুয়ে আছে। ডাকব? যদি কিছু মনে করে। কেন মনে করবে? কেন? আমার তো জলতেষ্টা পেয়েছে।

আস্তে আস্তে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের দরজা ঠেলল বিনোদ। দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। মিণ্টু আর নীলা ঘুমিয়েছিল। নীলার বুকে মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছিল মিণ্টু। তার মাথাটা একহাত দিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে নীলা শুয়ে আছে।

বিনোদ পিছিয়ে এল।

নীলার মাথার কাছে কুঁজো। নীলার রঙ ফর্সা। একটা বড় তিল তার গলার নীচে দেখবার জন্ম ঝুঁকে পড়ল বিনোদ, কিন্তু আসলে তিলটা

অনেক ছোট। এরকম একটা মীরার বুকেও আছে। আগে আগে মীরা—কিন্তু ভয় করছিল বিনোদের, মীরা যদি এখন এসে পড়ে, নীলা যদি এখন জেগে ওঠে, আর যদি তাকে দেখে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছিল, তবু ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। এসে ফের নিজের তক্তাপোশের ওপর বসল। নীলা কলেজে আই. এ. পড়ে, অথচ আজ, আমি—ইস্, হঠাৎ বিনোদের মনে দুঃখ হল, যদি আই. এ.-টা পাশ করতাম। পরীক্ষাই দিইনি, দিলাম না বিজয়ের পাল্লায় পড়ে। বিজয় সোম, মাথার চুল পেছন দিকে টানা, গোল মুখ, এখন নাকি কনট্রাক্টরী করে। আগের কোনও লোকেরই তো এখন খোঁজ রাখি না, অথচ বিজয় এককালে—আচ্ছা বিজয়ের সঙ্গে যদি নীলার ? উঃ নীলা! আচ্ছা নীলার এভাবে শুয়ে থাকাব কী মানে ? মিণ্টুর আঙুল-গুলো ভীষণ ছোট ছোট, আর—নিজের আঙুলের দিকে তাকাল বিনোদ। "নীলা—"। দরজায় কড়া নড়ে উঠল জোরে। বিনোদ দরজা খুলে দিল, মীরা ঘরে ঢুকল। বাসি, মরা মাছের মতো চুপসনো লাগছে তার মুখটা, ঘরে ঢুকেই বলল, "যা মেঘ করেছে, এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে। বাইরে কাপড়চোপড় আছে নাকি ?"

"কী জানি ?"

"ঘুমুচ্ছিলে নাকি ?"

"হুঁ।"

মুখ নীচু করে বলল বিনোদ, মীরা চলে গেল ভেতরে। বিনোদ ফের চৌকীতে এসে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে বৃষ্টির চড়চড় আওয়াজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দরজা খোলা, জোরে বৃষ্টি নামছে। নামুক। জলের তোড় ছুটছে নর্দমা দিয়ে, ঘড়ির শব্দ ডুবে যাচ্ছে বৃষ্টির আওয়াজে। চারিদিকে যেন অগুনতি ছোট ছোট কাঁচের সাদা ফেটেপড়া ফুল, ফোয়ারার মুখ থেকে জল ঝরে পড়ার মতো শব্দ; বৃষ্টির মধ্য থেকে উঠে এসে বিনোদের সামনে মূর্তির মতো দেখতে দেবদারু গাছটা দাঁড়াল, সে চিনতে পারল, ছোটবেলায় পাড়ার সরস্বতী পূজায় পাতা কেটে গেট সাজিয়েছে তারা, বৃষ্টির আওয়াজ তার মাথার মধ্যে আলতো আঙুলের টোকা মারতে লাগল যেন, বিনোদ শুনল, 'কেন ?···কেন ?···কেন ?' আপন মনেই সে বলল, কেন মীরাকে মিথ্যা কথা বললাম ? কেন নীলা শুয়েছিল ? কেন মিণ্টুর আঙুলগুলো ছোট ছোট ? নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল

সে, ভাবল তার কথা বৃষ্টিতে ডুবে যাবে। কিন্তু পেছনে হাসির শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল নীলা, "ছোড়দি জিজ্ঞেস করছে চা খাবেন ?"

ভুরু কুঁচকে নীলাকে দেখতে দেখতে ঘাড় নেড়ে বিনোদ বলল, "হুঁ।" নীলা আবার হাসল, "দরজাটা বন্ধ করে দিন, জলের ছাট আসছে।" বলে পেছন ফিরল। অভ্যেস মতো বিনোদ পেছন থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ওকে। তারপর উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নীলার কোমর চাপা, পিঠটা ছড়ানো, পিঠের ঢালটা সুন্দর। আর সেই তিলটা—কিন্তু, এমন করে ও শুলো কেন ? মীরা কেমন করে শুতো ? অনেক দিন মীরার পাশে শুইনি। দরজার ওপরকার ফাঁকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অদ্ভুত একটা সাদা আলোর মধ্যে পোকার মতো নড়ছে, কী করব ? অরগানটা পোষা জানোয়ারের মতো দাঁড়িয়ে, আলনায় জামাকাপড়, সাদা একটা পাঞ্জাবি, কতকগুলো শাড়ি, একটা সার্ট, আর মস্তবড় দিল্লীর দরবারের ছবিটা, আমাদের ইস্কুলের হলঘরটা এতবড় ছিল যে ওখানে একটা দরবার বসতে পারত, আর বসতও নাকি তাই, ওটা তো মহারাজার বাড়ি ছিল আগে, পরে ইস্কুল হয়েছে, সিংহের ঝোলানো সাদা কেশরের মতো থামের উপরকার গড়ন, ইস্কুলের মাথায় ইংলণ্ডের রাজার একটা লোহার মুকুট ছিল, সেটা একদিন রাত্রিবেলায় কারা যেন খুলে নিয়ে গিয়েছিল, পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গিয়েছিল—আবার সেই দেবদারু গাছটা এসে দাঁড়াল, এতক্ষণ তার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল বিনোদ। এবারে তাকিয়ে দেখল পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে চারিদিকে, নীলা এসে ঘরে ঢুকল, তার শাড়, চুল, মুখ পাতায় ভরে গেছে, সবুজ লাগছে চুলগুলো, মুখটা, চিবুক, সব।

"নিন আপনার চা", ঠক করে শব্দ হল, বাটি নামিয়ে রাখল নীলা, বিনোদ তাকিয়ে দেখল চা-এর সঙ্গে বাটিতে আবার মুড়ি আর পাঁপর ভাজা। নীলা একটু নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়তেই আঁচলটা ঝুলে পড়ল, বাটিটা বিনোদের হাতে দিল সে, "নিন", বিনোদ দেখল অনেকগুলো দেবদারুর পাতা ছোট-খাটো একটা ঝোপের মতো নীলার পিঠের ওপর থেকে কাঁধ বেয়ে গলার ফর্সা বাঁকে পাক খেয়ে খেয়ে গোছা গোছা হয়ে ঘিরে আছে, আশ্চর্য, নীলার একটুও তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, বিনোদ ভাবল একবার বলে, কিন্তু পরক্ষণেই শুনল সে বলছে, "এখনই, এত শীগগির…কী করে এত সব হল ?"

"ছোড়দিকে জিজ্ঞেস করুন।"

"তোমার ছোড়দি কোথায় ?"

"আসছে।" তারপর বিনোদের চোখ লক্ষ্য করে আঁচলটা টেনে ঠিক করল। কিন্তু তাতে শরীরটা আরও স্পষ্ট হল, বিনোদ ভাবল এবার বলে। কিন্তু ঠোঁট চেপে তাকাল নীলা, "দুপুরে ঘুমিয়েছেন ?"

"তুমি ?"

"আমি ?" আঙুল দিয়ে চৌকির ওপর নীলা আস্তে টোকা মারল, আমি আপনার মতো ঘুমোই না।"

"তাই নাকি ?" বিনোদ ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেল, নীলা কী বলল, নীলা ঠোঁট চেপে কী বলল ? মীরা ঘরে ঢুকল। তারপরেই ওপর থেকে কান্নার শব্দ এল, "উঃ কী অসভ্য ছেলে দেখেছ, ঠিক টের পেয়েছে।"

"ওর জন্য রাখোনি ?" নীলা জিজ্ঞেস করল।

"না রাখলে টিকতে দেবে ?" মীরা বলল।

তাড়াতাড়ি নীলা চলে গেল। মীরা বলল, "উঃ, অই ছেলেকে নীলা না থাকলে কে যে সামলাত", তারপর বলল "চিনি হয়েছে ?" "হ্যাঁ।" বিনোদ ঘাড় নাড়ল, "কিন্তু এত তাড়াতাতি এসব—" মীরা একটু হাসল। ওর নাকের নীচে একটা তিল আছে, সেটা নড়ে উঠল, "আজ এমন বৃষ্টি এল—"

"তা ঠিক।"

বিনোদ কান পেতে কিছুক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ শুনল। দেবদারু গাছটা সামনে সোজা দাঁড়িয়েছিল পাথরের মূর্তির মতো, মাকড়শার জালের মতো সরু সরু রুপোলি জলের রেখায় ভরে গিয়েছিল পাতা, "কেমন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে বাইরে।"

"এস লুডো খেলি," হঠাৎ বলল মীরা। এমন সময় মিণ্টুকে নিয়ে নীলা ঘরে ঢুকল।

"নীলা লুডো খেলবি ?"

কোল থেকে মিণ্টুকে নামিয়ে দিল নীলা, তারপর বলল "না, তাস। বৃষ্টির দিনে তাস ভালো লাগে।" বিনোদ পেছন দিকের জানালা খুলে দিল, "বৃষ্টি অনেক ধরে এসেছে।"

"তাহলে জানালাটা খোলা থাক।" মীরা বলল। বিনোদ দেখছিল বাইরের বৃষ্টির মিহি রেখা সুতোর মতো ঝরছে, ধূসর আলোয় ভরে গেছে গলির ওপরকার আকাশটা, মীরার বাবার লাগানো কাঁঠাল গাছটার ভিজে গা

বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, শাড়ি শুকোনোর তারটার গা থেকে ঝুলছে সারি সারি ঝকঝকে চোখের জলের মতো বৃষ্টির ফোঁটা। জানালা থেকে সরে এল সে, তারপর তিনজন মুখোমুখি তাস নিয়ে বসল। মিণ্টু নীলার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠের ওপর দোল খেতে লাগল, "আঃ ছাড় ছাড়," নীলা পেছনে হাত দিয়ে সরিয়ে দিল মিণ্টুকে, "এখন বিরক্ত করে না।" তারপর ওকে আস্তে একটা চুমো খেল, "আমরা খেলছি, তোর ছবির বইটা নিয়ে তুই খেলগে।" মিণ্টু চলে গেল খাটের নীচে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বের করে আনল ওর সেই বিখ্যাত ছবির বই, জন্মদিনে মীরা দিয়েছিল। বই নিয়ে ছবি দেখতে শুরু করল মিণ্টু, গোঁফওলা ইঁদুর, দস্তানা, ব্যাঙ, টিয়া পাখি, মাছ আর লালরঙের চাকাওলা রেলগাড়ি। খেলতে খেলতে বৃষ্টি থেমে এল। তারপর একসময় বৃষ্টি একেবারে থেমে গেলে খেলা ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা। বিনোদ বেরিয়ে এল বাইরে গলিতে। চারিদিকে ভিজে, ভীষণ ভিজে। ঘরদোর, জানালা দরজার কাঠ, দেওয়াল ভিজে থকথকে, পীচের রাস্তা ভিজে চকচক করছে চোখের তারার মতো। হাওয়াটাও ভিজে, ঠাণ্ডা। আকাশ সাদাটে হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে মেঘের কালো গর্ত—কেমন অদ্ভুত রহস্যময়। বিনোদ ঘরে এসে শার্ট গায়ে দিল। তারপর মীরাকে বলল, "তোমার কাছে খুচরো আছে?"

"কেন?"

"একটু বাইরে যাব।"

"এই বৃষ্টির মধ্যে?"

"কেমন জল জমেছে রাস্তায় দেখে আসি।"

মীরা একটু অবাক হয়ে তাকাল, তাকিয়ে হাসল। বিনোদ বুঝতে পারল, বলল, "হাসছ যে?"

"এমনি।" মীরা ঠোঁট চেপে হাসল, ওদের দু বোনেরই ঠোঁট চেপে হাসা অভ্যেস। মীরা ঘরে গিয়ে একটা আট আনি এনে দিল, তারপর বলল, "ছাতা নিয়ে গেলে পারতে।"

"এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে না।"

"বেশি জলটল লাগিয়ো না আবার, ঠাণ্ডা লাগলে—"

বিনোদ রাস্তায় নামল। পাড়ার গলির মুখে জল, ডাস্টবিন থেকে শালপাতা, ন্যাকড়া আর খবরের কাগজের আবর্জনা ঝুলে পড়েছে জলে,

নোংরা দুর্গন্ধ ভাসছে চারিদিকে, পাশের খাটালটা থেকে তেলতেলে গাঢ় হলদে রঙের জল রাস্তার মধ্যে এসে মিশেছে, পায়ের নীচে ঠাণ্ডায় শিরশির করে, মনে হয় পায়ের তলায় এক্ষুনি কোনও পেরেক অথবা কাঁচের টুকরো ফুটবে, একবার পেরেক ঢুকে গেছিল, মা ভীষণ চটে যেত বৃষ্টির দিনে রাস্তায় বেরোলে, আর সেসব দিন—আস্তে আস্তে বড় রাস্তায় এসে পড়ল বিনোদ। পায়ে জুতো পরে নিল। অনর্গল রাস্তা দিয়ে ভিজে গাড়ি চলেছে, জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আপন মনে খুশিতে চেঁচামেচি করছিল, পুরনো ধাঁচের নীচু একটা কালোরঙের গাড়ি চলে গেল, হুডগুলো ভিজে চুবচুবে, একটা ছেলে বাইরে মুখ বাড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল; দোকানপাটগুলোর টিনের পাল্লা ভিজে আরও কালো দেখাচ্ছে, নীল ডবল ডেকারগুলো ভিজে আরও নীল হয়ে গেছে। চারপাশে টুকরো টুকরো ভীড়, ভিজে জবজবে হয়ে কয়েকটি মেয়ে চলে গেল, ওরা কিন্তু হাসছে, হাতে বই, বোধহয় কলেজে পড়ে। রিক্সাওয়ালারা আপাদমস্তকে ওয়াটারপ্রুফে রিক্সা নিয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সিগুলো দাঁড়াচ্ছে না একটাও। একটা বিড়ি খেলে হত, কিংবা চা। না, চা পরে খাওয়া যাবে, আগে বিড়ি খাই। ফুটপাথের হকারদের মুখ গম্ভীর, কারও জিনিসপত্র ভিজে গেছে, কেউ কেউ জিনিসপত্র সামলাতে গিয়ে নিজে ভিজেছে। একটি ছেলে একটি মেয়ে চলে গেল, মেয়েটার মাথায় ছোট ছাতা তবুও ভিজেছে, ওটুকু ছাতায় দুজনের ধরে না, চুল থেকে জল ঝরছে ছেলেটার, সিগারেট জোরে জোরে টানছে, আর হাসছে। আরেকটু পরে, বাঁয়ে তেলেভাজার দোকান, অনেক লোক লাইন দিয়েছে। পাশেই বাসস্টপ। দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল বিনোদ, কাঁচের জানলাগুলোর ওপর বৃষ্টির সাদা রেখায় নানান কারুকাজ করা, মনে হয় কোনো দূর দেশের ধনীর প্রাসাদ থেকে খুলে নেওয়া, ডবলডেকারে যেন মানায় না। আসলে জানলাগুলোর জন্য বাসগুলোকে আরও সুন্দর লাগে। পর পর দুটো বাস দাঁড়িয়েছিল। বিনোদ অবাক হয়ে দেখছিল দুটো বাসই দেবদারু গাছে বোঝাই, জানালার কাঁচের ওপর বৃষ্টির রেখাগুলো মাঝে মাঝে ধেবড়ে গেছে পাতার চাপে, কণ্ডাকটার দুজন দাঁড়িয়েছিল, ছোকরা মতন, কাঁধ থেকে চামড়ার ব্যাগ ঝুলছিল, ওদের চুল, দাড়ি, গোঁফ ছেয়ে গেছে পাতায়, কেবল মাথায় হাত বুলোচ্ছিল ওরা, মাথার ওপর মুকুটের মতো পাতার গোছা। তেলেভাজার

গন্ধে ভরে রয়েছে জায়গাটা। ঠোঙ্গায় ভরে ভীষণ তাড়াহুড়োয় অথচ সাবধানে খদ্দেরদের জিনিস দিচ্ছে লোকটা, পেটটা ভাঁজে ভরা, ঘামে চকচক করছে, বোধহয় উনুনের খুব কাছে বসে রয়েছে বলে।

"এই যে বিনোদবাবু—"

বিনোদ তাকিয়ে দেখল ওদের পাড়ার হারান ঘোষাল, তেলেভাজার লাইনে দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে ডাকছিল, কাছে যেতে বলল, "যা বিষ্টি মশাই, তারপর আপনি এদিকে, কিনবেন বুঝি ?" বিনোদ কী বলবে বুঝতে পারল না, তবু ঘাড় নাড়ল।

"তাহলে আসুন, আমার সামনে জায়গা করে দিচ্ছি—" উদারভাবে হাসল হারাধন, কিন্তু পেছনের ঠোঁটফোলা এক ছোকরা বলে উঠল "বড়দা, বাইরে থেকে লোক আমদানি হবে না বলে দিলুম।"

"আরে আমার নিজের লোক, বাইরের হল ?"

"শ্বশুরবাড়ির লোক মাইরি", আরেকটা পায়জামা পরা ছেলে জামার কলারের নীচে কালো একটা রুমাল ঢোকাতে ঢোকাতে বলল। পাশে একটা কণ্ডাক্টর আর একটা আধবুড়ো লোক দাঁড়িয়েছিল, তারা হাসছিল শব্দ না করে। হারাধন সেদিকে তাকিয়ে বলল, "থাক তাহলে বিনোদ-বাবু, আপনি পরেই লাইন দিন।" বিনোদ কী বলবে ঠিক করতে পারার আগেই দেখল সামনের ডবলডেকারটা ছাড়ছে, দেবদারুগাছে বোঝাই, ডাল, পাতায় জানালাগুলো ছাওয়া, কিছু কিছু বাইরে বেরিয়েছিল, ঝুলছিল। "কাণ্ড দেখেছেন" হারাধন আবার বলল, "এই ষ্টেট ট্রানসপোর্টের বাসগুলো গাছ নিয়ে যাচ্ছে আজকাল।" বিনোদ জানত, কাজেই আস্তে আস্তে বলল, 'অনেকদিন থেকেই তো নেয়।" তারপর একেবারে শেষে গিয়ে লাইন দিল।

পুস্তক পরিচয়

ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা॥ প্রিয়তোষ মৈত্রেয়। রত্ন সাগর গ্রন্থমালা—৯। পরিবেশক : গ্রন্থজগৎ। চার টাকা॥

সংখ্যা বিজ্ঞানের অ আ ক খ॥ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রত্নসাগর গ্রন্থমালা—২০। পরিবেশক : গ্রন্থজগৎ। চারটাকা॥

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস, বিশেষ করে ব্রিটিশ যুগের প্রাক্‌কাল বা ওই যুগের সময়কার, এমনকি ইংরেজীতেও বিশেষ আলোচিত হয়নি। ১৯০২ এবং ১৯০৪ সালে রমেশচন্দ্র দত্তর বহুল প্রচারিত বই দুখানিতেই এই বিষয়ে প্রথম আলোচনা হয় ইংরেজীতে। রমেশচন্দ্র দত্ত যদিও হারকিউ-লিসীয় কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং তাতে বহুল পরিমাণে সার্থকতা লাভ করেছিলেন তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে ইতিহাস অনুশীলনে সমকালীন সীমাবদ্ধতাজনিত শত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাঁর বই দুখানি মুক্ত নয়। আর তাছাড়া সে ইতিহাসও ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ১ম খণ্ডে এবং ১৮৩৭ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ২য় খণ্ডে বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ সেই ইতিহাসকে আমরা ভারতের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাস বলতে পারি না। বাংলায় সেই আর্থিক ইতিহাস লেখার চেষ্টাও খুব কম করা হয়েছে বলা চলে। প্রিয়তোষবাবুর বইখানি ছাড়া বিনয় ঘোষ মহাশয়ের 'বাংলার নবজাগৃতি' ১ম খণ্ড ইত্যাদি আর একখানি বা দুখানি বইয়ের নাম করতে পারি। এ ছাড়াও সেই আর্থিক ইতিহাস যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লিখিত হয় বা লিখিত হবার চেষ্টা দেখা যায় তা স্বভাবতই প্রশংসাযোগ্য; এই দিক থেকে প্রিয়তোষবাবুর বইখানির আমরা প্রশংসা করতে পারি।

প্রিয়তোষবাবুর আলোচনার সময়কাল ১৭৫৭ সাল থেকে সিপাহী-বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত ধরা যায় বোধহয়, যদিও তিনি আর্থিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সিপাহী-বিদ্রোহের কারণগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণই নীরব। বইটিতে অর্থনৈতিক ভূমির (Basis) আলোচনার সঙ্গে মানসিক জীবনের

(রামমোহন ও বিদ্যাসাগর-আলোচনার মাধ্যমে) সম্বন্ধেরও আলোচনা আছে। তবে সেই মানসিক জীবনের (Superstructure) আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে উপস্থাপিত হয়নি! প্রিয়তোষবাবুর বইটির ভূমিকায় "বইটিকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাসও বলা চলে" এই দাবি করা হয়েছে, তাহলেও এই প্রসঙ্গে বলা ভালো যে এ ইতিহাসকে ১৭৫৭ সাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্তের ইতিহাস বলা সঙ্গত এবং তাও ঠিক বিভিন্ন কারণে পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। যদিও লেখক ভূমিকায় ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন, তবুও একথা বলা যায় যে তিনি যদি তাঁর রচনাগুলির খণ্ডিতরূপ দূর করতে পারতেন (যা বিভিন্ন কালে বিভিন্নস্থানে প্রকাশের ফলেই হয়ে থাকবে) তাহলে তাঁর সংগৃহীত তথ্যও একটা অখণ্ড রূপ নিতে পারত।

বইটির আলোচ্য বিষয়গুলি হল: ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থনৈতিক পটভূমি, ইংরেজ আগমনের পরবর্তী কালে ভারতের অর্থনীতিক অবস্থা, ইংরেজ অনুসৃত শাসননীতি ও তার প্রতিক্রিয়া, নূতন অর্থনীতি ও নূতন শ্রেণী, বিদেশে কুলি চালান, সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় মানস।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রিয়তোষবাবুর আলোচনায় ভারতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক রূপটি ফুটে ওঠেনি; সেই জন্যই বোধহয় তিনি মধ্যে মধ্যে কয়েকটি স্ববিরোধী উক্তিও করে ফেলেছেন। প্রথম অধ্যায়ের ['অর্থনৈতিক পটভূমি' (১)] আলোচনায় বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ যুগের ঠিক প্রাক্কালে "ভারতবর্ষ যখন তার সামন্তযুগীয় অর্থনীতির অন্তিম সীমায় এবং বণিকতন্ত্রগত মূলধন পরিমাণ ও বিস্তৃতির দিক দিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে…" (পৃঃ ১) তখন ইংরেজ তার আগমনে সেই স্বাভাবিক গতিকে খণ্ডিত ও বিকৃত করেছে তার স্বকীয় স্বার্থে। এই উক্তির পরেই তিনি যে তথ্য উপস্থাপিত করেছেন তাতে ভারতীয় 'ফিউডাল সমাজের' সেই অবিচ্ছিন্ন ও অপরিবর্তিত রূপেরই সাক্ষাৎ পেয়েছি। অতএব তাঁর তথ্য অনুযায়ী সেই স্বয়ং সম্পূর্ণ Republic সদৃশ গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার "অন্তিম সীমা উপস্থিত" একথা বলা যায় কিনা তা বিবেচ্য। এই 'এশীয় ফিউডাল' ব্যবস্থারও ধ্বংস শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রকৃতি এবং গতি অনুশীলনে লেখক যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। এই দিক থেকে বর্তমান

কালে লিখিত দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। ইরফান হাবিবের প্রবন্ধ দুটির ('Agrarian Causes of the Fall of the Mnghal Empire' —Enquiry No. 2 & 3. এবং 'Banking in Mughal India'—in contributions to Indian Economic History I—Edited by Tapan Roy Chowdhuri) তথ্য সংকলন দেখে মনে হয় ভারতে দেশীয় জমিদারশ্রেণী ও জায়গীরদার-ফৌজদার শ্রেণীর সংঘাতের মধ্য দিয়ে মোঘল সাম্রাজ্যের শেষদিকে ভারতীয় 'ফিউডাল ব্যবস্থা'য় অন্তিমদশা এগিয়ে আসছিল (হাবিব সাহেবের প্রথম প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য) এবং দেশীয় শেঠ-মহাজনরা অর্থাৎ বণিকশ্রেণী যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করছিল (হাবিব সাহেবের দ্বিতীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং মার্কস কথিত দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (দ্রষ্টব্য, H. K. Takahashi—Science and Society, Fall, 1952) জাপানের মতো আমাদের দেশেও হয়তো ধনতন্ত্রের বিকাশ স্বাধীনভাবে হতে পারত। প্রিয়তোষবাবু ভারতীয় ফিউডাল সমাজের অন্তিমদশার উল্লেখের কিছু পরে অবশ্য বলেছেন (৫ম পৃঃ), "রাজনৈতিক কিংবা ধর্ম অথবা বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক নগরী পরিলক্ষিত হত। সেদিনের গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে এই নগরীগুলিই ছিল একমাত্র ছেদ।" 'Science and Society'র পাতায় ফিউডাল ব্যবস্থা থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব প্রসঙ্গে মরিস ডব, পল সুইজি প্রমুখ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের যে বিতর্ক (১৯৫০ সাল বসন্ত সংখ্যা থেকে ১৯৫৩ সালের শেষ পর্যন্ত) হয়ে গিয়েছিল লেখক তার সদ্ব্যবহার করেননি; তাই এই রকম উক্তির মাধ্যমে নিজেকে ডব-সুইজি বিতর্কে তিনি জড়িয়ে ফেলেছেন অথচ তাঁর আসল মতটা কি তা পাঠককে বুঝতে দেননি। হাবিব সাহেবের প্রবন্ধ দুটি প্রসঙ্গের আলোচনায় একটি কথা সভয়ে বলতে চাই: আমাদের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে এ দেশীয় শেঠ-মহাজনদের ভূমিকা কি ছিল? যদি দেখা যায় যে, তাদের মোটামুটি সক্রিয় সমর্থন ছিল (যা থাকা মোটেই অসম্ভব নয়, বরং কোম্পানীর আমলে এই সব শ্রেণীই বোধহয় সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হয়েছিল) তবে বিপ্লবের নেতৃত্ব ফিউডাল হলেও আমাদের দেশে জাপানের 'মেইজি বিদ্রোহে'র মতো চরিত্র 'সিপাহী-বিদ্রোহ' নিত কিনা তা বিবেচ্য। যোগ্য ঐতিহাসিকেরা যদি এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেন তবে ভারতের ইতিহাস রচনায় একটি বিরাট ফাঁক পূর্ণ হতে পারে।

প্রিয়তোষবাবুর আরেকটি স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যাক। ব্রিটিশ যুগের ঠিক আগে এ দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "সেদিন শিল্পগুলি হস্তচালিত এবং ক্ষুদ্রায়তনের ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও স্থানীয় বাজারের অনেক বেশী উদ্বৃত্ত থাকত…" (পৃঃ ৬৮) অথচ ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখকের বক্তব্য হল : "…উৎপাদনটা সেদিন নিতান্তই কোনরকমে জীবনধারণের উপযোগী পর্যায়ে (Subsistence level) ছিল—তাই উদ্বৃত্ত ছিল না ফলে বাজার গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।" বাজার সম্পর্কে তাই তাঁব মতটি কি তা জানা সম্ভব নয়। বোধহয় তাঁর বক্তব্য হল : যেহেতু সেদিন চাষবাস ও শিল্পকর্ম "নিতান্তই কোনরকমে জীবনধারণের উপযোগী পর্যায়ে (Subsistence level) ছিল এবং যেহেতু জমিতে আর্থিক খাজনা অনুপস্থিত (এর বিরুদ্ধ মতও অবশ্য পাওয়া যাবে : হাবিব সাহেবের উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ বা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের Indian Land System (Govt. of West Bengal) দ্রষ্টব্য) এবং "সাধারণ কাঁচামাল…হাতের কাছেই মিলত" তাই "তেমন যানবাহনের প্রয়োজন ছিল না" এবং বাজার সংকুচিত ছিল যা উৎপাদন পণ্য উৎপাদনের (Commodity Production) পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। যদিও হাবিব সাহেবের ব্যবহৃত মালমসলাগুলি দুস্প্রাপ্য, লেখক অন্তত শ্রীনরেন্দ্রকুমার সিংহের সংগৃহীত তথ্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে পারতেন। শ্রীসিংহের তথ্য উল্লেখ করে বলা যায় অন্তত ব্রিটিশ যুগের ঠিক আগেই কাঁচামালের জন্যও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির সঙ্গে এমনকি দূরাঞ্চলের সঙ্গেও পারস্পরিক যোগসূত্র ছিল (N. K. Sinha—Economic History of Bengal, Vol I, পৃঃ ৯৪-৯৯ ১ম সংস্করণ)।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের পটভূমি হিসাবে লেখক মার্কস কথিত প্রথম পদ্ধতিকেই (অর্থাৎ শিল্পপতিরা বণিকশ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটান) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন অথচ তিনি সে কথা কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু বর্তমান সমালোচকের মতে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্যান্য 'এশীয় ফিউডাল' সমাজের দেশের মতোই হয়তো মার্কস কথিত দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই ধনতন্ত্র বিকাশের পথ উন্মুক্ত ছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন আমাদের দেশে না প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের দেশীয় বণিকেরাই ধনতন্ত্রের সূত্রপাত করত এবং ইতিহাসের বন্ধুর পথে নিজেদের শিল্পপতি হিসাবে

প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। এই জটিল বিষয়টি অর্থাৎ ভারতীয় সমাজব্যবস্থার Dialectics যতদিন না স্থিরীকৃত হচ্ছে ততদিন উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা অস্পষ্ট থেকে যেতে বাধ্য। "It is therefore most important to explain the development of productive forces which historically made inevitable the bourgeois movement which abolished the traditional feudal productive relations; and the social forms of existence of industial capital at that time" (Takahashi-র উল্লিখিত প্রবন্ধ)। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর আর্থিক ইতিহাস মোঘল সাম্রাজ্যের অবনতির কাল থেকেই শুরু করা যুক্তিসিদ্ধ। এই রকম সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য লেখকেব দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে আমাদের তথাকথিত অনড় গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ গতি। ইউরোপের মতো জমিদারশ্রেণী না থাকলেও জমিতে মালিকানার পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছিল মনে হয় (রাধাকুমুদ মুখার্জীর উল্লিখিত পুস্তকে বিবৃত হয়েছে যে পরবর্তী কালের (১৭৯৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক স্বত্বই পূর্বে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল: "Thus long before British rule, the principle of Permanent Settlement was an established principle and the growth of the land holders as a homogeneous body out of the heterogeneous body of different classes of intermediaries became an accomplished fact." পৃঃ ৩২)। এই সিদ্ধান্তের বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই সব অসঙ্গতি দেখাবার উদ্দেশ্য হল লেখক সামগ্রিক কাঠামো একটি তৈরি করে উঠতে পারেননি যেখানে এই সব আপাতবিরুদ্ধ অবস্থার ব্যাখ্যা মেলে।

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বলা যায়, ইংরেজ অনুসৃত শাসননীতি ও তার ফল হিসাবে লেখক দেখিয়েছেন ইংবেজ শক্তি কিভাবে ভারতকে কাঁচামাল জোগানদার হিসাবে এবং ব্রিটেনের শিল্পের বাজার হিসাবে তৈরি করল শাসনযন্ত্রের নাগপাশে এবং শস্তা শিল্পজাতদ্রব্যের অসম প্রতিযোগিতায়। লেখক এই প্রসঙ্গে দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ এদেশীয় অর্থনীতিবিদদের 'Drainage theory' বা শোষণ তত্ত্বটির উল্লেখ করে অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি ও ধ্যানধারণার ইমারতের সম্পর্ক দেখালে বিষয়টি সুপরিস্ফুট হত। অবশ্য এই প্রসঙ্গটিই বোধহয় লেখকের সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ আলোচনা। তবে এ ক্ষেত্রেও

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে, যথা ব্রিটিশরাজের অন্যান্য নীতির (বিশেষ করে শিক্ষানীতির) উল্লেখ বিশেষ নেই।

সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হলেও অন্যান্য বিষয়গুলির মোটামুটি ধারাটি আমরা অনুধাবন করতে পারি। এই বইটি সম্পর্কে এত বিস্তারিত আলোচনা করা হল এই কারণে যে এ বইটি আবার নূতন করে কয়েকটি অসমাধিত সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এ জন্য লেখক এবং প্রকাশকও ধন্যবাদার্হ।

দ্বিতীয় পুস্তকটি বিশেষভাবে অভিনন্দনীয়। বাংলায় সংখ্যাবিজ্ঞানের উল্লেখ্য বই একটা ছাড়া অন্য কোনো আছে কি না বর্তমান সমালোচকের তা জানা নেই। সেদিক থেকেও অন্তত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পুরোধার সম্মান পাবেন। অবশ্য এছাড়াও সহজ সাবলীল ভাষায় আঠারটি অধ্যায়েব মাধ্যমে সংখ্যা-বিজ্ঞানেব জটিল সংখ্যা ও তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা করে (অবশ্য প্রাথমিক স্তরের আলোচনা হলেও) লেখক সাধারণ পাঠকের অপরিসীম উপকার করেছেন। কারণ বর্তমান অবস্থায় সংখ্যাতত্ত্ব ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে না। তবে লেখক সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা বা তার উদ্ভবের ইতিহাস (লেখকের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যদি সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে করতেন তবে সাধারণ পাঠকদের কাছে তার আবেদন আরো জোরালো হয়ে উঠত। ল্যান্সেলট হগবেন যখন সংখ্যাবিজ্ঞানকে 'জনকল্যাণের সংখ্যাতত্ত্ব' (Arithmatic of Welfare—Lancelot Hogben in Mathematics for the Million) বলেন তখন তাঁর বিজ্ঞান-আলোচনা কি প্রেক্ষাপটে আলোচিত হবে তা আমরা অনুমান করতে পারি। হগবেনের মতো মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলেও লেখক যদি এটুকু স্বীকার করে নিতেন যে সমাজের প্রয়োজনে এ বিজ্ঞানের ক্রমশঃ উদ্ভব হয়েছে তাহলেও তাঁর সংজ্ঞা বা তত্ত্ব আলোচনা আরো মনোরঞ্জক হত। পরিশেষে একটি কথা জানাই, যদিও এই বই মনে হয়, সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবেই লিখিত; তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সংখ্যাবিজ্ঞানের আলোচনা এই যুগে করতে বসে 'সম্ভাব্যতা-তত্ত্ব' বা 'Theory of probability'র যদি আলোচনা করা না হয়, তবে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

বিমল চক্রবর্তী

সমুদ্রমানুষ ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। পাঁচটাকা॥

ভূমিকা করব না, কেননা গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈচিত্র্য কোনখানে এবং কতদূর পর্যন্ত শিল্পসম্মত তা প্রশস্ত আলোচনার ব্যাপার। তবে একেবারেই এড়িয়ে না গিয়ে আপাতত এটুকু প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে পরিবেশ এবং চরিত্রের মধ্যে সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী করে চিত্রিত করতে পারলেই কথাকারের সিদ্ধি। 'সিদ্ধি' অর্থে আমরা পাঠকেরা, কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারি। অন্যথায় বিজ্ঞাপনের ভাষায় সাহিত্যের ভূগোল বাড়ানোর প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম। শ্রীযুক্ত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সমুদ্র-মানুষ' উপন্যাসটির আলোচনাকালে এই উক্তিগুলি আরও সুপরিস্ফুট হতে পারবে।

উপন্যাসের প্রথম আরম্ভটি উদ্ধার করা যাক: "শিউলিফুলের মত শুভ্র জ্যোৎস্না। দক্ষিণ-মেরুর বিষণ্ণ বরফে ওর ছায়া থমকে আছে। বায়ুতরঙ্গে কেমন একটা শিষ-দেওয়া শঙ্খচিলের নিথর আওয়াজ।..." একেবারে এমন একটা জায়গায় লেখক আমাদের নিয়ে গেলেন যা কল্পনা এবং রোমান্স-রসকে উদ্দীপিত করতে যথেষ্ট। মেরু প্রদেশের অপরিচিত সমুদ্র আর আকাশ; নিউ প্লাইমাউথ, মাউণ্ট অ্যাগমণ্ট, লায়ন রক আর একটি জাহাজ—যেখানে নাবিকের কাজ নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে মোবারক আলি। কেন্দ্রীয় চরিত্র এই মোবারক আলিই এবং সমালোচ্য বইখানি তারই জীবনেতিহাস। কাহিনীর পরিবেশের অভিনবত্বে সঙ্গত কারণেই আমরা খুশি হতে পারি যেহেতু বিবর্ণ প্রত্যহের একঘেয়েমী থেকে লেখক প্রায় আমাদের গ্রহান্তরে টেনে নিয়ে গেছেন। লেখকের হাত নিশ্চয়ই সমর্থ; নইলে কি করে এমনিতর পারিপার্শ্বিক উত্তরণ সম্ভব হয়। ভৌগোলিক বর্ণনা, জাহাজী কর্মধারার খুঁটিনাটি বিবরণ (যার জন্য মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত পাদটীকার প্রয়োজন অনুভব করেছি), ও নানান ভিনদেশী চরিত্রের প্রবর্তনায় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একরকম চোখে আঙুল দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে উপন্যাসটি প্রণয়নে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকখানি কাজ করেছে। এবং সেই অভিজ্ঞতা সঞ্জাত রচনাকে হৃদয়স্পর্শী করার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে ভাষার সরল, অকপট ব্যবহার। এতটুকু কৃত্রিমতা নেই, এমনকি এ হেন সরলতায় ভাষা প্রায়ই শিথিল, প্রসাদগুণবিবর্জিত, অনমুশীলিত ঠেকে; আর বইখানিকে যদি একটানে শেষ করা কারুর পক্ষে সম্ভব না হয়—যেমন

আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, তবে তার কারণও প্রধানতঃ এই। অবশ্য এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে ভুলিনি যে, সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারেই একটি নতুন নাম। বলা বাহুল্য প্রথমতম রচনায় এই ধরনের অপ্রতিভতা সমালোচনীয় নয়।

পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্য রমনীয়তা অর্জন করলেও শেষকালে আমাদের কিছু অতৃপ্তি থেকেই যায়। আশা করেছিলাম মোবারক আলিকে একজন পুরো সমুদ্র-মানুষ হিসেবেই দেখব (লেখকের অভিপ্রায়, যদি আমি ভুল না বুঝে থাকি, উপন্যাসটির নামের মধ্যে মোবারক আলিকেই প্রচ্ছন্ন করে তোলা); সমুদ্রের উদার, ঊর্মিল ও বিচিত্র পটভূমিকায় মোবারকের বলিষ্ঠ, সংগ্রামশীল এবং যেহেতু সে ঘর-ছেড়ে-আসা সি-ম্যান, অতএব নাবিকের স্বাভাবিক বিবাগী বৃত্তি সম্পন্ন একটি মানুষ খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। ঘর-ছেড়ে-এলেও সে সর্বক্ষণ ঘরের কথাই ভাবে, জাহাজের বুকে তাকে আগাগোড়া দেখতে পেলেও সে ক্বচিৎ আপনার দায়িত্বে সচেতন হয়েছে, তার সমস্ত মনপ্রাণ শামীনগড়ের মাটিতে, স্মৃতিতে সংলগ্ন রয়েছে। একদিকে অতিমাত্রিক স্মৃতিচর্যা, অপরদিকে, বর্তমান বলতে যা, তা নিতান্তই সামান্য। লিলি-ব্লু-নাম্নী জনৈকা মহিলার সঙ্গে তার প্রণয় আর মাউথ অর্গান বাজানো। সুতরাং সমুদ্র-মানুষের বদলে এক অত্যন্ত সাধারণ দুর্বল একটি স্মৃতি ভারাক্রান্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল। অর্থাৎ প্রথমে পরিবেশ বৈচিত্র্যে মুগ্ধ করল যে উপন্যাস, পরিশেষে বৈচিত্র্যহীন সাধারণ একটি মানুষের অন্তর্জ্বালার ইতিবৃত্তে সে হতাশ করল আমাদের। তাই, মুগ্ধতাও স্থায়ী হল না শেষ পর্যন্ত। পটভূমির সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কশূন্যতা উপন্যাসটিকে সার্থক হতে দিল না। তাছাড়া কাহিনীর মধ্যে ঘনঘন রেট্রস্পেকসন ক্লান্তিকর এবং সেইজন্যই অনাকর্ষণীয়—শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তা সম্ভবত অজানা নেই। বর্তমান উপন্যাসের এই ত্রুটি তাঁর পরবর্তী রচনায় দেখা যাবে না আশা করি। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র যেমন রেনীল, লিলি ব্লু, জসীমুদ্দীন প্রভৃতির পরিস্ফুটন যথাযথ।

আর সমুদ্র মানুষ না হোক, এমনি মানুষ হিসেবে মোবারক আলির যে যন্ত্রণাদীর্ণ, স্মৃতিদগ্ধ চরিত্র শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছেন তা নিপুণতার পরিচায়ক। আলোচ্য উপন্যাসে বহু ক্ষেত্রেই তার শিল্পকৃতিত্বের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে—এটা নিছক শূন্যগর্ভ উৎসাহ বাক্য বলে তিনি যেন মনে না করেন।

শিবশম্ভু পাল

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

একশ' বছর পরে ॥ সম্পাদক : পঞ্চানন রায়চৌধুরী। 'সাত্বিক', ৫৩ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া। এক টাকা ॥

পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নবীন কবিদের কাব্য সংকলন। কবির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে যে সংকলনের প্রকাশ, তার কাব্যমূল্য বিচারে আপাতত আমরা প্রবৃত্ত হচ্ছি না। রাণা বসু, মণীন্দ্র কর রায়, বিশ্বরঞ্জন দে ও শেখর মজুমদারের কবিতা উল্লেখ্য।

বিনি সুতোর মালা ॥ সমীরকুমার গুপ্ত। সাধারণ পাবলিশার্স, কলকাতা-১২। এক ন. প.।

লেখক সাম্প্রতিককালের তরুণতম কবিদের অন্যতম। ইতিপূর্বে 'শিশিরবিন্দু' নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষে ২৫শে বৈশাখে এই ১৬ পৃষ্ঠার কাব্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-প্রণাম' বা ভূমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে জানিয়েছেন…"তুমি এই শতাব্দীর সবচেয়ে ব্যর্থ, বিবর্ণ ও বিপন্ন কবির প্রণতি গ্রহণ কর। বিনি সুতোর মালার যে কুঁড়িগুলো কখনো ফুটবে না, তাদের ঝরা নিঃশ্বাসে আমার কৃতজ্ঞতা রইলো।"

বিনামূল্যে বিতরণ না করে এই সংকলনটির মূল্য মাত্র এক নয়া পয়সা ধার্য করায় কবির মানসিকতার একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়েছে।

যে কালে—যে দেশে ॥ প্রগতি পাবলিশিং, ডায়মণ্ডহারবার। এক টাকা ॥

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত লেখকের ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকা।

দুরন্ত দীপ্ত দিগন্ত ॥ খালাসী কবি মুমূর্ষু বাগ সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান : ইউনিভার্সাল বুক ডিপো, কলকাতা ১২। দু টাকা পঁচানব্বই ন. প. ॥

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ইলেকট্রিক গার্ডেনরীচ শাখার কর্মচারীদের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত কাব্য সংকলন।

সম্পাদকের লেখা ইতিপূর্বে আমরা পড়িনি। গ্রন্থ সংলগ্ন বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা গেল ভবিষ্যতে এঁর খালাসী জীবন নিয়ে একটি 'খণ্ড কাব্য' প্রকাশিত হবে। তাই বোধহয় ইনি 'খালাসী কবি'। আর সংকলনের প্রথম কবিতাটি এঁরই লেখা, নাম 'দুরন্ত দীপ্ত দিগন্ত'। তাই বোধহয় বইয়েরও এই নাম।

বলা বাহুল্য এই ধরণের সংকলনের অধিকাংশ রচনাই দুর্বল হয়। এমন কি প্রকাশ-অযোগ্য রচনার সংখ্যাও কম থাকে না। তথাপি আমরা এই সকল গ্রন্থে নবাগত লেখকদের খুঁজি, কখনও কখনও আবিষ্কারও করি। তাছাড়া রবীন্দ্র-শতবর্ষে শ্রমিকদের উৎসাহে প্রকাশিত এই ধরনের সংকলনের ভিন্ন মূল্য সম্পর্কেও আমরা অবহিত। কিন্তু সম্পাদকের ধৃষ্ট ভূমিকা ও লেখক পরিচিতি প্রথমেই আমাদের এত হতাশ করে যে, তারপর এই সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই পাঠকের মনে সন্দেহ না জেগে পারে না।

জাহাজঘাটা ॥ শ্রীশোভাময়। প্রাপ্তিস্থান: বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২। পঁচাত্তর ন. প. ॥

দুই খণ্ডে বিভক্ত পঁচিশটি কবিতার ক্ষুদ্র সংকলন। রচনা সর্বক্ষেত্রে পরিণত না হলেও জীবন-বিশ্বাসী একটি কবি মনের পরিচয় পাঠক মনে আশা-সঞ্চার করে।

ছবি ॥ আশীষ সেনগুপ্ত। চিররঞ্জন সিংহ রায়, বাটানগর, ২৪ পরগণা। পঁচাত্তর ন. প. ॥

প্রকাশকের ভূমিকা পাঠে জানা গেল লেখক সাহিত্যে প্রায় সব্যসাচী (যদিচ এইটিই তাঁর প্রথম বই) এবং আলোচ্য ক্ষুদ্র কাব্যসংকলনটি "আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত করতে পারবে"।

বর্তমান জীবনের গ্লানি ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লেখকের অধিকাংশ রচনাতেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। শিল্পগুণ ব্যাহত হলেও কবির সুস্থ জীবনাদর্শটি প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই।

হাঁটা এ জীবন ॥ অ. কু. চ.। সুনীতি বুক ডিপো, স্টেশন রোড, সোদপুর, ২৪ পরগণা। এক টাকা ॥

কোনোক্রমে ছাপা এই ক্ষুদ্র কাব্য সংকলনটির একটি দুটি কবিতা কবি সম্পর্কে পাঠককে আগ্রহী করবে।

দুঃসহ পাঁচালী ॥ নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান: বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস। এক টাকা ॥

পাঁচালীর ঢঙে লেখা কয়েকটি পদ্যের সঙ্কলন। লেখক আপন বিশ্বাস মতো নীতিকথা প্রচার করেছেন এবং ভূমিকায় জানিয়েছেন 'কাব্যসাধনা' তাঁর নেশা বা পেশা নয়।

মনোরমা ॥ বিশ্বনাথ কাব্যভারতী। প্রাপ্তিস্থান: বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা। পঞ্চাশ ন. প. ॥

পেশায় বিড়ি-শ্রমিক। শৈশব থেকে জীবন সংগ্রামের কঠোর সৈনিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একেবারেই নেই। তবু "স্বভাবকবিত্বের" গুণে বিশ্বনাথ কাব্যভারতীর প্রথম কাব্যপুস্তিকা 'আমাদের গান' একশ্রেণীর "পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ" করেছিল। 'মনোরমা' তাঁর দ্বিতীয় কাব্য পুস্তিকা। প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠার কাহিনীকাব্যকে সংক্ষিপ্তাকারে ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করতে হয়েছে। মনোরমা নামে এক উদ্বাস্তু রমণীর জীবনের ব্যর্থতা ও গ্লানিকে অবলম্বন করে এর আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে। সরল, পাঁচালীর ঢঙে লেখা। পল্লীকবিতার মাধুর্য কোথাও কোথাও মনকে স্পর্শ করে।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (বাঙ্গালা বিভাগ): ১৯৫৮ ॥ সম্পাদক: বি. এস. কেশবন। স্টেট ব্যুরো অব্ এডুকেশন, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পাঁচ টাকা ॥

ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয় ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে ব্রতী হয়েছেন। সংবিধান তালিকাভুক্ত চোদ্দটি ভাষায় প্রকাশিত নতুন পুস্তকের প্রামাণ্য তালিকা হল এই ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী। ১৯৫৪ সালে লোকসভায় গৃহীত এবং ১৯৫৬ সালে সংশোধিত আইন অনুসারে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, মাদ্রাজের কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী, বোম্বাইয়ের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী ও নয়াদিল্লীর সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী ভারতে প্রকাশিত সকল প্রকার পুস্তকের একটি করে কপি প্রকাশকদের কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী হয়েছেন। "আইনের মাধ্যমে ভারতে প্রকাশিত সব বইয়ের একত্রীকরণ এবং প্রতি তিন মাসে একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের প্রচেষ্টা আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম। ১৯৫৮ সালে

১৫ই অগস্ট প্রকাশিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রথম সংখ্যায় ১৯৫৭ সালের অক্টোবর হতে ডিসেম্বর এই তিন মাসে প্রাপ্ত বই তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশন এবং বছরের শেষে একটি ক্রমচয়িত (cumulated) বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়।…কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় প্রতিটি রাজ্য সরকার নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশিত সকল বইয়ের এক বার্ষিক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।"

বর্তমান গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। এর পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

কজ্জল সেন

আমি সিরাজের বেগম॥ শ্রীপারাবত। নতুন প্রকাশক, কলকাতা। তিন টাকা॥

ইতিহাসাশ্রিত এই উপন্যাসে শ্রীপারাবত বাংলার একটি বিশেষ যুগকে বিবৃত করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে। প্রাসাদের জানলা থেকে, দাসী-বাঁদীর কথায়, পরিবার পরিজনের হাবে-ভাবে বাংলার সংকটময় সময়কে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লুৎফার জবানবন্দিতে। এইভাবে লুৎফাকে উপস্থিত করা হয়েছে পাঠকের সামনে। দৃষ্টিকোণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু সমস্ত সংকট এবং তার ভয়াবহতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে পরিমাণ শিল্পক্ষমতা থাকার প্রয়োজন ছিল, দুঃখের হলেও সত্য, বর্তমান সমালোচকের দৃষ্টিতে সে ক্ষমতা শ্রীপারাবতের এখনো অনায়ত্ত। লুৎফা চরিত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে নি নিজের জোরে। বাইরের প্রবাহ এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং তাতে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধতে পারে নি। ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহেও লেখককে অলস বলে মনে হয়। বহুল প্রচলিত কয়েকটি ঘটনার বিবৃতি নিঃসন্দেহে উপন্যাসের মর্যাদা পাবে না। ঘটনা এবং কল্পনার হর-গৌরী মিলনে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা। আলোচ্য উপন্যাস সেই সার্থকতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে।

জ্যোতির্ময় বসু

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

২৬শে আগস্ট অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হয়েছে।

চারুচন্দ্রের জন্ম ১৮৮৩ সালের ২৯শে জুন। ১৮৯৯ সালে মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ১৯০১ সালে মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ, এ, এবং ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ, (বি কোর্স) পাশ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মিঃ পার্সিভাল প্রমুখ বরেণ্য অধ্যাপক-দের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ১৯০৪ সালে চারুচন্দ্র পদার্থবিদ্যায় এম, এ, পাশ করেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার লেকচারার ও কয়েক বছর পরে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক রূপে তিনি শিক্ষাব্রতে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করে।

এম, এ, পড়ার সময়ই চারুচন্দ্র আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। এম, এ, পাশ করার পরও তাঁর এই গবেষণাকার্য অব্যাহত থাকে।

চারুচন্দ্রের সুদীর্ঘ অধ্যাপক জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের জীবনে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁরই ছাত্র। সেইদিক দিয়ে চারুচন্দ্রকে বাঙলাদেশের দুইযুগের বিজ্ঞান সাধনার সেতুরূপে গণ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুচন্দ্রের যোগাযোগ আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২২ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের ভার অর্পণ করলেন চারুচন্দ্রেরই হাতে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই পরিচালনার দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন। বাংলা পুস্তক প্রকাশনায় বিশ্বভারতী যে বিপুল ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, তার পেছনে চারুচন্দ্রের অবদানও সামান্য নয়। আমৃত্যু তিনি প্রকাশন বিভাগের উপদেষ্টা রূপে নিজেকে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন। তাছাড়া প্রথমাবধি বিশ্বভারতীর কার্যনির্বাহক পরিষদের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। দশবৎসর তিনি সমবায় আন্দোলন করেছেন এবং 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও প্রভাবের ফল আমরা

পেয়েছি চারুচন্দ্রের সাহিত্যে। শুধু বিজ্ঞান সাধনা বা অধ্যাপনা বা কর্ম পরিচালনার দায়িত্বই তিনি পালন করেন নি। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে সরল, সুন্দর, রুচিকর ভাষায় প্রকাশ করেছেন, প্রচার করেছেন। অক্ষয়কুমার, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মতো চারুচন্দ্রও বাংলাভাষার বিজ্ঞানচর্চার উল্লেখযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করে গেছেন। যার সুফল বর্তমানে ক্রমবর্ধমান আকারে আমরা ক্রমশঃ দেখতে পাচ্ছি।

মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, রবীন্দ্রভারতী, অবনীন্দ্র পরিষদ, ভারতসভা, রামমোহন লাইব্রেরী প্রভৃতি নানা সংস্থার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। 'বসুধারা' নামে একটি মাসিকপত্রও সম্পাদনা করতেন।

৭৮ বছর বয়সে এই বিজ্ঞান তপস্বী, সাহিত্যিক ও কর্মী পুরুষের জীবনাবসানে সকলেই বেদনার্ত। আমরা আশা করি বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ চারুচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রপ্রদর্শনী ঃ রামকিঙ্কর

শিল্পী রামকিঙ্করের ছবির ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী কলকাতার কলাজগতে এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর মতো অগ্রগণ্য একজন ভাস্কর ও চিত্রকরের এতগুলি রচনা একসঙ্গে এর আগে শান্তিনিকেতনের বাইরে যে কোথাও দেখার বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়নি, সেটা ভাবলে বেশ একটু বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

এই প্রদর্শনীতে রামকিঙ্করের গোড়ার দিকের (১৯৩৫) কাজ থেকে শুরু করে প্রায় সমসাময়িক (১৯৫৯) কাল পর্যন্ত অনেকগুলি তেল-রঙ, জল-রঙ, ভাস্কর্য ও কয়েকটি গ্রাফিক কাজ উপস্থিত করা হয়েছে। বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতি, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের নানা দৈনন্দিনতা, সাঁওতালদের ঘর-গৃহস্থালী, ফসল তোলার কাজ আর কাজের ফাঁকে বিশ্রাম—প্রধানত এই সবই রামকিঙ্করের ছবির বিষয়। এবং, প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে এমন একটা গতিবেগ আর অস্থির অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আছে যা দর্শকের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবেই।

একসঙ্গে এতগুলো ছবি দেখে রামকিঙ্করের রচনার যে বৈশিষ্ট্য আগাগোড়া সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়বে, সেটা হল তাঁর প্রাণবন্ততা এবং

ফর্ম সম্বন্ধে নতুন নতুন অনুসন্ধানের প্রয়াস। কিন্তু রামকিঙ্কর কোথাও ফর্মসর্বস্ব নন। তাঁর রচনায় ফর্ম এসেছে রচনাটির সামগ্রিক দেশগত পরিবেশের সঙ্গে সুসমন্বিত হয়ে। এটা সহজেই চোখে পড়ে যখন দেখি প্রধানত মানুষের ফিগার—তার দৈহিক আকৃতিগত ছন্দই—তাঁর ফর্মের মূল ভিত্তি। একেবারে আকার সাদৃশ্যহীন—ননফিগারেটিভ—বিমূর্ত ফর্ম তাঁর কোনো কোনো রচনায় এলেও, সেটা বড় একটা প্রাধান্য পায়নি। এদিক থেকে রামকিঙ্করের রচনা 'মডার্ন' হয়েও যে তার ভারতীয় চরিত্রটুকু অক্ষুন্ন রেখেছে, সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইওরোপীয় মডার্ন আর্টে সাধারণত ফর্ম তার দেশগত পরিবেশের সঙ্গে একটা বিরোধ সৃষ্টি করে। সেইটেই ইওরোপীয় মডার্ন আর্টের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রামকিঙ্কর নন্দলালের ছাত্র হিসেবে ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের ধারাগুলিকে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছেন এবং সেই সঙ্গে ইওরোপীয় মডার্নিস্টদের ভাবধারাগুলিকেও মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন-অনুধাবন করেছেন। তার ফলে তিনি নিজস্ব একটা ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে নিজের মতো করেই শিল্পসৃষ্টি করেছেন।

বস্তুর বাস্তবগ্রাহ্য রূপটিই তাঁর রচনায় রয়েছে ধ্রুবপদ হিসেবে। বিশেষত তাঁর জলরঙের স্কেচগুলি, প্রতিকৃতি-ভাস্কর্যগুলি এবং অনেকগুলি তেল-রঙের কাজ যেমন বাস্তবানুগ, তেমনি উজ্জ্বল রঙে আর বলিষ্ঠ তুলির টানে আশ্চর্য রকম প্রাণবন্ত।

সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে রামকিঙ্করের মতো শক্তিশালী খুব কমই আছেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে আলোচনাও সেই তুলনায় খুব কমই হয়েছে। তাঁর চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী যে-সব শিল্পী শুধু ভঙ্গি দিয়েই মানুষের চোখ ভোলাবার কাজে নেমেছেন, তাঁদের প্রতি যখন আকাদমি থেকে শুরু করে নানা সরকারী-বেসরকারী সূত্রের বহুমুখী করুণাধারা উৎসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে চলেছে উচ্চকিত প্রচারের ঢাক পেটানো, তখন রামকিঙ্কর সম্পর্কে আর্টের দেউড়ির ঐ সব দ্বারপালদের নীরবতায় শুধু এইটেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে পুরোহিতকে প্রণামী না দিলে দেবতার প্রসাদ পাওয়া যায় না। রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনের নিভৃত নীড়ে একান্তভাবে শিল্পসৃষ্টির কাজেই মগ্ন। প্রচার অথবা প্রসাদ—কোনোটির জন্যেই তিনি কারুর কাছে প্রণামী পেশ করতে চাননি।

রবীন্দ্র মজুমদার

হায় স্বাধীনতা!

গত ১৮ই আগস্ট তারিখের 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রে 'ক্রিটিক' তাঁর 'লণ্ডন ডায়েরী'তে লিখেছেন :

"খবর পেলাম, গত ১লা জুলাই উদ্যোক্তারা কমিটি অব সায়েন্স অ্যাণ্ড ফ্রীডম ভেঙে দিয়েছেন। এই কমিটির উদ্যোক্তা ছিলেন কন্‌গ্রেস অব কালচারাল ফ্রীডম। ঘটনার যে বিবরণ আমি পেয়েছি তা এই : এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মাইকেল পোলানী এবং সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অটো হান, জাক মারিটেন, রবার্ট ওপেনহাইমার, লর্ড রাসেল ও স্যার জর্জ টমসনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরা। কমিটি একটি বুলেটিন প্রকাশ করতেন। এটি ৫২টি দেশে প্রধানত অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রচারিত হত। বুলেটিনটির মেলিং লিস্টে নাম ছিল ৫,৫০০। কমিটি অ্যাপারথিড এবং স্বাধীনতার অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চালিয়েছে। কমিটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে একটি পারমাণবিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। সি. পি. স্নো তাঁর বিতর্কমূলক বক্তৃতা 'আণবিক যুগে বিজ্ঞানীর দায়িত্ব'র ভিত্তিতে আলোচনা চালাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। চার জন বিখ্যাত অধ্যাপককে এতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁরা হলেন পোলানী, জে: ডি. বারনাল, সি. ডি. ডারলিংটন ও জাপানের তাতো কোমাই। পোলানী যখন অন্যান্যদের নাম শুনলেন তখন জানালেন তিনি স্নোর সঙ্গে কোনো আলোচনা সভায় যোগ দেবেন না আর বারনাল যদি যোগ দেন তাহলে পদত্যাগ করবেন। পদত্যাগ তিনি করলেন আর তারপরই তাঁর কন্‌গ্রেস অব কালচারাল ফ্রীডম-এর সহকর্মীরা কমিটিটি ভেঙে দিলেন। বারনাল কমিউনিস্ট আর স্নো-র সঙ্গে মতবিরোধ আছে আলোচনায় যোগ না দেবার এই যুক্তি অদ্ভুত। যে সংগঠন স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলে ঘোষণা করে থাকেন—বিভিন্ন মতাবলম্বীদের একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানোর অপরাধে তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ একটি কমিটিকে ভেঙে দিলেন এটা আরও অদ্ভুত ব্যাপার—বিশেষত আলোচ্য বিষয়টি যখন এমন যা ইংলণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র সব দেশের স্বাধীনতার সমস্যার সঙ্গে জড়িত।"

তথাকথিত চিন্তার স্বাধীনতাবাদীদের স্বরূপ 'ক্রিটিক'-এর উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ-নিয়ে অযথা বাগবিস্তার করব না। আমরা শুধু পাঠকদের মনে করিয়ে দেব : 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকা কমিউনিস্ট নন, উদারপন্থী আর 'ক্রিটিক' হচ্ছেন পত্রিকাটির ভূতপূর্ব সম্পাদক কিংসলি মার্টিন।

শচীন বসু

বর্ষসূচী

শ্রাবণ ১৩৬৬—আষাঢ় ১৩৬৭ [১৮৮১—৮২]

পরিচয়
শারদীয় সংখ্যা
১৩৬৮

স্বচ্ছন্দে
সাইকেল চড়তে হলে
CYCLES
দেখতে সুন্দর
মজবুত
দামেও সুবিধা
সুপার ডিলাক্স
রোডস্টার
সামিট
ও ছোটদের জন্য
সাইকেল
ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড
কলিকাতা

আশ্বিন সূচীপত্র ১৩৬৮

শারদীয় সংখ্যা

প্রবন্ধ

গল্প

কবিতা

প্রবন্ধ

সম্পাদক

গোপাল হালদার। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

আত্মপ্রতিকৃতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষ ৩১ ; সংখ্যা ৩
আশ্বিন, ১৮৮৩ ; ১৩৬৮

কবির সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

১৯২৪-এর ১৯-এ সেপ্টেম্বর সকলে যাত্রা করলাম হাওড়া স্টেশন থেকে, মাদ্রাজ মেলে। চলেছি কবিগুরুর সহযাত্রী হয়ে য়ুরোপে। কবির জীবনীকার এ যাত্রার সহযাত্রীদের নাম-তালিকা থেকে আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নামটি বর্জন করেছেন। আজ 'পরিচয়'-এর আহ্বানে সে যাত্রার বিবরণ লিখতে বসে আশঙ্কিত হচ্ছি পাছে স্মৃতির অর্ঘ্য গুরুদেবের চরণে পৌঁছে দিতে অক্ষম হই, আর নিজের কথাটাকেই বড় করি।

সার্থক জীবন আমার, অভাবনীয় এ যাত্রা সংঘটিত হয়েছিল স্বয়ং কবির নির্দেশে। সুগন্ধী দ্রব্য তৈরি করা শিখতে ফ্রান্সে যাবার সংকল্প করেছি শুনে কবি ডেকে পাঠিয়ে আমায় বললেন—তুমিও নাকি ফ্রান্সে যাচ্ছ? চল একত্রে আমার সঙ্গে, আমিও ফ্রান্স হয়ে সাউথ আমেরিকা যাচ্ছি। 'মেসাজারি মারিতিম'-এ আমার টিকিট কেনা ছিল, বাতিল করে কবির জাহাজ 'হারুনা মারু'তে সিট ঠিক করে নিলাম। কবির সহযাত্রী হবেন রথীবাবু, প্রতিমা দেবী, পুপে (নন্দিনী), সুরেন কর ও 'বিশ্বভারতী'-র নির্বাচিত প্রাক্তন ছাত্র বিজয় বাসু।

য়ুরোপ গমনের দুরভিলাষ অঙ্কুরিত হয়েছিল বাল্যে, ১০।১১ বছর বয়সে, 'হিতবাদী' প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' পড়ে। পড়তাম লুকিয়ে নিভৃত দুপুরে—কবির লেখা গল্প, 'য়ুরোপের পত্র', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ইত্যাদি। আমাদের কালে

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-রচনা পড়া ছিল কর্তৃপক্ষের মানা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্প ও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' অন্তত আমাকে সম্মোহিত করত, কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব বঙ্কিমের দিকে হলেও। থাকতাম দামোদরের নিকটবর্তী বাঁধের কোলে এক অতি নগণ্য পল্লীগ্রামে। সেখানে দাদামশাই ছিলেন বাঁধের ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর আশ্রয়ে থেকে বর্ধমানে রাজস্কুলে পড়তাম। দামোদরের প্রলয়ঙ্কর বন্যা ভাসিয়ে দিয়ে যেত একূল ওকূলের দীর্ঘবিস্তার। পাহাড় প্রমাণ উঁচু জলরাশির 'হড়কা' দিয়ে বান আসত; বর্ধমান শহরের লোক ভেঙে পড়ত বাঁধের ওপর, সেই বান আসা দেখবার জন্য। বন্যার জল চলে গেলে বিস্তৃত নদীচরে সতেজ হয়ে উঠত কাশ ও সর-বন, বুনো-কুলগাছ, শেয়াল কাঁটার ঝোপঝাড়। বুনো শুয়োর, সাজারু, খরগোস, কাদাখোঁচা (স্নাইপ) ও বালিহাঁস শিকারের পীঠস্থান ছিল এই নদীচর, সাহেব মহল ও রাজন্য মহলের জন্য। শীতকালে দামোদরের জলে এসে বসা বালিহাঁসের সঙ্গে 'নিশীথে'র পদ্মা-চরের ওপর দিয়ে "ও-কে, ও-কে" শব্দ করে উড়ে যাওয়া যাযাবর হাঁসের শ্রেণী মনের মধ্যে একাকার অভিন্ন হয়ে যেত। বাইরের ডাকের একটা নেশা থমথমিয়ে জমে উঠত। সেই নেশাই আবার ছাপিয়ে উঠত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' পড়ার ভেতর দিয়ে। মনে হত ছুটির দিনে জুটেছিলাম 'ফকির'-এর দলে, পালিয়েছি 'তাবাপদ'র সঙ্গে; একেবারে হাজির 'ব্রিন্দিসি'তে। গোল ক্যাপ মাথায় পরা গাইড এসে জিজ্ঞাসা করছে—পার্লে ভু ফ্রাঁসে মঁসিয়—? সোজা লণ্ডনে ডাক্তার 'কে'-র বাড়ি উঠেছি। 'টবি' কুকুর সকাল না হতেই শোবার ঘরের দরজায় এসে টোকা দিচ্ছে আস্তে আস্তে, বিস্কুট নিয়ে তাকে খেলা দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সেই নিভৃত সুদূর পল্লী-বালকের পক্ষে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়া কেমন করে সম্ভব হয়েছিল, তা আবার 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' লেখকেরই সহযাত্রী হয়ে, ভাবতে অবাক লাগে। পল্লীজীবন থেকে প্রমোশন হল হঠাৎ একেবারে কলকাতায়: দাদামশাই বদলি হয়ে এলেন। এর কিছু আগেই বঙ্গ-বিভাগ ঘোষিত হয়েছে; আরম্ভ হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন। প্রথম কবি দর্শন হল স্বদেশী এক সভায়। দ্বিতীয় দর্শন 'টাউন হল'-এ 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' কর্তৃক পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মানপত্র দান সভায়। রবীন্দ্র-রচনা-পিপাসিত মন 'প্রবাসী'-তে মাস কিস্তিতে বার হওয়া 'গোরা' পড়ার সুযোগ পেল। হাতে এল 'গীতাঞ্জলী', চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত

'চয়নিকা', মোহিত সেন সম্পাদিত দুষ্প্রাপ্য 'কাব্যগ্রন্থ', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'। 'মায়ার খেলা'-র গান অজ পল্লীগ্রামে অভ্যস্ত হয়েছিল।

কিন্তু কবির কাছে পরিচিত হতে আরও কিছু সময় লাগল। তার যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন দাদা, ডাঃ পশুপতি। দাদা ছিলেন কবির বড়ই প্রিয়পাত্র। 'সবুজপত্র'-র যুগে দাদা কবিগুরুর কাছে যাতায়াতের অধিকার অর্জন করে নেন। কবি কলকাতায় এলে দাদা নিয়মিত জোড়াসাঁকোয় যেতেন সস্ত্রীক। দিনুবাবুর কাছ থেকে গান তুলে নিতেন ও গায়কের দলে গিয়ে রিহার্সাল দিতেন। দাদাকে কবি 'ডাক্তার' বলে ডাকতেন; স্নেহ করে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠাতেন ও কলকাতায় এলেই প্রায় তলব করে পাঠাতেন। ছোটখাট ডাক্তারিও দাদা করতেন কবির অসুস্থতায়। দাদারই কাছে শুনেছিলেন, দাদামশাই রিটায়ার্ড ইঞ্জিনীয়ার এবং বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের ১২।১৪ বছর আগে বাংলায় প্রথম ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। কবি এতে সমধিক প্রীত হয়েছিলেন। তাঁকে 'উত্তরায়ণ' ভবনের জন্য জরীপ ও নক্সা তৈরি করে শান্তিনিকেতনে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ফলে দাদামশাই হপ্তাখানেক সেখানে কবির অতিথি হয়ে থেকে আসেন। তাঁর তৈরি প্ল্যান কিন্তু অমনোনীত হয়। এর পর ১৩২৯ সালে আমার কন্যাসন্তান হলে দাদা নামকরণের দাবি পেশ করেন কবির কাছে (৭ই ভাদ্র); কবি লিখে পাঠান—"...অদিতির কন্যার নাম তপতী রাখতে পার—"। দাদার কাছে শুনেছিলেন অদিতি আমার স্ত্রীর নাম। 'তপতী' নাটকের নামকরণ হয় এর অনেক পরে।

দাদামশাইয়ের শান্তিনিকেতন যাওয়ার জন্য বা স্বগ্রামে তাঁর স্কুল স্থাপন কারণেই হোক, কবি আমাদের গৃহস্থালী—অর্থাৎ "সেকেলে" গৃহস্থালী দেখবার ইচ্ছা দাদার কাছে প্রকাশ করেন।

১৩৩০ সালে (১৯২৩) জন্মাষ্টমীর দিন—তারিখ সম্ভবত ৩১শে আগস্ট বা ১লা সেপ্টেম্বর—আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে, ১২ নং হরলাল মিত্র স্ট্রীটে, কবিগুরুর শুভাগমন হয়। সঙ্গে আসেন রানু অধিকারী (লেডী মুখার্জী)। যামিনীদা (শিল্পী যামিনী রায়) উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরই স্বহস্তে আঁকা মঙ্গল কলস ও কলাগাছ, আমের ডাল আদি প্রবেশ-দরজায় সাজিয়ে দেওয়া হয়। ভিতরের উঠোনে পাতা হয় এক নতুন পদ্ধতিতে দেওয়া পায়ের পাতা, পদ্ম ও হাঁসের আলপনা। এ পদ্ধতি আমাকে শিখিয়েছিলেন

রাজশেখর বসু। কবি এলে শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে বরণডালা মাথায় করে জলের ছিটে দিয়ে মা, দিদিমা ও বৌ-এরা কবিকে বরণ করেন। ওপরের ঘরে গিয়ে বসলে কবিকে চামর ও পাখার বাতাস দেওয়া হয়। কবি অতি প্রীত হন ও প্রায় একঘণ্টা থেকে দাদামশাই, মেয়েরা ও উপস্থিত সকলের সঙ্গে আলাপ গল্প করে কিছু ফল মিষ্টান্ন সরবত খেয়ে চলে যান। যাবার আগে যামিনীদার আঁকা কলাপাতার পাড় দেওয়া একটি কার্টিজপেপারে—"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল"—কবিতাটি লিখে স্বাক্ষর করে দিয়ে যান।

আমার দাদার কাছে কবি শুনেছিলেন আমি সাবান তৈরি করি। শুনে বলেছিলেন তাঁর কেশ প্রসাধনের জন্য লিকুইড সোপ করে দিতে পারি কি? কিছুদিন চেষ্টার পর কবির উপযোগী তরল সাবান তৈরি করতে কৃতকার্য হই। আমাদের বাড়ি শুভাগমন হলে এক বোতল তরল সাবান তাঁর হাতে দিই। পরের দিন আমি যাই জোড়াসাঁকোয় কবির দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। কবির সঙ্গে সরাসরি এই আমার প্রথম পরিচয়। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠলে কবি বললেন, গিরিজা, তোমার তৈরি সাবান ব্যবহার করে আমি তুষ্ট হয়েছি। এ রকম সাবান আমি এক আমেরিকা ভিন্ন কোথাও পাই নি। এর আমি নাম রাখলাম 'তরলা'।

আমি বললাম, আমার প্রথম সন্তান, কন্যারও, আপনি নাম করে দিয়েছেন—তপতী।

—হ্যাঁ, আমার মনে আছে। তোমার দাদা, ডাক্তার, আমায় লিখেছিলেন তোমার স্ত্রীর নাম অদিতি। তোমার স্ত্রীকে আন নি কেন? তিনি তো মাইশোরের জ্ঞানশরণ চক্রবর্তীর কে হন—।

আমি—ভ্রাতুষ্পুত্রী।

—বাঙ্গালোরে তাঁরই উদ্যোগে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলাম। এর পরের বার যখন আসবে অদিতিকে সঙ্গে নিয়ে এস। তোমার বৌদি দুর্গা তো আসেন।

কবিগুরু এর পর থেকে প্রায় আজীবন 'তরলা' ব্যবহার করতেন। দু-বোতল তৈরি করে পাঠালে কিছুকাল তাঁর চলে যেত। ফুরিয়ে গেলে লিখে পাঠাতেন বা খবর দিতেন, আবার নতুন তৈরি করে দিতাম। তাতে টাটকা জিনিস পেতেন। 'তরলা' নাম রেজেস্ট্রী করে নিলাম, কিন্তু তাঁকে যা নিবেদন করেছি তা বাজারে দিতে ইচ্ছে হল না।

এর পর থেকে কবি জোড়াসাঁকোয় এলে 'তরলা', নবীন দাসের রসগোল্লা এবং দ্বারিকের দই নিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। মিষ্টান্ন দুটি
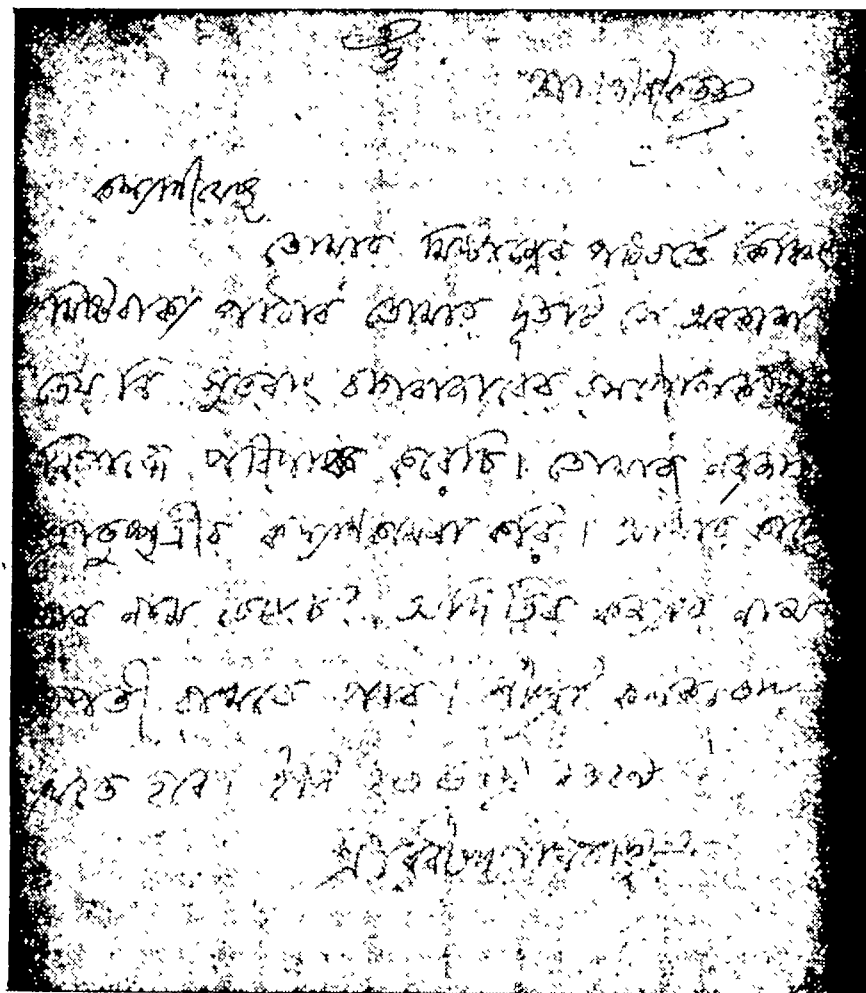
কবির খুবই প্রিয় ছিল। আমি গেলে আমার সঙ্গে ফুলের নাম ও গন্ধ নিয়ে আলোচনা হত। ফুলের বিষয়ে ছিল তাঁর অসামান্য আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। বাংলাদেশের শহরে গ্রামে বাড়ির দরজায়, গেটে, বারান্দায় প্রায়ই যে সাদা-

লাল ফুলের লতা দেখা যায়, অনেকে তাকে 'মাধবী' বলে জানেন। কবিরও এই নামই জানা ছিল।

আমাদের এক আলোচনায় এর কথা উঠলে, আমি জানালাম প্রকৃত 'মাধবীলতা' সম্পূর্ণ আলাদা। কলকাতায় 'মাধবী' দেখাই যায় না। দিল্লীতে যথেষ্ট। 'মাধবী'র ডাল আরও পুষ্ট, পাতা বড়, পুরু, গাঢ় কৃষ্ণ-সবুজ ; ফুল সাদা, কেশর হলদে। ফুল ফোটে অল্প দিনের জন্য। সাবান কলের বাগানে আমি 'মাধবীলতা' রোপণ করেছিলাম। কবিকে একদিন তার একগোছা ফুল এনে দিয়ে বললাম—এই আপনার—"মাধবী, হঠাৎ…এসে হেসেই বলে যাই, যাই, যাই—"।

কবি বললেন—তবে লাল সাদা ফুলের ও লতাটির আমি নাম দিলাম—'মধু-মাধবী'।

আমি বললাম—চমৎকার।

কবির 'মাধবীলতা' দুটির ওপর ঝোঁক লক্ষ্য করে ওর গন্ধ অনুকরণ করে 'মাধবী' নাম দিয়ে একটি সাবান তৈরি করে—'মাধবী', 'বকুল', 'চম্পক', 'ও-ডি-কলোন', 'ভায়লেট', 'লিলি'—দেশী বিদেশী এই ছ-রকম গন্ধের বাথ-সোপ, একত্রে 'ডালি' নামে বার করলাম। 'ডালি' নাম দিয়েছিলেন আমার এক বন্ধু শরৎচন্দ্র ঘোষ।

আর একদিন কথা উঠল Cassie ফুল নিয়ে। পূর্বাঞ্চল থেকে নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে এর চাষ করা ও নির্যাস বার করা হয়। এ ফুল এক-রকম 'বাবলা', যার চলতি নাম 'গুয়ে বাবলা' ; ফুল হলুদ রঙের। কবি বললেন আমি ওর নাম দিতে চাই 'কাঁটা নাগেশ্বর'। তখন আবার 'নাগেশ্বর চাঁপা'র কথা উঠল। কলকাতা বা নিকটবর্তী অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। বর্ধমানে থাকতে অনেক পেতাম। গাছ মাঝারি, ফুলের পাপড়ি সাদা, কেশর হলদে। বহুদূর গন্ধ যায় বলে আর এক নাম 'যোজন গন্ধা'। কবি বললেন তিনিও অনেক দেখেছেন কিন্তু ইদানীং আর পান নি। যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের হাতায় এর একটি গাছ আমার দেখা ছিল। গ্রীষ্মে ফুল ফুটলে সেখান থেকে ২।৪টি ফুল নিয়ে এসে কবিকে দিলাম। এর পর 'নাগেশ্বর চাঁপা'র গন্ধ অনুকরণ করে 'তরলা' সুগন্ধিত করে কবিকে দিয়েছিলাম। আর একদিন কবিকে 'কানাঙ্গা' ফুল এনে দিয়েছিলাম। এটি মলয় দ্বীপময় অঞ্চলের ফুল ; এদেশে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু এক নার্সারি থেকে এর

একটি চারা আমি সংগ্রহ করে সাবানকলের বাগানে গাছ করেছিলাম। তারই ফুল কবিকে দিয়েছিলাম। 'আকন্দ' ফুলের একরকম মধুকরী গন্ধ

আছে—কবি বলেছিলেন; ও পরে 'আকন্দ' ফুলের নামে কবিতা লিখে দিনুবাবুকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। এইভাবে আমার সঙ্গে আলোচনায় ফুলের বিষয়ে কবির গভীর আগ্রহের পরিচয় পেয়েছিলাম। একদিন "সাত ভাই চম্পা জাগরে, কেন বোন পারুল ডাকরে" ও "রাজার বাগানে ফুটেছে পারুল"-এর কথা উঠল। উভয়েই স্বীকার করলাম কেউই পারুল ফুল দেখি নি। 'পারুল ফুল' উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য-ভারতে আছে—পাটল রং, ঘণ্টাকৃতি, সুগন্ধী: কিন্তু দেখি নি। 'কিংশুক' ফুল কবি দেখে এসেছিলেন মাইশোরে। পলাশের নামও 'কিংশুক'; কিন্তু দুটি বিভিন্ন গাছ, বিভিন্ন ফুল। কলকাতায় 'কিংশুক' ও 'পলাশ' দুই-ই আছে, অল্প। কবি উভয়ের পার্থক্য জানতেন। কবির পদ্যে গানে লেখায় কত বিভিন্ন ফুলের নাম ও প্রকৃতি স্থান পেয়েছে: 'জুঁই', 'বেল', "শিরীষ-বকুল—আমের মুকুল,"[১] 'চাঁপা', 'চামেলি', 'রজনীগন্ধা', 'কেতকী', 'কদম্ব', 'করবী', 'গোলাপ', 'কামিনী', 'শেফালী', 'কমল', 'মালতী', 'মল্লিকা', 'মাধবী', 'মহুয়া', 'কৃষ্ণচূড়া', 'টগর', 'পারুল', 'মন্দার' (পালিতে 'মাদার'), 'পলাশ', 'কিংশুক', 'কাশ', 'শালফুল', 'আকন্দ', 'কৃষ্ণকলি', 'অ্যাজেলিয়া', 'ক্যামেলিয়া', 'রডড্রেনডন', "বেগুনি ফুলে ভরা লতিকা দুটি"—কবির আসরে ফুলের কী সমারোহ! আমার ভাগ্যক্রমে তিনটি নূতন নামকরণ—'তরলা', 'মধু-মাধবী', 'কাঁটা নাগেশ্বর' পেলাম।

যখন শুনলেন সুগন্ধী তৈরি বিদ্যায় হাতপাকাতে ফ্রান্সে যাবার সংকল্প করেছি, তখন আমায় বললেন তাঁর সহযাত্রী হতে। কবি বললেন, বিজয় বাবুকে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে মনোনীত করা হয়েছে ফ্রান্সে শিল্প শিক্ষার জন্য; আমাকেও তিনি মনোনীত করলেন বিশ্বভারতীর নির্বাচিতরূপে, গন্ধ শিল্প শেখবার জন্য।[২]

হাওড়া থেকে মাদ্রাজ মেলে সকলে যাত্রা করলাম। কবির জন্য রিজার্ভ করা একটি কুপে, রথীবাবু, বৌঠান (প্রতিমা দেবী) ও পুপের আলাদা

---

১ শিরীষ ফুল দুরকম। উভয়েরই আকৃতি ও সাইজ প্রায় এক; উভয়ই কেশরপ্রধান। কিন্তু একটির গাছ হয় সুবৃহৎ, ফুল গোলাপী, গন্ধহীন। দ্বিতীয়টির গাছ মাঝারি, ফুল সবুজ ও মৃদু-মধুর গন্ধযুক্ত। কবির "…ওরে শিরীষ, অন্ধকারের অন্তরালে দিকে দিকে গন্ধে ভরিস"—ও কালিদাসের "চারু কর্ণে শিরীষ"—দ্বিতীয় শ্রেণীর।

২ ফ্রান্সে পৌঁছে অনায়াসে সুগন্ধী প্রস্তুতের কারখানায় স্থান পেলাম, বিশ্বভারতীর সুপারিশের প্রয়োজন হয় নি।

কামরা। আমি সেকেণ্ড ক্লাস যাত্রী। আমার কামরায় আমার সহযাত্রী গৈরিক বস্ত্রধারী গৌরকান্তি বাঙালী এক নবীন সন্ন্যাসী, দর্শনে এম-এ। যথারীতি বিদায় অভিনন্দন পালা শেষে গাড়ি ছাড়লে চোখের পাতা আমার অশ্রুসিক্ত হয়েছিল, সন্ন্যাসীর কাছে এটি অলক্ষিত ছিল না। তাঁর দরদী প্রশ্নবাণে স্বীকার করতে হয়েছিল মনের চাঞ্চল্য শিশু-কন্যা তপতীর জন্য। যথাকালে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে রথীবাবুর কাছে ও রথীবাবুর কাছ থেকে কবির কানে এ কথা যেতে অন্যথা হয় নি। ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলে এ কথা মনে করিয়ে দিয়ে পরিহাস করতে ছাড়েন নি।

স্টেশনে গাড়ি থামলে বিপুল জয়ধ্বনি, মাল্য-চন্দন-কুঙ্কুমের অর্ঘ্য, কবির দরজা ও জানালায় দর্শনপ্রার্থীর প্রবল ভীড, গভীর রাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত রইল। পরদিন ভিজিয়ানাগ্রাম স্টেশনে গাড়ি পৌছুলে ভিজিয়ানগ্রামের রাজা কবি সন্দর্শনে এলেন। সঙ্গে এল বাহান্নটি টিফিন কেরিয়ারে—ডবল সাইজ কেরিয়ারে—আহার্য। দুটি কেরিয়ার আমার ঘরে দিয়ে গেলেন সুরেনবাবু। বলা বাহুল্য সন্ন্যাসী ও আমি উভয়ে মিলে তার দশমাংশও শেষ করতে পারি নি। ওয়ালটেয়ার স্টেশনে এলে কর্নেল চৌধুরী (প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দাদা) দশ ইঞ্চি প্রমাণ লম্বা এক পাইপের ডগায় সিগারেট চড়িয়ে ধূমপান করতে করতে হাজির। কবির কামরায় পুপেকে দেখে গেলেন, তার জ্বর হয়েছিল। পরদিন মাদ্রাজে পৌছলে সে কী বিরাট অভ্যর্থনা। সন্ধ্যায় বোট মেল। পথে স্টেশনে স্টশনে তেমনি জয়ধ্বনি, মালাচন্দন। পথের এক স্টেশনে বিজয় বাসু আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ধনুষ্কোটিতে ট্রেন থামল অপরাহ্ণে। এখানে পকপ্রণালী পার হয়ে ওপারে—সিংহলে টালাইমান্নারে নেমে ট্রেনে ওঠা। লাইন মিটার গেজ। এ ট্রেনে ছিলাম ফার্স্ট-ক্লাসে আরোহী। 'করিডর' ট্রেন হওয়ায় কবির ঘরে যদিচ্ছা যেতে-আসতে বাধা রইল না। সন্ধ্যায় ট্রেন ছাড়লে কবি বললেন তাঁর সঙ্গে একত্রে ডিনার খেতে। কবির মুখোমুখি বসলাম ডিনার টেবলে, বুক দুরু দুরু করতে লাগল পাছে শিষ্টাচারের ক্রটি হয়। কবি বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন আমার সংকোচ, ভয়। আমাকে বললেন—এই তো তোমার প্রথম বিলাত যাত্রা। একেবারে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নাকি? যদি নিষিদ্ধ মাংস খেতে হয়? এস, না হয় আমিই বৌনি করে দি। বেয়ারার আনা ডিশ থেকে হাসতে হাসতে স্বহস্তে

[illegible]

কল্যাণীয়েষু

শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দের সহিত "ভ্রমণের কথা" বইখানি পেয়ে খুসি হলুম। একদা আমারও এ শখ ছিল — ভ্রমণও বিস্তর করেছি — এমন কি ভূতে বিস্তর হয়ে থাকবার কোঠায় প্রবেশ হয়েছে — সুতরাং আমার কথা একেবারেই নেই। তবু এমনো দুর্গতি ঘটেছে। কিন্তু এমন পথ করে সবের ভ্রমণবৃত্তান্ত সঠিক লেখে উত্তীর্ণ হয়েছি। অতএব আমার এই পত্রের দ্বারা সেই ছাত্রবৃন্দের শুভকামনা করে তুমি যথাসাধ্য আমার আশীর্বাদ প্রেরণ করলুম, তুমি তাদের জানিয়ে দিয়ো।

কয়েকজন তরুণ বন্ধু মিলে 'সাইকেল হুইলার্স' নামে এক সমিতি গঠন করেন। এঁদের দলপতি ছিলেন 'পিকলু' (ডাক নাম); উদ্দেশ্য সাইকেলে ভারত ভ্রমণ। অহেতুক কারণে আমাকে এঁরা তাঁদের সহকারী অধিনায়ক মনোনীত করেন। আধা মিলিটারি কায়দায় বিউগ্‌ল বাজিয়ে এঁরা সাইকেল ভ্রমণের একটা আঙ্গিক খাড়া করেন ও পুলিশ কমিশনারের নিকট পরোয়ানা আদায় করে বন্দুক বিউগ্‌ল কাঁধে ঝুলিয়ে ভারত ভ্রমণে যাত্রা করেন।

কাঁটাচামচ দিয়ে মেনুর খাবার পর পর তুলে দিতে লাগলেন। আড়ষ্ট আনন্দ ও বিস্ময়ে আমি খেয়ে যেতে লাগলাম। কবির পরিহাসপ্রিয়তার আস্বাদ সম্ভ এই প্রথম পেলাম।

পরদিন, ২৩শে সকালে কলম্বো। ২৪শে সেপ্টেম্বর জাহাজে উঠলাম। 'হারুনা মারু', ১১০০০ টন জাহাজ, ছাড়ল অপরাহ্ণ প্রায় ৪ টায়। দেখতে দেখতে বন্দর ছাড়িয়ে এসে পড়লাম সমুদ্রে। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, পাতলা বৃষ্টি হচ্ছিল। সমুদ্র ছিল তরঙ্গময়। রেলিং ধরে ডেকে দাঁড়িয়ে শরীরকে আল্‌গা করে দিয়ে জাহাজের দোল খেতে লাগলাম। ডেকে কাউকে বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না; যাত্রীরা বেশির ভাগই নিজ নিজ কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বেশিক্ষণ ডেকে দাঁড়াতে পারলাম না; প্রবল সিক্‌নেসে আক্রান্ত হলাম। কোনোরকমে দেওয়াল ধরে সিঁড়ি বেয়ে কেবিনে এলাম কিন্তু সিকনেসের আক্রমণে সে রাত্রে বার ত্রিশ বেসিনে যেতে হয়েছিল। সকালে রথীবাবু খোঁজ নিতে এলেন ও বললেন—আপনি কেমন রাত কাটালেন জানতে 'বাবামশাই' ব্যস্ত হয়েছেন। আমার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি Brand's Essence of Chicken ও কমলা লেবু নিয়ে এসে খাওয়ালেন, বললেন না খেলে সিক্‌নেস যাবে না। বলে গেলেন সুস্থ হলে কিছু খেয়ে আমি যেন কবির কাছে যাই। বিকেল নাগাদ কবির কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন—তুমি তা হলে ভালো sailor নও, তোমার খুব সিক্‌নেস হল—।

আমি বললাম—আপনি প্রথম সমুদ্র যাত্রার কথা লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের গান উদ্ধৃত করেছিলেন "প্রবল উঠিল বায়ু নাচিল তরঙ্গ"। আমাদের জাহাজও তরঙ্গে যে রকম নেচেছে তাতে আর রক্ষা কি? আপনার প্রথম বারের মতো আমিও চিঁ চিঁ করছি।

কবি বললেন—প্রথম প্রথম আমারও খুবই সিকনেস হত; এখন যতই দোল্ হোক আমার কিছু হয় না। আমি এখন seasoned sailor। তার পর বললেন, তুমি বুঝি আমার 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এর খুব ভক্ত?

আমি বললাম—আমি আপনার গল্পের সবচেয়ে ভক্ত। টুর্গেনিভ, টলস্টয়, মোঁপাসার গল্পের পাশাপাশি রাখা যায় আপনার গল্প, কেন বলব না। শুধু তফাৎ এই, আপনার গল্পে বাংলাদেশের নদী জল কাদা বন বাগান ক্ষেত কুঁড়ের আস্তরণ। বড় কথা হল আপনিই এনেছেন বাংলা ভাষায় গল্প, তার আগে ও বস্তু ছিল না। ছিল রূপকথা ও ভাঁড়ের গল্প।

কবি ঈষৎ পরে বললেন—আমি নিজেও মনে করি আমার গল্পগুলি কালের ও বিশ্বের দরবারে স্থায়ী আসন পাবে।

পরের দিন, মেঘ বৃষ্টি কেটে গিয়ে শরতের আকাশে রোদ্দুর ঝলমল করে উঠল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চা খেয়ে কবির কেবিনে গেলাম। কবির কেবিন ছিল state cabin; বৈঠকখানা, লেখাপড়ার ছোট একটি ঘর ও বড় সোনার গিল্‌টি করা পালঙ্ক পাতা; মোটা গালচে বিছান। অতি ত্রস্তে দরজার কাছে এসে পর্দা সরিয়ে দেখি কোচ চেয়ারে বসে কবি লেখায় মগ্ন। সামনের ছোট একটি জানালা দিয়ে সকালের একফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে মুখে, মাথার কেশে; কবি যোগীবর তুল্য ধ্যানমগ্ন। দরজার দিকে পিছন করে বসা ও মোটা কার্পেটের জন্য আমার ঘরে আসা টের পান নি। সেই ধ্যানমূর্তি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ ফটো তুলে নেবার কল্পনা মনে হল। নিঃশব্দে নেমে এলাম নিজের কেবিনে। ক্যামেরা ও স্ট্যাণ্ড নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি তেমনি ধ্যানমগ্ন নিশ্চল নিথর মূর্তি। স্ট্যাণ্ডে ক্যামেরা সংযোগ করে পিছনে দাঁড় করিয়ে ঘরের আলোর আন্দাজ করে প্রায় ১০।১২ মিনিট এক্‌স্পোজার দিলাম। তারপর ক্যামেরা স্ট্যাণ্ড গুটিয়ে নিচে ফিরে গেলাম, কবি কিছুই জানলেন না। বিকেলে কবির কাছে হাজির হলাম। বাইরের ডেকে কবি আরাম কেদারায় এসে বসলেন। আমরা—রথীবাবু, প্রতিমা দেবী, সুরেনবাবু, বিজয়বাসু ও আমি পায়েব কাছে মেঝেতে বসলাম। কবি 'সাবিত্রী' কবিতা পড়ে শোনালেন; বললেন সকালে এটি রচিত হয়েছে। বুঝলাম যখন ফটো তুলছিলাম তখন 'সাবিত্রী' রচনায় মগ্ন ছিলেন। ফ্রান্সে এসে প্রিন্ট তুলে কবিকে দিলে বলেছিলেন—তুমি পেছন থেকে ছবি নিয়েছ, হয়েছে বেশ। কেউ কেউ বলেন পেছন থেকেও আমার একটা জীবন্ত-ভাব লক্ষ্য করা যায়। আমি বললাম—ঘরে প্রথম আসা, তারপর ফিরে গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে আসা, ছবি তোলা ইত্যাদিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় গেছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে আপনি ধ্যানরত নিশ্চল নিথর ছিলেন। এ অপরূপ ধ্যানমূর্তি দেখার সৌভাগ্য হল আমার।

এডেনে জাহাজ থামল একবেলা, তারপর ২রা অক্টোবর আমরা রেড সি-তে পড়লাম। চার দিন লাগল সুয়েজে পৌছতে। সৈয়দ বন্দরে এলে দীর্ঘাবয়ব ইজিপ্‌সিয়ানরা জাহাজে উঠে নানান জিনিস, সিগারেট সুভেনির বিক্রি করে গেল। সুয়েজ খাল দিয়ে যেতে তীরে মনোরম খেজুর

গাছের সার, দূরে বিস্তীর্ণ বালিতে মৃগতৃষ্ণিকা, উটের পিঠে চড়ে দলবদ্ধ হয়ে চলেছে আরবদের দল, দু-একটা মরুদ্যান দেখা গিয়েছিল। ভূমধ্য সাগরে পড়লে সমুদ্র গভীর, নীল ও শান্ত দেখা গেল। সেদিন ছিল ৮ই বা ৯ই অক্টোবর; শারদীয়া বিজয়া। সন্ধ্যায় কবিকে গিয়ে প্রণাম করে বললাম—আজ বিজয়া। কবি বললেন—দেবী কি গজে যাচ্ছেন না দোলায়? ঈষৎ পরেই চারিদিক থেকে একটা ঘন কুয়াশা ছেয়ে এল, ঝড় উঠল, খুব ঢেউ হয়ে জাহাজ দুলতে থাকল। জাহাজে বিপদ-সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজতে লাগল। ক্যাপ্টেন স্বয়ং এসে বলে গেলেন যদি ঝড় বা ঢেউ বাড়ে হয়তো লাইফ বেল্ট পরতে হবে। মোটামুটি প্রস্তুত থাকতে বলে গেলেন। ক্যাপ্টেন চলে গেলে কবি বললেন—যদি জাহাজ-ডুবি হয় লাইফ বেল্ট পরে জীবনের জন্য যুদ্ধ করব না। ভারী সিসের মতো টুপ করে ডুবব—। অল্পক্ষণ পরেই ঝড় ঢেউ থেমে গেল। সমুদ্রবক্ষ শান্ত হল, কিন্তু একটা নীল-সবুজের আভা phosphorescence চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হল। কবি বললেন—মা তা হলে দোলায় গেলেন—! পরদিন Crete পার হলাম।

স্টীমারে পড়ার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলাম Hutchinson এর 'If winter comes can spring be far behind'. বইটি আমার হাতে কবি দেখেছিলেন, চেয়ে নিয়ে দেখলেন। বললেন—বইটির নাম শুনেছি। তোমার পড়া হয়ে গেলে দিও, আমি পড়ব—। বাকিটুকু শেষ করে পর দিনই কবিকে বইটি দিলাম। আমায় বলেছিলেন চেয়ে নিতে। স্মৃতির অমূল্য সম্পদ হবে মনে করে লোভ হয়েছিল চেয়ে নিতে। কিন্তু চাই নি।

স্টীমারে সব চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল পুপের। (নন্দিনী) অবাধ চলা ফেরা ও নৃত্য। সে তখন আড়াই তিন বছরের। জাহাজের যাত্রীরা সকলেই তাকে একবার কাছে কোলে পেতে ব্যগ্র হত। হঠাৎ খেয়াল খুশি মতো কবির কাছে এসে বলত—"দাদামশাই সেই গানটা কর না"—। গান হল "হ্যাদে গো নন্দরাণী" আর "সে যে নাচে, তা তা থৈ থৈ"। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল দু-একদিনে। তারপর সে সহজে আমার কোলে আসত; আমায় ডাকত 'গিরবাবু' বলে।

একদিন কবিকে আমার কন্যা তপতীর ছবি দেখালাম। কবি বললেন—তুমি দেখছি বিদেশে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারবে না। আমিও বিদেশে

গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারিনে। শান্তিনিকেতনের আকাশ তালগাছের ভিতর দিয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

ক্রিট দ্বীপ পার হয়ে গেলে একদিন কবি শোনালেন 'আহ্বান' :

"দীপ চাহে তব শিখা,　　মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে　　তৃষ্ণার আতুর অন্ধকার
সঙ্গ সুধারস।"

'হারুনা মারু' জাহাজে লেখা কবিতাগুলি—'সাবিত্রী', 'পূর্ণতা', 'আহ্বান', 'ছবি', 'ক্ষণিকা' ও 'খেলা' যেমন যেমন লেখা হত সেই দিনই নয়তো পরদিন, বিকালে পড়ে শোনাতেন আমাদের। ভূমধ্যসাগর দিয়ে যাবার সময় কবির উদ্দেশে বেতারে অভিনন্দন ও নিমন্ত্রণ আসত উপকূলের দেশ থেকে। একদিন আর একটি জাপানী জাহাজ বিপরীত দিক থেকে আমাদের জাহাজকে পাশ করে গেল। সে জাহাজের যাত্রীরা ডেকে ভিড় করে কবির উদ্দেশে রুমাল সঞ্চালন ও হর্ষধ্বনি করতে করতে গেল।

মার্সেই বন্দরে পৌঁছলাম ১১ই, রাত্রে, ভোরের দিকে। নামলাম ১২ই প্রভাতে। কবিকে পারি-র ট্রেনে তুলে দিয়ে রথীবাবু আমাদের সকলকে নিয়ে এলেন খোলা ফুটপাথে চেয়ার টেবিল সাজানো এক 'রোটিসরি'তে। ফরাসী যুবতীরা ক্রোয়াসাঁ শোকালা পরিবেশন করে গেল। তাদের নিটোল গণ্ড দেখে মনে পড়ল 'য়ুরোপযাত্রীর পত্র'-এ কবি লিখেছিলেন—"ইতালিয়ান যুবতীদের দেখে মনে হয়েছিল আঙুরের গুচ্ছের মতো, অমনি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য, যৌবন রসে অমনি উৎপূর্ণ—"। প্রাতরাশ শেষ হলে আমরাও ট্রেনের কামরায় এসে বসলাম। ট্রেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল চাষের জমি, গরুচরা মাঠ, বন, গ্রাম, নদী, পাহাড় ভেদ করে। ট্রেনের করিডরে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে যখন পারি-র গ্যার দ' লিয়ঁতে পৌঁছলাম তখন রাত্রি প্রায় দশটা। কবিকে অভ্যর্থনা করতে হাজির হয়েছিলেন প্রবোধ বাগচী, প্রবাসী বাঙালী ও ভারতীয় ছাত্রেরা, স্বয়ং সিলভ্যাঁ লেভি। কবি উঠলেন বিখ্যাত ধনী কাহেনের বাড়িতে, 'রোন' নদীর ধারে। কবি আমাকে বলেছিলেন সেখানে যেতে। পরদিন সুরেনবাবু এসে বললেন কবি ডেকেছেন আপনাকে, সঙ্গে যেতে ; সকলে পারি অপেরায় যাওয়া হবে। অপেরায় সদলবলে উপস্থিত হলে সমস্ত দর্শকমণ্ডলী উঠে

দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাততালি দিলেন। আমরা সকলে কবির সঙ্গে বসলাম একেবারে সামনে। অভিনীত হল Wagner-এর Master Singer, কিন্তু ফরাসীতে। পরদিন ছিল সিলভ্যাঁ লেভির বাড়িতে কবি সম্বর্ধনা; আমরা সকলে ও ভারতীয় ছাত্রেরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। বিকালে কবি কাহনের বাড়িতে যেতে বলেছিলেন, চা-এর নিমন্ত্রণ। গৃহস্বামী একটি সম্পূর্ণ বাঙলো বাড়ি নিযুক্ত করেছিলেন কবির থাকার জন্য। কবি বললেন কাহন রঙীন সিনেমা প্রস্তুতের কৌশল আবিষ্কার করেছেন। চা খেতে বসলে কবি কেতলি থেকে চা ঢেলে দিলেন; আমি ঢেলে নিতে চাইলে বললেন,—আমার তুমি আজ অতিথি; আমি চা ঢেলে দোব আর তুমি খাবে, এই হল দস্তুর। আমি আচার-বিরুদ্ধ কাজ করতে গিয়েছিলাম বলে সংকুচিত হলাম। ১৭ই পারি ত্যাগ করে, কবি ১৮ই আণ্ডেস জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করলেন।

ফ্রান্স থেকে ফিরলাম ১৯২৫-এ; কবি প্রত্যাবর্তন করলেন ঐ বছরের শেষের দিকে। পারিতে থাকতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কবির উপন্যাস নিয়ে তর্ক হলে 'নৌকাডুবি'র কথা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখি। এটি পাঠিয়েছিলাম বন্ধুবর নীরেন রায়ের কাছে। তিনি কি মনে করে এটি 'প্রবাসী'-এর সহঃ সম্পাদক সজনী দাসের কাছে দিয়ে আসেন। কিছুদিন পরে 'প্রবাসী'তে সেটি ছাপা হয়। মনে মনে বড়ই আশঙ্কা থাকে কবি কি বলবেন প্রবন্ধটি পড়লে। কবি ফেরার পর জোড়াসাঁকোয় কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তীক্ষ্ণ কৌতুকবাণ ত্যাগ করে কবি বললেন—কি, ফ্রান্সে যাবার সময় চোখের জল ফেলতে ফেলতে গেছো, আবার ফেরার সময়ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে এলে নাকি—। এর পর একদিন, যে সংখ্যায় আমার 'নৌকাডুবির প্লট' প্রবন্ধ বেরিয়েছিল সেই সংখ্যা হাতে নিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি; সঙ্গে ছিলেন অমল হোম। অমল হোম কবির হাতে দিলেন্ প্রবন্ধটি, দিয়ে পড়তে বললেন; আমার সাহস হয় নি। নিবিষ্ট চিত্তে প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়ে ঈষৎ নিস্তব্ধ থেকে বললেন—গিরিজা, তুমি ঠিকই লিখেছ। তুমি যা বলতে চেয়েছ, তাতে আমার সায় আছে। শুনে আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আচ্ছন্ন বোধ করলাম। কবির বইয়ের সমালোচনা করে তাঁর কাছে সাধুবাদ শুনেছি বলে।

ফ্রান্সে অবস্থানকালে আর একটি রচনা আমি করেছিলাম, যা কবিকে

দেখানো হয় নি। নিস-এ থাকতে ছোটখাট এক সাহিত্যিকদের সভায় কবি সম্বন্ধে বলবার জন্য আহূত হই। একটা প্রবন্ধ পাঠ করি, সেই সঙ্গে 'অভিসার' কবিতা ফরাসীতে অনুবাদ করে পাঠ করি। একজন মহিলা কবি আমার অনুবাদের খসড়া নিয়ে তাকে ফরাসী কবিতার আকৃতিতে সাজিয়ে মানিয়ে দেন। একটি ফরাসী পত্রিকায় এই প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়।

প্রত্যাবর্তনের পরে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ঘটনা হল কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে পুরানো বইয়ের দোকানে পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত স্কুলপাঠ্য একটা কবিতা পুস্তক চোখে পড়া। তাতে 'দুই বিঘা জমি'তে অজ্ঞাত সম্পূর্ণ নূতন একটা স্তবক দেখতে পাই। ফুটনোটে লেখা ছিল মাতৃভূমিকে কুলটা বলায় স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আপত্তি করেন যে স্কুলপাঠ্য বইয়ে এ স্ট্যানজা থাকা উচিত নয়। তাঁরই অনুজ্ঞায় কবি ঐ স্তবকটি বর্জন করেন। সেটি এই—

"ধিক ধিক তোরে শতধিক ওরে নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনই যাহার তখনই তাহার এই কি জননী তুমি।
সে কি মনে রবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল লতা পাতা।
আজ কোন রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ মোহিনী বেশ,
পাঁচ রঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা পুষ্পে খচিত কেশ।
আমি তোর লাগি' ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী হাসিয়া কাটাস দিন।
ধনীর আদরে গরব না ধরে, এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনখানে লেশ নাহি অবশেষ সে দিনের কোন চিহ্ন।
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহারা সুধারাশি।
যত হাস আজ, যত কর সাজ, ছিলে দেবী হলে দাসী॥"

রোমাঞ্চিত হলাম পড়ে, বুঝলাম এ আমার অমূল্য আবিষ্কার। কী জুতসই ভর্ৎসনা, কী ড্রামাটিক! এর পরের অনুচ্ছেদ—"বিদীর্ণ হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি—" অপূর্ব সংযোগ। এই আবিষ্কারের কথা কবিকে লিখে পাঠালাম ও বর্জিত স্তবকটির পুনঃসংযোজনের দাবি পেশ করলাম। উত্তরে পূজনীয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে চিঠি পেলাম।

চারুবাবু লিখেছেন—আমার চিঠি গুরুদেব বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগে দিয়েছেন। স্থির হয়েছে কাব্যগ্রন্থে স্তবকটি পুনঃপ্রকাশিত হবে কিন্তু শিশুপাঠ্য 'কথা কাহিনী'তে নয়। এর পর 'সঞ্চয়িতা'য় স্তবকটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতাতে পুনঃসংযোজিত হয়—পৌষ ১৩৩৮। এক কপি 'সঞ্চয়িতা' কবির কাছে নিয়ে গেলে কবি স্বাক্ষর করে দেন।

১৩৩৮ সালের (১৯৩১) শ্রাবণে 'পরিচয়' প্রকাশিত হয়। 'পরিচয়'-এর জন্মকথা এর আগে বিবৃত করেছি। সুধীন্দ্র আমার কাছে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ত্রৈমাসিক বার করবার প্রস্তাব করেন। আমার বন্ধু নীরেন রায়কে আমি ডেকে আনি; আরও অনেককে। 'পরিচয়' নামকরণ নীরেন রায়েরই। যা হোক স্থির হয় প্রথম সংখ্যার জন্য কবির কাছে কোনো লেখা চাওয়া হবে না। সে সংখ্যা বার হলে কবির কাছে উপস্থিত হওয়া যাবে 'পরিচয়' হাতে নিয়ে। আমাদের উদ্যম সার্থক বিবেচনা করলে কবি স্বপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর লেখা দেবেন। আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় 'পরিচয়' বার হলে কবির কাছে যেতে পারি নি। সুধীন্দ্র গিয়েছিলেন আর কবি প্রথম সংখ্যা 'পরিচয়'-এর তারিফ করে নিজেই পরের সংখ্যা—কার্তিকের জন্য প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখে দিয়েছিলেন। 'পরিচয়'-এর সমালোচনাগুলি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিন সুধীন্দ্র ও আমি খড়দায় বাসকালে তাঁর কাছে যাই। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বইয়ের এক আলোচনা আমি 'পরিচয়'-এ দিই। আমি গেলে কবি বললেন—গিরিজা, তুমি যে দেখছি আমার কলম তুলে নিয়ে লিখতে শিখেছ। আমি তন্ময় হলাম; সুধীন্দ্র বললেন—আর বলবেন না স্যর। ওতেই গিরিজার টুপিটা মাথায় আঁট হয়ে উঠবে। খুব হাসলাম তিন জনে মিলে।

এই সময়ে আমার বিশিষ্ট বন্ধু চণ্ডীচরণ সাহা জার্মানী গিয়ে রেকর্ডিং-এর মেশিন নিয়ে আসেন। তিনি 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্' নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ও আমাকে অন্যতম ডিরেক্টার করে নেন। চণ্ডীচরণের বিশেষ আগ্রহ হয়, তিনি যে প্রথম রেকর্ড বার করবেন তা হবে রবীন্দ্রনাথের গান ও আবৃত্তি। এজন্য তিনি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের শরণাপন্ন হন। বলেন কবিকে গিয়ে আমাকেও বলতে হবে। শ্রীমতী মহলানবিশ ও প্রফেসার প্রশান্তচন্দ্র চণ্ডীচরণকে সঙ্গে করে কবির কাছে নিয়ে যান শান্তিনিকেতনে। ঠিক হয় রথীবাবুও যোগ দেবেন ডিরেক্টার

হয়ে। কবি গান আবৃত্তি দিতে রাজী হন। কলকাতায় কবি এলে আবার দ্বিতীয় প্রস্থ আমি গিয়ে কবিকে রেকর্ডিং-এর কথা বলি। কবি বললেন—তুমিও এতে ডিরেক্টার আছ শুনে সন্তুষ্ট হলাম। গান আবৃত্তির কথা রানী বলেছেন আগেই। এখন তুমিও বলছ যখন, তখন তথাস্তু। চণ্ডীকে বোলো ব্যবস্থাদি করে আমার কাছে খবর দিতে।

৫ই এপ্রিল ১৯৩২-এ কবির এই রেকর্ডিং হয় 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল'-এর স্টুডিওতে, ৬।১ অক্রুর দত্ত লেনে। শ্রীমতী মহলানবিশ কবির সঙ্গে এসেছিলেন এবং আবৃত্তি ও গান মনোনীত করতে সাহায্য করেছিলেন। অকম্পিত উদাত্ত সতেজ স্বরে, অবাধ দ্বিধাহীন স্বচ্ছন্দ গতিতে, ছন্দের মাত্রা যতি লয় অক্ষুণ্ণ রেখে, ব্যঞ্জন বর্ণ ও যুক্তাক্ষরের সংঘাত প্রতিফলিত করে, নীল-লাল আলোর সংকেত ক্রমে, কবি আবৃত্তি করলেন, গান গাইলেন। রেকর্ডিং করে পাণ্টা বাজিয়ে কবিকে শোনানো হল। মনঃপূত হলে পাকা রেকর্ডিং করা হল। নিচের গান ও আবৃত্তিগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে গৃহীত হয় :

৫।৪।৩২	তবু মনে রেখো আমি যখন বাবার মতন	…H 1
৬।৪।৩২	আমার পরাণ লয়ে হৃদয় আমার নাচেরে	…H 49
	তুমি এস হে কাঙাল আমারে কাঙাল	…H 17000

এর পরে রেকর্ডিং হয়, ১৯৩৬ অব্দে :

১৩।২।৩৬	ছোট বীরপুরুষ লুকোচুরি	…H 342
	Authorship ও Hero…	H 990
	সোনার তরী ও দুঃসময়…	H 991

এর পরে শেষ রেকর্ডিং হয় :

৯।১১।৩৯

ঝুলন ও আশা…	H 812
The Vision ও The Trumpet…	H 782

১৯৩২ ও '৩৬-এর রেকর্ডিং-এর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। রেকর্ডিং করেছিলেন চণ্ডীচরণ নিজে। দিন তারিখগুলি হিন্দুস্থানের সৌজন্যে পেয়েছি।

এ সময়ের এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে মনের পর্দায়। উদয়শঙ্কর তখন দলবল নিয়ে সবে প্রথম কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তাঁর নৃত্যাভিনয় পরিবেশন করছেন। সেবারের অভিনয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফার—১৯৩২-৩৩ সালে হবে; স্থান কর্পোরেশন স্ট্রীটের রঙ্গমঞ্চ, এখন যার নাম 'এলিট'। এই নৃত্যাভিনয় দেখতে এক জার্মান দম্পতি ও চণ্ডীচরণকে নিয়ে সস্ত্রীক আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। অভিনয় আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ আগে, বিস্মিত হয়ে দেখি, কবি এসে বসলেন মঞ্চের সামনে। দর্শকমণ্ডলী দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিয়ে অভিবাদন করলেন; কবির গলায় মালা দেওয়া হল। অভিনয় কিছুটা অগ্রসর হতেই কবি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। পরিচালক পক্ষের দু-একজন তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এলে কি যেন কবি বললেন। তাঁরা এনে দিল একটি ছোট সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে কবি মঞ্চে উঠে গিয়ে নিজের গলা থেকে মালা খুলে নিয়ে উদয়শঙ্করের গলায় পরিয়ে দিলেন। স্তম্ভিত বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দের হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ বহুক্ষণ ধ্বনিত স্পন্দিত হল। উপস্থিত সকলেই বুঝেছিলেন এ মাল্যদান পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না। কবির জীবনীকার এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নি। যা হোক, ধূর্জটিপ্রসাদ এ ঘটনার পর কবিকে লেখেন, যে-মালা বঙ্কিমচন্দ্র আপনার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন সে মালা আপনি অর্পণ করলেন উদয়শঙ্করকে!

ভারতীয় দর্শনে

ভাববাদ ও ভাববাদ-খণ্ডন : প্রস্তাবনা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের প্রভাব সংক্রান্ত আধুনিক বিদ্বানদের নানা অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও প্রথমত মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের দর্শনে ভাববাদের প্রসার অত্যন্ত সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা, আমাদের সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র তিনটিকে সুনির্দিষ্টভাবে ভাববাদী বলা যায়। এই তিনটি সম্প্রদায় বলতে যোগাচার, মাধ্যমিক এবং অদ্বৈত-বেদান্ত। প্রথম দুটি বৌদ্ধ, তৃতীয়টি বৈদিক দর্শন। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনেরই অপর দুটি প্রধান সম্প্রদায়—সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—ঐকান্তিক অর্থেই ভাববাদ-বিরোধী। বৈদিক দর্শনেরও প্রধানতম সম্প্রদায়ান্তরে—পূর্বমীমাংসা বা সংক্ষেপে মীমাংসায়—ভাববাদ-খণ্ডনের প্রবল আয়োজন দেখা যায়। এমনকি বেদান্ত দর্শনেরও অন্যান্য সম্প্রদায়ে—যথা, মধ্বর দ্বৈত-বেদান্তে—ভাববাদ বর্জনের আয়োজন উপেক্ষণীয় নয়। এবং এ-ছাড়া ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য কোন সম্প্রদায়ই দার্শনিক ভাববাদের সমর্থক নয়। জৈনরা অবশ্যই কোন দার্শনিক মতকে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা বলতে চাননি; কিন্তু পণ্ডিত সুখলালজী যেমন বলছেন, অনেকান্তবাদ সত্ত্বেও জৈন দর্শন একান্ত বাস্তববাদী। অর্থাৎ, এক অদ্ভুত দার্শনিক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেও ভাববাদ-বনাম-বাস্তববাদের সমস্যা প্রসঙ্গে জৈনরা প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ নন; কেননা তাঁদের মতে প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ যে স্থূল জগতের জ্ঞান দেয় সে-জগৎ অবশ্যই বাস্তব—তার সত্তা ভাববাদ-প্রতিপাদ্য নিছক ব্যবহারিক নয়। স্বভাবতই জৈন দর্শনেও ভাববাদ-খণ্ডনের প্রয়াস দেখা যায়। অবশ্যই, এ-প্রয়াসের চরম পরিচয় বোধহয় ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ে। এবং সাংখ্য-যোগ সম্প্রদায়ের আদিরূপ ও রূপান্তর প্রসঙ্গে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও একথা সর্ববাদী সম্মত হবে যে উক্ত দর্শন অবশ্যই বাহ্যবস্তুবাদী বা ভাববাদ-বিরোধী। এছাড়া বাকি থাকে প্রধানতই চার্বাক বা লোকায়ত। এবং ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না করলে এই সম্প্রদায়টিকে চূড়ান্ত বস্তুবাদী বলে মানতেই হবে; অর্থাৎ এখানে দার্শনিক ভাববাদের প্রতি কোন রকম সহিষ্ণুতা

বা পক্ষপাত কল্পনাতীত। অতএব, সংক্ষেপে, ভারতীয় দর্শনে দার্শনিক ভাববাদের প্রসার বাস্তবিকই অত্যন্ত সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

কিন্তু তাই বলে এই ভাববাদের গুরুত্বকে উপেক্ষা করার কারণ নেই। কেননা, শুধু যে উপরোক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সুবিশাল দার্শনিক সাহিত্য রচিত হয়েছে তাই নয় এবং শুধু এও নয় যে সে-সাহিত্যর সঙ্গে বসুবন্ধু, নাগার্জুন, দিঙনাগ, গৌড়পাদ, শঙ্কর, বাচস্পতি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ ভারতীয় দর্শনের নানা দিকপালের নাম জড়িত; বস্তুত অত্যুক্তির আশঙ্কা না করেও বোধহয় বলা যায় যে, সাধারণভাবে দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদের সমর্থনে যে-সব মৌলিক যুক্তি প্রস্তাবিত হয়েছে ভাবতীয় ভাববাদ আলোচ্য তিনটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও এই মৌলিক যুক্তিগুলি—অন্তত তার মধ্যে প্রধানতম যুক্তিগুলি—দ্বারাই সমর্থিত। এই কারণে, ভারতীয় ভাববাদের দার্শনিক গুরুত্বর প্রতি উদাসীন হওয়া মারাত্মক ভ্রম হবে। তাছাড়া আরো একটি বড় কথা আছে। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক যুগ পর্যন্ত এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত একটি সম্বন্ধে—অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্ত সম্বন্ধে—আমাদের দার্শনিক মহলে এক অত্যদ্ভুত সংস্কারগত মনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছে। যেন, অদ্বৈতবেদান্ত অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত শুধুমাত্র একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ই নয়; তার বদলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দার্শনিক প্রচেষ্টার চরম পরিণতি বলতে বুঝি এই অদ্বৈতমতই।

এ-মনোভাবেরই সবচেয়ে প্রচলিত সংস্করণটির নাম সমন্বয়-ব্যাখ্যা। কেবল মনে রাখা দরকার, সমন্বয়-ব্যাখ্যা বলতে প্রকৃতপক্ষে সমস্তগুলি দার্শনিক মতবাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধন নয়; তার বদলে অদ্বৈতমতেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন—অন্যান্য দার্শনিক মতগুলিকে অদ্বৈতানুগামী বলেই প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস। 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়' নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ যেমন মন্তব্য করছেন, 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাসমুদ্রে নানা প্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক স্রোতসমূহ মিলিত হইয়া একীভূত হইয়াছে।' কিংবা, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার যেমন বলছেন, 'ন্যায়াদি দার্শনিকদের মত বেদান্তমতের বিরুদ্ধ ইহা বলিবার হেতু নাই। বলিতে পারা যায় যে, বেদান্তমতই তাঁহাদের অভিমত।' কিন্তু তাহলে তাঁরা সরাসরি বেদান্তমতই প্রকাশ করেননি কেন? 'তাদৃশ সূক্ষ্মমত শিষ্যগণ

সহসা বুঝিতে পারিবেন না। এই বিবেচনাতেই তাঁহারা উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন।' কিন্তু মন্দবুদ্ধি শিষ্যদের অবগতি-সাহচর্যের উদ্দেশ্যে প্রকৃত অভিমতটি গোপন বা অস্পষ্ট রেখে মতান্তর অবতারণার যুক্তি কী? মহামহোপাধ্যায় সোপান-আরোহণের যুক্তি দিয়েছেন। দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করে শিষ্যগণ প্রথম সোপান হিসেবে ন্যায়-বৈশেষিক প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবেন, দ্বিতীয় সোপান হিসেবে সাংখ্য-যোগ প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবেন এবং তারপর তাঁরা চরম লক্ষ্য হিসেবে অদ্বৈত-প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বর উপলব্ধিতে উপনীত হবেন। কিন্তু শুরুতেই অদ্বৈততত্ত্ব শুনলে তাঁদের বুদ্ধিবিভ্রম হবে এবং তাঁরা শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হবেন। 'দয়ালু ঋষিগণ লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সোপান-আরোহণের রীতিতে ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক আত্মতত্ত্বে উপনীত করিয়াছেন।'

এ-জাতীয় ব্যাখ্যায় আস্থা-স্থাপনের জন্য যতখানি সরল বিশ্বাসের প্রয়োজন আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ মনে তার সংকুলান হওয়া অবশ্যই স্বাভাবিক নয়। পক্ষান্তরে এ-সন্দেহই প্রবল হয় যে আলোচ্য ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতের পক্ষে চরম সমর্থন উদ্ভাবনের একটি কৌশলমাত্র। কেননা, মধ্যযুগীয় লেখকদের মধ্যে সর্বজ্ঞাত্ম মুনির 'সংক্ষেপশারীরক', মধুসূদনের 'প্রস্থানভেদ' এবং বিশেষ করে কাশ্মীরবাসী বৈদান্তিক সদানন্দ যতির 'অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি'র মত প্রকট অদ্বৈতবাদী গ্রন্থই সমন্বয়-ব্যাখ্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আপত্তি তুলে হয়তো বলা হবে, এমনকি মহানৈয়ায়িক স্বয়ং উদয়নাচার্যও তাঁর 'আত্মতত্ত্ববিবেক' গ্রন্থের শেষভাগে এই সমন্বয়-ব্যাখ্যাই প্রস্তাব করেছেন; অতএব এ-ব্যাখ্যাকে শুধুমাত্র অদ্বৈতবাদীদেরই উদ্ভাবন বলা যায় না। এ-আপত্তি স্বীকারযোগ্য হলে মানতে হয়, অদ্বৈতমতই উদয়নের প্রকৃত অভিপ্রেত মত; অর্থাৎ ন্যায়মতের গ্রন্থ-প্রণেতা হলেও দার্শনিক বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ একথার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেছেন: 'মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের "আত্মতত্ত্ব-বিবেক"-এর কোন কোন উক্তি প্রদর্শন করিয়া এখন কেহ কেহ তাঁহাকে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কারণ, উদয়নাচার্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে যে-কোন রূপে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ গ্রন্থে কয়েক স্থলে অদ্বৈতমত আশ্রয় করিয়াও বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই কোন স্থলে সেই বৌদ্ধমতের অপেক্ষায় অদ্বৈতমতের বলবত্তা ও

শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। তদ্দ্বারা তাঁহার অদ্বৈতমতনিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না।' মহামহোপাধ্যায় আরো দেখাচ্ছেন, উদয়ন যেভাবে শ্রুতিকে সমর্থন করবার প্রয়াস করেছেন তা থেকেও বোঝা যায় যে অদ্বৈতমত তাঁর অভিপ্রেত হতে পারে না: 'যদি বল, শ্রুতিতে জগতের মিথ্যাত্ব কথিত হওয়ায়, অর্থাৎ শ্রুতি সত্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করায়, শ্রুতিতে মিথ্যা কথা (অনৃত দোষ) আছে এবং শ্রুতিতে নানা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কথিত হওয়ায় ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধরূপ দোষ আছে, এবং শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ একই আত্মতত্ত্বের উপদেশ থাকায় পুনরুক্তি দোষ আছে…। এতদুত্তরে উদয়নাচার্য বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে উক্ত দোষত্রয় নাই। কারণ জগতের মিথ্যাত্বাদি-বোধক শ্রুতিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাৎপর্য আছে।' এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, উদয়নের মতে শ্রুতিতে যদি প্রকৃতপক্ষে জগতের মিথ্যাত্ব কথিত হত তাহলে শ্রুতি বাস্তবিকই অনৃতদোষদুষ্ট হত, অর্থাৎ একথা বলা যেত যে শ্রুতিতে মিথ্যা কথা আছে। অতএব, উদয়ন কোনমতেই জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করতে সম্মত নন; আর এই কারণেই শ্রুতির সমর্থনে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে শ্রুতির যেসব কথা জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদক সেগুলির প্রকৃতপক্ষে অন্য তাৎপর্য আছে। অতএব উদয়নকে কোন মতেই অদ্বৈতবাদী বলা যায় না এবং তাঁর সমন্বয়-ব্যাখ্যাকে সদানন্দ যতি প্রমুখ অদ্বৈতবাদীদের সমন্বয়-ব্যখ্যার সঙ্গে সমানার্থক বিবেচনা করা যায় না। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ যেমন মন্তব্য করেছেন, 'প্রণিধান করা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য পূর্বোক্তরূপ সমন্বয় করিতে যাইয়া অদ্বৈতমতকে সিদ্ধান্তরূপেই সমর্থন করেন নাই। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধান্তের অনুকূল শ্রুতিসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যেরূপ উহার তাৎপর্য কল্পনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যে ন্যায়মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাই সমর্থন করিবার জন্য ঐ শ্রুতিসমূহের পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহাকে আমরা অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া আর কিরূপে বুঝিব?'

কিন্তু উদয়নকে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলে প্রমাণ করা না গেলেও আমাদের দেশের দার্শনিক মহলে দীর্ঘ দিন ধরে অদ্বৈতমতের প্রতি গভীর ও ব্যাপক শ্রদ্ধার একটি মূল কারণের ইঙ্গিত উপরোক্ত আলোচনা থেকেই পাওয়া যায়। কেননা, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে শ্রুতি—বিশেষত উপনিষদ্-সাহিত্যকে—চরম অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করবার আয়োজন হয়েছে। এবং

বৈদান্তিকেরা অক্লান্তভাবেই দাবি করেছেন, তাঁদের দর্শন একান্তই বেদমূলক বা শ্রুতিমূলক—যুক্তি বা তর্কমূলক নয়। বস্তুত তাঁদের একটি মূল দাবি হল নিরপেক্ষ তর্ক সম্পূর্ণ অপ্রতিষ্ঠ; একমাত্র শ্রুতির অনুগামী হলে তর্কের উপযোগিতা থাকতে পারে। অবশ্যই এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে শ্রুতিকে আশ্রয় করেই বিভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায় বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন, এবং আধুনিক বিদ্বানেরা যে-কথা বারবার দেখাবার চেষ্টা করেছেন, বাস্তবভাবে বিচার করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় সমগ্র উপনিষদ্-সাহিত্য একই দার্শনিক তত্ত্বর প্রতিপাদক নয়। তবুও এবিষয়েও সন্দেহ নেই যে বহু উপনিষদ্-বাক্যে সুস্পষ্টভাবেই অদ্বৈতবাদ সূচিত হয়েছে। অতএব উপনিষদ্ সংক্রান্ত সুদীর্ঘকালের সংস্কারগত মনোভাবের ফলে আমাদের দেশে অদ্বৈতবাদ আরো পাঁচ রকম দার্শনিক মতবাদের সমতুল্য একটি দার্শনিক মতবাদ মাত্র বলেই বিবেচিত হয় নি—এ মতবাদের প্রকৃত ভিত্তি দিব্যজ্ঞান, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি! অতএব তার প্রামাণ্যে সন্দিহান হওয়া অতি-বড় নাস্তিক বা পাষণ্ডের লক্ষণ। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, আমাদের দেশে অদ্বৈতবাদের সমর্থনে অদ্বৈতবাদীদের দার্শনিক প্রচেষ্টা ছাড়াও কোন-এক সুগভীর ধর্মসংস্কারও কার্যকরী থেকেছে। ভিন্টারনিৎস্ মন্তব্য করেছিলেন, it proved fatal for the development of Indian philosophy that the Upanisads should have been pronounced to be "revelations" and sacred texts; অর্থাৎ, উপনিষদ্গুলি যে আম্নাত হয়েছে এবং এগুলি আপ্তগ্রন্থ—এই ঘোষণা ভারতীয় দর্শনের বিকাশের পক্ষে মারাত্মক হয়েছে। মন্তব্যটি বিশেষত এইদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে তারই ফলে অদ্বৈত-প্রতিপাদ্য চরম ভাববাদ শুধুমাত্র একটি দার্শনিক মতের মর্যাদা পায় নি, এক প্রবল ও প্রাচীন ধর্মসংস্কারের দ্বারাও সমর্থিত এবং সংরক্ষিত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রচণ্ড হবার আশঙ্কা অবশ্যই ছিল। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় হল, অন্তত আংশিক-ভাবে ধর্মসংস্কারের প্রভাবেই আমাদের দর্শনে ভাববাদ-খণ্ডনেরও বিপুল উৎসাহ দেখা দিয়েছে। কেননা, আগেই দেখেছি, অদ্বৈতবেদান্ত ছাড়া প্রকৃত ভাববাদী সম্প্রদায় বলতে যোগাচার এবং মাধ্যমিক; এবং দুটিই বৌদ্ধ সম্প্রদায়। অতএব বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী দার্শনিকেরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবেই এই দুটি সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত খণ্ডনকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

দার্শনিক দায়িত্ব বলেই পরিগণনা করেছেন। ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ-খণ্ডনের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা বলতে ন্যায়-বৈশেষিক এবং পূর্বমীমাংসা সম্প্রদায়ের। এবং উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই ভাববাদী পূর্বপক্ষ বলতে অন্তত প্রত্যক্ষভাবে যোগাচার ও মাধ্যমিক মত। কিন্তু দার্শনিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব যে কত গভীর তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন উল্লেখ করা যায়। অদ্বৈতবাদী স্বয়ং শঙ্করাচার্য বৌদ্ধমত খণ্ডনকে সামগ্রিক বা সর্বাঙ্গীণ করবার উদ্দেশ্যে ভাববাদ-বিরোধী বা বাস্তববস্তুবাদী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতের মতোই ভাববাদী যোগাচার এবং মাধ্যমিক মতও খণ্ডন করেছেন। উপসংহারে তিনি বলছেন, 'অধিক কী বলিব? যে যে প্রকারে বৌদ্ধমতের যুক্তিসিদ্ধতা পরীক্ষা করিতে যাই সেই সেই প্রকারেই উক্ত মত বালুকাময় কূপের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া পড়ে।...সুগত (শাক্যসিংহ) পরস্পর-বিরুদ্ধ বাস্তববস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ এবং সর্বশূন্যবাদ উপদেশ করিয়া আপনার অসম্বদ্ধ-প্রলাপিতা ব্যক্ত করিয়াছেন। অথবা তিনি প্রজাবিদ্বেষী ছিলেন—প্রজাগণ বিরুদ্ধার্থ গ্রহণে বিমুগ্ধ হউক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।' প্রত্যুত্তরে অবশ্য বৌদ্ধরাও প্রশ্ন তুলতে পারতেন, উপনিষদের ঋষিরাও কি একই অর্থে অসম্বদ্ধ-প্রলাপিতার পরিচয় দেননি? কেননা, তাঁদের বাক্য অবলম্বন করেই তো বিভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদই প্রস্তাবিত হয়েছে! এই মতবিরুদ্ধতা উপেক্ষা করবার বাস্তব সুযোগ সত্যিই নেই। যথা, স্পষ্টদ্বৈতবাদী মাধ্ব-মত খণ্ডনের জন্য অদ্বৈতবাদী মধুসূদনকে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামে একটি সুদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছে।

অবশ্যই অসম্বদ্ধ-প্রলাপিতা হল হাসিতামাসা বা গালিগালাজের কথা। তার পরিবর্তে প্রকৃত দার্শনিক বিচারের দিকটি আলোচনা করা যাক। এবং দার্শনিক বিচারের দিক থেকে মূল প্রশ্ন হল, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের বাস্তববস্তুবাদ এবং যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের চরম ভাববাদ যেহেতু স্পষ্টতই পরস্পরবিরুদ্ধ সেইহেতু একাধারে উভয়ই খণ্ডন করে শঙ্করাচার্য নিজে কি দার্শনিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন নি? বিজ্ঞানবাদের সমালোচনায় তিনি অবশ্য অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন: 'নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য', অর্থাৎ, 'তোমাদের মুখের মত অঙ্কুশ নাই। অঙ্কুশ থাকিলে তোমরা ঐরূপ কথা বলিতে না।' বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, বহির্বস্তু বলে প্রকৃত কিছু নেই; যা অনুভব করি তা আসলে অনুভূতিই; অনুভূতিই

বহির্বস্তুর ন্যায় (ইব) প্রকাশিত হয়। উত্তরে শঙ্কর বলছেন, 'বহির্বস্তুর প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া তোমরা বহির্বস্তুর অস্তিত্বই বলিয়া থাক। তোমরা বলিয়া থাক, বিজ্ঞেয় পদার্থরাশি অন্তর্বর্তী—অন্তরেই আছে। কিন্তু সে-সকল বহিঃস্থিতের ন্যায় অবভাসিত হয়। সর্ববিদিত বহিঃপ্রকাশমান পদার্থরাশিকে জ্ঞানমাত্র বলিবার জন্য তোমরা বহির্বৎ—বহিঃস্থের ন্যায়—এইরূপ বলিয়া থাক। সে-সকল যদি বাহিরে আদৌ না থাকে তাহা হইলে কীরূপে বহির্বৎ বলিতে পার? কে এরূপ বলিয়া থাকে যে বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে? অতএব অনুভবের অনুরূপ বস্তু স্বীকার করিতে হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, পদার্থ বাহিরেই প্রকাশ পায়, বহিঃস্থের ন্যায় প্রকাশ পায় না।'

ভাববাদ-খণ্ডনের এই যুক্তিটি শঙ্করাচার্য খুব সম্ভব ন্যায়-বৈশেষিক এবং পূর্ব-মীমাংসকদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। কেননা আমরা পরে দেখব, শঙ্কর-পূর্ব ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্যে এবং কুমারিলের রচনায় হুবহু এই যুক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তত, একটি বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-যুক্তি ন্যায়-বৈশেষিক এবং পূর্ব-মীমাংসকদের মুখে শোভা পেলেও অন্তত শঙ্করের মুখে শোভা পায় না। কেননা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বাহ্যবস্তুবাদী, শঙ্কর উৎকট ভাববাদী। অতএব শঙ্কর এখানে বাহ্যবস্তু অপলাপের যে-আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তা নেহাতই কৃত্রিম। শঙ্করের নিজস্ব প্রস্তাব, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন নয়, তার বদলে বাহ্যবস্তুর অপলাপই। পার্থক্যের মধ্যে বড় জোর এই যে বিজ্ঞানবাদী মতে তথাকথিত বাহ্যবস্তুগুলি আসলে বিজ্ঞান, আর শঙ্করমতে এগুলি আসলে অজ্ঞান বা অবিদ্যা—কিন্তু উভয়মতেই এগুলি নেহাতই তথাকথিত বাহ্যবস্তু—প্রকৃত বিচারে বাহ্যবস্তু হিসাবে মিথ্যা। সংক্ষেপে, শঙ্করমতে আত্মন্ বা ব্রহ্মন্ই একমাত্র সত্য; বাহ্যবস্তু হিসেবে যার আপাত-প্রতীতি ঘটে প্রকৃতপক্ষে তার কোনো স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে না। অতএব, বৌদ্ধ বাহ্যবস্তুবাদ-খণ্ডনই শঙ্করের পক্ষে আত্মপক্ষসঙ্গতির পরিচায়ক; বৌদ্ধ ভাববাদীদের বিরুদ্ধে বাহ্যবস্তুবাদ-সঙ্গত কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে তিনি শুধুই বৌদ্ধ ভাববাদ এবং বৈদান্তিক ভাববাদের মধ্যে প্রকৃত দার্শনিক সাদৃশ্যটি আবিল করেছেন।

সুখের বিষয় চেরবাট্স্কয় প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানেরা বৌদ্ধ ভাববাদের বিরুদ্ধে শঙ্করের এই কৃত্রিম রোষকে *sectarian animosity*-র লক্ষণ

বলেই উপেক্ষা করার প্রস্তাব করেছেন। শঙ্করের পরমগুরু ছিলেন গৌড়পাদ এবং পরবর্তীকালে শঙ্করমতের প্রমাণশাস্ত্রগত প্রধান সমর্থক বলতে শ্রীহর্ষ। চেরবাট্‌স্কয় বলছেন, 'we find Gaudapada founding a new school of Vedanta and directly confessing his followship of Buddhism. This feeling of just acknowledgement was superseded, in the person of Samkaracarya, by a spirit of sectarian animosity and even extreme hatred; but nevertheless we find, later on, in the same school a man like Sriharsa libarally acknowledging that there is but an insignificant divergence between his views and those of the Madhyamikas'। এবং শ্রীহর্ষ-প্রসঙ্গে চেরবাট্‌স্কয় আবার বলছেন, 'he openly confesses that in his fight against realism he is at one with the Madhyamika Buddhists, a circumstance which Samkaracarya carefully tried to dissimulate. Sriharsa maintains that "the essence of what the Madhyamikas and other (Mahayanists) maintain it is impossible to reject"।'

বৃদ্ধ-সম্মতি হিসেবে শুধুমাত্র চেরবাট্‌স্কয়-এর মন্তব্যই উদ্ধৃত করলাম। কিন্তু তাছাড়াও ভ্যালে-পুঁসো, জ্যাকবি বা বিধুশেখর শাস্ত্রীর মন্তব্যও উদ্ধৃত করা যেত। কেননা, এঁরা সকলেই অদ্বৈতবেদান্ত যা মায়াবাদের সঙ্গে বিশেষত বৌদ্ধ যোগাচার ও মাধ্যমিক মতের নিকট সাদৃশ্য এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এবং ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ ও ভাববাদ-খণ্ডন প্রসঙ্গে সব-প্রথম এই কথাটিই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য ও সংঘাত যেমনই হোক না কেন, দার্শনিক ভাববাদ হিসেবে বৌদ্ধ ভাববাদ এবং বৈদিক ভাববাদ বা অদ্বৈতবাদ আসলে সমানতন্ত্র। অতএব ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ-খণ্ডন যদিও একটি উদ্দেশ্যের দিক থেকে বহুলাংশে বৌদ্ধ দার্শনিকদের বিরুদ্ধে অভিপ্রেত, তবুও প্রকৃত দার্শনিক বিচারে তাকে শুধুমাত্র বৌদ্ধ-মত খণ্ডন মনে করা সংকীর্ণতারই পরিচায়ক হবে।

অবশ্য, দার্শনিক ভাববাদ হিসেবে বৌদ্ধ ভাববাদ এবং বৈদান্তিক ভাববাদকে সমানতন্ত্র বিবেচনার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উঠবে। অতএব, এ-বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনার প্রয়োজন হবে। এখানে শুধুমাত্র একটি পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান আলোচনা শেষ করব।

ভারতীয় দর্শনে প্রকৃত বাহ্যবস্তুবাদীরা যতখানি প্রকট উৎসাহ দেখিয়ে বৌদ্ধ ভাববাদীদের মত খণ্ডন করতে চেয়েছেন হয়তো ধর্মসংস্কারের প্রভাবেই বৈদান্তিক ভাববাদীদের বিরুদ্ধে সে-উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তবুও দার্শনিক ভাববাদ হিসেবে উভয়ই যে সমানতন্ত্র—এ-জাতীয় স্বীকৃতি তাঁদের রচনায় বারবার পাওয়া যায়। প্রাচীন ধর্মসংস্কার ও প্রকৃত দার্শনিক বিচারের এ জাতীয় মিশ্রণের দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়: 'বেদ-বিশ্বাসী অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়…মতে…অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সনাতন ব্রহ্মে ঐ অনির্বচনীয় জগতের ভ্রম হইতেছে।…বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যদি নিজমত সমর্থন করিতে যাইয়া শেষে উক্ত অদ্বৈতমতেরই নিকটবর্তী হন, তাহা হইলে কিন্তু অদ্বৈতমতেরই জয় হইবে। কারণ, অদ্বৈতমতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত, বেদকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত মত সমর্থিত। তাই উহা বেদনয় অর্থাৎ বৈদিক মত বলিয়া কথিত হয়। বেদ ও সনাতন ব্রহ্মকে আশ্রয় করায় অদ্বৈতমত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের অপেক্ষায় বলী। সুতরাং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিচার করিতে করিতে শেষে আত্মরক্ষার জন্য অদ্বৈতমতের নিকটবর্তী হইলে তখন অদ্বৈতমতের জয় অবশ্যম্ভাবী। আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য উক্তরূপ তাৎপর্যেই প্রথম কল্পে বিজ্ঞানবাদীকে অদ্বৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন। পরেই আবার বলিয়াছেন যে, অথবা মতিকর্দম অর্থাৎ বুদ্ধির মালিন্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাদি বাহ্য-বিষয়ের পারমার্থিকত্ব বা সত্যতায় অর্থাৎ আমাদিগের সম্মত দ্বৈতমতে অবস্থান কর। তাৎপর্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধির মালিন্যবশত প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে অদ্বৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ করুন। তাহাতেও আমাদিগের ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির মালিন্য নিবৃত্তি হইলে তিনি আর এই বিশ্বের নিন্দা করিতে পারিবেন না।' কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন না উঠে পারে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে যদি এই বিশ্বের নিন্দা বা বাহ্যবিষয়ের পারমার্থিকত্বর অপলাপ প্রকৃতপক্ষে মতিকর্দম বা বুদ্ধি-মালিন্যেরই পরিচায়ক হয় তাহলে বেদকে অবলম্বন করে প্রস্তাবিত হলেও অদ্বৈতবাদও কি একই মতিকর্দমের পরিচায়ক হবে না? এই দিক থেকে, বিজ্ঞানবাদীকে অদ্বৈতবাদের কুক্ষিতে প্রবেশ করবার ওই উপদেশটি প্রকৃতপক্ষে বিদ্রূপাত্মক বলেই বিবেচিত হতে পারে: অর্থাৎ ভাববাদের সমর্থনে বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে ভাববাদ হিসেবে সমানতন্ত্র অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অনেকাংশে একমত হবার সুযোগ ছিল এবং বাহ্যবস্তুবাদীর দৃষ্টিতে সে-মতৈক্যও সমান মতিকর্দমেরই পরিচায়ক। অতএব, উদয়নের মন্তব্যটিকে আশ্রয় করে 'বেদের জয় হল, বৌদ্ধর পরাজয় হল'—এ-জাতীয় আত্মতুষ্টি ধর্মবিশ্বাসের পরিচায়ক হলেও প্রকৃত দার্শনিক বিচারের পরিচায়ক নয়।

দীর্ঘ কবিতা ও চিত্রকল্পের সংলগ্নতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির সাধনায় চিত্রকল্পের বিশ্লিষ্ট সাফল্য কখনো উদ্দিষ্ট নয়—সমালোচকও চিত্রকল্পের পৃথক ব্যাখ্যায় কুত্রাপি রস-সিদ্ধির গূঢ় রহস্যকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। চিত্রকল্পরাশি একটি বৃক্ষের ফুলের বা ফলের সঙ্গে তুলনীয়। বৃক্ষ-পরিচিতি অবশ্যই সেই ফুলের, বা ফলের ওপর নির্ভরশীল। তথাপি বৃক্ষ-লগ্ন ফল বা বৃন্ত-লগ্ন ফুলের মহিমা যেমন সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়েই অনুভব-বেদ্য, সার্থক চিত্রকল্পকেও পূর্ণভাবে লাভ করা যায় কাব্য বিষয়ের সমগ্রের প্রেক্ষাপটে রেখে। দীর্ঘ কবিতায় যেখানে কবি-কল্পনা তন্ময়তায় ব্যক্ত হবার জন্য প্রয়াসশীল, যেখানে গীতি-কবির সংক্ষিপ্ত গভীর অন্তর্মুখীনতা অপেক্ষা ব্যাপ্তিকে বিস্তারকে গভীর করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা, সেখানে কবিকে উপলব্ধির জন্য চিত্রকল্প-স্রোতকে অনুসরণ ব্যতীত নান্যঃ পন্থা। কল্পনাকে, কাব্যের উপকরণ-সঞ্জাত আবেগকে, শিল্পরূপ বাঁধতে গিয়ে অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির টানে কবি তাঁর নিজেরই বিস্তৃত জীবনপটের সম্মুখীন হন। চেতন-অবচেতনের দ্বৈতাদ্বৈত, কখনো গ্রহণে কখনো বর্জনে, দ্বন্দ্বে সমন্বয়ে তাঁর নির্দিষ্ট কবিকর্মে সিদ্ধি আসে। সে যন্ত্রণা কবিকে একা পোহাতে হয়—সেটা তাঁর ব্যক্তিগত। কিন্তু তার দান ছড়িয়ে থাকে বিস্তৃত কাব্যপটে। একটি দীর্ঘ কবিতায় বাইরে থেকে আমরা পাই, গল্প-কাহিনী-চরিত্র অথবা সময়কে। কিন্তু যে কারণে সেটা কবিতা—আবেগের সেই সূক্ষ্ম গভীর কল্পনাকে চিত্রকল্প ব্যতিরেকে কোথাও পাব না।

কিন্তু চিত্রকল্পের একক সার্থকতায় আবেগের সেই সমগ্রতাকে, গভীরতাকে কীভাবে সন্ধান করে থাকি? কখন্ চিত্রকল্পের একক সার্থকতা বিশ্লিষ্ট-কোনোকিছু না হয়ে, হয়ে ওঠে কবিতার মূল রসের, কবিভাবনার শিল্পসিদ্ধ রূপাধার? তাকে উপলব্ধির জন্য দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্পরাশির তালিকা প্রণয়ন অপেক্ষা চিত্রকল্পগুলির পরস্পর সংলগ্নতার মূলটিকেই সন্ধান করতে হয়। তাহলে সমুদ্রমুগ্ধ বালকের মুগ্ধতা যেমন কড়ি-ঝিনুক সংগ্রহেই নিঃশেষিত

হয় তেমন না হয়ে, আমাদের সম্বিৎসু-চেতনা আহরিত শঙ্খের গহ্বরে সমুদ্রের গভীরের দীর্ঘশ্বাসই শুনতে পাবে। এই সংলগ্নতাকে অনুধাবনই চিত্রকল্প আলোচনার উদ্দেশ্য। ক্রোচে এই বিষয়ে বলেছেন—What is called image is always a nexus of images, since image-atoms do not exist any more than thought-atoms। দীর্ঘ কবিতায় কবি-ভাবনার গতি, বিবর্তন ও পরিণতির চেহারাকে স্বরূপতঃ উপলব্ধির জন্যই চিত্রকল্প-গুচ্ছের বিন্যাস লক্ষণীয়, পরীক্ষণীয়। এ শুধু ইটের দৃঢ়তা এবং স্থাপনা-চাতুর্য দেখে টাওয়ারের মহিমাকে হারিয়ে ফেলা নয়। একটি কবিতার পূর্ণ রস-গ্রহণ তখনই সম্ভবপর যখন চিত্রকল্পগুচ্ছের ফলন্ত দ্রাক্ষাপুঞ্জ, কোন্ ভাবনার, আবেগের কুঞ্জবনের অসহ রসোচ্ছ্বসিত ফলে এ কথার সম্যক প্রতীতি জন্মাচ্ছে। কিন্তু সর্বদা স্মরণীয় যে আমরা সন্ধান করতে যাই দ্রাক্ষাপুঞ্জেরই, দ্রাক্ষাহীন দ্রাক্ষালতার কোনো মহিমার কথা আমরা শুনিনি।

দুই

কাব্যে দীর্ঘ তন্ময়তার কালে কবিরা চিত্রকল্প রচনার জন্য স্বাভাবিক প্রতীক natural symbol-গুলিকেই উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। পাহাড় অনড়তার প্রতীক, আর্চ বা খিলান শক্তির বা ভার বহনের স্বাভাবিক প্রতীক। এই স্বাভাবিক প্রতীক নিজে নিজেই কোনো চিত্রকল্প নয়। স্বাভাবিক প্রতীকের অনুষঙ্গে যে সমস্ত স্মৃতি জাগ্রত হয়ে থাকে, এই প্রতীকগুলি থেকে যে ব্যঞ্জনা কবি নিষ্কাষিত করেন, তারই সাহায্যে গঠিত হয় কবির চিত্রকল্প। স্বাভাবিক প্রতীকগুলি জাতিগত, বিশ্বগত। ঝড়ের প্রতীকী অর্থ সকল দেশেই এক। কবি সেই সব জাতিগত এবং বিশ্বগত প্রতীকের সাহায্যে নিজস্ব চিত্রকল্পের জগৎ সৃজন করেন। Kite ইংলণ্ডে বা ইউরোপে চিরদিন কাপুরুষতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও মৃত্যুর প্রতীক। চিল এবং ঘোড়া অথবা নৌকা আমাদের জাতীয় মানসে লোককাব্য, লোকসাহিত্য মারফত দৃঢ়মূল স্বাভাবিক প্রতীক। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে অথবা রবীন্দ্রনাথে এই স্বাভাবিক প্রতীকের ব্যবহার ঘটেছে কবিদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী, বক্তব্য অনুযায়ী, সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে। দীর্ঘ কবিতায় এই স্বাভাবিক প্রতীক-ব্যবহৃত চিত্রকল্পরাশির স্বাভাবিক সংলগ্নতার পাশে পাশে ছোট কবিতায় কবিদের লিরিক অন্তর্মুখীনতায় উচ্চারিত প্রথাবিমুক্ত চিত্রকল্পগুলির

অভিনবত্ব অনুধাবনযোগ্য। 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসান রুটি' অথবা 'বেতের ফলের মত ম্লান চোখ'—প্রভৃতি উক্তিতে চিত্রকল্পের অভিনবত্ব দীর্ঘ কবিতার পক্ষে বেমানান। ছোট কবিতার মিতায়তনে এরা কার্যকরী। কেননা সেখানে একটি সার্থকতম চিত্রকল্পই একটি প্রদীপ-ভাতির মতো কল্পনাকে আলোকিত করার পক্ষে যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে মাত্র-চিত্রলতা নয়, চিত্রলতার সংহতিই দীর্ঘ কবিতাকে সার্থক করে তোলে। আমাদের বর্তমান নিবন্ধে সেই সংহতির বিষয়টিই আলোচ্য। তার জন্যে আমাদের বক্তব্যের সহায়ক গুটিকতক কবিতা আমরা ব্যবহার করব। অবশ্যই কবি এবং কবিতার নিঃশেষিত তালিকা প্রণয়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

স্বাভাবিক প্রতীক কেমনভাবে চিত্রকল্পগুচ্ছের (Image-cluster) প্রধান উপাদানগুলিকে আকর্ষণ করে, কেমন করে স্বাভাবিক প্রতীকের আকর্ষণে চিত্রকল্পগুচ্ছের এক-একটি চিত্রকল্প সমগ্র কাব্য-কৃতির রচনায় অংশগ্রহণ করে, শেক্সপীয়রের Kites and Coverlets চিত্রকল্পগুচ্ছে তার প্রমাণ মেলে। শেক্সপীয়রের আরো অনেক এ-জাতীয় চিত্রকল্পগুচ্ছের ন্যায় এখানেও একটি স্বাভাবিক প্রতীকের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে কবির নিজস্ব অনুষঙ্গ-সৃজনী ক্ষমতার অব্যাহত শিল্পসিদ্ধ প্রকাশ ঘটেছে। Kite-এর প্রতীকী অর্থের আকারগত ভেদ ইউরোপ ভূখণ্ডে অবশ্যই উপস্থিত—কিন্তু প্রকারগত ভেদ কিছু নেই। সেক্সপীয়র Kite সংক্রান্ত চিত্রকল্প রচনাকালে প্রাচীন ইউরোপীয় ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন গ্রীক-ধারণায় এ পাখি ছিল দুর্লক্ষণের প্রতীক, চসর এই পাখি সম্বন্ধেই উল্লেখ করেছেন "the coward kyte" বলে। সুতরাং শেক্সপীয়র যখন প্রচলিত ধারণার অণুস্থিতিতে kite-কে ব্যবহার করলেন, তখন স্বভাবতই এই পাখি তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়াল Symbolic of cowardice, meanness, cruelty and death। অ্যাণ্টনি এবং লিঅরের মুখে এ হল একটা ঘৃণার্হতার প্রতীক (term of opprobrium)। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের শবরাশির ঊর্ধ্বে পরিদৃশ্যমান kite নিঃসন্দেহে প্রধানতঃ মৃত্যুর প্রতীক। কিন্তু সেক্সপীয়র এই প্রতীকের সাহায্যে যখন চিত্রকল্পগুচ্ছ সৃজন করেন তখন দেখা যায় sheets, bed বা শয্যা-সংক্রান্ত কোনো সংলগ্ন-চিত্র প্রায়শই ব্যবহৃত হয়েছে। সমালোচকেরা অনুমান করে থাকেন এবং বলেন যে এটা অনুমান মাত্র—হয়তো কোনো মৃত্যু-শয্যা-দৃশ্য মহাকবির মনে প্রবল প্রভাব কোনো সময়ে ফেলেছিল।

মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থেকে গিয়েছিল বলে, মৃত্যুকে শিল্পের ...ধারে ধারণ করার সময়ে kite এবং (মৃত্যু) শয্যা-সংক্রান্ত কোনো কিছুর উল্লেখ প্রায়শঃ অপরিহার্য হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে এই তথ্য জেনে আমাদের লাভ কী? অবশ্যই এর যদি তথ্যাতিরিক্ত কোনো মূল্য না থাকে তবে তা কাব্য-বিচারে শেষ তাৎপর্যে বঞ্চিত। কিন্তু আমরা জানি যে শেক্সপীয়রের চরিত্র-প্যাটার্ন, পরিবেশ-প্রয়োগ থেকে শুরু করে তাঁর কাব্যময়তা পর্যন্ত—সকল কিছুই সর্বাবস্থায় এক সমগ্রের বোধ সঞ্চারের দিকে অগ্রসর। Kite এবং coverlet বা অনুরূপ সকল সংলগ্ন চিত্রকল্পগুচ্ছকেই সেই অর্থেই ব্যবহার করা প্রয়োজন। শেক্সপীয়রের মানস-বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণোপলব্ধির পথে তা সহায়ক। এমন কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, সমালোচকেরা বলছেন, যে-কোনো মৃত্যু-দৃশ্যের প্রসঙ্গ ব্যতিরিক্ত হয়েও যখন sheet বা অনুরূপ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, তখনও শেক্সপীয়রের চিত্রকল্প সৃজনী ক্ষমতা নিজ ন্যায়কেই অনুসরণ করেছে। এই ব্যাপার না বুঝলে কবির শিল্পকর্মের মূল উপাদানস্বরূপ যে সব রূপাধার, তাদের সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। শেক্সপীয়রের মানস-সমগ্রতার সন্ধানে তাঁর শিল্পের সমগ্রতাকে ব্যবহার করা হবে—চিত্রকল্পগুলি কবির মহাভাবনার অন্ত-উপাদান বলেই বিচার্য।

রবীন্দ্রনাথের সাধারণত পণ্ডিতী-আলোচনায় উপেক্ষিত কিন্তু জন-সাধারণের কাছে সমাদৃত একটি দীর্ঘ কবিতার সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে অন্য আলোকে কিন্তু একই তাৎপর্যে উপলব্ধি করতে পারি। কবিতাটি 'দেবতার গ্রাস'। 'দেবতার গ্রাস' অবশ্যই তার করুণ রসাতিশয্যের জন্য জনপ্রিয়। রাখালের মৃত্যু করুণ-রসের সেই উৎস। 'বন্দীবীর' এবং 'দেবতার গ্রাস'-এ দুই কিশোরের মৃত্যু উপলক্ষ করে করুণ-রসের উৎস উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু 'দেবতার গ্রাস'-এ কবির কল্পনার ন্যায়ক্রম অধিকতর সুগঠিত। কবিতাটির প্রধান চিত্রকল্পগুলি এই :

ক। মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রুর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।

খ। ...চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে।

গ। অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহ ভরে।

চিত্রকল্প হিসাবে এরা, পৃথকভাবে দেখলেও, সুপ্রযুক্ত, সে কথা স্বতঃস্বীকার্য। কিন্তু শুধু সেই সার্থকতার কারণেই এ কথা বলা হয় না যে এরা রসোৎকর্ষের সহায়ক। এরা যে কারণে কাব্যের রস-জগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে তাকে অনুসন্ধান করতে হলে এদের সংলগ্নতার প্রসঙ্গটিই অনুধাবনযোগ্য। প্রথম দৃষ্টিতে যেটা চোখে পড়ে সেটা হল সমস্ত চিত্রকল্পগুলিতেই আসন্ন বিপদের, দুর্বিপাকের পূর্বাভাস প্রতিবিম্বিত। কিন্তু এ হল একান্ত বাইরের পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কবিতাটির ভাবের যা সারাৎসার তার সঙ্গে চিত্রকল্পগুচ্ছের নিবিড় সম্পর্কের জন্যই কবিতাটি রস-সিদ্ধির পথে এগিয়েছে। রাখালের মৃত্যু হল—এ তো শুধু গল্পটির বাইরের পরিচয়। পুণ্যার্জনের পর গৃহসুখপিপাসু প্রাণভয়কাতর যাত্রীজনতার হাতে মাতৃস্নেহের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা হল—এইটাই প্রকৃতপক্ষে গল্প। যা সুন্দর, স্নিগ্ধ, উচ্চ এবং পবিত্র তা কুটিল মত্ততার হাতে লাঞ্ছিত অবমানিত হতে চলেছে, অথবা হচ্ছে, এমন ধরনের চিত্রকল্পগুচ্ছ তাই কবিতার মূল ভাবের ধারক। উদ্ধত বিদ্রোহে প্রশান্ত সূর্যাস্তের বিরুদ্ধে হিংস্রতায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে, অথবা আকাশকে জলফেনিল আক্রোশে গাল পাড়ছে কিংবা ছল-ভরা খল জলের সর্প লালায়িত মুখে মৃত্তিকার শিশুদের কামনা করছে—সবই এই তাৎপর্যে ব্যবহৃত চিত্রকল্প। কবিতাটি যদি রাখালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হত তাহলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োবোধ পীড়িত হত। তাই মৈত্রমহাশয়ের মৃত্যু রাখালের মৃত্যুকে অনুসরণ করেছে। মৈত্রমহাশয়ের মৃত্যু অনুষ্ঠিত পাপের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-সম্মত প্রতিবাদ। কিন্তু এই কবিতায় পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বের কোনো চেতনা কবির মনে প্রথমাবধি সক্রিয় ছিল না। দুটি চিত্রকল্পের স্বল্প পরিচর্যায় এ কথা স্পষ্ট হয়।

ক। সিন্ধুর বিজয় রথ পশিল নদীতে
আসিল জোয়ার।
খ। সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে
উত্তাল উদ্দাম।

বিজয় রথ প্রবেশ ও স্রোত-সমীরের দ্বন্দ্ব—কবির মনে মৈত্রমহাশয়ের মৃত্যুর কল্পনা প্রথম থেকে দৃঢ়বদ্ধ থাকলে, আরো বিকশিত এবং বিস্তৃত হত। এরা সংক্ষিপ্তোক্তি হয়েছে বলে, মৈত্রমহাশয়ের নদীতে আত্মবিসর্জনের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নেই। কবিতাটির সমাপ্তির দুর্বলতার মূল এইখানে।

দীর্ঘ কবিতায় চিত্রকল্পের এই মূল ভাববাহিতার শক্তিই প্রধান কথা। তাদের বিশিষ্ট উৎকর্ষ সে ক্ষেত্রে গৌণ-বিচার। বহুখ্যাত 'দুই বিঘা জমি'র মূল-রস সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রকল্পের পরিণত ফসল ফলিয়েছে "ধিক ধিক ওরে শত ধিক তোরে নিলাজ কুলটা ভূমি"—এই স্তবকটিতে। ভূমিহারা উপেন নিজের দুই বিঘা জমির সৌখীন উদ্যানে রূপান্তরিত চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে, দীর্ঘপ্রবাসের পরে, যে আক্ষেপোক্তি করছে—স্তবকটিতে সেই আক্ষেপ একটি চিত্রকল্পে ধৃত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ এই চিত্রকল্প। লোলুপ ভূস্বামীর প্রলোভনে লুণ্ঠিত তরুণী-কৃষক-বধূ কতবার বঙ্গদেশে জমিদারের বাগানবাড়ির সামগ্রী হয়েছে, কতবার কেঁদে অভিশাপ দিয়ে ফিরে গেছে তার শিশুপুত্র—স্তবকটির বিস্তৃত চিত্রকল্পে সেই কাহিনীর স্মৃতি :

সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র মাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা!
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস বেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ।

এই চিত্রকল্পটি কবির কল্পনাকে ন্যায়তই এমন নাড়া দিয়েছে, সক্রিয় করেছে যে এরই টানে এর পরবর্তী স্তবকের শেষ প্রান্তে পর-হয়ে-যাওয়া মায়ের দীর্ঘশ্বাসযুক্ত গোপন সামান্য দানের স্মৃতিতে আমগাছ থেকে দুটি আম খসে পড়ার চিত্রকল্প সৃজিত হয়েছে :

ভাবিলাম মনে, বুঝি এতক্ষণে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা॥

এইভাবে বলা যায়, যে শুধু ভাবের সঙ্গে আপাত-সংলগ্নতা নয়, চিত্রকল্পের সাহায্যে ভাবানুভূতির গভীরতম উৎসকে আলোকিত করে তোলাই দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্পের ধর্ম। স্বভাবতই শেক্সপীয়র তাঁর জটিল গভীরতাকে ব্যক্ত করার জন্য স্বাভাবিক প্রতীকের আকর্ষণে যে চিত্রকল্পগুচ্ছ রচনা করতেন, তাঁর পূর্ববর্তী দান্তে-র হাতে স্বাভাবিক প্রতীকের ব্যবহার সেভাবে ঘটে নি—আবার রবীন্দ্রনাথের শান্ত গভীরতার পক্ষে চিত্রকল্পের অন্য জাতীয় ব্যবহার ঘটেছে। রবীন্দ্র-নাটকে জটিলতা কম বলেই 'বিসর্জন'-'মালিনী' প্রভৃতির চিত্রকল্প আলোচনা শেক্সপীয়রীয় চিত্রকল্পের আদর্শে সম্ভব নয়। এখানে চিত্রকল্পগুলি সোপান-পরম্পরার বিন্যাসে সাজানো। আমরা সেই সিঁড়ি ধরে ক্রমে ক্রমে নেমে যেতে পারি ভাবের গভীর সরোবরে, কিংবা উঠে যেতে পারি অচ্ছদ-নীলিমায়। 'কর্ণ-কুন্তি-সংবাদ' থেকে ব্যাপারটি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করা যাক।

যে প্রধান চিত্রকল্পগুচ্ছ কর্ণ-কুন্তি-সংবাদের কাব্যকে সূত্রে-বিধৃত রেখেছে তাদের মধ্যে নাট্যকাব্যের মূল বিষয়টিই প্রতিবিম্বিত। চিত্রকল্পগুলি এই :

ক। দেবি, তব নতনেত্র-কিরণ সম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মতো।

খ। যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।

গ। জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি।

ঘ। মাতঃ নিরুত্তর,
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু।

ঙ। আজি এই রজনীর তিমির ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধ ফল।

জমাট অন্ধকার ভেদ করা, অন্ধকারকে বিগলিত করা, অন্ধকারকে পাঠ করা—সমস্ত উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলির নিহিতার্থ। বরফ গলে যাচ্ছে অথবা গুণ্ঠন উন্মোচনের জন্য বাসনা জাগছে—এই চিত্রকল্প দুটিও অন্ধকার-ভেদ-সংক্রান্ত মূল কল্পনারই চিত্রকল্পগত পরোক্ষ প্রতিফলন। অন্ধকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের কর্ণকল্পনার মূল কথা। দিবসান্তের আলো-অন্ধকারের পটভূমিকায় কর্ণের জীবনে সত্যের আলোক ও অতীতের অন্ধকারের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হল। সেই আলোকে সে শেষপর্যন্ত নিজের জীবনের মূলবদ্ধ অন্ধকারকেই পাঠ করল—আর কিছু নয়। প্রথমাবধি চিত্রকল্পগুলিতে, অন্ধকারকে ভেদ করার জন্য কর্ণের যে আকুলতা, কুন্তির যে প্রয়াস তাই ধৃত হয়েছে। তাই দেখা যায় "অন্ধকার-চেতনা" কবিতাটিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মূল বিষয়। কিন্তু এই "অন্ধকার-চেতনা" নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করতে অক্ষম। তাই "অমনি মিলায় মূর্তি"...কিংবা "মুদিয়া দিতেছে চক্ষু..." কিংবা "যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার..." এই সকল চিত্রকল্প পরম্পরা পেরিয়ে শেষ পরিণতিতে অন্ধকারের স্বরূপ উন্মোচিত হল। নক্ষত্রের আলো অন্ধকারকে বিদূরিত করে না—মাত্র অন্ধকারকেই হৃদয়ঙ্গম করায়। "তিমির ফলকে প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ..." সেই অন্ধকারকেই ব্যক্ত করছে, যা শুধু কর্ণের জন্মবৃত্তান্তের রহস্যঘন অন্ধকার নয়, যা কর্ণের সম্মুখীন অন্ধকারও বটে। কর্ণ অন্ধকারকে ফেলে রেখে চলে গেল না, বরঞ্চ অন্ধকারের উপলব্ধিকে দৃঢ় করে—অন্ধকারই একমাত্র শুচি বলে মেনে নিল। উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলির শৃংখলায় সেই দ্বন্দ্বময় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। যেন জঠরের অন্ধকার ভেদ করে এই ক্লেশকর জন্ম—'কর্ণ-কুন্তি-সংবাদ'-এর প্রধান বিষয় এটাই।

তিন

দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্পের সংলগ্নতার দ্বৈত ভূমিকা এই। একদিকে তারা সুসার্থক চিত্রকল্প, কাব্য-বিষয়ের ছোট ছোট রূপাধার। আর একদিকে তারা ভাবগত গতির ও পরিণতির নিয়ামক অন্তর ব্যাখ্যাতা। এই দ্বৈতকে না বুঝলে কাব্যোপলব্ধি সম্পূর্ণ নয়। আধুনিক বাংলা কাব্যের দুটি বড় কবিতার সাহায্যে আমরা এখন এই দ্বৈতের সমস্যাকে বোঝার চেষ্টা

করব। জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন', ও বিষ্ণু দে-র 'জল দাও' আমাদের আলোচ্য কবিতা দুটির নাম।

চিত্রলতা জীবনানন্দের অনন্য সম্পদ। এক কথায়, ছবি দিয়ে কথা বলতে জীবনানন্দ ভালোবাসেন। কিন্তু সচেতন পাঠক মাত্রেই জানেন যে আমাদের আলোচ্য, জীবনানন্দের এই বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতাটিতে চিত্রলতার যে অভিনবত্বের জন্য জীবনানন্দের সাধারণ খ্যাতি, তা পরিত্যক্ত। চিত্রলতা এখানে কবির কল্পনাকে অকৃপণ হবার অবকাশ না দিয়ে, চিত্রল-সংহতির দিকে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কবি-কল্পনার, এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয়-দুর্বলতার জন্য সে যাত্রা মধ্যপথে খণ্ডিত হয়েছে। কেমনভাবে হয়েছে, এবং কবির ব্যবহৃত চিত্রকল্পে তার প্রতিক্রিয়া কেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেটাই আমাদের অনুধাবনীয়। সকলেই এই কাব্য-বিষয়ের আপাত-পরিচয়টুকু জানি যে এটি কোনো আত্মহত্যার বিষয়ে লেখা কবিতা। সেই আত্মহত্যাকে রুগ্নতার সঙ্গে একাসনে স্থান দেওয়া যাবে না। কেননা, কবি জানিয়েছেন যে এই মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়। যে-সমস্ত প্রাকৃত-কারণে মানুষের মৃত্যুবাসনা লৌকিক ব্যাপার হতে পারে, সে-সব কারণ এখানে উপস্থিত ছিল না। তাহলে এই মৃত্যু-বাসনার মূল কোথায় অনুসন্ধেয়? "বিপন্ন বিস্ময়"—বলে কবি ইঙ্গিতে বলেছেন, প্রতীকে-উপমায় তাকেই কবি ব্যাখ্যা করেছেন কাব্যের নিয়মে। মৃত্যু-বাসনার মূল সেখানেই সন্ধেয়। এই কবিতায় একটি চিত্রকল্পের তিনবার ব্যবহার ঘটেছে। চাঁদের অপঘাত মৃত্যু সেই চিত্রকল্পটির মূল কথা। এবং এই চিত্রকল্পের ব্যাখ্যায় সমগ্র কবিতাটির ব্যাখ্যা সম্ভব। চাঁদ অবশ্যই স্বাভাবিক প্রতীক। স্মরণীয় যে শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথ, এবং প্রধান আধুনিক কবিরা সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার জগৎ নিংড়ে রস-মৃত্তিকা সংগ্রহ করে নিজ নিজ প্রতীক রচনা করে নিয়েছেন। কেমনভাবে এ ব্যাপারটা ঘটে সেটা আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। পরবর্তী কোনো আলোচনায় সে-কথা বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করা যাবে। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয়, চাঁদকে স্বাভাবিক প্রতীক হিসাবে জীবনানন্দ ব্যবহার করলেও—কবি নূতন অনুষঙ্গ সংযুক্ত করেছেন "বুড়ি" এই বিশেষণটির প্রয়োগে। সদাই জীবনানন্দ তাঁর সমকালবর্তী সভ্যতার সঙ্গে একটা দুরতিক্রম্য ব্যবধান অনুভব করতেন। এই ব্যবধানজনিত শূন্যতাকে সাজানোর জন্য তাঁর নিজের প্রাতিভাসিক

জগৎ সৃষ্টির তাগিদে বিদিশা-ব্যাবিলন-জলসিড়ি-ধাই হরিণী প্রসঙ্গের কাব্যময় প্রয়োগ। "বুড়ি চাঁদ"—কথাটিতে 'সভ্যতা-পীড়িত' মানুষের প্রায় অবসিত সৌন্দর্যবোধের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার!—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!
জানায় নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

থুরথুরে অন্ধ পেঁচা দরিদ্র-অস্তিত্বের জীর্ণতার প্রতীক, কিন্তু দুর্মরতারও বটে। বুড়ি চাঁদ প্রায়-অবসিত সৌন্দর্যচেতনার প্রতীক। যে আত্মহত্যা করেছে সে জেনে গেছে—সৌন্দর্যের বিস্ময়ের মৃত্যু ঘটেছে। যেটুকু বেঁচে থাকে সেটুকু পেঁচার অন্ধ অস্তিত্ব-রক্ষার তাগিদ। এই কঠিন সত্যকে প্রতিমুহূর্তে "জানিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম—অবিরাম ভার" আর সহ্য করতে হবে না বলেই লাস-কাটা ঘরের দিকে যাত্রা।

কিন্তু আমরা বলেছি যে কবিতাটিতে কথঞ্চিৎ কেন্দ্রীয়-দুর্বলতা বিদ্যমান। পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেলে পরে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা এসে যাকে না জাগার তাৎপর্য বুঝিয়ে গেল—সে জীবনের অখণ্ড স্বরূপকে জানত না তা নয়।

গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারীর ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের
স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালী রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

উষ্ণ অনুরাগ, জীবনের স্রোত, রৌদ্র, সোনালী রোদ প্রভৃতি জীবনের ক্লান্ত, মৃত-বিস্ময়, জীর্ণ অস্তিত্বের বিপরীত প্রতীক। এগুলির সমবায়ে একথাই পাঠকের কল্পনায় আকার গ্রহণ করেছে যে—জীবন সর্বাবস্থায় সংকীর্ণ অস্তিত্বকে মাড়িয়ে অখণ্ড জীবনের দিকে যেতে চায়। কিন্তু আত্মহত্যাকারী জেনে গেছে যে মানুষের জীবনে জীবজগতের অখণ্ডতার আভাস মাত্র নেই।

যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের, মানুষের সাথে তার হয় নাক দেখা। একথা জানার পর সব কিছুই তার কাছে তাৎপর্য হারিয়ে ফেলল। জোনাকির স্নিগ্ধতার স্বাদ এবং পেঁচার ইঁদুর ধরার স্বাদ দুইকে যখন মেলানো মানুষটির পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় দুর্মর জীর্ণ অস্তিত্বকে আর সুন্দরকে মেলানো—তখন উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা, অর্থাৎ একটা অদ্ভুত বিশূন্যতা তাকে মরতে ডাকবে, এ স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তের পর কবিতা আর এগুতে পারে না। "শোনো, তবু এ মৃতের গল্প···" বলে যে স্তবক শুরু হল তা প্রকৃতপক্ষে কবির সংশয় থেকে উদ্ভূত। কাব্যে যাকে সঞ্চারিত করেছেন—প্রত্যয়ে তাকে তথ্যবদ্ধ করার জন্য কবির ব্যাখ্যা শুরু হল। ফলে নির্বেদগ্রস্ত আত্ম-হত্যাকারীকে তিনি কখনো মৃদু-করুণা করে, কখনো মৃদু ব্যঙ্গ করে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট করে ফেললেন। পক্ষান্তরে আমাদের তখন উটের গ্রীবার চিত্রকল্পে এই প্রত্যাশা জাগ্রত যে উক্ত বিশূন্যতা বোধকেই নানা রূপাধারে স্পষ্ট করা হবে। কিন্তু এ আমাদেরই ভুল, হয়তো জীবনানন্দও জানতেন যে এই বিশূন্যতাবোধ নিজে নিজেই কোনো মহৎ ব্যাপার নয়। কাজেই স্তব্ধ হয়ে গেল চিত্রকল্পের স্রোত, যা রইল তা শুধু পুরনো কথার আবর্ত, ফিরে ফিরে পুরনো চিত্রকল্পেই আশ্রয়গ্রহণ।

চার

দীর্ঘ কবিতায় বিস্তৃতিকে সংহত করবার তাগিদে চিত্রকল্পের সার্থক ভূমিকা প্রতিপালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ থেকেই এ শিক্ষা আধুনিক বাঙালী কবি সংগ্রহ করতে পারেন। একটা দীর্ঘ কবিতায় ভাব যে স্থিতিশীল নয়, তার যে একটা গতি ও বিবর্তন আছে, ক্রমশ বিবর্তিত হতে হতে চিত্রকল্পগুলিই সেকথা প্রমাণ করে। বিষ্ণু দে-র 'জল দাও' কবিতায় কবির সমস্যাই ছিল বিস্তৃত জীবনপটকে প্রকাশে সংহত করে তোলা। ছোট-বড় সর্বপ্রকার কবিতাতেই বিষ্ণু দে-কে এই সমস্যার সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। 'জল দাও' কবিতায় এই সমস্যা ছিল একই সঙ্গে জটিল ও তীক্ষ্ণ। 'সময়' জল দাও কবিতার বিষয়। সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির বোঝাপড়া, সময়ের বাঁকাচোরা গলিপথে অথবা ঋজু-রাজপথে ব্যক্তির যাত্রা ও পরিশেষে সিদ্ধি নয়—সিদ্ধান্তই কবিতাটির বাস্তব বহিরঙ্গ। সময় যখন অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত, তখনও ইতিহাসের পরিণতির অমল মহিমাকে বিশ্বাস করে যে-যাত্রা, তারই প্রতি মুহূর্ত ছড়িয়ে

আছে এই কবিতায়। ভয় তখন সব থেকে বেশি বিচ্ছিন্নতাকে, নৈঃসঙ্গ্যকে। চিত্রকল্পের মূল ধারা তারই সঙ্গে সুলগ্ন।

ক। যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ…

খ। হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার…

গ। নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণচাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?

ঘ। কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিম্বা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাত বাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান।

ঙ। অথচ নিঃস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে কারণ সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ।

অথচ এই নির্জন বিষাদকে ঘিরে রয়েছে প্রকৃতির অমেয় প্রসাদ। বিষাদকে ভেঙে সেই প্রসাদে মিলিয়ে দেওয়ার কোনো গাণিতিক সূত্র কবি জানেন না। বরঞ্চ প্রসাদের সুবিস্তীর্ণ পটে বিষাদকে স্থাপনা করার মধ্যে জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতার আভাস মেলে। জীবনেও প্রকৃতিতেও। তাই "গরমে বিবর্ণ হয় গোলমোরের সাবেক জৌলুস" সেই যাত্রিকের চোখে আনে জ্বালা, কিন্তু তার বিস্ময় বিপন্ন নয়, সে তার আগেই জানে :

তার পরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিম্বা বইয়ের আশ্রয়ে
কিম্বা খবর শুনি দাঙ্গার কোথাও ক্লান্ত
সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি

ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড় করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মত নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সম্বিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশ স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।

কিন্তু তার বিস্ময় বিপন্ন নয় বলেই তার যন্ত্রণা আরো তীব্র। চিত্রকল্পে চিত্রকল্পে অস্তিত্বের যন্ত্রণার রূপাধার গড়ে উঠেছে। পদ্ম পরম-প্রশান্তির ভারতীয় প্রতীক। কিন্তু বিষ্ণু দে এই স্বাভাবিক প্রতীকের সঙ্গে "বিনীত" শব্দের সংযোগে ছবিটিকে অন্তত্ব গভীর অর্থে মূল্যবান করেছেন। চারিদিকের অনাচার অত্যাচার পাপের মাঝে পদ্মের শুচিতা যেমন স্মরণীয়, তেমনি বিনয়ও। বিনয়ই তার শুচিতাকে পাপার্ত সমগ্রের দিকে তাকিয়ে মূল্যবান করে তুলেছে। যন্ত্রণার মোচড়ে মোচড়ে যাত্রিকের অভিজ্ঞতায় রূপছায়াগুলি এই আকার নিয়েছে :

ক। তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতা ঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার-মরার মরীয়া যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে।

খ। তবু সন্ধ্যা চৈত্র সন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাদে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ...

গ। তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গ আতত
বালাসরস্বতী কিম্বা রুক্মিনী দেবীর মত—

দেখা যাবে চিত্রকল্পগুলি কোথাও আকস্মিক সাহসিকতায় উদ্বেল নয়। অথচ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত আততি এদের প্রত্যেকটিতে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে এই আততি নিজে কোনো পৃথক দৃষ্টির পক্ষপাত দাবি করে না। 'গ'-চিহ্নিত চিত্রকল্পে রূপাধারটিকে তুলে ধরার পরিশ্রম-দীর্ঘ প্রয়াস যদিও বিচ্ছিন্নভাবে ক্লান্তিকর বলে মনে হয়, সে ক্লান্তিকে সময়ের পটে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। ক্লান্তি এবং প্রতীক্ষার কবি-কল্পনা, নিঃস্রোত এবং ঢেউ-এর চিত্রকল্প যখন শেষ স্তবকের সিদ্ধান্তে আসে, "তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই…" তখন রূপকল্প রূপক হয়ে উঠেছে। শেষ স্তবকে যাত্রিকের এই হৃদয়াভিরাম আত্মনিবেদনের কঠিন প্রস্তুতিই যেন ছড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ কবিতাটির পর্বে-পর্বে, পরতে পরতে। পৃথকভাবে চিত্রকল্পগুলির কথা তখন আমাদের মনে থাকে না। থাকে শুধু কবিতাটির শুদ্ধ দান। দীর্ঘ কবিতায় চিত্রকল্পেরা এ জাতীয় রসশুদ্ধি নির্মাণের ভূমিকা পালন করে নিজেরা নেপথ্যে যেতে পারলে কবি সার্থক হন। এখানে The Imagination modifies images and gives unity to variety।

ইন্‌কা যুগের রৌপ্যমূর্তি

ব্রেজিল ও পেরু

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

কিউবাতে যখন অত্যধিক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটছে তখন সেখানে না গিয়ে ব্রেজিল ও পেরুতে মাসাধিক সময় অতিবাহিত করলাম কেন তার একমাত্র জবাবদিহি হচ্ছে যে পর্যটনের পাথেয় ছিল পরিমিত ও কতকটা বিশেষ বিশেষ খনি-অঞ্চল দেখবার জন্যে নির্ধারিত। সেজন্য কোনো আক্ষেপ বোধ করি নি দুই কারণে। প্রথমতঃ কাস্ট্রোর চমকপ্রদ সংগঠন নৈপুণ্য ও দুঃসাহসিকতার সংবাদ পেয়ে আসছিলাম আমার চেয়ে ওয়াকিফহাল ও চক্ষুষ্মান সাংবাদিকদের মারফত। দ্বিতীয়তঃ শুনেছিলাম যে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার সমস্যা প্রণিধান করতে হলে বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে প্রবেশ না করে ব্রেজিল মেক্সিকোর মতো জনবহুল আপাত-শান্ত দেশে যাওয়া বিধেয়। আরও শুনেছিলাম যে লাটিন আমেরিকার সমস্যা সর্বত্র প্রায় একই, অর্থাৎ

প্রত্যেকটি ছোট, মাঝারি ও বড় দেশ বিদেশী ঋণদাতা ও মূলধন বিনিয়োগকারীর গুরুভারে অবসন্ন। অনেক স্থানে হীনবল জনসাধারণের জীবন ওষ্ঠাগত এবং কতকগুলি দেশে জাগ্রত ও সঙ্ঘবদ্ধ জনমতের চাপে উৎকোচপুষ্ট শাসকগোষ্ঠী তটস্থ।

শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোর ভিসা পাওয়া যায় নি। সুতরাং নিউইয়র্ক থেকে ত্রিনিদাদ হয়ে সোজা রিও-দে-জানেইরোতে চলে যাই। সে-সময়ে সবেমাত্র সাও পাওলোর জনপ্রিয় গভর্নর জানিও কোয়াড্রোস ব্রেজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পুঁজিবাদীদের অমরাবতী সাও পাওলোর প্রধান পুরোধার ব্যাপকতর ক্ষমতা গ্রহণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশা ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। আশা—সাড়ে ছয় কোটি মানুষ, অর্থাৎ মেক্সিকো বাদে সারা দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের আখেরের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে ডলারের মর্জিতে, কারণ কোয়াড্রোসের মতো কর্মঠ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক অসম্পূর্ণ রাজধানী ব্রাসিলিয়া ইত্যাদি বড় বড় ব্যয়সাপেক্ষ পরিকল্পনাকে অবহেলা করতে পারে না। আশঙ্কা—শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয় যখন তিনি ডলার-মুখাপেক্ষী না হয়ে সোভিয়েট রাশিয়া ও মহাচীন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করে বসেন এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে ভয়ডর না করে কাস্ট্রো অনুষ্ঠিত বিপ্লবের প্রশংসা করেন।

সারা জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল অপ্রত্যাশিত ও আগ্রহোদ্দীপক ঘটনা কিউবার বিদ্রোহের চেয়ে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কাস্ট্রোর আশাপ্রদ প্রস্তুতি শেষরক্ষা করতে পারুক বা না পারুক তাতে লাটিন-আমেরিকার অগণন দুঃস্থ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, মাথা গোঁজবার জায়গা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা নির্ভর করছে না। প্রত্যেক দেশে পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে কেমন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপরিউক্ত প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণ হবে, এবং যে-সকল কায়েমী প্রতিক্রিয়া শক্তি সে সমস্যা সমাধানে বাধার সৃষ্টি করছে তার নিষ্কাশন হবে কোন উপায়ে?

ব্রেজিল ও পেরুর আভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করলে দুটি চরম বিপরীত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে

কলম্বাসের বিস্ময়জনক আবিষ্কারের পর প্রথম অভিযান প্রস্তুতির সময় থেকে শুরু করতে হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কথা। পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে স্বার্থ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠায় পোপকে মধ্যস্থরূপে উভয়ের ভাগ্যান্বেষণের ক্ষেত্র নির্ধারিত করে দিতে হয়। তিনি একটি মানচিত্রের ওপর সরাসরি উত্তর-দক্ষিণ রেখা টেনে আফ্রিকার দিকটি নির্দিষ্ট করেন পর্তুগীজ অভিযানকারীদের জন্যে। বাকি অংশ প্রদান করা হয় স্প্যানিশ ভাগ্যান্বেষীদের। পরে অ্যাণ্ডিস পর্বতমালা ও অ্যামাজন নদীর উপত্যকা সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা হলে সে ঋজু সীমান্তরেখা আপোস মীমাংসায় বর্তমান আকার ধারণ করে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুঃসাহসিক স্প্যানিশ অভিযানকারীদের ভাগ্যে জুটে গেল আজটেক, ইন্‌কা প্রভৃতি জাতিসমূহের অপরিমেয় রত্নভাণ্ডার। তারা নির্মম নৃশংসতার সঙ্গে ঐতিহাসিক সৌধ মন্দির ও সমাধি ক্ষেত্রগুলি উৎখাত করে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ডে মেতে যায়। ধনলোলুপ স্প্যানিশ সম্রাট তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরদের শোষণকার্যে নিয়োগ করেন। অধিকৃত দেশগুলিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে পূর্বতন স্বাধীন জাতিগুলিকে কঠোরভাবে শাসন করবার পদ্ধতিটি নিখুঁত করে তোলা হল। সমগ্র খাদ্য উৎপাদনের জমির মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর হয়ে চলে গেল কতিপয় ধনাঢ্য প্রীতিভাজনদের কবলে। ইন্‌কা রাজপুরুষেরা ক্রীতদাসে পরিণত হল।

ক্যাথলিক গির্জা সঙ্ঘের পুরোহিতবৃন্দ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে যে শাসনপদ্ধতি কায়েম হল তাতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব নয়। সম্রাটের অনুশাসনে উপনিবেশগুলি পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ক্রয় বিক্রয় করতে হত সুদূর স্পেনের মাধ্যমে এবং মুনাফা যেত সম্রাটের ভাণ্ডারে। শিক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা তখন থেকে আজ পর্যন্ত কল্পনাতীত হয়ে রয়েছে সেই সকল অঞ্চলে যেখানে আদিবাসী ও মিশ্রিত জাতির মানুষ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পেরুভিয়ানদের শোচনীয় অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করাতে শুনেছিলাম যে ইকোয়েডর, পারাগুয়ে ইত্যাদি দেশগুলির অবস্থা আরও দুর্দশাপূর্ণ এবং বলিভিয়া হচ্ছে কয়েকটি ধনাঢ্য পরিবার ও অধমতম ক্রীতদাসের দেশ। যাই হোক, বলছিলাম স্পেনের শাসনের কথা। সম্রাটের প্রতিনিধি ভাইসরয়যুগলের প্রতি নির্দেশ ছিল যে কোনও প্রকার স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষ হলে তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে

হবে এবং এ ব্যাপারে প্রবল শক্তিমন্ত ক্যাথলিক গির্জাসঙ্ঘ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাহারাদারী করেছে। তারপর উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যখন ইওরোপে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর জন্য এই সকল উপনিবেশ থেকে স্পেনের শাসনপাশ স্খলিত হল তখন পূর্বতন ধনাঢ্য জমিদারদের অধিকাংশ সম্পত্তি গ্রাস করে বসল সেই গির্জাসঙ্ঘ। তাতে অবশ্য অবৈতনিক চাষীদের শ্লথগামী জীবন্মৃত প্রবাহে কোনো পরিবর্তন ঘটল না, কিন্তু ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী শ্রেণীসংঘর্ষের পথ দীর্ঘায়িত হয়ে রইল।

ব্রেজিলে উপনিবেশ পত্তন হয় ভিন্নভাবে। সেখানে লুঠতরাজ করবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজধানী বা ঐশ্বর্যপূর্ণ লোকালয় ছিল না। তথাকথিত ইণ্ডিয়ান জাতিসমূহের কিছু কিছু গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল গভীর অরণ্যানীর মধ্যে ও উপান্ত প্রদেশে। শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীরা এসে সমুদ্রের কাছাকাছি চাষ-বাসের উপযুক্ত উচ্চভূমিগুলি অধিকার করে প্রধানতঃ পশুপালন ও কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করেছিল। এখনও দেখা যায় যে সাড়ে ছয় কোটি জনসংখ্যার বেশির ভাগ জমায়েত হয়ে রয়েছে অ্যাটলান্টিক উপকূল থেকে মাত্র একশত মাইল পরিধির মধ্যে। আকাশ পথে যাতায়াতের সময় শহর ও গণ্ডগ্রামগুলিকে দেখলে মনে হয় যে পিছনের দুর্গম, দুর্ভেদ্য সীমাহীন অরণ্যের বিরুদ্ধে অসমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে লোকালয়গুলি অ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্রের নৌবহরের ভরসায় পূর্বমুখী হয়ে রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীরা এই সব জনবিরল এলাকায় খাদ্য ও রপ্তানির উপযোগী দ্রব্যের উৎপাদন করিয়েছে স্থানীয় আদিবাসী ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমদানি নিগ্রো ক্রীতদাসদের সাহায্যে। ক্রমে রবার ও কফির লাভজনক ফসলের দৌলতে চাষীদের অবস্থা উন্নত হয়েছে। বিবিধ জাতির মানুষ একত্রে থেকে নিজেদের প্রকৃতিগত গুণের সমন্বয়ে এমন এক স্থৈর্য ও ধৈর্যপূর্ণ কৃষিপ্রধান সংস্কৃতি গঠন করেছিল যার প্রভাব পরবর্তীকালের জার্মান, ইটালীয়ান্, রাশিয়ান, লেট্ ইত্যাদি ঔপনিবেশিকদের আগমনে ও সাও পাওলোর যন্ত্রশিল্পের প্রসারেও বৈশিষ্ট্য হারায় নি। পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে দুর্ধর্ষ মরিয়া প্রকৃতির ভাগ্যান্বেষীর অভাব ছিল না। তাদের অস্থির মতি ছিল মিনাস গেরাইস প্রদেশে মূল্যবান ধাতুর আকরের সন্ধানে নিবদ্ধ। অনেকে ব্রেজিলে সময় অপব্যয় না করে পেরু থেকে লুণ্ঠিত রত্নভাণ্ডার বাটপাড়ির উদ্দেশ্যে জলদস্যুর দলে ভিড়ে গিয়েছিল।

ক্যাথলিক গির্জাসঙ্ঘ অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে যে সুযোগ পেয়েছিল সে সুযোগ ব্রেজিলে পায় নি। তার অনেকগুলি কারণের একটি হচ্ছে যে উনিশ শতকের প্রথমেই পর্তুগালের সম্রাট ডম জাও নেপোলিয়ান-এর ভয়ে ব্রেজিলে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের প্রভাব বর্তায় ছাত্রদের ওপর। তাছাড়া ততদিনে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। নেপোলিয়নের পরাভবের পরে ১৮২১ সালে ডম জাও স্বীয় পুত্র পেড্রোকে প্রতিনিধি রেখে দেশে ফিরে যান। পর্তুগালের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার পর পেড্রো দীর্ঘ আটচল্লিশ বছর মিতাচার ও ভদ্রতার সঙ্গে রাজকার্য চালিয়ে যান। এঁর শান্তিপূর্ণ শাসনকালে রিও রাজসভার জাঁকজমক লিসবনকে রীতিমত ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। মোটকথা ব্রেজিলে অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী সবল হওয়ার জন্য গির্জাসঙ্ঘকে মন জুগিয়ে চলতে হয়েছে।

পেড্রো সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর যখন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সবেমাত্র আইন করে ক্রীতদাস প্রথা রহিত করা হয়েছে। পঞ্চাশ লক্ষ নিগ্রোদাস স্বাধীন হয়ে বিভিন্ন উদ্যোগের উন্নয়নকার্যে স্থান পেয়েছে। সে-স্থান নিম্নস্তরের হলেও তারা নিজেদের সম্পূর্ণ ব্রেজিলিয়ান জ্ঞান করে দেশের সকল কিছু ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সঙ্গীতবিভাগে তাদের কীর্তি জাতীয় গৌরবের অবদান হয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র আইনের চোখে নয়, মানুষে মানুষে ভাবে-ব্যবহারে অণুমাত্রও বর্ণবৈষম্যের রেশ দেখা যায় না। মাত্র এক শতাব্দী হল জার্মানরা এসে দক্ষিণের উচ্চ সমমালভূমির ওপর পশুপালনে ভাগ্য পরীক্ষা করেছে; ইটালিয়ানরা এসে সাও পাওলোর যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি করেছে; হোকাইডো দ্বীপ থেকে জাপানীরা এসে অ্যামাজন নদী-উপত্যকার দুর্গম ও অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলের আদিবাসীদের বহির্জগতের সংবাদ এনে দিয়েছে, তারপর তারাও বিভিন্ন ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মতো নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ভুলে পাকা ব্রেজিলিয়ান বনে গেছে। তাদের মতো কিছু কিছু তুর্কি ও গ্রীক এসেও সেই জাতীয় প্রবাহে মিশেছিল এককালে। আর এসেছিল এবং এখনও আসছে পর্তুগাল ও অন্যান্য পর্তুগীজশাসিত কলোনি থেকে বিতাড়িত অথবা পলাতক রাজদ্রোহী। ব্রেজিলের বর্তমান জনসংখ্যার

অর্ধেক হবে শ্বেতাঙ্গ ও বাকি অর্ধেকের অধিকাংশ হচ্ছে মিশ্রিত। খাঁটি নিগ্রোর সংখ্যা বোধ করি দেড় কোটির অধিক হবে না, কিন্তু জাতীয়

জীবনে, বিশেষ করে উত্তরের কৃষি-অঞ্চলগুলিতে, এরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে আছে।

আজ পেরুর সকল মানুষকেই মনে হয় যেন মুমূর্ষু, ক্লান্ত ও দুঃস্থ। রাজধানী লিমা ও ইন্‌কাদের পূর্বতন প্রধান নগরী কুস্‌কো এবং অন্যান্য লোকালয়গুলি দেখলে পর্যটকের মন অবসাদে পূর্ণ হয়ে যায়। লিমা শহরের আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলি নাগরিকদের দৈন্যদশা যেন প্রকট করে তোলে। শহরকেন্দ্রের জাঁকজমকপূর্ণ হোটেল, প্রহরীপরিবেষ্টিত ডিক্‌টেটার-এর প্রাসাদ ও সূক্ষ্ম ফিলিগ্রী-কারুকার্যে-খোদাই প্রস্তরমণ্ডিত গির্জার পুঞ্জীকৃত ঐশ্বর্য বিসদৃশ মনে হয় চারিপাশের জীর্ণমলিন দারিদ্র্যপূর্ণ পরিবেশে। কুস্‌কোর অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানকার পথচারীদের মনে হয় আশাহত,

কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরাই ছিল এককালে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার মধ্যে বিশালতম রাজ্যের অধীশ্বর। এদের তৈরি সূর্যমন্দির, দুর্গ, রাজপথ, সেতু, বাঁধ, রাজপ্রাসাদ, পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ ধাপের ওপর চাষের জমি ও জলের প্রণালী সাক্ষ্য দিচ্ছে উচ্চস্তরের সভ্যতা ও বলিষ্ঠ উদ্যমের।

সমুদ্র থেকে বারো-চৌদ্দ হাজার ফিট উঁচু পর্বতাঞ্চলে অম্লজানের স্বল্পতা ও সমতলভূমির অভাব সত্ত্বেও বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলিকে সমাবেশ করে যেরূপ নিখুঁতভাবে নির্মাণকার্যে লাগানো হয়েছে যে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়। লিমার প্রদর্শনশালায় দেখছিলাম আড়াই হাজার বছর পূর্বের সচিত্র মৃত্তিকা পাত্র ও গাত্রবস্ত্র। রঙের জলুষ ও নকৃশার উৎকর্ষ দেখে মনে হয়েছিল যে তখন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের শিল্পরুচিতেও সৌন্দর্য রূপায়িত করবার কৌশলে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। এই সকল শিল্পবস্তুর রচয়িতারা ছিল ইন্‌কাদের পূর্বের অধিবাসী। কথিত আছে যে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কুয়েচুয়া ভাষাভাষী ইন্‌কারা অ্যাণ্ডিস পর্বতপুঞ্জের অন্তরালে কুস্‌কোব প্রান্তর ও কাছাকাছি ভিল্‌কানোটা নদীর উপত্যকায় ইয়ামা-পশুপালন ও খাদ্য উৎপাদন করে নির্বিবাদে বাস করত। তারপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদের ইতস্তত অভিযান শুরু হয় এবং দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে তারা পবস্পরবিরোধী ছোট ছোট উপজাতিগুলির মধ্যে শান্তি স্থাপন করে দক্ষিণ কলোম্বিয়া—ইকুয়াডর, পেরু, বলিভিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম আর্জেন্টিনা ও মধ্য চিলি পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে রাজ্য বিস্তার কবেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইন্‌কাদের ভাগ্যরবি অস্তমিত হয়। রাজার মৃত্যুর পর দুই রাজপুত্রের কলহ বাধবার অনতিপরে স্প্যানিশ আক্রমণ শুরু হয়। পূর্বে কখনও অশ্ব দেখে নি বলে ইন্‌কাবা শ্বেতাঙ্গ ঘোড়সওয়ারদের দেখে কৌতুক বোধ করে তাদের সানন্দে আহ্বান করে এনেছিল। তারপর যখন শঠতার প্রকৃতি বুঝতে পারল তখন সেনানায়কেরা অবরুদ্ধ অথবা নিহত। তারপর যে নৃশংস লুণ্ঠনপর্ব চলেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী তাইতে ইন্‌কা সভ্যতার অনেক কিছু মূল্যবান নিদর্শন লুপ্ত হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত যে অতিকায় কঠিন উপাদান দিয়ে ইন্‌কাদেব মন্দির, দুর্গ ও ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছিল তা অপহরণ করা সম্ভব ছিল না এবং গিরিশৃঙ্গের ওপর থেকে অথবা দুর্গম নদী-উপত্যকার মধ্যে থেকে রাজপথ, সেতু, জলসরবরাহের

প্রণালী, ফসল উৎপাদনের ধাপ, জলসেচনের ব্যবস্থা অবলুপ্ত করে দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই সকল ঐতিহাসিক উপকরণ ও বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত এক অভিনব নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে ইন্‌কাদের গৌরবময় জাতীয় জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

উরুবাম্বা নদী-উপত্যকার দুর্ভেদ্যপ্রায় পর্বতবেষ্টনী অতিক্রম করবার পর যেখানে অ্যামাজন অরণ্য আরম্ভ হয় সেই অদ্ভুত জনবিরল স্থানে একটি দুরারোহ পর্বতশিখরের ওপর প্রচ্ছন্ন ছিল এই ঘুমন্ত পুরী। স্প্যানিশ লুণ্ঠনকারীরা সন্ধান পায় নি। একটি হারানো পুরীর জনশ্রুতির সূত্র ধরে একজন ইন্‌কা চাষীর পথ-প্রদর্শনে জনৈক মার্কিন প্রত্নতত্ত্ববিদ এর আবিষ্কার করেন। নাম দেওয়া হয় মাচ্চু পিচ্চু অর্থাৎ বৃহৎ শৃঙ্গ। উদ্ভিদাবরণ উন্মোচন করতে প্রকাশ পায় ঘনসন্নিবিষ্ট একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নগরী। গৃহাদির ছাদের তৃণাচ্ছাদন ছাড়া বাকি সব পাওয়া যায় অটুট অবস্থায় এবং সকলের অধিক চমকপ্রদ হয় সমাধির অভ্যন্তর হতে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী। অস্থি থেকে প্রমাণিত হয় যে এখানকার শেষ বাসিন্দার অধিকাংশ ছিল স্ত্রীলোক। এই সন্ধানলাভের সঙ্গে যুক্ত হয় একটি বহুকাল প্রচলিত কিংবদন্তী। কুস্‌কোর সূর্যমন্দিরের সুন্দরী দেবদাসীদের সংবাদ পেয়ে যখন পিসারোর সেনাবাহিনী আক্রমণে উদ্যত হয় তখন নাকি তপনদেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে পুরোহিতসমেত দাসীবর্গকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান। নৈরাশ্যকাতর স্প্যানিশরা এই জবাবদিহিতে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রহরীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেও নাকি সন্ধান পায় নি সেই শতাধিক রমণীর।

মাচ্চু পিচ্চু পর্বতপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে একটি প্রাচীন পথ চলে গেছে কুস্‌কোর দিকে কিন্তু পদব্রজে ছাড়া সেদিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আমরা লিমা থেকে কুস্‌কো যাওয়ার সময়ে অ্যাণ্ডিসের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি অতিক্রম করেছিলাম বিমানপথে গড়গড়ার নলের মতো একটি অম্লজান পরিবেশক বস্তু মুখে পুরে এবং সেখান থেকে উরুবাম্বা (বিকল্পে ভিলকানোটা) নদী অনুসরণ করে-অ্যামাজন উপত্যকা অভিমুখে যাই ট্রেনযোগে তারপর পর্বতারোহণ করি সরকারী বাসে। গন্তব্য স্থানে গিয়ে যে অপরূপ দৃশ্য দেখি তা অতুলনীয়।

শুনেছিলাম যে মায়া ও আজটেক জাতি থেকে ইন্‌কাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য বোঝা যায় তাদের স্থাপত্যভঙ্গির নিরাভরণ ঔদার্যে। এখানকার

এই অদ্ভুত নিরবকাশ স্তব্ধতার মধ্যে, নভঃস্থলের একান্ত সন্নিকটে অধিষ্ঠিত এই নগরী থেকে দিগ্‌বলয়ের যে রূপ দৃষ্ট হয় তাতে স্বতঃই অবচেতনলোকের সুপ্ত আধ্যাত্মিকবোধ সজাগ হয়ে ওঠে। চিত্ত থেকে সকল কিছু অহংকার ও ক্ষুদ্রতা নির্মুক্ত হয়ে যায়।

সূর্যদেবের উপাসক ইন্‌কাদের এই নগরীটির শীর্ষস্থানে রচিত হয়েছে মন্দিরটি এবং অলঙ্কারশূন্য বিগ্রহবিহীন বেদীর ওপর দিবাকরের প্রথম রশ্মিকে গ্রহণ করবার জন্য প্রশস্ত অলিন্দ উন্মুক্ত রয়েছে পূর্বদিকে। শুনলাম কেবল

প্রাক্ ইন্‌কা যুগের 'নাস্কা পটারী'। দেবতার হাতে বলিপ্রদত্ত মানব-মস্তক।
ইন্‌কা যুগে মানুষ বলির প্রথা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষের মধ্যে
সীমাবদ্ধ ছিল। কালীঘাটের পটের সঙ্গে সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

অরুণোদয়ের নয়, এখান থেকে সূর্যাস্তর সৌন্দর্যও নাকি অপূর্ব সুন্দর দেখায়।

ভাবছিলাম অমানিশির ঘোর কৃষ্ণ পটভূমিকায় দীপ্ত নক্ষত্রনিচয় এখানকার মানুষের চিত্তলোকে বড় কম প্রভাব বিস্তার করত না।

কুস্‌কো শহরে বেষ্টিত পাহাড়ের ওপর অধিষ্ঠিত দুর্গ ও মন্দির পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করেছিলাম যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি সকল সময়ে উন্মুক্ত ছিল। প্রখ্যাত সাকসাওয়ামান-এর ধ্বংসাবশেষের উপর থেকে দেখা যায়

ইন্‌কা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে চারদিকে চারটি পথ চলে গেছে পদচারী বার্তাবাহক ও রাজপ্রতিনিধি প্রদেশপালদের জন্য। ইন্‌কারা চক্রচালিত শকটের ব্যবহার জানত না বলে দীর্ঘপথগুলি নির্মিত হয়েছিল ঋজুভাবে। সর্পিল বঙ্কিম গতিতে ওঠানামার প্রয়োজন বোধ হয় নি, কারণ পর্বতগাত্রে প্রস্তর কেটে সিঁড়ি করে দেওয়া আরও সহজ।

দশ-বিশ টন ওজনের বিরাটাকার পাথরগুলিকে কোন উপায়ে তেরো-চোদ্দ হাজার ফিট ওপরে তুলে এমন নিখুঁতভাবে গাঁথুনি-মসলা ব্যতিরেকে সাজানো হয়েছে সে-প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি। ইন্‌কারা ইস্পাতের ব্যবহার জানত না। প্রস্তরগুলিকে কেটে সমতল করা হয়েছিল তামা ও টিন মিশ্রিত কোনো ধাতব যন্ত্রের সাহায্যে বলে অনুমান করা হয়, কিন্তু এমন অদ্ভুতভাবে ত্রুটিহীন হয়েছে পাথরে পাথরে সংযোজন যে ছুরির ফলাকা পর্যন্ত প্রবিষ্ট করানো যায় না কোনো ফাঁকে। উপর্যুপরি বড় বড় ভূমিকম্পেও ইন্‌কাদের নির্মিত দেওয়ালে ফাটল দেখা যায় নি অথচ এইসব ইমারত থেকে অপহৃত পাথরে তৈরি স্প্যানিশ বারোক সৌধনিচয় বারবার ধূলিসাৎ হয়েছে।

স্থানীয় ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে ইন্‌কাদের সময়ে দারিদ্র্য ছিল না দেশে। ইন্‌কা চাষীদের জলসেচনের কৌশলে খাড়া পর্বতগাত্রেও যে প্রচুর শস্য উৎপাদন হত তার দৃষ্টান্ত আজও মেলে এবং অ্যামাজন নদীর দিকে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী জলধারার প্রশস্ত উপত্যকা ছিল খাদ্য উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ হত ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির আশ্রিত জনগণের সম্পত্তি, এক-তৃতীয়াংশ যেত কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে ও বাকি অংশ বণ্টন হত স্থানীয় গোষ্ঠীবদ্ধ লোকদের মধ্যে। মোটকথা এইভাবে পুরোহিত, সৈনিক, চাষী, কারিগর শ্রেণীর সকল মানুষের খাদ্যের অভাব পূরণ হত। ইন্‌কারা ছিল শান্তিপ্রিয় জাতি এবং তাদের পূজা-অনুষ্ঠানাদি ব্যাপারেও আজটেকদের মতো নিষ্ঠুর বলিদান প্রথা ছিল না। একমাত্র বধ্য পশু ছিল ইয়ামা।

দক্ষিণ চিলি, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি শ্বেতাঙ্গপ্রধান দেশগুলি থেকে পূর্বতন অধিবাসীদের নিষ্কাশন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে ফেলা হয় যেহেতু সে দৃশ্যগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল ইওরোপীয়দের বসবাসের অনুকূল।

ইন্‌কারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসৃত হয়ে যায় নি তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে পেরু, বলিভিয়া ও ইকুয়াডর-এর ভৌগোলিক পরিস্থিতি ইওরোপীয়দের বসবাসের অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। তাছাড়া ধনাঢ্য জমিদারদের (প্রধানত ক্যাথলিক গির্জাসঙ্ঘ) অবৈতনিক ও স্বল্পবেতনের শ্রমিক হিসাবে তাদের নগণ্য জীবনেরও মূল্য ছিল। শারীরিক পরিশ্রমের প্রতিদানে তারা কায়ক্লেশে জীবনধারণের অধিকার অর্জন করেছিল কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা তাদের ভাগ্যে জোটে নি। সে দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের কিন্তু পেরুর শাসক জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন নি বলে সেদিক থেকে কর্তব্যমুক্ত। তাব কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক পাহারাদারি। তারও মতিগতির ওপর খবরদারি করছে গির্জার পুরোহিতবৃন্দ ও সামরিক অধিনায়ক। সকলের স্বার্থ নির্ভর করছে বর্তমান অবস্থা কায়েমী থাকার ওপর। উপস্থিত ক্ষেত্রে অবস্থা বলতে বোঝাচ্ছে অর্থপ্রসূ ব্যবস্থা। অর্থাগম হচ্ছে খনি, রেলপথ, বিজলী সরবরাহের কেন্দ্র, তুলা, শর্করা ইত্যাদি সর্ববিধ শিল্প ও রপ্তানির উপযোগী কৃষিক্ষেত্র থেকে। প্রতিটি উদ্যোগের মালিক হচ্ছে বিদেশী মুনাফাভোগীরা।

বিশ বছর পূর্বে প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক জন গান্থার দক্ষিণ আমেরিকা সফর থেকে ফিরে বলেছিলেন যে অর্ধকলোনিয়াল রাষ্ট্রের প্রকৃষ্টতম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায় পেরুতে। সে-দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে রয়েছে :

তৈল	খনির	শতকরা	আশি অংশ
তামা	„	„	পঁচানব্বই অংশ
রূপা	„	„	পঁচাত্তর „
স্বর্ণ	„	„	পঞ্চাশ „
ভ্যানেডিয়াম	„	„	আশি „

ইংরেজ দখল করে আছে রেলপথ, টিটিকাকা হ্রদের ওপর যাত্রীবাহী জাহাজ এবং তুলার বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ। ইটালিয়ানরা ব্যাঙ্ক-এর কারবার একচেটিয়া করে নিয়েছে এবং বিজলী সরবরাহও রয়েছে তাদের অধিকারে। শর্করাব ব্যবসা এসে গেছে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানদের আয়ত্তে এবং কিছু অংশ অধিকার করেছে জাপান। শেষোক্ত জাতি তুলার বাণিজ্যেরও অনেকখানি অধিকার করে আছে। ক্যানাডা হচ্ছে তৈলখনির বাকি অংশের মালিক।

গত বিশ বছরে ডলার অধিকৃত অংশ বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলিকে উচ্চহারের সুদে ঋণদানের প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি অগ্রণী ছিল এককালে। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব জর্জ ক্যানিং স্পেন ও পর্তুগাল-এর উপনিবেশগুলিকে বিছিন্ন হতে সহায়তা করেন এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেম্‌স মানরোকে তাঁর 'ডকট্রিন'টিকে প্রচার করতে উৎসাহিত করেন ঐ একই কারণে। তখন ভারতবর্ষ থেকে আহৃত অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যকে অর্থকরীভাবে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন ছিল। সেই সুবাদে কতকগুলি দীর্ঘমেয়াদী ইজারাও নেওয়া হয়ে যায় খনি অঞ্চলগুলিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডলারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা যায় নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের আলোচনার বিবরণী ঘাঁটলে কিছু কিছু আগ্রহোদ্দীপক ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। গান্থার তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছিলেন পেরুর ভূতপর্ব প্রোসডেন্ট লেগুইয়ার পুত্রের কথা। সে কোনো নিউইয়র্ক ব্যাঙ্ক থেকে চার লক্ষ পনরো হাজার ডলার উৎকোচ নিয়ে সাড়ে নয় কোটি ডলারের ঋণখত লিখে দেয়। এই প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়াই হচ্ছে বিচিত্র।

মজা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ইওরোপের মহানুভব ব্যক্তিরা সত্য সত্যই ইন্‌কাদের মতো অনুন্নত মানুষের দুঃখে কাতর হন। তাঁরা কেবল তলিয়ে দেখেন না তাঁদের নিজেদের ন্যস্ত মূলধন কোন প্রক্রিয়াতে এমন লাভজনকভাবে উপার্জনক্ষম হয়ে থাকে।

ব্রেজিলেও বিদেশী মূলধন একইভাবে, একই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার সকল দেশের মধ্যে এখানে অর্থ ঢালা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ বিবেচনা করে এসেছে কারণ প্রথম থেকেই রাষ্ট্র গঠনের কাঠামোতে স্থৈর্যের লক্ষণ দেখা যায়। শীর্ষদেশে রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধনাঢ্য কফি বাগানের মালিক ও শিল্পপতিরাই জয়লাভ করে এসেছিল এতাবৎকাল। তারা সমভোগবাদ চিন্তাধারাকে দমন করে এসেছে কঠোরভাবে। শ্রেণীগত ইষ্ট খুঁজেছে, কিন্তু কখনও স্বেচ্ছায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হতে দেয় নি। দেওয়া সম্ভব হয় নি জনমতের চাপে।

সাধারণ ব্রেজিলিয়ান হচ্ছে শান্তিকামী নিবিবাদ মানুষ। ব্যক্তিবিশেষের কিংবা রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতপার্থক্য বড় একটা কলহে পরিণত হয় না, কিন্তু স্বাধীনতায় হাত পড়লে বিস্ফোরণ হতে পারে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে কাঁচামাল রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল জাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন। সেইজন্য দেখা যায় যে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, কফি, তুলা, শর্করা ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য যখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হতে হয় তখনই স্কন্ধে এসে পড়ে নানা প্রকার বাধ্যবাধকতা। খননকার্যের মূল্যবান যন্ত্রপাতি, রেলপথ, উৎপাদন উন্নয়নের পরামর্শদাতা ও ঋণ ভার ইত্যাদি অবিরাম বোঝা বাড়তে থাকে। নূতন আকরগুলিকে গ্রাস করে নিচ্ছে মার্কিনী ইস্পাত কারখানার মালিকবৃন্দ ব্রেজিলিয়ান শিখণ্ডীদের অগ্রে রেখে। বিকল্প খরিদ্দার না পাওয়া গেলে কিছু করবার উপায় নেই।

এই পরিস্থিতি হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নব নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট জানিও কোয়াড্রোস সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনদেশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি হচ্ছেন দেশভক্ত জাতীয়তাবাদী। কোয়াড্রোস-এর অপসারণে প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া শক্তি বাইরে বেরিয়ে আসবে ও ডলার কূটনীতির শক্তি পরীক্ষা হবে। সাময়িক-ভাবে সে-শক্তির সাফল্য লাভ হলেও জনমতের চাপে পরাভব অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ

রণজিৎ দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষের মতো অর্ধোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান কথা চিরাচরিত, আধা-অচল গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি ও প্রাণের সঞ্চার, সারা দেশ জুড়ে আধুনিক শিল্পের দ্রুত সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, বিশেষত্ব ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের প্রসার। জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন, বেকার ও আধা-বেকারদের কর্মসংস্থান এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাসও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এসব উদ্দেশ্যপূরণ আবার দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর, বিশেষত সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কের ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তনের উপর মূলত নির্ভরশীল।

অতএব উপরোক্ত উদ্দেশ্যপূরণ এবং তার প্রাথমিক শর্তস্বরূপ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানগত ও সংগঠনগত পরিবর্তনে অগ্রগতির মাপকাঠিতেই যে কোনো পরিকল্পনার ভাল-মন্দ বিচার। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও এই বিচারের বাইরে নয়।

প্রগতিশীল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত দলিলে পাঁচ বৎসরে ৩০ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে, এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হবে ১১,৮০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় হবে ১০,৪০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রেরও ক্ষেত্র ও বেসরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগ লক্ষ্য যথাক্রমে ৬৫০০ কোটি টাকা ও ৪১০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাব তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭২ শতাংশ ও ৩২ শতাংশ। অর্থাৎ বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রস্তাবিত প্রসার অনেক দ্রুত ও বেশি।

তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের তালিকায় প্রথম অগ্রাধিকার কৃষিক্ষেত্রের। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এ পরিকল্পার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিল্প, বিশেষত ইস্পাত,

কয়লা, খনিজ তেল, বিদ্যুৎ, ভারী যন্ত্রপাতী, ভারী রাসায়নিক, সূক্ষ্ম কাজের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মতো ভারী ও মৌলিক শিল্পগুলির সম্প্রসরণ ও বিকাশের উপর।

উপরোক্ত লক্ষ্য ঘোষণার পাশাপাশি প্রস্তাব করা হয়েছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসার এবং অধিকতর সম-সুযোগ সম্পন্ন সমাজ সৃষ্টির।

সন্দেহ নেই, এ সবই বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। দেশের প্রায় সকলেরই সমর্থন ও সম্মতি রয়েছে উপরের সব কয়টি প্রস্তাবের প্রতি। ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি যদি বাস্তবে পরিণত হয় তবে ভারতের শিল্পায়ন, বিশেষত মূলধনী শিল্পের ভিত্তি হবে আরও প্রশস্ত, আরও শক্তিশালী, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসারের ফলে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া কারবারীদের কার্যকলাপ হবে সঙ্কুচিত। ফলস্বরূপ ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হবে আরও দৃঢ়, পরবর্তী অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ হবে সুগম। এ সবই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

অবশ্য তৃতীয় পরিকল্পনার প্রগতিশীল প্রস্তাব ও লক্ষ্যগুলির সঙ্গে কারও বিরোধিতা নেই এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেরণায় ও মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থপতি এবং কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে দক্ষিণ-পন্থীদের প্রবল বিরোধিতার পটভূমিতে। পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে নানাভাবে নানা অজুহাতে এরা চেষ্টা করেছে পরিকল্পনার আকারকে ছোট করতে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঢালাও কনসেসন দিতে, ভারী শিল্পের বিকাশকে সঙ্কুচিত করতে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকাকে খর্ব করতে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সচেতনতা এবং সরকারী দলের ভিতর দেশপ্রেমিকদের চেষ্টার ফলে এদের অপপ্রয়াস মূলত ব্যর্থ হয়েছে।

উপযুক্ত নীতিহীন পরিকল্পনা

কিন্তু কোনো পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য ভালো ভালো লক্ষ্যের সমষ্টি ও সদিচ্ছার প্রকাশটাই যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল নীতি, লক্ষ্য পূরণের জন্য দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক দেহে সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানগত উপযুক্ত পরিবর্তন, ঘোষিত নীতিকে বাস্তব রূপ

দেওয়ার উপযোগী কার্যকরী ব্যবস্থা। আর এই ধরনের নীতি ও ব্যবস্থার অভাবই তৃতীয় পরিকল্পনার মৌলিক দুর্বলতা।

অবশ্য এই একই দুর্বলতা ও ত্রুটি দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও বর্তমান ছিল। এবং বাস্তবিকপক্ষে তৃতীয় পরিকল্পনা নীতির দিক দিয়ে মূলত দ্বিতীয় পরিকল্পনার অনুসারী। তবে তৃতীয় পরিকল্পনার বিশেষত্ব এই যে, দশ বৎসরের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়াসের নানা অভিজ্ঞতার পরও অতীতে অনুসৃত নীতিগুলির কোনো একটিরও যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় নি, নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নে কোনো একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করা হয় নি, সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে কোনো কার্যকরী পরিবর্তনের আভাসমাত্র দেওয়া হয় নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘোষিত উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির প্রায় অবিকল পুনরুক্তি করা হয়েছে এ পরিকল্পনাতে। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার থেকে কোনোই পরিবর্তন নেই এমন নয়—কিন্তু যে পরিবর্তনগুলি রয়েছে সেগুলি ভালোর দিকে নয়, বরং মন্দের দিকে। এ অবস্থায় শুধু এই পরিকল্পনার সফল প্রয়োগ সম্পর্কে নয়, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই শঙ্কিত হওয়ার কারণ বড় বেশি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার খতিয়ান: সাফল্য

এই আশঙ্কার স্বরূপ বোঝার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান নেওয়া প্রয়োজন, জানা প্রয়োজন গত দশ বৎসরের পরিকল্পনার পরিণতি কি ঘটেছে, আর কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে তৃতীয় পরিকল্পনার শুরু।

এ সম্পর্কে এটা নিশ্চিত যে, দুটি পরিকল্পনা, বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের দেশের অর্থনীতির ভিত্তি হয়েছে আরও ব্যাপক ও দৃঢ়। অগ্রগতি ঘটেছে নানা ক্ষেত্রে। তবে তার মধ্যে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, শিল্পের বিকাশ ঘটেছে বেশ দ্রুত। দশ বৎসরে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৯৪ শতাংশ। এ ব্যাপারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার। এর অর্থ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন।

দ্বিতীয়, দেশী-বিদেশী একচেটিয়াপতিদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারী ও মূল শিল্পগুলির প্রসার ঘটেছে মুখ্যত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে। পাঁচ বৎসরে রাষ্ট্রায়ত্ত

ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটেছে ৭ গুণ। ১৯৫৫-৫৬ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিতে লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি টাকা, ১৯৬০ সালে এই মূলধনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৪৬৮ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের এই বিকাশে দেশী-বিদেশী ধনকুবেরদের অবাধ মুনাফা অর্জন ও যথেচ্ছাচারের সুযোগ অন্তত অংশত সীমাবদ্ধ, অর্থনৈতিক সম্পদের একাংশের উপর প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, গণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ প্রসারিত।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই সূচিত হয়েছে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর একান্ত নির্ভরশীলতা হ্রাসের শুরু এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্রমবিস্তার। কার্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ও নানা সুযোগ-সুবিধা দানের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও ভারী শিল্পের বিস্তৃতি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নবপ্রতিষ্ঠিত ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অর্ধেকেরও বেশি স্থাপিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের সাহায্যে।

এ সবই সুসংবাদ। এ সবের অর্থ সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, একচেটিয়া কারবারীদের ক্ষমতা ও আধিপত্যের সংকোচন, বুনিয়াদী শিল্পের বিকাশ, বাণিজ্যিক সম্পর্কে বৈচিত্র্য সৃষ্টি। এ সবই জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল উপাদান।

সীমাবদ্ধ, আংশিক বিকাশ

কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট সাফল্য পরিস্থিতির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা অনুসারে অতি সামান্য। পরিকল্পনার সব থেকে বেশি সাফল্য শিল্পক্ষেত্রে। অথচ সেখানেও প্রধান প্রধান লক্ষ্য ইস্পাত, কয়লা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্য অপূর্ণ রয়ে গেছে। উপরন্তু জাতীয় আয় সৃষ্টিতে শিল্প উৎপাদনের আনুপাতিক অবদান দশ বৎসর আগেও ছিল ১৭·২ শতাংশ, আর দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও প্রায় তাই রয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের অর্থনীতির কৃষি-নির্ভর চেহারাটির পরও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার ব্যর্থতা সব থেকে বেশি। খাদ্য সরবরাহের সংকটজনক পরিস্থিতিই এই অক্ষমতার প্রমাণ।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন, প্রতি বৎসর আমদানি করতে হবে ৩০ লক্ষ টন। এই বাবদে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে ৬০৮ কোটি টাকা মূল্যের। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, প্রথম পরিকল্পনা শুরুর আগেও বার্ষিক গড়পড়তা খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল এই একই। এবং শুধু তো খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়, প্রতিটি কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম-বেশি অচলাবস্থা বিদ্যমান।

এই অবস্থায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ঘোষিত লক্ষ্য অপূর্ণ রয়ে গেছে। পাঁচ বৎসরের লক্ষ্য ছিল ২৫ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধির। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র ১৯'৬ শতাংশ। এর সঙ্গে তুলনীয় প্রথম পরিকল্পনার ১৮'৪ শতাংশ আয় বৃদ্ধি।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, গত দশ বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ৪২ শতাংশ। অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদই এ দাবির যথার্থতা সম্পর্কে সংশয়ান্বিত। কিন্তু সে তর্ক না তুলেও বলা যায়, ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের তুলনায় তো বটেই, এমনকি বহু অর্ধোন্নত দেশের তুলনাতেও কম। জাতি সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৬০ থেকে জানা যায় সাঁয়ত্রিশটি অর্ধোন্নত দেশের বত্রিশটিতেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ভারতের থেকে বেশি। আর অনেক ক্ষেত্রেই এই বৃদ্ধি ঘটেছে কোনো পরিকল্পনা ব্যতীত।

মূলগত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা

এই অতি সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জীবনের সমস্যা তথা পশ্চাৎপদ অর্থনীতির গভীর অসঙ্গতিগুলির প্রান্তদেশ স্পর্শ করতেও যে ব্যর্থ হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। বস্তুত আমাদের দেশের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা এলিসের সেই আজব দেশের মতো—সেই যে-দেশে একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই আপ্রাণ দৌড়াতে হয়। তাই বা কেন? এখানকার পরিস্থিতি সে-দেশের থেকেও শোচনীয়। কারণ এদেশে দেখা যাচ্ছে, দুটি পরিকল্পনা আর দশ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ ব্যয়ের পরও জনসাধারণের জীবনের দারিদ্র্য ও দুর্দশা, বেকারি ও আধা-বেকারি এবং অর্থনৈতিক অসাম্য—এই তিনটি অতি জরুরী সমস্যার

কোনো একটির ক্ষেত্রেও সামান্যতম উন্নতি ঘটে নি। বরং অনেক বিষয়ে ঘটেছে অবনতি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেকার ও আধা-বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগের দ্রুত প্রসারের, পাঁচ বৎসরে ৮০ লক্ষ নতুন কাজ সৃষ্টির লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু যা হয়েছে বা লক্ষ্যের তুলনায় অনেক কম—নতুন কাজ সৃষ্টির সংখ্যা মাত্র ৬৫ লক্ষ। ফল কি হয়েছে? প্রথম পরিকল্পনা শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে বেকারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৯০ লক্ষ। উন্নতির অতি চমৎকার কল্পনা!

জনসাধারণের সর্বনাশ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন। বলা হয়েছিল, পরিকল্পনার লক্ষ্য জনসাধারণের জীবনমানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, অধিকতর সমসুযোগ-বিশিষ্ট সমাজ গঠন। কিন্তু এসব লক্ষ্য পূরণের কাছাকাছিও পৌঁছানো গেছে, এমন মনে করার কারণ নেই।

প্রশ্ন হতে পারে, তা কেন? পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী তো দশ বৎসরে মাথা পিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধি ঘটেছে যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ১৬ শতাংশ। কিন্তু এ হল গড়পড়তা হিসেব। সামনে জনসাধারণের কোনো কোনো শ্রেণী ও অংশের মাথাপিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধির হার গড়পড়তা হারের থেকে যথেষ্ট বেশি। অন্য অনেকের ক্ষেত্রে ঐ হার গড়পড়তা হারের সমান। আর বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের ক্ষেত্রে ঐ আয় ও ভোগ বৃদ্ধির হার গড়পড়তা হারের থেকে শুধু যে কম তা নয়, অনেকের ক্ষেত্রেই নেতিবাচক।

এমনটা হওয়ার নানা কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল পরোক্ষ করের ক্রমবর্ধমান বোঝা। জনগণের মাথাপিছু আয় যা বেড়েছে তা একরকম করবৃদ্ধিতেই খেয়ে গেছে। এ-কথার প্রমাণ স্বরূপ এই একটি তথ্যই যথেষ্ট যে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০—এই দশ বছরে প্রত্যক্ষ কর বেড়েছে মাত্র ২০ কোটি টাকা, অথচ পরোক্ষ কর বেড়েছে ৩৮০ কোটি টাকা।

তদুপরি যুক্ত হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। গত পাঁচ বৎসরে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে ৩০ শতাংশ। আর এটা তো অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম, মুদ্রাস্ফীতির ফলে

ক্ষতিগ্রস্ত হয় নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন গোষ্ঠীগুলি, দেশের শ্রমজীবী মানুষ—লাভবান হয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কারবারী গোষ্ঠীগুলি। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে।

সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে গত দশ বৎসরে। কিন্তু ১৯৬০ সালের ১১ই এপ্রিল লোকসভার বক্তৃতায় শ্রমমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন, "১৯৩৯-৪৭ সালের মধ্যে শ্রমিকদের জীবনের মান অবনয়নের হার ২৫ শতাংশ। ১৯৫১ সাল নাগাদ হৃত অবস্থার পুনরুদ্ধার ঘটে। ১৯৫৫ সাল নাগাদ প্রকৃত মজুরি (real wage) বৃদ্ধি পায় ১৩ শতাংশ। কিন্তু এই লাভের অনেকখানিই নাকচ হয়ে গেছে ১৯৫৬ সাল পরবর্তী মূল্যবৃদ্ধির ফলে।" সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকদের যেখানে এই অবস্থা সেখানে ছোট ও অসংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বেতনভুক্ত মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের অবস্থাও অনুরূপ।

গ্রামীণ জনসমষ্টির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পক্ষে কৃষি-শ্রমিক সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশেষ সহায়ক। এদের জীবনে দুর্গতি যে কী পরিমাণ বেড়েছে তা কৃষি-শ্রমিক তদন্ত কমিশনের দ্বিতীয় বিবরণীতেই উদ্‌ঘাটিত। এই বিবরণী অনুসারে ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি-শ্রমিকদের ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৬ শতাংশ এবং পরিবার পিছু গড় ঋণের পরিমাণ ১০৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩৮ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে কৃষি-শ্রমজীবী পরিবারের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ছিল ৪৪৭ টাকা, কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৩৭ টাকা। এই একই সময়ে নারীশ্রম ও শিশুশ্রমের নিয়োগ ও শোষণ গেছে বেড়ে। এই কৃষি-শ্রমিকেরা গ্রামীণ জনসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং তাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যতে কৃষকসাধারণের অধিকাংশের অবস্থাই প্রতিফলিত। ১৯৫৬-৫৭ সালের পরও যে এ অবস্থার উন্নতি ঘটে নি, বরং অবনতি ঘটেছে তা বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং গত পাঁচ বৎসরের মূল্যবৃদ্ধির ধারা থেকেই বোঝা যায়।

ধনীদের পোয়াবারো

কিন্তু জনগণের ক্রমবর্ধমান দুর্দশাই যদি এক দশক ব্যাপী পরিকল্পনার পরিণাম হয় তবে বর্ধিত আয় গেল কোথায়? এ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য

নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির বিবরণীতে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ পাবে বলে আশা করা যেতে পারে। কিন্তু এখুনি নানা তথ্যের থেকে যা জানা যায় তাতে এটা তর্কাতীত যে, পরিকল্পনার ফলে সমৃদ্ধি ঘটেছে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মুষ্টিমেয় ধনিককুলের।

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডাঃ কে. এন. রাজের বিশ্লেষণ[১] থেকে জানা যায়, কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন বর্ধিত আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই গ্রামাঞ্চলের বার্ষিক ৪,৫০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠী অর্থাৎ গ্রামীণ জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশের করায়ত্ত। গোটা অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আয় বণ্টনের ধারা অনুরূপ। সেক্ষেত্রে বর্ধিত জাতীয় আয়ের অন্তত ৩০ শতাংশ আত্মসাৎ করেছে বার্ষিক ৩,৬০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠী অর্থাৎ দেশের জনসমষ্টির মাত্র ৪ শতাংশ।

সংক্ষেপত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের বাগাড়ম্বরের আড়ালে উৎকট অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। দুটি পরিকল্পনার ফলে এক রাজ্যের তুলনায় আর এক রাজ্য, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চল হয়েছে লাভবান। আবার গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের চেষ্টা সুবিধাগুলি হস্তগত করেছে কৃষি-মজুর ও প্রকৃত চাষীর পরিবর্তে জমির বৃহৎ মালিক-মহাজন-কারবারীবর্গ। আর শহরাঞ্চলে প্রধানত লাভবান হয়েছে শিল্পশ্রমিক ও বেতনভুক কর্মচারীদের পরিবর্তে বৃহৎ কারবারী, ফাটকাবাজ, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কমালিক ইত্যাদি। এবং এদেরই মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী—দেশীয় একচেটিয়াপতিরা বিদেশী পুঁজিপতিদের সহযোগে দেশের শিল্প-বাণিজ্য-আর্থিক জগৎ-এর উপর বিস্তার করেছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য, করায়ত্ত করেছে জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি : বর্ধমান দুর্দশা

অতীতের দুটি পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের থেকেও বেশি টাকা বিনিয়োগের, দশ বৎসর জাতীয় আয়ের যে বৃদ্ধি ঘটেছে পাঁচ বৎসরে তার সমান বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনায়। তথাপি পরিকল্পনা শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটবে, জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার সমস্যা অন্তত কিছুটা লাঘব হবে এমন আশা করার কোনোই কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনো আশার চিত্র এ পরিকল্পনাতে উপস্থিত করাও

হয় নি। সেদিক দিয়ে মানতেই হবে, আমাদের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ খুবই সত্যভাষী।

আমরা দেখেছি দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুর সময়ের তুলনায় পরিকল্পনা শেষে বেকারের সংখ্যা গেছে অনেক বেড়ে। তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়ায় অনুমিত হয়েছে, এই পরিকল্পনা কালে নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ, অতীতের বেকার মিলিয়ে মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি ৬০ লক্ষ। কিন্তু নতুন কাজ সৃষ্টি হবে মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ। সুতরাং ১৯৬৫-৬৬ সালে বেকার সংখ্যা হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ—১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। আর পরিকল্পিত লক্ষ্য পূরণ করা যাবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

এ তো গেল বেকার সমস্যা প্রসঙ্গে। জনসাধারণের জীবনমানের উপর তৃতীয় পরিকল্পনার কোন্ ফল বর্তাবে? সেটা বোঝা যায় যদি আমরা মাথা-পিছু খাদ্যপ্রাপ্তির পরিমাণ বিবেচনা করি। চূড়ান্ত দলিলে ঘোষণা করা হয়েছে, পরিকল্পনার ফলে ১৯৬৫-৬৬ সালে দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্তির পরিমাণ হবে ১৭·৫ আউন্স। কিন্তু নিউট্রিশন অ্যাডভাইসরী কমিটির হিসেব অনুসারে, ইংরেজ আমলে ১৯৩৪-৩৮ সালে প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির গড় খাদ্যপ্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১৬·৩ আউন্স। সে তুলনায় পরিকল্পিত বৃদ্ধি অতি নগণ্য। তাছাড়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেই দৈনিক ১৮·৩ আউন্স খাদ্যপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য এ প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি—১৯৬০-৬১ সালে খাদ্যপ্রাপ্তির পরিমাণ মাত্র ১৬ আউন্স। কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রে বোধহয় একেই বলে প্রগতি!

কিন্তু এও তো মাথা গুণতির হিসেব। জনসাধারণের বঞ্চিত ও কম-সুবিধাপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে এই অতি সীমাবদ্ধ বৃদ্ধির কোনো ভাগ পাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তৃতীয় পরিকল্পনা কালে যে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যাবে তার কোনো ভরসা নেই। বরং পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়েছে, "দরের তাৎপর্যপূর্ণ, এমনকি বিপজ্জনক বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করা যায় না।" এর উপরে এই পরিকল্পনা কালে নতুন করধার্যের পরিমাণ হবে ১৭১০ কোটি টাকা। আর এই বিপুল পরিমাণ করের বোঝা যে সাধারণ মানুষকেই প্রধানত বহন করতে হবে তা পরিকল্পনায় খোলাখুলিভাবেই বলা হয়েছে।[৭]

এ পরিকল্পনারও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ গঠন। তবে সেটি যে কি পদার্থ তা এবারেও অস্পষ্ট করেই রাখা হয়েছে, 'আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস', 'অধিকতর সমসুযোগ সম্পন্ন সমাজ সৃষ্টি' ইত্যাদির প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু এসব উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাব, কোনো কার্যকরী ব্যবস্থার উন্নতি এই বিরাট পরিকল্পনায় প্রায় অনুপস্থিত।

বিপজ্জনক সম্ভাবনা

এহেন পরিস্থিতিতে তৃতীয় পরিকল্পনা জনচিত্তে কোনো আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয় নি, কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্ম দিতে সমর্থ হয় নি। কিন্তু কোনো পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য তার টেকনিক্যাল যথার্থতা, বিভিন্ন লক্ষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের নিখুঁত সামঞ্জস্য ইত্যাদি গুরুত্ব প্রচুর হলেও যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার প্রতি জনসাধারণের সোৎসাহ সমর্থন, পরিকল্পনার রূপায়ণে সক্রিয় অংশগ্রহণ, তাদের বিপুল কর্মশক্তির উদ্বোধন। কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় তার জন্য প্রয়োজন প্রচলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের, সম্পত্তির বর্তমান মালিকানা সম্পর্কের মূলগত পরিবর্তন, শ্রমজীবীসাধারণের স্বার্থানুগ উপযুক্ত নীতি অবলম্বন অর্থাৎ প্রকৃত চাষী ও ক্ষেতমজুরের স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কার, সমবায় অন্দোলনের বিস্তার, বিদেশী মূলধন সহ প্রধান প্রধান একচেটিয়া সম্পত্তির জাতীয়করণ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রসার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি, করব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি। আর এই ধরনের পরিবর্তন ও বলিষ্ঠ নীতির অভাবই যে তৃতীয় পরিকল্পনা ও পূর্ববর্তী দুটি পরিকল্পনার প্রধানতম দুর্বলতা ও ত্রুটি সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু এর পরিণাম হচ্ছে বিপজ্জনক। একপ্রান্তে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে শিল্প-বাণিজ্য-আর্থিক জগতের চূড়ামণিদের আয় ও সম্পত্তি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। আর বিপরীত প্রান্তে, জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিচ্ছে হতাশা ও তিক্ততা, পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়াস সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সংশয়। নিঃসন্দেহেই এ পরিস্থিতি বিপজ্জনক। কারণ জনসাধারণের ন্যায্য অসন্তোষ ও বিক্ষোভই ব্যবহৃত হতে পারে পরিকল্পনার সীমাবদ্ধ প্রগতিশীল উদ্দেশ্যগুলির বিরুদ্ধে। এবং বস্তুত কায়েমী স্বার্থপতিরা তেমন একটি অপপ্রয়াসেই লিপ্ত। জনসাধারণের

জীবনে দুর্গতির জন্য ভারী শিল্প বিস্তারের নীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রসারের নীতিই দায়ী এমন একটি কথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে দেশী-বিদেশী একচেটিয়াপতিদের পক্ষ থেকে। আর এ প্রয়াস সফল হওয়ার অর্থ স্বাধীন, সুস্থিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া তো বটেই, এমনকি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়া। অথচ এ পরিস্থিতির থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে সরকারী নীতি হল গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিত্তবানদের, বিশেষ করে একচেটিয়াপতিদের স্বার্থসংরক্ষণ। তৃতীয় পরিকল্পনা এর থেকে কোনো ব্যতিক্রম নয়।

কৃষি অর্থনীতির সংকট গভীরতর :

ইতিপূর্বে খাদ্য ও কৃষি পণ্য উৎপাদনে অচলাবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি আকস্মিক নয়। এর মূলে রয়েছে সরকারের অনুসৃত নীতি।

ভারতবর্ষে কৃষি অর্থনীতিতে পুনরুজ্জীবনের পূর্বশর্ত প্রচলিত ভূমি-বন্দোবস্তের মূলগত রূপান্তর—একথা করাচী কংগ্রেসের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে শুরু করে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেসের নানা সিদ্ধান্ত সুপারিশ ইত্যাদিতে স্বীকৃত নীতি ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়, বিশেষত পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত প্যানেলের সুপারিশ ও ১৯৫৯ সালে নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবে পরিবর্তিত রূপে হলেও একই মূল নীতি প্রতিফলিত।

কিন্তু এই নীতি রয়ে গেছে কেবলমাত্র ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ। আইনের নানা সীমাবদ্ধতা ও ফাঁকে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ ও গ্রামাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের যোগসাজশের ফলে ভূমিসংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য গেছে বানচাল হয়ে।

প্রথমত, ইংরেজসৃষ্ট জমিদারী, জায়গীরদারী, তালুকদারী প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্তের বিলোপসাধন ঘটেছে প্রায় সারা ভারতবর্ষেই। কিন্তু প্রাক্তন মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন বাবদ ৬২১ কোটি টাকার ব্যবস্থা তো রয়েছেই। উপরন্তু নানাভাবে হাজার হাজার বিঘা জমি তুলে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন জমিদারদের হাতে। উত্তর প্রদেশে তো জমিদারদের ৭১ লক্ষ একর খাস জমির মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ একরেই রয়ে গেছে জমিদারদের মালিকানা।

দ্বিতীয়ত, মধ্যস্বত্বের অবসান ঘটলেও প্রকৃত চাষী-প্রজাকে মালিকানা অধিকার দানের "ব্যাপারে কাজ হয়েছে অপ্রচুর"—একথা তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়াতেই স্বীকৃত।[৫]

তৃতীয়ত, জমির কেন্দ্রীভূত মালিকানার অবসান এবং গরিব ও ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরদের জমি বণ্টনের উদ্দেশ্যে জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের নীতি গৃহীত হয়েছিল প্রথম পরিকল্পনাতেই। কিন্তু এখনো তিনটি রাজ্যে—মাদ্রাজ, মহীশূর ও বিহারে এ সম্পর্কে আইন প্রণয়নকে চূড়ান্ত করার কাজ বাকী। তাছাড়া মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ ইত্যাদিতে জোতের উর্ধ্ব সীমা ধার্য করা হয়েছে ১২০ একর থেকে ২৭০ একর পর্যন্ত। ফলে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের নীতি অর্থহীনতায় পর্যবসিত।

এই অতি সীমাবদ্ধ ব্যবস্থাগুলিও বানচাল হয়ে যাচ্ছে আইনের নানা ফাঁক ও ত্রুটির ফলে। নানা অজুহাতে বহু ধরনের জোতের ক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ করা হয় নি। 'ব্যক্তিগত চাষের' অধীন জমিকেও সর্বোচ্চ সীমার আইনের থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে অনেক রাজ্যে। আর এই 'ব্যক্তিগত চাষের' অর্থ কোনো ক্ষেত্রেই মালিকের নিজস্ব কিংবা তার পরিবারের কারুর কৃষিকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ নয়—এর জন্য উৎপাদনে সামান্যতম ঝুঁকি বহন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ প্রমাণ করতে পারাটাই যথেষ্ট। এই প্রসারিত সংজ্ঞার সুযোগে হাজার হাজার বিঘা জমি রয়ে গেছে পূর্বতন মালিকদের হাতে।

অধিকন্তু পারিবারিক জোতের পরিবর্তে ব্যক্তিগত জোতের উপর সর্বোচ্চ সীমাবিষয়ক আইনগুলি প্রযোজ্য। এ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে মালিকপক্ষ কালবিলম্ব করে নি। পরিবারের সভ্যবৃন্দ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিশ্বাসী চাকর ইত্যাদির পক্ষে তো বটেই, এমনকি নবজাত শিশু, মৃত শিশু, হবু শিশুর নামে পর্যন্ত ভাগ-বাঁটোয়ারা করে বেমালুম 'জমি চুরি' হয়ে গেছে। গরিব ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণযোগ্য উদ্বৃত্ত জমি যা মিলেছে তার পরিমাণ অতি নগণ্য।

চতুর্থত, প্রজাদের স্বত্বের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার অভাবে এই সব আইনের প্রত্যক্ষ পরিণাম হাজার হাজার কৃষকের উচ্ছেদ। আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য, মালিকানাধীন জমিকে খাস জমি ও ব্যক্তিগত চাষের জমি হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বৃহৎ মালিকেরা প্রায় সব কয়টি রাজ্যেই গ্রহণ করেছে

ব্যাপক প্রজা উচ্ছেদের পথ। এ সম্পর্কে এক অনুসন্ধান* থেকে জানা যায়, হায়দ্রাবাদে ১৯৫১ সালে সৃষ্ট 'সংরক্ষিত প্রজাদের' মধ্যে প্রতি ১০০ জনে ৫৮ জন ১৯৫৫ সালেও কোনো না কোনোভাবে জমি ভোগ-দখল করছিল, কিন্তু বাকী ৪২ জনই জমি ছেড়ে দিয়েছিল। ২'৫৮ শতাংশ হয়েছে আইনত উচ্ছেদ, আর ২২'১৪ শতাংশ হয়েছে বে-আইনী উচ্ছেদ। আরো ১৭'৮৩ শতাংশ স্বেচ্ছায় জমি প্রত্যর্পণ করেছে জমির মালিককে। তবে এই স্বেচ্ছা-প্রত্যর্পণের কতটা যথার্থই স্বেচ্ছায় সে-সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনও সন্দিহান।[৭] অর্থাৎ ৪২ শতাংশ জমির মালিকানা পাওয়ার পরিবর্তে আসলে হয়ে গেছে জমি থেকে উৎখাত।

ব্যাপক প্রজা উচ্ছেদ তথাকথিত স্বেচ্ছা-প্রত্যর্পণের এই যে চিত্র এ শুধু হায়দ্রাবাদের বৈশিষ্ট্য নয়। কার্যত সারা দেশ জুড়ে গ্রামাঞ্চলে গত দশ বৎসরে কৃষকের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটে গেছে এটা তারই একটি নমুনা। আর এই ব্যাপক উচ্ছেদ ও পূর্বোল্লিখিত "জমি হস্তান্তর ভূমিসংস্কার আইনের উদ্দেশ্যকেই করে দিচ্ছে পরাস্ত"—তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়াতেই পাওয়া যায় এই স্বীকৃতি।[৮]

এই সব ঘটনার পরিণামে মধ্যস্বত্বের অবসান ও ভূমিসংস্কার আইন সত্ত্বেও জমি এখনও মুষ্টিমেয় অকৃষক মালিকের হাতে কেন্দ্রীভূত। গ্রামীণ ঋণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত দ্বিতীয় ফলো-আপ সার্ভে, ১৯৫৭-৫৮র থেকে জানা যায়, যে ১২টি জেলায় অনুসন্ধান করা হয় তার ৭টিতেই মোট আবাদী জমির ৪০-৪২ শতাংশ কৃষক পরিবারসমষ্টির মাত্র ১০ শতাংশের মালিকানাধীন; অন্যদিকে, ১০টি জেলাতে ছোট কৃষকেরা অর্থাৎ কৃষক পরিবারসমষ্টির ৩০ শতাংশে মাত্র ১০ শতাংশ জমির মালিক।

গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অর্থ-প্রভাব-প্রতিপত্তি-ক্ষমতা—সবই এই সংখ্যালঘু বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীটির করতলগত। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সারা ভারত গ্রাম্য ঋণ সমীক্ষা বিবরণী অনুযায়ী[৯], এই বৃহৎ মালিকদের স্বার্থ মহাজনদের স্বার্থের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং বাস্তবিকপক্ষে অনেক ক্ষেত্রে এরা নিজেরাই মহাজনী, ফাটকাবাজী, মজুতদারী কারবারে লিপ্ত। জমির বৃহৎ মালিক, মহাজন ও কারবারীদের এই জোটটিই গ্রাম্যজীবনের প্রধানতম শক্তি। এদেরই চক্রান্তে কৃষি

অর্থনীতির প্রকৃত পুনর্গঠন ব্যাহত। সমবায় সমিতিগুলি এদেরই কুক্ষিগত, এদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র।

এই অবস্থায় ছোট মালিক-চাষী ও চাষী-প্রজার জীবনে শোষণ ও বঞ্চনা বহুবিধ। খাজনা, সুদ ও করের বোঝা বিপুল। ফসলের ন্যায্য দর লাভে এরা বঞ্চিত। মূলধন ও আর্থিক সঙ্গতি তুচ্ছ। এ সবের অভাবে উৎপাদন পদ্ধতি পাশ্চাৎপদ; জমিগুলি টুকরো টুকরো, ছড়ানো ছিটানো; উন্নত যন্ত্রপাতি, ভাল বীজ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার এদের সাধ্যাতীত। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা নগণ্য ও প্রায় নিশ্চল।

সরকারী নীতি হল প্রকৃত চাষী ও ক্ষেতমজুরের স্বার্থে সুদূরপ্রসারী কৃষিসংস্কারের পরিবর্তে পুরানো ধরনের খাজনাভাগী মধ্যস্বত্বাধিকারী জমিদারদের কৃষি-শ্রমিক নিয়োগকারী, আধুনিক উৎপাদনপদ্ধতি ও উন্নত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারে ইচ্ছুক ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তর ও ধনী কৃষকগোষ্ঠীর বিকাশ। কৃষি অর্থনীতির মূলগত পরিবর্তনকে পরিহার করে প্রধানত টেকনিক্যাল উন্নতি অর্থাৎ ভাল বীজ ও রাসায়নিক সার, ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, জাপানী পদ্ধতিতে চাষ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নই হল সরকারের নীতি।

এই নীতির পরিণতি কি ঘটেছে? গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এটা সুস্পষ্ট যে, এই পদ্ধতি উৎপাদনের কোনো বড় রকম প্রসার সাধনে অসমর্থ। মধ্যের থেকে লাভবান হয়েছে জমির বড় বড় মালিক ও ধনী কৃষককুল— নানা সরকারী কমিটির বিবরণীতেই এই ধারা স্বীকৃত। কিন্তু এদের লাভ ও উন্নয়নজনিত উদ্বৃত্ত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগছে না। কারণ মহাজনী, ফাটকাবাজী বা মজুতদারীর কারবারে অনেক তাড়াতাড়ি লাভ, অনেক বেশি লাভ। সুতরাং সেখানেই খাটছে এদের লাভের টাকা, ফলে উপযুক্ত মূলধনের অভাবে কৃষিক্ষেত্র জীর্ণশীর্ণ, উৎপাদনের প্রসার ব্যাহত, কৃষির বিকাশ মন্থর।

এই পরিস্থিতিই, একদিকে, প্রকৃত চাষীর উপযুক্ত সঙ্গতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব, অপর দিকে, জমির বড় বড় মালিক, মহাজন ও কারবারীদের সম্পদ ও সঙ্গতির অনুৎপাদক অপচয় খাদ্য ও অন্যান্য কৃষি পণ্যের উৎপাদনে আধা-অচলাবস্থার মূল কারণ।

কিন্তু এর ফলে শুধু যে কৃষি-অর্থনীতিই সংকটগ্রস্ত তা নয়। বিশাল কৃষক

সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার প্রভাবে শিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজার সীমাবদ্ধ এবং পরিণতিতে শিল্পের প্রসারও বাধাপ্রাপ্ত।

পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত সমস্যা, বিশেষত ভূমিসংস্কারের ব্যর্থতা সম্পর্কে যে একেবারে অনবহিত নন সেটা তৃতীয় পরিকল্পনার নানা বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়। তথাপি এ সম্পর্কে বাস্তব প্রয়োজনানুগ কার্যকরী ব্যবস্থা কিংবা প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত এ পরিকল্পনায় নেই। খসড়ায় শুধু বলা হয়েছে, "দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে ও বিভিন্ন রাজ্যের আইনে বিবর্তিত নীতিগুলি কার্যকরী করার কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ করা তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান কর্তব্য।"[১০] চূড়ান্ত দলিলেও মূলত এই একই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্তত এই ঘোষণাটি সম্পর্কেও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ যদি যথার্থই আন্তরিক ও সৎ হতেন তবে তাঁরা স্বীকৃত নীতিসমূহকে কার্যকরী করার নিশ্চয়তা সৃষ্টির সুপারিশ করতেন, যে নীতি ও পদ্ধতি কৃষি-অর্থনীতি ও সারা দেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে সে সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতেন, হস্তান্তরের ফলে উধাও জমি পুনরুদ্ধার ও উৎখাত কৃষকের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করতেন। কিন্তু সে সবই এখানে অনুপস্থিত। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে বৃহৎ মালিক-মহাজন-কারবারীদের যে অশুভ জোটটি দানা বেঁধে উঠেছে সেটি প্রবলতর হবে, কৃষি-অর্থনীতিতে যে অচলাবস্থা বিদ্যমান সেটি অব্যাহত থাকবে—এই আশঙ্কাই করতে হয় তৃতীয় পরিকল্পনা কাল সম্পর্কে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে দ্বিধা

একথাও অনেকের জানা আছে যে, কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষিপণ্যের দামের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে ছোট ও মাঝারি চাষীরা বৃহৎ মালিক, মহাজন ও কারবারীদের শিকার, প্রয়োজনের তাগিদে সস্তায়, অনেক সময়ে লোকসানে ফসল বিক্রয়ে বাধ্য, ন্যায্য দামের থেকে বঞ্চিত। স্বভাবতই এ অবস্থা চাষীর পক্ষে উৎসাহজনক নয়, উৎপাদন প্রসারের পক্ষে অনুকূল নয়।

এ ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম নির্ধারণ ও সে-দামের স্থায়িত্ববিধান, উন্নয়ন কৌশলের বিশেষ অঙ্গ। 'ইকাফে' ও এফ. এ. ও.র মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। এ প্রশ্নের সঙ্গে

কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বণ্টনের দিকটিও জড়িত, বিশেষত যে-ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের সরবরাহে গুরুতর ঘাটতি বর্তমান।

অবশ্য মূল্যের স্থায়িত্ববিধান এবং পণ্যের যথাযথ বণ্টনের সমস্যাটি কেবলমাত্র খাদ্যশস্য বা কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা রয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রধান প্রধান সব কয়টি পণ্যের মূল্য নির্ধারণে একচেটিয়াপতিদের প্রভাবই মুখ্য, সরকারী প্রভাব তুচ্ছ। অথচ গত কয় বৎসরে বিভিন্ন পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পরিকল্পনার ব্যয় বর্ধিত, আয়বণ্টনে অসাম্য তীব্রতর, বিভিন্ন পণ্যের যথাযথ বণ্টন ব্যাহত, স্পষ্টতই এক্ষেত্রে দাম নিয়ন্ত্রণ ও দামের স্থায়িত্ববিধান বিশেষ জরুরী।

কিন্তু কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পজাত পণ্য—দুইয়ের ক্ষেত্রেই সরকারের পক্ষ থেকে দাম নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য অথবা সমবায় ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার প্রসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। অথচ এ-দুটি ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারী দ্বিধা প্রকট।[১১] দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি, বৈদেশিক মুদ্রার দ্রুত ব্যয় ও খাদ্যমূল্যের একটানা ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ ও বণ্টন এবং দামকে কার্যকরীভাবে প্রভাবিত করার জন্য কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। এমনকি অশোক মেহতা কমিটির মৃদু সুপারিশগুলিকেও কার্যকরী করা হয় নি। এস. কে. পাতিলের উদ্যোগে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতি তো হয়েছে কার্যত পরিত্যক্ত।

এমন বিস্ময়কর আচরণের একটি মাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব। কৃষিকার্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কিংবা সমবায় সংগঠন প্রসারের অর্থ গ্রামাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থপতিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়া। আর গ্রামাঞ্চলে যারা পাট বা ধান-চাল ইত্যাদির ব্যবসায়ে প্রধানত লিপ্ত তারাই কোনো না কোনো ভাবে শহরের একচেটিয়া শিল্পপতি ও কারবারীদের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। এই শেষোক্ত শ্রেণীটিও শিল্পজাত পণ্য ও আমদানি-রপ্তানির পণ্যে তো নিশ্চয়ই, অনেক ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের ফাটকাবাজী ও মজুতদারীতে নিযুক্ত। এরাই আবার বর্তমান সরকারের প্রধান ভিত্তি ও সমর্থক।

এ-রকম একটি শক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কিংবা সমবায় সংগঠনের প্রসারসাধনে সরকার যে দ্বিধাগ্রস্ত হবে তা স্বাভাবিক। এই দ্বিধার পরিচয় তৃতীয় পরিকল্পনাতে সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উল্লেখ তৃতীয় পরিকল্পনায়

নেই তা নয়। কিন্তু কৃষিপণ্যমূল্যের স্থায়িত্ব বিধান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ ও বণ্টন পরিস্থিতির উপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তারের উপায় হিসেবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি এবং উপযুক্ত কর্মসূচীর অভাব অতি প্রকট। ফলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যে একচেটিয়া কারবারীদের দখল, তাদের মুনাফাখোরী কার্যকলাপ এবং পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি তৃতীয় পরিকল্পনা কালেও অব্যাহত থাকবে।

একচেটিয়া কারবারীদের লাগামছাড়া বিকাশ

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে শিল্পের সীমাবদ্ধ বিকাশ ও পরিকল্পিত লক্ষ্য পূরণে অক্ষমতার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এরও মূলে রয়েছে রাষ্ট্রীয় শিল্প বিকাশের ঘোষিত উদ্দেশ্য সত্ত্বেও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থের পরিপোষক নীতি। দেশে এমন সাতটি পরিবার রয়েছে যাদের দ্বারা সংগঠিত শিল্পের মোট মূলধন ২৮০০ কোটি টাকার মধ্যে ৭৭৬ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট মূলধনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রিত।[১২] এই সাতটি পরিবার হল— টাটা, বিড়লা, মফতলাল, মহিন্দ্র, ওয়ালচাঁদ, ডালমিয়া, ও মার্টিন বার্ন। শিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক জগতের শীর্ষস্থানীয় এই সাতটি ও অনুরূপ আরও কয়েকটি পরিবারের স্বার্থেই সরকারী শিল্প ও আর্থিক নীতি পরিচালিত।

সরকারী নীতির ফলে বেসরকারী শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত—এমনি একটি রব অবশ্য প্রায়ই একচেটিয়াপতিদের পক্ষ থেকে তোলা হয়। কিন্তু এটি যে নির্জলা মিথ্যা তার প্রমাণ বেসরকারী শিল্পে বিনিয়োগের হিড়িক। উদাহরণস্বরূপ, একমাত্র ১৯৬০ সালেই ২৮৮ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগের অধিকার সম্পন্ন ১,৬৪১টি নতুন কোম্পানী রেজিষ্ট্রি হয়েছে। এর সঙ্গে তুলনীয় পূর্ববর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে ১৬১ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগের অধিকার সম্পন্ন ১,৪৫২টি কোম্পানীর রেজিষ্ট্রি।

এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ পরিকল্পিত বিনিয়োগ লক্ষ্যের থেকে অনেক বেশি— ৭০০ কোটি টাকা বেশি। বিপরীত দিকে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ লক্ষ্যের থেকে ২০০ কোটি টাকা কম। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, এমনকি ভারী শিল্পসংক্রান্ত কিছু কিছু প্রকল্পও বাতিল করতে হয়েছে অথবা স্থগিত রাখতে হয়েছে। কি কারণে বেসরকারী ক্ষেত্রে

ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে দুই বিপরীতমুখী ধারা ? বলা হয়েছে এর কারণ লেনদেনের ব্যালান্স ও বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের সংকট। অথচ এই সংকটের মূলে রয়েছে বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজনে ঢালাও আমদানি, এমনকি অপ্রয়োজনীয় আমদানি, বিলাসপণ্যের আমদানি। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশকে খর্ব করে বেসরকারী শিল্পের লাগামছাড়া প্রসার ঘটল। তবু নাকি সরকারী নীতি বেসরকারী শিল্পের প্রতি যথেষ্ট অনুকূল নয়!

পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের অন্যতম সদস্য ডাঃ ডি. আর. গ্যাডগিল সরকারের শিল্পনীতি আলোচনা[১৩] প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে গত এক দশক বা অনুরূপ সময়ে সরকার কর্তৃক অবলম্বিত প্রতিটি ব্যবস্থাই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিকাশের সহায়ক। আধুনিক শিল্পের প্রতি সংরক্ষণব্যবস্থা, আমদানি সঙ্কোচন ও কোটা ব্যবস্থা, কোনো কোনো শিল্পে আভ্যন্তরীণ বাজারের নিশ্চয়তাদান, করসংক্রান্ত নানা সুযোগসুবিধা দান,, প্রতিষ্ঠান বিশেষে পাঁচ বৎসরের জন্য কর রেহাই (tax holiday)—এ সবই সাধারণ করদাতা ভোগকারী (consumers), এমনকি ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে একচেটিয়া পুঁজি ও কারবারের বিকাশ এবং তাদের মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের কার্যকলাপ—পাঁচ বৎসরে ১০ কোটি টাকা ঋণ—এই ক্ষেত্রের বৃহত্তম কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রধানত লাভবান। এই ক্ষেত্রের প্রধানতম কয়েকজন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি নতুন প্রতিষ্ঠানকে সরকার বিনাসুদে সাড়ে সাত কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়েছে। অথচ এই সরকারই কৃষি ও ছোট শিল্পের স্বাভাবিক কাজ-কর্মের জন্য কোনোদিন বিনাসুদে একটি টাকাও ঋণ দেয় নি।" ডাঃ গ্যাডগিল এই মন্তব্য করেছিলেন ১৯৫৫ সালে। কিন্তু তারপর এই নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। যেটুকু পরিবর্তন ঘটেছে তা হয়েছে প্রধানত একচেটিয়াপতিদের স্বার্থে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতেও এই একই নীতি অনুসৃত। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় দ্রুততর—এ ঘোষণাতে প্রতিটি দেশপ্রেমিক আনন্দিত হবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিকল্পিত প্রসারের পরও তা হবে সংগঠিত আধুনিক শিল্পের

ক্ষুদ্রতর অংশ। আর পরিকল্পিত প্রসার যে ঘটবেই তারই বা ভরসা কোথায়, বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার পর ?

তবে তৃতীয় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুতর বিষয় হল একচেটিয়াপতিদের চাপে পড়ে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির পরিবর্তন। ইতিপূর্বে যে সব শিল্প কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত ছিল তেমন অনেক শিল্পে তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারী ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয়দের প্রবেশের অবাধ সুযোগ। ইতিমধ্যেই অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক সার ও কয়লা শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে নতুন নতুন বেসরকারী সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। সিমেন্ট শিল্পের প্রতিটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃহৎ শিল্পপতিদের উদ্যোগে। ভারী ও হাল্কা এঞ্জিনিয়ারিং, ভারী রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প ইত্যাদিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পুঁজিপতিদের নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য।[১৪]

এ-সবের পরিণাম হবে শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক জগতের চূড়ামণিদের অর্থ, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অব্যাহত প্রসার। এদের কাছে সমগ্র জাতির স্বার্থ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের মূল্য বেশি। আরও মুনাফা, তাড়াতাড়ি মুনাফা, আরও আধিপত্য, আরও ক্ষমতা—এই এদের মূলমন্ত্র। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক যোগাযোগ, সমবায় আন্দোলনের বিস্তৃতি, প্রকৃত ভূমিসংস্কার, শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন ইত্যাদি প্রতিটি প্রগতিশীল ব্যবস্থা ও নীতির বিরুদ্ধে এরা খড়্গহস্ত। গ্রামাঞ্চলে জমির বড় বড় মালিক, মহাজন ও কারবারীদের সঙ্গে নানাভাবে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এরাই বিদেশী একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য উন্মুখ। শ্রমজীবী জনসাধারণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার এদের কাছে অসহ্য। ভারত সরকারের প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতির এরাই সমালোচক। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের সঙ্কোচন ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে এদের স্বাভাবিক প্রবণতা :

যতই এদের তোষণ করা হচ্ছে ততই বেড়ে চলেছে এদের দাবি ও সাহসের বহর। এরাই ক্যানভাস করছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে মিশ্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য। এরাই কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে চরম প্রতিক্রিয়ার, উগ্র দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র পার্টির প্রধান ভিত্তি। তৃতীয় পরিকল্পনার ঘোষিত

নীতি ও ব্যবস্থাগুলির ফলে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের এই যথার্থক দিকগুলিই হবে আরও প্রবল। এবং এই ধারাকে প্রতিরোধে ব্যর্থতার পরিণতি হবে বিপর্যয়কর।

স্বাগত বিদেশী মূলধন

এই বিপর্যয়ের আশঙ্কা আরও বেশি এই জন্য যে, তৃতীয় পরিকল্পনার দক্ষিণ-অভিমুখী পরিবর্তন কেবলমাত্র দেশীয় একচেটিয়াপতিদের সুযোগদানেই সীমাবদ্ধ নয়। আরও গুরুতর হল বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি সম্পর্কে পরিবর্তিত মনোভাব ও নীতি। ইতিপূর্বে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের উপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে প্রচুর সুযোগ। পরিণতিতে ১৮৪৮-৫৯—স্বাধীনতার এই এগারো বৎসরে বেসরকারী ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি, ২৫৫.৮ কোটি টাকা বেড়ে ৬১০.৭ কোটি টাকা।[১০]

অবশ্য বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোটাই সরকারী নীতি। দেশীয় মূলধন ও বিদেশী মূলধনের প্রতি সমান আচরণের প্রতিশ্রুতি, বাধ্যতামূলক জাতীয়করণের ক্ষেত্রে ন্যায্য ও পূর্ণ ক্ষতিপূরণদানের ব্যবস্থা, বিদেশে মুনাফা রপ্তানি ও মূলধন তুলে পাঠানোর উপর নতুন কোনো বিধি-নিষেধ জারী না করার নিশ্চয়তা, কর সংক্রান্ত নানা সুযোগসুবিধা ইত্যাদি সেই নীতিরই অঙ্গ। মোরারজী দেশাই-এর উদ্যোগে এই সুযোগ-সুবিধা বর্ধমান। এবারের রাজ্যেই বিশেষ বিশেষ করের হার হ্রাস ও বিদেশী টেকনিশিয়ানদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দান অর্থমন্ত্রীর বদান্যতার পরিচায়ক।

অর্থমন্ত্রীর এই বদান্যতার সুফল ফলতে বিলম্ব ঘটে নি। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে বেসরকারী ক্ষেত্রে গড়পড়তা বার্ষিক নীট বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৬.৩ কোটি টাকা। কিন্তু মোরারজী দেশাই-এর উদার নীতির দৌলতে ১৯৫৬-৫৯—এই চার বৎসরে গড়পড়তা নীট বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৩৮.২৫ কোটি টাকা।[১০]

বিদেশী একচেটিয়াপতিরা অবশ্য এতেও সন্তুষ্ট নয়। এরা ভারী-শিল্প প্রসার নীতির বিরোধিতা করেছে। একান্তই যদি ভারী-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তবে বেসরকারী পুঁজিপতিদের, এমনকি বিদেশী একচেটিয়াপতিদের অংশ-গ্রহণের আব্দার জানানো হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ও সর্বশেষ

সরকারী নীতি ঘোষণায় সে আব্দারের অন্তত অর্ধেক স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

গত ৭ই মে লোকসভায় প্রদত্ত মোরারজী দেশাই-এর বিবৃতিতে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনের অজুহাতে স্বাগত জানানো হয়েছে বিদেশী মূলধনকে। শিল্প ও কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ভারী রাসায়নিক লৌহেতর ধাতু, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ২০টি প্রধান শিল্পকে বিদেশী মূলধনের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে নমনীয় নীতি অনুসরণের অর্থাৎ আরও কনসেশনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এমনকি নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে শেয়ার মূলধনে অন্তত অর্ধেকের বেশি ভারতীয় মালিকানার শর্তটিকেও করা হয়েছে শিথিল। ফলে স্বাধীন ভারতের সংগঠিত শিল্পজগৎ বিদেশী একচেটিয়া মূলধনের প্রায় অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত।

বেসরকারী ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির এই অনুপ্রবেশের অর্থ কেবলমাত্র শোষণ ও উৎপাদনী সম্পদের নিষ্কাশন বৃদ্ধি নয়। এর অর্থ ক্রোরপতির সঙ্গে ক্রোরপতির, দেশীয় ধনকুবেরের সঙ্গে বিদেশী ধনকুবেরের জোটবন্ধন। এর পরিণতি দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়ার শক্তি প্রসার, সরকারের সীমাবদ্ধ প্রগতিশীল নীতিগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে সম্প্রতিকালের নানা কনসেশনে উৎসাহিত বিদেশী পুঁজিপতিগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই তৃতীয় পরিকল্পনার অত্যন্ত আংশিক প্রগতিশীল দিক—ভারী-শিল্পের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর। এবং এটাই ভবিষ্যৎ-এর সূচক।

পশ্চিমী অর্থনৈতিক সাহায্যের ফাঁস

এই প্রবণতাগুলিই প্রবলতর হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার দরুন। ভারত সরকারের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৯৫৫-৬০—এই ছয় বৎসরে বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচ গুণেরও বেশি, ২০০·৮ কোটি টাকা বেড়ে ১১৯৩·০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রধানতম অংশ—৭০০ কোটি টাকারও বেশি হল মার্কিন সরকার ও মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলির। বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মার্কিন সরকারের ভূমিকার পটভূমিতে এই নির্ভরশীলতা বিশেষভাবেই উদ্বেগজনক।

তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্য আবশ্যক মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ৩,২০০ কোটি টাকা অর্থাৎ পরিকল্পিত বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১,৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি।

কোন্ দেশ থেকে, কি শর্তে সংগৃহীত হবে এই বিপুল সাহায্য? আগেই বলা হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রধানত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতার ফলে বিকাশ লাভ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, প্রসারিত হয়েছে ভারী ও বুনিয়াদী শিল্প। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও অন্য কোনো দেশ থেকে সুস্পষ্ট সাহায্য ঘোষণা করার আগেই গত এপ্রিল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রতিশ্রুত হয়েছে ২৪০ কোটি টাকা।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক জগৎ থেকে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্যের জন্য প্রধানত নির্ভর করা হচ্ছে মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলির উপর। অথচ ভারতের শিল্পায়ন, ভারী-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বিকাশের বিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রকাশ্য নীতি। তদুপরি রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় বেশি সুদের হার, কম সুবিধাজনক শর্ত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা প্রভাব। দেশী-বিদেশী একচেটিয়া কারবারীদের অনুকূলে সরকারের শিল্প ও আর্থিক নীতির সম্প্রতিকালের পরিবর্তন কিংবা কিউবায় মার্কিন বোম্বেটে আক্রমণ বা পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সাহায্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর অক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রভাব ইতিমধ্যেই অনুভূত।

বিকল্প সম্ভাবনা

স্পষ্টতই ভারত আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। অতীতের অগ্রগতি বানচাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নতুন বিপদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। সরকারী নীতির আরও দক্ষিণ-মুখী পরিবর্তনের সম্ভাবনাও তৃতীয় পরিকল্পনায় নিহিত।

কিন্তু এটাই একমাত্র সম্ভাবনা নয়। ভারতে এখনও কোনো কিছু অনড়,

অনমনীয় রূপ লাভ করে নি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ও প্রগতিশীলতার উপাদান বিশেষভাবেই সক্রিয়। তীব্র বিরোধিতার মুখেও তৃতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশ, ভারী-শিল্পের প্রসার ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিস্তৃতির নীতি ও উদ্দেশ্য ঘোষণা অর্থাৎ কার্যত দেশী-বিদেশী ধনকুবের ও মার্কিন সরকারের বক্তব্য গ্রহণে মৌলিক অস্বীকৃতি শেষোক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ। এ অবস্থায় সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত হস্তক্ষেপের ফলে সরকারী নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলিকে পরাস্ত করে প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের বিকল্প সম্ভাবনাও বিদ্যমান। আর নিঃসন্দেহে এটাই হবে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশ।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। K. N. Raj—Some Features of the Economic Growth of the Last Decade, Economic Weekly Annual, 1961, পৃঃ ২৭১ ;

২। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃঃ ১২৫ ;

৩। ঐ, ১০৪ ;

৪। এ অংশটির আলোচনায় প্রধানত নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ দুটির উপর নির্ভর করা হয়েছে : Daniel Thorner—Agrarian Prospects in India ; Baudhayan Chatterji—Agricultural Labour, Enterprise and Land Reforms in India, Enquiry, Nos. 2 and 3 ;

৫। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা, পৃঃ ৯৫ ;

৬। A. M. Khusro—Economic and Social Effects of Jagirdari Abolition and Land Reforms in Hyderabad ;

৭। ঐ, পৃঃ ৯৫ ; ৮। ঐ, পৃঃ ৯৬ ;

৯। All India Rural Credit Survey, General Report, Vol. II, পৃঃ ২৭৭—৭৪ ;

১০। খসড়া রূপরেখা, পৃঃ ৯৪ ;

১১। D. R. Gadgil—Planning and Economic Policy in India, পৃঃ ১৪৫—১৪৬ ;

১২। New Age (Weekly), August 27, 1961 ;

১৩। গ্যাডগিল, ঐ, পৃঃ ৯—১০ ;

১৪। খসড়া রূপরেখা, ২২১—২২৮ ;

১৫। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, মে, ১৯৬১, পৃঃ ৬৭৪ ,

১৬। ঐ।

অন্যবিশ্ব

ননী ভৌমিক

মেয়েটির দিকে কেন চেয়েছিলাম জানি না। সম্ভবত ওর কপাল ঢেকে নামা লম্বা চুলের ঝুলুনির জন্যে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম খাচ্ছিল আর থেকে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনে পাঠাবার চেষ্টা করছিল চুলগুলোকে। ভাবছিলাম, মেয়েটিকে আগে কোথাও দেখেছি কিনা। দেখেছি কি? হয়ত বা আমাদেরই পাড়ায়?

মোট কথা চেয়েছিলাম এবং নিশ্চয় এত বেশিক্ষণ চেয়েছিলাম যে ওরও চোখ পড়ল। মেয়েরা কী করে যেন বুঝতে পারে, আশ্চর্য, নইলে আমি এত দূরে, কী করে টের পেলে কেউ তাকিয়ে আছে?

ঘাড় ঝাঁকিয়ে কপালের চুলগুলো চোখের ওপর থেকে সরাবার চেষ্টা করে দেখতে পেল আমায়। দেখে হেসে ফেলল।

আমিও হেসে ফেললাম। এবং যেহেতু আমি হেসেই ফেলেছি, তাই কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, এই মেয়ে, হাসলে যে?

ছড়া কেটে ও যা উত্তর দিলে তার মানে, আমার খুশি।

তোমায় কি আমি কখনো দেখেছি?

বোধ হয় না।

আমায় কি তুমি কখনো আগে দেখেছ?

সত্যি কথা বলব ? কখনো দেখি নি।

এবার আমরা দুজনেই একসঙ্গে চোখ নাচিয়ে দুষ্টুর মতো হাসলাম। তারপর ও নিজের ডাকনামটা জানালে, আমি আমারটা। নাম জেনে নিয়ে ভাব করে নিলাম আমরা।

স্লট মেশিনে একটা খুচরো ফেলে এক গ্লাস আপেল-গন্ধী মিষ্টি জল পাওয়া গেল। বললাম, তুমি তো রাক্ষুসী, নিশ্চয় আরো কিছু আইসক্রীম খেতে চাইবে, তাই না ?

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ও একটু মিছিমিছি রাগ করুক। ও মিছিমিছি রাগ করে বললে, খাবই তো! আমি আরো দুটো আইক্রীম খাব, এই দ্যাখ।

এই বলে আরো দুটো আইসক্রীম নিলে ও। আইসক্রীম খেতে খেতে মিছিমিছি করে মুখটাতে ও এমন মিষ্টি মিষ্টি ভাব ফোটালে যেন আমি আপেল-জল খেয়ে ভারি ঠকেছি।

আমি তাই একটা সিগারেট ধরিয়ে আড়িআড়ি ভাব করলাম। ও একটা আইক্রীম আমায় দিয়ে ফের ভাব করে নিলে।

কেননা তখন চারিদিকটা এত সুন্দর যে ভাব করাই উচিত। নববর্ষে যে তুলতুলে-গাল বুড়োটা চুপিচুপি এসে ফারগাছে উপহার ঝুলিয়ে যায়, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেই শীতবাবাজীর তুলো তুলো দাড়ির মতো সাদা বরফে চারিদিকটা অন্যরকম হয়েছিল। বসন্তে সব গলে গেলেও সেই অন্য রকমটা যেন থেকেই যাচ্ছিল। তারপর দ্যাখ, এখন ছুটোপুটি করে ফুটে উঠছে ডাল পাতা কুঁড়ি। মস্ত এক শিশু শিল্পী যেন ভাসন্ত, রঙ-অন্ত, এবং সমগ্র করে এঁকেছে গোটা দৃশ্যটা : মোড়ের স্লট মেসিনগুলো তিন-থাকি রাস্তার মাঝের থাকে বাস, ট্রলি বাস, কারের কাচ। নীল চেকনাই প্রথম থাকের পাশে রাস্তার সঙ্গে সমানে লম্বা। বিজিবিজি সবুজ বাগানটায় বই হাতে বুড়োবুড়ি আর প্যারাম্বুলেটরের পাশে মা, আর ঝোপের পেছনে আচমকা আদুল গা কচি-কাচাদের খিলখিল হাসি, ঝগড়া, ভাব। উঁচু উঁচু বাড়ির সারি সারি চৌকো জানলাগুলো যেন বা গুনে গুনে বসানো। পাঁচতলার একটি মেয়ে জানলার বাজুতে দাঁড়িয়ে একমনে শার্সির কাচ পরিষ্কার করে রাখছে গ্রীষ্মের জন্য। কাজের ফাঁকে তার গুনগুনটুকু ব্যালকনির ফুলের টবে খুনশুটি করে রুপোর পেনসিলের মতো লম্বা লম্বা লাইটপোস্টগুলোর গা।

জড়িয়ে জড়িয়ে অলক্ষ্যে নেমে কেমন একটা অকারণ কার্নিভালের মুঠো মুঠো রঙীন বেলুনের মতো উঠে যাচ্ছে গ্রীষ্মের আকাশে। সে আকাশের আসমানি আর আলতা খুলে খুলে খুলেও দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অফুরন্ত এলানো।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছিলে ?

কোথাও না। এমনি। তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে গেলাম আজ কারখানায় —বলতে বলতে তরতরিয়ে ছুটে গেল একটু। আইসক্রীমের মোড়কটা ডাস্টবিনে ফেলে এসে আমায় শাসালে, ঠিক জানতাম সিগারেটের টুকরোটা তুমি রাস্তায় ফেলবে। এমন সুন্দর দিনটাকে নোংরা করতে লজ্জা হয় না তোমার।

লজ্জা হত না, ওর কথা শুনে হল। তাই বললাম, বা লজ্জা হবে কেন ?

ও বুঝলে আমার লজ্জা হয়েছে, তাই বললে, শোনো বরং রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাক।

আমি হাঁটব তোমার সঙ্গে ?

আসতে পার, যদি তোমার খুশি হয়।

আমারও কাজ ছিল না। আপিসের কর্তব্যটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। তাছাড়া গরমের বেলা। 'মরাল-সরোবরে'র গোটা স্টেজ চক্র দিয়ে আসা মরালীর মতো প্রায় গোটা চক্রবাল প্রদক্ষিণ করে এসে তবে মরণে ঢলবে সূর্য।

ইস যাঃ, একটুর জন্যে হল না।

কী হল না ?

নম্বর মিলল না। আমি হাঁটলেই কারগুলোর পেছনকার নম্বর দেখি। যেমন ধরো ঐ যেটা গেল ৩৬-৫৮, মিলল না ; ৩, ৬ এর যোগ ৯ ; ৫, ৮-এর যোগ ১৩, তাই হল না। দু পাশেই যদি যোগ দিয়ে একই হয়, তবেই। যেমন এদিকে ৩৬ ওদিকেও যদি ৩৬ কি ৭২ কি ৪৫ থাকত তাহলে হত।

তাহলে কী হত ?'

কী হত ? ও ফিক করে হেসে বললে, তাহলে মনে মনে যা ভাবছি তা পূর্ণ হয়ে যেত।

সে একটা কথা। আজ সকাল থেকে ভাবছি হবে কি হবে না। তারপর ভাবলাম, আচ্ছা গাড়ির নম্বর দেখব, যদি মেলে। কিন্তু কী কথা সে তোমায় বলব না কিন্তু, না কিছুতেই না, দুনিয়ার জন্যেও না।

কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর নাকি নম্বর মিললেই হয়ে যাবে ?

সারি সারি চলন্ত গাড়িগুলোর অপস্রিয়মান নাম্বার প্লেট থেকে চোখ না সরিয়েই বললে, ইচ্ছে হলে করি, ইচ্ছে হলে করি না। আজকে ইচ্ছে হয়েছে করছি। আমি ঠিক জানি, যদি মিলে যায় তাহলে হবেই হবে।

আমিও নম্বর দেখতে লাগলাম। কিন্তু মনে হল দুপাশের যোগফল মেলা বিশেষ সহজ হবে না। তাই বললাম, তার চেয়ে টস্ করি। এতে সহজে বোঝা যাবে।

'না—না—না। ও আমি জানি। ও আমি বিশ্বাস করি না।

কেন ?

কেন আবার কি, আমার খুশি। একটা ভালো জিনিস হোক, সে তো সবাই চায়, চায় না ? তুমি চাও না ? সবাই আমরা চাই, তারপর ভাবি হবে, হবে—আচ্ছা শোন—ভালো কথা—

কথা শেষ না করে ও প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল।

শোন, আমি বলি কি, বনে যাবে ? চমৎকার দিন কিন্তু।

কিন্তু কথা শেষ করলে না যে। আমরা সবাই ভাবি হবে, হবে,··· তারপর ?

ও ফের মাথা ঝাঁকিয়ে কপালের ঝোড়ো চুলগুলো সরালে। বললে, তারপর আবার কি ? যা ভাবি তা হয়ে যাবে। কিন্তু শোন বনে যাওয়া যাক আজ, গোধূলির এখনো অনেক দেরি।

মানে বনে, কোন্ বনে, কোথা থেকে—

আ রে ছেলে! বাস চলছে ? চলছে। টিকিটের পয়সা আছে ? আছে। ইচ্ছে আছে ? আছে।' তবে ?

তাই রাস্তার ওপরকার একটা খোলা হাওয়ার দোকানে দাঁড়ালাম। প্যাকিং বাক্স থেকে বার করে দোকানী মেয়েটা টেবলের 'ওপর সাজিয়ে রেখেছে নতুন গ্রীষ্মের সব্জি—টমাটো, শসা, পেঁয়াজকলি, মুলো, স্যালাড পাতা। সমুদ্র থেকে সদ্য ওঠা রাশি রাশি সূর্যের মতো টসটসে লাল টমাটো ; সতেজ, সটান, অবাক একদল কিশোর আদিবাসীর মতো সবুজ সবুজ পেঁয়াজকলি। মনে হয় খাই। শিশুদের মতো করে খাই, খাই আর হিহি করে হাসি আর খেতে খেতে পেটটা ঢোল হয়ে যাক।

টমাটো শসা মুলো পেঁয়াজকলির একটা ভরন্ত প্যাকেট করে ও ছুটল

রুটির দোকানে, আমি খাবারের। সদ্য সেঁকা রুটির ঝলমলে মদির খানিকটা গন্ধ জড়িয়ে ও যখন ফিরল তখন ওর দু গালে ডাঁশা আপেলের মতো ছোপ ছোপ লাল ধরেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, মিষ্টি না শুকনো ?

শুকনো নয়তো কি ?

শুকনো হালকা, কমলা রঙের একটা মদ নিয়ে সব চাপালাম ওর হাত-ব্যাগটার মধ্যে। এমন ঢোলঢোল হয়ে গেল হাত-ব্যাগটা যে আমাদের দুজনেরই ভারি হাসি পেল। বেশ শব্দ করে আমরা হেসে উঠলাম, আর কেউ অবাক হয়ে চাইল না। যেন সবাই জানে, ক্রেন, পাইপ, টেলিভিশন দণ্ডের মিহি মোটা নানান রঙ-পেনসিলে আঁকা এই অসমাপ্ত শহরের এখান ওখান থেকে হাসি তো ঝরবেই।

পেটমোটা মেয়েলী ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এবার ?

এবার ওই বাসস্টপ, সামনে। এস তাড়াতাড়ি।

বলে ও ছুটলে। ছুটতে ছুটতে মাথা ঝাঁকালে কপালের চুল সরাতে। পেছনে আমিও ছুটলাম। না ছুটলেও হত, কিন্তু ছুটতেও ভালোই লাগছিল আশ্চর্য! ফুটপাথে নানা লোকের পাশ কাটিয়ে সোমত্ত ছেলেমেয়ে ছুটে গেলেও ভালোই লাগে তাহলে। তাই ছুটতে ছুটতে আমরা গিয়ে পৌছলাম বাসস্টপে, হাসতে হাসতে।

বাসে উঠে ও বললে, বেশ ভালো হল তুমি আছ, তাই না ?

তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু কেন বল তো ?

মানে একলা ঘুরতে হবে না। একলা ঘুরে কি আনন্দ হয় কথনো। সবাই বলবে, ওমা, মেয়েটা একলা একলা ঘুরছে, সঙ্গে একটি ছেলেও নেই। নয় লোকের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু মানুষ কথনো একলাতে সুখ পায় ? বল ?

তাই আমরা বাসে উঠে টিকিট কেটেছি সেই স্টপের জন্যে, যার নাম সুখ।

ভিড়ের মধ্যে বাসের হৃষ্টপুষ্ট বুড়ী কনডাকটরটা যেন পুশকিনের ধাই-মা। গল্পের তার আর শেষ নেই, অথচ টিকিট কাটছে, রসিকতা করছে, এক-একটা স্টপে থেমে স্টপের নাম বলছে আর বলছে সেই জায়গায় সদ্য ঘটা এক একটা গল্প, যা এ পথের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের আগেই জানা, তবু সবাই হেসে খুন হচ্ছে ওর বলার ঢঙে। আমাদের নামবার স্টপটায় নামিয়ে দিয়ে বললে, যদি বন

চাও তাহলে ডানদিকে যেয়ো মেয়ে, যদি নদী চাও তো বাঁদিকে। আর তোমায় বলি ছেলে, ভালো করে মেয়ের হাত ধরে রেখো কিন্তু, বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ো না।

হাসি আর বাস আর যাদুকরের কালো দণ্ডের মতো লম্বা রাস্তাটাকে পেছনে ফেলে আমরা ঢুকলাম ডান দিকের বনে।

ঢুকেই তর্ক করলাম আমরা, ঠিক কোন পথে যাব, ঠিক কোন পথে গেলে সবচেয়ে ভালো সেই জায়গাটা পাওয়া যাবে যেখানে কেউ কখনো যায় নি।

তর্ক করে ও যা বললে আমি বললাম, না, আর আমি যা বললাম, ও বলল, না। তারপর দুজনেই এমন এক দিকে যেতে লাগলাম যা কেউ স্থির করি নি। তাই যেতে যেতে ও জিজ্ঞেস করলে, দিক মনে আছে তো? বললাম, না। তোমার? না, ওরও নেই।

হারিয়ে যাবার মানা নেই কোথাও। বনে বনে।

তারপর এলোমেলো ঝোপঝাপ পাইন ফারগুলো পেরিয়েই ও চেঁচিয়ে উঠল, এই ছাখ, দেখেছ! কী, আমি বলি নি?

সত্যি, কাঁটা ফারের ঝোপটা পেরতেই রুপোলী বার্চের কী সুন্দর একটা হালকা লুকোচুরি বন। খানিকটা জায়গা ফাঁকা—লম্বা বুনো ঘাসে ঢেউ খেলানো। আর ঘাসের মাথা ছাড়িয়ে লম্বা ডাঁটায় রাশি রাশি সাদা সাদা ফুল। কিণ্ডারগার্টেনী ড্রইংবুকের পাতা থেকে মাথায় মস্ত সাদা বো বাঁধা সেই টিংটিঙে মেয়েটা যেন চুপিসাড়ে পালিয়ে এসে অনেকগুলো মেয়ে হয়ে খেলা জমিয়েছে আড়ালে।

কী, আমি বলি নি এদিকে চল, ও ততক্ষণে ছুটে গিয়ে বোকে সাজাতে শুরু করেছে।

বা, তুমি কোথায়? আমিই তো বললাম এদিকে এস।

এই নিয়ে আমরা মিছিমিছি তর্ক চালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এত ফুল। এত ফুল। আমায় যেন ও ভুলেই গেল।

হিংসেয় আমিও অন্য কিছু খুঁজতে লাগলাম। সাদা ফুলগুলো ছাড়া অন্য কিছু। এবং উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম, এই ছাখ দেখেছ?

অনেক অনেক দূর থেকে ও একবার মুখ তুললে। অনেক অনেক দূর থেকে ভেসে এল ওর 'কী-ই-ই?'

বেরি। কী গন্ধ! কী স্বাদ! সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের ঠোঁটও এর কাছে লাগে না।

আচ্ছা—া—া, ভেসে এল দূর থেকে। বনে বনে।

আমি ওকে ছেড়ে হাঁটতে লাগলাম আপন মনে। মাটিতে চোখ রেখে। পাতার আড়ালে কোথায় লাল হয়ে পেকে উঠেছে বুনো স্ট্রবেরি। তারপর হাতে এক গোছা ফুল নিয়ে পেছন থেকে ঝুপ করে এসে হাজির হল একসময়। আমি জানতাম, আসছে, তাই মিছিমিছি ভাব করেছিলাম যেন জানি না। ও জানত, আমি টের পেয়েছি। তাই মিছিমিছি ভাব করল যেন আমি টের পাই নি।

বললে, কী ফুল বল তো।

জানি না; কী ফুল?

ল্যবিত-নি ল্যবিত রোমুশকা! ভালো বাসে কি বাসে না রোমুশকা! তুমি জানতে চাও, কেউ তোমায় ভালো বাসে কি না?

জানতে চাই না।

তাহলে আমি আমারটা জেনে নেব। দেখবে?

একটা শতদল সাদা নয়নতারার মতো দেখতে ফুলটা। এক একটা দল ও গুনতে লাগল গুনগুন করে: ল্যবিত-নি ল্যবিত, ভালো বাসে, বাসে না, বাসে বাসে না ·····এমনি করে গুনে গুনে শেষ দলটি শেষ হবে যে কোথায় সেইটেই উত্তর।

গুনতে গুনতে শেষ দল আসার বেশ আগেই থেমে গেল ও। না বাবা। যদি না-বাসে উত্তর হয়। না গোনাই ভালো। তাই না?

কিন্তু লোকটা কে? জিজ্ঞেস করলাম দুষ্টুমি করে। দুষ্টুমি আর হিংসে করে।

ও না। কিছুতেই না। সে কথা তোমায় বলব না—

সকালেই তো বলে দিয়েছি—সেই যখন গাড়ির নম্বর দেখছিলাম—সে কথা কাউকে না।

রোমুশকার গোছাটা নিয়ে ও তরতরিয়ে এগিয়ে গেল আপন মনে। তারপর এমনভাবে 'ঈস, দেখেছ!' বলে উঠল যেন সাপের মাথার মানিক দেখেছে ও।

কী হল?

নি জাবুৎকি, জানো ? ভুলো-না-আমায় ফুল।

ছোট ছোট প্রায় অলক্ষ্য, ভীরু, নরম নীলাভ যে ফুলগুলোর ডাঁটি ও সন্তর্পণে ভাঙলে, তাতে যেন মেপে মেপে এক এক বিন্দু আকাশ ঢেলে রেখেছে কেউ। খুশিতে ও বুড়ো আঙুলের ওপর পাক খেয়ে স্কার্ট উড়িয়ে যেন ভেসে এল আমার কাছে। তারপর ছোট একটু চুমু দিয়েই ফের আলগোছে ফিরে গেল ঘাসফুলগুলোর কাছে।

কলোকোলচকি, ঘণ্টিফুল !

উপুড় করা ছোট ছোট ঘণ্টার মতো বেগুনী কতকগুলো ঘাস ফুলও ও যোগাড় করলে তোড়ার জন্যে। তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে খুঁজতে লাগলাম ব্যাঙের ছাতা। খুঁজতে খুঁজতে আপন মনে এটা-ওটা গাইছিল ও। খুশিতে। বনে বনে।

হলুদ হলুদ এক মুঠো ব্যাঙের ছাতা আমার কাগজের ঠোঙাটায় জমা দিয়ে বললে, আচ্ছা তোমায় বলব। তোমার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না, কিন্তু এখন না কেমন ?

বনের কোন পাশ থেকে যেন লোকজনের কথা ভেসে আসছিল আবছা। তার মানে বনটা বোধহয় ওদিকে শেষ হয়ে এসেছে। কিংবা গ্রীষ্মযাপকদের কোনো একটা দল ওদিকে ঠাঁই নিয়েছে। তাই আমরা ফিরলাম। আমাদেরও ঠাঁই চাই যেখানে আমাদের যত আড়ি যত ভাব হোক কারো কানে যাবে না। মাথায় খবরের কাগজের টুপি পরে খালি গায়ে রোদ পোয়াচ্ছিল এক বুড়ো। সে বললে, কী পেলে গো মেয়ে, শুধুই ফুল ? আমরা গর্ব করে দেখালাম, এই ছাখ কত বেরি, কত ব্যাঙের ছাতা।

একটু ফাঁকা মতো জায়গায় বার্চগাছের গুড়ির কাছে বোঝা নামালাম আমি। বললাম, এইখানে বসি। ও বললে, না। আর একটু হাঁটিয়ে আর এক গুঁড়ির কাছে থামল ও। এইখানে ? আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, আগের জায়গাটা অনেক ভালো ছিল। তাই তৃতীয় যে জায়গাটা ওরও বিশেষ পছন্দ হল না, আমারও নয়, সেইখানে ডেরা পাতা গেল।

খবরের কাগজ বিছিয়ে গেরস্থালি নিয়ে বসল ও। বললে, যা ভেবেছিলাম। তুমি আস্ত একটি তালকানা। একটা ছুরিও আনো নি, একটা গেলাসও না। কী হবে ?

টম্যাটো, শসা গোটা গোটা কামড়ে কামড়ে খাব, রুটিটা ছিঁড়ে সসেজটা টুকরো কাঠের চটায় কেটে আর বোতলটা—

কর্ক-স্ক্রু না থাকায় কর্ক সমেত বোতলের মুখটা নির্বিঘ্নে ভেঙে ফেলা গেল ঠুকে ঠুকে।

গেলাশ নেই। ভাঙা মুখ বোতলটা থেকেই একবার ও খাবে, একবার আমি।

সমস্ত বনটা ভরে উঠল ভোজনে। সমস্ত বনটা মৌ-মৌ করে উঠল মদিরায়। বিছানো খবরের কাগজের ওপর ছেঁড়া রুটি, নিটোল টম্যাটো, নোড়া নোড়া শসা, শ্যামল পেঁয়াজকলি আর বেপরোয়া বোতলটার গাঢ়তা, ঘনতা, স্বাদ যেন কোনো পিকাসোর সামনে সাজানো।

আমরা খেলাম, আর খেলাম, আর হি হি করে হাসলাম। কী দেখে, না ভাঙা বোতলটা দেখে।

কী দেখে, না দুজন দুজনকে দেখে।

আর অবাক হয়ে গেলাম আমরা। সত্যি, কী সুন্দর যে জায়গাটা, তা আমরা আগে লক্ষ্যই করি নি, আশ্চর্য! ঘাসে ঢাকা গড়ানে একটা জায়গায় লুটোপুটি খাচ্ছে রোদ—রোদ নয় যেন সোনার পাখাওয়ালা এক ভিনদেশী তরুণ জটায়ু আড়িমুড়ি ভাঙছে, ডানা ছড়িয়ে দিচ্ছে, সোনার ঠোঁট গুঁজছে পালকে। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একদল ফার আর বার্চ। দীর্ঘ কৃষ্ণ রোমশ কঠোর ফার গাছগুলো যেন কোনো পুরাণের সর্বনেশে অসুর। সুঠাম, তন্বী, রুপোলী বার্চেরা যেন চন্দনে সাজানো দেবকন্যা। এক হাতে এক একটি বার্চ মেয়েকে হরণ করে অন্য হাতে লড়তে লড়তে কৃষ্ণকঠোর ফার গাছগুলো যেন যোজন পথ ছুটে এসে এইমাত্র কাঁধের বোঝা নামাল। কাঁধ থেকে নেমে ভীরু বার্চ মেয়েরা ধীরে ধীরে চোখ তুলে চেয়েছে। তাদের অপহারকদের দিকে। আর অবাক হয়ে গেছে দুদলই। কৃষ্ণ কর্কশ অপরিচিত এ পুরুষ দেখি আশ্চর্য শ্যামল! তন্বী শুভ্রা এ শত্রুকন্যা দেখি তারই বুকের কাছে মাথা তুলে আত্মদানে নির্বাক! গোটা বনভূমি জুড়ে জোড়ায় জোড়ায় ফার-বার্চগুলো এক্ষুনি নেচে ওঠার আগে এক মুহূর্ত তাকিয়ে আছে এ ওর চোখে। আর ঘাসে ঢাকা জায়গাটায় আলস্যে কেলি করছে রোদ—রোদ নয়, সোনার পাখা-মেলা অন্য এক জটায়ু।

ও বললে, বলব ? সকালে গাড়ির নম্বরের জোড় মেলাচ্ছিলাম কী কথা ভেবে ? শুনবে ?

বা, শুনব বই কি।

শোন, নাম তার···থাকগে, নাম নিয়ে কী হবে। সে আমায় ভা—লো—বা—সে—কী না।

আর তুমি ভালোবাসো ?

ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু ওর তো বৌ আছে। তাই।

তাই মানে ?

তাই ও-ও যদি আমায় ভালোবাসে, তাহলে সব ঠিক হয়ে যায়।

সব ঠিক হয়ে যায়, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবি হবে হবে, তারপর সত্যি একদিন হয়ে যাবে। যাবেই তো।

আর অবাক হয়ে আমরা চোখ মেলে রইলাম জোড়া জোড়া ফার-বার্চগুলোর দিকে। তখন নাচ শুরু হবে। ঘাসে লুটোপুটি রোদ।

ও বললে, কী চমৎকার রোদ না ? আমি কিন্তু রোদ পোয়াবো। তার সঠিক পোশাক আনি নি, কিন্তু তাতে তুমি কিছু মনে করবে না তো।

ও সরে গেল রোদের দিকে, অল্প একটু ঝোপের মতো আড়ালে। সেখানে তার ফ্রকটা ছেড়ে রাখলে। অনাবৃত শুয়ে রইল রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে।

তার আগে অবিশ্যি একজন আমায় সত্যি ভালোবেসেছিল, ও বললে শুয়ে শুয়ে, আলস্যে।

আমিও শার্ট ট্রাউজার খুলে শুয়ে ছিলাম এপাশে। জিজ্ঞেস করলাম, আর তুমি ?

আমি ? আমিও। সকাল সন্ধ্যা কেবলি ওর কথা। মা বলত তুই-এত ভাবিস, আশ্চর্য। আমি বলতাম, আমার যে আর কিছুই মনে হয় না মা। কাজটা করি, তোমায় বলেছি ইলেকট্রনিক কম্পটোমিটার মেরামতির কাজে আছি আমরা ? কাজটা শেষ করি আর ভাবি কখন যাব ওর কাছে। মা বললে যাক বাঁচা গেল, তোরা যদি বিয়ে করিস, তাহলে নয় এ ঘরটা তোদের দিয়ে আমি চলে যাব আলোয়শার ওখানে। মা-ও আলোয়শাকে বিয়ে করবে কিনা। তাই আমরা বললাম তুমি নয় আগেই বিয়ে করে নাও মা, আমরা পরে। আর সারা দিন সারা দিন কত যে ভাবতাম পেটেরটার কথা। মা এসব তো ভালো জানে। বলেছিল, ছেলে হবে দেখিস। তারপর

আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ভারি রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম চাই না ওকে, ওর ছেলেও চাই না। মা বললে, বেশ তুই যদি অতই না চাস, তাহলে যা ডাক্তারের কাছে। ভারি কষ্ট জান। অত কষ্ট জানলে আমি যেতাম না।...ছেলেটা এতদিনে তাহলে বছর খানেকের মতো বড়ো হয়ে যেত।...

গল্পের মধ্যে আমি সরে এসেছিলাম ওর কাছে। তাই থেকে থেকে কনুইয়ে ভর দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইতে হচ্ছিল না ওকে। কিন্তু গল্প শুনছিলাম না আমি। মাটিতে বুক দিয়ে ও শুয়েছিল। ওর অনাবৃত সোনা-সোনা পিঠখানার ওপর আপন মনে আঙুল দিয়ে নক্সা এঁকে যাচ্ছিলাম আমি। ওর কথা কিছুই শুনছিলাম না, কেননা জ্বালা জ্বালা করছিল। কেননা এক দুই তিন চার পাঁচটা ছেলেকে ভালোবেসেছে, হয়তো বাসছে, বেসেও যাবে পাঁচ ছয় সাত আটটা ছেলেকে। শুয়েছে, অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, ডাক্তারের কাছে গেছে। অথচ, অথচ যে কী সেইটে বুঝতে পারছিলাম না বলেই বোধহয় জ্বালা।

গোটা বনটা কেমন জুয়াচুরি বলে মনে হতে লাগল আমার। জটাজুট পাইনগুলোকে লাগল যেন ট্রেনের কামরায় মাঝরাতে ঠেলে-ওঠা বিনা-টিকিটের সাধু। বেলা থেকে বেলায় সরে-যাওয়া রোদটা যেন ফুটপাথে লেপটে যাওয়া একটা পচা ডিমের কুসুম। আর ওই মেয়েটাকে? মেয়েটাকে যে কী লাগছে সেইটে বুঝতে পারছিলাম না বলেই বোধহয় অত জ্বালা।

যেন এক পলিমারে বানানো আপেল-বাগান, তাই মধুর চাক বাঁধে নি। নাইলনের পাতে তৈরি ফুল—ভুল করে উড়ে-আসা প্রজাপতিগুলোকে কে যেন একটির পর একটি খুন করে রেখে গেছে। কে যেন গুনগুন করে গান গাইবে, কিন্তু হুকুম হয়েছে তা শুনতে হবে কানে একটা ভাঙা টেলিফোন তুলে। এবং তাছাড়া আর যে কী তা বুঝতে পারছিলাম না বলেই বোধ হয় অত জ্বালা।

তুমি আমায় মেরে ফেললে যে, ও ককিয়ে উঠল।

আঙুলগুলোকে ওর পিঠের মাংসের মধ্যে আরো বিঁধিয়ে আরো আরো বিষিয়ে কর্কশ গলায় বলে উঠলাম, অথচ আমি ভেবেছিলাম—

কী ভেবেছিলে তুমি?

ভেবেছিলাম তুমি কুমারী।

কুমারীই তো। ও বললে অবাক হয়ে, বনদেবীর মতো ধীরে ধীরে ওর অপূর্ব দেহটাকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে, কাঁধ বুক থুতনির একটা উদ্ধত সুন্দর ভঙ্গি করে :

আমি কুমারী। আমি জানি আমি কুমারী।

সন্ধের সময় আমরা ফিরেছিলাম। আমাদের কাছে পেনসিল ছিল না। একটা রুবলের নোটের ওপর ও তাই ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে ওর ঠিকানাটা লিখে দিলে লিপস্টিক দিয়ে। বললে, তোমাকে তো আমি ভালো বাসি না, না? কিন্তু মাঝে মাঝে, হয়তো কাল সকালে তোমার কথা ভেবে কান্না পাবে, কেন বল তো? কেন বল না! ওর গলার স্বরে বুঝলাম, কাল সকালে নয়, তখুনি কাঁদছে ও। ও যে রোমুশকার তোড়াটা বুকের কাছে ধরে রেখেছে, তাতে জল পড়েছে কয়েক ফোটা। কিন্তু বাস আমাদের এসে পড়েছে। অন্ধকার পটে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে শহরের আলো। যেন এক গাঢ় নীল বোখারা গালিচার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে একটা এলোমেলো সাতনরী ছেঁড়া জড়োয়া। আর গালে হাত রেখে একটি পরী মেয়ে ভাবছে, কী নক্সায় তা গেঁথে তুলবে।

ওর সঙ্গে অবিশ্যি আর কখনো দেখা হয় নি, কিন্তু কেন বললে ও কুমারী?

দাহন বেলা

দেবেশ রায়
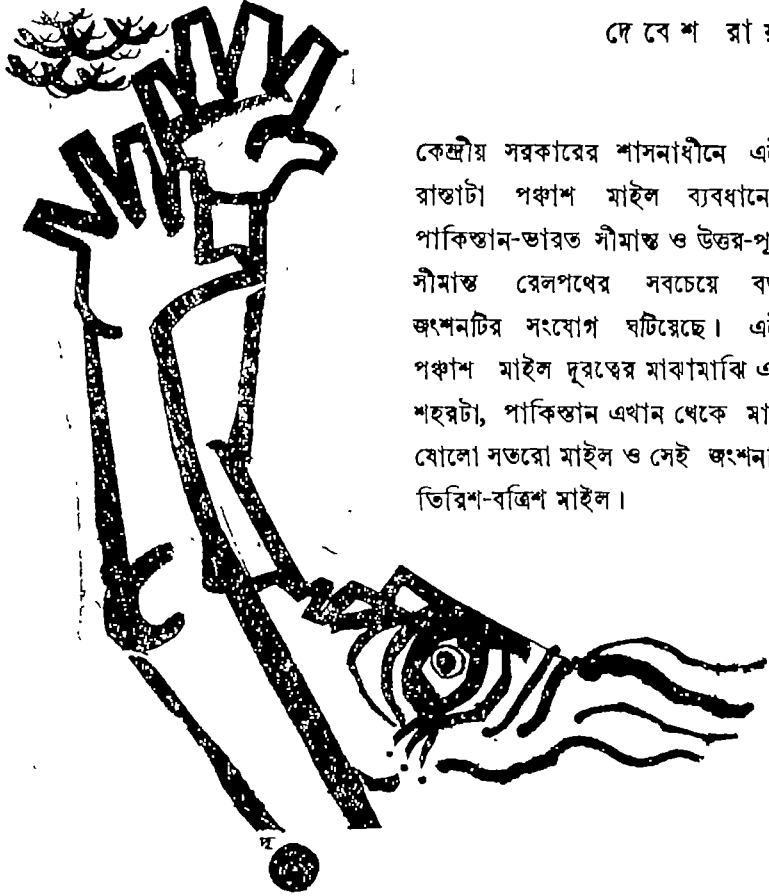
কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে এই রাস্তাটা পঞ্চাশ মাইল ব্যবধানের পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সবচেয়ে বড় জংশনটির সংযোগ ঘটিয়েছে। এই পঞ্চাশ মাইল দূরত্বের মাঝামাঝি এই শহরটা, পাকিস্তান এখান থেকে মাত্র ষোলো সতরো মাইল ও সেই জংশনটি তিরিশ-বত্রিশ মাইল।

বর্তমানে মাইলকে কিলোমিটারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবু সেই পুরনো 'মাইল'-ই দূরত্বের মাপ হয়ে আছে। অনেকে আবার কিলোমিটারকে মাইলে পরিণত করে নিয়ে শান্তি পান। তবে যেন দূরত্বটা বোঝা যায়।

এটি একটি ছোট মিউনিসিপ্যাল শহর। রাস্তায় রাস্তায় কল আছে। পথে পথে আলো আছে। বিজলি আলো। একাদশীর দিন থেকে সেগুলো জ্বালানো হয় না। ময়লা-টানা গাড়ি আছে। বেলা বারোটায় দুর্গন্ধ ছড়াতে

ছড়াতে সেগুলি শহরের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তিনটি সিনেমা হল আছে। সুতরাং ছোট হলেও, মিউনিসিপ্যাল হলেও, এটা যে শহর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

শহরের মাঝখান দিয়ে সোজা চলে যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সেই পথটি যেখানে রেললাইন টপকেছে, সেখানেই রেলপথের পাশাপাশি পূর্বদিকে একটি পথ চলে গেছে স্টেশন পর্যন্ত। সেই পুবমুখো রাস্তাটা সন্ধ্যেবেলায় এমন শোভা ধারণ করে যেন, কোনো-এক-কালে গাঁয়ে যে সার্কাস কোম্পানি এসেছিল তারা কাশবনের মধ্য দিয়ে সুড়কির পথটা বানিয়েছিল, অধুনা সূর্যাস্তের পরে সেখানে ধ্বংসস্তূপের (ধরা যাক মহেঞ্জোদারো) অন্তর্বর্তী পথের বৈরাগ্য স্তরে-স্তরে জমে এবং পথিক যেই হোক না কেন, নিশ্চিতভাবে তাকে উদাসীন দেখাবেই। পথ এবড়োখেবড়ো, দুই জায়গায় দুই জনহীন গুমটি, এক জায়গায় কিছু দোকানপাটে জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলন্ত, দৈনিক সংবাদপত্র মৃত-পাখির মতো মুখ থুবড়ে পড়ে এবং সারাটা পথ জুড়ে, ডানহাতি, নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর বনহারা বনস্পতি। সাধারণভাবে তাদের চূড়ায় পথিকের দৃষ্টি পড়ে না, কিন্তু তৎতলবর্তী গাঢ়তা ও ছায়া পরোক্ষভাবে ঘনপত্রাচ্ছন্ন চূড়া সম্বন্ধে সচেতন করে। ঐ গাছগুলির মাথায় শকুনের বাসা। সিগন্যালে কেমন একটা অপেক্ষার ভাব, গাঁয়ের বুড়ীরা যেমন বেলা ঠাহর করার জন্য ট্রেনের বাঁশির অপেক্ষায়। অপরাহ্নকালে ঘরমুখো পাখিদের ডাক এখানেও শোনা যায়, কিঞ্চিৎ বেশিই, কিন্তু আকাশ-ঠেকিয়ে দেয়া গাছের মাথাগুলির জন্যই হোক কিংবা বাঁহাতি নিচু জোলো পতিত জমির জন্যই হোক—মনে হয় পাখিগুলি দূরে কোথায় ডাকছে।

সেই যুবকের নাম কি, যে সকাল পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করে, পেট পরিষ্কার রাখার জন্য চিরতার জল পান করে, আশ্বিনের প্রথম থেকেই জামার নিচে গোপনে সোয়েটার পরে, কার্তিকমাসের প্রথমেই প্রকাশ্যভাবে চাদর গায়ে দেয়, একটু কাশলে ডাক্তার দেখায়, আফিসে টিফিনে কাঁচকলা সেদ্ধ খায়? ধরা যাক্ তার নাম সুবীর। সুবীর শরীর সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ কেননা সে শরীর সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। প্রায় সন্ধ্যার এই শহরটার সঙ্গে—সিদ্ধির নেশাগ্রস্ত প্রায় সন্ধ্যার এই শহরটার সঙ্গে হুড়োহুড়ি না করে রেলওয়ের ঐ রাস্তাটিতে এসে পৌছায়। ও অতঃপর ইস্টেশনে গিয়ে সেখানে এক ঘণ্টা বসে থেকে, সাতটার ট্রেন (এই একটি ট্রেন এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরের

সেই জংশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরায়) চলে যাওয়া দেখে, আবার ফিরে এসে···। এহেন একটি সন্ত প্রকৃতির যুবক পূর্বোক্ত পথটিতে পথিক। সংসার-অভিজ্ঞ ষাট বৎসরের বুড়ীর মতো সে অনায়াসে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যায় ইস্টিশনে।

সেথা পৌঁছে গেলেই আকস্মিকতার আঘাতে বিস্মৃত-উদ্দেশ্য ভাব আক্রমণ করে। যে উদ্দেশ্যে যাত্রা, সেই উদ্দেশ্যকেই যদি পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা মনে হয়—খেটে-খুটে ষোল আনা আদায়ের আনন্দ কোনোদিনই লাভ করা যায় না। লোহা-আলো-মানুষে গমগম, মাথার ওপরে দুই পাখা বিস্তার করে রাত্রিকে রুখে দেয়া শেড আর তারই নিচে সাদা আলোর বন্যা। সুবীর-নামা সেই যুবা সকলের মধ্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে, নোংরা বাঁচিয়ে, এক গাছের বাঁধান গুঁড়িতে এমনভাবে এলিয়ে বসে যেন সে একশত বৎসর পূর্বের কোনো উপন্যাসের নায়ক : প্রান্তর মধ্যবর্তী জনহীন রাজপথ দিয়ে ধাবমান অশ্বের পায়ে পায়ে যে ধূম্র নিশান উড়িয়ে রাখে, বজ্র-বিদ্যুতে বিদীর্ণ নিশীথে হঠাৎ পাওয়া মন্দিরের দরজায় আশ্রয় মাগে, উন্মোচিত অর্গল দ্বারের রেখায় বিধৃত পরমাসুন্দরী ভয়কাতরা তরুণী, বিদীর্ণ বক্ষ আকাশের হাহাকার তাদের প্রথম দর্শনের ঢক্কানিনাদ, গগনের ভ্রূকুঞ্চনের দীপ্তিতে শুভদৃষ্টি, পুরোহিত অন্ধকারের অন্তরালবর্তী শিব, রক্ত-অবগুণ্ঠনে মালতীর চোখ-মুখ কেমন দেখাবে? একমুহূর্তের মধ্যে মালতী কি আশ্চর্য ও অনিবার্যভাবে বদলে যাবে! মালতী কে? আমি যাকে ভালোবাসি। তোমাদের ভালোবাসার পরিণাম কি? বি-বা-হ। অতঃপর? সুখী দাম্পত্য-জীবন। বিয়ে করছ না কেন? মানে, মানে, ইয়ে, এই। মালতীর বিয়ে হচ্ছে না, কেননা মালতীর বাবার টাকা নেই। আমার বিয়ে হচ্ছে না, কেননা আমার ভাইয়ের টি. বি. ও আমার ছোটবোন এখনো অবিবাহিতা ও আমাদের ধারণা ওর এখনো বিয়ে হবে। এইরূপ সন্ধ্যায় হিসেবকালে ধরা পড়ে যে আমি ও মালতী গত আট বৎসরের পুরাতন প্রেমিক-প্রেমিকা। তৎকালে আমার বয়স একুশ-বাইশ ও মালতীর বয়স উনিশ-কুড়ি ছিল।

সেই যুবকের নাম কি, যার ভাইয়ের টি. বি, বোন অবিবাহিতা ও আট বৎসরের পুরাতন একটি প্রেম আছে?

অর্থাৎ সে সময় মালতীর বয়স উনিশ-কুড়ি ও আমার বয়স একুশ-বাইশ ছিল।

আমার বয়স একুশ-বাইশ, মালতীর বয়স উনিশ-কুড়ি ছিল। একদা, একদা, আমার বয়স একুশ-বাইশ, মালতীর বয়স উনিশ কুড়ি ছিল। ঝড়ের গতিসম্পন্ন মৃদঙ্গ-মন্দিরার ধ্বনি-সহ টিনের চালে বৃষ্টিপাতের মতো সংকীর্তন,—চাকায় চাকায় 'আমার বয়স একুশ-বাইশ, মালতীর বয়স উনিশ-কুড়ি—গেয়ে বাজিয়ে ও শেষে হিন্দু শোকযাত্রায়—বলহরি / হরিবোল॥ ধ্বনি-সদৃশ। 'আমার বয়স / একুশ-বাইশ॥ মালতীর, বয়স / উনিশ কুড়ি॥' স্লোগান চাকায়-চাকায় গেয়ে বাজিয়ে, প্রবল-প্রচণ্ড শিস দ্বারা চরাচরকে "সাবধান সাবধান" জানিয়ে অনিবার্য-ভাবে থামল। আর সুবীর বলে পরিচিত দেখতে সাধু-সন্তের মতো যুবকটি বৃক্ষবেদিকা ত্যাগপূর্বক দণ্ডায়মান হল, যেন তার শিকার খুঁজতে, ও ঘন-অরণ্যে অভিজ্ঞ শিকারীর চতুর দৃষ্টিপাতের মতো সেই জনারণ্যে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। 'জনারণ্য' কথাটির মতো সম্পূর্ণ অর্থহীন একটি শব্দ কি করে তৈরি হতে পারল ? শুধু সন্নিবেশের ঘনতার মাপকাঠিতে-ই মানুষগুলিকে গাছ করে দেয়া হবে, আর ধরা হবে না সেই মানুষগুলির গতি, স্রোত, আবর্ত ? একবার পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে দুপাশে চাইল। সেই হুড়োহুড়ির ভেতর নিজেকে লিপ্ত না ভেবে সুবীর চোখ বুঁজে যে-মুহূর্তে একটু বুঝি আরাম-ই বোধ করছিল, দু-চারটি ছোটখাটো ধাক্কা দু-একটি বড়-বড় ধাক্কা খেতে খেতে তাকে একেবারে কোলাহলের মাঝখানে পড়তে হল। ঐ দু-একটি ধাক্কা খাওয়ার সময় সুবীর সামান্য পরিমাণ পুলকিত হলেও হতে পারে যখন দেখা যায় নিজেকে ভিড়ের হাত থেকে বাঁচাতে উদ্যোগের পরিবর্তে তার মধ্যে আছে একপ্রকারের সমর্পণের নিরুদ্যোগ। বর্ষার স্রোতে কাঠের টুকরোর মতো সুবীর দু-একবার মাথা উঁচিয়ে নিজের নিশানা ঠিক করে নিতে চাইল—ইতিমধ্যে নিজের শরীর সম্পর্কে স্বাধিকার সে হারিয়েছে। কাছা বারকয়েক খুলে গেছে। অন্য একজনের পিঠের সঙ্গে গাল ঘষেছে বার কয়েক। তার নিজের উত্তাপ গালিয়ে দিয়েছে বারোয়ারি উত্তাপে। তারপর মধ্যনদীর বানচাল নৌকোর আরোহীর মতো সকলকে ছাড়িয়ে, ধাক্কিয়ে, কামড়িয়ে, মেরে বাঁচবার জন্য নৌকোর কিনারে গিয়ে পৌঁছবে—এমনি মরিয়া ভিড়ে যখন সেও মিলে গেল, আর অসংখ্য মানুষের চেঁচামেচি, ট্রেনের ইঞ্জিনের অচল ফোঁসফোঁসানি ও প্রতিমুহূর্তে এক বা একাধিক লোকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক যখন শারীরিক সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এনে এত ঘনিষ্ঠ সব শব্দকে ও ঘটনাকে দূরবর্তী করে

দিচ্ছে—তখন সে একটি লোহার থাম জড়িয়ে ধরে নিজেকে সামলাল, আর হেঁপো রুগীর মতো কিছুক্ষণ দ্রুত ও দীর্ঘ নিশ্বাস নিল। ও চারপাশে তাকাল।

এখন সুবীর খুশি। খুব খুশি। সেই বৃক্ষবেদিকা থেকেই সুবীর ঠিক করে রেখেছে যে এইখানে এসে দাঁড়াবে। তার কারণ সামনে…। অথচ কেমন ওস্তাদ দাঁড়ানেওয়ালার মতো ভাব করল যেন, ভিড়ের স্রোত তাকে এখানে এনে ফেলে দিয়েছে।

ফেলে তো দিল। সেই থামে হেলান দিয়ে সুবীর দাঁড়াল, যেন রাস্তার এক ভদ্রমহিলাকে চুমু খেয়েছে বলে সে প্রচণ্ড মার খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এবং এখানেই, এই লোহার থাম ধরেই। কেবল তার সামনের কামরাটিতে কুমারী অবস্থায় দেখতে ভালো লাগত—বিয়ের পর তেলতেলে হয়েছেন—এমনি এক ভদ্রমহিলা, নতুন গয়না আর শাড়িতে যিনি সদ্যোবিবাহিতা বলে বিজ্ঞাপিতা। তার জানলার সামনে জন চার-পাঁচ ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা। এক মেয়ের কোলে এক বাচ্চা। হাত দুয়েক দূরে দুই ভদ্রলোক এদের প্রতি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থেকে গল্প করছেন বলেই সন্দেহ হয় এরা তাদের অধিকারভুক্ত। ভদ্রমহিলা বিয়ের পর দ্বিরাগমনে এসেছিলেন বাপের বাড়ি, এখন শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাবে কে? মেয়েটার স্বামী। আরো সঙ্গে যাবে কে? বাড়িতে ছিল সুবীরবাবু কোমর বেঁধেছে। পাশের কামরায় সুবীর।…

…গতকাল রাত্রি এগারোটায় আমি মালতীদের বাড়ি থেকে বেরচ্ছি।—এগারোটা পর্যন্ত ও-বাড়ির বড়ঘরে মালতীর ট্রাঙ্ক গোছানো হচ্ছিল, জামাই ভদ্রলোক চাদর জড়িয়ে বাইরের চৌকির ওপর শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন, মালতীর বাবা খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে কুট্‌কাট্‌ মন্তব্য করছিলেন, ঘরের এককোণে চেয়ারের মধ্যে আমি। কারো খেয়ালই নেই আমি আছি কিনা, আর সবচেয়ে কম খেয়াস মালতীর। ভুলক্রমেও তার চোখ একবারো আমার ওপর পড়ে নি। আমি মালতীর দিকে হা করে তাকিয়ে আছি। আমার সেই বিস্ফারিত দৃষ্টির জন্যই আমার দিকে কেউ চাইতে পারছে না। আমি দেখছি শাড়ি-গয়না-ভর্তি মালতীর সারা অঙ্গ কী করে ঝকমকাচ্ছে, ঝলমলাচ্ছে। আর মালতীর দেহ অতি-ম্লান, অতি উজ্জ্বল অথচ বহু ব্যবহৃত ধাতুর মতো দ্যুতিহীন উজ্জ্বল। আর বিয়ের আট-দশদিনের মধ্যেই মালতী

কত দূরের···(সুবীর এইখানে বুকে ব্যথা বোধ করল) মালতী যেন হাঁটে রাজনন্দিনীর মতো···(সুবীর দেখে বাচ্চা ছেলের মতো ঢোঁক গিলল)···আর বিয়ের পর মালতী হাসে, এত হাসে, এত যে আমি তার শরীর থেকে চোখ সরাতে পারি না। অবশেষে রাত্রি এগারোটার সময় আমি উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। কেউ খেয়ালই করল না, যেন আমি এখানে ছিলামই না।···(সুবীরের জিভ শুকিয়ে এল)···আমাকে যেন কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, মরা বেড়ালছানাকে যেমন। ওদের গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমার প্রতিমুহূর্তে আশা হতে লাগল—কেউ এসে আমার ঘাড় চেপে ধরুক, মালতীদের বাড়ির ঠাকুর-চাকরই হোক, ধুমধাম মারুক, আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরোক, মালতী জানলায় দাঁড়িয়ে সেটা দেখুক—জানলার শিকের দ্বারা মালতী দেহ-দাগ বিভক্ত, জানলার শিকের দ্বারা মালতী দূরবর্তী, মালতী একবারের জন্য অন্তত সম্রাজ্ঞী, তার উন্মুক্ত ঘাড়ের ওপর নখত্রখচিত শাল। হঠাৎ পিঠে স্পর্শ পেয়ে থামলাম। ফিরলাম। মালতী। মালতী আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। আলো ছিল না। সারা শরীরের মধ্যে কপালের চুল দু-একটা, চোখের মণির একটা অংশ, গলায় সোনার হারের সামান্য অংশ—বিন্দু-সম জল-কল্প উজ্জ্বলতার ঈষৎ স্পষ্ট ছিল। অথচ, সারা শরীরের মধ্যে ঐ চারটি উজ্জ্বল বিন্দুতেই মালতীর সারা শরীর আমার চোখের সামনে স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। নিকষ আঁধারে যেন নদীর জল দেখা যায় না অথচ শব্দ গ্রাস করে, মালতীর অন্ধকার শরীরের, নীরবতার মধ্যে কথার মতো, উজ্জ্বল ঐ চারটি বিন্দু আমাকে গ্রাস করল। কথা না বলে মালতী তার ব্লাউজের ভেতরে হাত দিয়ে—ফলে হাতের বালায় শব্দ ও দু-একটি উজ্জ্বলতাব চমক—এক ছোট্ট ব্যাগ বের করে। এরপর মালতীর ব্যাগশুদ্ধ হাতখানা শিশির ভাকের মতো আমার সম্মুখে প্রসারিত। আমি সেই হাতখানি ধরলাম। মালতী বলল—"এর মধ্যে টাকা আছে। কাল আমরা যাচ্ছি। কাউকে কিছু না-বলে আমাদের ওখানকার টিকিট কেটে পাশের কামরা বা যে-কোনো কামরায় উঠে বোসো। প্রত্যেক স্টেশনে একবার আমার জানলার সামনে দিয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে একদিন দুপুর বেলায় দেখা করবে।" লালরঙের আত্মবিস্মৃত আধোচাঁদ পশ্চিমাকাশে, যেন নিভে যেতে ভুলে গেছে। আমি বললাম—"না, না, না, আমি পারব না। কিছুতেই তো কোনো লাভ নেই।" মালতী বলল "তোমাকে যেতে

হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকতে হবে।" "না"। "হ্যাঁ"। আমার মুঠো থেকে মালতীর হাত খসে গেছে। একবারের জন্য, অন্তত একবারের জন্য মালতী সম্রাজ্ঞী। তার উন্মুক্ত কাঁধে নক্ষত্র-খচিত শাল। আমি তার ক্রীতদাস। এ আমার পক্ষে এক অসহ ভার। মালতী আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার প্রেম ফিরিয়ে নাও, অপর কাউকে দাও, আমি আর পারি না গো, আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, মু-ক্-তি দাও। মালতী বাড়ির ভেতরে যাবার জন্য পেছন ফিরেছে; আমি বাড়ির বাইরে যাবার জন্য। তারপর মালতী ডাকল "শোন"—ফিরলাম, মালতী আমার দিকে সম্পূর্ণ না-ফিরেই নেহাত অলসভরে হাতটা উঠিয়ে, আমার চুল ছুঁয়ে কি না ছুঁয়ে, নামিয়ে, ফিরে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। যেন সে পুরাণের চাঁদ, আমাকে ভোগ করবার জন্য মোহিত করে রেখে গেল। তার শাড়ির খসখস, গয়নার মৃদু ঝিমঝিম, পিশাচীর হাসির মতো শোনাল। আমাকে যখন মালতী ভালবাসত—মানে, দেহের দিক থেকে-ও যখন মালতী আমার না-হলেও আর কারো ছিল না, তখন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে আমি শান্ত হয়ে যেতাম। আজো সেই, আজো সেই ভঙ্গি। আমাকে এখন হাঁটু ভেঙে, হাঁটুর ওপর দুই হাত রেখে নমাজের ভঙ্গিতে বসতে হবে, ধীরে ধীরে আমার পিঠে-ঘাড়ে ভালবাসার বোঝা চাপবে, সম্রাজ্ঞীর ভালবাসার বোঝা, মালতী, তোমার ভালবাসার বোঝা, ধীরে ধীরে আমার ঘাড় বেঁকে যাবে, পিঠ নুয়ে পড়বে, মেরুদণ্ড ভেঙে দুমড়ে একপিণ্ড মাস হবে, মাংসের এক-একটি জায়গা দিয়ে হাড় বেরিয়ে যাবে, এই তো আমার প্রেম, তারপর মালতীর নিশ্বাস একদিন অবশিষ্ট আমার কিছু গুঁড়ো উড়িয়ে দেবে। মালতী বসে আছে ট্রেনের কামরায়, সবার সঙ্গে হেসে গল্প করছে, আমার দিকে চাইছে-ও না, ট্রেন ছাড়লে আমি অন্য কামরায় উঠব। মালতী, আমাকে তুমি বেঁধে বেড়াচ্ছ কেন, আমার মনটা তুমি ফিরিয়ে দাও মালতী, তোমার প্রেম তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার মন আমায় ফিরিয়ে দাও, দাও, দাও, বাবু একটা পয়সা দাও, মালতী আমার মন দাও, "বাবু একটা পয়সা দাও"।

সুবীর নামধেয় সেই যুবা প্রথমে ভিক্ষুকের দিকে তারপর কামরার জানলাবর্তিনীর দিকে ও সবশেষে নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝল, দুঃখে তার চোখে জল এসে গিয়েছে, এরপর সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে। অসহায় ও সম্বলহীন সুবীর সকলকে এড়িয়ে স্টেশনের পেছন দিককার লোহার বেড়ায়

হেলান দিয়ে দাঁড়াল, কখন্ ট্রেন যাত্রীদের নিয়ে চলে যাবে, ঘরের লোক ঘরে ফিরবে ও স্টেশনের আলোকিত নির্জনতার একটি বেঞ্চের ওপর হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে—একটি গৃহহীন সংস্থানহীন মানুষের মতো। এখানে আলো নেই। আর লাইনের ওপর যখন ট্রেন কেই-বা তখন পেছনে দেখতে যাচ্ছে। এখন আর ট্রেনটাকে সুবীরের কোনো প্রয়োজন নেই। মনের যে-দুঃখকে সে এই কিছুক্ষণ আগে থাম ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রেনের কামরায় কোন্ এক মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে খুঁজে বের করল, সেই দুঃখটাকে নিয়েই সে এখন কাল কাটাতে পারবে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ডান দিকে চাইলে ইঞ্জিনঘরের চাকতি-হাতল-বোতামগুলি ও সম্মুখে তাকালে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়ানো মানুষের মাথা দিয়ে ঢাকা ট্রেনের জানলা। সুবীর তার অন্তর্লীন কান্না নিয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে এরপর রাতে আবার পুরনো সুবীর হয়েই ফিরতে পারবে। সকল সমারোহ ও সকল আয়োজন পরস্ব প্রতীয়মান হল—এবং সাধারণত তাই হয়ে থাকে বলেই গম্ভীর বিষণ্ণতায় সে নিজেকে আড়াল করে—যেন ফুটপাথ মেরামতিতে বাস্তুহারা মজুরের বৈরাগ্য। স্টেশনের এই কলরব যেন সর্বহারার সামনে সোনার খনি। সহসা ইঞ্জিনঘরে, বয়লারের দরজা উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে গোল দরজার মাথায় গোলাকার লোহিত আলো বেগনী কাপড়ে ঢাকা দুটি রোমশ পাকে জাপ্‌টে লেলিহান হতেই, দুটি রোমশ হাত একটি বেলচা নাচিয়ে নাচায় গর্ভস্থ প্রচণ্ড আগুনের আঘাতে মূর্ছাগতপ্রায় সুবীর হতচকিত দৃষ্টি ডান থেকে বাঁয়ে ফেরাতেই ট্রেনের বাতায়নে কামরার ভেতর থেকে শঙ্খবলয়শোভিত এক বাইরে সমর্পিত শিশুকে, চরম আশ্রয়হীনতায় তার আকাশ-ফাটানো চিৎকার, দেখে, শুনে, ফেটে পড়া "মালতী আমাকে ফেলে যেও না, মালতী আমি যাব না, মালতী আমাকে মুক্তি দাও, মালতী, তুমি যেও না"—এই মুখ ঢাকা কান্না ডুবিয়ে-ভাসিয়ে, বয়লারের আগুন সশব্দে ঢেকে, এক বাঁশিতে সব বিদায়-কে অসমাপ্ত করে, মাথায় ধূম্র নিশান উড়িয়ে ও চাকায় চাকায় আমার বয়স / একুশ বাইশ, মালতীর বয়স / উনিশ-কুড়ি গেয়ে বাজিয়ে, সুবীরের সম্মুখে সহসা শূন্যতা এনে, ট্রেন চলে গেলে, প্লাটফর্মের দিকে পেছন ফিরে লোহার বেড়াকে দু মুঠোয় শক্ত করে চেপে জোনাকি, অন্ধকার ও জঙ্গল ভরতি মাঠ ও তৎপরবর্তী পূর্বোক্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে নতুন গপ্‌পো ফাঁদল :

আমাকে এই জায়গায় বেঁধে রাখা হয়েছে, আর আমার সামনে মালতীকে একটা উন্মত্ত দল কেড়ে নিয়ে গেল, যাবার আগে আমার ও মালতীর চেষ্টা কত যথাসাধ্য, কত আন্তরিক ও কত নিষ্ফল হয়ে গেল। মালতীকে নিয়ে গেল ঐ অন্ধকার মাঠের ভেতরে—একদল লোক। মালতীর গোঙানি আমার কানে আসছে, ঐ তো, ঐ তো মালতীর চিৎকার সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। মালতী কি অজ্ঞান? মালতী কি মৃত? মালতী। মালতী। মালতীর বিলম্বিত নিশ্বাসের ও দুর্বৃত্তদের উষ্ণ নিশ্বাস। ওহো! মালতী ও আমার মাঝখানে শব্দবাহী পবন লুপ্ত হয়ে যাক। আমার আর মালতীর মাঝখানে···আমার আর মালতীর মাঝখানে···

আমার ভাইয়ের ফুসফুসটা ফুটো হয়ে গেছে—আগে যেটা রান্নাঘর ছিল সেখানে সে থাকে; আমার ছোট বোন একদা প্রেমে পড়েছিল, ছেলেটি আর একজায়গায় বিয়ে করল, বোনটা তাকে ভুলে গেছে, অথচ ও আদর্শ প্রেমিকা হতে চায়।

গপ্পোর মাঝখানে একেবারে সত্যিকারের সংসার থেকে ভাই বোন উঠে এসে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল গপ্পোটাকে আর স্বীবীর, আর স্বীবীর···

ঘরটি টিনের, চালের নিচে বাখারির সিলিঙ, বাঁশের বেড়ার ওপর চুন-সিমেণ্টের প্রলেপ দিয়ে চার দেয়াল, ঘরের পশ্চিম দিকে কয়েক বস্তা ধান (মালতীর বাবার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কিছু ধানী জমি আছে), তার পাশে লক্ষ্মীর আসন, সেখানে মহাদেব, লক্ষ্মী, কালীঠাকুর ও রামঠাকুর নামক এ-বংশের গুরুর পট, চন্দন-লেপিত, একটি অপরিষ্কার পেতলের থালায় সামান্য চিনি বসানো, তাতে কালো পিঁপড়ে। কিছু ময়লা শেফালি ফুল, বাসি জবার টুকরো ও দণ্ডকলসের ফুল লক্ষ্মীর আসনের লাল সালুর ওপর। পূজারিণী মালতীর সত্তর বছর বয়সী ঠাকুমা, তাঁর মাথার চুল একটিও পাকে নি অথচ সমস্ত মুখ খানখান। দাঁত পড়ে যাওয়ায় নিচের চোয়াল এগিয়ে এসেছে, ফলে ঠোঁট বড় হয়ে গেছে দু পাশে। ঠোঁটের দুই সরু প্রান্ত থেকে দুটি গভীর দাগ চিবুক পর্যন্ত এমনভাবে নেমে এসেছে যে হঠাৎ তাকালে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে ভদ্রমহিলার নিচের চোয়ালটা একটা বহু পুরনো দরজার পাল্লার মতো খুলে খুলে পড়বে। সিলিঙ থেকে ঝোলানো একটি বাঁশের ওপর ছেঁড়া তোশক লেপ ইত্যাদি টাঙানো। ঘরটির পুব পাশের উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি চৌকির ওপর অবিন্যস্ত বিছানা, অপর দেয়াল ঘেঁষে বিশালকায় কয়েকটি

কাঠের বাক্স ও ট্রাঙ্ক, চৌকি ও ট্রাঙ্কের সারির মাঝখানে পুবদেয়াল ঘেঁষে জানলার সামনে একটি টেবিল, আর টেবিলের পাশের থামটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা বালক বয়সের রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি, আর তার ওপর রুপালি ফলকে প্রজ্বলিত বিজলি বাল্ব। এই ঘরের পশ্চিম অংশে গেলে ভুলে যেতে হয়, ঘরের বাকি অংশের নায়িকা মালতী। পুবভাগে গেলে ভুলে যেতে হয়, ঘরের বাকি অংশের নায়িকা মালতীর সত্তর বছর বয়সিনী ঠাকুমা। আলো এত প্রখরভাবে ঝাঁপিয়ে, ঝরে ঘরের পুব অংশকে প্লাবিয়ে দিচ্ছে যে গর্ব ভরে মনে হয় ঘরের অপর অংশে প্রদীপের ম্লান শিখায় ও পচা পুষ্পের দুর্গন্ধে কী এক ভীরু আত্মরক্ষা অতর্কিত আলোর হাত থেকে।

সারাটা দিন মালতী এই সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকে। অমিয় আসবে। অপেক্ষা, আসা ইত্যাদি দীর্ঘদিনের অভ্যাস, তবু প্রতিদিন অপেক্ষা ও আগমনকে নতুন বলে মনে হয়। এই সন্ধ্যাকে তারা সাজায় বিস্ময় দিয়ে। প্রতিদিন তাদের প্রার্থনা—"বিস্ময় আমাদের তুমি ত্যাগ ক'রো না।" অথচ প্রতি সন্ধ্যার শেষে আভ্যন্তরীণ রক্ত মোক্ষণে ক্লান্ত রুগীর মতো তারা…। নাভিশ্বাসগ্রস্ত হেঁপো রুগীর হৃৎপিণ্ডের মতো তাদের বিস্ময়ের টিঁকে থাকাটাই বিস্ময়কর।

সেই পূর্বোক্ত রাস্তা ধরে জনৈক যুবক সাইকেল করে ছুটে আসছিল, ছুটন্ত ঘোড়ার মতো তার মাথার চুল টগবগাচ্ছিল। সেই কাশবনের ভেতরকার ধ্বংসস্তূপের স্মৃতিবহ পথের শেষে আলোকিত স্টেশনের বিস্ময়, শকুনের নীড়-বিশিষ্ট বনস্পতির আশ্রিত অন্ধকার রাস্তা ছেড়ে ও যে পথে পথিক-নিরপেক্ষভাবে উদাসীনতা আক্রমণ করে সেই পথ ছেড়ে যুবা উতরোল পঞ্চাশমাইল দীর্ঘ রাজপথে, যার একসীমায় পাকিস্তান সীমান্ত, অন্য সীমায় এক বড় জংশন। অশ্বমেধের ঘোড়া সহ অর্জুনের মতো এই সন্ধ্যার শহরের অর্ধমৃত আলো, বাতাস আর মানুষকে, না-খেতে-পাওয়া ফেলে-দেওয়া ছড়িয়ে বাড়িয়ে খাওয়া পথের ভিখিরির দেহেও অনিবার্য যৌবনের মতো, অবহেলা করে সে ছুটছিল। প্রেমের জন্য। দেখতে ঠিক প্রেমিকের মতো লাগছিল না। সারাটা রাস্তা জুড়ে যুবাটি যেন সময়ের ঝুঁটি ধরে এগিয়ে এসেছে, রাস্তার আলো খোলামেলা, তার ওপর কেন্দ্রিত হয় নি। মূর্তিসম্পন্ন গতির মতো সে সকলকে সচকিত করে দিয়েছে, তার মুখমণ্ডলের দিকে কেউ চাইতে পারে নি। সে মালতীদের বাড়িতে এসে ভিড়ল।

ঝন্ করে দেয়ালে সাইকেলটা ফেলে, দু লাফে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, থমকাল, তন্মুহূর্তেই দরজার দিকে পেছন ফিরে চেয়ারে বসে মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল ও স্থির হয়ে রইল। ঘরের চারপাশের দেয়ালের সুযোগে চতুর্দিকের আলো এই দুটি মানুষকে স্পষ্ট করল, নগ্ন করল।

আলো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় এতক্ষণে স্পষ্ট হল অমিয় যদিও সর্বাঙ্গে যুবক তথাপি তার চোখের চারপাশে গোলাকার এক কালো বৃত্ত আর সেই বৃত্তের গভীরে হলদেটে চোখ, যেন জন্মসূত্রে পাওয়া অমিয়র চোখদুটি উপড়ে নিয়ে সেখানে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, এমন একটি শবদেহের চোখজোড়া, জীবিত অবস্থায় যার বয়স হয়েছিল আশি। আর, মালতী যদিও বর্ষার প্রথম বাতাসে শিহরিত হতে প্রস্তুত তরুর মতো আবেগে নিষ্কম্প ও জলপ্রপাতের প্রথম ধারার মতো প্রবহণ, তথাপি তার দুই চক্ষু এত নিষ্পলক ও শ্বেত যে, অমিয়র দিকে চাইবার জন্য ঈষৎ উন্নয়নের ফলে তাতে আর্তনাদ-নিষিদ্ধ অসহায়তা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যেমন কুলবধূ। মঞ্চনির্দেশের সময় নাট্যকার যেমন বিশেষ সঙ্কেতবাহী বস্তুটিকে এমন জায়গায় রাখার নির্দেশ দেন যেখানে সে পটভূমিকার সঙ্গে বিরোধিতার দ্বারাই স্পষ্ট, এই দুটি ব্যক্তির চোখ যেন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নির্দেশে ওদের শরীরে এসেছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় অমিয় এমন লাফিয়ে এই ঘরে এসে ঢুকবে আর মালতী সচকিত ঘাড় হেলিয়ে চাইবে। এতদিনের পুরনো প্রেম তবু চমক গেল না কেন? কেন এখনো আপন মনে মাথা নিচু করে কাজ সারতে-সারতেই, —যেমন ধরা যাক কাপড়ের ওপর রেশমের সুতো দিয়ে দুটো পাখি এঁকে তার মাঝখানে "সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়", বা দুটি আকস্মিক তালগাছের মধ্য দিয়ে নীল রঙের নদীর ওপর কালো রঙের নৌকো ও গোলাপী রঙের চাঁদ ও এক বিরাট 'মা' লিখতে-লিখতে—মিনতি বলতে পারে না, "এসো" ও দেশলাই-কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে অমিয় এসে বসতে পারে না? ওদের প্রেম এখনো দৈনন্দিন হল না কেন, অথচ প্রতিদিনই তো ওদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

মালতী কেন কাজ করতে থাকে না—এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর—মালতীর হাতে তখন কোনো কাজ থাকে না। বড় ঘরে মালতীর হাতে তৈরি করা একটি অপরিচিত লতার মাঝখানে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'—এই নীতিবাক্যটি, কোণায় ছোট্ট অক্ষরে 'মি' লেখা, ঝুলছে। তখন 'মি'র তেরো

বছর বয়স, মা বিয়ের জন্য তাকে তৈরি করেছিলেন। আজ মিনতি অন্তত একটি বিষয়ে নিজের কাছেই কৃতজ্ঞ যে সেই তেরো বৎসর বয়সে নক্সাটি তাড়াতাড়ি শেষ করার ব্যস্ততা বশতই মিনতি নামটি পুরোপুরি লিখতে পারে নি। ভাগ্যিস পারে নি! আজ ছাব্বিশ বৎসরের মালতী কি লিখবে লতা-পাতা এঁকে। বাড়িতে শ্রম বিভাগ এই প্রকার: মালতী ও মালতীর বাবা সারাদিন চাকরি করে, মালতীর মা রান্না করে। রান্নাতে সাহায্য হয়তো মালতী করে কিন্তু সন্ধ্যায় নয়। তাছাড়া মালতীর ঘুম-ঘুম পায়। ঘুমিয়েই সে পড়ত যদি প্রেমের তাগিদটি না থাকত। সে কারণে চেয়ারের ওপর বসে-বসে এটা-ওটা নেড়ে ঘুম তাড়ায়। সুতরাং কর্মব্যস্ততার মাঝখানে, না তাকিয়েই "এসো" বলে অমিয়কে ডাকা হয় না। কিন্তু অমিয়র পায়ের শব্দ শুনে চমকাতে হয় কেন? ওরা সারাদিন সারারাত যে সন্ধ্যার বিস্ময়করতা ও অপূর্বতার ধ্যানে কাটায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সেই মুহূর্তটি আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভেবে বসে নাকি সেই অপূর্ব এলেন, সেই অপরূপ, সেই বিস্ময়; আর তাকে দুহাতে লুটে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্যই কি চমকে চায় ও দুজনের অতি প্রাচীন চোখ দেখে থমকে যায়?

আর ঘৃণায় আত্মদহনে জ্বলে পুড়ে "তবু ভালবাসি, তথাপি, তথাপি" এইরূপ কোনো মন্ত্রের জোরে ও জেদে যেন মালতী চেয়ার ঘুরিয়ে ও অমিয় অবিন্যস্ত বিছানায় বসে।

মালতী—"কি, খুব ঘুরে এলে নাকি?"

অমিয়—"না। কেন?"

মালতী—"চুল এলোমেলো। ঘেমে গেছ। হাঁফাচ্ছ।"

অমিয়—"খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে এসেছি তো।" তোমাকেও তো ওরকম লাগছে। ঘেমে গেছ।"

প্রতিদিন ভাবি তোমার জন্য সেজে থাকবে, ইশকুল থেকে ফিরে আর ভাল লাগে না, আলিস্যি ধরে,—ভেবে মালতী—"অত জোরে সাইকেল চালানোর দরকারটা কি?"

অমিয়—"তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর জন্য।"

মালতী—"তাড়াতাড়ি এসে কোন্ স্বর্গ হাতে পাবে?" কথার শেষে থুক্ করে একটু হাসি। স্বর্গ হাতে না পাওয়ার বেদনাতেই যেন হাসিটা শেষ হয় না।

অমিয়—"তুমিই বা কোন্ স্বগ্গের আশায় একা একা এই গরম ঘরে বসে আছ?" কথার শেষে খুক্ করে একটু হাসি। স্বর্গ হাতে না-পাওয়ার বেদনাতেই যেন হাসিটা শেষ হয় না।

তারপর দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে অসমাপ্ত হাসিটাকে টেনে শেষ করল, দুজনের অবস্থা দেখে দুজনে যেন মজা পাচ্ছে।

অমিয়—"দেখি একটা বইপত্র কিছু হাতে দাও।"

মালতী—"কেন, কী হবে?"

অমিয়—"হাতে একটা কিছু নাড়াচাড়া না করলে অপ্রস্তুত লাগে। কেউ এসে ঢুকলে দেখবে—"

মালতী—"যে, তুমি আমি গল্প করছি, লজ্জা করবে?"

অমিয়—"তা একটু করবে?"

মালতী—"একযুগ হল প্রেমে পড়েছ, এখনো নতুন বউয়ের লজ্জা গেল না।"

অমিয়—"একযুগ ধরে যে একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সেই প্রথম প্রেম" কথার শেষে খুক্ করে একটু হাসি।

মালতী—"পৃথিবীর আর সব কিছু-র বয়স বাড়ে, আমাদের"..."ছাড়া।" কথার শেষে খুক্ করে একটু হাসি।

অমিয়—"আমাদের বেলায়—সময় রহিয়া যায়, অচল পর্বত প্রায়" কথার শেষে দুজনে একসঙ্গে হাসল।

মালতী—"এতদিনে তুমি প্রেমে পড়লে—"

অমিয়—"মানে?"

মালতী—"যে-রকম কবিতা বানাচ্ছ—"

প্রেম কাকে বলে? গত আধ যুগ ধরে আমাদের যে এই নিয়মিত প্রতিদিনের সাক্ষাৎ—একেই কি প্রেম বলে? প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই যে না এসে থাকতে পারি না—একেই কি প্রেম বলে? অমিয় চোখ তুলে দেখল মালতীর কমনীয় ঘাড়ে আহ্বান, কমনীয় গালে আহ্বান, এবং তারপর সেই কালো বৃত্ত আঁকা বাঁদরের দুটি চোখ। অথচ মালতী জানে না যে, ওর চোখ দুটো বাঁদরের।

প্রেম কাকে বলে? গত আধ-যুগ ধরে আমাদের যে এই নিয়মিত প্রতিদিনের সাক্ষাৎ—একেই কি প্রেম বলে? প্রতিদিন যে সন্ধ্যাবেলায় এই

যে না দেখা করে থাকতে পারি না—একেই কি প্রেম বলে ? মালতী চোখ তুলে দেখল অমিয়র বেঁটে-বেঁটে মোটা মোটা আঙুলে আহ্বান, চাপা ঠোঁটে আহ্বান, এবং তারপর সেই কালোবৃত্ত-আঁকা একটি শবদেহের দুটি চোখ, যে শবদেহের বয়স জীবৎকালে ছিল আশিবর্ষ। অথচ অমিয় জানে না যে, ওর চোখ দুটো মরা।

মালতী হাই তুলল। ওর দাঁতের ওপিঠের ময়লা-ময়লা জিভ, লালাভেজা লাল তালু, গলনালী দেখল অমিয়। তারপর জলভরা চোখ। হাই তুললে চোখে জল আসে। মালতী ডান হাতের ওপিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

অমিয়—"আমি উঠি"—

মালতী—"কেন ?" বিস্ময়টা ঠিক ফুটল না।

অমিয়—"তোমার হাই উঠছে—" হাসতে পারল না।

মালতী—"হাই উঠছে তো তোমার কি ?" ভুরু কোঁচকাল।

অমিয়—"তোমার ঘুম পেয়েছে ঘুমোও—"

মালতী—"ঘুমোনোর জন্য কি সন্ধ্যা থেকে এখানে বসে আছি—"

অমিয়—"বসে ছিলে কেন তার আমি কি জানি, এখন আমাকে ভাল লাগছে না দেখছি—"

মালতী—"তুমি যা দেখ তাই-ই ঠিক, না ? অত বিশ্বাস ভাল নয়—" মালতীর বাঁদর-চোখে কথাগুলোর কোনো অভিব্যক্তি নেই।

অমিয়—"না এসে তো পারি না। আবার এসেও এই উপেক্ষা—" অমিয়র মরা-চোখে কথাগুলোর কোনো অভিব্যক্তি নেই। অমিয়র দাঁড়ানো দেখে মালতী—"দেখ, আসতে ইচ্ছে করলে এসো, নইলে এসো না। ও-সব আজে-বাজে কথা ব'লো না।" মালতী নিজের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল। ছি ছি। যদি অমিয় চলে যায়। যদি অমিয় কাল না আসে। যদি অমিয় রাগ করে। যদি অমিয় আমাকে ভাল না বাসে! অমিয় যে আমাকে ভালবাসে তার কোনো প্রমাণ, কী তার সাক্ষ্য—। আমি হাই তুলতে গেলাম কেন ?

"অত রাগারাগি করছ কেন ? যেতে বলছ, যাচ্ছি—" অমিয় রওনা হল। অমিয়র নিজের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল। ছি ছি। যদি মালতী ফিরে না ডাকে। যদি মালতী কাল না থাকে। যদি মালতী রাগ

করে! যদি মালতী আমাকে আর ভাল না বাসে! মালতী যে আমাকে ভালবাসে তার কোন প্রমাণ, কী তার সাক্ষ্য! মালতী হাই তুলতে গেল কেন ?

হাই তুললে প্রেম হয় না? হাই যদি ওঠে কি করা যাবে। সময় হয়েছে। বয়স বেড়েছে। অমিয়র সামনে হাই তুলতে লজ্জা লাগে না। কিন্তু আমাদের প্রেমের যে বয়স বাড়ে নি। আমাদের প্রেমের বেলায় "সময় দাঁড়ায়ে রয়, অচল পর্বত প্রায়।" তাই হাই দেখে প্রেমের লজ্জা পায়!

"এই শোন। এই। চলে গেলে খারাপ হবে কিন্তু।" মালতীর গলায় ভয়। অমিয় ফিরল। মালতীর চোখে একটিমাত্র বক্তব্য—সভয় কারুণ্য! অমিয়র চোখে একটিমাত্র বক্তব্য—ভিখারির দীনতা! মরা মানুষের চোখের মতো দীন আর কিছু কি আছে ?

মালতী যে আমাকে ভালবাসে। মালতী-ই যে আমাকে ভালবাসে। ভালবাসা কি ? প্রেম, তুমি একটি মৃত বৃত্তি হলে না কেন ?

অমিয় যে আমাকে ভালবাসে। অমিয়ই যে আমাকে ভালবাসে। ভালবাসা কি ? প্রেম, তুমি একটি অজ্ঞাতবৃত্তি হলে না কেন ? তুই আমাতে এলি কেন রাক্ষসী।

উভয়ে উভয়কে সান্ত্বনা দিতে চেয়ে মুখোমুখি হল। ওদের ইচ্ছে করছিল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু এই সন্ধ্যায়, এত লোকের বাড়িতে···। গত একযুগ ধরে নিজেদের এইভাবে মারতে চাইছে। অথচ শরীর চায়, মন চায়।

অমিয় নিজের পূর্ণ যৌবনকে প্রকট করার জন্য একমাত্র বাধা চোখ দুটো বুঁজল। অমিয়-র ইচ্ছে হল মালতী এসে তাকে বুকে নিয়ে মায়ের মতো ভালবাসবে। মালতী বৃহত্তর হয়ে যাতে তাকে আশ্রয় দিতে পারে অমিয় তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আর মালতী মুদ্রিত-চক্ষু অমিয়র দিকে তাকিয়ে যৌবনকে প্রত্যক্ষ করে ভাবল—আমার প্রেম, আমার বীর, আমার রাজা, অযুত যুদ্ধের ক্ষত ওর দেহে, হিমালয় পর্বতের বোঝা ওর মাথায়, ওর বক্ষকপাট ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে খুলে যাবে, তারপর আশ্রয়···আশ্রয়···আশ্রয়···। মালতীর ইচ্ছে হল অমিয়র বুকে ও মাথা রাখে, বাঁ-হাতে অমিয় ওকে বক্ষলগ্ন করে রাখুক আর ডানহাতে (চকিতের জন্য মালতীর চোখের সম্মুখে কোনো একটা ক্যালেণ্ডারের

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ছবি ভেসে উঠল, একহাতে অর্জুন দ্রৌপদীকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, আর একহাতে সমবেত রাজন্যবর্গের সঙ্গে লড়ছেন)···আমার পার্থ, আমার পার্থ !

বিজলিবাতির নিচে সুকুমার রবীন্দ্রনাথ আর ধানের বস্তার মাঝখানে মালতী আর অমিয়। অপেক্ষমান ? এই অপেক্ষার নাম কি প্রেম ? নাকি এই অপেক্ষার শেষে প্রেম ? উভয়েই আশ্রয়ের জন্য কাতর। উভয়েই বৃহত্তর কিছুর অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। মালতী আর অমিয়র দাঁড়িয়ে থাকা সেই বৃহত্তরের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র রচনা করল :

"মহামহিমবর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। সমীপেষু। সবিনয় নিবেদন। মহাশয় অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে আপনার অপর নামগুলি এখনো আপনি ব্যবহার করেন কি না জানি না বলিয়া ঈশ্বর নামেই আপনাকে সম্বোধন করিলাম। আশা করি অপরাধ লইবেন না। পরে কথা এই যে, বহুদিন আপনার কোনো সংবাদাদি জানিতে না পারিয়া মনোকষ্টে দিন-যাপন করিতেছি। আমাদের পিতামহ-পিতামহী ও পিতা-মাতা-র নিকট শুনিয়াছি, প্রেম ব্যতীত আপনার আর কোনো বৃত্তিই নাই। আপনি যে দুর্ভিক্ষ দেন তাহাও আপনার প্রেম। আপনি যে বন্যা দেন তাহাও আপনার প্রেম। আপনি প্রেমেরই ধারক ও বাহক। কলির কেষ্ট। গোস্তাকি মাফ করিবেন। প্রেম বলিলেই কেষ্টর কথা মনে আসে !

পূর্বে আপনার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আমাদের পিতামহ-পিতামহীরা যে সুখে-শান্তিতে বাস করিতেন বর্তমানে তাহা আর পাওয়া যায় না। তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। ধান এখন পূর্বাপেক্ষা বেশিই হইয়া থাকে, ও আমরা তাহার মোটামুটি ভাল ভাগ পাই, ভবিষ্যতে যাহারা ধান চাষ করে তাহারাই পুরাটা পাইবে—এমনতরো ভরসাও আছে। যে-নদীর বাৎসরিক বন্যা ছাড়া আমাদের ধান চাষ করা সম্ভব হইত না, বর্তমানে নানা খাল কাটিয়া একেবারে দেশের অভ্যন্তরে জল আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া বাৎসরিক বন্যার উপর নির্ভর করিতে হয় না। সুতরাং আমাদের জীবনযাত্রার কোনো অসুবিধা হইতেছে না।

অসুবিধা আপনাকে লইয়া। অনেকে সন্দেহ করিতেছেন আপনি এই তালুকটি বেচিয়া দিয়াছেন। অনেকে আবার এই ভাবিয়া খুবই পুলক বোধ করিতেছেন যে, কিছুদিন পূর্বে মানুষ একরকম গাড়িতে চড়িয়া গ্রহতারার

মাঝখানে যাইয়া লগুড়াঘাতে আপনাকে একেবারে চরাচর হইতে খেদাইয়া দিয়া আসিয়াছে, ভাতের থালার সম্মুখ হইতে যেরূপে কুকুরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

তাহাতেও আমাদের বিশেষ দুশ্চিন্তা নাই। দুশ্চিন্তা এই যে, আপনাকে না পাইয়া আমরা নিজেদের ও পরস্পরকে ঈশ্বর ঠাউরাইয়া, একমাত্র আপনার পক্ষেই যে-পরিমাণ বোঝা বহন করা সম্ভব, সে-পরিমাণ বোঝা নিজেদের কাঁধে চাপাইতেছি।

এখন অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে ওঠা বা গায়ে চর্বি না মাখিয়া মহাসাগরের জলে দশ বারোঘণ্টা সাঁতার দেয়া যেমন অসম্ভব তদ্রূপ কিছু বৃহৎ ছাড়া আমাদের পক্ষে ঈশ্বর হওয়া সম্ভব হইতেছে না। সম্প্রতি এই বৃহতের অভাবে অন্যান্য দিকে মোটামুটি সুখস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও ক্লান্ত বোধ করিতেছি। অনুমান করিতেছি আপনি চিরতরে অস্তোন্মুখ। আপনাদের প্রতি আমাদের কোনো অনুরাগও নাই। তবে আপনি নিজে এককালে বৃহৎ ছিলেন, তাই অন্যান্য বৃহতের সহিত আপনার আলাপ-পরিচয় থাকিলেও থাকিতে পারে। যদি থাকে, ও যদি পারেন, তবে কোনো বৃহৎ আমাদের জন্য পাঠাইয়া দিবেন। এই চিঠি পাইয়া রাগ করিবেন না। এটি আপনার ছাঁটাই ও নতুন বৃহতের নিয়োগপত্র। যা-হোক। শতকোটি প্রণামান্তে বিনীত নিবেদক অমিয়, মালতী।"

দুজনে চোখ খুলল। দুটি বানর চোখ দুটি মরা চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। অমিয়—"যাই"। মালতী—"না। একটু বসে যাও।" আর মনে-মনে ভয়, কাল যদি অমিয় বসে, আর যদি আবার আমার হাই ওঠে। অমিয় "ঐ একটু বসার কি আর শেষ হয়?" দুজন দুজনের দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল না। শুধু একজনের কোটরে বানরচক্ষুর পেছনে, আর-একজনের কোটরে মরা চোখের পেছনে মানুষের চোখ প্রকাশ পাবার জন্য ছট্‌ফট করতে লাগল, গর্ভের মধ্যে যেমন শিশু। এক্ষুনি, এক্ষুনি যেন তারা সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেঙে দুমড়ে সেই ধ্বংসস্তূপের অত্যুচ্চ প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে পরম সৃষ্টির বীজের মতো মহত্ত্ব নিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ধান-চেরা চালের মতো বানর আর মৃত চোখ ফেটে মানুষী আর মানুষের চোখ বেরিয়ে পড়বে!

"কাল আসছ তো?" "আসছি।"

"কবে শেষ হবে?" "কি?"

"এই"। "জীবনের নাম মহাশয়
যা সওয়াবে তাই সয়।" "কাল আসছো
তো?" "আসছি।" "কাল খুব ভাল—
"হ্যাঁ। কাল খুব ভাল—।" "কাল"।
"কাল"। "কাল"।

আলোকে পরিহাস করা কেরোসিন আলোর মতো এক চাঁদের তলা দিয়ে সেই অমিয়-নামা প্রেমিক-যুবা প্রেমিকার নিকট থেকে বেদনা নিয়ে, সর্ব-অঙ্গ সত্ত্বেও কুষ্ঠরোগীর স্পর্শশক্তিহীনতার মতো, সর্বাস্তি সত্ত্বেও সর্বনাস্তির শূন্যতার নীরব হাহাকারে গগন ভরিয়ে প্রাণধারণের নিমিত্ত নিশ্বাসকে আরো দ্রুত করে ঘরমুখো হল। আর সমবেত শিপধ্বনি অকস্মাৎ শুরু হয়ে, কাছে এসে একক মহাপশুর মরণআর্তনাদের ভ্রম জাগিয়ে, সদ্যপ্রেমলীলাকাঙ্ক্ষান্তা মালতী ও সদ্যপ্রেমলীলাকাঙ্ক্ষ অমিয়-র মনে সদ্যমরণলীলাকাঙ্ক্ষিজনিত শ্মশানের হাহাকারের অনুষঙ্গ জাগিয়ে অবসিত হল। রাত্রির এখন কত প্রহর?

অবশেষে পৌঁছন গেল। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খিল খুলল। সামান্য একটু শব্দ হল। ঘরে ঢুকে প্রথমে নিশাপতি দরজা বন্ধ করল। তারপর জানলা বন্ধ করল। এবং একেবারে শেষে লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে দিল। হঠাৎ জাগ্রত ঘুমন্ত পশুর মতো ঘরটা চোখ কান মেলতেই জামাকাপড় দড়িটার ওপর ছুঁড়ে লুঙি নিয়ে কুয়োপাড়ে চলে গেল নিশাপতি। সেখানে কিছু ধাতব ও কিছু তরল শব্দ। গামছাটা দড়ি থেকে টান দিতেই কাপড়টা পড়ে গেল। সেটাকে তুলে, উবু হয়েই নিশাপতি খেতে বসে। তরকারি দিয়ে রুটি মুখে ঢুকিয়ে ডাল চুমুক দিয়ে খায়। চপচপ চিবুকের আওয়াজটা কেমন ব্যাঙের মতো শোনায় বলে সে বেশি করে চিবোয়। কুলকুচি করে জল খেয়ে, বাকি জল দিয়ে মুখ ধুয়ে, জিভ দিয়ে দাঁতের গোড়া পরিষ্কার করে কেরোসিন কাঠের চৌকিতে নানারকম ক্যাচকোঁচ আওয়াজ তুলে শুয়ে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা নিবিয়ে দেয়। ও শুয়ে পড়ে। অবশেষে শুয়ে পড়ে। কেননা অবশেষে পৌঁছেছে। নিজের বিবরে। প্রতিদিন রাত্রিতে ঘুমুবার জন্য শোয়ার সময় নিশাপতি ভাবে সারাটা দিন সে লুকোচুরি খেলে-খেলে অবশেষে এখানে এই নিরাপত্তায় এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে সূর্যালোক ছাড়া আর কিছু তাকে বের করতে পারব না। সারাদিন সূর্যের আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ...।

কি করলাম সারাটা দিন? ডাক্তারবাবুর কাছে অমরের নতুন ওষুধের জন্য, ফলওয়ালার কাছে অমরের আঙুরের জন্য, মাংসওয়ালার কাছে অমরের মাংসের জন্য, এবং এই তিন জায়গায় সর্বদা আত্মীয়তা দেখানো—হাসি, কেননা বাকি নিতে হবে, বাজার, অফিস, অফিসে বারদশেক বড়বাবুর দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ, কাজের জন্য বার পাঁচেক বিরক্তি প্রকাশ, বার সাতেক বড়বাবুর সামনে দাদা-দাদা করা, লুকিয়ে চারবার সিগারেট ও প্রকাশ্যে বারদশেক বিড়ি খাওয়া, নতুন সাহেবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা, গত-সাহেবের প্রশংসা, টিফিনের সময় পনরো মিনিট বেশি বাইরে থাকার চেষ্টা ও পাঁচ মিনিটের বেশি না-থাকতে পারা, বিকেলে বাড়ি, মুড়ি খাওয়া, অমরের দিকে না-তাকানো, স্টেশন, মালতী, বাড়ি, বিছানা। এবং এখন সময় নিহত। এখন আমি পলাতক। এবং এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সারাদিন মধ্যে মধ্যে নিজেকে নিশাপতি বিলীন করেছে। সুতরাং তখনো নিশাপতি ছিল না। সুতরাং এখনো নিশাপতি নেই। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলে গেল, পড়ে রইল শ্মশানের খাট। নিশাপতির নিদ্রা-উন্মুখ বদনে সামান্য শ্লেষযুক্ত হাসি এল। সময়কে নিভৃতে ব্যঙ্গ করছে সে এখন, যখন সময় নেই। এই সময় হীনতাটুকু অনন্ত হয় না কেন? অনন্ত হোক। এই অনন্ত সময় হীনতার মধ্যে তাহলে নিশাপতি বড় সুখে কালযাপন করতে পারে, যেমন সারাদিন নিজেকে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়েছে, যেমন সারারাত নিজের মধ্যে ভিড়কে মেলাবে। নিশাপতি বেশ নিজেকে হত্যাকারী হত্যাকারী ভাবতে পারছে? সময়ের টুটি টিপে···। কে বা কাহারা সময়কে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারী কে! নিশাপতি দে। সময় নিহত। সুতরাং কত সুখে নিশাপতি এখন মনে করতে পারছে—সে মানুষ নয়, সে অমানুষ নয়, সে প্রেমিক নয়, সে সাংসারিক নয়, সে চাকুরে নয়, ছোটবোন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকা নয়, তার ছোট ভাইয়ের টি. বি. নেই, তার ছোটবোন নেই, তার ছোট ভাই নেই, সে নেই, নিশাপতি নেই। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশে গেল, পড়ে রইল শ্মশানের খাট! কেরোসিনের খাট আর কত সুখ। কত সুখ সময়কে ফাঁকি দিয়ে। পুলকে নিশাপতি প্রায় ঘুমিয়ে পড়ল। পড়ল। ও এখন ঘুমোবে—

রাত্রিব্যাপী মৃত্যুকে সচকিত করে, ও আকাশ-মর্ত ব্যাপী নীরবতাকে খুঁড়ে অমর কেশে উঠতেই অর্ধতন্দ্রায় নিশাপতি যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। সেই সময়, সেই কাল, তার ঘরের ভেতর, মশারির ভেতর, দেহের ওপর, মনের

ওপর। রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করে ছটফটিয়ে উঠে বসে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অনির্দিষ্টভাবে তাকিয়ে থাকতেই অমরের কাশির আওয়াজ এসে খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ল নিশাপতির ঘরে, মশারির ভেতরে, দেহের ভেতরে, মনের ভেতরে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে তার বিছানায় প্রত্যাখ্যাতা প্রেমিকা ছোট বোন ককিয়ে উঠল—শূন্য প্রসবের বেদনায়—আর আলোর চেয়েও দ্রুতগতি সময়ের স্রোতে ভাসমান নিশাপতি শুনতে পেল মালতী ডাকছে—"নিশাপতি" "নিশাপতি"—উঃ, নিশাপতি ছটফট করে মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, সময়, তুই যদি এতই শক্তিমান্—আমাকে আমার আত্মশক্তি-বিস্মৃত কর, "মালতী" নিশাপতি না ডেকে পারল না। সময় তাকে আর মালতীকে ছিঁড়ে আলাদা করছে, তবু তারা প্রাণপণ শক্তিতে কাছে আসতে চায়, সেই সংগ্রামের বেদনায় ক্ষতবিক্ষত নিশাপতি ঘর ছেড়ে বাইরে এল। পোকায় কাটা ফুসফুস নিশ্বাসে ভরে ওঠে না বলে রক্ত বেরোয়, বোনের গর্ভ শূন্য বলে তার কোঁকানিতে মৃত শিশুর কান্না। এই সময়টায় ফুসফুস ফুটো। এই সময়টায় গর্ভ শূন্য। নিশাপতি বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। নক্ষত্র-খচিত আকাশের তলায়।

আমি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র কালপুরুষকে চিনি। মধ্যরাত্রির আকাশের মধ্যবিন্দুতে কালপুরুষ তার উদ্যত শর-সন্ধান করছে আমার মস্তকে। আমি কি করব গো? ধুলোয় নিজেকে লুঠিয়ে দিলে সময় আমাকে গুঁড়িয়ে দেবে। মুখোমুখি দাঁড়ালে সময় আমাকে লুটিয়ে দেবে। অথচ আমার বাঁচার বড় শখ। অথচ আমাকে একজন মহাশক্তিশালী পুরুষ ঠাউরে সেই কবে থেকে, ঈশ্বরের মৃত্যুর পর থেকে, সময় আমার কাঁধে একটার একটা বোঝা চাপিয়েছে। কিঞ্চিৎ বৃহতের প্রার্থনায় আমি ও মালতী ঈশ্বরের নিকট যে আবেদন লিখেছিলাম, তার ছেঁড়া টুকরো আকাশে। এখন আমিই একাধারে বৃহৎ ও ঈশ্বর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঈশ্বর না হয়ে আমার উপায় নেই মালতী, বৃহৎ না হয়ে আমাদের উপায় নেই, মালতী ঈশ্বর-ঈশ্বরী না হয়ে আমাদের উপায় নেই!

একের পর এক শর নিক্ষেপ করে আমার উপযুক্ত শরশয্যা রচনা করছে মধ্যরাতের কালপুরুষ। মালতী, অবগুণ্ঠন খোল, এস, কালপুরুষ রচিত শরশয্যায় তুমি আমি মিলন-বাসর যাপন করি। আমাদের মিলনে বসুমতী উর্বরা হবেন। কাল-নিক্ষিপ্ত শর অতঃপর ধানের শিষ হয়ে ফুটবে। মালতী, তোমার আমার সন্তান সেই উন্মুক্ত হরিৎ প্রান্তরে মিলন-বাসর রচনা করবে।

মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে

বিষ্ণু দে

"আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি।"—ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল। কিন্তু শতসহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন, "আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি।"—রবীন্দ্রনাথ

শোচনা নেই, তাই তো আজও পৌত্র প্রপৌত্র
হবার সাধ আমারও আছে, কৌতূহল অসীম
এবং আশা অমর, তাই তাকাই সেইকালে,
যদিও আজ দিনের বাঁচা নিয়েই হিমসিম,
তবুও ভাবি আজের গিঁট কালকে কোন সূত্র
খুলবে, ভেবে প্রবীণ গান জমাই চৌতালে।

এটাও ঠিক, যাঁরা সদাই পিতামহের কালে
বাসা বাঁধেন, তাঁদের দলে আমার নেই ইয়ার,
যদিও প্রায়ই আমারও মন পিতামহের যুগে
অথবা তারও অনেক আগে বাংলাদেশী চালে
ঘুরে বেড়ায়, গ্রামের পথে মেটায় জ্বালা হিয়ার
কলকাতার ছন্নছাড়া উন্নয়নে ভুগে।

জীবনে বহু পেয়েছি স্বাদ, তাই জীবনচিত্র
ব্যাপ্ত দেখি দূর অতীতে আর ভবিষ্যতে।
সাধ মেটেনি, জ্বালাও ঢের, আহিতাগ্নি আশা
আজও অমর, তাই তাকাই আরেক পাণিপথে—
নিশ্চয় শেষ শান্তি হবে, পৌত্র বা দৌহিত্র
আমারও তাই হবার সাধ, কারণ ভালোবাসা

ক্রমেই বাড়ে, যদিও রোজ বাঁচার প্রাণপাতে
আমারও প্রাণ দেশের কোটি গলায় বলে, ধিক্।
জানি অচিরে মিলন হবে স্তালিনে-খ্রুশ্চেফে,
পিতামহের স্বপ্ন বাঁধা প্রতি নাতির হাতে।
আমারও তাই মনটা ছোটে আরেক স্পুৎনিক,
শূন্যে নয়, মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে॥

দ্বা সুপর্ণা

[গাগারিন-তিতফকে]

বিমলচন্দ্র ঘোষ

"অস্য লোকস্য কা গতিরিতি? আকাশ ইতি হোবাচ; সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণম্।"

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।৯।১

কুহেলী-নীল নির্মায়িকতায় কায়াহীন ছায়াহীন মনোহীন নিস্তব্ধতা
পৃথিবীর প্রথম সকাল আর প্রথম রাত্রি থেকে
মৃতচৈতন্যের সমস্ত স্পন্দনকে জ্যোতির্বলয়ে ঘিরে রেখেছিল।
অনাদিকালের প্রাক্ ইতিহাসের সেই নিরবচ্ছিন্ন দেয়াল ভেঙে,
দিগন্তহীনতার সেই দুশ্ছেদ্য অবরোধ ফুঁড়ে,
দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতির্লোকে
আমাদের সমস্ত অলকাপ্রেমিক পার্থিব প্রাণের
প্রতিনিধিত্ব ক'রে এলে তোমরা
দেশকাল জয়ের অব্যাহত গতিময়তায়।

সেই গতির অবিশ্বাস্য উদ্দীপনায়
আমাদের দিকশূল-সংস্কারে সঙ্কুচিত
কোটি কোটি বিস্ময়াবিষ্ট চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।
যে প্রত্যভিজ্ঞার কীর্তি আমাদের ছিল না
তোমরা সেই অমেয় কীর্তিতে আজ অবলীলায় ভুবনবিশ্রুত হলে।

রূপকথার বীর্যবান স্বপ্নদ্রষ্টাদের যে মায়াজগৎ
মহাব্যোমে ছিল অনন্তবিস্তৃত,
তোমরা দুজনে হিরণ্যপক্ষ বিহঙ্গমের মতো
সেই অনন্ত মায়াজগতের আংশিক পরিক্রমা করে এলে
সৃষ্টিমেঘের রোমাঞ্চকর আলোয়।

চাঁদকে পাঠালে মানবিক অভীপ্সার কিংশুকবর্ণ ঠিকানা
লোকপ্রেমের প্রতীকচিহ্নিত ধাতব পতাকায়।

শাশ্বত ও সুন্দর মনুষ্যসভ্যতার যে আশ্রয়ভূমি
সংহত শান্তিময়তার যে অপরিমেয় চতুর্মাত্রিক রূপায়ণ—
প্রত্যেকটি সৎমানুষের, প্রত্যেকটি প্রেমিক মানুষের অনন্ত লক্ষ্য
তোমরা সেই আদর্শ ও কর্মনিষ্ঠার মহাপ্রেরণাভূমি সোভিয়েট থেকে
যন্ত্রোজ্জ্বল রূপস্পন্দনে স্পন্দিত ক'রে এলে
চির রহস্য-গম্ভীর অমিত মহাকাশকে।

অন্যদিকে কল্মাষপাদ কুবের সভ্যতার ক্রূর সত্তা মাৎসর্য-পাণ্ডুর।
সেখানকার ঐশ্বর্য-ক্ষ্যাপা ধ্বংসোপাসকরা জানে :
সমান সুযোগ আছে একই রথে স্বর্গে আর নরকে যাবার।
একই অস্ত্রে সুখপ্রদ সৃষ্টি আর প্রলয় নিহিত,
যে অগ্নি সুস্বাদু অন্নে তৃপ্ত করে আপামর সজীব রসনা,
সে অগ্নির নীল জিহ্বা চেটে খেতে পারে
ব্রহ্মাণ্ডকে রাক্ষসের মতো।

ওরা বেছে নেয় বিশ্বশোষণের সর্বগ্রাসী লোভে
সর্বাত্মিক প্রলয়ের পথ।
সৃষ্টিতে ওদের ভয়, বিকাশের আতঙ্কে ওদের
চোখের পাতায় কাঁপে দুশ্চিন্তা-কলুষ অন্ধকার।
শান্তির প্রমূর্ত শত্রু ওরা
বার বার মাথা খোঁড়ে আকাশে বানাতে মৃত্যু-ঘাঁটি।

যে বিশাল মহাকাশ তোমরা দুজন ঘুরে এলে
অভীক সুপর্ণ শান্তি সম্প্রীতির মহাপ্রেম দূত!
জ্যোতির্লোকে রেখে এলে ভাস্বর স্বাক্ষর!
ওরা জানে যুদ্ধ আর নয়,
বিজ্ঞানের পদপ্রান্তে অনিবার্য প্রলয়ের নতি।

তবু আজ ঘুম নেই এশিয়ার আফ্রিকার চোখে :
লোভ্ আর হিংসা কবলিত
অর্ধেক ধরিত্রী কবে স্থিতসুখ স্থিতসাম্য স্থিতশান্তি হবে ?
আতঙ্কিত মন কবে মুক্তি পাবে প্রশান্ত প্রাণের
ইতিহাস আলো ক'রে ?
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অনন্ত সম্পদে উৎসারিত
যন্ত্রণার ভারমুক্ত কবে হবে বাকি অর্ধ পৃথুলা পৃথিবী ?

যুগল সুপর্ণ, জানি বিশ্বকে দিয়েছ তোমরা শান্তির উজ্জ্বল অঙ্গীকার !

যাত্রার বেলা

অরুণ মিত্র

উজ্জ্বলতার মধ্যে যাত্রা।

ধোঁয়ামাখা লণ্ঠনটা সীমানার ওধারে প'ড়ে রইল,
কোনো সময় তা এক নিশ্চিত চিহ্ন হবে কিনা জানা নেই,
প'ড়ে রইল গোপন প্রতিশ্রুতিগুলি,
পারাপারের অবসর ঝলকিত জোয়ারে ডুবে যায়।

ডালপালার ফিসফাস বন্ধ হয়ে গেল,
পতঙ্গেরা সকালের এক একটা দীপ্ত কণা নিয়ে ঘোরে,
ধুলোয় আর বাতাসে আমাদের জ্বলবার সঙ্কেত।

আমরা মাঠের শুকনো দাগ বরাবর এগিয়ে যাব,
আমরা শহরের একটানা তেজের ভিতর দিয়ে চলব,
নিভৃত আকাঙ্ক্ষাকে বুকে ধ'রে
তৃষ্ণার শিখরে আমাদের উঠতে হবে।
এখন রোদ্দুরের ভূমিকা।
একজন বলে : এই তো ফসল পাকবার রোদ্দুর।—
এই কথাটুকু আমরা মনে মনে আঁকড়ে ধরি
যেন আমাদের সমস্ত সান্ত্বনা তাতে রয়েছে।

উজ্জ্বলতার মধ্যে যাত্রা।
অগ্নিকোণে আমরা প্রতিবিম্বিত হয়েছি।

স্বতোৎসারে, নিজে

মণীন্দ্র রায়

সেই যন্ত্রণাই শুদ্ধ, বুকে যার ডাকিনী-চিৎকার
কারণ সে দ্ব্যর্থহীন, দোলায় না সন্দেহের টানে।
নির্ঘুম রাত্রির স্নায়ু ছেয়ে যায় যেমন আঁধার
তেমনি নিশ্চিত সে-যে, নেমে আসে স্বপ্নের শ্মশানে।

আমি আর সে-মুহূর্তে স্মৃতি দিয়ে পাই না আমাকে।
মুছে যায় পূর্বাপর, শুধু এক তীক্ষ্ণ অনুভূতি
চেতনার নদী থেকে আরো দূর চেতনার বাঁকে
অদৃশ্য নৌকোর মতো রেখে যায় শূন্যের প্রস্তুতি।

তখন, তখনি আমি বিদ্ধ ঐ যন্ত্রণার দাঁতে।
সময়ের মণিবন্ধে ছিন্ন হয় সহসা জীবন—
সহসা ছড়ায় প্রাণ রেণু-রেণু নক্ষত্রের রাতে।
অথচ এ নরদেহ দেখি দূরে পশুর মতন।

নাও তার অশ্রু-রক্ত, হে আমার কঠিনা ঈশ্বরী!
করুণা ক'রো না, ফিরে এসো না আবার রক্তবীজে।
পান কর, চূর্ণ কর বঞ্চনার চিত্রিত গাগরী।
যদি বা তাহলে আমি ভরে উঠি স্বতোৎসারে, নিজে॥

বাতাস বাঁক নিচ্ছে

রাম বসু

বাতাস বাঁক নিচ্ছে আমার হৃদয়ে
সমস্ত অরণ্য উথলে উঠছে বিরাট স্তোত্রে
অবারিত উচ্চারণে আমি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সেতুপথ।

আমার কপাল থেকে মহিমার রেখাগুলি
একে একে মুছে যাচ্ছিল
চিতা বাঘিনীর মতো নদীটা জ্যোৎস্নার জঙ্গলে
মোহিনী কণ্ঠে কতবার ডেকেছে পাতালে বাসরে
আমি যাব যাব করেও যাইনি।

আশ্চর্য, প্রত্যেক শতক বিনষ্ট গম্বুজের পাশে
রক্তে ও হ্রেষায় কুরুক্ষেত্র আবিষ্কার করে
আর আমাদের অংশ নিতে হয়
মৃত্যুর ওপারের সোপানশ্রেণী অধিকার করার জন্য
অন্তর্বাহ মন্ত্রস্বরে বিদ্ধ করতে হয় লক্ষ্যের মণি
যেন দহনের তীব্রতায় কথাগুলি কাকলি হয়ে যায়।

আমরা অসম্পূর্ণ বলে সাজগোজ করেছে পৃথিবী
রূপকথার রাজকন্যাদের চেয়েও অব্যর্থ সেই রূপ
আর আমরা পেতে দিয়েছি হৃদয়ের সমস্ত পরিধি
তার ভাঁজে ভাঁজে জমছে শিশির, আলোর গুঁড়ো, কাঁচপোকা
গোঙানো বিষাদ পোয়াতির মতো নমনীয়
লাগসই সুরের আঘাতে এখুনি সে কুসুমিত হবে।

লতাগুল্মের বিভূতি মণ্ডিত দূত আসছে এবার
ফুটন্ত ভাতের গন্ধের মত অনাবিল উল্লাসে
হৃদয়, সব কবাট খুলে দাও!
বাতাস বাঁক নিক আবার
আসুক অন্য মহাদেশের তুমুল সমারোহের সংবাদ।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজন্ম-জয়ন্তী প্রতিপালন উপলক্ষে বাংলাদেশে অসংখ্য অনুষ্ঠান হয়েছে এবং হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহুবিধ যে রচনা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাও সংখ্যাতীত। এমন পরিস্থিতিতে কিছু পরিমাণে অতিকথন অনিবার্য হয়ে পড়ে আর সেজন্য অপ্রতিভ বোধ করার কোনো হেতু নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎসবের পরিকল্পনা আয়োজন ও অনুষ্ঠানে অশোভন কিছু ঘটে থাকাও বিস্ময়কর নয়—যেখানে বহুজনকে একত্র মিলিত করতে হয় সেখানে যে সততই বিদগ্ধোচিত সুরুচি ও অনুপাতবোধ প্রকৃত মর্যাদা পাবে তা আশা করা সমীচীন নয়। তবে একথা বলা যায় যে কোথাও স্খলন হয়ে থাকলে তার কারণ সম্ভবত ছিল অত্যুৎসাহ—কবির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা এবং তাঁকে নিয়ে অপরিমিত গর্বই জয়ন্তীপ্রতিপালনে মাঝে মাঝে আমাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। আমাদের মধ্যে যাদের নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে তারা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করেছি যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে সৌম্য অথচ সুস্থ শালীনতা চাইতেন এবং তার পরিবেশ অনায়াসে সৃষ্টি করতেন, তার বেশ অভাব রয়েছে। কিন্তু এ-ধরনের ব্যাপার নিয়ে বিচলিত আমরা আশা করি কেউই হই নি। বাস্তবিকই যে উদার আনন্দ ও আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে বাঙালী এই জয়ন্তী উৎসবে নেমেছে তা অহংকারের বস্তু বললে অত্যুক্তি হবে না।

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮ তারিখে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির পক্ষ থেকে 'রবীন্দ্রনাথ' আখ্যা দিয়ে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমরা কয়েকজন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে অথচ সর্ববিধ অতিকথন থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে লিখেছিলাম। এজন্য অন্তত একটি সুবিদিত অঞ্চল থেকে আমাদের কটূক্তি শুনতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির যে অপার মহিমা তাকে মুগ্ধচিত্তে স্বীকার করেও কেবল কাব্যের বিচারে শেক্স্‌পিয়র বা সোফোক্লিস্‌-এর সমস্তরে তাঁকে না বসিয়ে অল্প একটু দূরে স্থান দেওয়া উচিত

বলেছি বলে কুটিল ভর্ৎসনার ভাগী হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কীর্তি এবং ব্যক্তিত্ব মিলে যে অখণ্ড ও অতুলন ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে তার বিশ্লেষণ প্রচেষ্টাকে নিন্দুকেরা মূল্য দিতে অপারগ বলেই এমন ঘটেছে। যদি নিছক আবেগের আতিশয্যে কেউ বিচলিত হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন, তাহলে মতানৈক্যের মধ্যে কটুতা দেখা দিত না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সব চেয়ে লক্ষ্য করার বস্তু হল দুরভিসন্ধি। বাংলাদেশের মার্ক্‌সবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন বলেই তাঁকে নিয়ে অলস আলোচনা ও মূল্যহীন স্তুতিবাক্য পরিহার করার সচেতন চেষ্টা চলেছে। আমাদের এই চেষ্টায় বহুস্থলে ত্রুটি থেকে গেছে, মাঝে মাঝে মূল্যায়নে নিদারুণ ভ্রান্তিও যে ঘটে নি তা বলা যায় না, কিন্তু যথার্থ শ্রদ্ধার অভাব কখনও হয় নি। কোনো কোনো ব্যক্তি এ-কথা বিশ্বাস করতে একেবারে অস্বীকৃত বলেই দেখা গেল যে অধ্যাপক সুশোভন সরকার এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে 'রবীন্দ্রনাথ' সংকলনগ্রন্থে যা লিখেছেন, তা নিয়ে রুচিবিগর্হিত মন্তব্য করতেও তাঁদের বাধে নি।

ঐ সংকলনের সকল লেখক মোটামুটি নিজেদের মার্ক্‌সবাদী মনে করলেও সকল বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। সুশোভনবাবুর যে-লেখাটি সম্পর্কে শ্লীলতাবর্জিত সমালোচনার উল্লেখ এখনই করেছি, সেই লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়কে আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি নি। যুক্তিনির্ভর, চিন্তাদীপ্ত, প্রাঞ্জল রচনা সত্ত্বেও ঐ প্রবন্ধের বক্তব্যে আমার সায় দেওয়া পুরোপুরি সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে কিছু লিখতে যাওয়ার কথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবি নি ; আশা করেছিলাম যে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে যথাসময়ে চিন্তাশীল লেখকরা কিছু বলবেন। কিন্তু যখন শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার কিছু বিবরণ দেখলাম এবং সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় আমেরিকা-ইয়োরোপ সফরের পর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মনোবিকার লক্ষ্য করলাম, তখন আমার "প্রাচ্যাভিমানী" চিত্ত বাস্তবিকই চঞ্চল হয়ে উঠল আর ভাবলাম যে আমাদের এই দেশ এবং তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত অনুভূতি বলে যা অনুমান করি তা নিয়ে একটু আলোচনা অসঙ্গত হবে না।

প্রথমেই বলে রাখি যে ইয়োরোপ এবং তার জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যতটুকু জানতে এবং বুঝতে পেরেছি, সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট মমতা আছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার এক প্রধান খেদ এই যে রবীন্দ্রনাথের মতো

চরাচরব্যাপ্ত প্রতিভার কাছ থেকেও আমরা ইয়োরোপের প্রকৃত সত্তা এবং তার গরিমা আর মোহনীয়তার সন্ধান তাঁর লেখায় ঠিক পাই নি, "অন্যে পরে কা কথা"। কিন্তু পঞ্চাশোর্ধে ইয়োরোপ-দর্শন করে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু যে বিভ্রমে জড়িত হয়ে স্বদেশের অপকর্ষ সম্বন্ধে একান্ত অনার্য মন্তব্য করতে সংকোচ বোধ করেন নি, তা বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। মৃতের নিন্দাবাদ অকর্তব্য, কিন্তু 'Quest' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে-রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে শুধু রুচি নয় সাহিত্যবিচারও যে বিকৃত রূপ নিয়েছে, সেজন্য দায়ী পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আংশিক পরিচয়-জনিত উদ্ভট মোহ। 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক অতি স্বল্পায়তন বিবরণ বেরিয়েছে, কিন্তু তাতেই তাঁর বলা আটকায় নি আমাদের এই দেশ সম্বন্ধে—"এ কি জলবায়ুর দোষ?—যে জলবায়ুতে তাড়াতাড়ি খাবার পচে যায়? তেমনি আত্মাও কি পচে যায়?"

এই যদি বুদ্ধদেববাবুর অনুভূতির পরিচয় হয় তো তাই নিয়ে ঝগড়া বাধাবার প্রবৃত্তি আমার নেই—অবশ্যই তাঁর চিন্তাস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে অবাধ অধিকার আছে। কিন্তু বিস্মিত (এবং কিঞ্চিৎ ব্যথিত) না হয়ে পারি না। আর ভাবি যে মানসিকতার এই দৈন্যই কি তাঁকে যথার্থ কবিকীর্তি থেকে বঞ্চিত করেছে? নিজের অজ্ঞাতে যে-চিত্তচাপল্য তাঁর আপাতশোভন কবিতাকেও লঘু আর পঙ্গু করে রেখেছে, গদ্যরীতিতে অসামান্য পটুতা সত্ত্বেও অভিনিবেশ, সংযম ও জিজ্ঞাসার যে-অভাব তাঁর বহু রচনাকেই রিক্ত করে ফেলেছে, তারই কি ক্লেশকর উদাহরণ এখানে দেখছি? ইচ্ছা করে বলতে যে বুদ্ধদেববাবু একবার ভারতদর্শনে বেরিয়ে পড়ুন, হয়তো এখনও তাঁর চোখ খুলতে পারে। আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, "নাল্পে সুখম্"—কিন্তু বুদ্ধদেববাবুর মতো গুণী ব্যক্তি বড়ই অল্পে তুষ্ট হয়ে ওঠেন। কয়েকমাসে পৃথিবী ঘুরে আসা যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশ্বরূপদর্শনের সম্ভাবনা না থাকলেও সেদিকে লক্ষ্য রেখে একটু সচেতন চেষ্টার তো প্রয়োজন, যে-চেষ্টা স্পষ্টই বুদ্ধদেববাবু করা দূরে থাক মনেও তোলেন নি। পাশাপাশি নাম উল্লেখ করলেই তুলনার কথা ওঠে না, তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহির্দৃষ্টি আর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এই চেষ্টা আপনা-থেকেই এবং অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিকভাবে করেছিলেন। তাই ভারতবর্ষ ও বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর বোধ, তাঁর অন্তরের সাড়া আমাদের কাছে এত মহার্ঘ, আর যেখানে

মানসিকতা প্রায় নিঃস্ব, সংবেদনশীলতাও রিক্ত, সেখানে যা শোনা যায় তা ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন কিছু নয়।

বুদ্ধদেববাবুর বাক্যবিলাসকে উপেক্ষা করতে পারি কিন্তু শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকার 'রবীন্দ্রনাথও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধে যে-কথা বলতে চেয়েছেন তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে এবং অগণিত রচনায় ভারতবর্ষের স্বকীয়তার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা (যাকে একটু আতিশয্য করে "প্রাচ্যাভিমান" আখ্যা দেওয়া হয়েছে) আর "ভবিষ্যতের উপযোগী পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আন্তরিক প্রীতি" এই দুই বস্তুর পর্যালোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে মোটামুটি ১৯০৭ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় চলেছিল প্রাচ্যাভিমানের পর্ব, আব তারপর থেকে, নিদেনপক্ষে ১৯১১-১২ থেকে শেষজীবন পর্যন্ত "পশ্চিমীদৃষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত"। তার্কিকের মতো না লিখে জিজ্ঞাসু চিত্ত নিয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন বলে সুশোভনবাবু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে কবির রচনায় "একই সময়ে বিভিন্ন বিরোধী সুর ধ্বনিত হতে পারে"। তাই এক জায়গায় ১৯১১ সালের এক চিঠি উদ্ধৃত করেছেন নিজের যুক্তির স্বপক্ষে: "আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই··· বাস্‌রে! এমন নীরন্ধ্র বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথনি! বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে কি?" কিন্তু তখনই বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে ১৯১২ সালেই "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুত্বেরই সংস্কৃত রূপ বলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রবন্ধেই আছে কবির অবিস্মরণীয় কথা—বাইরে থেকে আমরা যা নিয়ে থাকি সেদিকে মন থাকে সচেতন অথচ ভিতর থেকে পাওয়া জিনিসের কথা মনে থাকে না, ঠিক যেমন মাহিনার চেয়ে 'বোনাস'-কে (bonus) বড় করে দেখতে প্রবৃত্তি হয় আর মাথার ভার না বুঝলেও পাগড়ীর ওজন সম্বন্ধে মন সজাগ থাকে!

যাই হোক, গবেষকের সততা নিয়ে অধ্যাপক সরকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে অশীতিপর জীবনের বহু বিচিত্র পর্যায় সত্ত্বেও রবীন্দ্রচিত্তের যে অখণ্ডতা জাজ্জ্বল্যমান সেই অখণ্ডতাকে এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করছে। "পশ্চিমী হাওয়াকে স্বীকার করা" (এমন সময়ে যখন "পশ্চিমী হাওয়া" বাস্তবিকই এদেশে কতকটা বইতে আরম্ভ করেছে)

আর "পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা" সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়ার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রভেদ রয়েছে। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে "সমাজসংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ উনিশশতকে ইউরোপ থেকে সঞ্চারিত হচ্ছিল বলেই এসব কিছু সমর্থনের ঝোঁকটাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলার সার্থকতা আছে", সুশোভনবাবুর এই সিদ্ধান্ত ইতিহাস কিংবা সাধারণ বুদ্ধি কোনো সূত্র থেকেই গ্রহণ করা যায় না। আর আমি কোনোক্রমেই স্বীকার করতে পারি না—সুশোভনবাবু কিছুদিন আমাদের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু আর্যবাক্য বলেও মানতে পারি না তাঁর কথা: "আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নে যে-ভারতবর্ষ বিরাজ করছে, তার বাহ্যিক আকার যেরূপই নিক্ না কেন, অন্তর্বস্তুটুকুকে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই। যে সমাজবাদ আমাদের কাম্য, ন্যায্যত তার সঙ্গতি পাই প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে, যে-পশ্চিমী দৃষ্টি থেকে তার উদ্ভব ও পরিণতি।" আমার আশঙ্কা যে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়-'এ (১৯১২) যে ধরনের মনোভাবের শিকড়হীন অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন, সুশোভনবাবুর মতো মনে যেন এখনও তার ছাপ লেগে থেকে চিন্তাকেও নিষ্প্রাণ করে ফেলেছে।

সম্প্রতি যে-একটি বই দেখেছি তার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। J. P. Corbett, "Europe and the Social Order" (Leyden, 1959) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: "ইয়োরোপের লোক আমরা ছিলাম দুনিয়ার অবিসম্বাদী অধিপতি, অথচ আজ আমাদেরই জায়গা নিয়ে ঝগড়া চলছে। এতে আমরা কুপিত। আধুনিক বিজ্ঞান এবং শিল্পক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হল আমাদের সৃষ্টি, অথচ আজ দেখছি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ধনসম্পদে আমাদের ছাপিয়ে গেছে আর শীঘ্রই রাশিয়া পর্যন্ত আমাদের হারিয়ে দেবে। এতে আমরা ঈর্ষান্বিত। উনিশ শতকে আমরাই ধনতন্ত্র আর সাম্যবাদের জন্ম দিলাম, কিন্তু আজ দেখছি ঐ দুই বস্তু আমাদের এলাকার বাইরে জাঁকিয়ে বসেছে আর এমন অভূতপূর্ব শক্তির অধিকারী হয়েছে যে আমাদের সমেত সারা দুনিয়াকে তারা চেপে মারার ভয় দেখাচ্ছে তাদের পরস্পরবিরোধী দাবি নিয়ে। এতে আমরা অত্যন্ত শঙ্কিত। ইতিমধ্যে পৃথিবীর দশদিক জুড়ে যারা আগে ছিল আমাদের অনুগত, তারা আজ আমাদের তারিফ না করে কেবলই সন্দেহ করছে, আমাদের শাসন না মেনে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমরা অনেকে খুবই ক্রুদ্ধ।" এই ইংরাজ অধ্যাপক কিন্তু গ্রন্থটিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে ইয়োরোপ যা নিয়ে এখনও গর্বান্ধ, তা এমন জিনিস যে কারও মৌরসী পাট্টা সেখানে অচল।

ইতিহাস অবশ্যই বলে যে অন্তত গত চার পাঁচশো বৎসর ধরে ইয়োরোপের গতি ছিল বেগবান আর ভারতবর্ষের মতো দেশে আমরা স্থবিরতার দিকে ঝুঁকে পড়ছিলাম—এর শাস্তি যখন আমরা দিয়েছি ও দিচ্ছি, তখন একথা হাড়ে হাড়ে বুঝি বলাও ভুল হবে না। এই পার্থক্যের কারণ বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে, অন্যত্র নয়। কিন্তু "সমাজ সংস্কার যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ"-কে পশ্চিম ইয়োরোপের বদান্যতায় পাওয়া জিনিস বলে সুশোভনবাবু নিশ্চয়ই মনে করেন না। ভারতবর্ষের সমাজ যে এতকাল টিঁকে থেকেছে, সেটা কি এই কারণে যে আমরা কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা দিতেই অভ্যস্ত, সময়ের দাবির সঙ্গে সমাজের গঠন ও রীতিনীতির সামঞ্জস্য সাধন অর্থাৎ সংস্কার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ? এদেশের ইতিহাস তো শুধু মানুষের কোনোক্রমে বেঁচে থাকার ইতিহাস নয়। আমাদের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা কি বহু গ্লানি বহু অপরাধ সত্ত্বেও দেদীপ্যমান্ নয় ? যুক্তিবাদের আধুনিক মূর্তি যাই হোক না কেন, জ্ঞানের সন্ধানে যুক্তির অকাট্যতা সম্বন্ধে অচেতন থেকেই কি ভারতবর্ষের সভ্যতা বেঁচে থাকতে পেরেছে ? 'মানবতাবোধ' কি এদেশের অভিজ্ঞতায় অপরিচিত অনুভূতি, শুধু উনিশ শতকের "পশ্চিমী হাওয়া" কি তাকে জাগিয়ে তুলেছে, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাওয়ার মতো ? ভারতভূমিতে প্রতীচ্যের সদাশয় আবির্ভাব বিনা কি সমাজবাদ আমাদের কাছে অগম্য আর অবোধ্য থেকে যেত ? মনে পড়ছে রজনী পাম দত্তের কথা যে পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকেই যখন সমাজবাদের বাস্তব উদ্ভব, তখন ইয়োরোপের চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে স্পর্শ না করলেও দেখতাম যে বেদ, উপনিষদ ও অনুরূপ ভাবাদর্শ থেকেই সমাজবাদের অভ্যুদয় ঘটত। সুশোভনবাবু এ সমস্ত কথা খুবই ভালোভাবে জানেন বলে আমার অনুযোগ যে অত্যন্ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিনি বিষয়টির অবতারণা করেছেন, আলোচনায় বহু চিন্তনীয় বস্তু এনে ফেলা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তকে একদেশদর্শী করে ফেলেছেন। আর যার সম্পর্কেই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত শুধু অমূলক নয়, তাকে অসঙ্গত বললেও ভুল হবে না। ১৩৩৬ সালে লেখা "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত" প্রবন্ধে কবি অতি সহজ ভাষায় অত্যন্ত গভীর কথাই বলেছিলেন : "গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না। যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই।"

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আর কর্মে তাঁর দেশের মাটির এই মূলগত প্রাধান্য সর্বদা ছিল বলেই তা এত খাঁটি, এত সঙ্গত, এত সার্থক। ১৩১৫ সালে লেখা 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে তাই তিনি লিখেছিলেন: "রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই, তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এই জন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিলাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।" আরও লিখেছিলেন: "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।" পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব খাড়া করে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষার্ধে পূর্বোক্তের জয় আবিষ্কার করার প্রকৃত কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে তো মনে হয় না। উভয় ধারার মধ্যে সমন্বয় প্রয়াস এক তৃতীয় ধারায় উত্তরণে সাফল্য লাভ করল কি না এই আলোচনা চলে চলুক। কেবল একথা অকাট্য যে নিজের ঘর ছেড়ে কিংবা তাকে হারিয়ে ফেলে বহির্বিশ্বকে কখনও আতিথ্যগ্রহণে আহ্বান জানানো সম্ভব হয় না। যে মাটির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক তাকে অস্বীকার করে দুনিয়ার সঙ্গে মিতালি ঘটে না। "বিশ্বদেব" দেখা দিয়েছিলেন কবিকে "পূর্বগগনে", তাঁরই একান্ত "স্বদেশে"।

১৩৪৭ সালের ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, "আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" তাই প্রাচ্যাভিমান যাকে বলা হয়েছে, সে বস্তু কখনও তাঁর সত্তা ও সৃষ্টিকে সীমিত ও সংকীর্ণ করতে পারে নি। আর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা উঠেছে তা মানসিকতার সমুচ্চ শিখরে যে প্রকৃতই অপ্রাসঙ্গিক তা বোঝা হয়তো কঠিন নয়। কবি স্বয়ং মুগ্ধমনে ঋগ্বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন: "প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, আবার দিয়ো ভোগ, উচ্চরস্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।" পাশ্চাত্ত্য

সভ্যতার সমুজ্জ্বল গ্রীক প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মনের আকৃতি ও আত্মশ্লাঘা এর চেয়ে অর্থঘন প্রকাশ কি কখনও পেয়েছে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একান্ত স্বদেশজ নির্লিপ্তি নিয়ত তাঁকে আকর্ষণ করেছে—এর ফলে কবি হিসাবে তাঁর বহির্দৃষ্টি মাঝে মাঝে হ্রস্ব হয়ে গেছে, অনুভূতির বিশুদ্ধ মানবীয় অন্তঃসার কিঞ্চিৎ শীর্ণ হয়ে পড়েছে, অথচ মানসিকতার প্রসার ও মুক্তির অনন্ত মহিমা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'ঘরে-বাইরে'-তে যে সন্দীপের "মাংসবহুল আসক্তির" কথা শুনি তাকেও বলতে হয়েছে যে আমাদের গর্ভধারিণী এই মহাদেশ নিরাসক্তির যে মোহে আমাদেয় টেনে রেখেছে তা থেকে নিষ্কৃতি বুঝি সম্ভব নয়।

'গোরা' উপন্যাসকে প্রাচ্যাভিমান থেকে পশ্চিমী আদর্শের প্রতি অনুরাগে উত্তরণের উদাহরণ মনে করার চেয়ে সংকীর্ণ নিষ্প্রাণ অবাস্তব সিদ্ধান্ত কিছু হতে পারে ভাবা কঠিন। বস্তুত গোরার প্রচণ্ড প্রাচ্যাভিমান তার অজানিত পাশ্চাত্ত্য উত্তরাধিকারেরই এক নিদর্শন; বিশ্বাস ও ব্যবহারের মধ্যে প্রখর সামঞ্জস্য সাধন প্রচেষ্টায় অবিরাম লিপ্ত হয়ে থেকে সংসারে জাতিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সুস্পষ্ট মনোবৃত্তি গোরার মধ্যে দেখা যায়, তা ভারতবর্ষীয় হিন্দুর সর্বত্রচারী অথচ কথঞ্চিৎ শিথিল ধ্যানপ্রবণতার বিপরীত বললে খুব বেশি ভুল হয় না। সুশোভনবাবু তাঁর প্রবন্ধে উপন্যাসের শেষে গোরার অবিস্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।... সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি।" এ উক্তি যে প্রকৃত প্রাচ্যাভিমানী উক্তি, পশ্চিমী দৃষ্টির কাছে প্রাচ্যাভিমানের পরাজয় যে এতে সূচিত হচ্ছে না, তা কি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে? আর "গোরা"-র যে চরিত্রকে মূল প্রতীক বলা যেতে পারে, তা হল আনন্দময়ী, যিনি ঐকান্তিকরূপে ভারতীয়, যাঁর সংযম, ঔদার্য, বাৎসল্য, করুণা ভারতবর্ষের মতোই তাঁকে মহীয়সী করে রেখেছে। মনে পড়ে যায় ১৩০৯ সালে লেখা "নববর্ষ" প্রবন্ধের কথা—"কর্ণ যেরূপ সহজ কবচ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি সেইরূপ একটি সহজ বেষ্টনের দ্বারা আবৃত। সর্বপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে; তাই সে ভাঙিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ

তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না, সে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যে একাকী বিরাজ করে।"

যদি 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হত এই যে "খাঁটি প্রাচ্যাভিমানের পরিবর্তন-বিমুখিতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধরেছিলেন," তাহলে বিতর্কের কারণ ঘটত না। কিন্তু যখন পড়ি যে প্রাচ্যাভিমান থেকে মুখ ফিরিয়ে কবি "নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন" দেখলেন, "যাকে আমাদের বিশ্লেষণে পশ্চিমী দৃষ্টি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়ার উপায় নেই", তখনই মুশকিল বাধে। ঐ-একই সংকলনে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা পাশাপাশি পড়লে সুশোভনবাবুর বহু ভ্রান্তি ধরা পড়বে। আর শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবিশ রীতিমতো গবেষণা করে 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' বলে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও বোঝা যাবে যে সুশোভনবাবুর সিদ্ধান্ত একদেশদর্শিতাদুষ্ট। "পশ্চিমী সভ্যতা" কথাটার স্পষ্ট সংজ্ঞা কোথাও ঠিক নেই বলেও আবার অসুবিধা ঘটে, বিশেষত যখন তিনি আজকের ভারত সম্বন্ধে অপ্রসন্ন হয়ে বলেন: "প্রাচ্যাভিমান আজও সুপ্রতিষ্ঠিত, অথচ দেশের গতি পশ্চিমী সভ্যতার দিকে।" অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পের বিকাশ, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাবনা ইত্যাদিকে শুধুমাত্র "পশ্চিমী সভ্যতা" বলে একই বস্তুর আনুষঙ্গিক ব্যাপার মনে করার মধ্যে বাস্তবিকই বড়দরের গলদ আছে।

ভারতবর্ষে ধর্মের নামে যে অপকর্ম বহুদিন ধরে চলে এসেছে কিংবা জাতের যে বিড়ম্বনায় এদেশ ধিক্কৃত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ এবং লেখনী কখনও নিরস্ত হয় নি। কিন্তু মানবতাবোধ উনিশ শতকের ইয়োরোপ থেকেই "সঞ্চারিত" হচ্ছিল এমন কথা মেনে নিতে তিনি কখনও প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮৯৩ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্র থেকে চিন্মোহনবাবু যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা এখানে স্মরণীয়। "Sacredness of life সম্বন্ধে ভারতীয়দের কোনো ধারণা নেই"—জনৈক ইংরেজ প্রিন্সিপালের এই কথায় জ্বলে উঠে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "যারা আমেরিকায় Red Indian-দের উচ্ছন্ন করে দিলে, যারা নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ানদের মেয়েদের পর্যন্ত জন্তু শিকারের মতো বিনা-দোষে বিনা-কারণে গুলি করে মারত, যারা আমাদের দেশী লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকদের কাছে দণ্ডযোগ্য হয় না, তারা

নিরীহ করুণপ্রকৃতি হিন্দুদের কাছে Sacredness of life এবং high standard of morals preach করতে আসে ?” কবির জীবনদীপ যখন নির্বাপিতপ্রায় তখনই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা মিস্ এলিয়ানর র‍্যাথ্‌বোন-এর পত্রোত্তরে কিছুতেই ভারতে ইংরেজ শাসনের গুণ গাইতে রাজী হন নি, বলেছিলেন ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব তো আছেই, আরও বেশী অভাব হল পিপাসার জলের, আর তিনি ভুলতে পারবেন না কখনও যে আমাদের দেশের মেয়েদের কাদা ঘেঁটে একটু তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করে ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটতে হয়ে থাকে। হয়তো শুনব যে এসব কথা বলে কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন কিভাবে সাড়া দিত জানতে হলেও এগুলো স্মরণ করার দরকার আছে। আর একথা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে “বসুধৈব কুটুম্বকম্” যে-দেশের মুখে-মুখে প্রচলিত প্রবাদের মতো জীবনসত্যকে ধারণ করেছে, যে-দেশে আদিম জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং দূরত্ব স্বীকার করার মধ্যে যে অনাত্মীয় ভাব আছে তা সত্ত্বেও কখনও সেই আদিম জাতিকে একেবারে বিলোপ করার চেষ্টা দেখা যায় নি, যে-দেশের সাধুসন্তের মধ্যে দেখা গেছে এমন মনের মুক্তি যার তুলনা জগতে দুর্লভ, “সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই” একথা যে-দেশে সহজ ও স্বাভাবিক সুরে উচ্চারিত হয়েছে, সে-দেশকে মানবতাবোধ “পশ্চিমী দৃষ্টির” কল্যাণে ধার করে আনতে হয়েছে বলা চলে না। ১৩৩৪ সালে ‘বৃহত্তর ভারত’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “আমাদের দেশেও দিগ্‌বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান্ দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।” ইয়োরোপের ইতিহাস স্বল্প পরিমাণে তো জানতে হয়েছে, কিন্তু কেমন করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মানতে পারি অধ্যাপক সরকারের কথা : “আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নে যে ভারতবর্ষ বিরাজ করছে তার বাহ্যিক আকার যে রূপই নিক না কেন, অন্তর্বস্তুটিকে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই ?”

গণ্ডগোল হয়েছে সব চেয়ে বেশী যখন অধ্যাপক সরকার একেবারে দ্বিধাহীন ভাষায় বলেন যে আমাদের কাম্য সমাজবাদের সঙ্গতি পাওয়া যায় “প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে, যে পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও

পরিণতি।” এই বিষয় নিয়ে মস্ত বড় একটা কেতাব লিখলেও সব কথা বলা যায় না; তাই সে-চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের একটা ধারণা ছিল যে সমাজবাদ দুনিয়ার সব দেশেই খাপ খেয়ে যাওয়ার মতো বস্তু, আর স্থানকালপাত্র ভেদে তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর পরিবর্তন মূলগতভাবে নির্ভরশীল বলে। তবে একথা শুনি নি যে “পশ্চিমী দৃষ্টি” আর “পশ্চিমী সংস্কৃতি” এই দুই জিনিসকে আয়ত্ত না করতে পারলে সমাজবাদের ধারেকাছে পৌছনো যায় না। পশ্চিম-ইয়োরোপ কিংবা উত্তর-আমেরিকায় বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রকৃষ্ট বিকাশ সত্ত্বেও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল যে সমাজবাদ পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হল তুলনায় পশ্চাৎপদ রুশ দেশে এবং ইয়োরোপ ও এশিয়ার এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে, যেখানে পশ্চিমের তুলনায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক পিছিয়ে ছিল। জার্মানীর বার্লিন থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে সমাজবাদ আজ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এশিয়া আর আফ্রিকার “অনগ্রসর” দেশগুলি ক্ষিপ্রবেগে সমাজবাদ স্থাপনের প্রয়াসে আজ উন্মুখ। “পশ্চিমী দৃষ্টি”-বিনা এই বিরাট প্রযত্ন যদি বিফল হওয়া অনিবার্য তো বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার কথা!

সমাজবাদের উদ্ভব, বিবর্তন ও প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও সমাজ-পরিস্থিতির বিপুল অবদান অস্বীকার করার মতো দুর্বুদ্ধি আশা করি কারও হবে না। কিন্তু যান্ত্রিক আলোচনার দোষই হল এই যে চিন্তা এবং সিদ্ধান্তকে বসানো হয় স্বকপোলকল্পিত এক কৃত্রিম পরিবেশে, যেখানে জীবনের জটিল পরস্পরসম্পর্কের অস্তিত্ব নস্যাৎ হয়ে গেছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লযোদ্ধার মতো দুই চিন্তাধারার মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। অধ্যাপক সরকার যদি দয়া করে আমাদের মতো ভাগ্যহত দেশে সমাজবাদের অভ্যুদয় এবং আমাদেরই পরিবেশে তার প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর তথ্যানুগ বিচারবুদ্ধি পরিচালনার চেষ্টা করেন তো বাধিত থাকব।

“পশ্চিমী দৃষ্টি” এবং “পশ্চিমী সংস্কৃতি”-কে ন্যূন করে দেখার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই; পূর্বেই বলেছি ইয়োরোপ সম্বন্ধে আমার বাস্তবিকই যে-মনোভাব তাকে মমতা বললে অন্যায় হবে না। কিন্তু একথা আমার মনে হয় যে গ্রীক সভ্যতার যুগ থেকে পশ্চিমী সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ জাতকে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখার একটা

প্রবণতা যেন আছে, পূর্বদেশাগত খ্রীষ্টধর্মও তাকে পুরোপুরি বদলাতে পারে নি। অন্ধকার আফ্রিকায় ইসলাম যে-ভাবে প্রবেশ করেছে, তা থেকে খ্রীষ্টধর্মের প্রবেশে বড় দরের একটা প্রভেদ আছে। "The lesser breed without the law" বলে কিপলিং যাদের উল্লেখ করেছেন, তারা চিরকালই "lesser breed" থেকে যাবে, এ রকম ধারণা "পশ্চিমী দৃষ্টিতে" প্রায় চিরস্থায়ী হয়েছে। আমাদের মতো যারা "অন্ধকারাচ্ছন্ন" বলে পশ্চিমীদের সদয় দৃষ্টি পেয়েছে, তাদের সেবায় পশ্চিমী সদাশয়েরা অবশ্যই অগ্রসর হয়েছেন, শ্বেতাঙ্গ মিশনারিরা যে-কাজ করেছেন ও করছেন তা নমস্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের উপকারকদের মনে তাঁদের অনপনেয় ও শাশ্বত শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। আমাদের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে "পশ্চিমী" পণ্ডিতেরা যে বিপুল জ্ঞানানুসন্ধিৎসা দেখিয়েছেন, তা পরম শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে তাঁরা সকলেই আমাদের বর্তমান সম্বন্ধে স্থির করে রেখেছেন যে আমরা নাবালক, মনুষ্যত্বের বিচারে চিরপঙ্গু, কিঞ্চিৎ করুণার পাত্র বটে কিন্তু তাঁদের সমকক্ষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই আমরা রাখি না। সমাজবাদের অভ্যুদয় ও কর্মকাণ্ড "পশ্চিমী" এই দৃষ্টিকে আজ একেবারে বদলে দিয়েছে, আর তার কারণ হল এই যে শুধু পশ্চিম নয়, জগতের সর্বদেশের চিন্তা ও কর্মধারায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা কিছু বরণীয়, যা কিছু মানুষের সংসারকে মহিমময় করতে পারে, তাই হল সমাজবাদের প্রেরণা। ঠিক এই জন্য রবীন্দ্রনাথের চোখে সমাজবাদী রাশিয়া এত ভালো লেগেছিল; তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন: "নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলাম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব।...সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ মনে আপনি আসে যে নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তুলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে জাগে যে তাদের এই সাধনা সফল হোক।"

১৩২৮ সালে লেখা 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন: "সামনে এই প্রশ্নটা দেখা যায়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছো?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা

দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছিনে, ইংরাজিতে বললে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত।" [অনেকটা এই ধরনের কথা ১৯৩০ সালেও কবি বলেছিলেন।] তাই তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল: "পূর্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে।" "এই মিলনেব অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব, আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।" তাই তাঁর প্রার্থনা ছিল এই যে "ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।" এই সাধন-সম্পদ মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে দেখেছিলেন বলে 'সত্যের আহ্বান' (১৩২৮) প্রবন্ধে তিনি লেখেন: "কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম, তাঁকে আমরা প্রণাম করি।"

১৩৩১ সালের একটি লেখায় বড় দুঃখেই কবি বলেন: "আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে 'Made in Europe'।" 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' (১৩৩৬) আলোচনা উপলক্ষে তিনি লেখেন: "সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্মসংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল। বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষভাবে দীক্ষিত করেছে।" আরও বলেন: "রাজসাহী সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি

তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন।...পরবৎসরে রুগ্নশরীর নিয়ে ঢাকা কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্যোগ করেছি।" অধ্যাপক সরকারের প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা নেই, কিন্তু তাঁরই প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থন করে সেপ্টেম্বর মাসের 'Seminar' পত্রিকায় শ্রীমান মোহিত সেন বিদ্যাসাগর চরিত্রের উল্লেখ করে পশ্চিমী ভাবাদর্শকে জীবনে আয়ত্ত করার গৌরবময় উদাহরণ দেখিয়েছেন। অবশ্যই বিদ্যাসাগরের মহানুভবতায় পশ্চিমের বহু সদ্গুণ একান্ত সৌষ্ঠবের সঙ্গেই সন্নিবিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু "পশ্চিমী দৃষ্টি", "পশ্চিমী সংস্কৃতির জয়যাত্রা" যদি তাঁর জীবনে "অব্যাহত" হত তো তাঁর যে মূর্তি আমরা দেখতাম তা নিশ্চয়ই হত একেবারে ভিন্ন। অগ্রজ রামমোহন এবং অনুজ রবীন্দ্রনাথের মতোই বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য এই ভারতবর্ষের ভূমি থেকে তেজ ও জ্যোতিকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল ; আর ঠিক সেইজন্য তাঁদের আসন "দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে।"

১৩০৯ সালে লেখা 'নববর্ষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে হয়তো সামান্য অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু শুধু ধ্বনিমাধুর্যে নয়, চিন্তাগৌরবেও তা আজ আমাদের শিরোধার্য :

"...বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, একথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, চরিত্র ভগ্ন বিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।...দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম রক্ষায় দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে,

স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিবে; ইংরাজি কোর্তা, ইংরাজের দোকানের আসবাব, ইংরাজি মাস্টারের বাক্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল, কোথাও থাকিবে না, কোন কাজেই লাগিবে না।···আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর আস্ফালন করতালি মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্‌বেলিত পশ্চিম-সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে; তখন দেখিব এই অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে।···

"জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে।···"

এরই সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখে 'সভ্যতার সংকট' আখ্যায় যে অতুলন ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন। "আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণীকে সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।" একে বাক্‌বিলাস মনে করার মতো ক্ষুদ্রতা আশা করি কারও নেই; আর ক্ষুব্ধ মনের জ্বালা এখানে সত্যকে বিকৃত করেছে বলে যদি কেউ স্থির করে বসেন তো সেটা ভ্রান্তি বলেই মনে করি। নিজের দেশ ও তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে অপরিমেয় আস্থা ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে নন্দিত করতে পেরেছিলেন, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের সমাবেশে প্রয়াসী হয়েছিলেন, বিশ্বকে আহ্বান করেছিলেন শান্তিনিকেতনের নীড়ে। ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে যখন বিপুল জন-অভ্যুত্থান তখন বিদেশ থেকে তিনি লিখেছিলেন: "আমার চিত্ত আমার দেশের সত্তার সঙ্গে প্রবল বেদনায় সম্মিলিত হয়েছে।" দেশের সত্তার সঙ্গে এই যে সম্মিলন-শক্তি তারই অভাবে আমাদের বহু কর্ম আজও নির্জীব ও নিষ্ফল হয়ে থাকে, কারণ "তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই, তাহা অসংলগ্ন, অসংগত, তাহার শিকড় ছিন্ন।" পরম শ্লাঘার সঙ্গে তাই স্মরণ করি যে ছিন্নমূলবৃত্তির প্রতিরোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর ভাস্বর জীবন ও কর্মযোগ দিয়ে।

'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

নরহরি কবিরাজ

১২৭৯ সালের (১৮৭২ খ্রীঃ) 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'বঙ্গদেশে কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৮০ সালের (১৮৭৩ খ্রীঃ) 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত প্রবন্ধগুলির ধারা অনুসরণ করে 'সাম্য' এই শিরোনামায় আরও তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিকে একত্র করে 'সাম্য' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে লিখেছেন যে 'বঙ্গদর্শন'-এ যখন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রকাশিত হয় তখন এই প্রবন্ধগুলি "কিন্তু যশোলাভ করিয়াছিল"। 'সাম্য' নামক পুস্তিকাখানিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই পুস্তিকার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও প্রথম সংস্করণের পরে আর এই পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত করেন নি।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—বঙ্কিমবাবু তাঁকে বলেছিলেন যে "সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।" (বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ ১৯৮)

বাঙলা সাহিত্যে 'সাম্য' পুস্তিকার আবির্ভাব নিশ্চয় এক স্মরণীয় ঘটনা। জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও লেখক কর্তৃক পাঠকদের কাছ থেকে এই পুস্তিকাখানির প্রত্যাহার-এটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার নয়।

আশ্চর্যের কথা, কেনই বা বঙ্কিম এই বই লিখলেন, কেনই বা তিনি এই বই প্রত্যাহার করে নিলেন—এই বিষয়টি আজও একটি হেঁয়ালি হয়েই রয়েছে।

আগেই বলেছি 'সাম্য' প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশ ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

যে সময়ে 'সাম্য' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়ে গ্রাম-বাঙলায় চলেছিল অভূতপূর্ব এক আলোড়ন।

সেটি ছিল কৃষক সংগ্রামের, কৃষক অভ্যুত্থানের যুগ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আগুন নিবতে না নিবতে ১৮৫৯ খ্রীঃ গ্রাম-বাঙলায় নীলচাষীরা গর্জে উঠেছিল। নীলবিদ্রোহের পর থেকে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত (এই বছরে ইংরেজকে 'প্রজাস্বত্ব আইন' পাশ করতে হয়েছিল) চলেছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের, চা-করদের বিরুদ্ধে কুলিদের বিরামহীন একের পর এক সংগ্রাম। বিশেষ করে ১৮৭৩ খ্রীঃ পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান গ্রাম-বাঙলায় নতুন এক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

বাঙলার কৃষকের এই সংগ্রামগুলি সেদিন প্রগতিকামী মধ্যবিত্তের মনকেও নাড়া দিয়েছিল।

নীলবিদ্রোহ চলাকালীন অবস্থায় দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের পরে মীর মশারফ হোসেন 'জমীদার দর্পণ' প্রকাশ করলেন। আর চা-বাগানের কুলিদের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখলেন নতুন নাটক—'চা-কর দর্পণ'।

বলাই বাহুল্য, বাঙলার কৃষকদের সংগ্রামগুলি দীনবন্ধু ও মীর মশারফ হোসেনের শিল্পী মনকে স্পর্শ করেছিল।

এই যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ক্রমে ক্রমে শুধু আবেগের ভিত্তিতে নয়, যুক্তির ভিত্তিতে, একটি তত্ত্বের ভিত্তিতেও কৃষকের অধিকারের প্রশ্নটিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন

তদানীন্তন কালে 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় কৃষকের পক্ষ নিয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলির কোনো কোনোটিতে কৃষকের অধিকারের প্রশ্নটিকে একটি পুরো তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার নানারকম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ হিসাবে এখানে 'সাধারণী' পত্রিকা থেকে শুধু মাত্র একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের (১৯শে মে, ১৮৭৫) উল্লেখ করব। 'কৃষক বিদ্রোহ' এই শিরোনামায় ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে—জমিদারদের সীমাহীন অত্যাচারের জন্যেই এই কৃষক বিদ্রোহের উদ্ভব। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে—এই অবস্থা চলতে থাকলে মাঝে মাঝে কৃষক বিদ্রোহ ঘটবে—এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কৃষকের অধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপন করে ঐ প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে

কৃষকেরা আর আগের মতো মুখ বুজে জমিদারদের অত্যাচার সহ্য করতে রাজী নয়। তারা এখন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন।

পরপারে 'সাধারণী' কৃষক বিদ্রোহের সমর্থনে একটি তত্ত্ব দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। সেই তত্ত্বটি হল—যেমন প্রাকৃতিক জগতের ক্ষেত্রে, তেমনি সমাজগঠন ও সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রেও জীবন পরিবর্তনের নিয়মের অধীন। পৃথিবীতে এই যে পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটছে একে বাধা দেবার ক্ষমতা কারুর নেই।

এই তত্ত্বটির ভিত্তিতে বিচার করে 'সাধারণী' কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে প্রগতিশীল ভূমিকা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা তাই কৃষক বিদ্রোহগুলিকে উপলক্ষ্য করে বলছেন :

সামাজিক স্থবিরতা থেকে নিশ্চয়ই সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লব কাম্য। কেননা সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে আমরা পাই জীবন-সাধনার, কর্ম-সাধনার ইঙ্গিত। ছয়জন জমিদারের স্বার্থের চেয়ে ছয় কোটি কৃষকের অধিকার ও স্বার্থ যে সমাজের কাছে বেশী মূল্যবান—সে কথা কে অস্বীকার করবে।

'সাধারণীর' উপরোক্ত বক্তব্যটিকে সে-যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিন্তায় একটি ব্যতিক্রম বলে মনে করার হেতু নেই। সে-যুগের কৃষক বিদ্রোহগুলি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে জমিদার-প্রজা প্রশ্নটি সম্পর্কেই শুধু কৌতূহল জাগিয়ে তোলে নি। এই প্রসঙ্গটি উপলক্ষ করে তাদের মনে আন্দোলিত হল বৃহত্তর একটি প্রশ্ন—সমাজের শ্রেণীভেদের প্রশ্ন, তথাকথিত বড়লোক-ছোটলোকের প্রশ্ন।

বস্তুতঃ জমিদার-প্রজা সম্পর্ককে, তথাকথিত বড়লোক-ছোটলোক সম্পর্ককে একটি পুরো তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার একটি রীতিমতো চেষ্টা এই সময়ে চলেছিল। এই সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিরা ইওরোপের প্রগতিশীল বুর্জোয়া চিন্তাধারা মন্থন করে তাঁদের মতের সমর্থনে যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করলেন।

মিল, বেন্থাম, প্রভৃতি বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের উদারতাবাদী দর্শন থেকে তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে যুক্তি বাছাই করলেন।

শুধু তাই নয়, এই সময়ে ইওরোপে সাম্য প্রশ্নটির সমাধান নিয়ে উপরোক্ত উদারতাবাদী চিন্তার পাশাপাশি আর একটি পেটিবুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক

ভাবধারা বিকাশলাভ করেছিল। বাঙলার প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত চিন্তানায়কেরা যে এই মতবাদের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন তারও পরিচয় মেলে।

এই প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে সে-যুগের মধ্যবিত্তের মধ্যে যে কৌতূহল জেগেছিল তার দু-একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

উল্লেখযোগ্য যে ১৮৭০ খ্রীঃ এম-এ পরীক্ষার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রশ্নপত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি স্থান পেয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল : "কমিউনিজমের লক্ষ্য কি ? ফুরিয়ের ও সেণ্ট সাইমন যে তত্ত্বটি প্রচার করেছিলেন যথাক্রমে তার বিবরণ দাও। (Bimanbehari Majumder—History of Political Thought, পৃঃ ৪৫০)

১৮৭৩ খ্রীঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় শেরপুরের পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহের (১৮২৪) একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিবরণে পাগলাপন্থী বিদ্রোহের নেতা টিপুকে পূর্ববঙ্গের "লুই ব্ল্যাঙ্ক" বলে অভিহিত করা হয়েছিল। টিপুকে লুই ব্ল্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করার কারণ টিপু প্রচার করতেন যে মানুষ মাত্রেই সমান এবং গরিব কৃষকদের পক্ষে বড়লোক জমিদারদের মানার কোনোই বাধ্যবাধকতা নেই। (ঐ, পৃঃ ৪৫০-৫১)

১৮৭৩ খ্রীঃ পাবনা বিদ্রোহের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে 'ঢাকা প্রকাশ' (জুলাই, ১৮৭৩) লিখেছিল জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করার যেমন অধিকার আছে, তেমনি কৃষকদেরও প্রকৃতিদত্ত অধিকার দাবি করার যুক্তিসম্মত কারণ আছে। পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রবাদীদের যুক্তি অনুসরণ করে ঐ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে—যাদের পরিশ্রমে জমি মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে উপরোক্ত জমি থেকে উৎপন্ন মুনাফার একাংশের উপর নিশ্চয়ই তাদেরও অধিকার আছে। এইজন্যই ইউরোপের কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ প্রস্তাব করেছেন যে শিল্পে নিযুক্ত কুলিরা শুধু মাইনে পাবার অধিকারী নয়, তাদের মুনাফার একটি ক্ষুদ্র অংশ পাবারও অধিকার আছে।

কৃষক বিদ্রোহগুলি যে উপেক্ষণীয় নয় এই বিষয়ে সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে :

> আমরা নিশ্চয় বলতে পারি—যদি সময় থাকতে এদেশের কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা না হয়, তাহলে আমাদের এদেশে "আন্তর্জাতিক সমাজের" অনুরূপ একটি আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হবে।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আমাদের

দেশের মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিরা ইওরোপীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিম-চিন্তাতেও এই যুগের মেজাজটি প্রতিফলিত হয়েছিল।

বঙ্কিম-চিন্তায় দুটি তরঙ্গ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। একটি কৃষক সংগ্রামের তরঙ্গ। আর একটি ইওরোপীয় সাম্যমূলক চিন্তার তরঙ্গ। এই দুই তরঙ্গের মিলন ঘটেছিল বঙ্কিমের 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে।

সমাজতন্ত্রবাদের ধারণাটির প্রতি বঙ্কিমের যে কৌতূহল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সে কৌতূহলের কূল কোনখানে তা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন—এক সময়ে তাঁর উপরে মিলের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল।

বেন্থামের ইউটিলিটেরিয়ান দানও যে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তারও প্রমাণ রয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের, বিশেষ করে রুশোর চিন্তায়, যে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিদ্রোহের বিকাশ ছিল তার প্রতিও বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি লিখেছেন—"বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য।"

"ফরাসী বিপ্লবে রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজগৃহ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল। সম্ভ্রান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল, পুরাতন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় গেল, মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল।...ফ্রান্স নতুন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইওরোপে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হইল,—মনুষ্য-জাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল।"

বঙ্কিমের মতে—রুশোর চিন্তার মূল কথা ছিল—"সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান।"

বঙ্কিম প্রুঁধোকে অভিহিত করেছেন রুশোর মানসশিষ্য বলে। তাঁর মতে অনেকে যাকে আমরা ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজম বলে থাকি এমনকি "আন্তর্জাতিকও" হল ফরাসী বিপ্লবের ফল। তাই তিনি লেখেন:

"'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল।..."কম্যুনিজম" সেই বৃক্ষের ফল। "ইণ্টারন্যাশনাল" সেই বৃক্ষের ফল।" (সাম্য)

এর পরে কমিউনিজম কি এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বঙ্কিম যে মতবাদগুলির পরিচয় দিলেন তা থেকে মনে হয় বঙ্কিম কার্ল মার্কসের লেখা কোনো পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। বঙ্কিমসাহিত্যে বা সমসাময়িক সাহিত্যে 'আন্তর্জাতিকের' উল্লেখ থাকলেও এই আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী বা কর্মপন্থা সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫০ খ্রীঃ এবং ক্যাপিটালের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ খ্রীঃ। বঙ্কিম বা বঙ্কিমপূর্ববর্তীদের সঙ্গে এই দুখানি পুস্তকের পরিচয় ঘটে নি।

কমিউনিজম বলতে বঙ্কিম বুঝতেন—ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজম। রবার্ট ওয়েন, লুইব্ল্যাঙ্ক, ক্যাবে, সেণ্ট সাইমন, ফুরিয়ের প্রভৃতির সমাজতন্ত্রবাদী মতবাদের সঙ্গে বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বঙ্কিম ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতি তাঁর আকর্ষণের উৎস কোন্‌খানে?

রীতিমতো ঐতিহাসিক কারণেই সেদিন ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভব হয়েছিল।

ইওরোপে তখন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর অতিক্রান্ত হয়েছিল। সেখানে তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বমুহূর্ত ছিল উপস্থিত। ফরাসী বিপ্লবে ইওরোপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরম সাফল্য সূচিত হয়েছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবে সামন্ততন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হবার পরেও ইওরোপের লোকে মুক্তির আস্বাদন লাভ করে নি। সেখানে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধের পর্যায় আরম্ভ হয়েছিল। কল্পনামূলক সমাজতন্ত্রবাদ ছিল এই ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর এক ধরনের পক্ষতা। শ্রমিক-শ্রেণীর এই পক্ষতা ছিল অত্যন্ত অপরিণত, অনেকাংশে ভুল ধারণায়

প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রয়োজন হয়েছিল নতুনতর মতবাদ—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-মতবাদ—যার রচয়িতা ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস্।

বস্তুত মিল, বেন্থামের চিন্তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদীদের চিন্তার মিল ছিল অতি অল্প। মিল ও বেন্থাম ছিলেন ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সাম্য স্থাপনের পক্ষপাতী। আর সমাজতন্ত্রবাদীরা ছিলেন ধনতন্ত্রবাদের বিরোধী।

তাহলে কথা উঠছে—বঙ্কিম সোশ্যালিজম, কমিউনিজম, ইউটেলিটেরিয়া-নিজম প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে এক গোত্রে ফেলেছিলেন কিভাবে?

মনে রাখা প্রয়োজন বঙ্কিম যখন 'কমলাকান্ত' বা 'বাহুবল ও বাক্যবল' বা 'সাম্য' প্রবন্ধ লেখেন তখন আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দূরের কথা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বমুহূর্ত মাত্র উপস্থিত।

এক কথায়, আমাদের দেশের জাগরণের পক্ষে তখন প্রয়োজন ছিল গণতান্ত্রিক ধারার উদ্বোধন। ইওরোপের গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি তাই সেদিনকার মধ্যবিত্তের ছিল স্বাভাবিক আকর্ষণ।

এই অবস্থায়, কৃষক বিদ্রোহগুলি যখন সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রশ্নটি দেশবাসীর সামনে বড় করে তুলে ধরল, তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ইওরোপের সামন্ততন্ত্রবিরোধী চিন্তাধারার, সাম্যমূলক চিন্তাধারার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে উৎসুক হলেন।

বঙ্কিম ইওরোপীয় চিন্তায় এই সামন্ততন্ত্রবিরোধী চিন্তার খোঁজ নিতে গিয়ে মিল, বেন্থাম, সোশ্যালিজম বা কমিউনিজমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি তাই সমাজতন্ত্রবাদের নিজের মনোমত ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন—"সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণের জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইওরোপে সোশিয়ালিষ্ট, কমুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত।" (বাহুবল ও বাক্যবল)

বস্তুত সামন্ততন্ত্রবিরোধী মতবাদ হিসাবেই বঙ্কিমের চোখে সোশ্যালিজমের ছিল আসল মূল্য। এই মতবাদের ধনতন্ত্রবিরোধী মর্মটিকে তিনি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন নি। ধনতন্ত্রবিরোধিতার প্রশ্নটি তখন ভারতের পক্ষে ছিল নিতান্তই অবাস্তব।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিম ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য (Equality) মন্ত্রের উপাসক। সাম্য বলতে তিনি বুঝতেন—Equality, Socialism নয়। দেশের সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক জাগরণের স্বার্থে তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদটিকে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র।

অবশ্য, এই সামন্ততন্ত্রবিরোধিতার ব্যাপারটির মধ্যেও ছিল নানা রকমের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। ইংরেজশাসনের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় এঁরা চিন্তায় ব্রিটিশবিরোধী হয়েও কার্যক্ষেত্রে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতেন। তেমনি দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সম্পর্কে সচেতন হলেও তাঁরা কার্যক্ষেত্রে অনেকাংশে তার পক্ষতা করেই চলতেন।

১৮৫৯-১৮৮৫ খ্রীঃ ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ হওয়ার ফলে তাঁরা সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হলেন। তার বিরুদ্ধে এখানে-ওখানে কলমও ধরলেন। কিন্তু সম্মতিপূর্ণভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল না।

পাবনার কৃষক বিদ্রোহ এক সামাজিক বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করল তখন সরকার এবং সরকার সৃষ্ট সামন্ততন্ত্র এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংগ্রামী কৃষককে সরাসরি সাহায্য করতে ভয় পেয়েছিলেন।

এই সময়কার সংবাদপত্রগুলি কৃষকের প্রতি সমর্থন জানিয়েও সম্পাদকেরা এই সামাজিক বিপ্লবের তীব্র নিন্দা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও মীর মশাররফ হোসেন লিখিত 'জমিদার দর্পণ'-এর সমালোচনা (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০) প্রসঙ্গে খোলাখুলি লিখলেন :

"এই দর্পণে জমীদারের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহা বিকৃত কি প্রকৃত সে বিষয়ের আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহি না, এ সময় নহে। বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি, এই পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিতকামনা আমরা কখন ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলায় প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এসময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।"

নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের 'জমীদার ও প্রজা' নামক বইখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০) তিনি একই সুরে একই কথার পুনরুক্তি করলেন :

"...আমরা যে ইহার বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না তাহাতে আমাদের দুঃখ রহিল। জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের যাহা

বক্তব্য তাহার কিয়দংশ বঙ্গদেশের কৃষক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। আর যাহা বলিতে বাকি আছে, তাহা এখন অসময় বলিয়া বলা হইল না। সেই জন্যই এ প্রবন্ধের বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম না।"

'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নানা কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম হলফ করেছেন এই বলে যে—"আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।"

'সাম্য' প্রবন্ধ প্রকাশে ইংরেজ ও জমিদারেরা যে চটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'সাম্য' প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ করে (বিশেষ করে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইনের পরে) তিনি সরকার ও জমিদারদের আরও চটাতে চান নি—এই কথা মনে করা কি অন্যায় হবে? বস্তুতঃ, একথা মনে করার কারণ আছে যে বঙ্কিম তথা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সেদিন যে দ্বৈতচরিত্র ছিল, সেই দ্বৈতচরিত্রের প্রভাবেই 'সাম্য' প্রবন্ধের যেমন প্রকাশ, তেমনি তার পুনর্মুদ্রণে আবার আপত্তি।

বঙ্কিম চিন্তায় তথা উনবিংশ শতাব্দীর সকল চিন্তানায়কের চিন্তায় স্ববিরোধিতা ছিল সত্য। কিন্তু এই স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও এই চিন্তাধারা ছিল মূলত প্রগতিশীল। আমাদের দেশে দেশপ্রেমিক ভাবধারা, গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারে তাঁরাই ছিলেন অগ্রদূত।

বিশেষ করে কৃষক সমস্যার প্রতি সর্বাঙ্গীণ উপেক্ষার যুগে যাঁরা কৃষকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কৃষকের জীবনসংগ্রামকে রূপ দান করেছেন, যাঁরা কৃষক আন্দোলনের পক্ষে তত্ত্ব দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন; তাঁদের সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই চিরদিনের জন্য অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

যাঁরা আমাদের দেশে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক মতবাদ আমদানি করেছেন, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে দেশের লোকের মধ্যে যাঁরা কৌতূহল জাগিয়েছেন তাঁরা শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নয় বাঙলার সমগ্র জনগণেরই শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য পাত্র।

বাঙলার প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের আজ তাই কাজ হল উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে যে গণতন্ত্রের সুর ছিল তার মধ্যে জনগণের প্রতি যে সহানুভূতি ছিল তাকে জনগণের সমক্ষে তুলে ধরা। বঙ্কিমের 'সাম্য' ছিল এই গণতান্ত্রিক সাহিত্যধারায় এক উজ্জ্বল পদক্ষেপ। তাই 'সাম্য' প্রবন্ধের চাই প্রচার। সাম্য প্রবন্ধের চাই যথাযথ ব্যাখ্যা। সাম্য প্রবন্ধের চাই ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক মূল্য বিচার।

রবীন্দ্রচর্চা

সরোজ আচার্য

রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপনে 'বার্ডোলেট্রি'র আতিশয্য থেকে নিষ্কৃতি নেই। এর পর আছে স্বত্বের মামলা। রবীন্দ্রনাথ কে এবং কী ছিলেন নয়, রবীন্দ্রসাধনায় স্বত্বাধিকার বা উত্তরাধিকার কার, তাই নিয়ে তকরার। রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙালী, না খাঁটি ভারতীয়, না কি রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্ন ইওরোপীয়; তাঁর আন্তর্জাতিকতার উৎস প্রাচীন ঔপনিষদিক ভাবধারা, না নব ইওরোপীয় মানবতন্ত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গতা-পুষ্ট, এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং উত্থাপিত হওয়াটা আশ্চর্য নয়। তবে মুশকিল এই যে, এ-সব প্রশ্নের আলোচনায় যুক্তিনিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতা যে-পরিমাণ থাকা বাঞ্ছনীয় রবীন্দ্রানুরাগীরা সকলে সর্বত্র সে-বিষয়ে অবহিত নন। রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে স্বত্বের এবং উত্তরাধিকারের মামলা জেতার জন্য 'শনিবারের চিঠি', বুদ্ধদেব বসু, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাবাদীরা এবং আরো অনেকে নানা দিকে এলোপাথাড়ি শরসন্ধান করেছেন, যার ফলে সম্প্রতি রবীন্দ্রানুশীলনের নির্মল প্রতিবেশটি পরস্পর বিদ্বেষে, অতিকথনে কলুষিত হয়েছে বলা অন্যায় হবে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অতিকথনে আমরা প্রায় সকলেই অবশ্য অল্পবিস্তর অভ্যস্ত। ব্যক্তিপূজায় আমাদের বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিগত বিরাগ বা অনাসক্তি কোনোকালেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ নয়। রাষ্ট্রনেতা, ধর্মগুরু, মহাকবি কিংবা বিজ্ঞানী সবাইকেই প্রায় একই প্রকারের বিশেষণে সবিশেষ ভূষিত করে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সমপর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টায় আমাদের অনেকেরই উৎসাহ অপরিসীম; এমন কী ভজন-পূজনের সনাতন মন্ত্র ও মুদ্রাগুলি প্রয়োগেও আমাদের দ্বিধা নেই। যে কারণে গত পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারাবাহিক অনুশীলন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রয়াস রয়ে গেছে সীমাবদ্ধ, ভগ্নাংশতুল্য, প্রচারিত হয়েছে প্রধানত রবীন্দ্র-প্রতিভার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞপ্তি। অতুলচন্দ্র গুপ্ত যথার্থ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভাকে আমরা আত্মসম্মান বাঁচাবার দুর্গের মতো ব্যবহার করেছি।

'পশ্চিম-সভ্য জগৎকে ডেকে বলেছি, আমরা পিছিয়ে-পড়া পরাধীন জাতি, কিন্তু তার মধ্যেও দেখ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর সমতুল্য সাহিত্য-স্রষ্টা তোমাদের সব ইওরোপেও কজন জন্মেছে?...ভারতবর্ষ বিদেশী রাজশাসনের অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রলোভন আমাদের দূর হয় নি। আর সেই জন্যই মার্কিন দেশের চতুর্থশ্রেণীর পদ্যলেখক সে-দেশে রবীন্দ্রনাথের 'ষ্টক' কেমন নেবে গেছে, ওয়াল ষ্ট্রীটের দর ওঠানামার কায়দায় যখন তার বর্ণনা করে, আমরা খবরের কাগজে তার প্রতিবাদ প্রয়োজন মনে করি। এক প্রচারের উত্তর অন্য প্রচারে দিতে চাই।" (রবীন্দ্রায়ণ, ১ম খণ্ড)। এই হীনম্মন্যতার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা-পূজকরা ওয়াল স্ট্রীট এবং প্যারিসের 'বুর্জের' উদ্দেশে বিগলিত চিত্তে ঘোষণা করছেন, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমেরই মানস-শিশু এবং অতএব হে পশ্চিমী-সংস্কৃতির মুরুব্বীগণ, আপনারা আমাদের রবীন্দ্রনাথকে দয়া করে একটুখানি ঠাঁই দেবেন পশ্চিমী সংস্কৃতির বাজারে। আবার এদিকে রবীন্দ্রনাথের "জাতীয়তাবাদী" স্বত্বাধিকারের দাবিদার যাঁরা তাঁরা গর্জন শুরু করেছেন, "খবরদার, মার্কস্‌বাদীরা রবীন্দ্রনাথকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করলে ভালো হবে না।" রবীন্দ্র শতবর্ষের মানসিক আবহাওয়াটা ঠিক রবীন্দ্রনাথোচিত কি না রবীন্দ্রানুরাগীরাই সেটা বিচার করবেন আশা করি।

তবু আনন্দের কথা, রবীন্দ্রশতবর্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্যক অনুশীলনে আমাদের মুষ্টিমেয় মননশীল লেখকগণ উদ্যোগী হয়েছেন এবং তাঁদের উদ্যোগের প্রাবন্ধিক ফল পরিশীলিত চিন্তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সমালোচ্য তিনখানি প্রবন্ধ সংকলনের বিষয়-সূচীর সাধারণ ঐক্য লক্ষণীয়। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ'-এ সোমনাথ মৈত্রের 'রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য', গোপাল হালদার সম্পাদিত 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'-এ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সার্বভৌম কবি' প্রায় একই বিষয় লেখকদের নিজস্ব দৃষ্টিভূমি থেকে আলোচিত। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প' বইখানিতে সংকলিত হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক' প্রবন্ধটির সঙ্গে 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'-এ গোপাল হালদারের 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' -সমপর্যায়ভুক্ত। কবি ও কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই এই তিনখানি সংকলনের আলোচনায় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছেন। 'রবীন্দ্রায়ণ'-এ 'রবীন্দ্র- -নাথের ছোটগল্প' (অজিত দত্ত), 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ' (আলোক-

রঞ্জন দাশগুপ্ত), 'দামিনী' (কানাই সামন্ত), 'রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি' (বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী); 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'-এ 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' (রবীন্দ্র গুপ্ত), 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) একই শ্রেণীর লেখা এবং আলোচনার গুণগত তারতম্য থাকলেও পদ্ধতিগত পার্থক্য সামান্যই। সম্ভবত আমাদের কালের রবীন্দ্রানুরাগীগণ রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তিতে এমনই বিমুগ্ধ যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা ও কথাশিল্পের মূল্যায়নে তাঁরা নির্বিশেষভাবে একাত্ম। হয়তো অনেকটা সে কারণেই মনে হয়, লেখক ভিন্ন ভিন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং কথাসাহিত্য আলোচনায় তিনখানি সংকলনই গতানুগতিক ধারাবাহী, বিচার ও বিশ্লেষণে নব-আবিষ্কারের বিস্ময় অনুপস্থিত প্রায়। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং কাব্য-শিল্পের নির্মাণ-রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস তিনখানি সংকলনেই অনেক বেশী সার্থক মনে হয়। বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের শব্দ' (রবীন্দ্রায়ণ), অমলেন্দু বসুর 'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা' (রবীন্দ্রায়ণ), সুকুমার সেনের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষা ব্যবহার' (রবীন্দ্রায়ণ), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক' (শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন), আলোক-রঞ্জন দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্প' (রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প)—এই কটি প্রবন্ধই রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাসে বিজ্ঞানশ্রেষ্ঠ মৌল গবেষণার পদ্ধতি প্রবর্তক বলা বোধহয় অতিশয়োক্তি হবে না।

এই তিনখানি সংকলনের প্রবন্ধকারগণ রবীন্দ্রজীবন-সাহিত্য-শিল্পের সশ্রদ্ধ অনুশীলনে একাত্ম বটে, তবে, 'রবীন্দ্রায়ণ' (পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত), 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন' (গোপাল হালদার সম্পাদিত) এবং 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প' (সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত)-প্রত্যেকখানিরই লেখকগোষ্ঠীর কুল-চিহ্ন আলাদা। রবীন্দ্র-সমালোচনা সম্পর্কে এই তিনটি সংকলনের তিনটি লেখকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিগত শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না, কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে ইতিমধ্যেই 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় গোপাল হালদার সংকলিত 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'কে মার্কস্‌বাদ-দোষদুষ্ট গণ্য করে সংকলনের কোনো কোনো প্রবন্ধকারের তীব্র নিন্দাবাদ করেছেন। 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'-এর সব কয়জন লেখকই মার্কস্‌বাদী কিনা জানা নেই, তাছাড়া এই সংকলনের ভূমিকায় গোপাল হালদার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন রবীন্দ্র-প্রতিভার "সশ্রদ্ধ"

আলোচনার সংকল্প" ছাড়া এই গ্রন্থে কোনো বিশেষ মত প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয় নি। "দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ ঐক্যে" শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলনের লেখকরা সকলেই সম্ভবত মার্কস্‌বাদী না হলেও মার্কস্‌বাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। রবীন্দ্রনাথের 'টোটাল' স্বত্বাধিকার বা উত্তরাধিকারের দাবিদার যাঁরা তাঁরা ছাড়া প্রকৃত রবীন্দ্রানুরাগীরা নিশ্চয়ই এই মার্কস্‌বাদী চিন্তাশীলদের রবীন্দ্র-প্রতিভা আলোচনায় কোনো আপত্তির কারণ খুঁজে পাবেন না। বরঞ্চ এই সংকলনের কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ-সচেতনতা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও মননের কতকগুলি স্বল্প আলোচিত দিকের "বুদ্ধি ও শ্রদ্ধাসম্মত পরিচয়" দানে। গোপাল হালদারের সুলিখিত তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা'য় রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী' প্রবক্তা শনিবারের চিঠির সম্পাদকও কোনো ছিদ্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন কি না সন্দেহ।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি', চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' তথ্যসম্ভার সমৃদ্ধ মূল্যবান আলোচনা—যা মার্কস্‌বাদী বুদ্ধিজীবীর প্রখর সমাজবোধ এবং তথ্য সংগ্রহ ও সমাবেশে সততার প্রশংসনীয় নিদর্শন।

আমার বরঞ্চ অনুযোগ, এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত অগ্রণী মার্কসবাদী লেখকরা পুরনো বিতর্কের 'সিন্দুরবর্ণ মেঘের' ভীতিগ্রস্ত অস্বস্তি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গতানুগতিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দানই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। যেমন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সার্বভৌম কবি' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"ধর্মগুরু বা জননেতা না হয়েও যদি কেউ বাঙালীর হৃদয়ের পূজা পেয়ে থাকেন তো তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ।"

নিছক বিবরণ হিসেবে কথাটা ঠিক। কিন্তু বাঙালী ভাবালুতার আতিশয্য ও বিকার রবীন্দ্র-কাব্যধারার যে অংশ hypnotic তার দ্বারা কখনও এবং কিছুপরিমাণ প্রভাবিত হয়েছি কিনা সুধী প্রবন্ধকার সে-বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে গেছেন। "অত বড় চক্ষুষ্মান হওয়া সত্ত্বেও কবিকে এদেশের নির্লিপ্তি সতত আকর্ষণ করেছে, বহির্দৃষ্টিকে হ্রস্ব করেছে, অনুভূতির নিছক মানবীয় অন্তঃসারকে শীর্ণ করেছে" হীরেনবাবুর এই সংক্ষিপ্ত-সাহসিক ইঙ্গিতটুকু বিস্তারিত আলোচনার বিষয়।

সুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধটির

আলোচনাপদ্ধতি গতানুগতিক উচ্ছ্বাসবর্জিত—যে ভক্তিবাদী উচ্ছ্বাসের আধিক্য ক্লান্তিকর লাগে প্রমথনাথ বিশী (রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ) এবং সোমনাথ মৈত্রের (রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য) অন্যথা সুলিখিত আলোচনায়। তাছাড়া বাংলার নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রমানসের পরস্পরবিরোধী ভাবধারার পরিচয় দিতে গিয়ে সুশোভনবাবু বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে একটি সময়োচিত এবং সারগর্ভ স্পষ্টোক্তি করেছেন যা আমাদের অনেকের অত্যুগ্র বাঙালী সাংস্কৃতিক অহমিকাকে কিছুটা সংযত করার সাহায্য করতে পারে। "বাংলার নবজাগরণকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়াটা মনে হয় হাল ফ্যাশানের কথা, গত পনেরো কুড়ি বছরে এর বহুল প্রচলন হয়েছে" ইওরোপের পনেরো ষোল শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের পার্থক্য বিস্তর; "বাংলার রেনেসাঁস…খণ্ডিত, আড়ষ্ট, কিছুটা অস্বাভাবিক" এবং রবীন্দ্রনাথও যে দীর্ঘকাল প্রাচ্যাভিমান ও পশ্চিমী মানবতন্ময় সাম্যবোধের দোটানায় পড়েছিলেন সুশোভন সরকার তা সংক্ষেপে তথ্যসহযোগে দেখিয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত" সুশোভনবাবুর এই চূড়ান্ত মূল্যায়ন 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী' শনিবারের চিঠির সম্পাদককে যেমন ক্ষিপ্ত করেছে তেমনি মার্কস্‌বাদী বুদ্ধিজীবীও এই মন্তব্যকে অন্যদিক থেকে আত্যন্তিক অনুরাগরঞ্জিত অতিশয়োক্তি মনে করলে আশ্চর্য হব না। সেদিক থেকে তরুণ অধ্যাপক লেখকগোষ্ঠীর সংকলনভুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক' (রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প) প্রবন্ধটির দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন আরও বেশি যুক্তিনিষ্ঠ মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রবাহের বিভিন্ন পর্বের পরস্পর-বিরোধিতা হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আলোচনায় চমৎকারভাবে পরিস্ফুট। যে উক্তি মার্কস্‌বাদী বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্রপ্রতিভা আলোচনায় স্থান পেলে আনন্দিত হতাম তার সাক্ষাৎ পাই হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধে। যেমন "বঞ্চিতের কবি বলে অশ্রদ্ধাবান প্রশংসায় তাঁকে আমরা ভূষিত করব না, তিনি নিজেই জানতেন তাঁর কবিতা 'সর্বত্রগামী' হতে পারে নি।…বস্তুত, প্রগতির অন্য নাম-যদি হয় মার্কস্‌বাদ তাহলে নিশ্চয় তিনি প্রগতিশীল ছিলেন না…ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে তিনি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের উপায় বলে মনে করতেন; নিরন্তর পরিবর্তনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মার্কসীয় ভঙ্গিতে নয়, হেগেলীয় ভঙ্গিতে…। 'রায়তের কথা' প্রবন্ধটিতে জমিদারকে 'জমির জোঁক…প্যারাসাইট…পরাশ্রিত জীব'

বলে তিরস্কৃত করলেও ব্যবস্থাপত্রে জমিদারি প্রথা তুলে দিতেও বলেন নি।··· মার্কসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল বোধ হয় এই যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার ক্লান্তি শেষোক্তের অনুভবেও ধরা পড়েছিল।"

আলোচ্য সংকলন তিনখানির লেখকগোষ্ঠীত্রয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং কুলচিহ্নের বিশিষ্টতা নির্ণয় যদি সমালোচকের কর্তব্য হয় তাহলে সামান্য অতিরঞ্জনের ঝুঁকি নিয়ে চলা যায়, 'রবীন্দ্রায়ণ'-এর লেখকগোষ্ঠী রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বুনিয়াদী ব্যাখ্যায় কুশলী 'ক্লাসিসিস্ট', 'রবীন্দ্রনাথ-শতবার্ষিকী সংকলন'-এর লেখকরা 'মার্কসিস্ট' অথবা সাধারণ ভাবে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারী আর 'রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প'-এর নবীন অধ্যাপক লেখকগোষ্ঠী যাকে বলা যায় 'মডার্নিস্ট'—রবীন্দ্রপ্রতিভার মহিমায় আকৃষ্ট হলেও রবীন্দ্রোত্তর কালের মনীষার আলোকে পুনর্বিচারপ্রয়াসী। এ বিষয়ে শেষোক্ত সংকলনের সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য: "কোথাও কোথাও তাঁদের অস্ত্র আমাদের আবহমান ধারণাকে আহত করবে। কিন্তু সে অস্ত্রাঘাত, ভীষ্মের প্রতি অর্জুনের মতো শ্রদ্ধার প্রকাশ।"

আলোচ্য সংকলন তিনখানির সবগুলি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার সম্পর্কে প্রয়োজনমতো মন্তব্য করার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হল না বলে কেউ যেন ভুল ধারণা পোষণ না করেন যে এক্ষেত্রে অনুল্লেখ উদাসীনতা বা উপেক্ষার পরিচয়। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তিনখানি সংকলনেরই প্রবন্ধসম্ভার রবীন্দ্রশতবর্ষের মূল্যবান সম্পদ এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্র-প্রতিভার নানাদিকের পর আলোকপাতে রবীন্দ্রসৃষ্টিলোককে উদ্ভাসিত করেছে যেভাবে তাতে সাম্প্রতিক সমালোচনা সাহিত্যক্ষেত্রের এই নতুন ফসলের দিকে তাকিয়ে অনায়াসে বলতে পারি "Here's God's plenty."

রবীন্দ্রায়ণ: প্রথম খণ্ড। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। বাক্‌সাহিত্য। দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ: শতবার্ষিকী প্রবন্ধসংকলন॥ গোপাল হালদার সম্পাদিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প॥ সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। অচলায়তন প্রকাশনী। পাঁচ টাকা।

অপ্রত্যাশিতের প্রত্যাশা

জে. বি. এস. হলডেন

লোকসাধারণ অকস্মাৎ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে ইতিহাসের অন্যান্য যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের প্রভেদ ও পার্থক্য হল লৌকিক ব্যাপারে বিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রযুক্তির গুণ। মনুষ্যজাতির অপেক্ষাকৃত নির্বোধ সদস্যবৃন্দ এবং অধিকাংশ রাজনীতিকই সেই দলভুক্ত যাঁরা বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগের দিকেই মন দেন। এর একটা কারণ হল এই যে অ-সমাজতান্ত্রিক দেশেও যুদ্ধ হল একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাপার, ফলে পুঁজিবাদী দেশের সরকারগুলি বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগে সরাসরি স্বার্থসংশ্লিষ্ট অথচ তার সৃজনশীল প্রয়োগে তাদের তেমন কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থসংযোগ নেই। এর আর এক কারণ হল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটা জীবন্ত ও ব্যাপক ঘৃণা বিদ্যমান।

মানবজাতির অর্ধেক অংশও যদি আগামী কোন যুদ্ধে আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রে নিহত হয়, (ব্রিটেনে নিহতের ভাগ অর্ধেকের অনেক বেশী এবং ভারতে অর্ধেকের অনেক কম হওয়া সম্ভব) তবু তার বিপরীত দিকে দেখতে হবে যে চিকিৎসাবিদ্যা ও কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে গত একশো বছরে আমাদের সম্ভাব্য আয়ু দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে যুদ্ধ না ঘটলে, একটি ইংরেজ শিশুর সম্ভাব্য আয়ু ষাট এমনকি সত্তরেরও বেশী, এবং তার চেয়েও যা মূল্যবান এই সময়ের অধিকাংশই সে সুস্থ সবল থাকবে। অন্যপক্ষে ১৯৪০-এ একটি ভারতীয় শিশুর সম্ভাব্য আয়ু ছিল তিরিশ বছর এবং তার বেশীটাই রোগজীর্ণ। তাই আমি মনে করি যে কোন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে যদি বিজ্ঞানের অপব্যবহার ঘটেও, সেক্ষেত্রেও, সামগ্রিক বিচারে বিজ্ঞানকে ক্ষতিকর বলা চলে না।

ভালোর জন্যেই হোক আর মন্দের জন্যেই হোক আমাদের শত ঘৃণা সত্ত্বেও বিজ্ঞান যদি আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে তার বিকাশ কি ভাবে ঘটে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ে জনসাধারণ যে রকম অজ্ঞ এ রকম বিষয় খুব অল্পই আছে। অংশতঃ এটা

দোকানদারীর জন্যে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির কল্যাণে খবরের কাগজগুলি এমন সব বিজ্ঞাপনে অলঙ্কৃত হয় যাতে দেখি, বৈজ্ঞানিকেরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিংবা টেস্ট-টিউবে চোখ লাগিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং সম্ভবতঃ ঐসব প্রতিষ্ঠানের প্রচার অধিকর্তারা মনে করেন যে ঐভাবেই বুঝি বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাঁরা নিজেরা গবেষণায় সফল হন নি তাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর বইপত্র লিখে থাকেন। এইগুলি বিশেষ করে আমার কাছে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। কারণ পরে বলছি। শেষত বৈজ্ঞানিক রচনাবলী—এমনকি গবেষণার সযত্ন ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণগুলি থেকেও জানা যায় না যে কি ভাবে বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে অনিবার্যভাবেই সংক্ষিপ্তসার পরিবেশিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত সু-সম্পাদিত পত্রিকায় প্রথম শ্রেণীর গবেষণা প্রবন্ধও দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে লেখা হয়। প্রথমতঃ পাঠকদের বোঝানো যে কতকগুলি ব্যাপার সত্য। দ্বিতীয়তঃ যে সব নিরীক্ষণের ভিত্তিতে কতকগুলি ব্যাপারকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে কি উপায় অবলম্বন করতে হবে তা বলা। একটা ঘটনা যে সম্ভবতঃ সত্য, সেটা স্বয়ং লেখকের কি করে মনে হল যাতে ব্যাপারটা বাস্তবিক সত্য কি না সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হবার জন্যে তিনি পরিশ্রম স্বীকার করতে শুরু করলেন, সেই কথাটা সচরাচর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বলা হয় না।

আমি এই বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে বাধ্য হয়েছি কারণ ভারতে আমায় গবেষণা-কর্মীদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করতে হচ্ছে। ১৯২২ থেকে আমি অপরের গবেষণা পরিকল্পনা করতে অভ্যস্ত কিন্তু গবেষণা জিনিসটা কিরকম সে বিষয়ে কোন ধারণা না নিয়ে কোন ব্রিটিশ ছাত্র কখনও আমার কাছে আসে নি। কারণ তাদের ডিগ্রী কোর্সের কোন না কোন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী স্বাধীন এবং অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে সেরকম সর্বদা ঘটে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যখন দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে তখন গবেষণার চেয়ে শিক্ষাদানের ওপরেই যে জোর দেওয়া হবে তা স্বীকার করে নিতে আমরা বাধ্য, এবং ভারতে যে গবেষণা চালান হয় তার অনেকটাই তালিকা-সূচী রচনার মতো ; যেমন নতুন প্রজাতির (species) বর্ণনা কিংবা বাঁধাধরা ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রণয়ন যাতে বিশেষ মৌলিকতার প্রয়োজন হয় না।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জিনিসটা তাহলে কি ? সাধারণতঃ প্রচলিত ধারণা এই যে "সমস্ত ক হল খ শ্রেণীর" যেমন সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত লাল (প্রসঙ্গত বলি, কথাটি সত্য নয়) অথবা "আবহাওয়ার চাপ স্বাভাবিক থাকলে সর্বশ্রেণীর পাতিত জল (distilled water) O° সেন্টিগ্রেডে জমাট বাঁধে" প্রভৃতি বিবৃতির জন্য আবশ্যক গবেষণাতেই তা নিহিত। আরো গুছিয়ে বলা যায় যে, P শ্রেণীর ঘটনা সর্বদা Q শ্রেণীর দ্বারা অনুসৃত হবেই। এই ধরনের সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় সাধারণত দু-ভাবে। অংশত বহুল পরিমাণে দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করে এবং অংশত যদি আমরা পারি অন্যান্য সাধারণ সত্যের মাধ্যমে তার সত্যতা ব্যাখ্যা ও প্রতিপন্ন করে, যতদূর চলে ততদূর পর্যন্ত এতে আপত্তির কিছুই নেই কিন্তু এই সব কথা থেকে এটা জানা যায় না যে প্রথমে কোন প্রশ্ন করলে পরে তা ফল দেয়।

সন্দেহ নেই যে আমি যদি কোন শস্যের বিষয়ে অনুসন্ধানে রত হই তাহলে আমার জেনে রাখা ভাল যে মানুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন্ কোন্ প্রাণী তা খায় এবং কি করে তাদের সংখ্যা কমিয়ে রাখা যায়। এটাও বার করা ভাল যে জমিতে নাইট্রেট, কি পটাসিয়াম সল্ট কি চুন কিংবা ফসফেট, কোন্ ধরনের সার দিলে শস্যের ফলন বাড়ে এবং তামা বা বোরন (Boron) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্লভ পদার্থের যোগে তার কোন উপকার হয় কি না। এই সমস্ত অনুসন্ধান যখন প্রথম চালানো হয় তখন এ সব-ই ছিল উজ্জ্বল, মৌলিক ধারণা। কিন্তু আর এক খণ্ড জমিতে আর একটি শস্যের বিষয়ে এই ধরনের প্রশ্ন তোলাতে মৌলিকতা কিছুই নেই।

মৌলিক ধারণার উৎস কি তাহলে ? দুটি প্রধান উৎসের কথা আমার মনে হয়, একটি হল অবশ্য তাত্ত্বিক গবেষণা। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে নিউটনের তত্ত্ব যদি সত্য হয় তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বিষুবরেখার দূরত্ব উভয় মেরুর দূরত্বের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত, নিউটনের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে বাস্তবিক তাই বটে। আলোক যদি বৈদ্যুতিক-চৌম্বক (electro-magnetic) স্পন্দন হয় তাহলে রেডিয়ো যোগাযোগ সম্ভবপর হওয়া উচিত। সংক্রামক ব্যাধি যদি অত্যন্ত ক্ষুদ্রতর প্রাণীজনিত হয় তাহলে উচ্চতর উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে যা বিষক্রিয়া ঘটায় এমন জিনিসের কোন কোনটির দ্বারা তাদের বিষদিগ্ধ করা সম্ভব হওয়া উচিত। স্ত্রী বা পুরুষের কোন বৈশিষ্ট্য যদি মাতাপিতার মধ্যে কেবল একজনের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় তাহলে উত্তরপুরুষে শুধু

স্ত্রী বা পুরুষ সন্ততির প্রজনন সম্ভবপর হওয়া উচিত। এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিচারে মূল্যবান যে একটি মাত্র প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা করা গিয়েছে তা হল রেশমের গুটিপোকা। কোন তত্ত্ব যদি একবার গাণিতিক হয়ে পড়ে তাহলে এমন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া যায় যাদের ফল কেবল সাধারণ জ্ঞান ও কিছুটা কল্পনার ভিত্তিতে যা বলা যেত তার তুলনায় বহুদূর বিস্তৃত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির লেখকেরা মৌলিক ধারণার এই উৎসটিকে বিপুল স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন, তত্ত্বনির্দিষ্ট ফলের স্বীকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতির বিষয়ে তাঁরা দীর্ঘ পরিচ্ছেদ লিখে থাকেন, The Design of Experiments নামে ঈষৎ বিভ্রান্তিকর শিরোনামাযুক্ত বহু-পরিচিত বইটিতে বিশদভাবে বলা আছে যে যথাযথ সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে কি ভাবে প্রভূত সময় ও অর্থ বাঁচান সম্ভব। অবশ্য গবেষক কি বার করতে চান সেটা তাঁর নিজের জানা থাকা উচিত, যেমন বিশেষ আবহাওয়ায় বিশেষ জমিতে এক জাতীয় গমের গাছে ফসল বেশী হবে না আর আর এক ধরনের গমে ফসল বেশী হবে। কিন্তু তাতে এমন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা রূপায়ণ করার কথা বলা হয় নি যাতে এমন এক জাতের গম পাওয়া যাবে যার ফলন পিতৃগোষ্ঠীব ফলনের চেয়ে বেশী।

মৌলিক ধারণার আর একটি যে উৎস, তা আমার মতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চারপাশে কি ঘটছে তা নজর করলে কতকগুলি মৌলিক ধারণা সরাসরি আমাদের মনে আসে। যে-কোন বিজ্ঞানেই মানুষ যা দেখে, শোনে এমনকি শোঁকে বা অনুভব করে, তা শ্রেণীবদ্ধ করতে শেখে এবং এই শ্রেণী-বিভাগ অনেকদিন পর্যন্ত বেশ ভাল কাজ দিতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে কোন লোক যখন এমন একটা জিনিস বা ঘটনার সম্মুখীন হয় যা এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে খাপ খায় না তখন সে প্রায়ই ব্যাপারটা ভুল কোঠায় ফেলে নয়তো আদৌ নজর-ই করে না। দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যায় যে নতুন তথ্যের জন্তে নতুন শ্রেণীনির্ণয় প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের অভ্যাস তার মনকে যা গতানুগতিক নয়, স্বতন্ত্র, তার থেকে বিক্ষিপ্ত করে; যদি না সেটা খুব বিরাট আকারের হয় যেমন ভূমিকম্প কি ঝড় আর সেক্ষেত্রেও ব্যাপারগুলোকে 'ভগবানের কাজ' এই শ্রেণীতে ফেলে দেওয়া সম্ভব।

যা বাঁধা রীতির ব্যতিক্রম তা নজর করার অভ্যাস কয়েকজন লোকের

খুব বেশী পরিমাণে থাকে। আমার বিশেষত মনে পড়ে আমার বন্ধু, বর্তমানে মৃত L. A. Lantz-এর কথা যিনি ব্রিটিশ বর্ণ-পরিষদ-এর (British Colour Council) কর্মসচিব ছিলেন। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন এই সংস্থাটির কাজ ছিল ক্রান্তীয় দেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত। কিন্তু তা নয়, কাপড়ের রঙ নিয়েছিল এঁদের কাজ, এবং এর সচিবের নিঃসন্দেহে সূক্ষ্মতম বর্ণ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটা সজাগ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বিস্ময়কর কীর্তি সম্ভবতঃ তিনি যখন একটি গিরগিটিকে দৌড়ে বেড়াতে দেখে সেটি স্ত্রী কি পুরুষ স্থির করতে না পেরে, সেটিকে ধরে, মেরে দেখলেন যে সেটি একটি উভলিঙ্গ জীব। কিন্তু শুধুমাত্র এই ক্ষমতা থেকে বড় জোর কয়েকটি প্রাণী কি উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি এবং ধাতুর প্রকার নির্দেশ করা সম্ভব, কখনো কখনো এই দেখার ক্ষমতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দক্ষতা সংযুক্ত হয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষক কোন একটা ব্যবস্থা এমনভাবে পালটে দেন যার পুনরাবৃত্তি করা যায়; যেমন নতুন কোন যৌগিক ধাতুকে অগ্ন্যুত্তাপ থেকে আস্তে আস্তে সাধারণ তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করে আনলেন, কিংবা এমন একটা আধারে একটি উদ্ভিদের ফলন ঘটালেন যা থেকে সীসে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়েছে। কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য করা তাঁর উদ্দেশ্য। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করলে সংশ্লিষ্ট ধাতুটি বেশী শক্ত হয়, না কম ঘাতসহ হয়? তিনি হয়তো মনে করেন যে নতুন অবস্থায় গাছটি সাধারণ গাছের তুলনায় আস্তে আস্তে বাড়বে কিংবা মারা যাবে। তাঁর যদি আদৌ কোন প্রত্যাশা বা লক্ষ্য না থাকে তাহলে তাঁর পরীক্ষা থেকে উল্লেখযোগ্য ফললাভ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প, তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ হতে পারে, নাও হতে পারে। যদি পূর্ণ না হয়, একটা তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হবে। যদি পূর্ণ হয় তাহলে একটা তত্ত্বের যে কিছুটা ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে তা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হতে পারে। সম্ভবত ধাতুটিকে যদি যথেষ্ট আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা যায় তাহলে সেটা একটা চুম্বক হয়ে যাবে কিংবা অন্য অবস্থায় যা হত সে তুলনায় তার চেয়ে অনেক ভাল তাপবাহক হবে। সম্ভবতঃ সীসে বাদ দিয়ে যে গাছটি বেড়ে উঠবে সেটি অন্য সব দিকে স্বাভাবিক হবে কিন্তু তার পুং-কেশর হয়তো হবে এলোমেলো। কিংবা সাধারণ অবস্থায় যে সব জীবাণু তার ক্ষতি করে না

গাছটি তার দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। হয়তো সেই গাছের ফলে আঁশ হবে কম, ফলে খাওয়া আরো সহজ হবে। এই রকম ক্ষেত্রে প্রায়ই সম্ভাবনা থাকে যে অপ্রত্যাশিত ফল তা আদৌ নজরে পড়বে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ওয়াং ও লী (Wang ও Lee) ইদানীং যেটা আবিষ্কার করেছেন যাকে সাধারণতঃ তুল্যতার অসংরক্ষণ (non-observation of parity) বলা হয়। যে কোন রাসায়নিক অথবা তেজস্ক্রিয় রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ঘূর্ণ্যমান কণা উৎপন্ন হয়, নিজ নিজ গতিপথের তুলনায় যাদের একদিকে অথবা অন্যদিকে ঘোরার সম্ভাবনা তুল্যমূল্য। কিন্তু সব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ-রকমটা ঘটে না। Neutrino নামে একধরনের কণা কেবল একদিকেই ঘুরতে পারে। এই ঘটনার একাধিক ফল লক্ষ্যগোচর। ওয়াং ও লী যখন তাঁদের আবিষ্কার প্রকাশ করলেন তখন শীঘ্রই দেখা গেল যে কয়েক বছর ধরে অন্যান্য পদার্থবিদরা যে সব পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে যে শুধু উক্ত আবিষ্কার সমর্থিত হয় তাই নয় তার থেকেই যদি ঠিকমতো নজর দেওয়া যেত তাহলে ঐ আবিষ্কার করা যেত।

আগে যারা কাজ করেছে তারা সব রকম সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যের বিচার করে নি কেন, এ জন্যে তাদের দোষ দেওয়া বৃথা। একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ নেওয়া যাক। এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, যারা ফুসফুসের কর্কট রোগে মারা যায় তাদের মধ্যে বুধ যখন বৃশ্চিক রাশিতে তখন যাদের জন্ম তাদের সংখ্যা অন্যান্যদের দ্বিগুণ। চারশো বছর আগে যখন সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হত যে, মানুষ "সমস্ত দৈব-প্রভাবের দাস" তখন এই ধরনের ঘটনার অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত মনে করা যেত। আজো যারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করে তাদের এই দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত ; কিন্তু এ ধরনের লোকেরা সংখ্যাতত্ত্ব বোঝে না। তবু সন্দেহ নেই যে মহৎ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে এই-ভাবে নজর করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি আবশ্যিক অঙ্গই হল অপ্রত্যাশিতের প্রত্যাশা করা। সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের অন্যতম বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ছিল এই ক্ষমতা। অবশ্য একজন সেনাপতির শুধু এই ক্ষমতা নয়, এর সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এবং এমনভাবে বাহিনীকে সংগঠন করার দক্ষতা যাতে তাঁর সদ্যসদ্য গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী হয়। রুশরা মস্কো পোড়াবার আগে নেপোলিয়ন বোধ হয় কখনো কোন সামরিক পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে পড়েন নি। সে ক্ষেত্রেও

পশ্চাৎপসরণের জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ যে সিদ্ধান্ত নেন তা হয়তো তাঁর বাহিনীকে রক্ষা করতে পারত যদি না দুটি শত্রু তাঁর পেছনে লাগত যাদের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। শত্রু দুটি হল—উকুন ও টাইফাস জ্বরের ভাইরাস।

বিশেষতঃ রাদারফোর্ডের (Rutherford) নেপোলিয়ন-সুলভ এই গুণটি ছিল। যখন তিনি আবিষ্কার করলেন আলফা-কণাগুলি (alpha-particles) বস্তুর সূক্ষ্ম পর্দায় প্রতিহত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে না, বরং অধিকাংশই সোজা তা ভেদ করে চলে যায় এবং কিছু কিছু সোজা পিছনে ফিরে আসে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আবিষ্কারকে কাজে লাগালেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে বস্তুর সংগঠন সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। ডারুইনের কাজ থেকেই জানা যায় যে তাঁর নিজেরও এই ক্ষমতা ছিল কিন্তু তিনি কখনও তাড়াতাড়ি কোন কাজ করতেন না বলে প্রথম দর্শনে তাঁর মধ্যে নেপোলিয়নোচিত কিছু আছে বলে মনে হত না। নিজের যে মূল্যায়ন ডারুইন করে গেছেন যার যথেষ্ট সমর্থন তাঁর ভূতাত্ত্বিক ও উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা থেকেই মেলে, তা হল আমার মনে হয়, যা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এমন সব জিনিস নজর করা এবং তা সযত্নে লক্ষ্য করার ব্যাপারে, আর পাঁচজনের চেয়ে আমি বড়।

এই ক্ষমতাটা শিক্ষা দেওয়া যায় কি? আমার তো তা মনে হয় না। কিন্তু এই ক্ষমতাকে উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া কিংবা নিরুৎসাহিত করে দমিয়ে দেওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায় তাতে, আমার ভয় হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা নিরুৎসাহিত হয়ে থাকে। যে ছাত্র অপ্রত্যাশিত কিছু লক্ষ্য করেছে সে হয়তো কাজে কিছু ভুল করেছে। এই রকম 'ভুল' তাকে বার কয়েক দেখিয়ে দেবার পর সে বোঝে যে এ সব ব্যাপার গোপন করাই ভাল। এই ব্যাপারে ভারতের অবস্থা ইয়োরোপের চেয়ে খারাপ প্রধানত এই কারণে যে শিক্ষকদের অনেক বড় ক্লাস দেখা-শোনা করতে হয়, তবু আমি বিস্মিত হয়েছি যে আমি ইতিমধ্যেই দুজন তরুণ ভারতীয় সহকর্মী পেয়েছি যাঁদের অপ্রত্যাশিতকে লক্ষ্য করার ক্ষমতা আছে। কার্যত হয়তো ইয়োরোপীয়দের চেয়ে ভারতীয়দের এই ক্ষমতা বেশী আছে যদিও ভারতে এর প্রকাশ অনেক দুর্লভ কারণ জীববিজ্ঞান এখানে ভালভাবে শেখানো হয় না।

এইখানে আমায় প্রফেসর বার্নালের সঙ্গে বিতর্কে নামতে হবে। তিনি অধুনা প্রকাশিত World Without War (যার দশভাগের নয় ভাগের সঙ্গে

আমার মতের ঐক্য বর্তমান।) বই-এর ২০৩ পৃষ্ঠায় বলছেন, "শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রথমত সৃজনশীল চিন্তার ক্ষমতা কোথায় আছে তা ধরা, দ্বিতীয়ত তাকে খুঁজে বাইরে আনা, তৃতীয়তঃ সৃজনশীল চিন্তার ক্ষমতার তালিম দেওয়া।" বার্নালকে ভাববাদী বলতে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু যে লোক লক্ষ্য করে যে কোন একটা শামুক তার প্রজাপতির তুলনায় 'ভুল' দিকে পাক খায় অর্থাৎ সেটি একটি looking glass শামুক, বিজ্ঞানে তার দান মূল্যবান। শামুকের বিষয়ে সে যদি সৃজনশীল চিন্তা নাও করতে পারে, যেমন এই সব প্রশ্ন যদি তার মনে না ওঠে—"এই ধরনের শামুক কি স্বজাতীয় অন্যান্য স্বাভাবিক শামুকের সঙ্গে যৌনমিলনে মিলিত হতে পারে, যদি হয় তাহলে তাদের সন্তান-সন্ততি প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষে কি রকম হবে? অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেও কি তাদের গঠনবৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে? ইত্যাদি"—তবু তার দান বিজ্ঞানে মূল্যবান।

এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা আয়ত্ত করতে আমি কাউকে তালিম দিতে পারি না কিন্তু অন্যের মধ্যে এ ক্ষমতা থাকলে আমি তা ধরতে পারি এবং এই সব নিরীক্ষা যে আগ্রহজনক সেটা বুঝিয়ে আমি এই ধরনের ক্ষমতাকে 'বার করে আনতে' পারি, অন্যদিকে ভারতে সৃজনশীল চিন্তা একেবারে উকুনের মতো গিজগিজ করছে আর দুর্ভাগ্যবশত তার অনেকটা থেকে বিস্তর বাজে জিনিসের সৃষ্টি হয়। আর বাকি যা থাকে তার অনেকটাই নির্বস্তুক ও বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

এবার যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, অপ্রত্যাশিতের প্রত্যাশা করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবশ্যিক অঙ্গ তাহলে তাই থেকে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে আসে। অনেকে সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, কোন না কোন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে যে সব নীতিনিয়ম পাওয়া যায় তার দ্বারা জগৎ শাসিত, এই মতাদর্শ, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার কাছে বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টির তুলনায় বেশী সন্তোষজনক বা সম্মানকর, এ কথা কেউ বিশ্বাস করত না যদি না বিজ্ঞান এত খারাপ ভাবে শেখানো হত। বিজ্ঞান যে এত খারাপ ভাবে শেখানো তার একটা কারণ শিক্ষাদান কাজটা অন্তত ইয়োরোপে এবং কিয়দংশে ভারতেও এতকাল পাদ্রীদের হাতে ছিল। তাঁরা তাদের ছাত্রদের মধ্যে বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে এমন একটা নিশ্চয়তার বোধ সঞ্চারিত করতে চাইতেন যা তাঁদের একহাজারে একজন হয়তো প্রকৃতই অনুভব করেছেন। দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের শিক্ষকেরাও তাঁদের রীতি গ্রহণ করেছেন।

আমার মতে বিজ্ঞান এই রকম কোন ভাবে শেখানো উচিত। আমি আজ তোমাদের Boyle's Law শেখাতে যাচ্ছি। এর থেকে তাপ একরকম থাকলে বায়বীয় পদার্থের আয়তন ও চাপের সম্বন্ধ জানা যায়। এই নিয়ম সত্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে একশত বায়ুচাপের (hundred atmospheres) নিচে এবং ঋণাত্মক একশো থেকে ধনাত্মক একহাজার ডিগ্রী তাপের মধ্যে এটা প্রায় সত্য। এটা সত্যের এত কাছাকাছি যে এর সম্পূর্ণ সত্যতার ভিত্তিতে করা আঁকজোকের ওপর আমি একাধিক বার আমার জীবন পণ রেখেছি। এর বিকল্প হিসেবে যে সব জটিলসূত্র উপস্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না, কারণ আমি নিশ্চিত সে-সবও সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি যাদের আছে জীবন তাদের কাছে উত্তেজনাময়। তারা সর্বদা চমকের জন্যে অপেক্ষা করে আছে এবং তাদের জীবনে তা আসেও, কিন্তু তারা দেবতা বা মানুষ কারুর-ই আইন খুব একটা ভক্তিভরে মেনে নেয় না। আর এককালে যাকে 'ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন' বলা হত এবং আজকাল যাকে 'সামাজিক সমন্বয়' বা 'গোষ্ঠীগত সংহতি' বলা হয় সেই ধরনের বোদা কিন্তু আমার জ্ঞান যাই হোক, আত্মসন্তুষ্ট অস্তিত্ব নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। 'প্রাকৃতিক আইন' অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু তাই যদি থাকে তাহলে সেগুলো কি তা আমি জানি না এবং অন্য কেউ যে তা জানে না তাও আমি জানি। অবশ্য তার খুব কাছাকাছি যাওয়া যায়, এবং যদি কেউ দাবি করে যে সে চিরন্তন-গতিবেগ যুক্ত একটা যন্ত্র তৈরি করেছে অথবা নিছক ইচ্ছাশক্তি বলে মাটির থেকে নিজেকে শূন্যে তুলেছে তার কথা আমি বিশ্বাস করব না। কারণ আমার মনে হয় যে সে মিথ্যা বলছে অথবা নিজে ঠকেছে এই সম্ভাবনা, এইসব প্রায়-ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মের কোন একটি লঙ্ঘিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক-বেশী। অনুরূপভাবে মানবিক আচরণের বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন একটি নিয়মও আমি পাইনি যার কোন ব্যতিক্রম চলে না।

বিজ্ঞানের প্রথম যুগে এটা সম্ভবপর মনে হয়েছিল যে মানুষ এমন 'প্রাকৃতিক নিয়ম' নথিবদ্ধ করতে পারবে যার কোন ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না। নিউটন সম্ভবতঃ এতে বিশ্বাস করতেন এবং এই প্রকল্প থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে এক সর্বজ্ঞ সত্তার ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত এটা তত্ত্ব

হিসেবে বেশ ঔৎসুক্যজনক এবং আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে গুরুতর বিচার হয় নি। যাঁরা এই মতের পরিপোষক বলে নিজেদের দাবি করতেন তাঁরা এই সর্বজ্ঞ সত্তার ওপর মানবিক শাসকদের উদ্দেশ্যবোধ আরোপ করতেন যে সব শাসক তাঁদের প্রিয় এবং অন্যান্য শাসকদের মতই ক্ষমতার দ্বারা কলুষিত। আমার কাছে অন্ততঃ এই ধরনের অনড় নিয়ম বার করার সম্ভাবনা ক্রমেই দূর থেকে দূরতর হয়ে পড়ছে। আমি নিজে সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করি, এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের সবচেয়ে কাছে আমি যা যেতে পারি তা এই: ক-শ্রেণীর ঘটনা যে খ-শ্রেণীর ঘটনার দ্বারা অনুসৃত হবে না সেই সম্ভাবনা লক্ষেরও লক্ষ ভাগ—তার চেয়েও কম কিনা, আমি জানি না। এই চিন্তাধারা যথেষ্ট কাজ দেয়। এই রকম বিধিবিধান অবশ্য আমার পেশার পক্ষে আত্মপ্রচার হয়ে পড়ে। নিউটন বিশ্বাস করে থাকতে পারেন যে, গবেষণা অথবা দৈবোদ্ভাসনের দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মকে অন্ততঃ তত্ত্বের দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিধিবদ্ধ করা সম্ভব। এইসব নিয়ম একবার জানা হয়ে গেলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ হয়ে যাবে, যদিও এইসব নিয়মের প্রয়োগ করার জন্যে যন্ত্রবিদদের ক্ষেত্র থাকবে উন্মুক্ত। লেনিনের মতো আমারও সন্দেহ হয় যে, একটা ইলেকট্রনের গুণও বলে শেষ করা যায় না। যদি তাই হয় তাহলে এর থেকেই সিদ্ধান্ত আসে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন সর্বদাই থাকবে। তার মানে এ নয় যে এর চাহিদাও সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আজও বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় গুরু-পুরোহিতরা খুব-ই খুশী হন যদি তাঁদের অধীনস্থ কর্মীরা তাঁদেরই নির্দেশে যে সব খুঁটিনাটি নিয়ে কাজ করছে সে ছাড়া তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ে অন্য সমস্ত গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে তাঁদের অবস্থা আরো জোরদার হবে, কারণ তাঁদের প্রায় সবারই বিজ্ঞানের কোন না কোন শাখায় ত্রিশ বছর আগে জ্ঞানের যতদূর উন্নতি হয়েছিল তা বেশ ভাল জানা আছে। তারপর থেকে তাঁরা অন্যায়রূপী শয়তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এতই ব্যস্ত ও ব্যাপৃত রয়েছেন যে বিজ্ঞানের আধুনিক বিকাশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বর্তমানে অবশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয় কারণ কিয়দংশে এই যে, একাধিক বিজ্ঞান, বিশেষত পদার্থবিদ্যা, ভয়ঙ্কর পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে রয়েছে, এবং কিছুটা এই কারণে যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ভিত্তি হল প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান।

অবশ্য কয়েক শতাব্দী পরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এক বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে এবং বিংশশতকের সূচনায় পদার্থবিজ্ঞান যে অবস্থায় পৌঁছেছিল, সমস্ত বিজ্ঞানই সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানীরা তখন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞানের নীতি সব জানা হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাজ বলতে বাকি আছে শুধু খুঁটিনাটি ফাঁকগুলি ভরাট করা, নীতির প্রয়োগ করা, এবং জটিল গণিতের তত্ত্বগুলির শেষ নিষ্পত্তি করা। সুতরাং গবেষণা যে একদিন থেমে যেতে পারে, আমার মনে হয় তার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মানুষ তখন আরো কয়েক হাজার এমনকি লক্ষ বছর নীতি ও রুচিবোধের নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী কাটিয়ে দিতে পারে, যে-পর্যন্ত আবার অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে, এবং এমন সময়ে, যখন কেউ তা প্রত্যাশা করছে না। সম্ভবতঃ আট কোটি বছর আগে ডাইনোসরেরা যে কারণে মারা গিয়েছিল, এবং এ বিষয়ে Prometheus Unbound-এর শেষ অঙ্কে Panthea-র উক্তি রচনার সময়ে Shelly যা জানতেন, আমরা আজো তার চেয়ে বেশী কিছু জানি না। সেই একই কারণে আমাদের ভাবী বংশধরেরা নির্মূল হতে পারে।

ইতিমধ্যে আমি এই প্রাথমিক সত্যটি উপস্থাপিত করতে চাই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিষয়ে যা কিছু বলা হয় ও লেখা হয়ে থাকে তার প্রায় সবটাই একদম বাজে। বর্তমান প্রবন্ধটি স্বচ্ছন্দে তার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। মানবাত্মার বিকাশের যে মূল ধারা, তার বিশ্লেষণের চেষ্টা করাটা হঠকারিতাই বটে। সম্ভবতঃ আসল কথাটাই বলা হয় নি আমার। তবু আমার মনে হয় পূর্বগামীদের তুলনায় আমার লেখায় যা বাদ গিয়েছে তা অল্পই।

প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পালাবদল রামকিঙ্কর

প্রতিবেশ

চিত্ত ঘোষ

নষ্ট বসতির চিহ্ন চতুর্দিকে
চতুর্দিকে ব্যবধান, বল্মীক, বিবর
দুর্গম পাথরে নদী, প্রত্যেক তরঙ্গে স্রোতে, জটিল বিন্যাসে
আবৃত পর্বতমালা, হিমপুঞ্জ নীহারিকা মেঘ
মুখ, বাহু, আলিঙ্গন বিন্দু বিন্দু স্মৃতির শীকর
আবেষ্টনী অন্ধকার গুহা।

বিনষ্ট সহজে, ভিন্ন স্রোতে, বিরুদ্ধতা বায়ু
নিবদ্ধ নিঃশ্বাস দীর্ঘ, দীর্ঘতম সাপের কুণ্ডলী
পরিতাপ পটভূমি, ভূমিগর্ভে লীন বনচ্ছবি
শবাধার বাহকেরা ক্লান্তগতি লক্ষ্যহীন ভ্রূ
বিশ্রামে বিরক্ত, বন্দী, অসহ্য অক্ষম
উপলে উপলে ক্ষত স্নায়ু ও শিকড়।

উপাসনাগৃহে, কিংবা রাত্রির কবরে
ভয়াবহ উপস্থিতি, প্রস্তর পতনধ্বনি, তার প্রতিধ্বনি
প্রশস্ত মেঘের নীচে আলোড়িত ঢেউ
ভাসমান প্রতিবিম্ব, ভাসমান নক্ষত্র তরণী
দৃষ্টিহীন ঝড়ে, জলে, অন্ধকারে ছোঁয়ানো সাহসে
সে অকূলে কোনো আর্ত প্রবাহিনী ডাকে!

চোখে কোনো বৃক্ষ নেই, ছায়া কি পল্লব
দৃষ্টির দিগন্তে বৃষ্টি, অবিচ্ছেদ সেতুর নির্মাণ
ফাটলের শূন্যতায় চোয়ায় নিমগ্ন জলধারা
খণ্ড খণ্ড দীর্ঘ গাছ, ছিন্ন শাখা, নির্বাপিত চোখ
নগ্ন চৈতন্যের ভূমি, চতুর্দিকে বেষ্টিত পরিখা
চতুর্দিকে ভস্ম, ভগ্ন, অবশিষ্ট অঙ্গারের অগ্নিতাপ, শিখা।

সমুদ্রের স্বর

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

রহস্যে ডুবেছে মন।
আযোজন নীলাম্বু জলধি—
অতল গহ্বরে তার পরিতৃপ্ত মীনের মতন
ঝিনুকে, শ্যাওলায় গুল্মে,
জলজ উদ্ভিদ-গন্ধে মগ্ন আমি;
রহস্যে আমার
মন ডুবে আছে।

কে তোমরা আমায় ডাক?
তোমাদের কর্কশ চিৎকার
এখানে আসে না; শুধু শব্দের বুদ্বুদ
প্রবাল পাথরে লেগে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়।
তোমাদের মুখ যেন বিগত জন্মের তীক্ষ্ণ স্মৃতি
অস্থির তরঙ্গ-ভঙ্গে বিখণ্ডিত ছায়ার মিছিল।
মীনের আগ্রহে আমি নীলাভ জলের প্রান্তে নেমে
কড়ির পাহাড়ে ঠেকে অনুশোচনার গ্লানি ধুয়ে
কড়ির মতোই শুভ্র চেতনায় স্থির হয়ে আছি।

যেখানে তাপের কেন্দ্রে ধাতব সংঘাতে
গোঙায় হা-ভাতে দিন, গোঙায় শহর
পা-ছড়িয়ে, চৌমাথার মোড়ে,
যেখানে নিয়ন-চক্ষু রাত্রি ধূর্ত কিরাতের চেয়ে
জাল ফেলে আছে পাহারায়—
থাকব না। নেই আমি এইসব মুমূর্ষ দঙ্গলে
নরকের বীভৎস গলিতে।

প্রথম বর্ষার মেঘ ছোট ছোট বৃষ্টির আঙুলে
উন্মীলিত করেছে আমায়।
ভোরের প্রথম পাখি শানায়ের মতো কণ্ঠস্বরে
ডেকে গেছে বনজ জানালায়।
বাগানে মৃত্তিকা-লগ্ন অবনত ঘাসে নত হয়ে
ফুল-পাখি-পতঙ্গের স্পর্শে শুদ্ধ আমি
জেগে উঠে জন্মান্তের ভোরে
স্রোতের গভীরে এসে জ্বরতপ্ত চেতনার ঘোরে
সান্ত্বনা পেয়েছি এই অবগাহনের মগ্নতায়।

সব আলোড়ন থেমে গেলে এই জলের উপরে,
বর্ণগন্ধহীন স্তব্ধতার ভাষা
মন্ত্রোচ্চারণের মতো মনে হয়।
আচ্ছন্ন শ্রবণ ভরে তরঙ্গিত শব্দের সিম্‌ফনি
ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে আসে :
এক আকাশে যত শান্তি, এই বিশ্বে যা কিছু বিস্ময়—
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে যেন পদ্মমধু!
সমস্ত শূন্যতা করে উদ্ভাসিত একক সঙ্গীতে
ধ্রুপদের সমাগত উদাত্ত গমকে।
উৎকর্ণ সত্তায়, সদা-জাগ্রত চৈতন্যে উন্মুখর
সমুদ্রেই সেই স্বচ্ছ স্বর।

সময়, কয়েকটি চিহ্ন

সিদ্ধেশ্বর সেন

দগ্ধ-ধূসর সবুজ-কিশলয়
পাতা
নিসর্গ জুড়ে

বনস্পতি ও ওষধির মধ্যে

দগ্ধ-ধূসর সবুজ কিশলয়, জ্বালা

বনস্পতি ও ওষধির মধ্যে, নগ্ন-
তাম্রপ্রয়াস, জ্বালা
আর, কঠিন পৃথিবীর আচ্ছাদিত ত্বক
রোমশ, ঊষর, অবান্ধব

আমরা ধাবিত, ধাবিত এক প্রতিশব্দ থেকে আরেক প্রতিশব্দে
—শব্দে

যেহেতু, তৃণ স্পৃষ্ট তৃণ
অপরিণতিও নিরন্তর
সংঘাত
ঘূরন্ত নিসর্গপট
আমরা স্থান নিই, স্থান নিই
আর পা বদলাই

পরিগণিত অবস্থান বদল করি নিরন্তর
অপরিণতি ও সংঘাতের
আলোয়

রূপান্তর চেয়ে চেয়ে, রূপান্তরিত
আমরাই
দেখি, উপকূলভাগ, ঝুঁকে দেখি

দুই

রাত্রি নেমে আসে নিচে
প্রেত-শ্বেত ছায়া, সময় এবং স্মারক
দুঃখ আসে
সে কে—আমি ধারণ করি
মেদ ও কুসুম

(মৃগ-মায়া, অভিশাপস্পৃষ্ট তৃণ)

নরক হাওয়া আর সমুদ্র
মূল উন্মূলিত, পিষ্ট, নিক্ষিপ্ত
স্তম্ভমান, অন্তরীপ-কিনার
তরঙ্গ-তোরণ, তরঙ্গ
আর, অবিচলিত, অবিচলিত স্রোতধার

তিন

যে শায়িতা সে ছিন্নমূল, ছিন্নমূল, উত্থান, উত্থান
মগ্ন-ভগ্ন স্তূপ
চ্যুত লতাপাতা জড়ানো নিষেক
দ্বিভুজ, দ্বিভুজ নরকের হাওয়ায় জড়ানো
বিপরীত-দ্বীপে, দূরে
শত শত শতবার নড়ে, এবং
অনড়, জন্মস্থাণুবৎ

কে
আমি ধারণ করি, প্রজাতি-স্রোত
বয়ে যায়
পিতৃ-প্রতীক স্রোত
মাতৃ-প্রতিম আবর্ত, আবর্ত, মোহানায়,
জলাধারে
ভীষণ পতনশব্দ, ভাঙে
কে জলের তলায়
ভাসে, আর
ডুবন্ত শব ভাসায়

ভোর-ঘটবার আগে, ভোর
সোনায়
সৌর-শঙ্খ
-চিল, ওড়ে
ডানায় অস্থি
বিপুল, বিপুল ডানা
অস্থি, সাজায়
বালুকা-কণিকা, অজস্র শ্বেত-
সার
রক্ত-কণিকা, ভাঙে
বিজোড়, জোড়, যৌটক
ভাঙে এবং গড়ায়
সারা তট জুড়ে ঢেউয়ের ফেনায়, সেতু-
বন্ধের, সেতুবন্ধের, অপ্রকৃতিস্থ
সময়-পাংশু বেলা
আমাদের শতকেশপাশ ছিঁড়ে আদিম-উর্মি ওড়ায়।

একটি পৌরাণিক গল্প

মৃগাঙ্ক রায়

প্রায়শঃই সে-কথা নিয়ে আলোচনা হত ;
তুমি আমি সঞ্জীব সুধাংশু প্রায়শঃই
কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘাসের ওপর
বসতাম, একই লগ্নের করতলে একমণ্ডল
নক্ষত্রের মতো। যে কথা আলোচনা হত,
যার কথা, কেউ তার নিরুদ্দেশ নির্দেশ জানে না,
বৃক্ষ বায়ু ভাগীরথী জনস্থানে কেউ তার সন্ধান
জানে না।

তবু সে কথা নিয়ে আলোচনা হত, তবু
দেখা যেত শুধু সংশয় সাড়া দিত, অন্ধকার
কালপর্বে কৃষ্ণসারমেয় অস্থিলগ্ন হত।
অবশেষে একদিন বৃদ্ধ জটায়ুর মুখে সব
জানা গেল, তার কঙ্কনকাঁচুলিকেয়ূর চিহ্নিত
পথ পাওয়া গেল এবং ত্রিবিণীত ধনুকের
করাল গর্জনে ছিন্নমুণ্ড রক্তাক্ত উদর
গড়াগড়ি গেল।

আমাদের জয় হল, অকাল সন্ধ্যায়
লাল ধোঁয়ার আড়ালে তার মুখ দেখা গেল ;
শোনা গেল—সুধাংশু সঞ্জীব তুমি আমি
অকস্মাৎ শুনলাম, তার দেহে পীত পাপ,
অঙ্গ জরাতুর, তার চোখ প্রাচীন মূর্তির মতো
ফেটে চৌচির। তার সঙ্গে সহবাস অসম্ভব।

মঞ্চদৃশ্যে

তরুণ সান্যাল

একটি নাটকে চরিত্র রেখে
নিভে যেতে পারা মন্দ নয়,
অসাধ্য মানি, তবু প্রত্যেকে
এঁকে যাই ভেবে ধন্দ হয়,
অয়শ্চক্রে দেখি বালুময়
কৃষ্ণাভ তালীবনের গোল
ফেনা ও জলের সুনীল প্রলয়
ঘিরে নিসর্গ ভূমণ্ডল।

আমিও ভেবেছি অমন মুকুর
মঞ্চবাতির প্রেক্ষাপটে
বিদায়ী দৃশ্যে বেহালার সুর
যদি-বা ক্বচিৎ ভাগ্যে ঘটে,
সূর্যের লালে, চাঁদের সাদায়
গড়ুরপ্রতিম ক্ষুধার ঠোঁটে
মরজন্মের পেশল কাদায়
পেছল হাস্য চমকে ওঠে।

ললিত মুখের নিকটে যাবার
নিশ্চিত ছিল তৃষ্ণা দেহে
ঘুমের শরীরে বিদ্যুৎধার
বানাই পেটাই নিবিড় স্নেহে
ভয় থমথম মধ্যরাতের
মাঝ নদী ধরে নৌকা বেয়ে
যাব বলে, যাই, যদিও হাতের
দরিয়াই হল মাতাল নেয়ে।

যাব বলে যাই, মুক্তি ঘনায়
গগনে শ্যামল মেঘের ছলে,
পড়ি, ধুয়ে যাই লুটে তৃজনায়
আমি ও আমার প্রতিমা জলে,
জলে ঘন ঢেউ মুছে দেবে নাকি
আমারই ছায়ার ধূর্ত ফণা,
ভেঙে গুঁড়ো হয়ে রোদের জোনাকী
লক্ষ বিন্দু বৃত্তে বোনা ?

অসীম দুঃখ মাথা কোটে, লোটে
শিশিরে ত্রিশির কাঁচের চূড়ে,
সাত রঙ হয়ে নিন্দায় রটে
ক্রমশ রৌদ্র নিকটে দূরে।
সেবিত গরলে অধুনা সরল
জীবনদৃশ্য মঞ্চ জুড়ে—
কদাপি দাস্তে অথবা তরল
হাস্যক্বণিত ছন্দে, সুরে॥

কল্পনা চায় রূপ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গল্পটার একটা সংক্ষিপ্তসার দিয়ে দিচ্ছি। একটা মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা বেরিয়েছে, অনেকে দেখে থাকবেন।

কিছুদিন আগে যখন আমি রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ নিয়ে রয়েছি, বিনা-টিকিটে রেলযাত্রা প্রতিরোধ করতে, একটি অদ্ভুত ধরনের কেস্ আমার হাতে পড়ে। দিনটা স্বাধীনতা-দিবস, পনরোই আগস্ট। যাঁরা এ সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকিবহাল তাঁরা হয়তো জানেন এই দিনটিতে উল্লিখিত মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকেদের, বিশেষ করে যুবকদের ভেতর একটা সাড়া পড়ে যায়; বিশেষ করে দূর মফঃস্বলের দিকে। টিকিট-হীন যাতায়াতটা যায় বেড়ে। তারা হয়তো মনে করে বিয়াল্লিশের আগস্ট-আন্দোলনটা—রেল ওপড়ানো, তার ছেঁড়া যার অঙ্গ ছিল—সেটা যেমন স্বাধীনতা অর্জনের একটা চিহ্নিত দিবস ছিল, যে-কোনও সালের পনরোই আগস্ট তেমনি স্বাধীনতা উপভোগের দিন। অর্জনের অনুসরণেই উপভোগটাকে রূপ দিতে যায়। জন্মস্বত্ব হিসাবে, যে কথাটা সে-সব দিনে খুব চলেছিল।

একটা সস্তা উত্তেজনা, বাহাদুরি, কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ। তাঁদেরও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে যেমন গোলমালটা যায়

বেড়ে তেমনি অনেকক্ষেত্রে যায় একেবারেই চাপা পড়ে ; হুজুগের বা সস্তা বাহাদুরির যা ধর্ম, জনতা-মনই তো।

সৌভাগ্যবশতঃ আমার এলাকায় চাপাই পড়ে গেল সেবার। তারপর অপ্রয়োজন মনে করে আমার বাহিনী সরিয়ে নোব ভাবছি, এমন সময় একটা কেস হাতে পড়ে গেল।

আগেই বলেছি, একটু অদ্ভুত। একটি আঠারো-উনিশ বছরের ভদ্র ঘরের নিতান্ত নিরীহ গোছের যুবক, মেয়েলী গড়ন, নরম দৃষ্টি। বেশ বোঝা যায়, কোনরকম বাহাদুরি তো দূরে, এই রকম নিতান্ত সস্তা হুজুগে মাতবার মতো মালমশলাও এ ছেলের দেহে বা মনে কোথাও নেই। আমাদের সংক্ষিপ্ত বিচারই করতে হয়, ইংরাজীতে যাকে বলে Summary Trial ; দলকে দল এক সঙ্গে তো ; সেদিন হাতে প্রচুর অবসর থাকায় এবং 'কেস'-টি কৌতুকজনক মনে হওয়ায় একটু ধীরেসুস্থে তদন্ত আরম্ভ করেছিলাম।

ভুল হয় নি। একটু চাপ দিয়ে সওয়াল জবাব চালাতে টের পাওয়া গেল, একটি ছোটখাট রোমান্স রয়েছে ব্যাপারটুকুর পেছনে। ছেলেটি কলেজের ছাত্র, বি. এ. থার্ড ইয়ারে পড়ে। নাম হিমানীকুমার, অর্থাৎ নামেও বাহাদুর নয়, তবে রোম্যান্টিক তো বটেই। যথারীতি একটি নায়িকাও আছে, একটি ম্যাট্রিকুলেশনের ছাত্রী, রোমান্সের বাকি যা তাও আছে, অর্থাৎ পূর্বরাগ।

চাপ দিতে টের পাওয়া গেল, মেয়েটিই নামিয়েছে এই কাজে। ঠিক সে টিকিট না নিয়ে রেল চড়তে হবে পনরোই আগস্টের হুজুগে এমন কথা বলে নি বিশেষ করে, তবে যাকে ভালোবাসছে সে একেবারে নরম, কাদার ডেলা হয় এমনও চায় না। (কোন্ মেয়েই কবে চেয়েছে ?) ঠারেঠোরে এটা জানিয়েছে এবং বীরত্বের এইটিই সবচেয়ে এক হিসাবে নিরাপদ পন্থা মনে করে নেমে পড়েছে ছেলেটি। গল্পটির নাম দিয়েছি "দুঃসাহসী"। সত্যসত্য একটু কারণও হয়েছে। মেয়ে স্কুলেও কিছু হুজুগের গন্ধ পেয়ে অভিভাবক মেয়েটিকে সরিয়ে দিচ্ছেন, তার মামা এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এই গাড়িতেই। হিমানীকুমার বীরত্ব বা একটু দুঃসাহস (ঠিক ঠিক মেয়েটি যা চায়) দেখাবার এ সুযোগটা হাতছাড়া করে নি। সুবিধা হয়েছে, মামাও ওকে চেনেন না।

বড় জংশন স্টেশন, গাড়ি রয়েছে সামনে দাঁড়িয়ে, বড় প্ল্যাটফর্মের একধারে

আদালত বসিয়ে সওয়াল-জবাব চলছে, একবার ওরই কথায় একটু আড়ে দৃষ্টি হেনে দেখি, মেয়েটিও গাড়ির জানলার ধারে বসে নিরুপায়, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আছে চেয়ে। সব মিলিয়ে ছেলেটি ভেঙে পড়েছিল, স্টেশনের একটি নিরিবিলি ঘরে নিয়ে যেতে সব বলল। কাতরভাবে ক্ষমা চাইল।

ক্ষমা যে মনে মনে করেছিই এটুকু বলাই বাহুল্য। নিরীহ রোমান্সের মার্জনা সব পেনাল-কোডেই অলিখিতভাবে ধরা আছে তো। আমার এর অতিরিক্ত কিছু করতে ইচ্ছা হল। অসম্পূর্ণ রোমান্সটি সাধ্যমতো পূর্ণ করে দেওয়া; বীর-রসটা তো ছেলেটি একেবারেই ফোটাতে পারল না। আমি পকেট থেকে একটি দশটাকার নোট বের করে বললাম—"এইটে আমার নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে তুমি ঘর থেকে আস্ফালন করতে করতে বেরিয়ে এস—বলবে—কী মশাই! আপনি জরিমানাই করতে পারেন, তা এই নিন, চোখ রাঙান কাকে? ইত্যাদি যতটা পার, আমার আপত্তি নেই।"

পারল না শেষ রক্ষা করতে। আরম্ভ করল, খানিকটা এগুলও, তারপর সমস্ত স্টেশনের সুমুখে, বিশেষ করে মেয়েটির সুমুখে লজ্জা অপমান, তার ওপর আমার দরদ সহানুভূতি, হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল।

এইখানেই শেষ করেছি। বলতে বাধা নেই, গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক; 'হলে-বেশ-হয়'—এই রকম একটা বাসনা-প্রসূত।

গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর এই চিঠিটি পেয়েছি—

মান্যবরেষু,

আপনার লেখাটি পড়ে বেশ ভালো লাগল। আমার এর আগে শোনাই ছিল লেখকদের সব জানবার, সবার মনের মধ্যে সেঁদিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ রাখবার ক্ষমতা থাকে, এখন দেখছি সত্যিই তাই। আশ্চয্যি! খবর নিয়ে জানতে পারলুম আপনার বাড়ি অনেক দূরে, এখান থেকে তিনশো চারশো মাইল দূরে। আরও জানতে পারলুম আপনি রেলের ম্যাজিস্ট্রেটও নয়, নেহাত গোবেচারি একজন সাদামাটা লেখক, কিন্তু যা যা হল ঠিক জানতে পেরেছেন তো। আশ্চয্যি! অবিশ্যি একেবারে ঠিক ঠিক ভগবান ভিন্ন তো কেউ জানতে পারেন না। আচ্ছা, ভগবান আছেন সত্যিই? রাশিয়া তো

বলছে নেই। চাঁদের দিকে রকেটও তো ছুঁড়ছে। সে তো তেমনি আমাদের এ্যামেরিকাও ছুঁড়ছে, কি বলেন? ওরা তো বলছে আছেন ভগবান।

আমি ঠিক স্কুল-ফাইনালেই পড়ি। আশ্চর্যি নয়? তবে হিমানীশ—হ্যাঁ একটা কথা বলে দি—ওর নামটা হিমানীকুমার নয়, তবু আপনার বাহাদুরিই বলতে হবে, কাছাকাছি তো গেছেন—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, হিমানীশ কিন্তু থার্ড-ইয়ারের ছাত্র নয়। ও আই-এস্‌সি পাস করে দু বছর মেডিকেল কলেজে পড়ল। তারপর ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন বাড়িতেই আছে। বলে মড়া-মানুষ চেড়াফাড়া আমার ভালো লাগে না; আমি জ্যান্ত মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাই। তার মানে ও একজন লীডার হতে চায়। হবেও একজন এটা আপনাকে বলে রাখছি। বাঘা যতীন কি স্বভাষ বোস না হোক, একজন বড় লীডার হবেই। একটা স্থবিধে খাওয়া-পরার ভাবনা নেই তো। কলকাতায় বড় ব্যবসা আছে হার্ডোয়ারের—বাবা আর বড় ভাই দেখেন, ওর কাকে পরোয়া বলুন? কতই বা বয়স এখন? আপনি অবিশ্যি একটু কম করে লিখেছেন। এই সামনের অঘ্রানের বাইশে ওর জন্মদিন, পড়বে ও বাইশ বছরে—অথচ কত বড় বড় মুভমেণ্ট চালিয়ে যাচ্ছে দেখলে আপনার তাক লেগে যাবে। আমার তো যায়। আশ্চর্যি! ও এখন বলছে মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়ানো দরকার, নৈলে এ আমাদের এক পায়ে প্রগতি হচ্ছে। কাজেই কিছুই হচ্ছে না। সত্যিই তো, বলুন না। এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আপনি কত জোরেই বা যেতে পারেন, কত দূরেই বা? আমরা তেমনি বলি —আমাদের তাহলে শিক্ষা দাও, স্বাধীনতা দাও, হাতে অস্ত্র দাও, নৈলে ঝাঁটা আর খন্তিবেড়ি নিয়ে পাশে দাঁড়ালে তো কিছু ফল হবে না। ওদের বাড়িতেই বসে আমাদের তর্ক হয়। যাক, মেয়েদের এখন পুলিস করতে আরম্ভ করেছে। চেঁচামেচি করতে হয়, নৈলে দেয় কেউ, বলুন তো? একদিন আমাদের স্কুলের বিতর্ক সভাতেও কথাটা উঠেছিল। বেলা বললে—'মেয়ে-পুলিস হলে খোঁপার কি দশা হবে? ও আবার একটু সৌখীন তো। শুক্লা—আমাদের ক্লাসের সে ফার্স্ট মেয়ে, খুব তেজী, রুখে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—'খোঁপা থাকার চেয়ে পুলিশ হওয়া ঢের ভালো।' ওদের বাড়িতে যখন তর্ক হয়, হিমানীশ অবশ্য আমাদের দিকেই থাকে। ওর বড়বৌদি কিন্তু একেবারে উল্টো। আশ্চর্যি। কোথায় আরও জোর করে আদায় করতে হবে, তা নয়, সেই আদ্যিকালের দিদিমা ঠাকুমাদের ধরে বসে থাকবে। দেখুন তো।

এই জন্যে আমার হিমানীশকে খুব ভালো লাগে। ও বলে মেয়েরা হচ্ছে শক্তি, তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রেরণা জোগাবে তবে তো আমরা এগুব। বৌদিদি বলে—'বেশি নয়, একটি দিন সবাই হেঁসেল ছেড়ে দিয়ে জোগাচ্ছি প্রেরণা যত চাও, চলো দেখি ক'পা প্রগতি করতে পার।' শুনলেন তো বৌদি'র তর্ক? কেন, মেয়েরা তো গবর্নর পর্যন্ত হচ্ছে, তাদের হেঁসেল চলছে না?

আমি যতটা পারি জোগাই প্রেরণা, হিমানীশও সেটা বোঝে। আর তো কিছুই পারছি না, ওটুকুও করব না? বলুন।

তা বলে রেল-আইন ভঙ্গ করতে ঠেলি নি। ঐখানটায় আপনি একটু ভুল ক'রে বসেছেন। কেন ঠেলব বলুন? যে মানুষকে রুখে রাখাই দায় তার অদম্য পুরুষকারের জন্যে—হ্যাঁ, একথা দুটো আমি আপনারই একটা বইয়ে পেয়েছি, ধন্যবাদ। যা বলছিলুম, যাকে রুখে রাখাই দায়, তাকে আরও ঠেলে দোব বিপদের মুখে? শত্রু নই তো।

আরও একটা কথা আপনি একেবারে ঠিক করে ধরতে পারেন নি। তা কি করবেন? ভগবান তো নন। তাইতে একটু গোলমালও বেধেছে। সেকথা পরে বলছি। রেল-আইন ভঙ্গ অবিশ্যি করেছিল হিমানীশ কিন্তু আপনি যেমনভাবে লিখেছেন তেমনভাবে নয়। অবিশ্যি বৃথা আইন ভঙ্গ করা হিমানীশ পছন্দ করে না। আমাদেরই তো দেশ, আমাদেরই তো আইন। স্বাধীনতা দিবস, অথচ আমাদের কোনদিকেই স্বাধীনতা নেই, তাই প্রতীক আইনভঙ্গ হিসেবে হিমানীশ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে বিনাটিকিটে গিয়েছিল, আপনি যেমন লিখেছিলেন। কিছু একটা না করলে লীডারই বা কিসের? আপনিই বলুন না। হিমানীশ নীতিগতভাবে ওটা করেছিল।

আর, লজ্জা বা অপমান কিছুই বোধ করে নি, তাহলে আপনি চেনেন না ওকে। ও বীরের মতনই বুক ফুলিয়ে নিজের দল নিয়ে আত্মসমর্পণ করলে রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'ফাইন, কি কারাবরণ?' সামারি-ট্রায়েলই তো। হিমানীশ বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বললে—সসম্মান কারাবরণ। পোরাস যেমন আলেকজাণ্ডারকে বলেছিল—রাজার মতন ব্যবহার চাই। আপনি ওকে জানেন না।

আরও একটা ভুল আপনি করেছেন। তা কি করবেন? ভগবান নয় তো। আমি গাড়িতে ছিলাম না। আমার মামাই নেই তো মামার বাড়ি

যাওয়া। বাড়িতেই ছিলাম। আর আমার জন্তেই তো জেলে যেতে হল না ওদের। কি করে তা এবার বলি আপনাকে।

হিমানীশরা অবশ্য খুব লুকিয়েই এখান থেকে বেরিয়েছিল। না হলে কে যেতে দেবে বলুন? আমি অবিশ্যি টের পেয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু গোড়াতেই ফাঁস করে দিয়ে বাধা দিতে যাব কেন বলুন? রাজপুত রমণীরা যখন নিজের হাতে আরও সাজিয়েই দিত। কিচ্ছু বললুম না। ওদের গাড়িটা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে দন্দন্ করে বেরিয়ে গেল। রেলের ধারেই বাড়ি তো আমাদের। আমি জানলার ধারে বসে ছিলাম, জানি তো। দেখি দৃপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে হিমানীশ। মনে মনে বললাম—যাও বীর তোমার জয়যাত্রায়।

কিন্তু যেমন বাধাও দিলুম না কথাটা গোড়াতেই ফাঁস করে তেমনি আবার জেলেও তো যেতে দিতে পারি না জেনেশুনে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে রইলুম। ওদের গাড়িটা জংশন স্টেশনে তিনটে বেজে সাত মিনিটে পৌছাবার কথা, আমি ঠিক আড়াইটের সময় ওদের বাড়ি চলে গেলুম। বেশি দূর তো নয়, রাস্তা পেরিয়েই একটা গলি তারই খানিকটা ওদিকে। সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছিল, আমি গিয়ে বৌদিকে আস্তে আস্তে তুললুম। বললুম একটা খুব দরকারি কথা আছে, কিন্তু আগে দিব্যি করো আমার নাম করবে না। পা ছুঁয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়ে বললুম কথাটা, হিমানীশদা পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে নীতিগতভাবে প্রতীক আইন ভঙ্গ করতে গেছে এই দুটো চোদ্দোর গাড়িতে। তারপর চুপি চুপি বেরিয়ে এলুম। আগেই দিব্যি করিয়ে নিয়েছিলুম আমি বাড়ি পৌছে না যাওয়া পর্যন্ত কাউকে কিছু বলবেন না।

বীর বিক্রমেই গাড়ি থেকে নেমেছিল। আপনি যেমন লিখেছেন মোটেই সেরকম ভাবে নয়। জিজ্ঞেস করবেন জানলুম কেমন করে, ভগবানও নয়, নিদেন একজন লেখিকাও তো নয়। জানলুম কুন্তলের কাছে, হিমানীশের ছোট ভাই। টাকা নিয়ে তখনই মোটরে ক'রে সরকারমশাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কুন্তলও গিয়েছিল। বলে আমরাও মোটর থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পা দিয়েছি, গাড়িটাও এসে পৌছুল, সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন কাঁপিয়ে স্লোগান আওড়াতে আওড়াতে পুলিস আর টিকিট-চেকারের সঙ্গে হিমানীশ নামল। কুন্তল বলে—এই রকম করে বুক চিতিয়ে। রেল আমাদের। নেই দেঙ্গা টিকিট। জেলে যাব। যদি শুনতেন কুন্তলের কথা! দাদারই ভাই তো।

সরকার মশাই অবিশ্যি ছাড়িয়েই নিয়ে এলেন ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে কয়ে। ওর বাবা এদিকের নামজাদা লোক তো একজন।

সমস্তটা যেমন যেমন হয়েছিল জানালুম আপনাকে। জায়গায় জায়গায় একটু এদিক-ওদিক হলেও সত্যিই আশ্চর্য্যি হচ্ছি আপনি অতদূর থেকে জানলেন কি করে! এবার আমি তো বলব গল্পটা আপনি বদলে ফেলুন। কেন? ভেবে দেখুন অমন একজন উদীয়মান লীডারের ওপর কি অবিচার করা হচ্ছে না? তাছাড়াও একটা কথা আছে। যেমন একটু আগে বলেছি, একটু গোলমালও বেধেছে; হিমানীশ বলছে আপনার নামে মানহানির মকদ্দমা আনবে ওকে এইভাবে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে! বেশ বুঝেছি আপনি শিউরে উঠেছেন। ভালোমানুষ লেখক, দুটো গল্প লিখে পেট চালান— হঠাৎ একি বিপদ! তাও তেমন মিল কোথায়? রেল আইন ভঙ্গ তো কত হচ্ছে অমন—ধরতে গেলে শুধু একটু নামের মিল, তাও পুরোপুরি নয়, জায়গাটার নাম দেন নি। ভাবছেন একি বিপদ রে বাবা!

তা অত ভাববেন না। গল্পটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। যদি নাই বদলাতে পারেন তবুও তো একজন নায়কই ও এখন। আমি ঠিক করে নোব ওকে। আপনাকে শুধু একটা অনুরোধ। তাও করছি কেননা না বললেও আপনারা মনের কথা বুঝতেই পারেন। তাই কেমন যেন লেখকের কাছে ভয় হয় না। যদি বলেন লজ্জা তো তাও নয়। বড্ড আপনার মনে হয়। সত্যি কথা বলছি আপনাকে। অতটা লিখলেনও তো আমায় নিয়ে, তাইতে আরও যেন আপনার বলে মনে হচ্ছে।

তাই অনুরোধ করছি বই বেরুলে আমার আসল নামটা দয়া করে বসিয়ে দেবেন। যা লিখেছেন তা নয়, আমার আসল নাম হচ্ছে সুলতা সেন।

আমাদের গাঁয়ের নামটাও বসিয়ে দেবেন? নাঃ, থাক, কি বলেন? অত মিলও আবার ঠিক নয়। প্রণাম রইল। ইতি বিনীতা সুলতা সেন।

ভাবছি করি কি। মানহানির মামলাটা আরও জোরালই হয়ে যাবে না ওদিকে?

কিংবা খুশি রাখতে পারলে আমার নায়িকা পারবেই আমার নায়ককে মানিয়ে নিতে?

সাঁকো

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রকম-সকম দেখে মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত হয় শিবপদর।

তার বৌ যে নিতান্তই গেঁয়ো, এ সম্পর্কে তার মনে কখনো সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু তাই বলে স্যাণ্ডাল জোড়া পায়ে দিয়েই খোঁড়াতে আরম্ভ করে দেবে আর মেয়েটাকে ট্যাঁকে নিয়ে একদিকে খানিক কাত হয়ে অমন বিশ্রীভাবে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে—এমন কথাই বা কে ভেবেছিল তখন ?

—একটু দাঁড়াও না গো, আর যে চলতে পারছিনি।

চলতে পারিসনে তো যেখানে খুশি বসে থাক্—এমনি একটা রূঢ় উত্তর জিভের ডগায় এসেছিল, তবু শিবপদ সামলে নিলে। চারদিকে গিজগিজে লোক। চেনা মানুষেরও অভাব নেই। এই তো একটু আগেই অফিসের হেডক্লার্ক বাবুকে দেখে সে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে এসেছে, অন্যান্য কেরানী বাবুদের দু-একজনের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেছে। তার সঙ্গী পিয়ন-বেয়ারাও নিশ্চয়ই কেউ কেউ ঘুরছে এই মেলার ভেতর। এখন শিবপদ যদি রাগের মাথায় অমনি একটা কিছু বলে বসে বৌকে—তা হলে চুপ করে যে সয়ে যাবে তার বৌও সে জাতের নয়। অমনি হয়তো ট্যাঁক থেকে মেয়েটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে কোমরে হাত রেখে সোজা ঝগড়া করতে দাঁড়িয়ে

যাবে। মেলাশুদ্ধু লোকের সামনে ইজ্জত বলতে কিছু আর বাকী থাকবে না তখন।

অগত্যা কেবল ভুরু কুঁচকেই থেমে যেতে হয় শিবপদকে। আর ফোসকাপরা পায়ে অনভ্যস্ত জুতোটা টানতে টানতে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বৌ এগোয় তার দিকে!

ভুলই হয়েছে বৌকে নিয়ে মেলায় আসাতে।

সরকারী মেলা। লাল শালুতে লেখা আছে একজিবিশন। ভেবেছিল, নতুন জিনিস দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে বৌকে। কিন্তু—শহরের বাইরে মাইল আড়াই দূরে শিবপদর পৈতৃক ভিটে। বাপ-পিতামো ছিল চাষী গেরস্ত, কিন্তু বাপের আমলেই জমি-জমা যা ছিল সব গেছে। থাকবার মধ্যে খোড়ো বাড়িটি, পাঁচ কাঠা জমিতে কলার বাগান আর গোটাকয়েক আম কাঁঠালের গাছ, একটা এঁদো ডোবা, একটা গাই। এও যেত, কিন্তু শিবপদ টেনে-টুনে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত উঠতে পেরেছিল ভাগ্যিস; আর বাপ মারা যাওয়ার পরে শহরের কালেক্টারী কাছারীতে অনেক চেষ্টায় এই পিয়নগিরিটা জুটেছিল বলে রক্ষে! চাষ-বাস চলে গেলেও সরকারী চাকরির গুণে একটু মান-সম্মান গাঁয়ে এখনো আছে। ওর বৌ তো প্রায়ই পাশের বাড়ির পরামানিক গিন্নীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, যাই দিদি, ওঁকে টাইনের ভাত দিতে হবে। উনি তো আবার সরকারী আপিসের নোক!

"টাইন" নয়, "টাইম"—এটা গোমুখ্যু বৌকে বোঝাতে পারেনি শিবপদ। তবু কথাটা বলতে গিয়ে বৌয়ের গলায় যে অহংকারের রেশটা বাজে—তাতে তারো মন খুশি হয়। সে টের পায়—অন্য দশজন স্বামীর চাইতে নিজের স্ত্রীর কাছে খানিকটা অতিরিক্ত সম্মানের পাত্র সে। শুনে বৌকে তার আরো বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু বৌকে সরকারী মেলা দেখাতে সমস্ত সম্মান তার যাবার উপক্রম। বৌ যে এমন ক্যাবলামো জুড়ে দিয়ে সারা শহরে তার মুখ হাসাবে স্বপ্নেও কি বুঝতে পেরেছিল শিবপদ?

হয়েছে কি, এগজিবিশনের চেহারা দেখেই বৌয়ের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

—হাঁগা, এ কোন্ মেলায় আনলে? একী ছাইয়ের মেলা!

—আঃ, চুপ চুপ।

—চুপ চুপ কি গা? কেনাকাটা কই? নাগর দোলা কই? দোকান-পশার কোথায়? আমি যে ক গাছা কাঁচের চুড়ি আর নতুন একটা আলতা কিনব বলে ছুটো টাকা আঁচলে বেঁধে এনেছি? কোন্‌দিকে সে-সব?

ভারী বিব্রত হয় শিবপদ।

—আরে, চুড়ি-ফুড়ি নেই এখানে। ও সমস্ত এ মেলায় বিক্রি হয় না।

—বিক্‌কিরি হয় না?—বৌয়ের চোখ আকাশে ওঠে: তবে এ কোন্ চণ্ডের মেলা? কিসের জন্যে তবে দেড় কোশ রাস্তা ঠেঙিয়ে এখানে মরতে এলুম শুনি? মেলা কাকে বলে সে কি আমি জানিনে?

—আঃ কী জ্বালাতনেই পড়া গেল!—শিবপদ সন্ত্রস্ত চোখ চারদিক ঘুরিয়ে একবার দেখে নেয়, কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কি না। তারপর বোকা বৌকে বোঝাতে চায়: এ সে মেলা নয় রে পাগলী। এখানে নানারকম শিক্ষে হয়। শিক্ষের মেলা।

—শিক্ষের মেলা?—শুনে বৌ চটে যায়: শিক্ষে হয় কি গো! ই কি পাঠশালা নাকি—অ্যাঁ? এমন মেলার কথা সাত জন্মে কেউ শুনেছে কোনোদিন? তুমি কি আমায় শট্‌কে শেখাবার জন্যে মেলায় নিয়ে এলে—অ্যাঁ?

ছুটি লোক মুচকে হেসে তাদের পাশ দিয়ে চলে যায়—কথাগুলো নিশ্চয় কানে গিয়েছে তাদের। লজ্জায় শিবপদর কান ছুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। ইচ্ছে হয়, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় বৌকে।

—চলো—চলো—অনেক দেখবার আছে—বলে বৌকে টেনে নিয়ে এগোতে চেষ্টা করে শিবপদ। ফোসকাপরা পায়ে বৌ নেংচে নেংচে হাঁটে—চারদিক থেকে লোক তাকিয়ে দেখে তাদের দিকে। ট্যাঁকের মেয়েটা ঘ্যান ঘ্যান করে ওঠে: জিলিপি খাব—জিলিপি খাব। বৌ টুক করে তার গালে একটা ঠোনা মেরে দেয়: এই নে হতচ্ছাড়ী জিলিপি খা।

মেয়েটা চ্যাচাবার জন্যে হাঁ করে।

—চিল্লুবি তো আছাড় মেরে ফেলে দেব—তা বলে দিচ্ছি! যমের অরুচি কোথাকার!

ভয় পেয়ে চুপ করে যায় মেয়েটা। থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ওঠে আর কাজলপরা চোখ ছুটো ভাসিয়ে দু গাল বেয়ে তার জল পড়তে থাকে।

শিবপদর মায়া হয় না—লাল খোল গড়ানো ঝুঁটি বাঁধা কাঁদুনে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে গা জ্বালা করে তার।

হিংস্রভাবে একটা বিড়ি ধরায় শিবপদ। নিজের বোকামির জন্যে নিজেরই কান ধরে মলতে ইচ্ছে করে। সে-ই তো বলেছিল—চল্, শহর থেকে সরকারী মেলা দেখিয়ে আনি। তার বৌ গেঁয়ো তা সে জানত—তাই বলে এমন কাণ্ড জুড়ে দেবে শেষে—এ-কথা কি সে ভাবতেও পেরেছিল? কে যে কোন্‌দিকে আছে—অফিসে কি সে মুখ দেখাতে পারবে কালকে?

তবু বৌয়ের মনেও একটু একটু করে কৌতূহল জেগেছে এখন। চার পয়সার চীনে বাদাম পেয়ে আপাতত মেয়েটার প্যানপ্যানানি বন্ধ হয়েছে। কিছুক্ষণ একটু আরাম পায় শিবপদ। কিন্তু—

—ওটা কি গো? ওই যে ভারী যন্তরটা ভটর ভটর করে চালাচ্ছে?

—ওর নাম ট্রাকটার।

—কী হয় ও দিয়ে? মাগো—মাটিফাটি ভেঙেচুরে যে একশা করে দিচ্ছে!

—আরে, মাটি ভাঙবার জন্যেই তো। ওটা হল গিয়ে তোমার চাষের যন্তর।

—চাষের যন্তর?—বৌ গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ: এখন বুঝি ভদ্দর লোকেরাও চাষ করবে? মোটরে চড়ে চাষ?

শিবপদ আবার সন্ত্রস্তভাবে চারদিকে লক্ষ্য করে: ভদ্দরলোকেরা চাষ করবে কেন? চাষীদের জন্যেই তো ওগুলো।

—চাষীরা ওসব পাবে কোথায়? বলে—হালের বলদই কিনতে পায় না—হুঁ!

—চাষীদের কিনতে হবে না—সরকার দেবে।

—সরকার থেকে পেণ্টলুন দেবে? ওই বাবুদের মতো জুতো-মোজাও দেবে নাকি চাষীদের?—বৌ আরো অবাক হয়।

পাশ থেকে হাসির আওয়াজ শোনা যায়। অনেক জোড়া চোখ ঘুরে এসেছে তাদের দিকে। ট্রাকটর নয়—তাদেরই সকলে দেখছে এবার।

শিবপদর মাটির তলায় ঢুকে যেতে ইচ্ছে করে। আজ পর্যন্ত কোনোদিন সে বৌয়ের গায়ে কখনো হাত তোলেনি—কিন্তু এই মুহূর্তে হাত দুটো তার নিশপিশ করে ওঠে। উঃ, নিজের হাতে তুলে কী মাটিই সে খেয়েছে আজ!

—চলো—চলো—ওদিক পানে দেখে আসি একটু···

তারপর ডি-ভি-সির মডেল, দুর্গাপুরের লোহার কারখানা—এটা ওটা কত কী! কিন্তু দুর্গতির লাঘব হয়নি শিবপদর। আগাগোড়া বৌ সমানে বোকামি করেছে—আর বকর বকর করে মাথা ধরিয়েছে। মেয়েটাও হয়েছে মার মতোই হাবা। চীনে বাদাম শেষ করেই তার বায়না: জিলিপি দাও—জিলিপি!

—কী জ্বালাতন! বলছি যে জিলিপি এখানে পাওয়া যায় না?

—মা যে কিনে দেব বলেছিল? খাব—জিলিপি খাব···

—আমায় খা, আমায় খা!—চারপাশের লোককে চমকে দিয়ে খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে বৌ: আমার হাড় মাস খা!

এখুনি বৌয়ের মুখটা চেপে ধরা উচিত, কিন্তু সে তো আর পারা যায় না! শহরের মানুষগুলো এর মধ্যেই তাদের চিনে নিয়েছে, কেলেঙ্কারির পরিমাণটাও আর বাড়ানো চলে না। দাঁতে দাঁত ঘষেছে শিবপদ—তারপর সামনে বেলুনওলা দেখে নিরুপায় হয়ে একটা বেলুনই কিনে দিয়েছে মেয়েকে।

বেলুন দেখে পাঁচ দশ মিনিট চুপ। কিন্তু একটু পরেই আবার বায়না শুরু করে।

—মা, জিলিপি?

—দুত্তোর! যেমন মা, তেমনি তার ছা!—এবার রুখে দাঁড়ায় শিবপদ: এমন গেঁয়ো ছোটলোক নিয়ে কেউ এ-সব মেলাতে আসে?

—আনতে মাথার দিব্যি কে দিয়েছিল শুনি?—বৌ ঝঙ্কার দেয়: ওরে আমার মেলারে! মেলার কী বা ছিরি। খামোকা ভোগান্তি!

—খুব হয়েছে!—শিবপদ আগুনঝরা চোখে বলে: নে—বাড়ি চল্, তোদের 'এনেই আমি মাটি খেয়েছি! চারদিকে জানা-চেনা লোক—মাথাটা আমার হেঁট করে দিলে সব্বার সামনে?

—ওঃ, ভারী মাথা! আদালতের পেয়াদা, মেলাশুদ্ধ সব্বাইকে সেলাম করছ তখন থেকে—মাথার দৌড় তোমার দেখে নিয়েছি—চটাং করে চড়া গলায় জবাব দেয় বৌ।

শিবপদ শক্ত হয়ে যায়। এতদিন ধরে তাহলে বৌ যে বলে এসেছে "টাইনের ভাত", "সরকারী আপিসের নোক"—এ সব তাহলে নিছক কথার কথা! তার কাছেও সে তবে পেয়াদা ছাড়া কিছুই নয়! বৌয়ের চুলের

মুটিটা চেপে ধরবার জন্তে হাতটা এগিয়ে গিয়েও থমকে থেমে যায়। এই অপমানটুকুই তবে তার বাকী ছিল আজকে।

শিবপদ বলে—বাড়ি চল্।

—চলো না বাপু, বাঁচি তো তাহলে।—বৌয়ের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে: হাড়ে বাতাস লাগে আমার।

শিবপদ মাথা নিচু করে হাঁটে—যেন শহরের লোকের দিকে সে আর তাকাতে পারছে না। পেছন না ফিরেও শিবপদ বুঝতে পারছে, মেয়েটাকে ট্যাকে করে, ফোসকাপড়া পায়ে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে তার বৌ আসছে, আর শহরের সমস্ত লোক যেন তাদের দেখিয়ে বলছে—ওই যাচ্ছে শিবপদ পিয়ন, পেছনে নেংচে নেংচে হাঁটছে তার গেঁয়ো পেত্নী বৌটা। ছি—ছি—ছি!

—একটু আস্তে হাঁটো না গো—পায়ে বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার!

শিবপদ জবাব দেয় না। মনে মনে বলে, চুলোয় যা। আর যদি কোনোদিন তোদের শহরে নিয়ে আসি—তবে আমি তারাপদ সরকারের ছেলেই নই! কালীর দিব্যি!

বেলা আস্তে আস্তে ডুবে আসে। বাঁ দিকে, খানিক দূরে লাসকাটা ঘরটার মাথার ওপর সূর্যের শেষ রঙ পড়ে। ছোট লোহার পুলটার তলায় মরা খালের কাদা-জল কালো হয়ে আসে। মিউনিসিপ্যালিটির আলোর পোস্ট পুলের এপার পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ায়—শহরের সীমানা।

পুল পার হয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে শিবপদ। মনের জ্বালাটা শান্ত হয়ে এসেছে এতক্ষণে। আর শহর নেই, লোকের ভিড় নেই আর। সুরকির পথের ওপর এখানে ধুলোর আস্তর—মাঠের হাওয়া আসছে ধানের চারার গন্ধ নিয়ে। একটু দূরে কয়েকটা ঝাঁকড়া গাছের ওপরের পাতাগুলো এখনো চিকচিক করছে—তাদের তলায় দানা বাঁধছে অন্ধকার। শহরের আলো সেখানে কখনো পৌঁছুবে না।

কিন্তু বৌ কতদূরে? বসে পড়ল না তো কোথাও!

এবার উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরে তাকায়। মেয়ে কোলে নিয়ে, পুল পার হয়ে বৌ নেমে আসছে আস্তে আস্তে। খুব কষ্ট হচ্ছে বোঝা যায়। ভারী করুণ

দেখায় এখন। শিবপদ দু পা এগিয়ে যায় বৌয়ের দিকে। রাত্তিরে বৌটা ভীতু হয়ে যায়—সেটা মনে পড়ে এতক্ষণে।

—হাঁটতে পারছিসনে বুঝি? লাগছে?

—তবু ভালো, জিজ্ঞেস করলে এতক্ষণে! ক্লান্তিতে বৌ অল্প অল্প হাঁপায়; রাগ করতে গিয়েও যেন তার দমে আর কুলোয় না: পায়ে ফোসকা পড়ে গলে গিয়ে এখন যা টাটাচ্ছে! কী করে যে আসছি, ভগবানই জানে।

—তিন বছর আগে জুতো কিনে দিয়েছি, প্রাণে ধরে পায়ে দিবিনি তো! হবেই এ-রকমটা।

—কথা শোনো! বৌ গালে হাত দেয়ঃ জুতো কখন পরব শুনি? ধানসেদ্ধ করবার সময়? রান্নার সময়? গোরুকে গোয়ালে দেবার সময়? কী যে বলো, ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু! কোন্‌দিন বলবে, জুতো পরে চান করে আয়গে!

—খোল্ খোল্ এখন।—শিবপদ নুয়ে পড়ে বৌয়ের পায়ের দিকেঃ পায়ে কী হয়েছে দেখি?

—ও মা—ছি ছি! পায়ে হাত দিয়োনি! খুলছি—আমিই খুলছি।—সন্ত্রস্ত হয়ে চটি থেকে পা বের করে বৌ।

শিবপদ দেশলাই জ্বালে, তারপর শিউরে ওঠে। বৌয়ের দু পায়ের পাতাই একেবারে ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত চটচট করছে।

—তুই মানুষ না আর কিছু। হাঁ রে—এইভাবে এতটা হাঁটলি! কেউ পারে?

বৌ বলে—কী করব? তোমার মানের কথাটাও ভাবতে হয় তো। শহরের রাস্তায় জুতো হাতে নে হাঁটলে লোকে তোমায় কী বলত বলো দিকি? তুমি যে চেনা মানুষ গো!

শিবপদ বৌয়ের মুখের দিকে তাকায়। আবছায়া অন্ধকারে মুখটা ভালো করে দেখা যায় না—কপালের টিপটা কেবল ঝকঝক করে। মাঠ থেকে ধানের চারার গন্ধ আসে হাওয়ায় হাওয়ায়। শহরের শেষ ল্যাম্প পোস্টটা অনেক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। শিবপদর মনে পড়ে, তার ছোট্ট শামলা বৌটির মতো মিষ্টি মুখের গড়ন গাঁয়ের কোনো মেয়েরই নয়। শিবপদর বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করতে থাকে। নরম গলায় ডাকে—বৌ!

—কী বলছ গা?

—তুই এত ছোট্ট যে এই দেড় মাইল রাস্তা তোকে বুকে করে নিয়ে যেতে পারি—তা জানিস ?

—ছি-ছি !—বৌ জিভ কাটে : তুমি সরকারী নোক—কারুর চোখে পড়লে কী ভাববে বলো তো ?—বউয়ের কথায় গর্বের সুর বেজে ওঠে : তার চেয়ে এই মেয়েটাকে একটু নাও দিনি—কাঁকাল আর বইছে না !

মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শিবপদ তুলে নেয় তাকে—মাথাটা শুইয়ে দেয় কাঁধের ওপর। একটু থাবড়ায় আস্তে আস্তে। তারপর বৌয়ের একটা হাত নিজের মুঠোর ভেতরে টেনে আনে, প্রচুর আপত্তি সত্বেও তার জুতো জোড়া নেয় আর এক হাতে, বলে,—আয়, আমার হাত ধরে এগিয়ে চল্। দেড় মাইল তো রাস্তা—দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাব। দরকার হলে তোকেও তুলে নেব কাঁধে। আয়…

ধানের মাঠ থেকে নতুন চারার গন্ধ নিয়ে বাতাস আসে—গ্রামের গন্ধ। শহরের শেষ সীমায় আলোটা জ্বলে উঠলেও এতদূরে তা আর দেখতে পাওয়া যায় না। নিজেকে এখন ভারী সুখী মনে হয় শিবপদর।

লড়াই

সমরেশ বসু

আবার জল বাড়তে লাগল। বেত্‌নি নদীতে জল আবার বাড়তে লাগল। কালো হল। ফুলতে লাগল। কিন্তু শব্দ নেই। ঢেউগুলি ফণার মতো বড় হতে লাগল। উঁচু হতে লাগল। কিন্তু কোনো শব্দ নেই। চুপি চুপি আবার সে এল সমুদ্র থেকে, নদীর তলে তলে। চোরা 'ঝুটো'-র মতো এল সমুদ্রের জল নিয়ে। আর ফুলতে লাগল। উঁচু হতে হতে বাঁধ ছাড়িয়ে গেল। ছাড়াতে ছাড়াতে আকাশের সমান উঁচু হল। আকাশে ফটফটে তারা ছিল। ঢেকে গেল, লেপটে গেল। আর জলের তলা থেকে সেই জলস্তম্ভের ঝুটো এবার প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু কোনো শব্দ নেই।

বদি সরতে লাগল। এই! এই আবার আসছে। বদি গা ঘস্‌টে ঘস্‌টে বড় বড় নখ দিয়ে মাটি খাম্‌চে খাম্‌চে সরতে লাগল। এই! অপ্‌ঘেত্তেটা আবার আসছে। আবার সোহাগ করে বলত, "অ সোনা, তোর নাম রেখেছি বদরীনারায়োন।" বদি সরতে লাগল। কুঁকড়ে, বেঁকে ছোট হয়ে, একটা দেয়াল খুঁজতে লাগল। একটা কোণ। আর গায়ের মধ্যে চট্‌চট করতে লাগল ওরই বিষ্ঠা আর মূত্র।

কিন্তু আকাশ সমান সেই কালো জল সাপের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল। আর জলস্তম্ভের ঘূর্ণী পাকে পড়ে মাছগুলি ছিটকে যাচ্ছে। রাক্ষুসে কামটগুলি ওলটপালট খাচ্ছে। কিন্তু কোনো শব্দ নেই। আর এগিয়ে আসতে লাগল। বাঁধ ডিঙিয়ে নেমে, একেবারে বদির সামনে এসে দাঁড়াল। জল দু ভাগ হয়ে গেল। আর জলস্তম্ভটা আবার সেই মূর্তি ধরল।

সেই কুলোর মতো বড় বড় কান। সাদা মুলোর মতো দাঁত। পাঁশুটে রোঁয়া ভরা প্রকাণ্ড মুখ আর ঝুলে পড়া চোখ। ঝুলে পড়া চোখ দুটো চোয়ালের ওপর নেমে এসেছে, আর সেখানেই অঙ্গারের মতো তারা দুটো জ্বলছে, নড়ছে। সে ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল, বদি।

বদি চীৎকার করে উঠল, আমি যাব না।…

সে বলল তেমনি, চেঁচাস না বদি। তোর সময় হয়ে গেছে।

বদি মুখ ঢেকে বলল, না, আমি তোর সঙ্গে যাব না। তুই দানো!

—আমি তোর বাপ নেতাই।

—এখন তুই দানো। তুই অপঘাতে মরেছিস্, তুই ঝুটোতে গা ঢেকে এইছিস্, তুই দানো।

—হায়, আমি দানো, কিন্তুন্ তোর বাপ। আমি তোকে নিতে এইছি।

বদি দু হাত দিয়ে বুক ঢেকে চিৎকার করে উঠল, আমি যাব না…।

—যাবি। তোর সময় হয়েছে।

—আমি যাব না—।

—আমি একলা আছি বদি। আমার আর কেউ নেই।

—আই শালা, তুই দানো। আমি যাব না।

—গাল দিস্ না বদি।

—আই কামটের বাচ্চা, তুই দানো। আমি যাব না।

—গাল দিস না বদি।

—হেই শোরের বাচ্চা, তোকে গুনীনে খাক্।

—ও নামটা করিস না বদি।

—আ-ই গু-নী—ন্ হে… !

জল সরতে লাগল। মূর্তিটা জলের ঘূর্ণীস্তম্ভে ঢুকতে লাগল। বদির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎ নিশ্বাস পড়তে লাগল জোরে জোরে। সে আরো জোরে চিৎকার করে উঠল, আ-ই গুনী-ন্, বাউল্—হে !…

জল সরতে লাগল আর নিচু হতে লাগল আর ঝুটোর জলস্তম্ভে দানোটা আস্তে আস্তে ঢুকতে লাগল। বদি প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল, আই দানোরো শমনো হে গুনীন্—! আই ছাখসে, আই তের বছরের বদিকে শালা নে যেতে এয়েছে।··

জল বাঁধের ওপর সরে গেল। নিচু হতে লাগল আর আকাশটা দেখা গেল। তারা দেখা গেল। কিন্তু চুপিচুপি স্বর ভেসে এল আবার, কিন্তুক্ তোকে যেতে হবে বদি।

—আই মা বনবিবি গ—, আই ছাখসে, আমার বাপ বিষ্টাখেগো দানোটা আমাকে নে যেতে চায় গ···। হে খোকা ঠাকুর গ, আই ছাখসে, আমি যোয়ান হই নাই, মাছ মারতে যাই নাই, আর ঢ্যামনার বাচ্চা দানোটা আমাকে নে যেতে চায় গ—।

জল সরে গেল বাঁধের ওপারে, নদীর ওপরে। আর নিচু হয়ে গেল, নদীর সঙ্গে মিশে গেল। ঝুটো তলিয়ে গেল। ভাঁটা পড়া বেত্‌নি ছলছল করতে লাগল। যেন এতক্ষণ কে মন্ত্র দিয়ে বেত্‌নিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। আবার গেমো বন দুলতে লাগল বাঁধের ওপরে। তারাগুলি হাসতে লাগল মিটিমিটি। পশ্চিমের অনেক দূরের আকাশে ঝাপসা এক ফালি চাঁদ টিমটিম করতে লাগল।

আর বদি এখনো হাঁপাচ্ছে। কাঁপছে থরথর করে। চোখ মেলে আছে ও। ও দেখতে পাচ্ছে এখন বাঁশের আড়াগুলি। অন্ধকারেই দেখতে পাচ্ছে, বাঁশের আড়ার ওপরে গোলপাতার চালা। মনে পড়ছে, এটা ধানের গুদাম ঘর। ধানের শূন্য গুদাম ঘর। এটা গঞ্জ।

আবার যেন কে এল নিচু হয়ে। এসে ওর নিম্নাঙ্গগুলি চাটতে লাগল। অ! কুকুরটা এসেছে। নোংরা চাটছে। গরম জিভ দিয়ে চাটছে। ভালো লাগছে বদির। যেন বাছুরকে গাই চাটছে। কিন্তু ও আর চোখ বুজবে না। চোখ বুজলেই সে আসে। সেই দানোটা। টের না পেলেই, ঘুমিয়ে পড়লেই, টপ করে তুলে নিয়ে যাবে। আর, একবার তুললেই শেষ। ছুঁলেই গেল। ওকে জেগে থাকতে হবে। খারাপ খারাপ গালাগাল দিতে হবে। গুনীন বাউলের নাম্ নিতে হবে। খোকা ঠাকুর বনবিবিকে ডাকতে হবে। আর তখনই পালাবে।

আর বাপ যখন অপঘাতে মরে দানো হয়, তখন সে কাউকে খাতির করে

না। ছেলেকেও না। কিন্তু বদি এখনো কত ছোট। এখনো যোয়ান হয় নি। মাছ মারতে যায় নি। আর এখনি তাকে নিয়ে যেতে চায়।

কান্না ঠেলে উঠল। তার সঙ্গেই, আবার সেই তেতো জলে ভরে উঠল মুখটা। আর মুখের মধ্যে কিলবিল করে উঠল সেই জিনিস। কিরমি, কিরমি। থু থু করে উঠল বদি। যেন বান মাছের মতো লাফাতে লাফাতে মুখ থেকে ছিটকে গেল গলার কাছে। তারপরে মাটিতে।

আবার কিসের শব্দ?

বাতাস। বৈশাখের বাতাস। সমুদ্র থেকে আসছে! আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়। গোলপাতার ছাউনিতে শন্ শন্ শব্দ তুলছে। আর খোলা দরজা দিয়ে খালি গুদাম ঘরে এসে ঢুকছে। গায়ে বেশ করে বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে চাইছে। কিন্তু বদি আর ঘুমোবে না।

আবার কিসের শব্দ?

অ! পুবের চালাগুলিতে কালীদিদিরা হাসছে। খাঁদুদিদি, আর টেপী মাসীরা হাসছে। এখন গঞ্জ মরা। ধান মন্দা। পাট নেই। গঞ্জ এখন গাঁ জুড়ে শ্মশানের মতো মহাশ্মশান। তবু বুঝি কেউ এসেছে। বাজার মন্দা হলেও যে মহাজনদের অনেক টাকা থাকে, সেই রকম কেউ। আদিবাসীদের কাছ থেকে পচুই এনেছে, তাড়ি এনেছে। তাই খেয়ে হাসছে। আর ওই তো, হারমনিয়া বাজছে। বোধ হয় খাঁদুদিদি গান করছে, যাতা থাও, যেয়ো না। আর কালীদিদিরা পচুই খেলে কী রকম ক্ষেপে যায়। গায়ে জামা কাপড় রাখে না। খালি হাসে। এখন সেই রকম হাসছে।

তবে কি রাত বেশি হয় নি।

কিন্তু চোখের পাতা বুজে আসছে কেন? শালা আমাকে মন্ত্র দিচ্ছে। আই গুনীন হে—! কিন্তু বাঁশের আড়াগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। আর মুখের মধ্যে আবার কিলবিল করছে। কিন্তু ফেলতে পারছে না। কেবলি যেন তলিয়ে যাচ্ছে। টানছে নাকি কেউ? কে? কে? আই খোকা ঠাকুর হে—!

এই সব ঠিক হয়ে গেছে। এই তো সব দেখা যাচ্ছে। এখন দিনের বেলা। সকাল বেলা। এই তো নদী। বেতনি নদী, কেমন কলকলাচ্ছে, ছলছলাচ্ছে। আর চলেছে ভাঁটার টানে। আকাশটা ফর্সা। কোথাও

মেঘ নেই। বাতাসে গেমোবন দুলছে, নুইছে। আর বদি বসে আছে বাঁধের ওপরে। ও দেখছে, জল নতুন। নদী দক্ষিণে ছুটেছে।

ওর নাকে গন্ধ লাগছে। সেই গন্ধ। পাকা ওড়চাকা ফল আর গেমো ফলের। ওর নাকে গন্ধ লাগছে পাকা কেওরা ফলের। আর চোখ দুটো কামটের মতো তীক্ষ্ণ এবং অপলক হয়ে উঠছে। মুঠি পাকিয়ে যাচ্ছে। জলে যেন কী দেখতে পাচ্ছে ও। আর বিড়বিড় করছে, এসেছে! এসে পড়েছে। আরো আসছে। এইবার। এই সময়! ওই তো সেই চোখ। লাল হীরার মতো চোখ, আর রুপোর মতো শরীর।

আর বদির কানে বাজছে সেই শব্দগুলি, এই সেই খোকা ঠাকুরের আশীর্বাদ। দূর সমুদ্র, অনেক দূর আর সেই পাতাল থেকে ওরা এসেছে খোকা ঠাকুরের হুকুমে। লড়ে নিতে হবে।

বদি উঠে দাঁড়াল। ও উলঙ্গ, কিন্তু ঘা পাঁচড়াগুলি নেই। শরীরটা তাজা লাগছে। বমি আসছে না, মুখে কিছু কিলবিলিয়ে উঠছে না। বদি তাকাল চারদিকে। সাবধানী সতর্ক চোখে চারদিকে দেখল। না, কেউ নেই।

কেউ নেই আশেপাশে। আর বাঁধের নিচেই গেমোবনের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে নৌকাটা। তীরের মতো নৌকা, ছই নেই। পাটাতনের ওপর জড়ো করা রয়েছে, জোড়া লাগানো বিন্ জাল। বৈঠা রয়েছে গলুয়ের কাছে।

কেউ নেই আশেপাশে। আর ওরা আসছে। লাল লাল হীরার মতো চোখ আর রুপোর মতো শরীর বিশাল এবং গম্ভীর। নির্ভয় আর শান্ত। পুচ্ছ দোলাচ্ছে জলে। লড়বার জন্যে ডাকছে।

বদি ঝাঁপিয়ে পড়ল গেমো বনে। নৌকা খুলল তাড়াতাড়ি। বৈঠা তুলে চাড় দিয়ে, ভেসে গেল নদীর জলে। ভেসে গেল দক্ষিণে, ভাটার টানে। জোরে জোরে বৈঠা টানতে লাগল। তীরের মতো ছুটল দক্ষিণে।

গন্ধ লাগছে নাকে। ওরা আসছে।—"দূর সমুদ্র থেকে খোকা ঠাকুর ওদের পাঠিয়েছে। গন্ধে ওদের পাগল করে ছুটিয়ে দিয়েছে। বলেছে, যা, খেগে যা। লড়ে খেগে যা।"

ওরা আসছে। এখন ভাঁটা, সমুদ্রে যাচ্ছে। যাচ্ছে গন্ধ বয়ে নিয়ে। আর ওরা আসছে। উজান ঠেলে, নিঃশব্দে, দল বেঁধে, গায়ে গা দিয়ে আসছে। আর বদি যাচ্ছে, মুখোমুখী হতে।—"জীবনের সঙ্গে, আর মনের সঙ্গে এই রকম আমাদের সামনাসামনি দাঁড়াতে হয় বাবা বদি।"…

জোরে, আরো জোরে। কোথায় মুখোমুখী হবে? শালকির চরে? না। বৈচকের বনে? না। তবে? আরো নিচে, আরো। সাঁইমারা চরে। ওই দূরে, ওই দূরে, সাঁইমারা চরে। জোরে, আরো জোরে হে বদি। নৌকাওয়ালারা যদি পিছন তাড়া করে, যদি ধরে ফেলে, তবে আর হবে না। পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

এই সাঁইমারার চর। চর নয়, জঙ্গল। গোলপাতার বন আর গেমো, গুড়চাকা, কেওরার জঙ্গল। পাকা পাকা ফলে গাছ ভরতি। তলায় বিছানো। অন্ধকার সাঁইমারার জঙ্গল গন্ধে আমোদিত। এইখানে, এই সেই জায়গা। জলের ধারেই, অর্জুনের গোড়ায় নৌকা বাঁধল বদি। লাফিয়ে ডাঙায় নামল। পলিমাটির পিছল। পা হড়কে যায়।

চরে জল নেই। ভাঁটায় নেমে গেছে। জোয়ার আসবার আগেই, লড়বার জায়গা গণ্ডী দিতে হবে। ওরা আসছে। যাত্রা করেছে দূর সমুদ্রের অন্ধকার পাতাল থেকে। এখন উজান ঠেলছে। তারপরে জোয়ারে গা এলিয়ে দেবে।

অনেকগুলি বিন্ জাল এক সঙ্গে জোড়া। জুড়ে জুড়ে লম্বা করা হয়েছে। প্রায় দু মন বোঝা টেনে টেনে নামল বদি। পাটাতন তুলল। খোলের মধ্যে শোয়ান মানুষের বুক সমান বাঁশ। তাড়াতাড়ি নামাল বদি। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। দেখল সাঁইমারার অন্ধকার জঙ্গলাবৃত চরকে। তারপর, গেমো গুড়চাকা আর কেওরার ঘন সন্নিবিষ্ট অংশকে ঘিরে পায়ে হেঁটে, গোল করে একটা পাক খেয়ে এল। মাটিতে তাকিয়ে দেখল। পায়ের ছাপ পড়েছে পলিমাটিতে। এবার শাবল।

শাবল দিয়ে গর্ত করে, বাঁশ পুঁতল। কয়েক হাত দূরে দূরে। একটা করে বাঁশ, গোল করে ঘিরে পুঁতল। তারপর হঠাৎ চমকে ফিরে তাকাল। জলে শব্দ নেই। সব স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভাঁটা শেষ হয়ে আসছে। সময় নেই, সময় নেই আর। তাড়াতাড়ি।

বিন্ জাল বাঁশের গায়ে গয়ে পেতে ফেলল। পেতে ঘিরল চারদিক গোল করে। দুহাত দিয়ে নরম পলিমাটি নিয়ে জাল চাপা দিতে লাগল। সবটা জাল পলিমাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ওরা আসছে। গায়ে একবার, একটু ইশারায় জালের সুতো ঠেকলেই, সজাগ হয়ে যাবে। "এসো না! আর এসো

না। আমরা টের পেয়েছি, ওরা হেরে গেল। এসো না কেউ!” সংবাদ চলে যাবে দূর পাতালে।

মাটি ঢাকা শেষ হবার আগেই প্রবল গর্জন কানে এল বদির। মাথা তুলে দেখল, বাসুকির মতো ফেনা মুখে নিয়ে আকাশের বুক ঘেঁষে বান আসছে। আর সময় নেই। কোনো রকমে শেষ সীমা পর্যন্ত মাটি ঢেকে, ছুটে এসে নৌকায় উঠল বদি। দুহাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে অর্জুনের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা মোটা দড়ি দুহাতে আঁকড়ে ধরে রইল।

আর সেই মুহূর্তেই, সহস্র ফণা এসে প্রচণ্ড গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। মনে হল, অর্জুনের মগডালে ঠেলে তুলল নৌকা শুদ্ধ। আবার আছড়ে নামাল। আবার তুলল, আবার নামাল। আবার, আবার…। তারপর একসময়ে স্থির হল। উলঙ্গ শরীরটা নিয়ে ও শুয়ে পড়েছিল। বান চলে যাবার পর, আরো খানিকক্ষণ ও চুপ করে পড়ে রইল। যখন নৌকাটা শান্ত হল, বদি আস্তে আস্তে মুখ তুলল।

ডুবে গেছে! সাঁইমারার চর ডুবে গেছে। আরো ডুবছে। জোয়ার এসেছে। আরো ডুবছে। আর বদির মুখে একটা হাসি ফুটছে। ও উঠে দাঁড়াল। উলঙ্গ, কালো, শনমুড়ি চুল আর দুধের এবং নতুনে মেশানো দাঁতের হাসি। কিন্তু অপলক চোখে তীক্ষ্ণ শিকারীর দৃষ্টি। জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। চুপিচুপি বলল, আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, লাল লাল হীরার মতো চোখ। আর রুপোর মতো শরীর। সুচতুর, উৎকর্ণ, মন্থরগতি আর গম্ভীর।—“সেও বাঁচবার জন্য আসে। আমিও বাঁচবার জন্যে আসি।”

হঠাৎ জল একবার চলকে উঠল। লোভ দেখাচ্ছে, পরীক্ষা করছে। কেউ আছ? শত্রু কেউ আছ? বদি নিশ্বাস বন্ধ করে রইল। এই ওদের লড়াই। এই লোভ দেখানো আর এই স্তব্ধতা, উৎকর্ণ মন্থরগতি, সুচতুর নড়াচড়া। “কিন্তুন্ আমি মাছমারার ছেলে। তোর সঙ্গে আমার এই হার জিতের খেলা।”…কথাগুলি সব মনে পড়তে লাগল বদির। ও স্থির হয়ে রইল। আর তীক্ষ্ণ চোখে দেখল, বাঁশের খুঁটিগুলি। আর বেশি দেরি নেই খুঁটিগুলি ডুবতে। তার আগেই, কাজ শেষ করতে হবে।

নিঃশব্দে, নিঃসাড়ে জলে নামল বদি। ওর নাভি পর্যন্ত ডুবে গেছে। আর তরতর করে জল বাড়ছে। একটু শব্দ না করে, আস্তে আস্তে খুঁটির কাছে

গিয়ে দাঁড়াল। নিচু হল। নিচু হয়ে, একেবারে নিঃশব্দে জাল টেনে তুলে, খুঁটির ডগায় বাঁধল। আবার আর একটা খুঁটির কাছে গিয়ে তুলল, জাল বাঁধল ডগায়। নিঃসাড়ে সমস্ত খুঁটির ঘেরাওটা ঘুরে ঘুরে জাল তুলে তুলে, গণ্ডী বাঁধতে লাগল খুঁটির সঙ্গে।

যত সময় যেতে লাগল, ততই জল বাড়তে লাগল। আর ওর গলা অবধি ডুবে গেল। তখন ডুব দিয়ে দিয়ে জাল তুলে বাঁধল খুঁটির ডগায়। কিন্তু, সাবধান, শব্দ যেন না হয়। ওরা হারছে। ওরা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে পাকা গেমো ফল। ওড়চাকা আর কেওরা ফল। ওই ফলের গন্ধে পাগল করে ওদের ছুটিয়ে দিয়েছে খোকা ঠাকুর। বলে দিয়েছে, "সাবধান! সেই তোমার শত্রুপুরী! সেইখানে তোমার বাঁচা মরার লড়াই।"

আর বদির মনে পড়ছে সেই কথাগুলি, "সংসারের এই বিধি, লড়েই বাঁচতে হয় বাবা। আমাদের লড়েই মরতে হয়।"

গণ্ডীর শেষ সীমা অবধি যখন জাল বাঁধা হয়ে গেল, তখন বদির ডুব জল। স্রোত ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরে। কিন্তু শব্দ করার উপায় নেই। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে কাছের একটা গাছ ধরল ও। নৌকায় ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। জল না চলকিয়ে, আস্তে আস্তে গাছে উঠে পড়ল।

সময় যেতে লাগল। জল বাড়তে লাগল। বেলা মাঝামাঝি উঠল। জল বাড়তে লাগল। ওরা হারছে। বেলা ঢল খেল। জলও ঢল খেল। জল নামছে। আসে যত জোরে, নামে তার থেকে জোরে। জল নামছে। আর ওদের লোভ বেড়ে গেছে। ওরা গন্ধে পাগল হয়ে গেছে। পেটে ওদের অভর ক্ষুধা।—"মানুষকে ক্ষুধা দিয়েছেন উনি, আর তার জ্বালায় লড়তে বলেছেন। মানুষকে ঘর সংসার ছেলেমেয়ে দিয়েছেন উনি। তাদের লড়ে বাঁচাতে বলেছেন, বুইলি কি না বাবা।"...

কথাগুলি মনে পড়ছে। আর ক্ষুধা সত্যি অভর। ঘর সংসার ছেলেমেয়ে কী জানে না বদি। ও দেখল, জল নামছে। খুঁটি জেগে উঠছে, জাল দেখা দিচ্ছে। বদি নেমে এল গাছ থেকে। এখনো সাবধান! নিশ্চুপে এল নৌকায়। পাটাতন সরিয়ে বার করল মুগুর। শাল কাঠের ভারী আর মোটা মুগুর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অনেকখানি জল চলকে উঠে একটা রুপোলী গা

লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তেই অদৃশ্য হল আবার। বদি চিৎকার করে উঠল, "আই পাঙাস্! আই পাঙাস্! আমি আছি।"

মুগুরটা সে তুলে ধরল। জল নামছে তরতর করে। আর বাঁশের খুঁটিগুলি দুলে উঠছে। ওরা ঘাই মারছে জলে। আবার একটা লাফ দিয়ে উঠল জলে। বিরাট! বিরাট পাঙাস্! আঁশ নেই, পালিশ করা রুপোর মতো শরীর। বদি লাফিয়ে জলে পড়ল। জল তার হাঁটুতে।

গণ্ডীর মধ্যে মাছগুলি লাফাচ্ছে। পাঙাস্, ছোট বড় রুপোলী পাঙাস্। দূর সমুদ্রের আশীর্বাদ। লাফিয়ে জাল টপ্‌কে ভিতরে ঢুকল বদি। আর বিস্ময়ে থমকে রইল। এত বড় বড়। হে বাবা খোকা ঠাকুর! আমার থেকে বড় পাঙাস্!

দু হাতে মুগুর তুলে মাছগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বদি। মাছগুলি লাফাতে লাগল। যেন গাছে উঠতে চাইছে। আর পড়ন্ত বেলার রোদে যেন রুপোলী উড়ন্ত মাছ মনে হচ্ছে। ঝল্‌কে উঠছে। মুগুর দিয়ে আপ্রাণ পিটতে লাগল বদি। চিৎকার করতে লাগল, "লড়ে যা, লড়ে যা।"

জল লাল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু কেউ শান্ত হচ্ছে না। এক, দুই, তিন, চার···প্রায় দশ-বারোটা হবে। আর সবগুলিই বড়। আ রে বাবা! ওটা কত বড়। শালা আমাকে দেখছে। আমার থেকে বড়। বাবার থেকেও বড়।

বৃহৎ পাঙাস্‌টার অর্ধেক শরীর তখনো জলে ডুবে আছে। বদি মুগুর তুলল। মাছটা লাফ দিল। এক লাফে বদির মাথা ছাড়িয়ে উঠল। আর পড়ল একেবারে ঘাড়ের ওপরে।—"এই শালা, ছাড়!"

বদি সরতে চাইল। কিন্তু মাছটা ওকে নিয়ে মাটিতে পড়ল। ও নিজেকে ছাড়াতে চাইল। কিন্তু কেমন যেন জুড়ে রইল পাঙাস্‌টার গায়ে। আর মনে হল কাঁধের কাছে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। বদি দু হাত দিয়ে প্রকাণ্ড পাঙাসের পিছল শরীরটাকে জড়িয়ে ধরল, আর ছাড়াতে চাইল। পারছে না। জল আরো নেমেছে। বদি দেখল, রক্ত পড়ছে। কাদায় আর জলে রক্ত মাথামাথি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে হাতাহাতি লড়বার বুদ্ধি নাই মাছের। পাঙাস্‌টাও ছটফট করছে। ওলটপালট খাচ্ছে। আর বিশাল মাছটার সঙ্গে বদিও ওলটপালট খাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা! মনে হল, বদির বুকের মধ্যে কিছু বিঁধেছে গিয়ে আমূল।

বদি মাছটার মাথায় মুখ ঠেকিয়ে উঁকি দিল নিচের দিকে। দেখল, পাঙাসের কানের কাছের তীক্ষ্ণ কাঁটাটা তার কণ্ঠার পাশে, নরম জায়গার মধ্যে ঢুকে গেছে। রক্তের স্রোত দেখা মাত্র আতঙ্কে কেঁপে উঠল বদি। চিৎকার করে উঠল; "আই শালা, তুই আমাকে মারছিস!"…

সারা গণ্ডীটা জুড়ে তখন অন্যান্য মাছগুলি দাপাদাপি করছে। যেন একটা তাণ্ডব চলেছে পলির পাঁকে। বদি আবার চিৎকার করে উঠল, "আই খোকাঠাকুর! তুমি আমাকে দানো করলে হে।"… ও শেষবারের জন্যে মুক্তির চেষ্টা করল। পারল না। আর সেই কথাগুলি ওর মনে পড়তে লাগল।—"আমরা দুজনেই লড়ি। আমরা দুজনেই মরি। আগে আর পরে, বুইলে বাবা।"…

গঞ্জে সকাল হল। এখন গঞ্জ মরা। ধান মন্দা। পাট নেই। নেহাত ঘরের বেড়াগুলি, চালগুলি পাহারা দেবার জন্যে গদীতে গদীতে এক আধজন করে থাকতে হয়। তাই কিছু লোক আছে। আর তারাই আবিষ্কার করল, বদি মরে পড়ে আছে গুদামঘরের মধ্যে। খবর দেওয়া হল মালোপাড়ায়। মালোরা এল। দেখল, মাথাটা ঘাড়ে গুঁজে, মরে পড়ে আছে নিতাই মালোর ছেলেটা। মরতই, আজ আর কাল। সবাই অপেক্ষা করছিল কেবল।

নাকে কাপড় চেপে, ঘাড় গোঁজা শক্ত দুর্গন্ধময় শরীরটা সবাই বার করে এনে, বাঁধের ওপর শোয়াল। কতটুকুনি আর শরীরটা।

—কত বয়স হয়েছিল ছেলেটার?

একজন জিজ্ঞেস করল। আর একজন বলল, কে জানে। নিতাইও মরল সঙ্গে সঙ্গে বউটাও মরল। ছেলেটা তো মেগে মেগে খাচ্ছিল। কদিন দেখছিলাম খালি শুয়ে পড়ে থাকে।

সকলেই চুপচাপ। একজন বাঁশ আনতে গেছে। একটা বাঁশেই ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে। ওই দূরের বাঁকের মুখে জ্বালিয়ে দিলেই হবে।

একজন বলল, ওর বাবা নিতাই গিয়ে মরল সেই সাঁইমারার জঙ্গলে।

—হ্যাঁ। কালীনগরওয়ালাদের জাল নৌকো চুরি করে নে' গেছল। পেটের টানে, অতবড় যোয়ানটা…

—আর মরল কী ভাবে বল। ইস্! অতবড় পাঙাস্ মাছ কোন্ দিন দেখি নাই। কিন্তুন্, কণ্ঠায় গিঁথল কী করে, বল দি নি।

—মাছমারার মাথার ঠিক না থাকলে, অই হয়। সামলাতে পারে নাই, আর ওর ভাগ্যি, পড় তো পড় একেবারে ঘাড়ে। কপাল! কত মন ওজন ছিল না?

—দেড় মনের ওপরে। এই গপ্পেই তো বিকোলে এনে নিতাইয়ের মহাজন পাঁচানন দাস।

—হ্যাঁ, অনেক নাকি পাওয়ানা হয়েছিল নিতাইয়ের কাছে।

—তবু নাকি মহাজনের পাওয়ানা মেটে নাই।

সকলে চুপ করল। তারপরে বাঁশটা নিয়ে একজন এল।
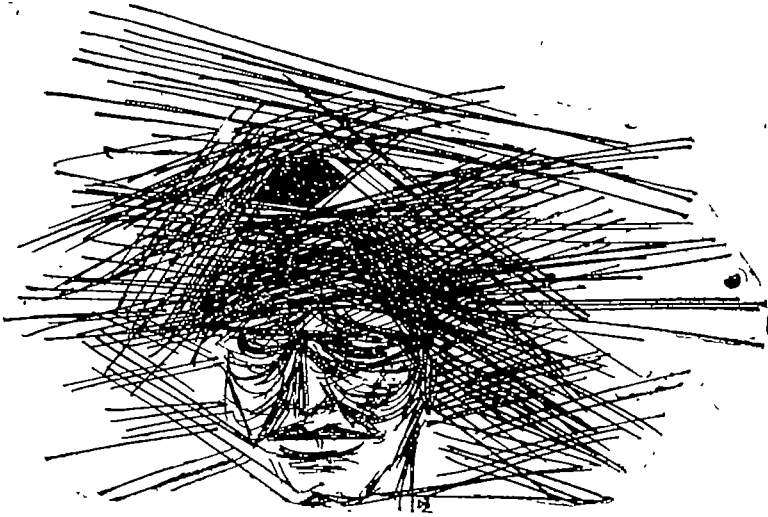
শেষের আগে

অমল দাশগুপ্ত

[মুখবন্ধ]

স্থান : ইংলণ্ডের সাসেক্স। কাল : ১৯০৮ সালের গ্রীষ্ম।

ভদ্রলোকের নাম চার্লস ডসন। চুয়াল্লিশ বছর বয়েসের ছোটখাটো মানুষটি। মুখের দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে ঘন কোঁকড়ানো গোঁফ ও বোলার টুপি। সাসেক্স-এর গ্রামাঞ্চলের একটি নির্জন রাস্তা দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। শহরের লোক গ্রামে বেড়াতে এলে যেমন কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়, তেমনিভাবে তাকাচ্ছিলেন চারদিকে। তিনি যে রাস্তা ধরে চলেছেন তা উকৃফিল্ডের পাশ দিয়ে গিয়েছে। সামনেই ফ্লেচিং গ্রাম। আর এখন তিনি যে খামারের পাশ দিয়ে চলেছেন তার নাম পিল্‌টডাউন। চারদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছেন যে তাঁর পরিচিত কেউ এখানে উপস্থিত থাকলে এই উদাস ও ভাবুক প্রকৃতির লোকটির মধ্যে নিউহেভেন শহরের দুর্ধর্ষ সলিসিটরটিকে কিছুতেই খুঁজে পেত না।

কিন্তু আচমকা তিনি সচকিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পিছিয়ে এলেন কয়েক পা। তারপরে গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে কি যেন ভাবতে

লাগলেন। এইমাত্র তাঁর নজরে পড়েছে যে রাস্তা সরাবার জন্যে যে কাঁকর ঢালা হয়েছে তার কণাগুলো চ্যাপ্‌টা আর লালচে। তিনি যতদূর জানেন, এই ধরনের কাঁকর এই অঞ্চলের জমি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

এখানে মিঃ ডসন সম্পর্কে আরো একটি খবর জানিয়ে রাখা দরকার। তিনি শুধু সলিসিটর নন, শখের পুরাতত্ত্ববিদও। ফলে, প্রত্নবিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল। যা কিছু অতীতের নিদর্শন তাই সংগ্রহ করার দিকে তাঁর বাতিক। তবে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ, প্রায় দুর্বলতাই বলা চলে, জীবাশ্মবিদ্যা সম্পর্কে। রাস্তায় চলবার সময়ে তিনি চোখকান খোলা রেখে চলেন, কারণ তিনি কিছু একটা আবিষ্কার করতে চান।

রাস্তায় যারা কাজ করছিল তাদের জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন যে এই কাঁকর এসেছে একটু দূরের একটি পাথরের খনি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খোঁজখবর করতে শুরু করলেন যে পাথরের খনি থেকে কোনো হাড়গোড় পাওয়া গেছে কিনা। সকলেই জানাল, না, পাওয়া যায়নি ; আর সকলেই আশ্বাস দিল, পাওয়া গেলেই সেটি তাঁর হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

[উপক্রমণিকা]

স্থান : কলকাতা। কাল : ১৯৫৬ সালের শীত।

'কেমন দেখলে ?'

'শুনলে তোমার ভালো লাগবে না।'

'তবুও বল।'

'উনি এতই সুপুরুষ যে প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে।'

'বেশ বলেছ।'

'তোমার হিংসে হচ্ছে না ?'

'সত্তর বছরের বুড়োকে দেখে যদি স্ত্রীর প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে, তাতে তিরিশ বছরের স্বামীর হিংসে হয় না।'

'আজকাল তোমার মুখে বেশ কথা ফুটেছে।'

'বিয়ের আগেও এমনি কথা বলতাম। কিন্তু মনে মনে। তুমি সামনে এসে দাঁড়ালেই এমন বুক ঢিপঢিপ করত যে মুখ দিয়ে কথা সরত না।'

'......'

'হাসছ যে ?'

'তোমার চোখদুটো কিন্তু তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত। যা তুমি মুখে বলতে পারতে না তা বোঝা যেত তোমার চোখ দেখে।'

'কথাটা তুমি আগেও বলেছ। কিন্তু তুমি যে আমার চোখের দিকে কখন তাকাতে তা আমি টের পেতাম না। আমাকে বরং চেষ্টা করতে হত যাতে তোমার চোখে পড়ি।'

'......'

'হাসছ যে ?'

'এমনি।'

'যাক, শোন। তোমাকে দেখেও ওঁর ভালো লেগেছে।

'কী করে বুঝলে ?'

'আমি তো ওঁর সঙ্গে ছ-মাস কাজ করছি। নিজের স্ত্রী বা মেয়ের সঙ্গেও উনি দরকারের চেয়ে বেশি কথা বলেন না। প্রতিটি সেকেণ্ড ওঁর কাছে মূল্যবান। কিন্তু তোমার সঙ্গে কতক্ষণ ধরে কথা বললেন! কতরকম রসিকতা করলেন!'

'দাদু আর নাতনীতে এই রকমটিই হয়ে থাকে।'

'তুমি অবাক করলে! দাদু-নাতনী সম্পর্ক আবার কখন পাতালে ?'

'তুমি তখন পাশের ঘরে গিয়েছিলে। আমি ওঁকে বললাম, আপনাকে দেখতে ঠিক আমার দাদুর মতো। উনি হেসে বললেন, তাই নাকি, তবে আজ থেকে আমি তোমার দাদুই হলাম।'

'তোমার সাহস তো কম নয়!'

'মেয়েরা একমাত্র স্বামী সম্পর্ক পাতাতে ভয় পায়। সেক্ষেত্রেও আমি বোধ হয় সাহসের পরিচয়ই দিয়েছি।'

'আমার মতো পাত্র চোখের সামনে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার মতো অনেক মেয়েই বোধ হয় সাহসের পরিচয় দিতে পারত।'

'পাত্র হিসেবে তুমি কি খুব দামী ছিলে ?'

'বল কি! ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম-এস্-সি! তিন বছরের মধ্যেই ডক্টরেট!'

'তাতে কি তোমার দাম খুব বেড়েছিল ? বড়োজোর তুমি একটা মফস্বলের কলেজে অধ্যাপক হতে। কয়েক বছর পরে চেষ্টাচরিত্র করে কলকাতায় আসাটাও হয়তো অসম্ভব হত না। তারপরে যদি কর্তৃপক্ষের

ধামাধরা হতে পারতে বা অধ্যাপকদের আন্দোলনের নেতা হতে পারতে তাহলে বড়জোর সেনেটের সদস্য। এম-এস-এর স্বর্গরাজ্যে তুমি কোনো কালেই পৌছতে পারতে না।'

'তোমার ঠাট্টাগুলো খোঁচা হয়ে বিঁধছে। তুমি জান, মানুষের দাম বলতে আমি চাকরি বা প্রতিষ্ঠা বুঝি না। আমি মনে করি, ক্রিয়েটিভ—'

'হয়েছে পণ্ডিতমশাই, আর বলতে হবে না।'

'আচ্ছা এসব কথা থাক। উনি আজ বিশেষ করে আমাদের দুজনকেই চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন কেন জান?'

'উনি বোধ হয় দেখতে চেয়েছিলেন, ওঁর সবচেয়ে প্রিয় রিসার্চ স্কলারটির ঘাড়ে যে মূর্তিমতী দৌরাত্ম্যটি ভর করেছে তার দাপট কতখানি।'

'না, উনি বাংলাদেশের সেই অদ্বিতীয়াকে দেখতে চেয়েছিলেন যে স্বামীর বড় চাকরির চেয়ে বড় গবেষণার সুযোগে খুশি হয়।'

'......'

'তুমি হাসছ। কিন্তু আমার কি ধারণা জান, এই গবেষণামন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উনি বোধ হয় ওঁর স্ত্রীর কাছ থেকে খুব বড় রকমের বাধা পেয়েছিলেন। যেদিন উনি শুনলেন যে দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে অত মোটা মাইনের সাধা চাকরি আমি পায়ে ঠেলেছি, সেদিন আমাকে শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন? আমি বলেছিলাম, না, বরং, আমার রিসার্চ শেষ হবার আগেই যদি আমি মোটা মাইনের লোভে চলে যেতাম তাহলেই অসন্তুষ্ট হতেন।'

'ও, আজকাল বুঝি স্ত্রী-তত্ত্ব নিয়েও গুরু-শিষ্যে আলোচনা চলে!'

'এটা ঠাট্টার কথা নয়। আমি সেদিনই বুঝতে পারলাম, ওঁর মনের মধ্যে মস্ত একটা ব্যথার জায়গা আছে। নইলে একবার ভাব, পৃথিবীজোড়া যাঁর খ্যাতি, গত চল্লিশ বছর ধরে যিনি নতুন নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন, যাঁর আবিষ্কার—'

'গুরুবন্দনার অংশটুকু ইচ্ছে করলে বাদ দিতে পার। শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।'

'তুমি শুনলে অবাক হবে যে গত এক বছরেই উনি তিনটি গবেষণা-নিবন্ধ লিখেছেন। প্রত্যেকটিই অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল বিষয়ে। উনি যে কি করে এত কাজ করার সময় পান আমি ভেবে পাই না। আমি তো এক বছর ধরে

আমার নিবন্ধটা তৈরি করতে চেষ্টা করছি—এখনো কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। যতই কাজ এগোচ্ছে ততই যেন কাজ বেড়ে যাচ্ছে।'

'তুমি যদি এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে যে তোমার গবেষণায় তোমাকে সাহায্য করতে পারত তাহলে খুব ভালো হত।'

'ও, কী কথার কী অর্থ হল!'

'তুমি আজকাল ঠাট্টাও বোঝ না!'

'.........'

'এই! কী হচ্ছে!'

'.........'

'আচ্ছা বেশ!'

[প্রস্তাবনা]

স্থান : পিল্‌ট্‌ডাউন। কাল : ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সালের শীত।

কয়েক দিনের মধ্যেই একটা ভাঙা হাড়ের টুকরো ডসনের হাতে পৌঁছল। হাড় বলে চেনা যায় না। লাল্‌চে পাথরের মতোই। হাড়ের টুকরোর ওপরে পুরু হয়ে মরচে পড়েছে। সাধারণ লোকের পক্ষে কিছুতেই ধরা সম্ভব নয় যে এই পদার্থটি হাড়ের টুকরো—পাথর নয়। ডসন স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, তিনি এখানে এসে পৌঁছবার আগে এমনি আরো অনেক হাড়ের টুকরো পাথর হিসেবে চালান হয়ে গিয়েছে। অনেকের মুখে শোনা গেল যে কিছুকাল আগে নাকি নারকেলের মতো গোল একটা পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল। কেউ তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। অন্য পাথরের সঙ্গে এই গোল পদার্থটিকেও গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

যাই হোক, যে হাড়ের টুকরোটি পাওয়া গিয়েছে তার দামও ডসনের কাছে কম নয়। এই হাড়টি ব্রহ্মতালুর অংশবিশেষ।

এই ঘটনার পরে ডসন বারে বারেই পিল্‌টডাউনে ফিরে আসতে লাগলেন আর পাঁতিপাঁতি করে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু ১৯১১ সাল পর্যন্ত তাঁর ঘোরাঘুরিই সার হল। এক চিলতে হাড়ও তিনি পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই হাত লাগালেন। এক জায়গায় মস্ত একটা পাথরের স্তূপ ছিল। সেই স্তূপের এদিকে ওদিকে খোঁচা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই খুঁজে বার করলেন আরেক টুকরো হাড়। এবারেও সেই ব্রহ্মতালুর।

এবারে ডসনের উৎসাহ ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছুটল। তিনি সরাসরি গিয়ে হাজির হলেন লণ্ডন যাদুঘরের জীবাশ্মবিদ অধ্যাপক আর্থার স্মিথ উডওয়ার্ডের কাছে। উডওয়ার্ডও উৎসাহিত হলেন।

এক সফল অভিযানের স্বপ্নে মেতে উঠলেন দুজনে।

[পরিস্থিতি। এক]

স্থান: কলকাতা। কাল: ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সালের শীত।

'চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

'না, লক্ষ্মীটি, আজ নয়। তুমি বরং তোমার বোনের বাড়ি থেকে একাই একটু ঘুরে এস।'

'আমার বোনের সঙ্গে তোমার তো আরো মধুর সম্পর্ক। তুমিও চল।'

'দেখছ না, আমার কত কাজ। এই চার্টটা আজ রাত্রের মধ্যে আমাকে শেষ করতেই হবে।'

'কাল কোরো। বাইরের খোলা হাওয়ায় ঘুরে এলে তোমার ভালো লাগবে দেখো।'

'কাজটা শেষ না হলে আরো খারাপ লাগবে।'

'শুধু আজকের দিনটা আমার কথা শোন। কাজ তো আছেই। আমি কি তোমার কাজে বাধা দিই! কিন্তু আয়নায় একবার নিজের চেহারা দেখ তো। কাজ নিয়ে এমন উন্মত্ত হয়ে আছ যে নিজের শরীরের দিকে পর্যন্ত নজর দেবার সময় নেই।'

'সেজন্যে তো তুমিই আছ।'

'না, ঠাট্টা নয়, আজ তোমাকে আমার সঙ্গে বেরোতেই হবে। চল, ময়দানের সেই গাছতলাটায় গিয়ে একটু বসি।'

'তুমি তো এমন অবুঝ ছিলে না।'

'তুমি যাবে কিনা বল।'

'চল যাচ্ছি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।

'কী?'

'রাত্রিবেলা আমাকে কাজ করতে দিতে হবে। বারোটার মধ্যে শুতে যাওয়া—তোমার এই আইন আজ আর চলবে না।'

'থাক, তুমি কাজ কর।'

'রাগ করলে ?'

'.........'

'অমন মুখ ভার করে থাকলে কেউ কখনো কাজ করতে পারে ?'

'তোমাকে নিয়ে হয়েছে আমার মহা জ্বালা।'

'.........'

'থাক, আর অমন বোকার মতো মুখ করে হাসতে হবে না। বরং তোমার চার্টটাই বার কর। আমি আর কিছু না পারি রুল টানতে তো পারব।'

'সত্যি—তুমি—তুমি—'

'.........'

'তুমি অতুলনীয়া।'

'এই কথাটা কোত্থেকে শিখলে ? কোয়াণ্টাম থিয়োরির আঁকজোকের মধ্যে আজকাল বুঝি এসব শব্দ আমদানি হচ্ছে ?'

'ব্যাপারটা কি জান, তুমি যখন রাগ কর তখন তোমার মুখের দিকে—'

'রিসার্চ স্কলারের এখন বুঝি সময় নষ্ট হচ্ছে না ! আচ্ছা, তোমার গুরুদেবেরও বোধ হয় গুরুপত্নীর সঙ্গে বেড়াতে যাবার ফুরসত হয় না ?'

তোমাকে তো বলেছি, উনি অসাধারণ মানুষ। উনি কি করে যে এত সময় পান ! একবার ভাব, পৃথিবীজোড়া যাঁর খ্যাতি—'

'গুরুবন্দনার অংশটুকু বাদ দিতে পার। আমার প্রশ্নের জবাবটা শুনি।'

'উনি অসাধারণ মানুষ। ওঁর সঙ্গে কার তুলনা ! উনি এত কাজের মধ্যেও সামাজিকতা বজায় রাখেন।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে শিষ্যটি গুরুর চেয়ে অসাধারণ। দু-বছরের মধ্যে একদিনও বৌয়ের সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরোবার ফুরসত তাঁর হল না।'

'......'

'হাসছ যে ?'

'তুমি ঠাট্টা করছ। কিন্তু আর কয়েকটা মাস অপেক্ষা কর। আমার এই পেপারটা যেদিন শেষ হবে সেদিন দেখে নিও কী কাণ্ডটা হয়। সেদিন আমিও কম বিখ্যাত হব না। আইনস্টাইনের পর আমিই বোধ হয় আরেকটা বড় রকমের আলোড়ন তুলতে পারব।'

'বাংলাদেশের আইনস্টাইন মশাই, একটু চা খাবেন কি?'

'নিশ্চয়ই।'

'সঙ্গে কিছু খাবার?'

'নিশ্চয়ই।'

[পরিস্থিতি। দুই]

স্থান: পিল্‌ট্‌ডাউন। কাল: ১৯১২ সালের বসন্ত।

ডসন ও উডওয়ার্ড প্রচুর লোকজন নিয়ে এসেছেন। পাথরের খনিতে শাবল ও গাঁইতির ঘা পড়ছে আর দুজনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছেন। ফলও পাওয়া গেল হাতে হাতেই। গাঁইতির ফলার মুখে উঠে এল খুলি ও চোয়ালের টুকরো টুকরো হাড়। আর এই সামান্য কয়েকটা হাড়ের নিদর্শন থেকেই উডওয়ার্ড পুরো জীবটির একটি মূর্তি খাড়া করে ফেললেন। তখন বোঝা গেল এই জীবটি না পুরোপুরি একটি বানর, না পুরোপুরি একটি মানুষ। দুয়ের মাঝামাঝি একটি অবস্থা। করোটিকার মাপও আধুনিক মানুষের চেয়ে একটু ছোট—অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকেও পুরোপুরি হোমো স্যাপিয়েন্‌স্ নয়। মানুষের এই আদি পুরুষটির নাম দেওয়া হল এয়োআন্‌থ্রোপাস ডসনি।

১৯১২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডনের জিওলজিকাল সোসাইটিতে এই নতুন আবিষ্কারের বার্তা পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের সমস্ত কাগজে মোটা হেডলাইনের নিচে পিল্‌ট্‌ডাউন মানুষকে নিয়ে রোমহর্ষক সমস্ত কাহিনী রটনা হতে লাগল। পিল্‌ট্‌ডাউনের ছোট্ট সরাইখানাটির নাম ছিল 'দি ল্যাম্ব', রাতারাতি সাইনবোর্ড পালটে নাম রাখা হল 'দি পিল্‌ট্‌ডাউন ম্যান', আর টুরিস্টদের ভিড়ে ব্যবসাও হল মোটা রকমের।

পিল্‌ট্‌ডাউন মানুষ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের আদি পুরুষের নিদর্শন হিসেবে বিপুল মর্যাদায় লণ্ডনের যাদুঘরে অধিষ্ঠিত হলেন।

[উপসংহার]

স্থান: কলকাতা। কাল: ১৯৬০ সালের বসন্ত।

'চা এনেছি।'

'রেখে যাও।'

'কিছু খাবে?'

'আঃ, বড্ড বেশি কথা বল তুমি! যদি এনে থাক তো রেখে যাও। যদি না এনে থাক তো আনতে হবে না।'

'......'

'দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

'......'

'বোস। রান্না হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চল একটু ঘুরে আসি। চল ময়দানের সেই গাছতলাটায় গিয়ে একটু বসি।'

'না।'

'আচ্ছা আজ কত তারিখ বল তো?'

'তোমার কাছে যে ছাপানো কার্ডটা এসেছে, সেই কার্ডে যে তারিখ লেখা আছে—সেই তারিখ।'

'......'

'চুপ করে রইলে যে?'

'কি বলব বল?'

'কী বলবে তুমি জান না! তোমার মধ্যে কি ঘেন্না নেই? তোমার মধ্যে কি রাগ নেই? তোমার জিনিস কেন অপরে ভোগ করবে? কেন তুমি মুখ খুলবে না?'

'আমার কথা কে বিশ্বাস করবে বল! পৃথিবীজোড়া যাঁর নাম—'

'ফের!'

'তার চেয়ে চল তোমার বোনের বাড়িতে আজ একটু যাই। তোমার যদিও বোন, আমার সঙ্গেও সম্পর্ক মধুর।'

'তুমি একা যাও।'

'তোমার কী হয়েছে বল তো?'

'আমার কিচ্ছু হয়নি। তোমার মুখের দিকে তাকালেই আমার গায়ে জ্বালা ধরছে।'

'......'

'কথা বলছ না যে?'

'কিছুই বলার নেই। সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'তুমি কি মানুষ! তোমার চার বছরের পরিশ্রমের ফল অন্য একজন ভোগ করবে তাতেও তোমার রক্ত একটুও গরম হয় না!'

'গরম হয়েছিল। সমস্ত শোনার পরে এখন আর হয় না।'

'অন্যদের তিনি বড় বড় চাকরি করে দিয়ে মুখ বন্ধ করেছেন। কিন্তু তুমি তো এই কাজের জন্যে বড় চাকরির লোভ পর্যন্ত ছেড়েছিলে।'

'ভুল করেছিলাম।'

'না, ভুল তখন করনি, এখন করছ, এখনো সময় আছে—চল যাই।'

'কোথায়?'

'সেই যে ছাপান কার্ড! অপরের প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফল চুরি করে যার খ্যাতি—'

'তোমার মুখের এই মন্দ বাক্যগুলি শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। আসল কথাটা বল।'

'চল আমরাও ওই সম্বর্ধনার-সভায় যাই। সভায় দাঁড়িয়ে সমস্ত লোকের সামনে আমরা জোর গলায় সত্যি কথা জানিয়ে আসব।'

'লোকে আমাদের পাগল ভাববে।'

'ভাবুক। কিন্তু ইতিহাসের কাছে একটা সাক্ষ্য দেওয়া থাকবে।'

[যবনিকা]

স্থান : লণ্ডন। কাল : ১৯৫৩ সালের ২১শে নভেম্বর, শনিবার।

লণ্ডনের এই বিশেষ শনিবারটি অন্য সব শনিবারের মতোই। আবহাওয়া বিষণ্ণ, আকাশ ভারী। যাত্রীবোঝাই লাল ওম্‌নিবাস শহরের কেন্দ্রস্থলে ভিড় করেছে। পিকাডেলি সার্কাসে সাইনবোর্ডগুলো ঝকমকে। ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে স্টার্লিংপাখির ডানা-ঝাপ্‌টানি।

কিন্তু লণ্ডনের সাউথ কেনিংস্টনে যে যাদুঘর রয়েছে সেখানে কিন্তু এই শনিবারেই বিশেষ ব্যস্ততা। যাদুঘরের ভেতরে ঢুকে গজ কুড়ি এগোলেই বাঁদিকে একটি কাচের আধারে এতদিন পর্যন্ত পিল্‌টডাউন মানুষের যে মূর্তিটি সকলের চোখে পড়ত—সেটিকে আজ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে পিল্‌টডাউন মানুষটি মস্ত একটি ভাঁওতা। একটি বানরের হাড়কে ফাইল দিয়ে ঘষে আর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভোল পালটিয়ে

ফেলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের নিদর্শন বলে চালানো হয়েছিল। চল্লিশ বছর ধরে এই ভাঁওতাটি সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সমর্থন পেয়ে এসেছে।

কিন্তু কিছুতেই শেষরক্ষা হল না। যে বিজ্ঞানীরা একদিন এই ভাঁওতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, সেই বিজ্ঞানীরাই আবার একদিন তাকে জঞ্জালের মতো আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলেন।

[পরিশিষ্ট]

স্থান : পৃথিবী নামক গ্রহ। কাল : ভবিষ্যৎ।

পরিশিষ্ট এখনো জানা যায়নি। ইতিহাসের অদৃশ্য কালিতে তা লেখা হচ্ছে।

স্কেচ রণেনআয়ন দত্ত

আকাশতরণী

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

দূর তুমি কতদূর। নিকটের নোঙরে বাঁধা-যে
আমার প্রতিটি দিন প্রত্যেক দিনের সেই মুখ
প্রতি রাত্রি অভ্যস্তের শরশয্যা। বাঁচার অসুখ
চেনা মুখ চেনা সুখ কথা কথা কথার আওয়াজ-এ।
তবু কি কোথাও বাজে তবু বাজে কোথাও কি বাজে
কথার অতীত শব্দ শব্দাতীত রোমাঞ্চ ধুকধুক
কখনো কি টানে কেন্দ্রে কেন্দ্রাতিগ দূরের কৌতুক
কর্দমে কাছির টান—জোয়ারের জয়ন্তী সাধা যে!

দূর তুমি কতদূর! নিকটের গোষ্পদে আকাশ?
যে-স্মৃতি শায়কবিদ্ধ যে হারাল স্বপ্নের সরণি
সেই হংস বুকে নেবে, দেবে তাকে নিকটআভাস?
—মরে মৃত্যুভয়ে মরে মুহূর্তেকে মুহূর্তের বাঁচা—
খোলো রৌদ্রধাঁধা স্বপ্নসাধা হালকা হাতে এই খাঁচা
প্রাণ পাক পাখা উড়ে দূরে ঘুরে, আকাশতরণী।

দুঃসহ আর্তির মূল্যে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বেশ থাকা যায় সুখে যদি কোনো কপট ভূমিকা
জীবন সংলগ্ন থাকে ; 'আহা, বেশ, খুব ভালো' বলে
হয়তো ফোটানো যায় মুহূর্তের গোলাপকণিকা,
নাট্যমঞ্চে ক্ষণদ্যুতি অন্তত উঠবে তাতে জ্বলে।
সুন্দর নিসর্গ দৃশ্য পাহাড়িয়া কোমল নদীর,
অথচ অদৃশ্য নিচে ঘূর্ণিপাকে দারুণ সঙ্কট ;
নীলিমায় চেয়ে ছাখো রম্যদৃশ্য শান্ত প্রকৃতির,
অথচ চৈত্রের ঝড়ে বজ্রে পোড়ে ধ্যানমুগ্ধ বট !

তেমনি গভীরতর পরিব্যাপ্ত জীবনের মূলে
বিপুল তৃষ্ণার দাহ, তীব্র আর্তি, দুঃখের রণন ;
বিচ্ছিন্ন স্বস্তির মূল্যে থাকো যদি এই সত্য ভুলে,
পৌরাণিক বকধর্মে সমর্পিত হবে তবে মন।

অগভীর দৃশ্য সজ্জা, ছাখো চেয়ে তার অন্তরালে
দুঃসহ আর্তির মূল্যে ফুল ফোটে জীবনের ডালে।

এই ফুলগুলি

কৃষ্ণ ধর

কখনো চিন্তিত হই, এই ফুলগুলি
যদি ঝরে পড়ে, এই অসামান্য ফুলগুলি
রক্তে ভেজা উপাধানে, অসংখ্য সময়ে
যদি তারা ঝরে পড়ে, এই ফুলগুলি।

এই ফুল অনেক শতক ধরে
ফুটে আছে, বিস্মিত সকালে
রক্তের আদল নিয়ে, মানুষের
মুখের দর্পণে, এই ফুলগুলি।

শব্দ, অর্থ, বিশ্লেষণ, সব ভাষ্য
কোমল দলের ভিতর লুকায়িত
প্রাণের যন্ত্রণা, শোকের, গানের
মিছিলের কথা নিয়ে ফুটে থাকে
অসামান্য এই ফুলগুলি।

ফুলগুলি দেখে তাই নক্ষত্রের কথা
মনে পড়ে, তারা বাঁধ দিত যারা,
একতারা, দুইতারা, তিনতারা
রূপকথা দিত সাড়া, কান্নার সুতোয়

তাদের আদল নিয়ে এই ফুলগুলি
পৃথিবীর রক্তাক্ত সকালে ফুটে থাকে।

রূপান্তরে

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সমুদ্র দেখিনি আমি, শুনিনি সে হার্দ্য সম্ভাষণ
অজস্র ঊর্মির ভঙ্গে, হাওয়ার অদৃশ্য জালে মন
জড়ায়নি কোনোদিন সহসা ইচ্ছায়, কাদা-পথ
মাড়াইনি এলোমেলো পায়ে, যেন কোথায় শপথ
কোনো এক ঈশ্বরের, অস্বচ্ছারে তারই সতত
প্রকাশ, অভ্যাসবশে কাটে এইভাবে, ইতস্তত
করে তবু এই মন, আড়ালে কোথায় পালটায়
হাতড়ায় একাকীই পথে যেতে, রূপান্তর চায়।

কী বা এই রূপান্তর, অয়শ্চক্রে এক পরিবেশ :
মেঘ ভেঙে রোদ আসে, রোদ নিভে হঠাৎ বর্ষণ।
রূপের অন্তরে কে সে, শেষই কী পরম অশেষ!
দৃশ্যান্তরে অন্যদৃশ্য, বর্ষে বর্ষে তারই হনন।
সমুদ্র দেখিনি আমি, শুনিনি সে হার্দ্য সম্ভাষণ,
অসংখ্য প্রতীককল্পে পরিক্রমা, রূপান্তরে মন।

ইণ্ডোর দলের কথা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে স্লাভ ভাষাভাষী জাতি একটি বিশিষ্ট ভাষা সৃষ্টি করেছে। কমপক্ষে সাড়ে চার হাজার বছর আগে মূল ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও মানসিকতা নিয়ে বিশেষত্ব লাভ করে। শুষ্ক তৃণভূমি থেকে উরাল পর্বতের দক্ষিণাংশ, এশিয়া ও ইওরোপের কিয়দংশ এর পটভূমি। ইন্দো-হিট্টিট ভাষা ও সংস্কৃতি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মেরুদণ্ড। এর আগে ইন্দো-হিট্টিট ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাচীন সংকীর্ণ পথ অবিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক দিকটা কিছু পরিমাণ বাদ দিয়ে ইন্দো-হিট্টিট ভাষাগোষ্ঠীর পরিবেশ সম্বন্ধে কোনো বিশেষত্ব বার করা সম্ভব নয়। ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাভাষীরা যতদূর এ দিক থেকে জড়িত, আদিম ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাই আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট—যখন আমরা ইন্দো-ইওরোপীয় যে কোনো একটি শাখা বা অতি সংশ্লিষ্ট একটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করছি।

প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলি তাদের সাহিত্যে একটা যুগের ও সমাজের পটভূমির চিত্র তুলে ধরে, যাদের আমরা সুবিধামতো বীরধর্মী (heroic) বলতে পারি। এই বীর-যুগ অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষীয়, গ্রীক, জার্মান ও কেল্টিক প্রথম ইন্দো-ইওরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে। ঈরানীয় বীরযুগের কিছু নমুনা আবেস্তা সাহিত্যের অবশিষ্টের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, আবেস্তার সাহিত্যের বীরযুগ গ্রীস ও ভারতের মতোই প্রাচীন। ঈরানের বীর ঐতিহ্য মধ্যযুগীয় আবরণে ফারদৌসীর শাহ্-নামার মধ্যে রক্ষিত রয়েছে। এই ধারার শেষের দিকে প্রাচীন ঈরানীয় নামগুলি আধুনিক ঈরানীয়তে রূপান্তরিত হয়েছে।

গল্পের বীরধর্মিতা ও আদিম স্বাভাবিকতা কিছু পরিমাণে রোমান্টিক ও মধ্যযুগীয় করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ঠিক এই রূপান্তর ঘটেছে জার্মানীর প্রাচীন মহাকাব্য সিগুর্ড ও ব্রুনহিল্ডের ক্ষেত্রে। মধ্য-

যুগীয় উচ্চ জার্মান রোমান্টিক কবিতা নিবলুঙ্গেন লিড-এর মতো মিশ্র কৃত্রিম পরিবেশ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আইরিশ বীরগাথা, উদাহরণতঃ যা Ta'in Bo' Cualnge (the Dun cow of Cooley) কাহিনীকে প্রকাশ করছে, দ্বাদশ শতাব্দীর Lebor na-Huildre-র মতো হস্তলিখিত পুঁথি এবং অন্য অনেক অর্বাচীন পুঁথিতে তা রক্ষিত রয়েছে। আইরিশ বীরগাথার জাতীয় নায়ক-নায়িকারা মহাভারত-ইলিয়াড ও জার্মান বীরকাহিনীর মতো একই পরিবারের লোক, কংচোবর ও মেড, কু-চুলেইণ্ড ও এমের এবং নোইসি ও দের্দ্রিয়। কিন্তু এগুলি যথেষ্ট প্রাচীন, আইরিশ বীরযুগের পরিবেশ খ্রীষ্টের জন্মের একান্ত আগে ও তারপরের শতককে নির্দেশিত করে। এই সমস্ত সাহিত্য, গ্রীসের ইলিয়াড ও অডিসি, সংস্কৃত সাহিত্যের মহাভারত, পুরাণ, শাস্ত্রীয় উপাদান কিছু কিছু থাকলেও বেদের প্রাচীনতর অংশের কিছু কিছু, জার্মানীর প্রাচীন নর্সের 'এল্ডার এড্ডা' ও ভোল সুঙ্গাসাগা প্রাচীন ইংরেজীর বে-উলফ্ এবং ঠিক এই রকম প্রাচীন ইংরেজী নর্স ও জার্মান কবিতা এবং বীরধর্মী সাহিত্যের টুকরো, প্রাচীন আইরিশ বীরগাথা কু-চুলেইণ্ড ও ফিণ্ড সাগা—এই সবগুলির মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে জগৎ বীক্ষণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের ঐক্য নিহিত রয়েছে। তাদের এই ঐক্যে আদি ইন্দো-ইওরোপীয় জগতের যুগ এবং তার আগের যুগ থেকেও যে উত্তরাধিকার ধারা চলে আসছে, তারই আভাস দান করে। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ বা দশম শতকের হোমারের গ্রীক জগৎ ও ভারতবর্ষের মহাভারতের জগৎ, অথবা খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শাহ্-নামায় রক্ষিত প্রাচীন ঈরানীয় যুগের বীরকাহিনীর জগৎ এবং খ্রীষ্ট জন্মের সামান্য আগে ও পরে রচিত আদি কেল্টিক ও জার্মানীর বীর-যুগের জগৎ অনেক দূরবর্তী। কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বীর কাহিনীর নায়কদের মানসিক সংস্থিতির মধ্যে ও সামাজিক পরিবেশে এই প্রাচীন ঐতিহ্য যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষিত হয়ে আছে। এইচ্ মুনরো চাডুইক রচিত 'হিরোইক এজ', নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত রচিত 'হিরোইক এজ অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে প্রাচীন ইন্দো-এরিয়ান যুগে ভারতবর্ষ, জার্মানী ও প্রাচীন গ্রীসের বীর যুগের সম্পর্ক দেখান হয়েছে। অধ্যাপক মাইলস্ ডিলন তার মূল্যবান লেখায় আইরিশ বীরগাথার জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইঙ্গিতপূর্ণ তুলনা করেছেন। প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয় বিভিন্ন শাখার মধ্যে এমনি সমানভাবে

এই সম্পর্ক দেখান যেতে পারে। মহাভারত হোমারকে মনে পড়িয়ে দেয় এবং তেমনি হোমার মহাভারতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে জার্মান ও কেল্টিক বীরগাথার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে হোমারের মহাকাব্যের ও মহাভারতের মিল আছে। এমনকি তাদের পরবর্তী রূপান্তরের কালেও, যখন বীরধর্মিতা রোমান্টিকতায় পর্যবসিত হল, বীর-রোমান্টিকের বিচিত্রতর প্রকাশের মধ্যেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশের ঐক্য দেখতে পাই; যেমন শাহ্‌-নামার কাহিনীর মধ্যে; নিবেলুঙ্গেন লিডের মতো জার্মান কাহিনীর মধ্যে এবং প্রাচীন ফরাসী Chanson de Roland-এর গানে ও প্রাচীন স্পেনীয় কবিতা Poema del cid-এর মধ্যে। যদিও Chanson de Roland ও Poema del cid খ্রীষ্টপূর্ব যুগের কোনো অবশিষ্টও ধরে রাখেনি, তাহলেও ঐক্য রয়েছে। কিন্তু অন্যগুলির মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব যুগের ধারা একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

আদি বীরধর্মী ও পরবর্তী ও রোমান্টিক সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের সমাজে ইন্দো-ইওরোপীয় কেন্দ্রের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে থাকলেও স্লাভ ভাষা, একেবারে না হোক, যথেষ্ট পরিমাণে তার দারিদ্র্যকে প্রকাশ করেছে। স্লাভদের ফিনো-উগ্রিয়ান প্রতিবেশী দুটি বিশিষ্ট মহাকাব্য বা বীরগাথা বিশ্বসাহিত্যকে দান করেছে—ফিন্‌ল্যাণ্ডের Kalevala এবং এস্থোনিয়ার Kalevipoig। এই বই দুটি কিছু পরিমাণ উৎকল্পনামূলক এবং এমনকি মহাপরিমাণসূচক তাদের বীর চরিত্র প্রাণপ্রাচুর্যহীন, চরিত্রে রোমান্সের ও প্রেমের নিবিড়তার অভাব, যেগুলি আমরা ইন্দো-ইওরোপীয় মহাকাব্যের মধ্যে দেখতে পাই। তাদের উত্তরে ও পশ্চিমে ফিনীয় প্রতিবেশীর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও স্লাভ ভাষাভাষীরা বীরগাথা সৃষ্টি করতে পারেনি বা তাদের একান্তই ভুলে গিয়েছিল—এটা খুব বিস্ময়ের ব্যাপার লাগে। ফিনীয় ও এস্থোনীয় মহাকাব্যগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত হয়েছে। সংকলকদের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পাদনা ও সংযোজনা সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব মানবিক মূল্য ও চতুঃপার্শ্বস্থ জীবনের ঐক্যসহ প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় ফিনো-উগ্রিয়ান জগতের পরিবেশ যথেষ্ট পরিমাণে এদের মধ্যে রক্ষিত আছে। স্লাভ মনোজগতে খ্রীষ্টানধর্মই যদি প্রাক্‌খ্রীষ্ট যুগের ঐতিহ্যকে সমষ্টিগতভাবে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে দায়ী হয়, তাহলে ফিনো-উগ্রিয়ান মনোজগতের সঙ্গে সুস্পষ্ট বৈপরীত্যই দেখা যাবে। সম্ভবত সেই সঙ্গে দূরবর্তিতা স্লাভ ও বাল্টি ভাষাভাষীর চেয়ে ফিন্‌স্ ও এস্থসের মধ্যে প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় পরিবেশ সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

স্লাভ সংস্কৃতির প্রাক্‌খ্রীষ্টান-মূল স্লাভ ইতিহাসের বীর যুগের মধ্যেই পাওয়া যায়, এর ভাষাই তার বিশেষ প্রমাণ দেয়। ইন্দো-ইওরোপীয় অন্য শাখার চেয়ে প্রাচীন স্লাভ ভাষাই আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিক রূপটা কিছু রক্ষা করেছে। স্লাভ নামে এখানে-সেখানে কতগুলি নাম দেখতে পাই, এই নামগুলির সঙ্গে আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার প্রকৃত যোগ আছে। খ্রীষ্টীয় বাইজান্তিয়া ও রোমের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নেবার পর খ্রীষ্ট জন্মের প্রথম হাজার বছরের শেষ শতক থেকে স্লাভ জনসাধারণ বীর ঐতিহ্যের প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় উত্তরাধিকার, ধর্মীয় পূজাপার্বনের ধ্যান-ধারণা ও আচার-ব্যবহারের প্রাকখ্রীষ্টীয় ধারা অতি সত্বর ভুলে যায়। তাদের প্রাচীন দেবতাদের তারা ভুলতে থাকে, যদিও এই প্রাচীন দেবতারা কিছু পরিমাণে লোকসংগীতে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। তাদের অস্পষ্ট স্মৃতি স্লোভোর বাক্য মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। এই স্লোভোর মধ্যে প্রায়ই ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীন রুষীয় ও স্লাভ দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, দাঝবোগ, স্ট্রিবোগ, ভেল্‌স্‌, খোরস্‌ ও ডীভ এবং স্লাভদের মহিমময়ী কুমারীদেবীর নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এছাড়া অরণ্য ও জলের শক্তির পরিচয়ও আছে। এটাই প্রতিভাত হয় যে প্রথম খ্রীষ্টান বিশ্বনারীরাই প্রাচীন গ্রীস ও ক্যাথলিক রোমান যুগ থেকে সর্ব বিষয়ে কাজ করতে থাকে, যেমনি তারা জার্মানীর ক্ষেত্রে করেছিল। ইন্দো-ইওরোপীয় ধর্ম, প্রাচীন ধর্মীয় কাহিনী ও প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় বীর যুগ স্লাভদের মধ্যে কখনো পুনরুজ্জীবিত হয়নি। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের কাছে এই ঘটনা ও অনুমান অতি পরিচিত, তাই এদের পুনরায় বিবৃত করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন আইরীশ, প্রাচীন জার্মান সাহিত্য যে বীরযুগের প্রচুর উপাদান আমাদের কাছে রেখে গেছে, তার তুলনায় স্লাভ সাহিত্য নিঃসন্দেহে অতি সামান্য উপাদান দিয়েছে। মহাভারতের মহনীয়তার মধ্যেই ভারতবর্ষ বারংবার জীবন্ত হয়ে রয়েছে। মহাভারত যেমন একদিকে জাতীয় উত্তরাধিকার, তেমনি অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যের প্রমাণ, এ শুধু বীরকবিতা ও অভিমানের জন্যেই নয়, কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠ কৃতি হিসাবে এর মূল্য। এই কবি কল্পনার মধ্যে অতি অন্তরঙ্গ প্রগাঢ় ব্যাপক অন্তঃগূঢ় প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ অবশ্যই মহাভারত ও রামায়ণকে কখনো ভুলতে পারবে না, কিন্তু মধ্যযুগীয় মহানুভবতা ও

রোমান্সের বহুবর্ণ কাচের রঙে এই ঐতিহ্য রঞ্জিত হয়ে গেছে। যে মহাভারতে বলা যেতে পারে সংমিশ্রিত ও শাশ্বত ক্লাসিক্যাল দর্শন ও নীতি শাস্ত্র। পারস্য অনুবাদের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত মহাভারতের পরিবেশের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলেছিল (যদিও প্রধানত গল্পের দিক দিয়ে), ষোড়শ শতকের অর্ধভাগে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বের মহাসমারোহের দিনে। মুসলমান ও ইন্দো-পারস্য পরিবেশের মধ্যে, তাদের নিজেদেব দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পীরা প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের গৌরব ও সমারোহ পুরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহাভারতের আসল অর্থ নির্ণয় ও প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য আজ ভারতের শিক্ষিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এই শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যে আত্মোৎসর্গীকৃত পণ্ডিতেরাও রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটুটের নাম করা যেতে পারে। এঁরা ভারতীয় সভ্যতার সমালোচনামূলক সম্পাদনার বিরাট কাজ করছেন এবং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরা বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ও মহাভারতের ব্যাখ্যা ও রসাস্বাদ আলোচনা করছেন। পশ্চিম ইওরোপে রোমানদের চোখ দিয়ে হোমারের মহাকাব্যের আলোচনা হয়েছে, সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় ও ফরাসী দৃষ্টিতেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতক থেকে পশ্চিম ইওরোপে ও জার্মানে নবীন ক্ল্যাসিকাল পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে, ইওরোপ হোমারের মহাকাব্য ও গ্রীক জগৎকে তাদের প্রকৃত পটভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। এর পাশেই জার্মানী ও কেল্টিক বীর যুগের তুলনা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু, উপাদানের অভাবেই স্লাভ সাহিত্য নিয়ে এই রকম তুলনা বেশি করা যেতে পারে না।

মহাভারতে দু-লক্ষ পংক্তি, রামায়ণে আটচল্লিশ হাজার পংক্তি আছে। (রামায়ণ বীরযুগেরই সৃষ্টি তা বলা চলে না, একজন লেখক বা এক গোষ্ঠীর কয়েকজন লেখক মিলে রামায়ণকে রোমান্টিক কাল্পনিকতায় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এর তুলনায় মহাভারত বীরযুগের ঐতিহ্যে স্বরূপত লোকসাহিত্যের জনগণের দ্বারা সৃষ্ট) ইলিয়াডে ষোল হাজার পংক্তি, শাহ্‌নামায় ষাট হাজার পংক্তি রয়েছে। প্রাচীন আইরিশ ও আদি ওয়েল্‌স্‌ সাহিত্যের প্রাণবান বীরঐতিহ্য যথেষ্ট পরিমাণে গদ্যে পদ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জার্মানের বীরগাথাও কম নয়। কিন্তু প্রাচীন রুষীয় মহাকাব্য বা বীরগাথা, the

Slovo o Pulku Igoreve মাত্র সাত শত সত্তর পংক্তির। মহাকাব্যটি একাদশ অক্ষরের পংক্তিতে কাব্যরূপে বিন্যস্ত, এর আদি অক্ষরে ঝোঁক আছে এবং পরের দুটি অক্ষরে কোনো ঝোঁক নেই। কিছু কিছু কবিতার টুকরো চেকোস্লোভাকিয়া থেকে রানীর কোর্টের পুথিতে (Kralovidvarsky Rukopis) ও গ্রীন হিল পুথিতে (Zeleneleorsky Rukopis) পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভাকৃলাভ হাংকা কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত দুটি পুথিতে চেক ভাষায় লিরিক ও বীরকবিতার কিছু নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কবিতাগুলি কৃত্রিম ও সাহিত্যিক চুরি বলে সাধারণত নিন্দিত হয়েছে, যদিও বর্তমানে শোনা যাচ্ছে যে চেক ভাষাভাষী পণ্ডিতেরা ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে এর প্রামাণিকতার প্রশ্ন আলোচনা করছেন। এখানে রানীর সভার পুথির রোমান্টিক গীতিকবিতা আমাদের আলোচনা করবার দরকার নেই। কিন্তু Libusa ও Premysl-এর বীরগাথা এবং স্লাভোই, জাবোই ও লুডিয়েক রাজাদের বীরকাহিনীর আলোচনা স্লাভদের বীরযুগের আলোচনার পক্ষে যথার্থ হবে। এই ব্যাপারে বর্তমান লেখক কোনো যোগ্যতা দাবি করতে পারেন না, যদিও তার মতো একজন সাধারণ ছাত্রের কাছে প্রাচীন চেক-গাথায় প্রকৃত বীরযুগের পরিবেশ যথেষ্ট পরিমাণ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ম্যাক্‌ফারসনের Ossian বইটিব প্রভাব তাঁব মনে সক্রিয় বা অবচেতন ভাবে কাজ করছে। এর আগে চেক শব্দতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা চেক ভাষার বীরকবিতাগুলির একান্ত প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতার সমর্থনে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু তাদের সেইভাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যথার্থ হবে না।

বীরকবিতার মতোই অন্য একটি মহাকাব্য যুগোস্লাভীয়রা স্লাভদের দান করেছেন। এই মহাকাব্যিক ব্যালাড কুশোভো যুদ্ধের কাহিনীকে রূপদান করেছে। কিন্তু এখানেই আমরা অর্ধ বর্বর যুগীয় পরিবেশ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি, খ্রীষ্টধর্মের প্রকৃত মিস্টিক রহস্যের মধ্যে আমরা নিজেদের আবদ্ধ করেছি এবং এর মধ্যে রোমান্টিক স্বাদেশিকতা রয়েছে। মহৎ কবিতা হওয়া সত্ত্বেও জার লাজার ও নয়জন যুগোস্লভিচ ভ্রাতার ন্যায় বীর সম্বন্ধে চতুর্দশ শতকের যুগোস্লাভকুশোভো ব্যালাডকে প্রাচীন বীরগাথার ধারার কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে অন্তর্গত বলে গণ্য করতে পারি না।

বিস্তারতার দিক থেকে, কিয়দংশ জাতীয় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে Oghuz-name-এর প্রাচীন তুর্কী কবিতা প্রাচীন রুষীয় স্লোভোর সঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে। Oghuz-name প্রাচীন তুর্কী ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেনি, কিন্তু রুষীয় মহাকাব্য ঠিক তার উল্টো। এই মহাকাব্যের প্রসঙ্গ নির্দেশ আধুনিক ও প্রথম ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে আছে যা প্রথম রুষ ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত। বিশিষ্ট ধরনের জাতীয় বীরের কাহিনীতে এইগুলি কাজে লাগান হয়েছে। স্লোভোর রাজনৈতিক অংশগুলি Oghuz-name-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। Oghuz-name দৈর্ঘ্যে যদিও ৬৫০ পংক্তিরও কম।

প্রাচীন রুষের বীরকবিতার বিষয় একটু আলাদা। এখানে বিষয়টা অত্যন্ত বিতর্কমূলক। যদিও অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে এর পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং ১৮০০ সালে এই পুথি থেকে কাউন্ট মুসিন পুশ্‌কিন এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮১২ সালে দুর্ভাগ্যবশত এই পুথি আগুনে দগ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে রানী ক্যাথারিনের আদেশে আরেকটি পুথির নকল তৈরি করা হয় এবং মুদ্রিত সংস্করণও প্রকাশ করা হয়। ঐ গ্রন্থটিই আমাদের আলোচনার উৎস। এর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রন্থটির তুলনামূলক পরিবর্তিতা (অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে) সময়ের এই তুলনামূলক পরিবর্তন দৃঢ় ঐতিহাসিক ভূমিতে আসন দান করেছে। যদিও গ্রন্থটি ছোট, তাহলেও স্লাভ ও রুষিয়ার সংস্কৃতির ইতিহাসে এর গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। রুষিয়া ও স্লাভ-ভাষাভাষীর প্রকৃত তথ্যান্বেষী পণ্ডিতবর্গ এবং স্লাভ ভাষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইওরোপের অন্যান্য পণ্ডিতেরা এই সমস্যাটিকে গ্রহণ করেছেন। স্বভাবত রুষীয় ও স্লাভ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে স্লোভোর গবেষণা করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে আমরা এ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ রয়েছি, যদিও এখানে সবেমাত্র স্লাভ পড়াশোনা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু স্লোভোর সমস্যা এখানে এখনো শোনাই যায়নি। সোকোভস্কি ও কোচেরভস্কির মতো অনেক নৈরাশ্যবাদী আছেন ; ই. ডি. বারসভ ও এ. এস. স্মিরনভ্‌-এর মতো লোকও আছেন—তাঁরা এই গ্রন্থের প্রামাণিকতাকে সমর্থন করেছেন। এঁদের নামের সঙ্গে আধুনিক পণ্ডিত এন. কে, গুডজি, এস. পি. অবনর্স কি, ভি. পি. আদ্রিয়ানভ-পেরেট, ডি. এস. লিকসাকভ ও এস. ই. মালভ এবং অন্য

অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁদের গবেষণার ফলাফল ইংরেজী বা ফরাসী বা জার্মান—পশ্চিম ইওরোপের ভাষায় আলোচনা হলে বাইরের পৃথিবীর পক্ষে যাঁরা রুষ ভাষা সম্বন্ধে অপরিচিত, অথচ স্লোভো সম্বন্ধে কৌতূহলী তাঁদের কাছে তা মহাসম্পদ হবে। (মস্কোর রুষ বন্ধুদের কাছে আমি ঋণী, তাঁরা আমাকে উপরোক্ত তথ্য ও নামগুলি দিয়েছেন।)

অনেকদিন আগে ইংরেজ পণ্ডিত লিওনার্ড এ. ম্যাগনাস তাঁর Tale of the Armament of Igor গ্রন্থে (১৯১৫ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত) কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাচীন রুষীয় মহাকাব্যের প্রামাণিকতা প্রমাণ করেন। ইংরেজী অনুবাদ ও টীকাসহ এই সংস্করণ কবিতার আদি-মাত্রিক রূপটিকে যথার্থ ধরেং রেখেছে, ঐতিহাসিকতা ও প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় প্রাচীন স্লাভ পটভূমি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। স্লাভ ভাষাভাষীর জগতের বাইরে প্রকাশিত প্রামাণিকতাব প্রশ্ন সম্বন্ধে সর্বশেষ প্রামাণিক উক্তি অধ্যাপক রোম্যান জ্যাকবসন ও তাঁর সহকর্মীর বিদগ্ধ আলোচনা। তাঁরা স্লাভ বীরযুগ ও স্লাভ ও রুষীয় প্রাচীনত্বের অকৃত্রিম প্রমাণ হিসাবে গ্রন্থটিকে আলোচনা করেছেন। (in La Geste du Prince Igor; by Henri Gregoire, Roman Jakobson, Mark Szeftel and J. A. Joffi. New York 1948) বইটির ভাষাতাত্ত্বিক, আলোচনা, টীকাটিপ্পনী ব্যাখ্যা, প্রকৃত পাঠনির্ণয় ছাড়াও এটির অকৃত্রিমত্ব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোনা করেছেন। ফরাসী সমালোচনার ধারা (অধ্যাপক আন্দ্রে মার্জোঁ যাঁদের শিরোমণি) এই বইটিকে কৃত্রিম ও পরবর্তীকালের বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এই কবিতার ভাষাতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক খুটিনাটি তত্ত্ব দেওয়া বর্তমান লেখকের যোগ্যতার বাইরে। কিন্তু তিনি ভাষাতত্ত্বে কৌতূহলী সাধারণ মানুষ হিসেবে স্লাভ বীরযুগের ঐতিহ্য বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন, যদিও কিছুটা অর্বাচীন রুষীয় ভাষারূপকে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান লেখক প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও সংস্কৃতি নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছেন, এতে স্লাভ ভাষাও ছিল। বর্তমান লেখক স্বীকার করেন প্রাচীন সাহিত্যের বীরযুগের জন্য ইমোশনগত কিছুটা দুর্বলতা তাঁর আছে। বিজ্ঞান ও মানবিকতার দিক থেকে অধ্যাপক জ্যাকবসনের আলোচনার সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলে তিনি মনে করেন। (এই কাব্যটি পরবর্তী কালের রুষীয় বীর Bogatyrs-এর জগৎ থেকে একেবারে আলাদা), অবশ্যই

বর্তমান লেখক স্বীকার করছেন, স্লোভোর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অধ্যাপক মার্জো যে তাঁর মতবাদের পুনরালোচনা করেছেন, তা শুনে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। রুষদেশ ও রুষদেশের বাইরে পণ্ডিতেরা স্লোভো সম্বন্ধে মতের ঐক্যে পৌছেছেন। এবং স্লোভোকে রুষীয় জনগণের প্রকৃত জাতীয় মহাকাব্য হিসাবে স্বীকার করেছেন—এতেই তিনি আনন্দিত।

৭৭০ পংক্তির ছোট কব্যগ্রন্থ স্লোভোকে কালের অতীত কবল থেকে পুনরায় উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা নিজেরাই ধন্য এটি দেখতে পেয়ে, কেননা, এটিতে প্রাচীন স্লাভ ও রুষীয় বীরযুগের পরিচয় পাওয়া যায়। নিসর্গের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ, মিষ্টিক রহস্য, স্লাভ পুরাণের জগৎ এই গ্রন্থের মধ্যে পাই। কবিতার পটভূমি হিসাবে এর যোগসূত্রও আমরা লক্ষ্য করেছি। ব্যবহৃত শব্দ ও উৎপাদিত চিত্র প্রায়ই আদিমতার দিকে যায়, প্রাচীন কাব্যে যা আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রাচীনযুগে মানুষ নিজেকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারত না, প্রকৃতির প্রভু নয়, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল মানুষ। হয়তো কিছুটা তাকে বশে আনতে পেরেছে, নতুবা প্রকৃতির শক্তির ওপরে নিজের শাসনকে রাখবার চেষ্টা করেছে। স্লোভো কবিতার মধ্যে এমন অনেক কথা আছে, যা প্রায় আদিম কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—যেগুলি সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। সকল মহৎ কবিতার মতোই এই কবিতার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা চারিত্র্য আছে। ছোট ছোট সাম্রাজ্যের শাসকের বংশধরদের ও তাঁদের কার্যের খণ্ডতা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক রুষ ইতিহাসে এর দৃঢ় ছাপ রয়েছে। এর ফলেই কবিতার কৃত্রিমতা সম্বন্ধে, অর্বাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দূরে চলে গেছে। কবিতার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মন্তব্য স্থান ও কালের নির্দিষ্ট পটভূমিতে একে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বীর ইগোর ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ১১৫১—১২০১-এর মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন। ১১৮৪ সালে এভ্ ফ্রোসিনা ইয়ারো স্লাভ্নাকে বিবাহ করেন, এঁর কথা স্লোভোর মধ্যেই উল্লেখ আছে। ইগোর-এর ঔরসে স্লাভ্নার গর্ভে পাঁচটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তাতার সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের নিখুঁত বিবরণ আছে। তাতার অধিকারের, ফলে ১১৮৫ সালে তাঁর পলায়ন এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ঠিক এরই সঙ্গে অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তির উল্লেখ কাব্যের মধ্যে মূল্যবান ঘটনাগত প্রসঙ্গ এনে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সেই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ও গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

নবম শতাব্দী থেকে জার্মান স্কাণ্ডানাভিয়ানরা উরালীয় ফিন ও স্লাভদের শাসন করে। (সুইডেনের ফিনীয় নাম Routsi, Rusi ও Rus, পরে উত্তর-পূর্ব স্লাভদের কাছে ব্যাপকতর হয়ে জাতীয় নাম Rus বা Russian হয়েছে।) কয়েকটি বংশধারার মধ্যে স্কাণ্ডানাভিয়ানরা স্লাভদের সঙ্গে একত্র মিশে যায়। এবং তাদের ভাষা হয় স্লাভ, তারা অতি অনায়াসে স্লাভ নাম গ্রহণ করে। যদিও তারা অনেক প্রাচীন স্কাণ্ডানাভিয়ান নাম-প্রাচীন রুষীয় রূপান্তরিত স্লাভ ভাষার আকারে ঠিক রেখে দিয়েছিল। ইগোর হচ্ছে তেমনি একটি রুষীয় নাম, যার মূল স্কাণ্ডিনাভিয়ান। প্রাচীন স্কাণ্ডিনাভিয়ান Ingvair থেকে Igor এসেছে।

স্লোভোর ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ, প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ। মনে হয় প্রাচীন স্লাভ বীর কবিতার আদি যুগ থেকে এর অধিকাংশ সূক্ষ্ম গুণগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। প্রাচীন স্লাভ সাহিত্য প্রধানত অপার্থিব। প্রাচীন স্লাভ-চার্চের বিরাট কৃতিত্ব বাইবেলের অনুবাদ। এর বাক্যগঠন গ্রীকের ওপর ভিত্তি করে রচিত ও অনেক নতুন শব্দ এতে ঢেলে সাজান হয়েছে। কিন্তু স্লোভোর মধ্যে আমরা স্বাভাবিক স্লাভ কবিতার রচনারীতির প্রাচীন প্রত্যক্ষতা দেখতে পাই—যাকে যথার্থভাবে বেদ এল্ডার এড্ডা ও প্রাচীন আইরিশ কবিতার পাশে স্থাপন করা যায়।

নীতিসংহিতা—যা যোদ্ধা ও নারীদের সম্মুখে স্থাপিত ছিল, অখণ্ড আদিম জনসাধারণের সাধারণ নৈতিকতা মাত্র। যুদ্ধে বিশ্বাস, বন্ধুত্বের শক্তিমত্তা অক্ষুণ্ণ ছিল, নেতার সম্মানার্থে কর্তব্যবোধ সজাগ ছিল। মহান নারী চরিত্রে প্রেম-ভালোবাসার স্নিগ্ধ চিত্র এর মধ্যে আছে। এই কবিতায় বীরনায়ক ইগোরের স্ত্রী ইয়ারোস্লাভনার যুদ্ধে বিদায়ী স্বামীর জন্যে গভীর প্রেম, তার নিঃসঙ্গচিত্ততা, স্বামীর কল্যাণের জন্যে উদ্বেলতা সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। একটা নিজস্ব জাতি-গৌরববোধ কবিতার মধ্যে প্রকাশমান। বর্বর ও নিষ্ঠুর আক্রমণকারী শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে উৎকণ্ঠা বা আকুলতা চমৎকার। বীরকবিতা আমাদের প্রকৃত মহৎ করে, উদ্দীপনা ও প্রেরণা দান করে, ব্যক্তিসত্তাকে সাধারণের স্তর থেকে উচ্চে, বীরধর্মে ও আত্মোৎসর্গিত কার্যে উন্নীত করে, এই সমস্ত উপাদানই এই ছোট ও মহৎ গ্রন্থটির মধ্যে আছে। বীরযুগের রোমান্স ও আড়ম্বর আমাদের সম্মুখে পরিবেশিত হয়েছে আরোহী সৈন্যদলের মতো—

শিরস্ত্রান ও অস্ত্র নিয়ে, প্রচণ্ড জাঁকজমকপূর্ণ রক্তবর্ণ বর্ম নিয়ে, বিচিত্রবর্ণ পোশাকে সাজসজ্জায় আমাদের সম্মুখে মঞ্চের মতো শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই কাব্যের বিচ্ছিন্ন ছড়ানো অংশের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকৃতির চিত্র আমরা দেখতে পাই। এগুলি অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু ফলদায়ক, এবং অত্যধিক সুন্দর। এগুলি মাঝে মাঝে হোমারের উপমাকে মনে করিয়ে দেয়, কখনো সংস্কৃতের মতো সংক্ষিপ্ত বর্ণনাধর্মী বিশেষণকে মনে পড়িয়ে দেয়। সংস্কৃত, পারসিক ও জার্মান বীরকবিতাব সঙ্গে এর তুলনা মনে আসে, কখনো প্রাচীন আইরিশ বীরগাথার সঙ্গে অধিক বিস্তৃত তুলনার কথা মনে আসে, বিশেষত অস্‌সিয়ান কাব্যের সঙ্গে। দূরবর্তী পূর্বাঞ্চলের চীনা ও জাপানী নিসর্গ কবিতার অপূর্ব সৌন্দর্যের কথাও মনে পড়িয়ে দেয়।

আমি এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে পারি অতি সহজে। (পংক্তির সাহায্যে যে প্রসঙ্গ নির্দেশ আছে তা লিওনার্ড এ. ম্যাগনাসের সংস্করণ ও অনুবাদের থেকে।)

চিন্তায় এই পৃথিবীর বুড়ো নেকড়ের মতো, মেঘের নিচে ছায়াচ্ছন্ন ঈগলের মতো গাছে উড়ে যেত। (১০-১২)

ঝড়ের মতো শিকারী পাখি বিস্তৃত মাঠ পেরিয়ে এর সম্মুখে উপস্থিত রয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে কাকগুলি শক্তিশালী ডনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। (৬৯-৭২)

সূর্য তার অন্ধকার নিয়ে তার পথকে রুদ্ধ করল, রাত্রি তার কাছে গুঙিয়ে কেঁদে উঠল, পাখিগুলি ভয়ে জেগে উঠল, পশুদের কম্পমান স্বর তাকে জাগিয়ে দিলে, বৃক্ষশীর্ষে আহ্বান জাগিয়ে ডীভ্ জেগে উঠলেন। (১০২-৭)

হে রুশ, তুমি এখনই এর মধ্যে পর্বত প্রাচীরের অন্তরালে, দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, উষা আলো দিতে আরম্ভ করেছে, কুয়াশা মাঠের ওপর গড়িয়ে যাচ্ছে, নাইটেঙ্গেলের ডাক নীরব হয়েছে, কাকগুলির ভাষা জেগে উঠেছে। (১২৫-৩১)

দ্বিতীয় দিনের প্রথমেই রক্তাক্ত উষালোক দিবসের ঘোষণা করল। কৃষ্ণ মেঘ সমুদ্র থেকে এল, চতুঃসূর্যকে আচ্ছন্ন করতে উৎকণ্ঠ, কৃষ্ণ মেঘের মধ্যে নীল বিদ্যুতের ঝলক কেঁপে উঠছে। এখনই ভীষণ বজ্র নেমে আসবে, শক্তিমান ডন থেকে বৃষ্টির তীর নেমে আসবে। (১৫৯-৭২)

এখন বাতাস স্ট্রিবোগের নিম্নবংশধরেরা সমুদ্র থেকে তীরের মতো

উৎসাহে উদ্দীপিত ইগোরের সৈন্যদলের ওপর বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী গুঙিয়ে কাঁদছে, ঝরনাগুলি গম্ভীর স্তব্ধতায় বয়ে যাচ্ছে, ধুলায় ক্ষেত্র আচ্ছাদিত হয়ে গেছে, পতাকা পতপত করে উড়ছে। (১৭৫-৮১)

ঘাসগুলি দুঃখে নত হয়েছে, গাছগুলিও দুঃখে মাটিতে ভেঙে পড়েছে। (২৮২-৮৪)

অন্য অনেক অংশ সংক্ষিপ্ত চিত্রময় ও সুস্পষ্ট, প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের বীরকার্যকে নিবিড় করবার জন্যে এগুলি আনা হয়েছে। উপমা ও বর্ণনাগুলি জার্মান বীরকবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাচীন নোর্স ও ইংরেজী তুর্কীমহাকাব্য Oghuz-name-র মধ্যে এর সাদৃশ্য আছে।

বেদগুলি খ্রীঃ পূঃ দশম শতকেই সংকলিত হয়েছে, স্লোভো রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে। এই দীর্ঘ দু-হাজার বছরের ফারাক এদের মধ্যে। কিন্তু যদি বৈদিক ভাষার পরিবেশ যথেষ্ট পরিমাণে বাল্‌টিক ও স্লাভে রক্ষিত হয়, তাহলে স্লাভ ও বাল্‌টিক ভাষায় শব্দ ও ভাষা প্রকাশে কিছু বৈশিষ্ট্য দীর্ঘস্থায়ী হবে। লিথুনিয়ান লিরিক ব্যালাড অথবা Dainus (এই শব্দটি সংস্কৃতের ধেনার সঙ্গে মেলে, মানে হচ্ছে স্মর্তব্য বস্তু, ঈরানীয়, দএনা যা ধর্ম ও বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়, আরবীতে দেন বা দীন ধর্ম অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে) কাব্যের পুরাণ ও কাব্যের প্রকাশ বৈদিক পুরাণ ও কাব্যের সহজ সাধারণ গাম্ভীর্যকে ইঙ্গিত করে। চন্দ্রদেবতা মেনো সূর্যদেবী সৌলুশকে বিবাহ করছেন এবং পরে চন্দ্রদেব তাঁকে উপেক্ষা করে ভোরের শুকতারা ঔশরিশকে প্রেমিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং সর্বশেষে ঝড়ের দেবতা পেরকুন কর্তৃক এর জন্য দণ্ডিত হচ্ছেন চন্দ্রদেব—এই সেই কাহিনী। দাইনু সূর্যদেবীকে সম্বোধন করছেন আকাশদুহিতা বলে, দিয়েবো দুক্রিতে বৈদিক দুহিতর্ দিবঃ-এর সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে। বৈদিক উষাদেবী উষসের বিশেষণ হিসাবে দুহিতর দিবঃ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও খুব সামান্য, তাহলেও আদি ইন্দো-ইওরোপীয় কাব্যের ঐতিহ্যের নিশ্চিত উত্তরাধিকার দেখতে পাই। এই বিশেষ রূপটাই বেদের মধ্যে পূর্ণরূপে দেখতে পাই। ইগোরের প্রেমময়ী ও দুঃখভোগিনী স্ত্রী পুটিভ্‌ল শহরের রক্ষিত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সূর্য জল বায়ু দেবতাকে প্রার্থনা করেছেন। এটা খুব অতিশয়োক্তি হবে না যে বায়ু সূর্য জলের প্রতি প্রসিদ্ধ প্রার্থনাগুলির বৈদিক সূক্তের সঙ্গে মিল আছে, বিশেষ করে সূর্যের প্রতি ক্ষুদ্র চমৎকার প্রার্থনাগুলি :

হে সূর্য! তুমি উজ্জ্বল, তিনগুণ উজ্জ্বল তুমি। সমস্ত লোকের কাছে তুমি উষ্ণ ও সুন্দর! হে প্রভু! কোথায়, তুমি তোমার অনন্ত সূর্যকিরণ আমার প্রিয় লোকদের ওপর বিকীর্ণ করে দিয়েছ? জলহীন প্রান্তরে তৃষ্ণায় তুমি তাদের তূণীর প্রসারিত করে দিয়েছ, অতি দুঃখে তাদের কাঁপুনিকেও কণ্ঠরুদ্ধ করে দিয়েছ। (৮৫৬-৮২)

এই প্রার্থনাটি অতি সহজেই সংস্কৃতে অনুবাদ করা যায়। সমধাতুজ রূপ ও সংস্কৃত শব্দের মতন যদি মূল প্রাচীন রুষ থেকে ভাল শব্দ ব্যবহার করা যায় তাহলে আর্য ও ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যাবে, বৈদিক কবিতার সঙ্গে প্রাচীন স্লাভ কবিতার মিল পাওয়া যাবে।

যুদ্ধের বর্ণনার অংশে প্রাচীন পরিবেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্যের উত্তরাধিকারের ধারা থেকেই এগুলি এসেছে, যে ধারা আজকে বিগত বা বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে। বীর কবিতার একঘেয়েমিত্ব সুস্পষ্টভাবে অতি প্রাচীন। মধ্যযুগীয় রোমান্সের আগের যুগের ব্যাপার। যোদ্ধগণের বাক্য ও ভাষণও বীরধর্মী। বীরেরা যোদ্ধার মতো বলিষ্ঠতা নিয়ে গর্ব করত। প্রাচীন রচনারীতির জীবন্ত রূপ এই কবিতার প্রথম পংক্তির মধ্যে আছে। জার্মান, কেল্‌টিক ইন্দো-এরিয়ান, ইরানীয় ও গ্রীক সাহিত্যের মধ্যেও এটি রক্ষিত আছে। ব্যাস হোমার ওইসিন ওইড্‌সিথ ইন্দো-ইওরোপীয় বীর কাহিনীর নামহীন অন্য সংরক্ষকের সঙ্গে স্লোভো কাব্যের স্লাভ ঐতিহ্যের ;বীরসঙ্গীতের প্রেরণাদীপ্ত নায়ক হিসাবে বোয়ানের নাম আমরা পাই। স্লাভ হোমার হলেন বোয়ান, স্থাপত্যে তাঁর মূর্তিকে আদর্শায়িত করে রাখা হয়েছে পি. এ. ভেলিওনোভস্কি কর্তৃক তাঁর মর্মর মূর্তিতে। এই স্লাভ হোমার পূজ্য দ্রষ্টাকবি প্রাচীন স্লাভ বীণায় (gulsi) বালকসহচর নিয়ে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। অন্যান্য অনেক রুষ শিল্পী, রুষ ঐতিহ্যে, বীণা হাতে রুষ কবির বিশিষ্ট পোশাকে বোয়ানের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। স্লোভোর কাহিনীর মতোই বোয়ান রুষ শিক্ষিত ব্যক্তি ও শিল্পীদের কল্পনাকে আকর্ষণ করেছেন। বীরের বর্ণনা, যে বীর দৃঢ়তার সঙ্গে তার মনকে প্রসারিত করে দিয়েছে, চিত্তকে মানবিকতায় শাণিত করে তুলেছে, অথবা বাস্তবচিত্র—যখন ইগোর ঘোষণা করছে যে পোলট্‌সি শহরের সীমায় সে অস্ত্রকে চুরমার করে দিতে চায় ; যখন সে ইচ্ছা

প্রকাশ করছে মস্তক নত করতে এবং তার শিরস্ত্রাণে ডনকে পান করতে, তখন যোদ্ধার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের মন আকর্ষণ করে। দুঃখের সময় ইগোর তার বন্ধুদের সাবধান করছে, ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, বন্দী হওয়ার চেয়ে অস্ত্রের আঘাতে টুকরো টুকরো হওয়া অনেক ভালো। সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো আমরা দ্রুত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করি এবং নীল ডনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। (৪৩-৪৮)

আমি আরো কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি যে অংশগুলি বাস্তবজীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ।

সুলার অন্তরালে ঘোড়াগুলি ডেকে উঠছে, কিভে গৌরব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে, ভোগোরোডে বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত হচ্ছে, পুটিভ্‌লে জাতীয় পতাকা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। (৭৫-৭৮)

আমার কুর্সকের মানুষের অভিজ্ঞ যোদ্ধা, বিজয়ধ্বনিতে লালিত, শিরস্ত্রাণে বদ্ধ, তলোয়ারে অভ্যস্ত, তাদের কাছে সমস্ত পথই চেনা, পর্বতশিখর তাদের অতি পরিচিত, অশ্বপৃষ্ঠ সজ্জিত, তাদের তূণীর উন্মুক্ত, তাদের বাঁকা তলোয়ার শাণিত। মাঠের মধ্যে নেকড়ের মতো তারা লাফিয়ে বেড়ায়, তারা নিজেদের ও তাদের রাজপুরুষের গৌরবের সম্মানের জন্য অম্বিষ্ট। (৮৭-৯৯)

তাদের নিজেদের সম্মান ও তাদের যুবরাজের খ্যাতির জন্যে রক্তাক্ত বর্ম দিয়ে রুষ সন্তানেরা প্রশস্ত ক্ষেত্রকে রুদ্ধ করেছে। (১৩২-৩৫)

শুক্রবারে প্রভাত থেকেই পোলোভট্‌সির বর্বর সৈন্যদের পদদলিত করেছে, তাদেরকে তীরের মতো বিস্তৃত মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। পোলোভট্‌সির সুন্দরী নারীদের তারা হরণ করেছে, সেই সঙ্গে স্বর্ণবস্ত্র ও দামী রেশমী বস্ত্র হরণ করেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল পথে সেতু রচনা করতে যাত্রা করেছে। (১৩৬-৪৫)

হে ভীষণ ষণ্ডতুল্য vsevolod (সংস্কৃতের পুনর্গভঃ-এর সঙ্গে তুলনীয়), সংগ্রামে তুমি দণ্ডায়মান, সৈন্যদের ওপরে তীরে তুমি যাত্রা করেছ, লৌহ-তরবারির আঘাতে তাদের শিরস্ত্রাণ চুরমার করে দিয়েছ। হে ষণ্ডতুল্য মানব, তুমি কোথায়। তোমার স্বর্ণশিরস্ত্রাণের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছ, সেখানে বর্বর পোলোভট্‌স্কির সৈন্যদল মৃত পড়ে আছে, তাদের আবর শিরস্ত্রাণ তোমার তরবারির আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, হে ভীষণ ষণ্ডতুল্য vsevolod, তুমি শত্রুদের আঘাতে অনুতাপ করেছ, তার সম্মান ও

তার জীবন বিস্মৃত হয়েছে, চোর্নিগভ শহর, তার পিতার স্বর্ণসিংহাসন, তার প্রেমিকা সুন্দরী গ্লেবোভ্‌না পথ ও রীতিকে বিস্মৃত হয়েছে। (১৯০-২০৮)

দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে উষা পর্যন্ত কঠিন লৌহ তীর উড়ে যাচ্ছে, তরবারির আঘাতে শিরস্ত্রাণে বজ্রধ্বনিত হচ্ছে, পোলোভট্‌স্কির দেশে বিদেশে অশ্বারোহীর নিক্ষেপণাস্ত্র বেজে উঠছে। অন্ধকার পৃথিবীতে নিচে হাড়ের বীজ পোঁতা হয়েছে, রক্তনদীর ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। রুষ মাটিতে শোককে জাগিয়ে দিয়েছে। (.২৫০-৬২)

হে সাহসী রুরিক ও ড্যাভিড, তোমার রক্তশিরস্ত্রাণ নিয়ে তারা কি রক্তে সাঁতার দিতে পারে না। অনাবিষ্কৃত দেশে লৌহতরবারির আঘাতে ষাঁড়ের মতো তোমার সাহসী ড্রুঝিনা কি লাফাতে পারে না। (৪৬৫-৭০)

বীরযুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হল এতে যুদ্ধের তীব্র বেগ থাকে। এই কাব্যেও তা আছে। যত্রতত্র আদি ইন্দো-ইওরোপীয় কবিতার মতো 'আলস্তময় আবছায়া' দেখতে পাওয়া যায়।

ট্রোয়ান দেশে সুন্দরী নারীরা যত এগিয়ে যাচ্ছে, নীল সমুদ্র রাজহংসের পাখা নিয়ে আলোড়িত হচ্ছে। (২৯০-৯৩)

এইভাবে নীল সমুদ্রের তীরে গথ্‌সের সুন্দরী রমণী রুষ মুদ্রায় ধ্বনি তুলে গান গাইছে। (৪০৭-০৯)

একাকী সে মুক্তোর মতো শুভ্র আত্মাকে তার বলিষ্ঠ দেহ থেকে বর্মের ভেতর দিয়ে তার গলায় পরে যেতে দিয়েছে। ইয়ারোস্লাভ্‌না অজানা দেশে কোকিলের মতো প্রথমে গুঙিয়ে কাঁদতে লাগল। (৬২৩)

যুবরাজ ইগোর জন্তুর মতো বনের দিকে ছুটে গেল, সাদা রাজহংসের মতো জলের দিকে ছুটে গেল। (৬৮১-৬৮৩)

ইগোর বললে, হে ডনেট্‌স। তোমার মহনীয়তা হীন নয়, তুমি যুবরাজকে তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেছ, তার জন্যে তোমার রজতশুভ্র তীরে সবুজ ঘাসের শয্যা বিছিয়ে দিয়েছ, সবুজ গাছের ছায়ার তলায় উষ্ণ কুয়াশার দ্বারা যুবরাজকে আচ্ছাদিত করেছ, জলে রাজহাঁসের সাহায্যে তাকে রক্ষা করেছ, সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গে ঝড় তুলে সাহায্য করেছ, বাতাসে বন্য রাজহাঁস দিয়ে রক্ষা করেছ। (৬৯৮-৭০৭)

তখন কাকগুলি আর ডেকে উঠল না, ছোট কাকগুলি এখনো স্থির হয়ে আছে; সাদা-কালো রঙের পাখিগুলি কিচিরমিচির করছে না, তারা ঝোপ-

ঝাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কাঠঠোকরা পাখিগুলি আঘাত করে নদীর দিকে পথ দেখাচ্ছে, নাইটেঙ্গেল তার আনন্দ সংগীতে উষালোককে ঘোষণা করছে। (৭২২-২৯)

স্বর্গে সূর্যের আলোক জেগে উঠল, যুবরাজ ইগোর রুষ ভূমিতে, ডানুবী নদীর তীরে সুন্দরীরা গান গাইছে, তাদের কণ্ঠস্বর নদীর জল পেরিয়ে কীভে কিভে গিয়ে মিলিত হল। (৭৫৪-৫৭)

যোদ্ধগণের বীরকার্য নিয়ে এই ধরনের কাব্য, এই কারনেই পরিবার জীবনের চিত্র এখানে স্থান পায় না। কিন্তু আমরা ধন্য যে পরিবার জীবনের ক্ষুদ্র চিত্রও এখানে আমরা পাই। প্রাচীন রুষ গৃহে স্ত্রীর স্থান দেখতে পাই। ক্ষুদ্র অংশ থেকেই এর পরিচয় পাওয়া যায়।

রুষ নারীরা এই বলে দীর্ঘ দুঃখের কান্না কাঁদতে লাগল, এখন থেকে আমরা আমাদের প্রেমিকের চিন্তা আর করতে পারব না, আমাদের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আর পরামর্শ করতে পারব না; আমাদের চোখে তাদের আর দেখতে পাব না, সোনা বা রূপা জড়ো করতে পারব না।

না না—এ চিন্তা আজ বহু দূরে। (৩১৩-১৯)

কবিতার মধ্যে সুস্পষ্ট খ্রীষ্টীয় পরিবেশ নেই কিন্তু প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় পুরাণ ও ধর্মের চিহ্ন একেবারে সাধারণ। এখানেসেখানে বিশ্বাসের নিবিড়তা দেখতে পাই। এই বিশ্বাসের নিবিড়তা খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে প্রাক্‌খ্রীষ্টযুগের কম বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয়। পরমশক্তির অস্তিত্ব প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় ধর্মও নিবিড়ভাবে অনুভব করেছে। এইখানেই স্লোভো বলতে পারে যে ভগবানই যুবরাজ ইগোরকে পোলোভস্ক দেশ থেকে রাশিয়ার পথ ব্যক্ত করেছেন। এই রুষদেশেই তাঁর পিতার স্বর্ণসিংহাসন। অন্ধকারের মধ্যে, নিশীথ রাত্রে সমুদ্র যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কুয়াশার মতো জলধারা বয়ে যেতে থাকে —তখন ভগবানই যুবরাজ ইগোরকে পথ দেখিয়েছেন।

মহান দ্রষ্টা ও কবি বোয়ানের বাক্য হিসাবে, কিছু পরিমাণে আদিম মহনীয়তা ও বিশ্বাস হিসাবে স্লোভো পুরনো প্রবাদ উদ্ধৃত করেছে : (ইন্দো-এরিয়ান ঋষি ও প্রাচীন আইরিশ Filid-এর সঙ্গে তুলনীয়) চালাক, অভিজ্ঞ পাখি কবি কেউই ভগবানের বিচার এড়িয়ে যেতে পারে না। (৬০৮-১০)

বীরযুগের বলিষ্ঠ আশাবাদ নিম্নোক্ত অংশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এটি আধুনিক যুগের কৃতকার্য ও উল্লসিত মানুষের আশাবাদকে যেন বিশিষ্ট

করে তুলছে কেননা এতে তারা মনে করে তারা একটি জাতিকে জয় করছে।

আমরা আমাদের দ্বারাই আমাদের শক্তিকে প্রমাণ করব, আগামী দিনের গৌরবকে আমরা হরণ করব এবং সেই অতীতকে আমরা আমাদের মধ্যে ভাগ করব। (৪৩৮-৪০)

আমরা স্লোভো সম্বন্ধে উপরি-উপরি আলোচনা এখানেই শেষ করতে পারি। এই স্লোভো রুষীয় ও স্লাভবীরযুগের স্মরণীয় স্মৃতি। নিঃসন্দেহে ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার উত্তরাধিকার উপরোক্ত আদর্শ বীরধর্মী মানসিক গঠনে যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক। বিভিন্নদেশে বিভিন্নকালে সকল মানুষের মধ্যেই একে দেখা যায়—যে নিজের চেষ্টায়, শুধু প্রাচীন বংশধারার ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে নয়, ভবিষ্যতে নিজের জন্যে নূতন পথ ও মহান গৌরবের পথ খনন করেছে।

বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শেষ পর্যবেক্ষণ এই আলোচনার বহির্ভূত হবে না। শিল্প সৃষ্টি হিসাবে যত্নের সঙ্গে যে-ই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিকে পড়েছেন, তিনি স্বীকার করবেন যে যে-ব্যক্তিই এর লেখক বা সংকলক হোন না কেন, সেই ব্যক্তি প্রতিভাবান। তিনি জানেন বীরত্বের সাম্প্রতিক ঘটনাকে, অভিযানকে, বীরযুগের নরনারীর মধ্যে সাধারণ স্নেহপ্রীতি সঞ্চারিত করে দিতে হয়। কোথায় সাধারণ ঘটনা শাশ্বত মূল্যে রূপান্তরিত হয় এবং শাশ্বত মূল্যের সঙ্গে আনন্দ উল্লাস একই সঙ্গে উচ্চাদর্শ আনে, বুদ্ধিবৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত ও পুষ্ট করে। নিঃসন্দেহে স্লোভো বিশ্ব সাহিত্যে একটি মহান ক্ষুদ্র কাব্যখণ্ড। প্রাচীন স্লাভ রাজ্যের অতীত জগৎ থেকে মুক্ত বায়ুর নিঃশ্বাস এনে দিয়েছে এবং এই স্লাভ রাজ্যের তাৎপর্য আধুনিক জগতেও অক্ষুণ্ণ। আমরা সেই ব্যক্তির কাছে কৃতার্থ যিনি প্রাচীন স্লাভ এবং এমনকি ইন্দো-ইওরোপীয় বীর-জগতের কিছু টুকরো আমাদের জন্যে সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন।

১৯৫৮-তে আন্তর্জাতিক স্লাব কংগ্রেসে পঠিত প্রবন্ধ থেকে লেখকের নির্দেশানুযায়ী সংক্ষেপিত অনুবাদ। বিদেশীয় নামের বানানে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকা সম্ভব।

সম্পাদক

কবির সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার

অন্নদাশঙ্কর রায়

"অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র—ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র—হঠাৎ একদিন আমার প্রভাতভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। বলে ইংরেজিতে শুরু করলেন: Is Art too good to be human nature's daily food? বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত একটি তর্ক আছে। সে তর্কটি এই যে, যে সকল সাহিত্য বা শিল্পরচনার প্রয়াস আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আনুকূল্য করে, মানুষকে ভালো করে বা সমৃদ্ধ করে বা সুদক্ষ করে, তার সামাজিক বা অন্য কোনোপ্রকার সমস্যাপূরণের সহায়তা করে, সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ কি না। অর্থাৎ, কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কি না। সেই ছাত্রটির এই প্রশ্নটি আমি আজকের সভায় মনের মধ্যে করে নিয়ে এসেছি। এই প্রশ্নের সূত্রটিকেই অবলম্বন করে, চিন্তা ও ব্যাখ্যা করে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।" (রবীন্দ্রনাথ: 'সাহিত্যের পথে'র অন্তর্ভুক্ত 'সাহিত্য' প্রবন্ধের বর্জিতাংশ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৫৪৭ ও ৫৪৮।)

এই হলো প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা। জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সালে আমি আচমকা কবির সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার নাম জানতেন না, আমিও জানাই নি। জানালে চিনতেন না। কদাচিৎ দুটো একটা রচনা 'প্রবাসী'তে বা 'ভারতী'তে বেরিয়েছে। আমার নাম নয়, আমার প্রশ্নটাই ছিল স্পর্শ করবার মতো। তিনি বললেন, "আচ্ছা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।" মুখে মুখেও একটা উত্তর দিয়েছিলেন। অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা দেওয়া হল কলকাতায়। আমি তখন পাটনায়। তাই শোনার সুযোগ হয় নি। 'বিজলী'তে একটি বিবরণী পড়েছিলুম। তাতেও আমার উল্লেখ ছিল। সেই অনুলিখনে কবির ভাষা আরো স্বাভাবিক

মনে হয়েছিল। পুনর্লিখিত হয়ে বক্তৃতাটির স্বাদ বদলে গেছে। এখন পড়ছি আর ভাবছি আমি বোঝাতে চাইলুম কী আর তিনি বুঝলেন কী! তর্কটা চিত্তবিনোদন বনাম জীবনযাত্রার আনুকূল্য বা মঙ্গলবিধান বা সমস্যাপূরণ নয়। প্রশ্নটা হল, আর্ট কি এমন মূল্যবান সামগ্রী যে তাকে নিত্য ব্যবহার করা যায় না, এমন শখের জিনিস যে তাকে আটপৌরে করতে নেই, এমন এক ভোজ যা শুধু উৎসবের জন্যে বা শুধু বিদগ্ধদের জন্যে? যেমন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসীনৃত্য। দেবতাই তার দর্শক। দেবতা ব্যতীত একজন কি দুজন পুরুষ। পূজারী কি রাজা। নৃত্যের শেষের দিকে দেবদাসী সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে রসে গলে যায়। সাধারণ লোক কি তার মহিমা বুঝবে? সেই জন্যেই বলা হয়েছে, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

আমার প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাই নি। কাজ চালানো গোছের একটা উত্তর সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছি। সেটা রবীন্দ্রনাথেরও নয়, রলাঁরও নয়, টলস্টয়েরও নয়। সেটা তাঁদের সৃষ্টির ভিতর থেকে নেওয়া। তাঁরা যা লিখেছেন বা বলেছেন তা নয়। তাঁদের সৃষ্টি যে- দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তাই। সেই সঙ্গে তাঁদের জীবনও।

প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ১৯২৯ সালের শেষে। মাঝখানে প্রায় ছ-বছর ব্যবধান। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা'য় আমার 'পথে প্রবাসে' পড়েছেন, পড়ে সম্পাদকের কাছে তারিফ করেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তার উল্লেখ করে বললেন, "ওটা তুমি ইংরেজিতে অনুবাদ করছ না কেন?"

এবারকার সাক্ষাৎ প্রভাতভ্রমণের সময় গোয়ালপাড়া যাবার রাঙা মাটির পথে নয়। এবার নবনির্মিত উদয়ন ভবনের দ্বিতলে। পৌষোৎসবের মেলা সাঙ্গ হয়েছে। আশ্রম নীরব। অচিন্ত্যকুমার আর আমি একসঙ্গে কবি-সন্দর্শনে এসেছি। পুরাতন অতিথিশালায় স্থান পেয়েছি। অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে কবির আগেই পরিচয় ঘটেছিল। কলকাতায়।

কবিকে আমার সদ্যপ্রকাশিত কবিতার বই 'রাখী' উপহার দিতেই বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যদি এমন করে চুরি কর তাহলে আমি আমার বইয়ের জন্যে নাম খুঁজে পাই কোথায়?"

আমি বললুম, "বা! চুরি করলুম কবে! এ নাম তো আমারি আবিষ্কার।"

তিনি হেসে বললেন, "কিন্তু ওটা আমারি কল্পনায় ছিল।"

বইখানা নাড়াচাড়া করে কাছে রেখে দিলেন। অনেকদিন পরে আমার কর্মস্থলে আমার বই আমার কাছে ফিরে আসে। খুলে দেখি রবীন্দ্রনাথের সুন্দর হাতের লেখায় সংশোধন। একখানি চিঠিও ছিল। 'রাখী' প্রসঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে অসাহিত্যিক বিষয়েও আলাপ করলেন। বললেন, "তুমি বাংলাদেশ নিলে কেন? আমি হলে ইউ পি নিতুম।"

তবে কি রবীন্দ্রনাথের সাধ ছিল আই সি এস হয়ে ইউ পি যেতে?

কবিকে বললুম, "আমি বাঙালী সাহিত্যিক হতে চেয়েছি বলেই বাংলাদেশ চেয়ে নিয়েছি। চাকরির দিক থেকে ভেবে দেখিনি।"

কবি যুক্তপ্রদেশের গুণগান করলেন। বাংলাদেশ সম্বন্ধে উৎসাহ দিলেন না। বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে আমি সাহিত্যের জন্যে এসেছি।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, বলতে পার, ওদেশের লোক আমার কাব্য যেমন নিয়েছে আমার ছোটগল্প কেন তেমন নিল না? এদেশের সঙ্গে ওদেশের সমাজব্যবস্থার মিল নেই বলে? আমাদের সমাজ ওদের অজানা বলে?"

উত্তর খুঁজে পেলুম না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আমাদের চোখে অতুলনীয়। অথচ ইংলণ্ডে বা কন্টিনেন্টে ওর সমাদর হল না। সমাজের জ্ঞান না থাকলে যদি গল্প উপভোগ করতে কষ্ট হয় তবে আমরা চেখভ এত পড়ি কেন?

কবি আমাকে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। আমি সদ্য বিলেত প্রত্যাগত বলে। একটি আমার মনে আছে। সেটি আইরিশ নাট্যকার Synge-এর নাটক সম্বন্ধে। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তাঁর কাছে বরাবরই বিশেষ কৌতূহলের বিষয় ছিল। চিঠিপত্রে উল্লেখ নেই বলে কেউ যেন না মনে করেন যে তিনি সে বিষয়ে উদাসীন বা অজ্ঞ ছিলেন। গ্রহণ করুন আর নাই করুন লেখক ও লেখার খোঁজ খবর তিনি রাখতেন। হালফ্যাশানের হলে তো কথাই নেই।

সামনের বছর কবি আমেরিকা যাবেন ভাবছিলেন। বললেন, "ওদের

অগাধ টাকা। তার সামান্য অংশ যদি বিশ্বভারতীর জন্যে পাই তা হলেও আমার ঝুলি ভরে যায়।”

তিনি যে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরোবেন এটা আমার ভালো লাগেনি। বিশেষত আমেরিকায়—সান ফ্রান্‌সিস্‌কোর সেই অপমানের পরে। আমি তখন লণ্ডনে। কাগজে পড়ে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলুম। আবার আমেরিকায়! পরে খবর পেলুম যে তিনি প্রথমে রাশিয়ায় ও তার পরে আমেরিকায় যান। জানতেন না যে রাশিয়ায় গেলে আমেরিকায় কল্কে মেলে না। চাঁদা দূরের কথা, বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণও পেলেন না। রিক্ত হস্তে ফিরলেন। যদি আগে আমেরিকায় যেতেন তা হলে অতখানি নিরাশ হতে হত না। তবে কতকটা হতে হত বইকি। আমেরিকায় তখন জোর মন্দা। সেই অর্থনৈতিক সঙ্কটে কেই বা পরের দেশের জন্য মুক্তহস্ত হচ্ছে!

কবির সঙ্গে দেখা করতে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী এলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আমি বললুম, “আলাপ হয়েছে।”

শান্তিনিকেতনে আসার আগে বালিগঞ্জে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিলুম। তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গেও। এঁরা দু'জনেই আমার সঙ্গে আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করেছিলেন। চৌধুরী মহাশয় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে “পথে প্রবাসে”র ভূমিকা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। অনুরোধটা আমার দিক থেকে যায়নি, তাঁর দিক থেকেই এসেছিল। সাহিত্য জগতে এটি একটি আশ্চর্য ব্যাপার।

কবি বললেন, “ওহে, বিবি একটা তাবলো (tableau) প্রযোজনা করছেন। ভারত ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কয়েকজন নারীর নাম করতে পারো?”

চাঁদবিবি, দুর্গাবতী প্রভৃতি বীরাঙ্গনার নাম করলুম। মীরার নাম বোধহয় তিনি নিজেই করলেন। ঝাঁসীর রানীর নামও উঠেছিল মনে হয়।

অচিন্ত্যকুমার আর আমি আরো দিন দু-তিন থেকে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু আর সে রকম নিরিবিলি পাইনে। আমাকে যেতে হয় চৌধুরীদের কাছে। তাঁরা উঠেছিলেন উত্তরায়ণেরই অন্য কোনোখানে। একদিন সন্ধ্যায় তো তাঁরা আমাকে ডেকে বৈঠক করলেন। অমিয় চক্রবর্তী তখন কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনিও একদিন ডেকে নিয়ে চা খাওয়ালেন। তাঁর সঙ্গে এই প্রথম আলাপ হলেও আগে তাঁকে আমি

শান্তিনিকেতনে দেখেছিলুম বছর চারেক আগে ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়ার ঘরে। গুহায় নির্জনবাস করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। পরনে রেশম।

একদিন অতিথিশালায় ফিরে অচিন্ত্যকুমার বললেন, "তুমি আজ গেলে ভালো করতে। কবি আজ মন খুলেছিলেন। যা বললেন তা অপূর্ব।"

আমি জানতে উৎসুক হই। "কী বললেন, শুনি?"

"কবি বললেন, অচিন্ত্য, সব সময় মনে রাখবে লোকলক্ষ্মী গর্ভিণী।" অচিন্ত্যকুমার উত্তর দেন। স্তব্ধ হয়ে থাকি আমরা দুজনে।

এই উক্তির ব্যাখ্যা কবির মুখে শুনিনি। শুনেছিলুম অচিন্ত্যকুমারের মুখে। এতকাল পরে ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। মর্ম এই যে, সাহিত্যিক দীর্ঘকাল ধরে এক একটা স্বপ্নকে বা আইডিয়াকে গর্ভে ধারণ করেন, একটু একটু করে অবয়ব দেন। তার পর যথাকালে প্রসব করেন। যতদিন না প্রসবের সময় হয়েছে ততদিন অন্তরালে থেকে অতি যত্নে গর্ভরক্ষা করেন। গর্ভিণীর এর বাড়া কর্তব্য নেই। লোকের প্রতি সাহিত্যিকেরও কর্তব্য এই। অকালে তাড়াহুড়া করে আত্মপ্রকাশ করতে গেলে লোকেরই ক্ষতি করা হয়।

এই বাণীটি যদিও অচিন্ত্যকুমারকে দেওয়া তবু আমিও এটিকে আপনার করে নিই।

কার্তিক ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কার্তিক **সূচীপত্র** ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

বর্ষ ৩১ ; সংখ্যা ৪
কার্তিক, ১৮৮৩ ; ১৩৬৮

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

অশোককুমার দত্ত

শ্রদ্ধাভাজন রাজশেখর বসু যাকে "পরিপূর্ণ সাহিত্য" বলেছেন আমাদের এতো গৌরবের ভাষা বাংলা আজো তা দাবি করতে পারে নি। কবিতা উপন্যাস বা গল্প সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মোটেই অবাঞ্ছিত নয়, কিন্তু শুধুমাত্র রস সৃষ্টির প্রতিভা তাকে পূর্ণরূপ দেয় না। সাহিত্য কথাটার মধ্যে যে একটা সহিতত্ব বোধ আছে, আমাদের দেশের বিজ্ঞান বা কারিগরি বিদ্যার কর্মীদের সাথে সে যোগ বড় ক্ষীণ। যে কোনো বছরের বাংলা বইয়ের তালিকা বিশ্লেষণ করলেই হিসাবটা আরো স্পষ্ট হবে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত মোট ২২৫০টি বইয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ বিদ্যার আলোচনা ছিল মাত্র ১৮৫টিতে, শতকরা হিসাবে এ হল মাত্র ৭·৩ ভাগ (তুলনীয়: জর্মান বা ফরাসী ভাষায় প্রায় ২০ ভাগ)। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার পরিচিত সমস্যাটি হল পরিভাষা, অর্থাৎ যে শব্দ বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্রে এসে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে এবং সে অর্থ সহসা বিস্তৃত বা পরিবর্তিত হবে না। যে বিজ্ঞান আমাদের ভাষার কাছে এতদিন প্রায় অপরিচিত ছিল তার আলোচনায় আমরা যে উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধ করব এতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু শুধু সমস্যার কথা ভেবে যদি নিষ্ক্রিয় থাকি, ভাষা তার সৃষ্টির কাজ সংগ্রহের কাজ চালাতে পারে না। আজকের এই বাংলা ভাষাও তার প্রাথমিক অবস্থায় বিপুল শব্দ সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয় নি, কিন্তু নদী যেমন আপন প্রয়োজনে বেগকে সঞ্চিত করে ক্রমশ বিস্তৃত হয়, ভাষাও তেমনি বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনে নানা শব্দকে

আহরণ করেছে, আবার বাতিলও করেছে—এভাবে নানা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব এক ভঙ্গি গড়ে ওঠে। আজকের যুগের বিশেষ প্রয়োজনের চাপে পড়ে বিজ্ঞানাশ্রয়ী বাংলা ভাষাকে আবার তেমনি নতুন করে তৈরি হতে হবে। এজন্য সবচেয়ে আগে দরকার বিজ্ঞান-অভিজ্ঞ লেখকদের দ্বারা ভাষা অনুশীলন। যারা তাঁদের বিষয়কে জানেন এবং সাধারণ লোকের জন্য তা প্রকাশ করতেও পারেন, এমন লোকের সংখ্যা মণিকাঞ্চনযোগের মতোই দুর্লভ। অতীতে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে আমরা এ যোগাযোগ লক্ষ্য করেছিলাম। দুঃখের বিষয় সে ধারা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে নি। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়, তবে তা ব্যতিক্রমই। প্রারম্ভের ক্ষীণ ধারা যে ভাবে বিস্তৃত হওয়া উচিত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা সেভাবে প্রসারিত হয় নি। ক্রমাগত বিদেশী ভাষার অনুশীলনে বাংলা ভাষার প্রতি এক ধরনের 'ছোট' মনোভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক, তাছাড়া মাতৃভাষায় লেখা বইয়ের শেষ পর্যন্ত যে কি গতি হবে তা ভেবেও অনেকে দ্বিধাগ্রস্থ থাকেন। সরকারী পোষকতার ফলে হিন্দীভাষা এই মনোভাব জয় করেছে। আমরা যে ভাষাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলি সেই হিন্দীতেই ১৯৫৮ সালে মোট ৪০৮টি বিজ্ঞানের বই (শতকরা হিসাবে ১০·৮ ভাগ) প্রকাশ পেয়েছিল। অবশ্য কৃতিত্ব শুধু পরিসংখ্যান বিচার করে না। কিন্তু অধিক সংখ্যায় এই পুস্তক প্রকাশের নিশ্চয় একটা ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই প্রকাশের দিকে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

হিন্দীভাষী ডঃ রঘুবীরের মতো এখানেও অনেকে আছেন যাঁরা প্রতিটি বিদেশী কথার বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজেন। ডঃ রঘুবীর প্রবল 'বিক্রমে' রামায়ণ তুল্য পরিভাষা কোষ রচনা করেছেন, কিন্তু অসংখ্য "রাবণ সৈন্য"-র কয়টিকে তিনি হিন্দীভাষার "শরে" আবদ্ধ করতে পারেন। বিজ্ঞানের যেমন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংখ্যাও তেমনি বেড়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য পদার্থবিদ্যা (health physics) কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানের এক অকল্পনীয় বিষয় ছিল, আজ কিন্তু তা পরমাণু বিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়। পঞ্চাশ কি যাট বছর আগে ভূ-পদার্থবিদ্যা (geo-physics) বা ইলেকট্রনিক্‌স্-এর তত্ত্বগুলি আরম্ভের পর্যায়ে ছিল মাত্র, কয়েক বছরের ব্যবধানেই আজ তা এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের যে কোনো শব্দকোষে এদের নিয়ে বেশ কয়েক হাজার নূতন পরিভাষার খোঁজ পাওয়া

যায়। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই এভাবে প্রসারিত হচ্ছে। বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগের দিক দিয়ে এই যে দ্রুত পরিবর্তন তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া তথাকথিত আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির পক্ষেও সব সময় সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রান্তে সর্বাধুনিক গবেষণার কথা জানার জন্য উন্নত ভাষাগুলি আজ তাই দ্রুত অনুবাদ পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছে। উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা অনুশীলন অনেকদিন থেকেই চালু হয়েছিল, আজ এই প্রয়োজন অত্যাবশ্যকরূপে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীব্যাপী বৈজ্ঞানিক ভাষা অনুশীলনের ফল যখন এই তখন এ সমস্ত আলোচনায় অনভ্যস্ত ভারতীয় ভাষাগুলির অপ্রস্তুত দিকটা আমাদের বিবেচনা করতে হয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ অন্যদিকে তেমনি তার অনুপূরকরূপে ইংরেজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার চর্চাও আমরা পুরোপুরি বাদ দিতে পারি না। এমন অবস্থায় অনেকে বিদেশী পরিভাষাকে বাংলা হরফে প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছেন। যোগ্য লেখক যদি ভাষার গ্রহণ ক্ষমতাকে বাড়াতে পারেন তাহলে আজকের প্রচলিত অনেক বিদেশী শব্দের মত এই পরিভাষাগুলিও আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ক্রমাগত চর্চার ফলে কারখানার ইংরেজী না-জানা শ্রমিকেরাও আজ বলেন—ক্রেন, লেদ, সিমেন্ট, বীম, রড, গিয়ার (gear), মোটর, পাইপ, হ্যাণ্ডেল, ইঞ্জিন, টাইম, আন্‌-লোড (un-load), প্রডাকশন ইত্যাদি। আমাদের অনেকে আজো রসায়ন শাস্ত্রের মানে ধরতে পারি না কিন্তু 'ক্যামিষ্ট্রি' বললে অনায়াসে বুঝে নি। 'ক্যালকুলাস'-এর বাংলা যে ব্যসকলন কথাটা অনেকে বোধহয় এই প্রথম শুনলেন। ভাষা-পণ্ডিতদের বিতর্কের অপেক্ষা না রেখে অনেক বিদেশী পরিভাষা আমাদের ঘরোয়া গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছে, এতদিন পরে তাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা তীরের বালুকণা থেকে নদীর জলকে বিশুদ্ধ করার মতোই হাস্যকর হবে।

বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির ব্যাপকতার দিক দেখে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম, উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বদাই আমাদের বিদেশী ভাষার সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মাতৃভাষাকে স্থান দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য হোক, কিন্তু তার আগে বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলিকে সহজ করে সাধারণ করে দেশের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। এ কাজ ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে, কিন্তু পরিভাষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো

নির্দিষ্ট মতধারা অনুসরণ সম্ভব হয় নি। এ সম্বন্ধে আগে থেকেই ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না, কাজের মধ্য দিয়েই সমস্ত ধারণা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটুকু বুঝতে কারো কষ্ট হয় না, ছোট ছোট বিদেশী কথা সহজেই ভাষার মধ্যে চলে আসে। আবার উদাহরণ দিই—এটম, আয়ন, নিয়ন, প্রোটন, ভোল্ট, গ্রিড ইত্যাদি। রাসায়নিক জিনিষের নাম (সোডিয়াম ক্লোরাইড, সিলভার নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সুপারফসফেট ইত্যাদি), ওষুধের নাম (এনাসিন, প্যারামাইসিটিন, থালাজল, এনট্রোকুইনল ইত্যাদি), বাণিজ্যিক নাম (trade name—পেট্রল, ডেটল, সুলেখা কালির 'এস-সল্' ইত্যাদি) মানুষের নামের মতোই সরাসরি ভাষায় ব্যবহার হবে। কারো নাম যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয় স্বজাতীয় করার চেষ্টায় তাঁকে 'চু-চেন-তাং' বলতে যাওয়া জটিলতাই বাড়িয়ে তোলে মাত্র। গাছপালা ও জীবজন্তুর নাম বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা মেনে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা আছে (যে কারণে জল-কে রসায়ন বিদ্যায় হাইড্রোজেন মনোক্সাইড এবং সাধারণ লবণকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা হয়)। ল্যাটিন ভাষায় লেখা এ সমস্ত দুরূহ নাম প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে দুস্তর বাধা, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান চর্চার উন্নততর ও প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যেতে পারে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তরলতাকে Ipomoea quanmoelit বা পটলকে Trichosanthes Dioica বলার প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু ছাত্র যদি জীব ও উদ্ভিদ বিদ্যায় অগ্রসর হতে চান বিজ্ঞান অনুমোদিত নামগুলিই ক্রমে জেনে নিতে হবে। আমাদের ভাষার কাছে পরিচিত বলেই এ সমস্ত দেশী নাম ব্যবহারে আমাদের আপত্তি থাকে নি, কিন্তু শব্দ পণ্ডিতদের তৈরি রাসায়নিক জিনিষের কৃত্রিম পরিভাষা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাই সৃষ্টি করবে মাত্র। এ কথা ভুললে চলবে না যে এই সমস্ত পরিভাষা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গঠিত বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীর দ্বারা নানা বিচারের পর রচিত হয়েছিল। 'স্বজাতীয়করণ'-এর মোহে তা যদি আমরা না মেনে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে যাই ভাষা তা গ্রহণ করতে চাইবে না। নেপথনিলকে যাঁরা 'উত্তৈলনীল' বা নাইট্রিক এসিডকে 'ভুয়িক অম্ল' বলতে চান জাপান তাঁদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হোক। অ্যামোনিয়াম সালফেটের পরিভাষা না খুঁজে দেশের মাটিতে তা তৈরি করতে যাওয়া আজকের এবং আগামীকালের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

পরিভাষা সৃষ্টিই বিজ্ঞান আলোচনার প্রধান সমস্যা নয়, ভাষার মাধ্যমে তা লোকের বোধগম্য করে তোলাই হচ্ছে আসল কাজ। পেট্রোলিয়ামকে 'মৃতৈল' বা Induction Coil-এর বাংলা 'আবেশ কুণ্ডলী' লিখে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি কিন্তু তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হয় না। পরিভাষা যাদের পক্ষে সমস্যা নয় সে সব ভাষাতেও এই বোঝানোর অসুবিধা রয়েছে। ইংরেজী Resistance-এর আক্ষরিক প্রতিশব্দ রোধ বা বাধা, বিদ্যুৎ বিজ্ঞানে তা বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেছে—'বিদ্যুৎ প্রবাহের যে বাধা উত্তাপ সৃষ্টি করে।' Energy-এর মানে আমরা 'শক্তি' বলতে পারি, Power-এর বাংলা হয়েছে 'ক্ষমতা'। কিন্তু এর দ্বারা Energy এবং Power-এর মূল প্রভেদটা প্রতীয়মান হয় না। একটি পরিমাণগত এবং অপরটি সময়নির্ভর পরিমাপ। Basic English-এর অনুকরণে ডবলু. ই. ফ্লুড নামে এক ব্যক্তি অগণিত ইংরেজী পরিভাষা থেকে মাত্র ২০১২টি শব্দ নিয়ে লোকবিজ্ঞানের একটি পরিমিত শব্দকোষ (Consolidated Popular Science Vocabular) রচনা করেছিলেন, কিন্তু এই বোধগম্যতার কথা বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞজন তা অনুমোদন করেন নি। কনসেপশন জিনিষটা এককভাবে পরিভাষার উপর নির্ভর করছে না, শব্দের সঙ্গে শব্দ যোগ করে লেখক যে মোট প্রতিফলটি রচনা করেন মূলত তাকেই তা আশ্রয় করে থাকে। আলো কথাটার মানে তো আমাদের জানা ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে তা আরো ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছে। আমাদের পরিচিত অনেক কথার মধ্যেই বিজ্ঞান এভাবে নূতন তাৎপর্য যোগ করেছে—পরিভাষার লক্ষণই হল তাই, কিন্তু আমরা অনেক সময় এ বিষয়ে সচেতন থাকি না। বিদেশী অপরিচিত পরিভাষা এদিকে আমাদের চিন্তা করার এক বাড়তি সুযোগ এনে দেয়। আলো-কে 'লাইট' বলতে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে আরো উদার উন্মুক্ত বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিতে হবে। 'সল্ট'-এর পরিভাষা আমরা অনায়াসেই লবণ বলতে পারি, 'লাইম'-এর মানে এতদিন চূণ জেনে এসেছি—বিজ্ঞানের বইতেও তাই বলব, 'স্লেইক লাইম'-এর পরিভাষা পাথুরে চূণ বা কড়া চূণ পল্লীবাসীর মুখেও শোনা যায়, সুতরাং প্রাথমিক জ্ঞানের খাতিরে তাও মেনে নিলাম। এভাবে অনেক পরিভাষা আমাদের মধ্যে সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কথা আমাদের ভাষার কাছে এতদিন অপরিচিত ছিল শব্দ-পণ্ডিতদের কারখানায় সৃষ্ট তাদের

"ভারতীয়" পরিভাষা দেশী প্রত্যয় নিষ্পন্ন বলেই শুধু মেনে নেওয়া দেশের লোকের পক্ষে সহজ হবে না। এক সময় সোনা রূপা তামা ইত্যাদি নানা ধাতু বিভিন্ন চিত্র এঁকে চিহ্নিত করা হত, ১৮১১ সালে বারজেলিয়াস রোমান হরফের দ্বারা তা নির্দিষ্ট করার কৌশল আবিষ্কার করেন। সঙ্গীতের স্বরলিপির মতো রসায়নবিদ্যার এই সাংকেতিক লিপি সমস্ত বিষয়টিকে যে কত নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করেছে বিজ্ঞানের প্রথম পর্যায়ের ছাত্রও তা অনুভব করেন। অভারতীয় লিপির দোহাই দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনার ফল থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। সাংকেত লিপির মধ্যে থাকে যে চিত্রধর্মিতা তা ভাষা নিরপেক্ষ। ইংরেজীতে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনায় আলফা, বিটা, গামা, ডেল্‌টা ইত্যাদি গ্রীকলিপিগুলি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের ভাষাতেও নিশ্চয়ই তার আপত্তি থাকবে না। জ্যামিতিক শাস্ত্রে কোণ ত্রিভুজ বৃত্ত ইত্যাদি নানা চিত্রলিপির সঙ্গে আমরা পরিচিত থাকি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও তেমনি বিচিত্র প্রয়োগচিহ্ন রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত এ সমস্ত সংকেত বাংলা ভাষাও স্বীকার করে নেবে। গণিতের দশটি অঙ্কের আবিষ্কার এই ভারতভূমিতে হলেও স্কুলপাঠ্য বইতে এখন 1, 2, 3 ইত্যাদি আন্তর্জাতিক লিপিই মেনে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শুধু এ কারণেই যদি কোনো ছাত্র অঙ্ক ভুল যাওয়ার অনুযোগ দিয়ে থাকে বুঝতে হবে তার শিক্ষার মূলেই গলদ রয়ে গেছে।

রকেটের যুগে এসে পৃথিবীর সীমানাটাই আজ বেড়ে গেছে। বিজ্ঞান ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানের এই অতি উন্নতির যুগে আমরা একদিকে যেমন নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি, সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় তার আলোচনার ক্ষেত্র রচনার জন্য নূতন নূতন শব্দ অনেক গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান আমাদের ডাক দিয়েছে—পরিভাষাকে ভাষার পরিপন্থী হিসাবে নয়, যুগের প্রয়োজনে পড়ে ভাষার পরিধিকেই আবার বাড়িয়ে তুলতে হবে।

কে যেন হাওয়ায়

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কে যেন হাওয়ায় বাজিয়ে দিল সমুদ্র।
পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম
আমি খান্‌-খান্‌ হয়ে ছড়িয়ে গেছি।
শুধু ভাঙা-গড়ার শব্দ
আমার অস্তিত্বের চারদিকে।

থোঁড়াতে-থোঁড়াতে যে আলোটা
এতক্ষণে অন্ধকার
গালে হাত দিয়ে যে ভাবনাগুলো অন্যমনস্ক
তারা সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

তোমরা ভাখো—আমি এসেছি
শোনো আমি শব্দ করে কিছু ভাঙছি এবং গড়ছি
তারপর মনে করো আমিই দু'হাতে
হাওয়ায় বাজিয়ে দিচ্ছি সমুদ্র।

ফেরাবে কি মুখ

জিষ্ণু দে

আহা, হালকা দীপ্ত চোখের দৃপ্ত মায়া
আসবে কি তাতে দীঘির সে গভীরতা,
দীর্ঘ দুঃখস্নিগ্ধ চোখের ছায়া ?
হালকা ঝড়েই উড়বে কি ঝরাপাতা !

ভাসন্ত মেঘ থামবে কি তার পথে
ফেরাবে কি মুখ তপ্ত মরুর দিকে—
দীপ্র আকাশ দুঃখের কালি মেখে
পৃথিবীর হয়ে চাইবে কি বৃষ্টিকে ?

সমর্পণে

রণধীর মিত্র

তুমি বলেছিলে
পাহাড়ের ওপারে তোমার স্বপ্ন
যেখানে এক একটা ক্লান্ত দিন
বুদ্বুদ হয়ে মিলিয়ে যায়

পথের ধারে সারাবেলা
জ্বলছিল কত উৎসবের চিতা
তবু কোনো স্ফুলিঙ্গ
আমাকে স্পর্শ করেনি

(আমার যে রক্তাক্ত বন্ধুরা
আজকের সূর্যাস্ত দেখল না
তাদের হৃদয় আমি
তোমাকেই উৎসর্গ করলাম)

পাহাড়ের চূড়ায় এখন
শূন্যে শূন্যে অন্ধকার
তুমি বলেছিলে
তার পরেই তোমার রূপকথা

সেখানে পৌঁছব বলে
আমি নক্ষত্রের আলো এনেছিলাম
কিন্তু তা কুয়াশা হয়ে
ছড়িয়ে গেল।

একটি শব্দের জন্ম

শ্যামসুন্দর দে

অন্ধকারের আড়ালে রাত্রি
বিবর্ণ আকাশে তারকার নৈঃশব্দ্য
আর মাটির গভীরে কত মুখরতা
সূর্যের সকাল গোণে
যন্ত্রণায়।

বালিয়াড়ির শীর্ষে দাঁড়িয়ে···
প্রবাহিত সামুদ্রিক বাতাস
দূরান্তের কোন্ কথার কানাকানি
নিসর্গের নীরবতায় তাই শুনি।

প্রহরের ঘণ্টা বাজে—
রাত্রির প্রহর ভেঙে ভেঙে
একটা জন্মের সকালের আকুলতা।

সময়ের স্রোত বয়ে গেল
বন্ধ্যা মুহূর্ত শুধু যন্ত্রণা
পরিক্রমা
তবুও তারার ঘোষণা।

পৃথিবীর গর্ভে কত অবগুণ্ঠিত প্রত্যয়
মাটির গন্ধে বেঁচে আছে
আর সেই ভ্রূণ বাসনা
জন্মের সকালের দিকে চেয়ে আছে।

আচ্ছন্ন অন্ধকারের প্রহরে দাঁড়িয়ে
সমস্ত ভয়ের মুহূর্ত পার করে বলি
জয় হোক !
জয় হোক জীবনের আকুলতার

সেই তরঙ্গিত শব্দ
ব্যাপ্ত হল একটি গ্রহের পরিমণ্ডলে।

সেইসব দুঃখ

রণজিৎ সিংহ

সন্ধেবেলার ঠাণ্ডা আকাশের নিচে শুয়ে আমরা তারা দেখতাম ;
মা গল্প বলত।

ছেলেবেলায় পশুশালার ঘোড়ার হ্রেষায় হাতির বৃংহনে ঘুম ভাঙত।
চোখ মেলে দেখত রাঙা রোদ খেলছে সাতমহলার চুড়োয়। সেই
ঠাট বজায় রাখার লড়াইয়ে বেদোরস্ত কয়েক পরগণায় আগুন
ধরিয়ে দাদামশায় ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন। তারপর টাটি-মরাইয়ের
ঘরে পালটা দিন কাটে।

গল্পের ঘোরে আকাশের তারা কখনো অবিশ্বাসে ঠিকরে উঠত
কখনো ঝাপসা হ'ত।

আমাদের কৌতূহলে তাল রেখে মা আবার কোনোদিন গল্প বলত।
তার রঙ আলাদা। পাড়া-পড়শির রঙ্গ-আমোদের গল্প, পরবের খুশির
গল্প। আমাদের তাজা টগবগে রক্তে সাহসী আর লড়ুয়ে জোয়ানদের
কথা জোয়ার ডাকত। হৃৎপিণ্ড থেমে যেত যখন শুনতাম, এক মা
জমির দাঙ্গায়, সর্বনাশের তাণ্ডবে, সাত ছেলেকে টাঙ্গি বল্লম তুলে দিয়ে
পিঠ ঠুকে দিয়েছিল।

এদিকে আনুকূল্যের তোড়ে অনেক দূর ভেসে গেলে আমাদের হুঁশ
হ'ত। জিগ্যেস করতাম, মা তোমার সেই আপন দুঃখ-দিনের গল্প ?

রাতপহর থমথম করত আগ্রহে। মা অনেক ক'রে আমাদের মন
ফেরাত ; আমরা আকাশে চোখ রেখে তারার গল্প শুনতে শুনতে
ঘুমিয়ে পড়তাম। আজ যা সবচেয়ে মনে পড়তে চায় সে গল্প মা
কোনোদিন বলে নি।

অন্ত্য প্রহর

বীরেন্দ্র নিয়োগী

ঘুম ভাঙতেই টেবল-ক্যালেণ্ডারের ওপর চোখ গিয়ে পড়ল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ঘোলানো ভাবে শরীরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আজ সাতাশে!

আড়মোড়া ভেঙে উঠতে গিয়েও আবার পাশ ফিরে শুলেন মিঃ চ্যাটার্জী। কি হবে এত সকাল সকাল উঠে! কেবল ভোর হয়েছে। শার্সি দিয়ে সকালের ম্লানাভ আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে ঘরের অন্ধকারটাকে ফিকে করে দিয়েছে। একটু নীলচে নীলচে দেখাচ্ছে দেয়ালগুলো।

কালও এই সময়ে ঘুম ভেঙেছে মিঃ চ্যাটার্জীর। আর ঘুম ভাঙতেই একটুও দেরি না করে, আড়মোড়া ভেঙে খাটের ওপর উঠে বসে পূব দেয়ালে ছোট্ট সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো মা কালীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে প্রণাম করেছেন ভক্তিভরে। তারপর খাট থেকে নেমে স্লিপার জোড়ায় পা গলিয়ে আস্তে আস্তে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেছেন। জীবনের তিরিশটা বছর ঠিক এমনি নির্ভুলভাবে একটানা ছন্দের মতো কেটে গিয়েছে।

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আজ কিন্তু হঠাৎ মনে হল, কি হবে এত সকাল সকাল উঠে! আজকেই অফিসের সঙ্গে শেষ পাট চুকিয়ে দিয়ে আসছেন। ঝাঁদরেল অফিসার মিঃ কে. পি. চ্যাটার্জি রিটায়ার করছেন আজ থেকে।

রিটায়ার। গা-টা যেন আবার ঘুলিয়ে উঠতে চাইছিল। মনে হল সুরমা আসছেন এ ঘরে। চট করে উঠে পড়লেন মিঃ চ্যাটার্জি। সুরমা কি কিছু ভেবেছে নাকি? আজ আমার রিটায়ার করবার দিন, তাই মন খারাপ করে শুয়ে আছি! বিছানার ওপর উঠে বসে মা কালীর ছবির দিকে মুখ করে হাত জোড় করলেন। দেখুক সুরমা, যে বাঘা অফিসার জীবনের ত্রিশটা বছর নির্ভুল ঘড়ির কাঁটার মতো সব কাজ করে এসেছেন, আজও চাকরী জীবনের শেষ দিনটায় একটুও এলোমেলো হননি তিনি।

গলা খাঁকারি দিলেন দুবার। তারপর আস্তে খাট থেকে নেমে চটিতে পা গলালেন। সুরমা টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। চট করে একবার স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হুঁ, যা ভয় করছিলেন তিনি, সুরমার চোখে সমবেদনা। আর ঠিক এই জিনিষটার মুখোমুখি হতে হবে ভেবেই কি জেগে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা তাঁর বিচ্ছিরি ভাবে ঘুলিয়ে উঠেছিল? দোরের দিকে এগুতে এগুতে দুবার গলা খাঁকারি দিলেন আবার।

—ঠাণ্ডা লাগল নাকি আবার? সুরমার উদ্বিগ্ন স্বর।

ভ্রু কুঁচকোলেন মিঃ চ্যাটার্জি—না, ভোরে একটু কনজেসশন হয়ই গলার। কালও তো হয়েছিল। মৃদু স্বরে বললেন।

—রোজ এমন হওয়া তো ভালো নয়। ডাঃ মিত্রকে একটা ফোন করে দি? সুরমা দুপা এগিয়ে এলেন।

অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না। আর ফিরে তাকালেন না মিঃ চ্যাটার্জি। দরজার ভারী পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

বাথরুমে ঢুকে যেন স্বস্তি পেলেন একটু। সাবান, ব্রাশ, পেষ্ট, তোয়ালে, তেল, জিভছোলা—সব পরিপাটি করে সাজানো। সুরমার হাতের ছোঁয়া না থাকলেও প্রখর দৃষ্টি রয়েছে সব কিছুর ওপর। স্বামী যে সকালের অনেকখানি সময় এ ঘরটায় কাটান, এ সত্য কোনোদিনই ভোলেননি সুরমা।

দেয়ালে টাঙানো পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় আয়নার মধ্যে এক প্রৌঢ়ের ছবি ফুটে উঠল। ফরসা শরীর, গোল ভারী মুখ, থুতনিতে খানিকটা চর্বি জমেছে। এই ভারী মুখখানাকে ভয় না করেছে এমন সাব-অর্ডিনেট কোনো অফিসার চোখে পড়েনি তাঁর। বেয়ারাকে দিয়ে ডাক পাঠালেই সবাই তটস্থ হয়ে ছুটে এসেছে। ঘরের সুইং ডোরে কাঁপা কাঁপা হাত রেখেছে। আর সেটা দেখে আরো সোজা আরো গম্ভীর হয়ে বসেছেন তিনি। ঘরে ঢুকে কার্পেটের ওপর নিঃশব্দে ভীরু পা ফেলে এগিয়ে এসেছে এক সন্ত্রস্ত অফিসার বিরাট ঘরের শেষ কোণে বাঁকা করে বসানো তাঁর টেবিলটার সামনে। একটা অস্ফুট নমস্কারের প্রত্যুত্তরে শুধু হাতের কলমটা ঈষৎ মুখের দিকে তুলেছেন মাথা

না তুলেই। একটা স্তব্ধতা। মাথার ওপরে ফ্যানের সঞ্চালনের মসৃণ শব্দ, টেবলের ওপর শেড দেওয়া টেবিল আলোর একটা বৃত্ত। এই মুহূর্ত কয়টি বড় মূল্যবান আর বড় উপাদেয় লেগেছে তাঁর। মনে হয়েছে, যেন তিনি ভগবান। ইচ্ছে করলে এক লহমায় সামনের ওই দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারেন, আবার হয়তো নতুন করে গড়েও তুলতে পারেন পরমুহূর্তে।

মাথার টাকে ডান হাতখানা রাখলেন মিঃ চ্যাটার্জি। এই সব মুহূর্তগুলো আর কোনোদিন ফিরে আসবেনা। অফিসের একপ্রান্তে একখানা সাজানো ঘরের মধ্যে শুধু বসে থেকেই প্রতিটি কর্মচারীর কাছে নিজের অশরীরী অস্তিত্বকে অনুভব করিয়ে ওদের দিয়ে সদাসন্ত্রস্ত ভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন না।

হঠাৎই যেন চমকে উঠলেন মিঃ চ্যাটার্জি। আয়নায় এ কার মুখ দেখছেন তিনি? স্তিমিত দৃষ্টি, বিবর্ণ মুখ; থুতনি আর গাল বুঝি একটু ঝুলে পড়েছে। এই কি তিনি? সর্বস্বহারার মতো?

হ্যাঁ, আজ থেকে সব শেষ। সত্যিই তো অফিস তাঁর সর্বস্ব ছিল! ওইখানে নিঃশ্বাস নিতেন, ওই জলে খেলা করতেন তিনি মাছের মতো।

একটা অপরিসীম শূন্যতা অকস্মাৎ তাঁর সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। যেন এইমাত্র খালি করে দেওয়া একটা বিরাট হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার ফাঁকা দেওয়ালগুলো ম্লান আলোয় বিবর্ণ। ধূলিহীন মেঝে, পরিষ্কার ছাদ। এই শূন্যতা যেন এক পাষাণের ভার। বুকটা কেমন করে, বুকে হাত দিলেন। হার্টের প্যালপিটেশনটা বাড়ল নাকি আবার? ডাক্তারকে কি খবর দিতে বলবেন? নাঃ, মাথা ঝাঁকালেন মিঃ চ্যাটার্জি, আজ নয়। শেষদিন আজ। কাউকে কিছু বুঝতে দেওয়া চলবে না। বাঘা অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি এতদিন কর্মচারীদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে এসেছেন, নিজের মুখের ভাব একটুও বদল না করে; আজও সেই মুখোসটা এঁটেই দিন কাটিয়ে যাবেন।

মুখোস? কথাটা মনে আসতেই দুপা পিছিয়ে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি। লোকে তাঁকে খারাপ অফিসার বলে, তাঁকে নাকি চেনা যায় না কখনো। এমন কি উর্ধতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত মাঝে তাঁর সম্বন্ধে নোট দিয়েছিলেন, সাব-অর্ডিনেটদের সাথে ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট tactful নন।

এসব কথাতো শুনতেই হবে। বিশ্বস্তভাবে সরকারকে সেবা করবার এই ফল। সরকারের প্রতিটি হুকুম, প্রতিটি নিয়ম বর্ণে বর্ণে পালন করে আসবার চেষ্টা করেছেন তিনি সারাটা চাকরী জীবন ধরে। তার পুরস্কার তো এই হবে! কিন্তু কর্মচারীরা কেন তাঁকে এই দুর্নামটা দিল? তিনি কারো গাফিলতি সহ্য করেননি—কি অফিসার কি সাধারণ কর্মচারী—তাই কি এই দুর্নাম? হ্যাঁ, এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন, ফাঁকি দেবার সুযোগ দাও, তুমি ভালো। না দাও, অমনি মন্দ হয়ে গেলে। এই নিয়ম। আর দেশ স্বাধীন হয়ে এরা তো এখন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। আজ মাইনে বাড়াও, কাল সার্ভিসরুল বদলাও—কি না সংবিধান বিরোধী! যত সব হুজুগ! উচ্ছৃঙ্খলতা! হ্যাঁ, উচ্ছৃঙ্খলতাই বলবেন তিনি একে! এ সবের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন, ওসব এ্যাসোশিয়েসন মার্কা আন্দোলন ফান্দোলন কড়াভাবে দমন করবার চেষ্টা করেছেন। কর্মচারীদের ভেতরে শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতা আনবার চেষ্টা করেছেন। এক কথায় অফিসের efficiency. সুতরাং দুর্নাম তো তাঁর হবেই।

যাক, সুনাম দুর্নাম সবই আজ থেকে শেষ। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ভালো করে ধুয়ে নিলেন। তোয়ালেটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে মুখ ঘাড় হাত মুছলেন। একপাশে সকালের জন্য গরদের কাপড় কোঁচানো রয়েছে। সাহেবীয়ানা পছন্দ করেন না চ্যাটার্জি, শুধু নামে আর অফিসের পোষাকে ছাড়া। সকালে সন্ধ্যাহ্নিক করেন। একটু প্রাতঃভ্রমণ, ফিরে এসে অল্প কিছু খেয়ে একটু অফিসের ফাইল পত্তর দেখা। তারপর যথারীতি অফিসের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এ নিয়মের কোনোদিন ভুল হয়নি। বন্ধুদের অনেকে বলেছে—সূর্য হয়তো একদিন না উঠতে পারে, কিন্তু চ্যাটার্জির অফিস কামাই! নৈব নৈব চ। জীবনের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নিয়মপালন করে এসেছেন তিনি। তাই জীবনে উন্নতি করেছেন। শরীরটাও ভালো রাখতে পেরেছেন আজ পর্যন্ত।

দেরি হয়ে গেল নাকি আজ? গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি। কি হয়েছে আজ! শুধু যত সব আবোলতাবোল ভাবছেন! না কি দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। দুঁদে অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি দুর্বল, এ কথা শুনলেও যে লোকে হাসবে।

—আজ আর এগোব না। লাঠিটা ফুটপাতে ঠুকে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—শরীরটা কি—একটু উদ্বেগ ফোটানোর চেষ্টা করলেন সেন তাঁর গলায়।

—না না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মিঃ চ্যাটার্জি,—শেষ দিন তো। কয়েকটা কাজ পড়ে আছে।। সকালেই চুকিয়ে রেখে দেব। চলি।

জোরে জোরেই হাঁটছিলেন। হঠাৎ পা হড়কে যেতেই লাঠি দাবিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন, পায়ের তলায় গোবর। তীব্র বিরক্তিতে গা-টা রী-রী করে উঠল। এইতো কর্পোরেশনের কাজের নমুনা। মাইনে দিয়ে কর্পোরেশন থেকে এতগুলো ভিস্তিওয়ালা, মেথর, ঝাড়ুদার সব পুষছে, আর কি কাজ করছে তারা? ফাঁকি, স্রেফ ফাঁকি! অফিসের একগাদা কর্মচারীর মুখ হঠাৎ মনের মধ্যে ভীড় করে এল। আর মনে হল সেই মুখগুলোর কেউ এখনো তাঁকে কোনো ফেয়ারওয়েলের কথা বলেনি।

বাড়ি এসে ঢুকলেন। সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে ওপরে উঠে গেলেন। রামু বেয়ারা লাঠিটা নিয়ে গেল হাত থেকে। বাড়ি এখন পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে।

জামা ছেড়ে গেঞ্জী গায়ে পাশের ঘরে এসে ঢুকলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ঘর সাজানো হয়ে গেছে এরি মধ্যেই। টেবিলে ফুলদানিতে টাটকা ফুল। একপাশে আজকের স্টেটসম্যান। খুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। সুরমা এক্ষুনি এসে পড়বেন। ব্রেকফাষ্ট সেরে নিচে নেমে যাবেন তিনি। দুটো ফাইল আছে। উল্টে পাল্টে দেখতে হবে একটু। অফিসারটা বলেছিল অবিশ্যি, সব ঠিক আছে। মুস্কিল, এদের যে বিশ্বাস করা যায় না। এদের ডিসিসনের কি মাথা মুণ্ডু আছে? তিনি নিজে না দেখে দিলে একটা না একটা গণ্ডগোল বাঁধবেই। অপদার্থ অফিসার অথচ ক্লিকবাজীতে খুব উৎসাহ। ওর সার্ভিস হিষ্টিটা তিনিও দাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কনফার্মড্ হতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে। হাসলেন একটু।

খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। সুরমা আসছেন। পেছনে ট্রে হাতে বেয়ারা। টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল।

—কি, হাসি হাসি মুখ যে, স্বামীর দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে যেন একটু স্বস্তি পেলেন সুরমা। হালকা সুরে কথাটা বললেন।

—হাসছিলুম একটা কথা ভেবে। কাল থেকে নিশ্চিন্ত। আর কোনো

কাজ নেই, শুধু বুড়ো আর বুড়ী। খুব বেড়াব আর সিনেমা দেখব, ফুর্তিতে দিন কাটাব।

অকস্মাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে এল। কি কথা থেকে কি কথা যে চলে এল! অপ্রতিভ হয়ে মুখ নামালেন। অস্বস্তি বোধ হতে লাগল বড়।

পট থেকে চা ঢালছেন সুরমা। মুখটা একটু নিচু। একটা ছায়া। মাথার ওপরে পাখার মৃদু ঘূর্ণন। একটা টিকটিকি টক টক করে উঠল। স্তব্ধতা জিনিষটা কি কুশ্রী! অন্ধকারের মতো ভয়। আমার নির্জনতা বোধ হচ্ছে কেন?

—সমুর চিঠিটা কালও আসেনি। খুব মৃদুগলায় বললেন মিঃ চ্যাটার্জি—একটা cable করে দেব? বলতে বলতে বুকের মধ্যে কেমন হু হু করে উঠল। ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল, একবার ছেলের মুখখানা কাছে থেকে দেখেন, দুদণ্ড ওর সঙ্গে বসে গল্প করেন। জেসপ-এর ইঞ্জিনিয়ার। ফরেন-এ গেছে ছ বছরের ট্রেনিং-এ। এখনো ফিরতে মাস আষ্টেক। ইস, কতদিন যে দেখেননি!

স্বামীর দিকে তাকালেন সুরমা। একটা কান্না ঠেলে উঠে আসছিল। চায়ের কাপটা একটু ঠেলে দিলেন স্বামীর দিকে। চা টলমল করে উঠল। উপচে পড়বে বুঝি এখুনি। চোখ ফিরিয়ে নিলেন মিঃ চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি।

—তাই দাও। মৃদুস্বরে বললেন।

—নাঃ, এবার ও ফিরে এলেই বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। যেন সামনে একটা মরুভূমি। এবং সেই মরুভূমির মধ্যে একটা ওয়েসিস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিলেন। বাড়িতে একটা বউ আসুক। হৈ হল্লায় ঘর ভরুক। শান্তি।

নিচু হয়ে চায়ে চুমুক দিলেন, নাঃ আজ বড় ধরা পড়ে যাচ্ছেন তিনি—কাজটুকু শেষ করে আসি। বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

এবং সেই মুহূর্তে সুরমা বললেন—আজও কাজ? শেষ দিন না আজ? আজ তো শুধু ফেয়ারওয়েল তোমার।

কথাটা কানে ঢুকল এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন ঝনঝন করে উঠল। ফেয়ারওয়েল। শব্দটা যেন দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁর গলা চেপে ধরেছে। প্রসারিত ডান হাতের তেলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জী। যেন আজকের ভবিষ্যৎটা দেখবার চেষ্টা করছেন ওই হাতের মধ্যে দিয়ে। না,

ফেয়ারওয়েলের কথা শোনেন নি তিনি। কেউ বলেনি তাঁর কাছে এসে।

একটু উসখুস করলেন। না, ভুলতে গিয়েও ভুলতে পারলেন না। সুরমা দুচোখে অদ্ভুত প্রত্যাশা ভরে নিয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। স্বপ্নের ভেতরে এক মুহূর্তের মধ্যে যেমন জীবনের অনেকখানি অংশ ফুটে ওঠে, তেমনি এই মুহূর্তে মিঃ চ্যাটার্জি বুঝতে পারলেন, আজ সকাল থেকে এত ভাবনা সব কিছুর ভেতরে প্রচ্ছন্ন ছিল ওই একটিই কথা। তাই সকালে উঠতেই ঘুলোনো ভাবে গা আচ্ছন্ন হয়েছে, স্ত্রীকে এড়াতে চেয়েছেন কথায় কথায় এবং রাস্তায় বন্ধুকেও।

তাঁকে কি তাহলে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে না? কিন্তু এতো একটা চিরন্তন প্রথা। রিটায়ার করবার সময় সহকর্মীরা ফেয়ারওয়েল দিচ্ছেন, নিজের জীবনেই তো কত দেখলেন তিনি। এর কি কখনো ব্যতিক্রম হতে পারে? না না, নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত হচ্ছে কিছু। বোধহয় কাছে আসতে ভয় পায় বলেই এখনো পর্যন্ত বলেনি কিছু। আজ বলবে।

মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে তুললেন। বললেন—তা বটে! আর, একটা কাঁটা খচ করে উঠল। অভিনয় করলেন নাকি? মিথ্যা হয় যদি? পাতলা অন্ধকারের কুয়াসা ঘেরা পর্দা বুঝি সামনে। তাহলে তো মিথ্যা বললাম। কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। ঠিক জানেন না তিনি। কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—তবু একটু আধটু কাজ করা ভালো। বলে আর কোনোদিকে না তাকিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

লম্বা করিডর। ঘাড় টান করে হাঁটছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। বাড়ি থেকে আজও অন্যদিনের মতো ঠিক সময়ে বেরিয়েছেন। ঠিক সময়ে এসে গাড়ি লেগেছে অফিস গ্যারেজে। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার এই করিডরে এসে পৌঁছেচেন।

হিসেবী পদক্ষেপে হাঁটছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হাতদুটো আস্তে আস্তে দোলাতে দোলাতে, বুকটা সামনে চিতিয়ে রেখে আর পা দুটো সমান মাপে ফেলে ফেলে। ঠিক আর সব দিনের মতোই। মাথা উঁচু আর ঘাড় শক্ত করে। কারো দিকে সরাসরি না তাকিয়ে। বড় অফিসারকে এমনিভাবেই

হাঁটতে হয়। তাঁর এক শ্রদ্ধেয় উপরওয়ালা এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আজও বিশ্বস্তভাবে সেই উপদেশ অনুসরণ করে চলেছেন তিনি। হাঁটবার সময় পিয়নরা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, হাতজোড় করে সেলাম বাজিয়েছে আর মাথাটা ঈষৎ নুইয়েই আবার সোজা করে হেঁটে চলে গেছেন। ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে থাকা কর্মচারিদের হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে ওঠা মূর্তি চোখের আভাসের মধ্যে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেছে। করিডর, ঘর, সবকিছু অকস্মাৎ অত্যন্ত নিঃশব্দ হয়ে গেছে।

হঠাৎই মনে হল, অফিসটা আজ যেন বড় জীবন্ত। এত চেঁচামেচি বা কথাবার্তা তাঁর হেঁটে যাওয়ার সময়তো এর আগে কখনো শোনেন নি। ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠল। ওরা কি মনে করেছে, আজ ওরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছে একেবারে? অজান্তেই ঘাড়টা একটু বেঁকে গেল। চারটি ছেলে একটা টেবিলের সামনে এসে জড়ো হয়েছে। হাত নেড়ে মুখ নেড়ে কি সব বলাবলি করছে। ওদের চোখও তাঁর চোখের সঙ্গে এসে মিশল এক মুহূর্তের জন্য। একটুক্ষণের জন্য, মনে হল, ওরা বুঝি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অথবা হয়তো তাঁর মনের ভুল। যেন তারপরেই ওরা জোর করেই বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে কথাবার্তায় মেতে উঠল। তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন। ওদের চোখে মুখে বেপরোয়া ভাবের সঙ্গে আর কি যেন মেশানো ছিল? ঘৃণা আর অবজ্ঞা কি? কঠিন সত্যের মতো মিঃ চ্যাটার্জির মনে একটা কথা চমক দিয়ে গেল। ওরা নিশ্চয় আজ ওদের মনের মতো একটা কিছু করে তাঁকে অপদস্থ করে ওদের সঞ্চিত গোপন ক্ষোভ এবং ঘৃণা মেটানোর চেষ্টা করবে। হুঁ, তাকে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছে না ওরা, নিশ্চয়! ওদের চোখে মুখে যেন এই কথাই লেখা ছিল।

হ্যাঁ, এই কর্মচারীরা তাঁকে ভয় করে এবং ভয়ের চাইতেও বেশী ঘৃণা করে। এ তিনি দেখেছেন। কিন্তু এর জন্য তিনি কি করতে পারেন? সরকারের কাজ। আদায়ের ভার তাঁর ওপর। তিনি নিজে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, তেমনি আদায়ও করে নিয়েছেন শক্ত হাতে। ওরা ছুটি চাইবে। কাজ বেশী বলে চ্যাঁচাবে। যেন সব সময়েই অত্যাচার চলছে ওদের ওপর এমন ভাব! দশটার সময় অফিসে কক্ষনো আসতে চাইবে না। কি না, ট্রাম বাসের ভীড়ে উঠতে পারা যায় না! অফিসের প্রয়োজনে বাইরে বদলী করতে গেলে বলবে, এই অল্প মাইনেয় দু জায়গায় নাকি সংসার

চালানো যায় না। এদের যে কোনো অর্ডারেই অসন্তোষ আর ক্ষোভ। আর কথায় কথায় এ্যাসোসিয়েশনেব নামে বায়নাক্কা। কিন্তু এসব অন্যায্য দাবিকে লাই দিতে গেলে কখনো শৃঙ্খলা থাকে, দক্ষতা বাড়ে? অতএব ওদের চোখে কিছু কড়া হতেই হয়েছে তাঁকে। দুর্নাম তো হবেই। ওদের চোখে তাই ঘৃণা! যেন কোনো অত্যাচারীর দিকে তাকিয়েছিল ওরা!

চাপরাশী ফ্যান খুলে দিয়ে গিয়েছে। টেবলের ওপরে সুদৃশ্য গ্লাসে জল শোভা পাচ্ছে সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া অবস্থায়। চেয়ারটা একটু বেঁকিয়ে নিয়ে বসলেন মিঃ চ্যাটার্জি। দেয়াল ঘড়িটায় টিক্‌টিক্ শব্দ উঠছে। জানলার কাটা পর্দায় বাইরের হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে। শুধু সুইং ডোরটা স্থির।

কি পরিচিত ঘর! কতদিন কাটালেন এখানে? চার বছর! এর আগে ছিলেন অন্য অফিসে। শেষ প্রোমোশন পেয়ে এই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। এই ঘর থেকেই বিদায় নিতে হবে।

ঢাকনা নামিয়ে গেলাশটা তুলে নিলেন। এক চুমুক জল খেয়েই নামিয়ে রাখলেন। কে যেন সুইংডোর ঠেলছে। চমকে তাকালেন। রামু পিয়ন।

—কে? ভ্রূ উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন।

—আজ্ঞে হীরেন বাবু দেখা করতে চান।

—হীরেন বাবু। কথাটা বললেন আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরের স্নায়ুগুলো যেন টানটান হয়ে উঠল। এ্যাসোসিয়েশনের লীডার! ফেয়ারওয়েলের কথা বলতে আসছে নাকি? একটা উদগ্র আগ্রহ আর কামনায় চনমন করে উঠলেন। বললেন—আসতে বলো।

রামু বেরিয়ে গেল। সুইংডোর ঠেলে ঢুকল হীরেন চ্যাটার্জি। একই সঙ্গে অফিসিয়াল গাম্ভীর্য এবং কিছুটা ভদ্রতা ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। একটু ঝুঁকে পড়লেন টেবলের ওপরে। কাঁধদুটো সঙ্কুচিত করলেন। পেন হোল্ডার থেকে একটা কলম তুলে নিলেন হাতে।

—কি ব্যাপার?

হীরেন চ্যাটার্জি এগিয়ে এল কয়েক পা। মাথাব চুলে আলতোভাবে ডানহাতটা একবার বুলিয়ে নিল।

—আপনিতো আজ থেকে চলে যাচ্ছেন।

বুকটা ধক্ করে উঠল মিঃ চ্যাটার্জির। এইবারে বুঝি ফেয়ারওয়েলের কথা বলবে!

—কিন্তু স্মরজিৎ সরকারের ট্রান্সফারের ব্যাপারটাতো এখনো ফয়সালা হল না।

এই কথার জন্য এসেছে? একটা অক্ষম রাগে চোখমুখ ঝাঁঝাঁ করে উঠল। মনে হচ্ছিল, এখুনি ডানহাতটা তুলে দরজাটা দেখিয়ে দ্যান। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম ভয় বাধা দিচ্ছিল। ও যেন একমুহূর্তেও একলা নয়। ওর চোখের পেছনে দুশো কর্মচারীর চোখ তীব্র খোঁচা মারছে। ওর গলায় দুশো মানুষের গর্জন। কেমন যেন ভয় লাগে। অকারণ স্নায়বিক ভয়। আর এর জন্যই একটা তীব্র অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকেন। শিরশিরে ভয়ের ভাবটা স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে যাচ্ছে। শরীরটা শক্ত হয়ে উঠছে, চোখের কোণে রক্ত জমছে, কানের দুপাশে টিপটিপ ভাব সুরু হয়েছে। একটা অক্ষম রাগে আর ভয়ে জড়ভরতের মতো হীরেন চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

—আপনিই বলেছিলেন, বড় অফিস থেকে কেউ এসে এখানে জয়েন করলেই স্মরজিৎকে ব্রাঞ্চ থেকে হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়ে আনবেন। তা, লোক তো আজ জয়েন করেছে। এবারে স্মরজিতের ফিরিয়ে আনবার অর্ডারটা দিয়ে দিন।

—এমন কথা কি আমি বলেছি? চাপা ক্রোধে ফুলতে ফুলতে উত্তর দিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ইচ্ছে করে প্যাঁচ কষা আমার ওপরে!

—হ্যাঁ, আমি বেশ স্মরণ করতে পারছি। এমনি ধরণের মৌখিক আশ্বাসই এর আগে আপনি আমাদের দিয়েছিলেন। এবং আপনার সেই প্রতিশ্রুতির জন্যই ট্রান্সফারটা টেম্পোরারী হয়েছিল।

—কিন্তু এমন কথা বলিনি, যে মুহূর্তে কেউ জয়েন করবে, সঙ্গে সঙ্গে স্মরজিৎ সরকারকে ফিরিয়ে আনবার অর্ডার দেব। মনে রাখবেন, তাঁকে পাবলিক ইন্টারেষ্টে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া আপনাদের বন্ধুদেরই অপ্রয়োজনীয় ছুটি নেবার ফলে ব্রাঞ্চে যে এরিয়ার পড়েছে, সেটা pull up করবেটা কে? চেয়ারে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন। একটু স্বস্তি পেলেন। যাক প্যাঁচ দিয়েছেন একটা এতক্ষণে।

—প্রথমত ছুটি অপ্রয়োজনে কেউ নেয় নি। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই তাই হয়েছে, তাহলেও তার জন্য একটা নিরপরাধ ব্যক্তি suffer করতে যাবে কেন? তাছাড়া, আপনার প্রতিশ্রুতির একটা গুরুত্ব আছে।

এটা কি আমরা আশা করতে পারি না ? হীরেন সোজা তাঁর দিকে তাকাল। কি বিনীত ভঙ্গি অথচ কি দুর্বিনীত ? অসহায়ের মতো একটা তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। নাঃ, এখানে আসার পর থেকে এই এ্যাসোসিয়েশনের পাণ্ডাগুলো জ্বালিয়ে এসেছে তাঁকে, আজ শেষ দিনেও ছাড়বে না।

—আমার এখন আর কিছু করবার নেই। যিনি নূতন আসছেন আমার জায়গায়, প্রয়োজন বুঝে তিনিই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন। দাঁতে দাঁত রেখে কোনরকমে উচ্চারণ করলেন।

—ঠিক আছে ! কেমন একটা ইঙ্গিত সহকারে কথাটা বলে মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে গেল হীরেন চ্যাটার্জি।

কপালে বুঝি ঘাম দেখা দিয়েছে। প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করতে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হাত কাঁপছে নাকি একটু একটু ?

রক্তের মধ্যে একটা অস্থির চাঞ্চল্য জাগছে। আর এক অদ্ভুত ভয়। যা কোনোদিন করেন না, আজ তাই করলেন মিঃ চ্যাটার্জি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, অস্থির পায়ে পায়চারী শুরু করলেন ঘরের মধ্যে। খাঁচায় পোরা সিংহের মতো। এই মুহূর্তে বাইরে বেরুবার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। যেন, শত শত কর্মচারীর জোড়া জোড়া চোখ ঘৃণা আর আক্রোশ নিয়ে দরজায় দরজায় পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তীক্ষ্ণ বর্শার মতো বিঁধিয়ে দেবে তিনি বাইরে গেলেই।

কয়েকবার পায়চারী করে একটু ঠাণ্ডা হলেন। ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে। লজ্জা লাগল। কেন এত ভয় পাচ্ছিলেন ? ছিঃ ! যা করেছেন তিনি, সবই তো কর্তব্যের খাতিরে। বাইরে যেতে কেউই চায় না। কিন্তু সরকারী স্বার্থ দেখতে গিয়ে জোর করেই পাঠাতে হয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকাতে গেলে অফিস চলত না। যারা ছুটি নিয়েছে, অনেককে মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছেন, সত্য সত্য অসুখ কি না পরখ করবার জন্য। ক্যারেক্টার রোল খারাপ করেছেন অনেকের, ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। অযোগ্য লোকগুলোর শাস্তি হওয়াই তো উচিত। অথচ এই সব ব্যাপার নিয়ে এ্যাসোসিয়েশন হৈ চৈ করবার জন্য মুখিয়েই রয়েছে। করুকগে হৈ চৈ। ডিসিপ্লিন বজায় না রাখলে অফিস কবে তলিয়ে যেত। এর জন্য তাঁকে কৈফিয়ৎ তলব করতে হয়েছে, চার্জশীট-

করতে হয়েছে। একজনের চাকরীও খেয়েছেন। এবং এ সবই অফিসের দক্ষতা ও মান বজায় রাখবার জন্য। তাই তিনি অত্যাচারী এবং হিংসাপরায়ণ অফিসার! ওদের ঘৃণার পাত্র!

কিন্তু তাহলে তিনি অনর্থক ভয় করেন কেন? নাকি তিনিও মনে মনে বিশ্বাস করেন যে হাতে অপরিমিত ক্ষমতা পেয়ে দুর্বলের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে এসেছেন এতকাল?

মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলেন মিঃ চ্যাটার্জি চিন্তাগুলো। নাঃ, এখন প্রস্তুত হতে হবে। কলিং বেল টিপলেন। পিয়ন এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

—দত্ত সাহেব।

ও সেলাম করে চলে গেল।

চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

সুইং ডোর ঠেলে দত্ত সাহেব ঢুকলেন। সাবঅর্ডিনেট অফিসার। মাঝ বয়েসী লোক। ব্যক্তিত্বহীন। নিজের টাই ঠিক করতে করতেই গলদঘর্ম। দেখলে গা জ্বালা করে। একটা ডিসিসন যদি ঠিকমতো দিতে পারে!

—চার্জ হ্যাণ্ডওভার রিপোর্ট রেডি করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দত্ত সাহেব টাইতে আঙুল বোলালেন।

—নিয়ে আসুন। দেখি, আপনাদের কাজ তো! কি করতে কি করে বসে আছেন কে জানে? মৃদু বিদ্রূপের হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠল।

নিরীহ পশুর ভঙ্গিতে কেমন দাঁড়িয়ে আছে! শুধু টাই টানাটানি করছে! সত্যি, চাবুক মারলেও বোধহয় এমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েই সব সহ্য করবে!

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কথাটা কি বুঝতে পারেন নি? তীক্ষ্ণ গলায় বললেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—আজ্ঞে সার। এই যে যাই। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দত্ত সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

—অপদার্থ। স্কাউণ্ড্রেল! অস্ফুটে মন্তব্য করলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

যে অক্ষম আক্রোশ মনের মধ্যে এতক্ষণ মাথা ঠুকে ঠুকে মরছিল, ওই লোকটার ওপর দিয়ে তার খানিকটা উদ্গীরণ হয়ে যেতে কিছুটা শান্তি পেলেন যেন।

দত্ত সাহেব চার্জ হ্যাণ্ডওভার রিপোর্ট দিয়ে গেলেন। তার ওপরে চোখ বোলাতে লাগলেন মিঃ চ্যাটার্জি। এতে একটা সই করলেই, ব্যাস, তাঁর মুক্তি।

ফোনটা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে কানের কাছে ধরলেন—হ্যালো!

—হ্যালো! আমি কি মিঃ চ্যাটার্জির সাথে কথা বলছি?

—হ্যাঁ। কে?

—আমি বিভাস অধিকারী কথা বলছি।

হাতটা একটু কেঁপে গেল অজান্তেই। তাঁর সাকসেসর!

—আচ্ছা! কখন আসছেন? গলায় কেমন একটা বাধো বাধো ভাব বোধ করছিলেন।

—খুব বেশী হলে আধঘণ্টার মধ্যে। কেমন?

—ঠিক আছে।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

—থ্যাঙ্কস্।

অসাড় হাতে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

ঘড়িটার দিকে আপনমনেই চোখ গিয়ে পড়ল। একটু একটু করে কাঁটা সরছে। একটু একটু করে যেন তাঁকে সরিয়ে দিচ্ছে চেয়ারটা থেকে। আর একটু পরেই মিঃ অধিকারী আসবেন। চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া, রিপোর্ট সই করা। ব্যস। খালি হাতে গিয়ে উঠবেন গাড়িতে। নিঃশব্দে ফিরে যাবেন বাড়িতে। সুরমা শুধু বড় বড় চোখ মেলে তাকাবে একবার তাঁর মুখের দিকে, একবার গাড়ির দিকে। কি আনলেন অফিস থেকে, শেষ দিনটায় সহকর্মীদের প্রীতি উপহার হিসেবে, বুঝি হিসেব করে বুঝে উঠতে চাইবেন।

অথচ কোনোদিনই তো প্রীতি চাননি মিঃ চ্যাটার্জি অফিস থেকে। এখান থেকে তিনি চেয়েছেন কাজ। দক্ষতা আর নিয়ম শৃঙ্খলা। আজ কেন তাহলে প্রীতির কথা উঠছে।

ভাবতে ভাবতে কখন মাথায় হাত রেখেছেন, জানলার দিকে তাকিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন, জানেনই না মিঃ চ্যাটার্জি। হঠাৎ চমক ভাঙল চাপরাশীর মৃদু ডাকে।

—হুজুর!

ঈষৎ চমকে মুখ ফেরালেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—নিচে নয়া হুজুরের গাড়ি এসেছে।

—তাই নাকি! তুমি গিয়ে তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো। আচ্ছা চলো, আমিই যাচ্ছি। বলে উঠে দাঁড়ালেন।

কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা গটগট করে করিডর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

—হ্যাল্লো!

—হ্যাল্লো!

দুজনে করমর্দন করলেন—আসুন। চ্যাটার্জি আহ্বান করলেন তাঁর উত্তরাধিকারীকে।

চকচকে স্যুট আর কম্বিনেশন টাইতে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে অধিকারীকে। বয়েসও অনেক কম। অনেক উন্নতি করবে জীবনে। মিঃ চ্যাটার্জি ভাবলেন।

ঘরে এসে ঢুকলেন দুজনে।

আর নয়, এবারে পালা চুকিয়ে ফ্যালো চ্যাটার্জি। মনে মনে যেন নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

অফিসারদের ডাকলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তারপর কাগজ পত্তরগুলোয় সই শেষ করে যখন উঠে দাঁড়িয়ে দুজনে করমর্দন করলেন, বেলা তখন প্রায় একটা।

এখন আমি একজন সাধারণ ভদ্রলোক। মনে মনে আওড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি। আর সিনিয়ার অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি নই।

ভাবলেন, আর ভয়ংকর একটা শূন্যতার চাপে মনটা যেন অবশ হয়ে এল। তারপর সেই চাপটা হঠাৎ উঠে গেল আর নিজেকে কি ভীষণ হালকা মনে হল! বুকটা বুঝি একটু ধকধক করছে। চারিদিক তাকালেন। মনে হল, যেন এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন, অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে। একটু আগেই নিজের হাতে তাঁর রাজ্যপাট সব কিছু অন্যের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন মঞ্চ ফাঁকা। তার অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। এবারে উইংসের আড়ালে চিরতরে প্রস্থান।

সইটার দিকে তাকালেন। পেছনের দিনগুলো আর আগামী দিনগুলোর মধ্যে এই শেষ সই যেন তীক্ষ্ণধার অসির মতো সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে। এখন থেকে তিনি একজন ভূতপূর্ব অফিসার।

গা ঝাঁকানি দিলেন। আর নয়। এবারে চলে যাই। এই ঘর, এই টেবিল, আলো, জানলার পর্দা, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, কার্পেট, সব মিলিয়ে এই জগৎটা যে কত অসংখ্য অদৃশ্য টানে তাঁর সমস্ত সত্তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ঠিক এই মুহূর্তে যখন পড়্‌পড়্‌ করে সমস্ত শিকড়ে টান পড়ল, যেন বুঝতে পারলেন। মরবার সময় কি মানুষের এমনি যন্ত্রণাই হয়?

—আর নয় মিঃ অধিকারী। এবারে উঠছি।

—সেকি, এখনি চলে যাবেন? ফেয়ারওয়েল কি এরি মধ্যে হয়ে গেছে নাকি? অত্যন্ত নির্দোষ বিস্ময়ে প্রশ্ন করে অধিকারী সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আর যেন পাহাড় থেকে একটা বিরাট পাথরের চাঁই হুড়মুড় করে গড়িয়ে এসে মিঃ চ্যাটার্জির ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ল। সুরমার মুখ চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, অফিসের কর্মচারীদের অদ্ভুত চোখগুলো। সমস্ত সার্ভিস লাইফের সার্থকতা কি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে এই একটি শব্দের যাদুর মধ্যে! ফেয়ারওয়েল? এর সঙ্গে বুঝি নিজের সম্মান, পরিবারের সম্মান সব কিছু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। অস্তিত্বের একটা বৃহৎ অংশের মতো।

সেই অস্তিত্বের ওপরেই বুঝি মিঃ অধিকারী আঘাত করেছেন না বুঝে।

কয়েক পলক ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পৃথিবীটা দুলছিল, চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মুখ তুলেই বলে ফেললেন—নাঃ, আমি বারণ করে দিয়েছি।

কথাটা বলে ফেললেন আর হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ যেন মুহূর্তে দীর্ণ করে ফেলল তাঁকে। ঠিক তখনি, বিদ্যুৎঘাতে আলোকিত আকাশ মাটি গাছপালার চকিত প্রকাশের মতো বুঝতে পারলেন, কি যন্ত্রণায়, কি কঠিন প্রয়োজনে তাঁর কর্মচারীরা মাঝে মাঝে মিথ্যে কথা বলে থাকে।

আর দাঁড়ালেন না। সেই মুহূর্তেই মিঃ অধিকারীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ভূতে তাড়া করা মানুষের মতো দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। অফিস ঘরের দরজাগুলো সট সট্ করে সিনেমার ছবির মতো তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল। হন হন করে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন। যেন অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকোতে পারলে বাঁচেন। অফিস কম্পাউণ্ড ছেড়ে মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি রাস্তায় এসে পড়ল।

আর সব কিছু শেষ হয়ে গিয়ে একটা চিন্তাই সিনেমার পর্দায় ক্লোজ-আপ মুখের মতো বড় হতে হতে সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কি করে খালি হাতে স্বরমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন! দুহাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো পেছনের সীটে পড়ে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। কি করবেন? কি? মাথার মধ্যে ভোমরার ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন যেন।

অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—সতীশ, গাড়ি ঘোরাও। নিউমার্কেট। বিস্মিত সতীশ গাড়ি ব্রেক কষল। তাঁর দিকে একবার তাকাল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

প্রখর রৌদ্রে রাস্তা জ্বলছে। ট্রামগুলো ক্লান্ত গরুর মতো যেন গলার ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। ল্যাম্পপোষ্টের শীর্ণ ছায়ায় একটা কুকুর বিশ্রাম করছে। চারপাশে শুধু বিবর্ণ কর্মহীনতার মেলা।

নিউমার্কেটের মুখে এসে গাড়ি থামল। নেমে ভেতরে এসে ঢুকলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ঘুরে ঘুরে একটা চাদর কিনলেন; একটা ছড়ি, গীতা একখানা। তারপর ফুলের স্টলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মালা দেখি একটা।

পছন্দ করে সাদা ফুলের একটা মালা কিনলেন। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে এসে গাড়ির মধ্যে একপাশে সাজিয়ে রাখলেন জিনিষগুলো। নিজে উঠলেন।

সতীশের অবাক দৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু বললেন—চলো, বাড়ি।

মাথা উঁচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। মাথা উঁচু করেই আবার ঢুকবেন। তার জন্য যত মূল্যই দিতে হোক না কেন।

গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে গাড়ি দাঁড়াল। দরজা খুলে নেমে জিনিষগুলো বের করে নিলেন। সতীশ হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল জিনিষগুলো। বললেন—দরকার নেই। গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাও।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।

সাড়া পেয়ে রামু চাকরটা এগিয়ে এল।—ধরো। বলে সব জিনিষ দিয়ে দিলেন ওর হাতে। ফুলের মালাটা ছাড়া।

শব্দ পেয়ে স্বরমাও বেরিয়ে এসেছেন। চোখাচোখি হল। জিনিষপত্তরের দিকে নজর পড়ল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন।

—ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল তাহলে?

—হুঁ। বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে অর্ধস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলেন।

—এগুলো দিল বুঝি ?

—হুঁ।

—বাঃ! গীতা, চাদর, ছড়ি! তোমার কর্মচারীদের বেশ রসবোধ আছে তো ?

—খুব।

বুকের মধ্যে আবার সেই সকালের যন্ত্রণার ভাবটা যেন চাড়া দিয়ে উঠছে। কিছু বাতাস নেবার জন্য হাতের মুঠো আলগা করে আবার শক্ত করলেন।

—ওকি, তোমার মুখটা অমন শাদা হয়ে গেল কেন ? উদ্বিগ্ন হয়ে সুরমা এগিয়ে এলেন—শরীর খারাপ করছে।

—না, না! দুপুরে চলে আসতে হল কিনা ? অভ্যাস তো নেই! জোর করে হেসে উঠতে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জী।

আর সঙ্গে সঙ্গে সুরমার চোখে আবার চোখ মিলল।

আমি সব মিথ্যে কথা বলছি। বুঝতে পারছ না ? চেঁচিয়ে বলে উঠতে গেলেন। কিন্তু কে যেন গলাটা কামড়ে ধরে আছে। আহত পশুর মতো আর্ত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েই রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

আলোচনা

সুশোভন সরকার

শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা নিয়ে বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত আলোচনা নিশ্চয়ই একটা শুভলক্ষণ। এই আলোচনায় সকলে যে একমত হবেন না এটা তো স্বাভাবিক। এখানে শেষ কথা কিছু থাকতে পারে না, সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা নেই, গোষ্ঠিগত নীতিও অচল। আমার রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নব-জাগরণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপত্তি তাই অপ্রত্যাশিত নয়। আমি যাকে প্রাচ্যাভিমান বলেছি, আজকের দিনে তার বিশিষ্ট ধারকেরা যে আমার উপর খড়্গহস্ত হবেন তাতে গোড়া থেকে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য হলাম শারদীয় পরিচয়ে হীরেনবাবুর ক্ষোভ ও উষ্মা দেখে, যেহেতু আমার সংজ্ঞায় যেটা প্রাচ্যাভিমান, রবীন্দ্রনাথ যাকে বার বার আক্রমণ করেছিলেন (তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতিগুলি এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ), হীরেনবাবুকে তার আওতায় আনতে আমি অক্ষম।

আমার প্রবন্ধের মতামত "ভ্রান্ত", "নিষ্প্রাণ", "যান্ত্রিক", "একদেশদর্শী", "অসঙ্গত", "সংকীর্ণ", "অবাস্তব" কিনা সেকথা নিশ্চয়ই তর্কসাপেক্ষ। এবম্বিধ বিশেষণ প্রয়োগ আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন, কেন না বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠকেরাই কেবল তর্কের নিষ্পত্তি করতে পারেন। আমি এখানে চেষ্টা করব শুধু ভুল বোঝার অবকাশটুকু কমিয়ে আনতে।

কারণ, মনে হয় এ-প্রসঙ্গে বেশ কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, ইংরাজিতে যাকে বলে arguing at cross purposes. দোষ অনেকটা নিশ্চয় ছিল ভাষা প্রয়োগে ও ভাবপ্রকাশে আমার দুর্বলতার মধ্যে। কিছুটা দায়িত্ব বোধহয় সমালোচকেরও আছে।

দুটি সামান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। হীরেনবাবু বলেছেন যে আমি সিদ্ধান্ত করেছি: "মোটামুটি ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় চলেছিল প্রাচ্যাভিমানের পর্ব"—আর আমার প্রবন্ধে "বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা নেই।" অথচ আমি রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যাভিমান-বিরোধী উদ্ধৃতি

দিয়েছিলাম অল্প কিছু একেবারে আদিপর্বের লেখা থেকে, আর ১৮৮৬—১৮৯৮ সালের রচনা থেকে প্রচুর পরিমাণে। "বহিরঙ্গ-চিহ্নগুলি যে পশ্চিমী দৃষ্টির আসল পরিচায়ক নয়", বিদ্যাসাগরের মধ্যে তার প্রমাণ দেখেছিলাম, মূল্যায়নে তাঁকে রামমোহন ও মধুসূদনের সমগোত্রীয় মনে করেই। এর থেকে অনুমান হতে পারে যে হয়ত সমালোচক মূল প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত ভালো করে পড়ে দেখেন নি।

কিন্তু আসল গোলমাল বেধেছে প্রবন্ধে ব্যবহৃত দুটি পারিভাষিক শব্দ নিয়ে, পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমান। নূতন concept প্রয়োগে সর্বদাই মুশ্‌কিল দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লেখকের নিজস্ব ধারণাটুকু নির্ভুলে বুঝবার চেষ্টা করাটা বাঞ্ছনীয়, নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরে যাওয়া অনুচিত।

সমালোচকেরা পশ্চিমী দৃষ্টির অর্থ করেছেন ইওরোপ-প্রীতি, প্রতীচ্যের কাছে আত্মসমর্পণ, নির্বিচারে পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি গ্রহণ, হাতজোড় করে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকা। তাঁদের কাছে প্রাচ্যাভিমানের মানে দাঁড়িয়েছে—স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, চিন্তায় ও কর্মে স্বদেশী মাটির মূলগত প্রাধান্য, দেশের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক, এককথায় হীরেনবাবুর "ভারত-বোধ"। বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যা স্বীকার করলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পশ্চিমী দৃষ্টির অনুসন্ধান বৃথা, রামমোহনের মতোনই "পশ্চিম তাঁহাকে কখনই অভিভূত করে নাই।" এই সংজ্ঞা অনুসারে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রাচ্যাভিমানী, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁর প্রীতি ও বিশ্বাস অবিসম্বাদিত। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, কোনও বড় সাহিত্যিক দেশের মাটিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তিনি প্রকাশ করেন নিজের ভাষাতে, স্বদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকবেই। প্রকৃত দেশপ্রেমিক নাড়ীর সম্পর্ক কাটাতে পারেন না। দেশ সম্বন্ধে তাঁর 'বোধ' থাকতে বাধ্য। আমি এতটা অর্বাচীন নই যে সর্বজনগ্রাহ্য এইসব কথা অগ্রাহ্য করব।

প্রকৃত প্রশ্ন হল যে আমার প্রবন্ধের মূল শব্দদুটির অর্থ কি এই ছিল? সেখানে কি বলা হয়নি যে নব-জাগরণের সাহিত্যশিল্প-সৃষ্টি ও স্বাদেশিকতা "সমানে পুষ্টিলাভ করেছিল উভয় ধারা থেকে"? প্রাচ্যাভিমান থেকে রবীন্দ্রনাথের মুখ ফেরানোর অর্থ তাঁর ভারতবোধকে অস্বীকার করা, এই বা কেমন কথা? যে-রামমোহনের প্রতিষ্ঠা 'ভারত-পথিক' রূপে, তাঁকে পশ্চিমী দৃষ্টির প্রবর্তক হিসাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব হল কি করে?

প্রবন্ধের পারিভাষিক শব্দের মধ্যে 'দৃষ্টি' ও 'অভিমান' কথা ছুটির প্রয়োগ আকস্মিক নয়। পশ্চিমী দৃষ্টির প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রাচ্য দৃষ্টি অর্থাৎ ভারতবোধ, প্রাচ্যাভিমানের বিপরীত হিসাবে পাশ্চাত্ত্যাভিমান অর্থাৎ পশ্চিমীকরণকে উপস্থিত করা হয়নি স্বকল্পিতভাবেই। Westernism এবং westernisation সমার্থক নয়। সমালোচক যোগ্যতর পারিভাষিক শব্দের প্রস্তাব আনতে পারতেন, তাতে অবশ্য প্রবন্ধের বক্তব্যটুকু বদলে যেত না।

পশ্চিমী দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে দৃষ্টিপাত নয়, ইতিহাসের বিশেষ যুগে পশ্চিম থেকে আহরিত আদর্শ মাত্র। উনিশ শতকে বাংলা দেশে এই দৃষ্টি বাস্তব রূপ নিল সমাজ-সংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবিকবাদে। (হিউম্যানিজমের এই প্রতিশব্দের জন্য আমি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে ঋণী—শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর লেখাটি সকলের পড়া উচিত)। তেমনই প্রাচ্যাভিমানের প্রকৃত অর্থ আপন ঐতিহ্যের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, স্বাদেশিকতা, ভারতবোধ নয়। তার বাস্তব প্রকাশ হয়েছিল প্রাচীন গৌরবের 'উপাসনা' অর্থাৎ ঐতিহ্যকে নির্বিচারে সংরক্ষণের ঝোঁকে, ভারতের বিশেষ অবস্থায় হিন্দুত্ববোধের প্রাধান্যে, যুক্তিকে হটিয়ে ভক্তিপ্রবণতার স্রোতে। আমার প্রবন্ধে ছিল উভয় ধারার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা। উভয় ধারারই কিছু কিছু প্রকাশ সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথের লেখায় ধরা পড়ে। কিন্তু কোনো কোনো পর্বে, বিশেষত পরিণত জীবনের শেষার্ধে পশ্চিমী দৃষ্টির প্রাবল্য লক্ষ্য করা সম্ভব, আমার বক্তব্য ছিল এই। প্রমাণ হিসাবে প্রবন্ধে তারিখ-সম্বলিত বহু উদ্ধৃতি কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রায় প্রতিটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের পার্থক্য ও প্রকৃত স্বরূপ। উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি করে এই লেখার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

পশ্চিমী দৃষ্টি বিদেশী শাসক, প্রচারক বা লেখকের চোখে "ভারত দর্শন" নয়। ইতিহাসে যাকে western impact বলে তার থেকে সঞ্জাত, বাংলার রেনেসান্সের যুগে নূতনভাবে রূপায়িত দেখবার ভঙ্গিটাকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ দৃষ্টির location এদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে, বিদেশে কিংবা ব্রিটিশের "বদান্যতা"র মধ্যে নয়—একে made in Europe বললে চলে না। পক্ষান্তরে "যাঁরা সদাই পিতামহের কালে বাসা বাঁধেন" এদেশীয় তাঁদেরই প্রবন্ধ নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় প্রাচ্যাভিমানী বললে অন্যায় হয় না। তাঁরা কিছু

অশ্রদ্ধেয় নন, তাঁদের প্রভাবেরও ঐতিহাসিক কারণ ও তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু তাদের তুলনায় প্রথম ধারাকেই "ভবিষ্যতের উপযোগী" মনে করাটা কি এতই অস্বাভাবিক ?

পশ্চিমী দৃষ্টি সাহেবিয়ানা নয়, ইংরাজিকে শিক্ষার বাহন হিসাবে আঁকড়ে থাকা নয়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আত্মনিমজ্জন নয়, ব্রিটিশ শাসনের স্তব নয়, ইওরোপের শক্তিরূপের আরাধনা নয়, দেশ ও দেশবাসীকে হেয়জ্ঞান করা নয়, অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, ভারতীয় সরল শান্ত জীবন জীবনযাত্রাকে বিসর্জন দেওয়া নয়। রবীন্দ্রনাথের যে-সব উক্তিকে আমি পশ্চিমী দৃষ্টির প্রকাশরূপে চিহ্নিত করেছি, তার থেকেই কি একথার প্রমাণ মিলবে না ? অথবা সেই সব লেখাতে কি সমাজসংস্কার-যুক্তিবাদ-মানবিকবাদের উজ্জ্বল দীপ্তি নেই ? শেষের দিকে এই ঝোঁক প্রবলতর হয়ে ওঠার নিদর্শনকে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা বলতে এত আপত্তি কেন ? আপত্তি তখনই ওঠে যখন পশ্চিমী দৃষ্টিকে এমন অর্থ দেওয়া হয়, যে-অর্থ আমার প্রবন্ধে ও নির্বাচিত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে না।

কথা উঠতে পারে পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানকে বিপরীত ধারা বলবার সার্থকতা কোথায়। উনিশ শতকের নব-জাগরণের চিন্তায় দুই বিরোধী ধারার বাস্তব অস্তিত্ব অনেকেরই চোখে পড়েছে। আমি শুধু তাদের উনিশ শতাব্দীর রুশদেশে চিন্তা-সংঘাতের তুলনীয় ভেবে সংক্ষিপ্ত দুটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছি। কেউ কেউ এদের রেনেসাঁস ও রিভাইভালিজম্ বলেছেন। আমার মতে দুটিই আমাদের নব-জাগরণের অঙ্গ। আমি বলেছি দুই ধারার বিরোধ এদেশে প্রধানত গোষ্ঠীগত ছিল না, একই লোকের মনে উভয় ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। আমি রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দুই ধারারই প্রকাশ খুঁজেছি, এ সম্বন্ধে তাঁর লেখায় পর্বভেদের অনুসন্ধান করেছি, এবং শেষ পর্যন্ত একটির উপর অপরটির জয়যাত্রার নির্দেশ পেয়েছি। নব-জাগরণের যুগে চিন্তার রাজ্যে অন্তর্বিরোধ আমার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়েছে। হীরেনবাবু তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লযোদ্ধার মতো সংঘর্ষ বলে উপহাস করেছেন। দুই ধারার মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের অস্তিত্ব অর্থাৎ inter-penetration নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাতে করে অমূর্ত ধারণার দুই ঝোঁকের বিরোধের অবসান হয় না। আর সেই পরস্পর-সম্পর্ককে সমন্বয়সাধন বলে নিশ্চিন্ত থাকবারই বা অবসর কোথায় ?

একথা বলবার কারণ এই যে আমার মতে উনিশ শতাব্দীর বিরোধের সমন্বয় সম্পন্ন হয়ে ওঠে নি, আজকের দিনে বরং বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। পশ্চিমী দৃষ্টিকে যদি সমাজসংস্কার-যুক্তিবাদ-মানবিকবাদ হিসাবে দেখি, তাহলে এখনও পদে পদে এই পথে যে-বাধা উঠছে তার উৎসও পাই সেই প্রাচ্যাভিমানে, যার আদর্শ হল ঐতিহ্য সংরক্ষণ, যার অবলম্বন হল ভক্তিস্রোতে অবগাহন, যার অস্ত্র হল হিন্দুত্ববোধের বুলি। শেষ বিশ্লেষণে অবশ্যই এখানে বাস্তব শ্রেণীবিরোধের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, চোখে পড়বে কায়েমী স্বার্থের প্রেরণা। কিন্তু বিরোধ প্রকাশিত হয় ভাব-রাজ্যে—ইডিয়লজির ক্ষেত্রে। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত রূপ নেয় আদর্শের সঙ্গে আদর্শের বিরোধে। আজ কোথায় গেল উনিশ শতকের সেই সুবিখ্যাত সমন্বয়সাধন?

অনেকের কাছে শুনতে পাব, এ তো হল রবীন্দ্রনাথকে দলে টানবার স্বার্থপ্রসূত অভিসন্ধি, অতএব সাধু সাবধান। এঁদের দুর্ভাগ্যবশত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বার বার নানা ব্যাপারে partisan রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করেন নি, বলিষ্ঠ মতামত প্রচারের ব্যাপারে সমন্বয় খোঁজেন নি। তাঁর সেই উত্তরাধিকার আজ যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে কি অন্যায় হবে?

হীরেনবাবুর প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মন্তব্যের আলোচনা করে এ লেখা শেষ করি।

আমার প্রবন্ধ-খণ্ডন মূল উদ্দেশ্য হলেও তিনি লেখা শুরু করেছেন বুদ্ধদেববাবুকে আক্রমণ করে। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি আমাদের দুজনকে এক পর্যায়ে ফেলছেন। অথচ আমার মতে পার্থক্য সুদূরপ্রসারী। বুদ্ধদেববাবুর লেখা হাতের কাছে নেই, কিন্তু তাঁর অন্তত দুটি ইঙ্গিত আমার কাছে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। স্বীকার করি না যে রবীন্দ্রনাথের যুগে এদেশের প্রায় অখ্যাত ফরাসী কবিদের কাব্যপ্রতিভা সাময়িক পত্রে অথবা মুখে মুখে আকাশে বাতাসে বিচ্ছুরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাঁর মতো প্রতিভাধরের পক্ষে প্রজ্জ্বলিত হতে এই স্ফুলিঙ্গই ছিল যথেষ্ট। আমার মতে এমন সিদ্ধান্ত নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা। সংস্কৃতি-রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ আসল পশ্চিমী হয়েও দেশবাসীর ভয়ে চরিত্রগোপন করে স্বাদেশিক সেজেছিলেন, একথা বিশ্বাস করাও অসম্ভব। তাঁর পক্ষে এ জাতীয় উভয়চারিতা আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়।

আধুনিক উদারনীতির জন্ম ইংরাজ বিপ্লবে, আধুনিক গণতন্ত্রের উৎস ফরাসী বিপ্লব। এইসব কথা মোটামুটি স্বীকৃত বলেই এতদিন আমার ধারণা ছিল।

হীরেনবাবুর শেষ আপত্তি হল সমাজবাদকে "প্রাচ্যাদর্শ নয়, পশ্চিমী দৃষ্টির" সঙ্গে সংযুক্ত করার বিরুদ্ধে। আমার বিশ্বাস যে আধুনিক ইওরোপের শ্রেষ্ঠ কীর্তির পরিণতি এল সমাজবাদে। এই প্রসঙ্গে লেনিনের The Three Sources and Three Component Parts of Marxism প্রবন্ধটি স্মরণীয়। বলা বাহুল্য আমার উল্লেখিত ভবিষ্যৎ স্বপ্নের 'অন্তর্বস্তু'টুকু এই মার্কসবাদ। বাস্তব অবস্থা অনুসারে সমাজবাদ নিশ্চয়ই "দুনিয়ার সব দেশেই খাপ খেয়ে যাবার মতো বস্তু", কিন্তু তাতে করে তার পশ্চিম থেকে আগমন কিছু অসিদ্ধ হয়ে যায় না। হীরেনবাবুর বিশ্বাস: "ইওরোপের চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে স্পর্শ না করলেও দেখতাম যে বেদ, উপনিষদ ও অনুরূপ ভাবাদর্শ থেকেই সমাজবাদের অভ্যুদয় ঘটত।" কী হতে পারত সেটা নিশ্চয় কল্পনার কথা, ইতিহাসের কারবার হল কী হয়েছে তাই নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে দুশম জ্‌ভাভিতেল

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জীবন নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রগত কারণেই বিড়ম্বিত। যেহেতু সাহিত্য ও সাহিত্যালোচনা জীবন বহির্ভূত নয়, সেহেতু এই বিড়ম্বনার দায় তার উপরেও বর্তেছে। বিশেষত আমাদের সাহিত্যালোচনায় প্রায়শই যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা আমাদের মানসক্ষেত্র ইওরোপে হাস্যকর। কেউ কেউ রটান উচ্চমান সম্পন্ন সাহিত্যের অভাব এর মূলে। কিন্তু এই রটনার ভ্রান্তি ধরা পড়ে যখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। বাংলাদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনায় অযথা সরলীকরণের ঝোঁক প্রায়ই চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে সিভিসের বুনিয়ান মডার্ন আইজ নামক প্রবন্ধটি স্মরণীয়। নির্দিষ্ট ছকে ফেলার ফলে ম্যাকলিওডসের কাছে বুনিয়ানের ধর্মবোধ শ্রেণী-সংঘাতের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর দিকে সরলীকরণের ফলে টিণ্ডল-এর বিচারে বুনিয়ান সাধারণ জনসাধারণেরই একজন। এই সরলীকরণ সর্বদা পরিত্যাজ্য। নির্দিষ্ট ছকে কোনো বড় লেখককে ফেলা যাঁদের সহজাত, তাঁদের সর্বদাই অবহিত হওয়া উচিত যে উক্ত লেখকের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ হতে পারে, যদিচ কেন্দ্র নিশ্চয়ই একটা থাকে। আসলে, ফ্রন্টইয়ার্স অব ক্রিটিসিজম্ নামক প্রবন্ধে এলিয়ট যে কথা বলেছেন সেকথা প্রতি সমালোচকেরই অবশ্য স্মর্তব্য।—সমালোচক শুধু সমালোচনা কৌশলে পারঙ্গম নন—তাঁকেও সমগ্র ব্যক্তি হতে হবে, বিশেষ নীতি ও বিশ্বাসে বিশিষ্ট হতে হবে, জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর প্রজ্ঞায় মুক্ত-দৃষ্টি হতে হবে। এখানে আরও একটি কথা স্মরণীয় যে প্রত্যেক সমালোচককেই উপলব্ধি ও উপভোগের উপর সমান জোর দিতে হবে, নচেৎ সাহিত্যালোচনা শুধুমাত্র ব্যাখ্যায় অথবা ইম্প্রেশনিষ্টিক আলোচনায় নিঃশেষিত হবে।

এলিয়ট কথিত সমালোচকের এই বিশিষ্টতা অর্জন করতে গেলে আমাদের মার্কসবাদের দ্বারস্থ হওয়া ব্যতীত উপায় নেই। কারণ মার্কসবাদ কতকগুলি ডগমা মাত্র নয়। মার্কসবাদের সর্বোচ্চস্তরে সে নিজেই একটি সৃজনাত্মক

প্রজ্ঞা। অতীত সংস্কৃতির বোধগম্যে ও তার সম্পর্কে জ্ঞানার্জনেও মার্কসবাদ-সহায়ক। সুতরাং অজ্ঞকে চিরগতিশীল বিশ্ব বোঝাতে বা অনুভব করাতে শিল্পী বা সমালোচক মার্কসবাদকে একটা উন্নততর উপায় হিসাবে পায়। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে মার্কসবাদের মৌল পার্থক্য এইখানেই। কারণ বুর্জোয়া ভাবাদর্শ জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের অসেতুসম্ভব ফারাকের সৃষ্টি করে এবং সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের ধারাকে শুষ্ক করে ফেলে। মার্কসবাদের কাছে সংস্কৃতি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিভার ফল নয়, এতে সমাজের অবদানও স্বীকার্য। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ নিরূপণে মার্কসবাদ যেহেতু অব্যর্থলক্ষ্য, সেহেতু সংস্কৃতিকে সে দেখে সমাজের সামগ্রিক দ্বন্দ্বময় সংঘাত এবং তার শক্তির প্রকাশ হিসাবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে যৌথ উপায়ে সংস্কৃতি সৃষ্টি দুঃসম্ভব। সেহেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিভার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাতেই ব্যক্তি, কাল ও দেশ রূপ পাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্পীদের কাছে মার্কসবাদের মূল্য কী? এক্ষেত্রে মার্কসবাদ শুধুমাত্র বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকেই শিল্পীকে মুক্ত রাখে না, জনসাধারণের প্রাণময় সাংস্কৃতিক জীবন লাভ করার জন্য সংগ্রাম ও বিজয়কেও রক্ষা করে! এ ছাড়া, মার্কসবাদ স্পষ্টতই জানিয়ে দেয় যে অতীত সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকেও বর্তমান জনসাধারণ তাদের মুক্তিসংগ্রামের পাথেয় পায় এবং নতুন সৃষ্টিতে মাতে।

বাংলাদেশের কোনো কোনো মার্কসবাদী রবীন্দ্রালোচনায় কখনো কখনো মারাত্মক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছিলেন এ কথা সত্য। এই ভ্রান্তির পেছনে নানা কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল। এছাড়া তখনই এবং পরেও মার্কসবাদী সমালোচকরাই এর প্রতিবাদ করেছেন। বিষ্ণু দের তৎকালীন যুক্তিযুক্ত তীব্র প্রতিবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। সুশোভন সরকার ও গোপাল হালদারের স্থিতধী আলোচনাগুলিও ভুলে গেলে চলবে না। এবং রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে মার্কসবাদের সম্বন্ধ যে অহিনকুল নয় তার প্রমাণও আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধাবলী।* তবুও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাদের মার্কসীয় রবীন্দ্রচর্চা এখনও অংশত বিড়ম্বিত। বামপন্থীমহলে অধুনা ব্যাপক রবীন্দ্রচর্চা নিঃসন্দেহেই পরম আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই রবীন্দ্রচর্চায়

* Dusan Zbavitel লিখিত Archiv Orientalni পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজীতে লেখা ছয়টি প্রবন্ধ।

কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের রাশিয়ার চিঠি বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী অনন্যসাধারণ লেখাগুলিই কেবল মর্যাদা পায়, তাঁর সুবিপুল মহৎ সাহিত্য উপেক্ষিত হয়। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা তাঁদের স্বকপোলকল্পিত মার্কসবাদে মেশাতে পারেন না তাঁরা তাঁকে এখনও বুর্জোয়া বলেন, আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী তাঁরা তাঁকে প্রায় প্রোলেটারিয়েটের প্রতিভূ করে ছাড়েন। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমই কি নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে না। সুতরাং এখনও যখন কোনো কোনো মার্কসীয় সমালোচনায় বিড়ম্বনা দেখা যায়, তখন আমাদের খোঁজ করতে হয় সমাজতান্ত্রিক দেশে রবীন্দ্রালোচনা হয় কিনা, হলে সেখানকার লেখকেরা কিভাবে আলোচনা করেন। এই কারণেই দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর এই প্রবন্ধাবলী আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

যখন এই প্রবন্ধাবলী হাতে এল, তখন মনে মনে একটু সংশয় ছিল। সংশয় দুদিক থেকে। এক, বিদেশী সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঋষি বা মিষ্টিক ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। দুই, সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে এই সমালোচনা এসেছে—আমাদের কোনো কোনো মার্কসীয় সমালোচনার কথা প্রায়ই মনে পড়ছিল। কিন্তু প্রথম প্রবন্ধ পাঠেই বুঝলাম, এর লেখক এই কোনো দলেরই নন। আশ্চর্য লাগল দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর বাংলাদেশ ও ভাষার সঙ্গে গভীর পরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ বোঝার আগ্রহে। পূর্বে একথা শুনেছিলাম, সমাজতান্ত্রিক দেশে রবীন্দ্রনাথ বহু-আলোচিত ও পরম শ্রদ্ধেয়। কিন্তু সেই আগ্রহ ও শ্রদ্ধা যে এই স্তরে উঠতে পারে ধারণা ছিল না। বাস্তবিক এমন বিস্তৃত রবীন্দ্র-রচনাবলী পাঠ ও তার মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশেও সুলভ নয়।

এই ছ'টি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দুশন জ্‌ভাভিতেল ১৮৮৭—১৯৪১-এর রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাহিত্য ও চিন্তাধারার আলোচনা করেছেন। নানা দিগন্ত অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের অশ্রুতপূর্ব মহত্বে কিভাবে এলেন তার ধারা তিনি দেখিয়েছেন। আলোচনার বস্তুনিষ্ঠতায় এই প্রবন্ধগুলি অনন্য—বিশেষত যখন ভাবি এগুলি এসেছে একজন বিদেশীর কাছ থেকে।

প্রবন্ধ ক'টি বিভক্ত হয়েছে এই ভাবে—১৮৮৭—১৮৯১ ; ১৮৯১—১৯০৫ ; ১৯০৫—১৯১৩ ; ১৯১৩—১৯৩০ ; ১৯৩০—১৯৩৭ ; ১৯৩৭—১৯৪১। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি স্বল্পাকারের সিদ্ধান্ত।

দুশন জ্ ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর আলোচনা আরম্ভ করেছেন ১৮৮৭ সাল থেকে। কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনার সঙ্গে ১৮৮৫ সালের পরবর্তী রচনাবলীর তুলনা করলে একটা বড়ো রকমের পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় 'কড়ি ও কোমল'। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চায় এক নতুন যুগের সূচনার কারণানুসন্ধান করেছেন সেই সময়কার জাতীয় জীবনের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কথা। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার একটি মূল্যবান ফল, দুশন জ্ ভাভিতেল-এর ভাষায় "ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়াদের অধিকাংশের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যাবলীর বৃদ্ধি।" ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ সালে প্রকাশলাভ করল রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও সমালোচনা নামক প্রবন্ধ দুটি। 'কড়ি ও কোমলে' দুশন জ্ ভাভিতেল সবচেয়ে নতুন যে সদর্থক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন, সেটি হল "রবীন্দ্রনাথের জগৎ সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা।" প্রাথমিক ভাবে এই ধারণা দ্বন্দ্বাত্মক এবং ক্রমবিবর্তনশীল। লেখক আরও জানালেন যে, তিনি এই বৈশিষ্ট্যের উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্যসাধনায় এই ধারণা সর্বক্ষণই সক্রিয় ছিল, কখনোই হারিয়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যকে অবশ্য জ্ ভাভিতেল বুর্জোয়াদের উত্থান-সময়ের প্রগতিশীল চিহ্ন হিসাবেই দেখেন। এবং 'কড়ি ও কোমলে'ই রবীন্দ্রনাথের মানবেতিহাসের প্রগতিশীলতায় গভীর বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পান। যদিচ এই বিশ্বাস ভাববাদে শেষ হয়েছে তথাপি এই বিশ্বাসের জোরেই, জ্ ভাভিতেল মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক অন্য সব চিন্তানায়কদের থেকে অনেক বেশী মুক্ত দৃষ্টি হয়েছিলেন। 'কড়ি ও কোমল', তিনি আরও জানালেন, তৎকালীন উঠতি বুর্জোয়াদের উৎসাহ ও সম্ভাবনাময় আশার প্রকাশ।

এই প্রবন্ধেই দুশন জ্ ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেন। বলেন, "যখন আমরা তার নাটককে ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্যের দিক দিক থেকে বিচার করি, তখন আমাদের সিদ্ধান্তকে অনেক পরিমাণে সংকুচিত করতে হবে।" এর কারণ স্বরূপ জানান যে, ভারতীয় নাটকে নাটকীয় টানাপোড়েনের প্রয়োজন হয় না। ঘটনার দীর্ঘ বিবরণেই কাজ চলে। মঞ্চে ঘটনাগুলি অনুষ্ঠিত না হলেও ক্ষতি নেই এবং নাটকীয়

ঘটনা অপেক্ষা ভারতীয় নাটকে ভাব বা আইডিয়ার উপরই জোর দেওয়া হয় বেশি। 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সালে। এদের জ্‌ভাভিতেল "পাঠ্য নাটক" হিসাবেই দেখেন। 'বিসর্জনে', নাটক হিসাবে নানা ত্রুটি থাকলেও, সংকীর্ণ ধর্মবোধ বা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট প্রতিবাদের মূল্য তিনি স্বীকার করেন। বস্তুত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নিয়ত সংগ্রামকে জ্‌ভাভিতেল বার বার তুলে ধরেছেন।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত হল 'মানসী'। থিম-এর দিক থেকে জ্‌ভাভিতেল মনে করেন 'মানসী' প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই রবীন্দ্রনাথের আগের কবিতার সঙ্গে সংযুক্ত এবং মোটামুটিভাবে 'কড়ি ও কোমলে'র উন্নতির ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত নয়। 'মানসী'তে স্পষ্টভাবে দেখা গেল, ভারতীয় তথা বাঙালী মেয়েদের দুর্ভাগ্যের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল নববঙ্গ-দম্পতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু 'মানসী' সম্পর্কে লেখক শেষ কথা বলেছেন যে যদিচ তিনি 'মানসী'র সদর্থক গুণগুলির উপর বেশি জোর দিয়েছেন, তথাপি 'মানসী'তে ভাবগত ও শিল্পগত স্বল্পমূল্যের কবিতাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। এবং দুর্ভাগ্যত এই কাব্যগ্রন্থে এই ধরনের কবিতাও যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই সময়ের রবীন্দ্রনাথের রচনায় দুটি সীমাবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে—এক, জীবন ও তার স্বতন্ত্র ঘটনাগুলি (typical facts) সম্পর্কে তাঁর অপর্যাপ্ত জ্ঞান ; দুই, বাস্তব ও দৃঢ় ভাবাদর্শের অভাব। এইখানে এসে প্রথম প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ পাতিসর যাত্রা করেন।

প্রথম প্রবন্ধটির এই বিস্তৃত আলোচনার প্রধান কারণ, দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর আলোচনা পদ্ধতির পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধেই পাই। শিল্প হিসাবে সাহিত্যের বিচার তিনি করেন নি। মানসীর শিল্পমূল্য সম্পর্কে এর কতকগুলি কবিতার "smaller artistic value-র" উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। পরবর্তী আলোচনাতেও সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে বিশেষ বিচার করেন নি। কচিৎ উল্লেখ করেছেন। যেমন 'মেঘ ও রৌদ্র' সম্পর্কে, 'চৈতালী' প্রসঙ্গে। 'মেঘ ও রৌদ্র' সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে গল্পটির গঠন কৌতূহলোদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ গল্পে সমগ্র মনোযোগ দেন ঘটনাগতির উপর এবং সেটা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এখানে

'রৌদ্র ও মেঘের' প্রসঙ্গ বারবার এসেছে, তৈরি করেছে সমগ্র গল্পের পটভূমিকা, ইঙ্গিত করেছে শশীভূষণ ও গিরিবালার অবস্থা পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের, বিশেষত তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের। চৈতালী প্রসঙ্গে তিনি জানান যে 'চৈতালী'কে সনেট হিসাবে বিচার করলে ভুল করা হবে। কারণ 'চৈতালী'র আঙ্গিকরীতি একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। 'চৈতালী'র প্রায় কবিতাই "consist of seven parts, seven ideas or pictures, comprising couplets, each rhyming differently. The whole poem has then, in general, an ascendent tendency up to the final couplet containing the main point."

সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের বিচার না করলেও কয়েকটি মৌলিক কারণে যান্ত্রিক-বস্তুবাদী আলোচনা থেকে (যা আমাদের দেশেও কখনো কখনো দেখা যায়) দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর আলোচনা পৃথক। প্রথমত তিনি রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কী প্রোলেটারিয়েট নিছক তার আলোচনার দায়িত্ব শেষ করেন নি। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের পর অসামান্য 'রাশিয়ার চিঠি' বা অসাধারণ কবিতাগুলিকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেন নি। রবীন্দ্রকাব্য বা চিন্তাধারার ক্রমানুবর্তনেই যে তারা এসেছে সেকথা জানিয়েছেন। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ধর্মবোধ সম্বন্ধে তিনি সজাগ। এবং চতুর্থত রবীন্দ্রকাব্যে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে তিনি দেখেছেন মানবতা বা হিউম্যানিজমকে।

এবার দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য উক্তির দ্বারা তাঁর বিশিষ্টতা দেখানো যেতে পারে।

জ্‌ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেন। উল্লেখযোগ্য. রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প লিরিক্যাল—এই বহুপ্রচলিত উক্তিটি তাঁর লেখায় দেখি না। ন্যায্যভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্পাবলীর বাস্তবতা, সামাজিক মূল্য বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রগুলি তাঁর কাছে "life-like and realistic in the deepest sense of the word." এই গল্পাবলীতে সামাজিক অত্যাচার, রক্ষণশীলতা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন, স্বাভাবিক কারণেই জ্‌ভাভিতেল সে সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। সোনার তরীও তাঁকে আকর্ষণ করে এর pastoral element-এর জন্য। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন

রবীন্দ্রকবিতায় এই গুণ এই প্রথম দেখা গেল। রবীন্দ্রকাব্যে এই নতুন বৈশিষ্ট্য কবির গ্রামজীবন ও প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল। 'চিত্রা'র বহু আলোচিত 'জীবনদেবতা' প্রসঙ্গে দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর উক্তি আশ্চর্যভাবে নতুন ও যুক্তিসহ। প্রথমত তিনি মানেন না যে জীবনদেবতা-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতে, এই তত্ত্ব চিত্রারই মাত্র কয়েকটি কবিতায় সীমাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে রবীন্দ্ররচনাবলীর পাঠক ও ছাত্রবৃন্দ এই তত্ত্বকে অযথা অতিমূল্য দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি জীবনদেবতা তত্ত্বের কারণ অনুসন্ধান করেন। তখনকার রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থাই এর মূলে বলে মনে করেন জ্‌ভাভিতেল। এই সময়ে রবীন্দ্রমানসে যে নির্জনতার সাক্ষাৎ আমরা পাই তার কারণস্বরূপ লেখক বলেন—রবীন্দ্রনাথের গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেখানকার জনসাধারণ। অবশ্য জ্‌ভাভিতেল এই সময় রবীন্দ্রনাথের "preoccupation with himself"-কেও জীবনদেবতা তত্ত্ব উদ্ভবের কারণ হিসাবে দেখেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই জীবন-দেবতার ছায়ামুক্ত হলেন এবং দুশন জ্‌ভাভিতেল টমসন সাহেবের সঙ্গে একমত যে এই উৎক্রান্তিই মানুষ এবং কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। জীবনদেবতা-পর্যায় অতিক্রম করার প্রয়াস 'চিত্রা'তেই আছে—উদাহরণস্বরূপ জ্‌ভাভিতেল উল্লেখ করেছেন 'এবার ফিরাও মোরে', 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি'র। 'দুই বিঘা জমি' প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল বলেছেন "the first social ballad in Tagore's work and worthy counterpart to the best of his short stories." পরের গ্রন্থ 'চৈতালী'র 'জাতীয়তাবাদী কবিতাগুলি' সম্পর্কে তিনি জানান যে স্বদেশকে মহত্ত্বে দীক্ষা দেবার জন্য স্বদেশবাসীর কাছে স্বাবলম্বনের ডাক দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে 'মানসী' থেকে রবীন্দ্রনাথ আরও অগ্রসর হয়েছেন। উদাহরণ বঙ্গমাতা কবিতাটি। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'কল্পনা'য় জ্‌ভাভিতেল সাক্ষাৎ পেলেন "a new anti British note"-এর। এর কারণ তিনি অনুসন্ধান করেন উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে কংগ্রেসে যে পরিবর্তনগুলি আসে তার মধ্যে। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত কণ্ঠরোধ নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ ও উদ্ধৃত করেন জ্‌ভাভিতেল। উনিশ শতকের শেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে জ্‌ভাভিতেল দেখেন সজীব আশাবাদ,

জীবনের তুচ্ছতম দানেও আনন্দলাভের ক্ষমতা এবং এর ফলে বিশ্বসৌন্দর্য ও সাধারণের কাছে তার প্রকাশ।

এর পর 'ক্ষণিকা'য় সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনেব প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হন। জ্‌ভাভিতেল মনে করেন 'ক্ষণিকা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার গ্রন্থ। 'ক্ষণিকা'র চলতি ভাষার কথাও উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে দুশন জ্‌ভাভিতেল যে যথার্থ কাব্যরসিক তার পরিচয় 'ক্ষণিকা' সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিতে তিনি দিয়েছেন। কারণ আমরা সাধারণত 'ক্ষণিকা'র অসামান্যতাকে আমল দিই না। বস্তুত জ্‌ভাভিতেল যে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন যথার্থ মার্কসবাদী লেখক তার প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রকাব্যে জাতীয়তাবোধের ক্রমবর্ধমান স্থানলাভের উপর জ্‌ভাভিতেল বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'কল্পনা'র পরবর্তী 'কথা ও কাহিনী'। এই প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল জানিয়েছেন যে এই কাব্যগ্রন্থে ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক চেতনাই বেশি সক্রিয়। জাতীয়তাবোধের প্রত্যক্ষ ফল 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি। বিশেষত রাজস্থানী ও মারাঠী কাহিনী সেগুলির অবলম্বন। 'নৈবেদ্যে' ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের।

১৮৯১-১৯০৫ সালের মধ্যে রচিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাওয়া গেল সামাজিক বাস্তবতা, ঘনিষ্ঠ জীবনচেতনা (though following the religious conceptions) এবং জাতীয়তাবোধ।

শ্রীযুক্ত জ্‌ভাভিতেল আবার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথের, বিষয় ও আকারে, 'religious creation'-এর চূড়ান্ত পর্যায় লক্ষ্য করেও জ্‌ভাভিতেল বললেন যে বৈষ্ণবজ ভক্তিতত্ত্ব বা মিষ্টিক কবিস্বভাব এই কবিতাগ্রন্থে প্রাধান্য পেলেও রবীন্দ্রনাথের দেশ ও মানুষের প্রতি আগ্রহ এই ঝোঁককে ব্যাহত করেছে। এবং এইজন্যই কবি ঈশ্বরকে এই পৃথিবী এবং তার দুঃখকষ্টের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। তিনি আরও জানালেন যে 'গীতাঞ্জলি'তে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা মোটেই আধ্যাত্মিক নয়। কবিতা-গ্রন্থটির ঐক্য নষ্ট না করলেও উপরিউক্ত মানব ও দেশের প্রতি আগ্রহই এখানে স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল 'গীতাঞ্জলি'র একশ ষাট সংখ্যক কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে জ্‌ভাভিতেল-এর উক্তি সঠিক।

'গীতাঞ্জলি'র একষট্টি সংখ্যক কবিতাটিও পূজার কিংবা আধ্যাত্মিক নয়। এই কবিতাটিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই গান হিসাবে প্রেমের পর্যায়ে ফেলেছেন (গীত-বিতান ২য় খণ্ড, প্রেম ২৬৭)। শুধু তাই নয় ভারতের বর্ণভেদ, অধিকাংশ জনসাধারণকে অস্পৃশ্য করার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার শোনা গেছে এই কবিতাগ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত একশ' সাত সংখ্যক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

ইওরোপে এই গ্রন্থের অভূতপূর্ব সম্বর্ধনার কারণ নির্দেশেও তিনি অব্যর্থ-লক্ষ্য। (যদিও মূল 'গীতাঞ্জলি'র সব কবিতা ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে নেই)। তিনি বলেন যে নিঃসন্দেহভাবেই কবিতা নির্বাচনে (গীতাঞ্জলি, গীতালি ও গীতিমাল্য থেকে) রবীন্দ্রনাথ "সার্থক" হয়েছিলেন। কারণ তৎকালীন আগত যুদ্ধে সশঙ্ক পশ্চিমী বুর্জোয়া সমাজ এই ধর্মভাবসম্পন্ন কবিতায় অবলম্বন পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যত রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বা তাঁর দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় দুর্যোগাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপ সেদিন পায়নি। পূর্বে একজায়গায় বলেছি যে জ্ভাভিতেল সাহিত্য শুধু সাহিত্য হিসাবে বিচার করেন না ; তাই 'গীতিমাল্যে'র শিল্পগত মূল্যকে স্বীকার করেও, গ্রন্থটিকে উচ্চমূল্য দিতে পারেনি—কারণ এদের বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শ।

'গীতাঞ্জলি' থেকে 'বলাকা'য় উৎক্রান্তির ব্যাখ্যা হিসাবে দুশন জ্ভাভিতেল বের্গস কিংবা গীতিতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান না। সরাসরি জাগিয়েছেন যে সবার উপরে, নিঃসন্দেহভাবে, রবীন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠা তাঁকে ফিরিয়ে আনে স্বদেশ ও দেশবাসীর মাঝখানে। সৃজনাত্মক স্বাতন্ত্র্যে, বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আত্মমগ্ন হয়ে থাকার কবিস্বভাব রবীন্দ্রনাথের ছিল না। সুতরাং 'গীতাঞ্জলি, গীতালি', 'গীতিমাল্যে'র আধ্যাত্মিকতা থেকে কবি ফিরে এলেন বাস্তব জগতে, দেশের মাটিতে। ক্রমে প্রকাশিত হল 'চতুরঙ্গ' (১৯১৪), 'বলাকা' (১৯১৬) এবং 'পলাতকা' (১৯১৮)। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে "a more vigorous and radical" মনোভাব দেখা গেল। এই গল্পগুলিতে সরাসরি হিন্দুসমাজকেই সমালোচনা করা হল। ভারতীয় সাহিত্যে ও সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় critical realisim-এর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

এই সময়েই প্রকাশিত হল 'ঘরে বাইরে'। (যখন ভারতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের আকাঙ্ক্ষা শক্তিশালী হয়েছে)। এই উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্যে সন্দেহ প্রকাশ করলেও জ্ভাভিতেল এর

ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করেন। এ ছাড়া, এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৪), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), 'শোধবোধ', 'নটীর পূজা', 'চিরকুমার সভা', 'তপতী', 'পরিত্রাণ' এবং 'রথযাত্রা'। স্বাভাবতই জ্বাভিতেল 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' ও 'রথযাত্রা'কে (১৯৩২ সালে পরিবর্তিত 'কালের যাত্রা') মূল্য দিয়েছেন বেশি এবং তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী 'কালের যাত্রা'র মূল্য অপরিসীম। 'কালের যাত্রা' "One of the keys to the comprehension of Tagore's conception of the world and politics." আরও বলেছেন 'কালের যাত্রা'য় যে সমাজ ও তার শক্তি এবং শ্রেণীর যে চিত্র পাওয়া যায় সে চিত্র মুমূর্ষ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবচিত্র। আবহাওয়া সৃষ্টিতেও এই নাটক বাস্তবানুগ—পারস্পরিক অবিশ্বাস, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ সবকিছুই সততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

পরবর্তী দুটি প্রবন্ধে অর্থাৎ ১৯৩০ ও ১৯৩৮—'৪১—রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের এই অধ্যায়ের আলোচনায় দুশন জ্বাভিতেল আশ্চর্য মননশীলতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আবেগদীপ্ত গদ্যে ভারতীয় মহাকবির অতুলনীয় সাহিত্যকৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। নতুন দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের তীর্থযাত্রা—তাঁর উপর রাশিয়া ভ্রমণের প্রভাবের আলোচনা করেছেন। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ভ্রমণ তাঁর নতুন চিন্তাধারার উৎস হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অবশ্য "did not cause any radical change in Tagore's views nor did they shake his idealistic religio-philosophical conceptions." কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ "underwent clearly a discernable changes after visit to the Soviet union." জ্বাভিতেল-এর এই উক্তি সর্বদা স্মরণীয়। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত পদ্ধতি এবং ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের মৌল পার্থক্য বুঝতে পারলেন। স্বাভাবতই তিনি এই ফলাফলের তুলনা করলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ শাসনকে ঘৃণা করলেন। অন্যদিক থেকেও সোভিয়েত ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্ররচনাবলীর বিশতম খণ্ডে চারশ' তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায়। এছাড়া সোভিয়েত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় সম্পর্কে নতুন আশা, নতুন প্রত্যয় এনেছিল। এই আশাতেই রবীন্দ্রনাথ পুনরায় রাজনৈতিক কার্যাবলীতে উৎসাহ পেলেন। এবং বৃদ্ধ কবিকে দেখা গেল

হিজলী বন্দীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনুমেন্টের পাদদেশে বজ্রকণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয়ের-মুখে কবি এসে দাঁড়ালেন জনসাধারণের কাছে, দেশের মাঝখানে। এ প্রসঙ্গে জ্বাভিতেল 'বাঁশি' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। আধুনিক মহৎ শিল্পীর যে পথ হওয়া উচিত সে "রাস্তা মানুষের দিকে"।—আধুনিক মহত্তমশিল্পী রবীন্দ্রনাথও সেই পথেই নেমে এলেন। রাশিয়ার নতুন জীবন দেখে শুধুমাত্র চিন্তায় তীব্র পরিবর্তন এল না, প্রকাশেও দেখা গেল বিপ্লবী প্রচেষ্টা। সত্তর বৎসর বয়সে একান্ত নিজস্ব যুগান্তকারী উদ্ভাবনী শক্তিতে কবি গদ্যছন্দের প্রবর্তনা করলেন। লেখা হল 'পুনশ্চ'—সাধারণ মেয়ে এবং একজন লোক এই কাব্যগ্রন্থের চরিত্র। এই সাধারণ নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎ তাঁর লেখায় প্রায়ই পাওয়া যেতে লাগল। গুণগত পার্থক্য থাকলেও 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়', 'বাঁশরী' এবং 'চণ্ডালিকা'—'পুনশ্চ' যে প্রেরণায় লেখা হয়েছে সে প্রেরণারই সৃষ্টি।

১৯৩২-৩৩ সালে আন্তর্জাতিক আকাশে ঘনিয়ে এল দুর্যোগের মেঘ। এই সময় থেকে বারবার ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কৃত করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব অকস্মাৎ আসে নি। "It was only the logical culmination of the development of Tagore's political and philosophical conceptions that he, from the very beginning, did not hesitate to oppose fascism whose barbarous inhumanity and use of force was in direct contradiction to Tagore's deep humanism"—জ্বশন জ্বাভিতেল-এর এই উক্তি স্মরণীয়।

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হল 'পত্রপুট'। রবীন্দ্রনাথের "ইতিহাস সচেতনতা" প্রকাশ্যভাবে দেখা দিল। এবং আন্তর্জাতিক সমকালীন ঘটনা তাঁর কবিতায় প্রায়ই ছায়া ফেলতে শুরু করল। ১৯৩৭-এ কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিশ্বের দানবদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ক্লান্তিহীন। নাগিনীর নিঃশ্বাসের বায়ুকে ঝড়ে উড়িয়ে দেবার জন্য ডাক পাঠালেন ঘরে ঘরে, 'সেঁজুতি'র জন্মদিন (১ম) কবিতায়। রোগশয্যায় শুয়ে রাশিয়ার দানব প্রতিরোধের অদম্য ও তুলনাহীন প্রচেষ্টায় আনন্দে উদ্ভাসিত হলেন—সভ্যতার সংকটে স্পষ্টভাবেই তাঁর রাশিয়াপ্রীতির কথা জানালেন। এর পাশাপাশি শান্ত সাধারণ বাংলার

গ্রামজীবনের "চলন্তি ছবি" ধরা পড়ল তাঁর সাহিত্যে। এমন কী যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মধ্যেই মানুষের সব দুর্দশার শেষ বুঝেছিলেন তিনিই আশ্চর্য স্বচ্ছদৃষ্টিতে জানালেন যে তথাকথিত 'কালচার' অপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় অস্তিত্বরক্ষার্থে সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের। যার উপর সমাজের, জ্ঞানের উপরিতল বাঁচে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এই অধ্যায় সম্পর্কে, যে অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তা অতিক্রমের অদম্য প্রয়াস পান, আশ্চর্য সুন্দরভাবে বলেছেন দুশন জ্‌বাভিতেল। রবীন্দ্রনাথের প্রাণশক্তির অদম্যতায়, মানবতায়, মানুষের পক্ষে, সুন্দরের পক্ষে, প্রকৃতির পক্ষে ক্লান্তিহীন সংগ্রামে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ; বলেছেন, "তাঁর মৃত্যু, নীহাররঞ্জন রায় যেমন বলেছেন, ঐ বৃদ্ধ বয়সেও প্রকৃতপক্ষে অকালমৃত্যু।" কারণ শেষ জীবনের রচনাবলী পরিষ্কারভাবে দেখায় যে রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসাবে বৃদ্ধ হন নি। আশ্চর্য আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিতে তিনি শুধু সময় ও তার ক্ষিপ্রস্রোতের সঙ্গে সমান তালে চলেন নি, প্রায়ই বিভিন্ন দিকে "সময়কে ধরে এবং পিছনে" ফেলে গেছেন এবং এতেই, মায়াকভস্কি যা চমৎকারভাবে বলেছেন, "কবির শক্তি নির্ভর করে।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কী নিষ্ঠার সঙ্গে জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করেছেন। জ্‌বাভিতেল-কৃত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর আলোচনা করা হয় নি—এই প্রবন্ধ-আলোচনাতেও তিনি রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। জ্‌বাভিতেল-এর এই অসামান্য প্রবন্ধাবলীর আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার পূর্বে যে সামান্য আপত্তি আছে—সেটা জানিয়ে নিই।

রবীন্দ্রালোচনায় বিষ্ণু দের একটি উক্তি সর্বদা স্মরণীয়। সেখানে তিনি তাঁর অনবদ্য গদ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জানান, "যান্ত্রিক বামপন্থী ব্যাখ্যায় এই মহত্ত্বের মর্যাদা হয় না। বনেদী পরিবার, সামন্ততন্ত্র সমাজের অবশেষ ও বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থানশক্তির সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব এসব কথা তাঁর দুর্নিবার প্রতিভার নিঃসঙ্গ সৃষ্টির আবেগের আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। মহর্ষির প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের মানসও নিশ্চয় তাঁর প্রবল বিশ্বাসের মূলে ছিল, যার বলে সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর কাছে পরোক্ষ তত্ত্বমাত্র ছিল না, ছিল জীবনের উদারনীতির

সত্য। তবু তাঁর প্রাণময় রহস্য শেষ হয়ে যায় না।” এই উক্তি বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় সমালোচককুলেরই অবশ্য স্মর্তব্য। এবং জ্‌বাভিতেল ও মাঝে মাঝে এই কথা ভুলে গেছেন। বুর্জোয়া সংকীর্ণ মনকে রবীন্দ্রনাথ কাটিয়ে উঠেছেন একথা স্বীকার করেও তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধের কারণ স্বরূপ দেখেন "indefiniteness of class bias." সামন্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেও বুর্জোয়া সমাজের প্রতি আকর্ষণ পরে humanism ও genuine humanity-র জোরে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মনকে অতিক্রম—লেখকের মতে এই দ্বিবিধ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধ এসেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, যদিও কদাচিৎ, জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্র ব্যাখ্যায় সহজ পন্থা অবলম্বন করেছেন ও কিছুটা যান্ত্রিক। এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক-ছোটোগল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাসের আলোচনা করলেও জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রনাথের গানকে আলোচনায় আনেন নি। অথচ তাঁর গানে এমন বিশিষ্টতা আছে, যা সাহিত্যে বিরল। এখানে স্মরণীয় যে ইওরোপের ইতিহাসের মতো, সামন্ত-বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক যুগ-বিভাগকে ভারতবর্ষে সেভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়—কারণ এদের ইতিহাসে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান।

বাস্তবিক মাঝে মাঝে যে সমাজচিত্রণে নয়, ব্যর্থতার নৈঃসঙ্গ্যে বা যন্ত্রণার মুকুরে দেশ-কাল-সমাজ আরও স্পষ্টভাবে ছায়াপাত করে—এ-কথাটি দুশন জ্‌বাভিতেল আদপে আমলে আনেন নি। মহৎ শিল্পীর বিকাশ যে জটিল পন্থায় ঘটে একথা ভুলে যাবার দরুন ১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রসাহিত্যের দিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় তিনি শুধুই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দেখেন, রবীন্দ্র-মানসের কোনো খবরই রাখেন না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, ব্যক্তির নিজেকে অন্বেষণ—এসবের কোনো স্বতন্ত্র মূল্যই দেন না দুশন জ্‌বাভিতেল। তাই 'একটি আষাঢ়ে গল্প' বা 'তাসের দেশ' যে মর্যাদা পায় তাঁর কাছে, 'নষ্টনীড়' তা পায় না। অথচ 'নষ্টনীড়'-এর অসাধারণত্ব উদাসীন পাঠককেও মুগ্ধ করে। এই ঝোঁকের জন্য জ্‌বাভিতেল-এর এই অনবদ্য লেখা মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত বিড়ম্বনায় আক্রান্ত।

তাঁর এই বিড়ম্বনা প্রকট হয়েছে 'ডাকঘর', 'চতুরঙ্গ' ও 'যোগাযোগ' সম্পর্কে মন্তব্যে। 'ডাকঘর' সম্পর্কে তিনি লেখেন "the poet certainly also wanted to ridicule the medical "science" which tries to replace proper medical treatment by Sanskrit formulas and anxiously

protects the patient from fresh air and sun and yet, at last, he admits that the representative of the medicine was right—by the death of Amal who was killed by the interference of Thakurdada and the king's doctor." "বৃহত্তর ইতিহাসের নামে কল্পিত ছকে" ফেলতে গিয়ে কী অদ্ভুত উক্তিই না করে বসেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় 'ডাকঘর'-এর মূল বক্তব্য তাঁর বিচারে মর্যাদা পায় নি।

'চতুরঙ্গ' প্রসঙ্গে বললেন যে এর বিষয়বস্তু যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি সাহসিক। গ্রন্থের প্রথম পর্বে কোনো সন্দেহই নেই যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন তিনি কত মূল্য দেন মানবতাবাদী এথেইজমের। "But the sudden, also psychologically, rather improbable 'reformation' of sachis in second chapter considerably weakens the plot of the novel". "And so the work does not—and with Tagore cannot end in the victory of atheism over religion, does not put atheism higher than religion." আরও বলেন যে 'চতুরঙ্গ' "is a conflict between practical and active atheism and the two forms of Hinduism—orthodoxy and exalted Vishnuism." কিন্তু 'চতুরঙ্গ'-এর সমস্যা কী এই? শচীশের ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা, তার নিজেকে অন্বেষণ—এ সব-কিছুই মূল্যহীন মনে হল লেখকের কাছে। শ্রীবিলাসের সাধারণত্ব, উপন্যাসের শেষে দামিনীর সাধারণ সংসারেই ফিরে আসার ব্যঞ্জনা—সব কিছুই তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হল। নচেৎ 'চতুরঙ্গ' যে পৃথিবীর সাহিত্যেরই একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি একথা তিনি মানতেন।

শেষ পর্যন্ত জ্‌বাভিতেল 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'কে একাকার করলেন এবং মন্তব্য করলেন যে "both of these books are colourful though not particularly deep, pictures of the life of the well-to-do clasess of Bengali society." 'যোগাযোগ' সম্পর্কে এই উক্তি সকল রবীন্দ্র-পাঠকের কাছেই অগ্রাহ্য মনে হবে। কুমুর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মধুসূদনের সংঘাত, একটি জীবনের প্যাটার্নের সঙ্গে অন্য একটি প্যাটার্নের দ্বন্দ্ব, ভালোবাসতে চাইলেও যে ভালোবাসা যায় না তার আশ্চর্য চিত্র—সবই দুশন জ্‌বাভিতেল-এর চোখ এড়াল। এমন কী মধুসূদনের মধ্যে উঠতি অথচ পঙ্গু

বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর চিত্রও যে কী করে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল—বোঝা যায় না।

'গোরা' সম্পর্কেও মামুলী প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন "we have already mentioned the excessive space devoted to theoritical discussions which hold up the action. The worst fault in the conception of the novel is that Gora is liberated from the grip of orthodoxy without his own effort…" আশ্চর্য যে গোরার অস্থিরতা, তার যন্ত্রণা, তার জীবনের পরিহাস কিছুই লেখকের দৃষ্টিগোচর হল না। সর্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার মানবধর্মে উত্তরণ—সবই তাঁর চোখ এড়াল। বুঝলেন না, "গোরা, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দু'ধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে।"

নাটকের আলোচনাতেও, কদাচিৎ যদিও, একই বিড়ম্বনা। অবশ্যই 'কালের যাত্রা'র গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। কিন্তু নাট্যগত উৎকর্ষের আলোচনা ব্যতিরেকে 'কালের যাত্রা'কে শুধু ভাবাদর্শের, ধনতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব চিত্রণের (এটি যদিও মূল্যবান) কারণে 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা'র উপরে স্থান দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? 'পূরবী'র বৈশিষ্ট্য উপেক্ষায়ও একই নীতি কাজ করেছে।

বস্তুত শুদ্ধ সাহিত্যালোচনা যদিও সম্ভব নয়, তবু শুধু ভাবাদর্শের ব্যাখ্যায়, শুধু সমাজ বিশ্লেষণে—সাহিত্যকে বিচার করলে এই ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যের বিচার সাহিত্য হিসাবে—নচেৎ নিছক শুদ্ধতম জীবনদর্শন সম্বল করেও সাহিত্যে স্থায়ীকীর্তি অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় "শিল্প সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বিচার জটিল"—সেখানে কোনো প্রকার সরলীকরণই বিড়ম্বনাময়।

কিন্তু এহ বাহ্য। কারণ এই সামান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দুশন জ্‌বাভিতেল-এর আলোচনার মূল্য অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ও চিন্তার, দ্বন্দ্বময় অভিব্যক্তির, কবির নিজ সীমা সম্বন্ধে সচেতনতা ও তা অতিক্রমণের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় দুশন জ্‌বাভিতেল শুধু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজনই নন, শ্রদ্ধাভাজনও বটে। এছাড়া, এমন বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার সাধারণ মূল্যও

অপরিসীম। অনন্যসাধারণ স্বচ্ছদৃষ্টিতে জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন—সারাজীবনের বিরোধ কাটিয়ে শেষ জীবনে আশ্চর্য সমন্বয়-সাধনে আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে ওঠার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উপর এমন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের অশ্রুতপূর্ব মহত্ত্বের যথার্থ কারণ নির্দেশ আমাদের দেশেও দুর্লভ। সবশেষে, বর্তমান প্রবন্ধকার চমৎকৃত হয়েছেন দুশন জ্‌বাভিতেল-এর রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠের গভীরতায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আগ্রহে।

"Tagore became (দুশন জ্‌ভাভিতেল বলেন) the truly national poet of Bengal; when his best works have been made aceessible to the world in good translations—which has so far happened only in few cases—a desirable and much needed revision of the distorted 'western' conception of the great personality of world culture will follow. And towards the goal especially, this present work wishes to make a modest contribution."

এরপর দুশন জ্‌বাভিতেলকে জানাতে হয় অকুণ্ঠ অভিনন্দন। সমাজতান্ত্রিক দেশের এই মানুষটি বাঙালীকে শুধু তাঁর কাছেই ঋণী করলেন না, বাঁধলেন তাঁর দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে।

আশা করি, দুশন জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রনাথের উপর আরও লিখবেন—ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায়, তাঁর নিজের ভাষা চেক-এ।

পুস্তক পরিচয়

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ভবতোষ দত্ত। জিজ্ঞাসা। ছয় টাকা ॥

এ তথ্য স্বীকার্য বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানস নিয়ে আলোচনা যত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে তাঁর মননশীলতার দিকটি তেমনভাবে আলোচিত হয় নি। বঙ্কিম শুধু artist ছিলেন না, thinkerও ছিলেন একথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু পরিশ্রম করে অধ্যয়ন করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণারও শেষ নেই সেজন্য। রক্ষণশীল, সনাতনী, প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রভৃতি বিশেষণও বঙ্কিমের নামের সঙ্গে অনেকে সংযুক্ত করে থাকেন। বলা বাহুল্য তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশের পটভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেন নি এবং ঐ শতকের অন্যান্য চিন্তাশীল মনীষীদের রচনার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে বঙ্কিমের যথার্থ মূল্য নিরূপণে অগ্রসর হন নি। অবশ্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, গোপাল হালদার, রমেশচন্দ্র বসু প্রভৃতি লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতার প্রসঙ্গ নিয়ে ভালো আলোচনা করেছেন। শ্রীভবতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' এই ধারার বই এবং সেজন্য লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ।

বইখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সাতটি প্রবন্ধ আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মননসাধনার অনুবর্তী হিসাবে বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার পর্যালোচনা পরিশিষ্টরূপে গ্রথিত হয়েছে। লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে রামমোহন ও 'ইয়ংবেঙ্গল'দের যুগে, যে-মননচর্চা ও সমাজচিন্তা লক্ষিত হয় ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও মননধর্মে তারই সুপরিণত প্রতিষ্ঠা। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে রামমোহন, ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির চিন্তায় ও রচনায় মননচর্চা, সমাজচিন্তা, বিজ্ঞানসেবা, পুরাতত্ত্বানুশীলন যে-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে নবজাগরণের তথা যুক্তিধর্মিতার যুগ বলে আখ্যাত

করা অনৈতিহাসিক নয়। পরলোকের চেয়ে ইহলোক, আধ্যাত্মিক-পন্থার চেয়ে বুদ্ধি ও যুক্তিপন্থা, তথাকথিত পুণ্যার্জনের চেয়ে মস্তিষ্ক, পেশী ও হৃদয়-বৃত্তির সামঞ্জস্যসাধন, দেবস্তুতি অপেক্ষা নরকল্যাণ—এর সবই রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় নানাভাবে দেখা দিয়েছে। 'বঙ্কিমযুগের মননসাধনা' অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গগুলো আলোচিত হয়েছে। লেখক পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ শশধর-কৃষ্ণপ্রসন্ন-রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের শ্রেণীভুক্ত নন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবেই ঈশ্বরানুগত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস থেকে মুক্ত।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-নায়কদের কথা মনে আসে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থের নাম-পত্রে আচার্য সীলির উক্তি উৎকলিত হয়েছে। সীলি (১৮৩৪—১৮৯৫) বঙ্কিমচন্দ্রের সমজীবী। তাঁর Ecce Homo (১৮৬৩) বঙ্কিমচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল, সীলি-র Natural Religionও (১০৮২) বঙ্কিমচন্দ্রের অনধীত ছিল না। সীলি খ্রীষ্টকে 'মানব' হিসাবেই দেখেছেন যেমন বঙ্কিমচন্দ্র দেখতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। সীলি ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি কিন্তু তিনিও তার Natural Religionকে সকল অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে দেখেছেন। সীলি 'কালচার'কে (বঙ্কিমের ভাষায় 'অনুশীলন') ধর্মের ফলস্বরূপ বলে মনে করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনেকটা সে-পথে গিয়ে গীতার কর্মযোগকে মুখ্যত গ্রহণ করেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের শিক্ষাদান-নীতি তার নিদর্শন। শুধু সীলির রচনা নয়, কোম্‌তে, হিউম্‌, বেন্থাম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, স্পেন্সর প্রভৃতির রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। কোম্‌তের মত একদা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। ইংলণ্ডে positivist গোষ্ঠী যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জর্জ হেনরি লিউয়েস, জর্জ এলিয়ট, হ্যারিয়েট মার্টিন্যু এবং রিচার্ড কনগ্রিভের নাম উল্লেখযোগ্য। কোম্‌তের মতবাদই ইংলণ্ডে ১৮৩৭ থেকে প্রচারিত হতে থাকে। তাঁর 'Cours de Philosophic positive' ১৮৪২-এ সমাপ্ত হয়। ক্যাথলিক-পন্থী ঈশ্বরতত্ত্বের পরিবর্তে কোম্‌তে মানবতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশেও উনবিংশ শতকে অনেকে পজিটিভিষ্ট ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। মিলের সঙ্গে কোমতের মতৈক্য, পরে মতানৈক্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে সমষ্টিবাদ ও ব্যষ্টিবাদের সামঞ্জস্যসাধন প্রচেষ্টা,

লেখক যথোপযুক্ত তথ্য দ্বারা বিবৃত করেছেন তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' প্রবন্ধে। অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের অনিবার্য পরিণতি লার্মার্ক, ডারউইন, স্পেনসার, ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির রচনায়। হর্বার্ট স্পেনসার অভিব্যক্তিবাদ বা evolution-কে মনে করতেন "the law of the continuous redistribution of matter and motion"। তিনি পূর্বেই লার্মার্কের মতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং ডারউইনের 'origin of species' (১৮৫৯) প্রকাশিত হবার পর তাঁর মতামত আরও সুস্পষ্ট হয়। স্পেনসারের Synthetic Philosophy পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবহারবিজ্ঞান—সর্বক্ষেত্রেই তিনি অভিব্যক্তিবাদের তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। তিনিও 'সামঞ্জস্যবাদ'-এর পক্ষপাতী। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে স্পেনসার-পন্থার বিরোধ নেই। কোম্‌তের রচনাতেই তিনি অবশ্য প্রথম তাঁর 'অনুশীলন' তত্ত্বের সূত্র পান। পরে বিভিন্ন পাশ্চাত্যমনীষীর রচনা ও ভগবদ্‌গীতার দ্বারা তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট 'জীবনাদর্শ' রূপে গড়ে ওঠে, যার সঙ্গে ঈশ্বর, পরলোক, আধ্যাত্মিক মার্গের সংযোগ নেই। ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ইংলণ্ডে 'স্কটিশস্কুল'-এর প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে 'ইউটিলিটারিয়ান'দের প্রতিষ্ঠা ঘটে। জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮–১৮৩২) এই মতাদর্শের প্রবক্তা এবং তারপর জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) তাঁর ধারাকে চালিয়ে নিয়ে যান। বেন্থাম যদিচ ঊনবিংশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু তাঁর চিন্তা ও ধারণায় তিনি অষ্টাদশ-শতকের Age of Reason-এর মানুষ। রামমোহন রায় বেন্থামের কল্যাণবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও বেন্থামের মতাদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' প্রবন্ধে স্বাভাবিক কারণেই লেখক ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতকে ধর্মকে নবরূপে গড়বার প্রচেষ্টাগুলির উল্লেখ করেছেন। কার্ডিনাল নিউম্যানের 'Oxford Movement' এই প্রচেষ্টারই ফল। কার্ডিনাল নিউম্যান (১৮০১-৯০)-এর অক্সফোর্ড মুভমেণ্ট ১৮৩৩ থেকে শুরু হয়। তাঁর আন্দোলন, অষ্টাদশ শতকের 'র‍্যাশনালিজম' অর্থাৎ নির্মোহ যুক্তি ও বুদ্ধিগত বিচারপ্রবণতার বিরুদ্ধে—সমালোচক লিখেছেন "but he used reason to maintain beliefs"। বঙ্কিমচন্দ্র আবেগপ্রবণ-ভক্তিবাদকে স্বীকার করেননি, কেশবচন্দ্র সেনের চিন্তার মহিমা স্বীকার করলেও তাঁর সংকীর্তন, প্রত্যাদেশ, নরপূজা প্রভৃতিকে পরিহার করেছেন। অষ্টাদশ শতকীয় মন যেমনভাবে নিউম্যানের "ক্যাথলিক

প্রতিক্রিয়া"কে (Catholic Reaction) স্বীকার করতেই পারে না তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ঐ জাতীয় আবেগাত্মক ধর্মমতে সমর্থন বা আস্থা স্থাপন কোনোটিই সম্ভব ছিল না। লেখক বঙ্কিমমানসের এই দিকটি পূর্বোক্ত অধ্যায় দুটিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত রমেশচন্দ্র বসুর আলোচনাগুলি এই সূত্রে মনে পড়ে।

পরের প্রবন্ধটি 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারত সংস্কৃতি'। ভারত-সংস্কৃতি চর্চা নবজাগরণের অন্যতম উজ্জ্বল লক্ষণ এবং সেই চর্চার সূত্রপাতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের দান অগ্রগণ্য। কিন্তু নবজাগরণের আলোকপায়ী জাতি সর্বদেশেই স্বদেশের শাস্ত্র ও পুরাবৃত্তের নবব্যাখ্যা ও আবিষ্কারে উৎসাহী হয়ে থাকে। বাংলাদেশে তার ব্যতিক্রম হয়নি। রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বিদ্যাসাগর সকলেই এ-বিষয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের ঐতিহ্যকে বরণ করে নিয়ে, তাঁদের চিন্তার অংশভাক্ হয়ে ভারতীয় ইতিহাস, জনতত্ত্ব, সাহিত্য—সর্ববিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। ইংলণ্ডে উনবিংশ শতকে একই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। নবীনচন্দ্রকে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিতে ভারতীয় ইতিহাসের যে খসড়া পরিকল্পনার সন্ধান মেলে, তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আধুনিক' ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয়স্বরূপে স্বীকার করতে হবে। শুধু ইতিহাস রচনা নয় ভারতীয় সংস্কৃতির নবব্যাখ্যা, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীপ্ত মানবপন্থী ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারই নিদর্শন। সেজন্য বুদ্ধদেবকে তিনি আদর্শ মানব হিসাবে না দেখে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানবরূপে ঘোষণা করেছিলেন। কেননা বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী। কিন্তু সংসারে থেকে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সামঞ্জস্যসাধনে পূর্ণ মানবতার প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ।

'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধদুটি সুলিখিত। পরিশিষ্টের প্রবন্ধদ্বয় বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আলোচনাও তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিসিদ্ধ। বাংলার রেনেসাঁস বা নবযুগের বাংলা সম্পর্কিত রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রের ঐতিহাসিক দৃষ্টির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সমন্বিত বোধের দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই দৃষ্টি ছিল। তবে বিপিনচন্দ্র পালের মধ্যে বাঙালী chauvinism বহু ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল এবং ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে তিনি গ্রথিত করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্যে উনবিংশ শতকে অনুরূপ ঘটনা দেখা গেছে। কাজেই বিপিনচন্দ্র সর্বক্ষেত্রেই যুক্তি ও বিচারবোধের

দ্বারা চালিত হয়েছিলেন একথা স্বীকার করা দুরূহ। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নবজাগরণ-চেতনাও revivalism থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' (১৮৬৪-১৯১৯) উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগের বহুমুখী চিন্তাধারাকে নিজের মধ্যে সংহত করতে পেরেছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় কি করে ঘটানো যায় তিনি সেকথা পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর কোনও বিষয়ে খুব নতুন কথা বলেছেন বলা যায় না। তবে বোধ করি তিনিই প্রথম ডারউইন, বিশেষত হার্বার্ট স্পেনসারের synthetic philosophyর পন্থায় সৌন্দর্যতত্ত্ব, সুখদুঃখতত্ত্ব—সর্বক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদ প্রয়োগের প্রয়াস পান। 'কর্মকথা'র প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থাকেই অনুসরণ করেছেন। লেখক রামেন্দ্রসুন্দরের বিভিন্ন রচনা থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। শ্রীভবতোষ দত্ত ভাবাবেগ, পূর্ব-সংস্কার বা অন্ধমোহ নিয়ে প্রবন্ধগুলি রচনা করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের তথা তাঁর অনুবর্তীদের মননশীল দৃষ্টি ও সামাজিক চেতনা সম্পর্কে প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই তিনি করেছেন। এই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই উনবিংশ শতকের বাঙালীর মনঃপ্রকর্ষের বিভিন্ন দিক তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কাজেই বইখানি শুধু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি বহন করছে না, গোটা উনবিংশ শতকের চিন্তাজগতের সমালোচনাই এখানে করা হয়েছে। সেদিক থেকে বইখানির অতিরিক্ত মূল্য রয়েছে। শিক্ষিত সমাজ এই বইখানি পড়বেন এই আশা নিয়ে আলোচনাটি শেষ করা হল।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

একসূত্রে গাঁথা : ভারতীয় বারোটি ভাষার গল্প ॥ অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্‌। গ্রন্থবিহার। তিন টাকা ॥

বর্তমানে যখন ভারতের ঐক্য নানা কারণে বিপর্যস্ত, বিশেষ করে ভাষার প্রশ্নে আমাদের মনে যখন উষ্মা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, তখন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মুখ্য ভাষাগুলির সাহিত্যিক নিদর্শন যদি একই প্রচ্ছদে গ্রথিত হয়, তবে সে-প্রচেষ্টার সৎ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিমত

হওয়া অসম্ভব। বোম্মানা বিশ্বনাথম্ বারোটি ভাষার ছোটগল্পের অনুবাদ একসূত্রে গেঁথে বাঙালী পাঠক সমাজে পরিবেশন করেছেন, এজন্য তিনি অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথম্ যে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন, তার সবগুলির মান সমান উন্নত বলে মনে হয় না। অনুবাদক আটটি ভারতীয় ভাষা জানেন, অতএব তাঁর কাছে আরও অনুসন্ধান ও পরিশ্রম দাবি করি। অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যিক অগ্রগতির স্বাক্ষর বিদ্যমান, একথা প্রমাণ করাই বোধহয় অনুবাদকের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি এই দুর্লভ ভাষাজ্ঞান ও ভারতবর্ষীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগের পরিচয় দিয়েছেন। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এবং অন্য গ্রন্থে তিনি ভারতীয় ভাষাগুলির শ্রেষ্ঠ ফসলের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। অবশ্যই বর্তমান গ্রন্থ পাঠকসাধারণকে সে কাজে অনেকখানি সাহায্য করবে।

ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা ॥ চিত্ত ভট্টাচার্য। ফ্রেণ্ডস বুক ক্লাব। আড়াই টাকা॥

'ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা' বোধহয় চিত্ত ভট্টাচার্য-র প্রথম গল্প সংকলন। মাত্র দশটি গল্প একত্রিত করে একটি ছোট্ট ভূমিকা সহযোগে লেখক আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা', 'অতনুবোসের কাহিনী', 'স্মৃতি গন্ধা' গল্পগুলিতে মিষ্টি হাতের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই গল্পগুলি তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে। কিন্তু অবশিষ্ট গল্পগুলি খানিকটা গতানুগতিক এবং অনেক সময় দ্রুত লেখার জন্যেই হয়তো কয়েকটি গল্প নকশার স্তর পেরোতে পারে নি। গল্প শুধু গল্পের জন্য লেখা হয় না, সেই গল্পে জীবনের তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলাই সাহিত্যিক-কর্তব্য। অত্যন্ত আশার কথা প্রথম গ্রন্থেই লেখক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ রচনা সাগ্রহে পাঠ করব।

যান্ত্রিক ॥ অঞ্জনকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ। দু টাকা॥

'যান্ত্রিক' লেখকের প্রথম পুস্তক। কিন্তু গ্রন্থটি রম্যরচনা, গল্প, না রিপোর্টাজ? প্রশ্নটির সমাধান দুরূহ। অতএব 'যান্ত্রিক' একটি গ্রন্থ—এই নামে অভিহিত

করাই ভালো। লেখক লেখাগুলি বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন, তার মধ্যে কিছু হারিয়েছে, কিছু বা তিনি স্বেচ্ছায় ছিঁড়ে ফেলেছেন। বস্তুত লিখলেই যে ছাপতে হবে এবং ছাপলেই যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু ভূমিকায় প্রকাশ অঞ্জনবাবু অনেক চিন্তা করে লেখাগুলি প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিন্তার প্রতি সর্বত্র সায় না থাকলেও আমরা তাঁর উদ্যমের প্রশংসা করি।

কার্তিক লাহিড়ী

ভারততীর্থ (প্রথম তরঙ্গ) ॥ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিচিত্রা। দু টাকা ॥

"আমরা পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকপুঙ্গব সংখ্যায় এগারো। আমাদের উদ্দেশ্য মাদ্রাজে অনুষ্ঠেয় নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান এবং তৎসহ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। এক ঢিলে দুই পাখি।" শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের আত্মপরিচয় এবং অভিপ্রায় তাঁর 'ভারততীর্থ' গ্রন্থের সূচনাতেই এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবে উক্তিটির শেষাংশ সামান্য সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য দুটির বদলে তিনটি পাখি মেরেছেন: শেষ পাখিটি হচ্ছে—একটি বই লেখা। অর্থাৎ ভ্রমণ কাহিনী রচনা। এখন বিচার্য, ভ্রমণকাহিনীর পাখিটি কেমন।

ভ্রমণকাহিনীর মানে কি? ভ্রমণের কাহিনী, না ভ্রমণকেই কাহিনীর মতো চিত্তাকর্ষক করে তোলা? প্রথমটি সহজসাধ্য, শেষেরটি দক্ষ কলমের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লান্তিকর অর্থাৎ পাঠযোগ্য নয় অর্থাৎ কতগুলি ভূগোল আর ইতিহাসের বাসি তথ্যের সমাহার, যা লেখা নিতান্তই পণ্ডশ্রম, কেননা এই ধরণের তথ্য অনেকেরই জানা এবং বিশেষ করে, এর জন্যে সরকারী টুরিজিম্ বিভাগ তৈরি হয়েছে। অপিচ, এই ধরণের লেখায় প্রায়ই নানান ছবি থাকে: ঘোড়ায় চড়া লেখকের ছবি, পাহাড়-মন্দির-জলপ্রপাত এবং উপজাতি-সুন্দরী মেয়ে, লোকনৃত্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি সুখপাঠ্য, তথ্য ভারাক্রান্ত না হয়ে লেখকের সরস দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংবেদনায় রচনাটি অভিষিক্ত এবং তাই সাহিত্যের স্তরে উন্নয়নযোগ্য। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য, সম্ভবত, 'ভ্রমণকাহিনী'র চরিত্র সম্বন্ধে সংশয়ী; তাই তাঁর 'ভারততীর্থ'তে সদ্যোকথিত দুটি ধারারই, সমন্বয় নয়, সমান্তরাল প্রকাশ ঘটেছে। সমন্বয়

হলে অবশ্য ভালোই হত: তথ্যগুলো সাহিত্যরসসম্পৃক্ত হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয় নি; সুন্দর বর্ণনা পড়ে চলেছি, বেশ দু এক আঁচড়ে চরিত্র তৈরি করার ক্ষমতার পরিচয় পাচ্ছি লেখকের, এমন সময় অতর্কিতে "ফরফর করে উড়ে গেল ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা!" ইতিহাস শুধু নয়, লোক-কাহিনীরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বিশেষত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণাংশে। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা এই অংশে বিবৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, যেখানেই লেখকের কলম চরিত্রচিত্রণ আর ব্যক্তিগত সরস অভিজ্ঞতার রূপায়ণে মুখর হয়েছে, সেখানেই আমরা আকৃষ্ট হতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেরালা পর্বটির উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশটির নাম 'পঞ্চনদের তীরে।' তুলনায় এই অংশটিই সুলিখিত অর্থাৎ ইতিহাস-ভূগোলের অত্যাচার থেকে লেখক আমাদের রেহাই দিয়ে কেবলমাত্র পরিশুদ্ধ সরসতায় প্রচ্ছন্ন কয়েকটি পৃষ্ঠা উপহার দিয়েছেন। সেখানে মানুষই তাঁর বিষয়, তার আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ভ্রমণ-কাহিনীও কথা সাহিত্যের মতো সেখানেই শিল্পায়ত হয় যেখানে তার উপজীব্য দেশকালবিধৃত মানুষ। দেশ-কালকে তুচ্ছ করার প্রশ্নই উঠছে না, কিন্তু মানুষের কথা বিস্মৃত হলে রচনা সাহিত্যিক কৌলীন্য অর্জন করতে পারে না। সুতরাং ইতিহাস-ভূগোলের ভূমিকা ঠিক ততখানিই স্বীকার্য যতখানি তারা মানুষকে গড়ে তোলার পক্ষে সহকারী। পাঞ্জাব-ভ্রমণ লিপিবদ্ধ করার সময়ে লেখক জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এই উক্তিটিকেই মেনে নিয়েছেন মনে হয়। লেখকের ভাষার সাবলীলতা কিছু কিছু অংশে কাঁচা কবিত্বে ব্যাহত হলেও প্রশংসার্হ। এবং এইজন্যেই বইখানি শেষ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। 'ভারততীর্থ'-র দ্বিতীয় তরঙ্গে কি কি থাকবে জানতে ইচ্ছা করি।

শিবশম্ভু পাল

ডকশ্রমিকদের জীবন-গাথা

বার্ণিক রায়

সান মার্টিন শহরে সমুদ্রের উপকূলে জয়েস নামে একটি নিগ্রো মেয়ে এল ওয়েল্ডারের কাজ শিখতে। এই মেয়েটির জীবনকে কেন্দ্র করে আলেকসান্দর স্যাক্সটন আমেরিকার ডক অঞ্চলের শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার একটি রসঘন বর্ণাঢ্য চিত্ররচনা করেছেন তাঁর উপন্যাস Bright web in the Darkness-এ।*

জয়েস দিনে কাজ করে, রাত্রে ক্লাশ করে। ভবিষ্যতে আশা আছে যে স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। এখানে নিগ্রোর কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকানদের শ্বেতবর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। আমেরিকান দুহিতা স্যালিও নিজের স্বাধীন জীবিকা বেছে নিতে রাত্রির এই ক্লাশে যোগদান করেছে, হোটেলের ওয়েট্রেসের চাকরির চেয়ে নিজে খেটে খাওয়া অনেক ভাল। জয়েস থাকে তারই পরিচিত হেণ্ডারসনের বাড়িতে। একা রাত্রিতে ঘুমের আগে, সকালে ঘুম ভাঙার পর চিন্তা করে মায়ের কথা, তার বাবার কথা। মনে পড়ে তার ফেলে আসা নেভেদার সিগন্যাল স্প্রিংগসের গ্রামের কথা। এমনি ভাবেই দিন এগিয়ে যায়। কাজ শিখে অনিশ্চয়তার মধ্যে চাকরিতে যোগদান করে। কাজ করতে করতেই স্যালির সঙ্গে টমের প্রেম ও পরিণয় হয়, জয়েসের সঙ্গে সমুদ্র নাবিক চিত্রশিল্পী চার্লির পরিচয়ে দুয়ের হৃদয়বৃন্তে প্রেমের রক্ত-গোলাপ উঁকি মেরে যায়। চার্লির বিবাহে সম্মতি থাকা সত্ত্বেও অপরিচিতকে হঠাৎ নিজের করে নিতে পারে না। তার যন্ত্রসংগীত পিয়ানোর সুরে সারা অঙ্গে বিহ্বল সুর জাগিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যে সমুদ্র নাবিক সমুদ্রের দুস্তর দূরত্বের অভিযানের মধ্যে নিজের মনপ্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করে দিয়েছে, তার মধ্যে কোথায় যেন একটা ভয়, একটা আশঙ্কা জড়িয়ে থাকে। আর চার্লি

* Bright web in the Darkness. Alexander Saxton. Seven Seas. Distributors: National Book Agency (Private) Ltd. Calcutta-12. Rs. 2.

শিল্পী। সে অসুস্থ, হসপিটাল থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। এই তো সামান্য পরিচয়।

নীচেরতলার মানুষের মধ্যে মানুষের জাতিভেদ বর্ণভেদ নেই বটে, কেন না তারা একই অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু উপরিতলার মানুষের মধ্যে ভেদ আছে। শুধু নীচেরতলার মানুষের আর্থিক শোষণই শেষ কথা নয়। আমেরিকার দুরপেনয় শ্বেত ও কৃষ্ণের বৈষম্যের মধ্যে ভেদ জাগিয়ে তাদের শোষণনীতিকে জাগ্রত করে তুলছে। বলতে গেলে তাদের য়ুনিয়ন নেই। একটা সামান্য (auxiliary) আছে। তাতেও তাদের সভা ডাকার কোনো অধিকার নেই। ওয়েল্ডারের শিল্প ও কর্মনিপুণতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ কাজ তারা পায় না। বাইরে কোনো বিভেদ নেই, অন্তরমূলে এই বিভেদের বিষবীজ চতুর্দিকে বিষাক্ত মহীরুহ সৃষ্টি করে তুলছে। যে কয়েকটি নিগ্রো শ্রমিক আছে, তারা তাদের কৃষ্ণবর্ণত্বের অভিশাপে এই জ্বালা সর্বক্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না। এই নির্বাক নিস্তব্ধ অন্তর্জ্বালার মধ্যে তারা অন্য সকলের থেকে পৃথক হয়ে আছে। এই শোষণ ও শাসনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে মালিকেরা, তাদের আমোদবিলাস নারী মদ নিয়ে, তাদের নারীরা মগ্ন হয়ে আছে হলিউডের নৃত্যের উন্মাদনায়। মালিক স্টোনের পত্নী সিল্‌ভিয়ার সমগ্র জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে হলিউডের নৃত্যে যোগদান করতে পারেনি বলে। অবসরে জুয়োখেলাই হল মালিকদের একমাত্র নেশা ও অবসরবিনোদন। সমাজের সঙ্গেই এটা অঙ্গীভূত। স্টোনের অংশীদারেরাও তাদের স্বার্থের জন্যে স্টোনের পুত্রকে ব্যবহার করতে চাইছে আসন্ন নির্বাচনে। এদের গর্ব হল এরা শিক্ষা পায়নি, কিন্তু শিক্ষিতদের অনায়াসে তাদের তাঁবে আনতে পারে। মাঝে মাঝে তারা যে অভিসন্ধির জাল রচনা করে, তাতে শ্রমিকদের কেউ কেউ ধরা পড়ে। শ্রমিক য়ুনিয়নে যোগদান করে যাতে নিগ্রোরা উন্নতির কোনো পথ না করতে পারে, তার জন্যে লোভ দেখায়। স্যালির প্রণয়ী টম্‌ নিগ্রোদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণ। বাণিজ্য জাহাজের কর্মচারী টমের জাহাজ যেদিন টর্পীডোতে আয়ার্ল্যাণ্ডের কূলে ধ্বংস হয়ে গেল, নানাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিদেশী লোকদের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, সে সময় সে সংবাদ পেল একটি নিগ্রো মেয়ে স্যালির ঘরে একত্র থাকে, এতে তার মনে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। নানাদেশ ঘুরে, নানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, স্পেন ভাষা সম্বন্ধে সামান্য

জ্ঞান নিয়ে যখন ফিরে এল তখন ডকে জাহাজ তৈরির কারখানায় প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিগ্রোদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা দেখা দিয়েছে, তারা সমান অধিকার চায়, তাদের দলভুক্ত করে নেবার জন্যে সংগ্রাম করতে চায়। স্যালি আগামী য়ুনিয়নের সভায় এই ঐকতার জন্যে ভাষণ তৈরি করছে। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ এক অধিকার পাবে। স্যালির এই চেতনায় টম অসন্তুষ্ট হয়েছে এবং যখন স্টোন তাকে প্রলোভন দেখিয়ে টমের ল পড়ার ইচ্ছাকে উস্‌কে দিয়েছে, তখন স্যালির এই মনোভাবের বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ করেছে। কি দরকার এসব করবার নিজের উন্নতিকে আত্মবলি দিয়ে। তাই স্ত্রীকে ত্যাগ করে রাত্রেই চলে গেছে সে।

দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনে জয়েসের মনে নানাভাবের আলোড়ন ঘটে যায়। চার্লির কথা মনে করে তার যৌবন হৃদয়ে ব্যাকুল সুরভি ছড়াতে থাকে। মাঝে মাঝে মনে ব্যথা ও অনুতাপ জাগে, চার্লির সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিলেই ভালো হত। টম ও স্যালির দাম্পত্যজীবন দেখে, স্যালির উন্নত যৌবনের বুকে প্রেমের পরিণত রূপ দেখে, জয়েসের মনে আসঙ্গলিপ্সা, ঘর বাঁধবার দুর্বার পরিকল্পনা ব্যথা জাগাতে থাকে। সাদা দেহের ওপরে লাল দাগগুলি স্যালির মনে পূর্ণরূপ দেখে মনের কোণে এক দুর্বার ঈর্ষা জাগাতে থাকে। সমুদ্র উপকূলের প্রকৃতির মধ্যে, চারিদিকের নির্জন নিসর্গের মধ্যে জয়েস তার নির্জন মনের সঙ্গী খোঁজে। এই সময়েই খবর এল চার্লি হাসপাতালে মারা যাচ্ছে। এমনি করেই তার প্রেমের বৃন্ত ঝরে গেল।

নিগ্রো শ্রমিকেরা অধিকার চায়, কিন্তু মালিক বা শ্বেতাঙ্গরা তা দিতে চায় না। তাদের এই অধিকারের দাবি স্থানীয় কোর্টে উঠল, কিন্তু কোর্ট রায় দিল মালিকদের পক্ষে। বিজয়ীপক্ষ যে প্রকারেই হোক বিজিতদের দমন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল। প্রেমিকের মৃত্যুতে, হঠাৎ মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে জয়েসের মনে ঔদাসীন্য হয়তো এসেছিল কিছু কাজে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রায় এল এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যে তার চাকরি যাবে। পনেরো দিন দেখা হবে সে ভালোভাবে কাজ করে কিনা, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। স্বার্থপর অশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরা তাদের পরাজয়ে অকথ্য ব্যবহার আরম্ভ করে।

এমনি হতাশার মধ্যেই দিন যায়। কিন্তু পূজ্যপাদ বীজিলি তাদের অধিকারের দাবি সুপ্রীম কোর্টে উপস্থাপিত করে, Negro Improvement

League এখানেই জয়লাভ করে। অন্ধকার হতাশ্বাসের বুকে আশার ঊষা আলোকিত হয়ে উঠল। প্রেমিকের মৃত্যুর বিষণ্ণতা, জাতীয়তার আশান্বিত বিজয়ের আনন্দ, তার পিয়ানোতে অপূর্ব মূর্ছনা সৃষ্টি করল। এই বিজয়সভার আহ্বানে তার পিয়ানো এমিলি ডিকিনসনের বাণীকেই মূর্ত করে তুলল :

What fortitude the human soul
That it can thus endure
The accent of a coming foot,
The opening of a door……

তার হৃদয়ের বোঝা হালকা হয়ে গেল।

অদৃষ্টের ক্রূর নিয়তি মানুষের ছলনাকে কিভাবে পরাস্ত করে অদ্ভুত লীলা দেখায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মালিক স্টোনের চরিত্রে। সে তার স্ত্রীকে পায় নি, একমাত্র পুত্রও তাকে ছেড়ে গেছে। এই বিপুল অর্থের মধ্যেও সে একা, কিন্তু চরিত্রগত ছলনা, কপট অভিনয় শোষণ, বর্ণবৈষম্যকে সে সজাগ করে রেখেছে। স্ত্রী সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে পার্বত্য পথে মোটরে যেতে যেতে একদিন দুর্ঘটনায় স্ত্রীকে হারাল, নিজে অঙ্গ ভেঙে হাসপাতালে পড়ে রইল। এবং কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। তার সমগ্র প্রচেষ্টাই যেন একটা শূন্যের লীলাখেলা।

উপন্যাসটির কেন্দ্রবৃত্ত জয়েসকে ঘিরে। জয়েসের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, তার জাতির উন্নতি আকাংক্ষা এবং তাকে ঘিরেই সমগ্র শ্রমিক সমাজ সুন্দর-ভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। তার চরিত্রের পাশেই সমান্তরালভাবে স্যালির চরিত্র আঁকা হয়েছে। স্যালি বিবাহিত জীবনে টমের ঔরসে তার গর্ভে সন্তান ধারণ করতে চায়। তার অবচেতন মনে মাতৃত্বের আকাঙ্খা তাকে ব্যাকুল করে তোলে। অর্থের জন্যে টম অসম্মতি জানালেও সে নিজে সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে চেয়েছে। টমের এই ব্যবহারে সে মনের মধ্যে ব্যথা পেয়েছে। স্যালির এই দাম্পত্যজীবনের রূপটাই বারংবার কল্পনা করে জয়েস তার যুগলজীবনের আশাকে উদ্দীপিত করে রেখেছে। মাঝে মাঝে ঈর্ষাও জেগেছে। এদের কথা ভেবেই প্রকৃতির ছায়াঘেরা নির্জনে একাকী পথ ঘুরেছে। কিন্তু ব্যর্থপ্রেমে, হতাশ আঘাতে, মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে তার জীবন চূর্ণ হয়ে গেছে। একমাত্র গানের মধ্যেই সে সুর

খুঁজে পেয়েছে। বাস্তবজীবনের হতাশা সুরের আনন্দে পূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু জীবনের এক দুর্ঘট মুহূর্তে অনন্ত গ্লানির বীভৎসতায় তার সহকর্মী ক্রকসের অন্তর্জ্বালার সময়ে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। এই মানবপ্রীতির ভালবাসায় তার চিত্ত মিলনআনন্দে পূর্ণতর হয়েছে। জীবনের হতাশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে মানবপ্রেমে জয়েসের এই আত্মদান পরিপূর্ণ মানবিক। মনের অন্ধকোণে ব্যথার সাগরের নরম ঢেউ ভাঙলেও জীবনের ক্ষেত্রে এর আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য।

উপন্যাসটি তিনটি শ্রেণীর মানুষের চরিত্রচিত্রণে একটা ব্যাপ্তি এনেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষের বুকের ওপর যে শোষণনীতি চালিয়ে গেছে, বিভেদনীতি উস্‌কে রেখে বৈষম্যকে জাগিয়ে রেখেছে, তারই দৃষ্টান্ত আমেরিকান মালিক স্টোন ও তার সহকর্মীদের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসটির গুণাগুণ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় বইটি সুখপাঠ্য নয়। চরিত্রগুলি অনেকস্থলেই টাইপে পর্যবসিত হয়েছে। ঘটনায় প্রত্যক্ষতা অত্যন্ত স্বল্প, চিন্তা ও ভাষণই বেশি। জয়েসের চরিত্রই আমাদের মনকে বেশি আন্দোলিত করে, স্যালির মাতৃত্ববাসনা সার্বজনীন নারীত্বের প্রতীককল্প হয়ে উঠেছে। টমের মধ্যে টিপিক্যাল আমেরিকান যুবকের রূপ প্রতিভাত। স্যালির সঙ্গে দাম্পত্যজীবনে যৌবন মধু পান করে তৃপ্ত হয়েছে, সন্তানের পিতাও সে হয়েছে, কিন্তু যে মুহূর্তে স্যালির সঙ্গে তার জীবনের আদর্শগত ও স্বার্থের বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেই মুহূর্তে আসন্নপ্রসবা স্যালিকে ত্যাগ করে বাণিজ্য জাহাজে যুদ্ধের পরে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে নানা বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সমুদ্রের বিভিন্ন বন্দরের মতোই বিভিন্ন রূপোপজীবিনীর জীবনবন্দর থেকে তাদের দেহসুধা অর্থ দিয়ে পান করে জাহাজে ফিরে এসেছে। স্যালির জন্যে কোনো অনুতাপের সুর তার চিত্তকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মথিত করে তোলে নি। বরং ল পাশ করবার জন্যে স্টোনের কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে পত্র দিতে স্থির সংকল্প করেছে। সার্জেন্ট চরিত্রটি প্রাণের সজীবতায় চঞ্চল। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো গুণ নেই—যা সহজেই পাঠকদের মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

ঘটনার স্রোতও এত স্বল্প যে এগোতেই চায় না। কিন্তু ক্ষণিক মুহূর্তে চকিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটছে, যাতে বিস্ময় না জেগে আকস্মিকতার আঘাত মনের মধ্যে লাগে।

বর্ণনামূলক ভাষার মধ্যে মাঝে মাঝে স্বন্দর চমৎকার পংক্তি মনের দিগন্তে কাব্যের ইশারা জাগিয়ে তোলে। এবং প্রায় প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে কাব্যিক পরিবেশ আনবার চেষ্টা করেছেন। যদিও অন্যত্র ভাষা এমন দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু একটি জায়গার বর্ণনা আমার মনে এক পুলকিত বিস্ময় এনে দিয়েছে। টম্ জাহাজের দুর্ঘটনায় পাঁচ মাস পরে সান্ মার্টিন শহরে ফিরে এসেছে, নানাদেশের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে স্থালির কাছে ফিরে এসেছে, স্থালিকে প্রথম দেখেই তার মনে ষ্ট্রবেবি ফুলের উপমা মনে হয়েছে :

Reaching out his hand, he found hers; her face was close and her eyes watching his. They were graygreen, he had almost forgotten. The face was one he had never seen before, yet knew every mark upon it, the freckles and eye-lashes, the coppery red hair drawn back. She was older. She was more beautiful than she had been before, he thought, older and he no longer remembered her. For a moment he felt a panic as if he had stepped forward to the wrong person. The lips were half open, the eyes half closed. Strawberry. Strawberry laughing in the lunch counter, and he pressed his mouth against hers and her arms locked around his neck. 186-87 pages.

ঔপন্যাসিক হিসাবে Alexander Saxtonকে যে শ্রেণীতেই ভাগ করি না কেন, ফরাসী সাহিত্য ও ইংরাজি সাহিত্য ও জার্মান সাহিত্যের মনের জটিল জঙ্গলপূর্ণ উপন্যাসের কুহক মায়া ছেড়ে জীবনের চলমান আশা দীপিত সহজ সরল সাধারণ পথে মাঝে মাঝে যাত্রা করতে বরং ভালোই লাগে। নাভিশ্বাসে হাঁপ ছাড়ানো মন কিছুক্ষণের জন্য হালকা আলোর খুশির ঝলক পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। দৃপ্ত আশায় মন স্থিত হয়। মানবিক সত্যে আস্থা আসে।

সংস্কৃতি সংবাদ

রবীন্দ্রশতবর্ষে শান্তিউৎসব

নিখিলভারত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিউৎসব সমিতির উদ্যোগে পার্কসার্কাস ময়দানে দশদিনব্যাপী মেলা ও অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাম ও শান্তির আদর্শ যে সমস্ত স্তরের মানুষকে, দেশ-বিদেশের মানুষকে এক মহৎ অঙ্গীকারে মেলাতে পারে—এই বিপুল উদ্যোগের সাফল্য তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর স্মৃতি রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে মেলার কথাই বলেছিলেন। শহর কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত এই মেলার চরিত্র ছিল প্রথমে বাঙালী, তারপর ভারতবর্ষীয়, তারপর আন্তর্জাতিক। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রমেলার চরিত্র অন্যরকম হতে পারে না।

যদিও এক গোপন হস্ত ভাড়াটে লোক মারফৎ কলকাতার পথে-ঘাটে শান্তিসমিতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর, সুদৃশ্য, ব্যয়বহুল পোস্টার লাগিয়েছিল, যদিও 'জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র'গুলি প্রথম দিকে এই মেলা সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবতা দেখিয়েছিলেন, তথাপি প্রত্যহ শহর, শহরতলী ও সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে গড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার নরনারী এই মেলায় যোগ দিয়েছেন। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহই বোধহয় একটি প্রখ্যাত ইংরিজি দৈনিকের নীরবতার তুষার গলিয়ে দিয়েছে। উৎসবের এই উত্তাপই হয়তো শেষ দিনে একটি প্রখ্যাত বাংলা দৈনিককে সম্পাদকীয় লিখতে উদ্দীপ্ত করেছে। কিন্তু অপর বাংলা দৈনিকটি শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর সেই বিখ্যাত তিনটি বাঁদরের মতো নিজের চোখ, কান ও মুখ বন্ধ রাখার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে।

শেষ পর্যন্ত স্টেটসম্যান ও যুগান্তর যে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য দেশবাসী তাঁদের অভিনন্দিত করবেন। আর অপর যে পত্রিকাটি সাংবাদিক অসততা ও ভৃত্যতান্ত্রিকতার পরিচয় দিলেন—দেশবাসী তা-ও সহজে বিস্মৃত হবেন না। তবে, একটা কথা আর একবার প্রমাণিত হল। শান্তিব আদর্শ ও রবীন্দ্রঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের যে অনুরাগ—কোনো অদৃশ্য হস্তের শাসন বা প্রলোভন বা অনুনয়ই তাকে স্তিমিত করতে পারে না। প্রমাণিত হল এই সংবাদ-বিক্রেতারা দেশবাসীর ইচ্ছা ও আকাংক্ষাকে সর্বক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারেন না। নইলে শেষ দিনের অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ পার্কসার্কাস ময়দানে ঘটত না।

এই বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সর্বত্র রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু উদ্যোগ ও আয়োজনের বিপুলতায় এবং অংশগ্রহণের ব্যাপকতায় এই মেলা ও অনুষ্ঠান যে ঐতিহাসিক চরিত্র অর্জন করল তার তুলনা নেই। দশদিন ব্যাপী এই মেলার সর্বত্র প্রীতি ও সহযোগিতার দুর্লভ পরিচয় পাওয়া গেছে। সরকারী প্রহরা বিভাগের সহায়তা বা ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, কংগ্রেস সেবাদল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রভৃতি 'বিখ্যাত' প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ভিন্নই এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হতে পেরেছে। কোনো দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। দেশবাসী যে কত দায়িত্বশীল, তাঁদের সাংস্কৃতিক চেতনা যে কত প্রখর—আরও একবার তা প্রমাণিত হল।

তেমনই সহযোগিতা দেখিয়েছেন শিল্পীরা। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশ্বখ্যাত ত্রয়ী রাত এগারোটায় দমদম বিমানঘাটি থেকে সোজা অনুষ্ঠান মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে মুহূর্তের বিশ্রাম না নিয়ে তাঁদের অনুপম সুরসৃষ্টির পরিচয় দিলেন। কিউবার বিশ্বখ্যাত ব্যালে নর্তকী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মঞ্চসমূহে নাচতে অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি এই ময়দানের অত্যন্ত সাধারণ স্টেজে বিপুল শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করেও তাঁর অনুপম নৃত্যকৌশল দেখালেন। বৃদ্ধ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কোনোক্রমে মঞ্চে উঠে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত রাগসঙ্গীত শোনালেন। অতি বৃদ্ধ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ইনভ্যালিড চেয়ারে বহন করে ডায়াসে বসিয়ে দেওয়া হল—তিনি গান গাইলেন। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পিদল এমনই নিরহঙ্কার, এমনই সহৃদয়, এমনই শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। আর দেশ-বিদেশের খ্যাতিসম্পন্ন এই শিল্পীদের পাশে আদিবাসী ও গ্রামীন শিল্পিদল এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মজুর শিল্পীরাও তাঁদের সাংস্কৃতিক নৈপুণ্যের পশরা তুলে ধরেছেন। এমন যোগাযোগ ইতিপূর্বে কখনোই ঘটে নি।

তিনদিন কবি সম্মেলন হয়েছিল। বাংলাদেশের কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় থেকে নবীনতম কবির কবিতাও সেখানে পঠিত হয়। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশের সম্পূর্ণ নিরক্ষর, বৃদ্ধ লোককবি রামখেরের কবিতা এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা ও বিদেশীয় কবিতা-আবৃত্তি এই কবি সম্মেলনে এক আন্তর্জাতিক চরিত্র এনেছিল। উর্দু কবিরা সারারাত্র-ব্যাপী মুশায়েরার পৃথক আয়োজনও করেছিলেন। তরুণ কবিবৃন্দ কবিতা-

গ্রন্থের এক নির্বাচিত প্রদর্শনী করেছিলেন। তরুণ নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের তরফে নবনাট্য আন্দোলনের এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল।

তাছাড়া মেলার প্রদর্শনী মণ্ডপটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম সরকার, চেকোস্লোভাকিয়া সরকার, রুশ ভারত মৈত্রী সংঘ, পূর্ব জার্মানী সরকার ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান তথ্যবহুল, শিল্প সৌন্দর্যে অনুপম এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনপ্রবাহের প্রদর্শনীটি স্মরণীয়। আর তানসেন ব্যবহৃত তানপুরা সহ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিষয়ক প্রদর্শনীটি ছিল এই মেলার সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ও অপর শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনের প্রদর্শনী ও ক্যাথে কোলভিৎজের গ্রাফিক আর্টসের প্রদর্শনী পৃথক আলোচনার বিষয়। স্মরণীয় যে জার্মাণ ভ্রমণকালে কোলভিৎজই রবীন্দ্র-চিত্র-প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন।

দেশবাসী কি গভীর গুরুত্ব ও অভিনিবেশ সহকারে এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ প্রতিদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও শেষ দিনের প্রাতঃকালীন জনশিক্ষা সম্মেলন। অত্যন্ত গুরুতর বিষয় সম্পর্কে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত চিন্তানায়কদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছেন।

আর ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শন। কানাল, ব্যাটেলশিপ পটেমকিন, রুশ রবীন্দ্র-জীবনী, তলস্তয়ের জীবনচিত্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুর্লভ চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ উদ্যোক্তারা করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন একই সঙ্গে তিনটি মঞ্চে অনুষ্ঠান ও পর্দায় চলচ্চিত্রের প্রদর্শন—এই চারটি অনুষ্ঠান চলেছে। পুতুল নাচ, বিশেষভাবে প্রেরিত রোবসনের গান ও অর্ণডাইকের আবৃত্তি, রুশ অনুবাদে ও কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাটক ও সঙ্গীত বা প্রাদেশিক সংস্কৃতি পরিবেশন, ছায়ানাট্য, নাটক, যাত্রা, বিবিধ অনুষ্ঠান হাজার হাজার মানুষ ঘুরে ঘুরে দেখেছেন।

দেশখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিক, মনস্বীকে উৎসবের যত্রতত্র দেখা গেছে। বিদেশীয় অতিথিরা মাটিতে বসে মৃৎপাত্রে চা খেয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে দেখেছেন রবীন্দ্রপূজা বা রবীন্দ্রব্যবসায় নয়—রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বিশ্বসংস্কৃতির মিলন উৎসব। শতবার্ষিকী বৎসরে এইটিই তো কাম্য ছিল।

উৎসব উপলক্ষে সমিতির তরফে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে প্রকাশিত হবে। আমরা পাঠকদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

নিখিলভারত শান্তিসমিতি যদিও রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিসমিতির প্রাথমিক উদ্যোক্তা, তথাপি এ কথাটি পরিষ্কার করে বলা দরকার শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিখিলভারত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব সমিতি নামে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল।

অনেক ব্যক্তিই এতে এসেছিলেন—যাঁদের সঙ্গে শান্তিসমিতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিউৎসব সমিতিই রবীন্দ্রমেলা ও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, পরিচালক। যাঁরা শান্তিসমিতি বা কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এই মেলার কর্তৃপক্ষকে জুড়ে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছেন—জনসাধারণই তাঁদের নিজ উদ্যোগ ও উৎসাহে সেই কুৎসার যোগ্য জবাব দিয়েছেন।

কিন্তু আজ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রথমত নিখিলভারত শান্তিসমিতি যে-শান্তি আন্দোলন পরিচালনা করছেন, দেশবাসীর সঙ্গে 'পরিচয়' তার জন্ম কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়ত শান্তিসমিতি প্রবর্তিত এই রবীন্দ্র-উৎসব সমিতি একটি পৃথক সংগঠন এবং এঁরা এঁদের কর্মের মাধ্যমে আপন সর্বদলীয় উদার চরিত্রটির পরিচয় দিয়েছেন। তৃতীয়ত এই সমিতি মেলা উপলক্ষেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সমিতির নিখিল ভারতীয় কাউন্সিল ও প্রায় পঁচিশ হাজার সহযোগী সদস্য এই সমিতিকে স্থায়িত্বদানের প্রস্তাব দিয়েছেন। দেশব্যাপী রবীন্দ্রচর্চা তথা সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মহৎ দায়িত্ব আজ এই সমিতির হাতে পড়েছে।

বাংলাদেশে সর্ববয়স ও মতের সাহিত্যিকদের তরফে সাহিত্যিকদের নিজস্বভাবে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক সাহিত্যিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী লেখক সংস্থা' গঠিত হয়েছিল। তার সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রবীণ-নবীন সর্বমতাবলম্বী সাহিত্যিক ও সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক এই সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লেখক সংস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের নামে, বৃহত্তর সাহিত্যাদর্শে লেখকদের মিলিত হবার যে উদ্যোগ ও প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ হল না। প্রায় সেই উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করল এই রবীন্দ্রমেলা। কিন্তু কোনো কোনো সাহিত্যিক তাতেও অংশ গ্রহণ করলেন না। এই সময় কলকাতায় নিখিল ভারত আফ্রো-এশীয়-সংহতি-লেখক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন হল। এশিয়া-আফ্রিকার সংহতি ও ঔপনিবেশিকতার অবসান—এই ছিল সম্মেলনের আহ্বান। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি অনুসারী, বিবেকবান মানুষের তথা সাহিত্যিকের অবশ্য পালনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই সম্মেলনে ঐক্যের যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল—তাতেও কোনো কোনো বাঙালী সাহিত্যিক সাড়া দিলেন না। আর সেই সময়েই হঠাৎ কয়েকজন লেখকের একটি রাজনৈতিক বিবৃতি প্রকাশিত হল।

আণবিক বিস্ফোরণ মাত্রেই দুঃখকর। কিন্তু কোনো ঘটনাই প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে বিচার্য নয়। গত তিন বছরের ঘটনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তাঁরা যে বিবৃতি প্রকাশ করলেন তাতে স্বাক্ষরকারীদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে সোভিয়েত বিরোধিতা। এই মনোভঙ্গি আরও প্রকট হয় যখন দেখি গত প্রায় দশ বছর এই আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিচুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি যে দাবি আন্তর্জাতিক শান্তিসংসদ পৃথিবীতে জনপ্রিয় করেছিল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ যে অভীপ্সা ঘোষণা করেছিল —তার সমর্থনে এই সাহিত্যিককূলের অধিকাংশই সম্পূর্ণ নীরব থাকতে পেরেছিলেন। কেউ কেউ বিবৃতিদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন। তখন তাঁদের বক্তব্য ছিল শান্তির আহ্বান মানে রাজনীতি।

অথচ হাঙ্গেরি প্রভৃতি ঘটনায় প্রায়ই এঁদের কেউ কেউ বিবৃতি দিয়ে মানবতার ঋণ পূর্ণ করেছেন। করেননি মহাকাশে কণ্টক ক্ষেপণ, লুমুম্বার হত্যা, ঔপনিবেশিক দেশসমূহে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পাশবিক অত্যাচার, কিউবায় মার্কিন যুদ্ধ অভিযান প্রভৃতি ঘটনায়। কারণ তাতেও রাজনীতি করা হত।

শান্তিসংসদ জার্মাণ সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। হাঙ্গেরির সময়েও বলেছিলেন। আর যাইহোক—শান্তিসংসদকে পছন্দমতো কোনো ব্যাপারে নীরব আর কখনো বা মুখর হতে দেখি নি।

সুতরাং এই বিবৃতির উদ্দেশ্য ও কয়েকজন স্বাক্ষরকারীর চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট। আমাদের বক্তব্য আর যাঁরা, অধিকাংশ যাঁরা—তাঁদের সম্পর্কে। আমরা জানি এঁদের অনেকেই এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরে বুঝতে পেরেছেন নিছক মানবিক কারণেই বিবৃতিটি ছাপা হয় নি; অনেকেই তাঁরা অনুতাপও প্রকাশ করেছেন। আজ তাঁরাই বলছেন লেখকদের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি করে কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হল?

এখনও সময় আছে। ন্যূনতম যে বিষয়গুলিতে সর্ব মত ও বয়সের লেখকরা মিলতে পারেন—উচিত হবে তার ভিত্তিতে তাঁদের একত্রে বসা: যে লেখক-সংস্থা নিষ্ক্রিয় হয়েছে, উচিত হবে তা সঞ্জীবিত করা। এই মেলার শিক্ষা হল ঐক্য ও মানবতার শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা। এই উৎসব সমিতি, বা, আঞ্চলিক লেখক সমিতি বা রবীন্দ্রশতবার্ষিক লেখক সংস্থা—যে কোনো একটির মাধ্যমে আবার বাংলা দেশের লেখকরা সমবেত হোন। পৃথবীর কারা শান্তির পক্ষে, কারাই বা যুদ্ধ চাইছেন তা বুঝুন। স্পষ্ট করে বলুন আমরা লেখকরা চাই সমস্ত রকম যুদ্ধাস্ত্র বর্জন, শান্তি চুক্তি, ঔপনিবেশিকতার অবসান, সহৃদয়তা। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বৎসরে এইভাবেই বাঙলা দেশের সাহিত্যকরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে পারবেন, যা পেরেছে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এই মেলায় মিলিত হয়ে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

তুশান জবাত্তিভেল

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

অরুণাচল বসু

মানস রায়চৌধুরী

পরেশ মণ্ডল

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষণ চন্দর

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

প্রদ্যোৎ গুহ

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমল দাশগুপ্ত

সুমিত রায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ **সূচীপত্র** ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।
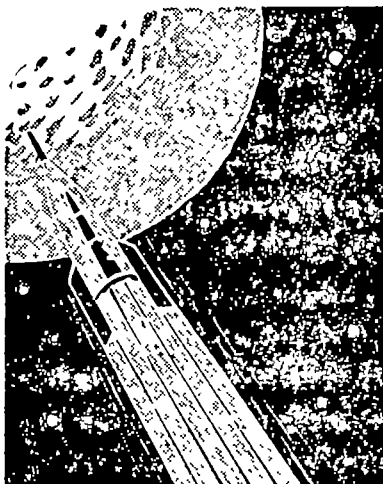
বর্ষ ৩১ ; সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ, ১৮৮৩ ; ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

দুশান জবাভিতেল

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, লেখক ও নাট্যকার ছিলেন একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সাহিত্যের কোন্ ক্ষেত্রে বাংলা তথা পৃথিবীর সাহিত্যে তাঁর দান সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে অনেক মতান্তর দেখা যাবে। তাঁর ছোটগল্পের কথা উল্লেখ করবে অনেকে, বিশেষ করে বিদেশীরা।

এইরূপ জবাবের অনেক কারণ আছে। বাংলা ও সারা ভারতবর্ষের সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের আগে ভারতবর্ষে সত্যকার ছোটগল্প লেখা কারুর পক্ষে সম্ভব হয় নি। আজকে কিন্তু ছোটগল্পই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গর্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে যে পথ দেখিয়ে দিলেন তা অনুসরণ করে বাঙালী লেখকেরা ভারতবর্ষের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে দুনিয়ার সাহিত্যে একটা উঁচু স্থান দখল করেছেন। একটিমাত্র দুঃখের বিষয়, বিদেশে যারা বাংলা ভাষা জানে তাদের সংখ্যা খুব কম ও ইংরেজী ভাষায় বাংলা ছোটগল্পের অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায় না বলে অনেকে এই গল্পগুলির যথার্থ মূল্য বুঝতে পারে না। গেল বছরে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-সদনে একটা তালিকা পেয়ে অবাক হয়ে দেখলাম—রবীন্দ্রনাথেরও কত গল্প এখনো ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় নি।

আমার ছোট প্রবন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটগল্পের বিশ্লেষণ করে একটা বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব ; তাই শুধু কয়েকটি প্রধান দিক উল্লেখ করতে পারব।

প্রত্যেক ছোটগল্পের দুটো দিক আছে—বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। এদের মধ্যে কোন্‌টার গুরুত্ব বেশি এ নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে নেই। শুধু এ-কথা বলতে হয় যে বিষয় ও রূপের ঐক্য থাকা উচিত। তাছাড়া জীবনের বৈচিত্র্যের মতোই বিষয়বস্তুও বিচিত্র; আর রূপ-প্রকাশের উপায়ও একেবারে অসংখ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিষয়ে ও রূপে, উভয়েই লেখকের মতামত, চিন্তাধারা, বিচার, অনুরাগ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সাহিত্য শুধু জীবনের দর্পণ নয় তো—সাহিত্য জীবনের উপর নির্ভর করে বাস্তবতা বিচার করে ও জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে—চেষ্টা না করলেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বেশির ভাগ পল্লীসমাজের জীবন, সমস্যা, সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত। তিনি যখন ১৮৯১ সালে বাংলাদেশের গ্রামে গেলেন তখন তাঁর চারিপাশে যা দেখতে পেলেন ও গ্রাম্যসমাজের জীবনের যে টুকরো সংগ্রহ করতে পারলেন তাই নিয়ে তাঁর ছোটগল্প লিখতে থাকলেন। তিনি নিজে বলেছিলেন: "আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি, যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।"

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পগুলির বিষয়বস্তুকে এককথায় প্রকাশ করতে চাইলে আমরা বলতে পারি বিষয়টা হল মানুষ—মানুষের সুখ-দুঃখ, মানুষের বেদনা, মানুষের আনন্দ। সুখ ও আনন্দ গ্রাম্যসমাজে বেশি দেখতে পান নি বলে তাঁর ছোটগল্পেও বেশি সুখ ও আনন্দের কথা পাওয়া যায় না। 'দেনাপাওনা', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'কঙ্কাল' ইত্যাদি গল্প পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি পল্লীসমাজের সীমাবন্ধন, প্রথার নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতা তাঁকে কী আঘাত করেছিল। 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি নিজেই বারংবার বলতেন তাঁর অল্পবয়সের জীবন কেমন সংকীর্ণ ও বাইরের আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল। এখন হঠাৎ জীবনের ঠিক মাঝখানে এসে পড়ে তিনি বাস্তবের সমস্ত নিষ্ঠুরতা তীব্র বেদনার সঙ্গে অনুভব করতে লাগলেন। এইভাবেই বাস্তবতা তাঁর ছোটগল্পের মধ্য দিয়েই বাংলা ও ভারতবর্ষের সাহিত্যে প্রথমবার প্রবেশ করল। একথাও স্বীকার করতে হয় যে তাঁর কাব্যরচনায় কিন্তু এই বাস্তবের—সামাজিক বাস্তবের—প্রবেশ একটু দেরিতে হল। পল্লীজীবনের এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসবার

কয়েক বছর পরেই 'চিত্রা' থেকে আরম্ভ করে আমরা তাঁর কবিতায়ও সামাজিক জীবনের স্পষ্টতর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'এবার ফিরাও মোরে' নামের কবিতায় তিনি যে artistic programme রেখেছিলেন তা নিজের কাব্যরচনায় যে সব সময়ে মানতে পেরেছেন তা আমি মনে করি না ; কিন্তু তাঁর ছোটগল্পে এই কর্মসূচী ঠিকই বজায় রেখেছেন। যারা বোবা, যারা অক্ষম, যারা অসহায় তারাই মূর্ত হত তাঁর ছোটগল্পে ; তারাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করবার পথ পেল এই ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। তাই ভ. লেস্‌নি প্রায় তিরিশ বছর আগে যথার্থই বলেছিলেন : "These stories were a revolutionary event in the world of Bengali literature ; apart from certain lyrical poems they are Tagore's finest works."

একথাও উল্লেখ না করে পারি না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এ যে সমস্ত সমস্যা পাঠকদের চোখের সামনে স্থাপিত করলেন তা হল পল্লীসমাজের ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের typical problems। গ্রামের গরীব লোকের দুঃখ ও তাদের প্রতি উৎপীড়ন, পুলিশ ও জমিদারদের অত্যাচার, হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, মেয়েদের পরাধীনতা ইত্যাদি বর্ণনা করে তিনি এ সমস্ত কুক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, তাঁর প্রতিবাদ জানাতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা এখানে প্রথমবার তাঁর অতল মমতাবোধের স্পষ্ট প্রকাশ পাই যা হল তাঁর মানবতাবোধের ভিত্তি ; কারণ রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ কোনো abstract philosophical category নয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের একটা অংশ যা প্রত্যেক বড় লেখক, প্রত্যেক বড় কবির অন্তরে থাকা উচিত। এই মানবতাবোধেই Romain Rolland, Maxim Gorki, Lu Hsun ইত্যাদি আধুনিক দুনিয়ার বড় লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ মিল।

এদিকে 'গল্পগুচ্ছ' মানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারবার একটা অত্যন্ত দামী দলিল।

'গল্পগুচ্ছ'-এর নায়ক-নায়িকার একটা তালিকা তৈরি করলে আমরা দেখতে পেতাম কোন্ ধরনের লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বেশি প্রবল ছিল। অন্ধ সমাজ ও স্বার্থপর পুরুষদের অত্যাচারে উৎপীড়িত নারীদের সংখ্যা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমা, 'কঙ্কাল' গল্পের

নায়িকা, 'ত্যাগ' গল্পের কুসুম, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের বিধবাটি, বোবা 'সুভা', 'খাতা' গল্পের উমা, 'বিচারক' গল্পের ক্ষীরোদা, 'দিদি', 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পের বিনোদা, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিন্দু, 'হৈমন্তী' ইত্যাদি—এদের সকলের মর্মস্পর্শী কাহিনী ব্যক্তিগত আপদ-বিপদের কাহিনী নয়, সামাজিক অসমতা ও অন্যায়ের ফল বলেই রবীন্দ্রনাথ এত জোর করে বারংবার এসব বেদনাগ্রস্ত মেয়েদের কথা বলতেন।

তাঁর অনেক ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অমানুষিক প্রথা ও কুসংস্কারগুলির পটভূমিকায় জীবিত নর-নারীর ছবি আঁকতেন, পরিবেশের সঙ্গে তাদের ব্যর্থ লড়াইয়ের কথা বলতেন ; সেই লড়াইয়ে তারা পরাজিত হয়ে মরে গেলেও moral victory অর্থাৎ নৈতিক জয় সব সময় তাদেরই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকা যে শুধু মরে যেতে জানে তাও নয়—পুরাতন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও পারে। অন্তত দুটি গল্পে এরকমের বিদ্রোহের কথা পাওয়া যায়—'ত্যাগ' ও 'স্ত্রীর পত্র'। এই দুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের দুঃসাহসী পথ দেখিয়ে দিলেন সে রকমের পথ তিনি নিজেও তাঁর নানা প্রবন্ধে কোনোদিন দেখান নি। এ বিষয়ে S. A. Dange সঠিকভাবে বলেছেন : "When Tagore wrote as a 'social reformer' or as a politician or essayist, his emotions and sentiments, his imagination and thoughts became circumscribed and inhibited. But when he wrote as a poet and a dramatist, *i. e.* when he was on the job of creation in the realm of art, he revealed himself fully and truly."

রূপের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প দেখে তার সবচেয়ে বড় গুণ আমার মনে হয় প্রত্যেক গল্পের সমাপ্তি। দীর্ঘতায় এক একটি গল্পের মধ্যে অনেক তফাত দেখা যায় ; কিন্তু লম্বাই হোক আর ছোটই হোক, প্রত্যেক গল্প আশ্চর্যভাবে সমাপ্ত। ছোটগল্প লেখবার সময়ে সফলতার জন্য লেখককে যে সব সময়েই শেষের point-টি মনে রাখতে হয় সেই রহস্যটি রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন বুঝিবা। একটার পরে একটা গল্প নিয়ে আমরা দেখতে পাই শেষের point-টি stress করবার

উদ্দেশ্যে সারা গল্প রচিত। তাই প্রত্যেক গল্পই আমাদের মনে এত গভীর দাগ কেটে যায়।

আর একটি কথা বলেই আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ে গল্প লিখতেন সে বিষয়ে গল্প লেখার সবচেয়ে বড় বিপদ হল লেখকের sentimentality অর্থাৎ ভাবালুতা। অনেক আধুনিক লেখকের রচনায় একথার প্রমাণ পেতে পারি। বিপদটা রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে এড়াতে পেরেছিলেন ; তাঁর ছোটগল্পে মমতা যতই থাক sentimentality কোথাও দেখা যায় না। তা এড়াবার জন্য তিনি বরঞ্চ একটু বেশি কঠিনভাবে কথা বলেন এবং বিদ্রূপ প্রয়োগ করে তাঁর artistic লক্ষ্য সফল করেন, অনেক সময় আবার নিরপেক্ষতার ভান করে তাঁর নায়ক-নায়িকাদের কাহিনী বলেন। কিন্তু এই নিরপেক্ষতার নিচে মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসীম ভালোবাসা ও সহানুভূতি পাঠক অনুভব না করে পারে না।

মানুষের প্রতি কবির সেই ভালোবাসার সবচেয়ে সুন্দর ও স্পষ্ট প্রমাণ হল তাঁর ছোটগল্প। তাই আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা এই গল্পগুলি বারংবার পড়ব।

প্রখ্যাত চেক্ মনস্বী ডঃ দুশান সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। মূল বাংলায় লিখিত এই নিবন্ধটি পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রমেলার এক আলোচনা সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনাটি তিনি আমাদের দিয়েছেন—সম্পাদক।

কথা

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

সাড়া নেই, শব্দ নেই,—ওরা ভাবল : বাঁচা গেল। কিন্তু
গোপনে অতলে তাকে নিলো এক সিন্ধু ;
কারণ, বুক ভরে সে ভারি এক বিদারণ চায়
একেবারে নিচু থেকে। ঠিক সেই বিস্ফোরণ। অতলে যা যায়।

একসময় ঠিক ফাটবে। চুপচাপ সমুদ্রের জল
দিন গোণে, কাল গোণে। একসময় জলমণ্ডল
আদিম ঝাঁপিয়ে উঠবে, মাথা ঝাঁকিয়ে। রূপ
পুরোপুরি দেখবে বলে আকাশের নীল টাল চুপ।

সামুদ্রিক প্রয়োজন। জল-ছেঁড়া উৎক্ষেপণ চাই
নিচের জলসকল বুকে তার করে আইঢাই
উপরে উলটিয়ে সব পালটে দেবে ;—ঢেউ, জলস্তর,
বিন্যাস, বাতাস, বর্ণ। বহুদূর পঁউছে দেবে স্বর।

সে-কারণে সে-ই নিলো ও-কথাটি। গভীর গোপনে
ধরে রাখবে প্রাণজোড়া, ভয়ঙ্কর ভারি শুভক্ষণে।

বাক্‌বহ্নি

অরুণাচল বসু

উচ্চারিত হতে গেলে কোন্‌ কণ্ঠ স্বতঃ স্ফুটয়ান—
আরোপিত আপ্তনতি নও তুমি, নিহিত সম্মান ;
বাচনে সূচিত, প্রীত আচরণে ললিত সুমিতি,
শালীন, অমিতবিত্ত, অন্তঃশীল, হে উত্তরদ্যুতি !

শতায়ু-প্রসরে এই উন্মীলিত মানচিত্রে রেখা—
তুমি কোন্‌ হৃদ্‌ভূমির উদ্ভাসনে রূপমগ্ন একা ?
মণ্ডিত বলয়ে স্মিত মায়াঞ্জন সন্নিহিত বুকে
অ-লক্ষ্য নিখিল-পুষ্প ফোটাবে কী বর্ণের কৌতুকে :

উত্তরিত আয়ুতীর্থে কী কল্লোল, ধৌত স্মৃতিদাহ,
উপনীত সুষমায় অভিষিক্ত ফুল্ল সে-পুণ্যাহ ;
জলে সিক্ত জলকণা, শোণিতে লোহিত শ্বেত অণু
সত্তার সুঠাম বৃক্ষ—অমল সংসক্ত বরতনু।

হে স্নাত বালার্ক, বৃত বাক্‌বহ্নি তিমির অর্গলে—
স্ফুরিত আলেখ্যে কোন্‌ বিমূর্ত চ্ছন্নতা যায় টলে !

সরব

মানস রায়চৌধুরী

বলতে হবে এইবেলা। তোমার মহিমা ধীরে মাঠের ওপারে অস্তগামী
"ঈশ্বর ঈশ্বর" বলে চেঁচিয়ে উঠেছি পাখি, ঘুমের ভিতরে
তারপর সেই বক্ষরেখা পীন প্রবালচুম্বিত দীপ্তি দেখে
মনে কি হয় নি তুমি স্পন্দিত যৌবন ঘিরে আরেক রকম দেবালয়
অস্থির নিঃশ্বাসে দ্রুত জেগে উঠতে হয়েছিল স্বপ্নভাঙা ভোরের বিষাদে।

ওই কান্তি, তবু উদ্ভাসিত কেন পোশাকে অনিদ্র গোলাপের
সম্মোহন এঁকে ছিলে? আলোর বাঁকানো কাঁচে শেষ বেলা যায়
আহত, জলের পাশে পড়ে আছি, অন্ধকার যেন নদীতীর—
এই বয়সের নৌকা অনীশ তরঙ্গে যাবে কোথায় ওপারে,
যদি সব ভুলে যাই, খুব তাড়াতাড়ি বলছি কার আঁচলের ক্ষমা লেগেছিল মুখে।

রোদের সকালে

পরেশ মণ্ডল

বেলাবেলি কাজ সেরে রেখো,
নাহলে অজস্র মেঘ কৌটাতে পা রেখে বৃষ্টি হবে
অন্ধকার ডানা ঝাড়বে। অতএব শোনো
দিনে দিনে পথ চিনে নাও।

সেদিন রাতের ঘোরে পাখিটা কেবল
কেঁদেছে বলেছে, বেশ করে
বুঝেছি আমাকে এতদিন শুধু কিনেছ বেচেছ
এবার তারার ছায়া দাও
আমি রোদ হব—গাছে গাছে রোদ হব।

এখনো সময় আছে, সবে তো বিকেল!
ছুটে যাও জল আনো, প্রদীপটা জ্বালো;
ঘুমে ঘুমে না কাটিয়ে আজকের রাত
বিরহে কাটাও;
ভোর হলে পাল তুলো, সকলের সাথে
দাঁড় ধরো রোদের সকালে।

আর্নল্ড্ ওয়েস্কারের নাটক

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগান্তকারী আদর্শ-নির্ভর আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনে সাধারণত দু ধরনের যোগদানকারীর আধিক্য দেখা যায়। এক, শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আস্থাশীল বিশ্বাস-প্রধান মানসিকতাসম্পন্ন; দুই, যুক্তিপ্রসূত প্রশ্নে আত্ম-জর্জরিত বুদ্ধি-প্রধান প্রকৃতির মানুষ। আধুনিক বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। চিন্তাটা পুরনো হলেও নতুনভাবে মনে উদিত হল আর্নল্ড্ ওয়েস্কারের তিনটি নাটক পড়ে। ..."don't let me finish this life thinking I lived for nothing. We got through, didn't we? We got scars but we got through."—বৃদ্ধা নায়িকার এই উক্তিটিতে ওয়েস্কারের 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'র সমাপ্তি। ওয়েস্কারের ত্রয়ীর এই প্রথম নাটকটির পরবর্তী উত্তরভাগ যথাক্রমে 'রূট্স্' ও 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট্ জেরুজালেম্'। উদ্ধৃতিটিতে আদর্শানুরক্তির যে ব্যাগ্র অঙ্গীকার লক্ষ্য করি, তার সঙ্গে বুদ্ধি-উত্তেজিত সন্দেহশীলতার সংঘাত এবং অবশেষে চতুর্দিকব্যাপী নৈরাশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানবতাবোধের উপর বিশ্বাসরক্ষার কৃচ্ছ্রসাধিত সংগ্রাম, তিনটি নাটকেরই মূল উপজীব্য। অবশ্য এ কথা সর্বদাই স্বীকার্য যে যখন অভিনয়ই নাটকের জীবনদায়ক নিঃশ্বসন, তখন মঞ্চস্বরূপেই নাটক দর্শনীয়। তার বিকল্প পঠন; যদিও পাঠে নাটকদর্শনপ্রাপ্ত আনন্দের শতাংশও পূর্ণ হয় না। শুনেছি এ তিনটি নাটক বিলেতে প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। যেহেতু তক্রপানে দুগ্ধস্বাদলিপ্সুর পরিতৃপ্তি শাস্ত্রবিধিসম্মত, তাই নাটকগুলির পঠনে দর্শনের অভিলাষ কিছু পরিমাণে সিদ্ধ হতে পারে, এই ভরসায় এ আলোচনার অবতারণা। তার পূর্বে ওয়েস্কার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। আর্নল্ড্ ওয়েস্কার বয়সে তরুণ; তিরিশের দ্বারপ্রান্তে সমাগত। জন্ম লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে। নাটক রচনায় অধুনাখ্যাত জন্ অসবোর্নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও, তাঁকে 'অ্যাংগ্রি ইয়ং মেন্' গোষ্ঠিভুক্ত করা অন্যায় হবে। এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা

গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ওয়েস্কার শ্রমিকসন্তান; দ্বিতীয়ত, তিনি ইহুদি বংশোদ্ভূত। স্বশ্রেণী ও স্বজাতির প্রতি গভীর অনুরাগের প্রতিফলন তাঁর নাটকের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট বলেই, ঘটনা দুটির উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি' ঘোরতর রাজনৈতিক নাটক। লণ্ডনের শ্রমিক-অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের ইহুদি এলাকার একটি ছোট শ্রমজীবী পরিবার এ নাটকের প্রধান চরিত্র। বর্তমান বিলেতী শ্রমিকসাধারণের নমুনা বলে এদের বিবেচিত করা উচিত হবে না। কারণ ইহুদিজাতি সম্পর্কিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, রাজনৈতিকভাবেও এ পরিবারের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা—প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। সুতরাং সক্রিয় রাজনীতি এদের প্রাত্যহিক জীবনকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে। তিরিশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশের শেষ পর্যন্ত—এই তিন দশকের ঘটনাবহুল আন্তর্জাতিক ইতিহাসের বিপর্যস্ত স্রোতরাশির প্রতিক্রিয়ায় পরিবারটির ক্রমপরিবর্তনই এ নাটকের উপপাদ্য বিষয়। নাটকের শুরুতে সংযোজিত নাট্যকারের স্বল্পায়ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: " 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি' সোভিয়েত-বিরোধী নাটক হিসেবে কখনই লেখা হয় নি।......ইন্‌কুইজিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অর্থ যেমন সমগ্র খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করা নয়, ঠিক তেমনি সোভিয়েতের সাম্প্রতিক অপরাধ-স্বীকৃতির ভিত্তিতে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা মানেই সমাজতন্ত্র-বিরোধী আক্রমণ নয়। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে লাভ নেই। খুব অল্প লোকের হাতই আজ পরিষ্কার। আমরা শুধু আর একবার যেন ভেবে দেখি।" নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫৮ সালে। সুতরাং কথাগুলি অর্থব্যঞ্জক।

নাটকটির শুরু ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণ। আর ইংলণ্ডের ইহুদি সমাজের পক্ষে সময়টা নানা বিপজ্জনক ঘটনার সন্ধিক্ষণ। জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থানের ধাক্কায় ইওরোপে ইহুদি সমাজের ভাগ্যবিপর্যয় ও খাস ইংলণ্ডে মস্‌লির নেতৃত্বে ইহুদি-বিরোধী ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাতের পটভূমিকায় প্রথম দৃশ্যের ঘটনাবলী সাজানো হয়েছে। সেরা কাহ্‌ন্, তার স্বামী হ্যারি, কন্যা এডা, পুত্র রনি ও আশেপাশের শ্রমিক বন্ধুদের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মিছিলে অংশ গ্রহণের উৎসাহের হাওয়ায় প্রথম দৃশ্য প্রায় উড়ে চলে। এরই ফাঁকে জানা যায় যে এডার প্রিয়তম ডেভ্ স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সৈনিক হয়ে গণতন্ত্র

রক্ষার সংগ্রামে যোগ দিতে চলেছে। কিন্তু এই উদ্দীপনার ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে ভবিষ্যৎ সাংসারিক সঙ্কটেরও সূত্র নিহিত রয়েছে। সেরা কাহ্নের স্বামী হ্যারি সৎ-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কমিউনিস্ট, কিন্তু কর্মবিমুখ, কিছুটা ভীত ও দায়িত্বগ্রহণে অনিচ্ছুক। সেরার প্রচণ্ড জীবনীশক্তির তৎপরতার সঙ্গে তার শান্তদিনযাপনের ইচ্ছার নিত্যনৈমিত্তিক সংঘাতের দুঃসহ বর্ণনায় তাই প্রথম অঙ্ক শেষ হয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের সময়কাল যুদ্ধের পর, ১৯৪৬ সাল। কাহ্ন্ পরিবার উঠে এসেছে লণ্ডনের উত্তরে হ্যাকনি অঞ্চলে—অবস্থাপন্ন ইহুদিদের বাসস্থান। আর্থিক স্বচ্ছলতাটা চোখে পড়ে। মনে রাখতে হবে যে ইতিমধ্যে লেবর দল মন্ত্রিত্ব পেয়েছে। সংসারেও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বড় মেয়ে এডা স্বতন্ত্র থাকে। তার স্বামী ডেভ্ সামরিক কর্তব্য থেকে কবে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরবে তার আশায় দিন গুণছে। ছোটবেলার রাজনৈতিক উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসেছে। পুত্র রনি সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী; সে দিবসের মিছিল-সংগঠন ও ইস্তাহার বিতরণে সর্বদাই ব্যস্ত। এ কাজে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও উৎসাহ উদ্দীপক তার মা সেরা। অপর পক্ষে হ্যারি ক্রমশই আলস্যের চোরাবালিতে ডুবছে। একাদিক্রম জীবিকাশূন্য জীবনযাপনের মাঝে মাঝে চাকুরি জোটে; কিন্তু কিছুকাল পরে নিজের দোষেই আবার বেকার হয়ে ঘরে ফেরে। এই নিয়ে স্ত্রী সেরার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক্রমেই চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছয়। একদিন কলহের কোনো এক উত্তপ্ত মুহূর্তে হ্যারি হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। মনের ব্যাধি এবার শরীরকে সংক্রামিত করে। মন-মেজাজ তিক্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে হ্যারির কথাগুলি তার জীবন-দর্শনের ইঙ্গিত দেয়: "What I am—I am. I will never alter···I'm an old man and if I've been the same all my life so I will always be."

তৃতীয় অঙ্কে হ্যারির পক্ষাঘাত তার সমস্ত দেহকে অক্ষম করে তোলে, বাক্শক্তি কেড়ে নেয়। এ পক্ষাঘাত অনেকটা প্রতীকধর্মী; নাটকের অন্যান্য চরিত্রদের মানসিক নির্জীবতার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির ব্যাধিও এগিয়ে চলে। তার পুরনো বন্ধু মন্টি পার্টি ত্যাগ করে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় মন দিয়েছে। সেরা ও হ্যারির সবচেয়ে প্রিয় সন্তান রনি, যার উপর তাদের আশা-ভরসা ছিল প্রচুর, যে স্বপ্ন দেখত শিল্পী হবার, সেই রনি প্যারিসের কোনো হোটেলে

সামান্য পাচকের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। একমাত্র সেরা, এই বার্ধক্যেও পার্টির অক্লান্ত কর্মী রয়ে গেছে। সেই অতীতের উদ্দীপনা, আদর্শবাদের উন্মাদনা এখনও সময়-অসময়ে দপ করে জ্বলে ওঠে। শেষ দৃশ্যের ঘটনার কাল ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস। সোভিয়েতের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। বহুদিনের অপ্রকাশিত খবরের অপ্রত্যাশিত উদ্‌ঘাটনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত রনি ফিরে এসেছে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল মায়ের কাছে—যে মার কাছ থেকে সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল সে, যে সেরার উৎসাহ তার রাজনৈতিক জীবনের প্রাণদায়ক রক্ত-সংবহনস্বরূপ ছিল। মায়ের আদর্শবাদের কঠোর সংকল্প তার মনে আর পুরনো ভক্তি জাগায় না ; ধিক্কার দিয়ে বলে : "You're a pathological case......you're still a communist.", জবাবে সেরা উত্তেজিত হয়ে জানায় কেন সে কমিউনিস্ট ; কমিউনিস্ট আদর্শবাদ রক্তের কণা হয়ে তার শরীরে বইছে। সরল ভাষায় নিজের প্রয়োজনটাকে ব্যক্ত করে : "If the electrician who comes to mend my fuse blows it instead so I should stop having electricity ? I should cut off my light ? Socialism is my light, can you understand that ? A way of life.... I've got to have light. I'm a simple person, Ronnie, and I've got to have light and love."

অবিচলিত বিশ্বাসশক্তিতে সেরা কাহ্‌নু হয়তো ডিকেন্‌স্‌সৃষ্ট মাদাম দেফার্জ্ বা হেমিংওয়ের Pilar-এর সমতুল্যা হতে পারে, যদিও রক্তপিপাসু উগ্রচণ্ডা বলে তাকে কখনই ভুল হয় না। কিন্তু 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'র অভিনবত্ব সেরার চরিত্রে নয়। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে সকল প্রশ্ন নাট্যকার অন্যান্য চরিত্রদের মুখে দিয়েছেন, মনে হয় চিন্তাশীলতার অভিব্যক্তি তাতেই বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। আসল কথা নাটকটিতে লেখক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি সহানুভূতিসূচক দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে একদা সক্রিয়া কমিউনিস্ট এডার রাজনীতিবিমুখতার কারণটা আশ্চর্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ছোট ভাই রনি মে-দিবসের মিছিলের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ করে বাড়ি ফিরে এডাকে প্রশ্ন করে : "আসবে তো ?

এডা : কে জানে !

রনি : কে জানে মানে? মিছিলে আর উৎসাহ পাও না?

এডা : না, পাই না।

রনি : বুঝতে পারি না। তুমি আর ডেভ্ পুরনো দিনে আগে আগে চলতে। আমি আমার সমস্ত চিন্তা তোমাদের দুজনের কাছ থেকেই পেয়েছি—অথচ এখন—”

এখন এডার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রৌঢ়ত্ব ও শ্রান্তির ভাব এসেছে। সহরে জীবনের নিরানন্দ কায়িক শ্রমের বিরক্তি থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রামে বাস করার স্বপ্নে বিভোর এডা। সেরা ও হ্যারির সদাকলহপ্রিয়তার প্রতি কটাক্ষ করে এডা বলে—“In the country we shall be somewhere where the air doesn't smell of bricks and the kids can grow up without seeing grand parents who are continually shouting at each other.” তাছাড়া রাজনৈতিক কাজকর্মের বিভ্রাট থেকে চিরতরে মুক্তির সুযোগও থাকবে। রনি আশা করে ডেভ—যে ডেভ্ স্পেনে লড়াই করেছে, সে কখনও এডার মানবসমাজ-ত্যাগের এ-প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না। মানবসমাজের নাম শুনে এডা নাসিকাকুঞ্চিত করে। রনি অবাক হয়ে ভাবে, সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ সবে শুরু হচ্ছে, অথচ—! এডা ঠাট্টা করে বলে—“It's always only just beginning for the Party. Every defeat is victory and every victory is the beginning.” আসলে এডার রাজনীতিবিমুখতা ও সর্বাত্মক বিদ্বেষের মূল কারণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অবসাদ ও অভিজ্ঞতাই নয়। সে মনে করে সব সমস্যার মূলে রয়েছে এ যুগের শহুরে শ্রমশিল্পের অমানবিক বিস্তার। তার মা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—“কিন্তু তাই বলে পালিয়ে যাবে? জীবন এখনও চলছে। মানুষ বিয়ে করে, তার ছেলে-মেয়ে হয়, সে হাসে, হাসবার কারণ খুঁজে পায়। মানুষ সবসময়ই হাসতে পারে। পারে না?” এডা জবাবে বলে, “এর অর্থই জীবন নয়। জঙ্গলের মধ্যেও ফুল ফোটে; তাই বলে জঙ্গলকে, তার গাছ-পালার বিশৃঙ্খলাকে, তার জন্তু-জানোয়ারের ভয়ার্ত চিৎকারকে তো আর অস্বীকার করা যায় না!” এডার পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ; “তোমরা কোনোদিনও এই শ্রমশিল্প জগতের জঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করোনি। তোমরা এ সমাজের মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে চাওনি—নিজেরা তা শুধু অধিকার করতে চেষ্টা করেছ। যন্ত্রের মালিক না হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

তার জন্য খাটুনি—এইটেই তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড় অন্যায় বলে গণ্য হয়ে এসেছে। যন্ত্রের মালিক হলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!” এভার এই দোষারোপের আড়ালে, খুঁজলে হয়তো কিছু সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল ঝোঁকটা উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারের উপরই গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে ; অথচ বর্তমান ধনতান্ত্রিক উৎপাদনশক্তি-প্রসূত শ্রমশিল্প-সমাজের মানবমন-বিধ্বংসকারী মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে সচেতন আক্রমনে, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেক সময় ব্যর্থ। আধুনিক উচ্চমানের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মেশিন-ঘনিষ্ঠ শ্রমিক যে প্রায় অটোম্যাটন বা কলের মানুষে পরিণত হচ্ছে—এ কথা অনস্বীকার্য। শ্রমিক-আন্দোলনের পক্ষে এর থেকে বড় ক্ষতিকারক আর কি হতে পারে? শ্রমিকদের সংগ্রামশীলতা ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে চিরতরে পঙ্গু করে দেবার সবচেয়ে বড় উপায়, তাদের চিন্তাশক্তিকে সংজ্ঞাহীন করে দেওয়া, যন্ত্রের নিত্যনৈমিত্তিক আওতায় এনে তাদের হৃদয়কে মানবিকমূল্যশূণ্য করে তোলা ; কার্ল মার্কস যার বর্ণনা করে বলেছিলেন—“…the intellectual desolation, artificially produced by converting immature human beings into mere machines for the fabrication of surplus-value, a state of mind clearly distinguishable from the natural ignorance which keeps the mind fallow without destroying its capacity for development…”(ক্যাপিটাল, ১ম পর্ব)। এ যুগের শ্রমশিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এইভাবে শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার কাজে নিয়োজিত করেছে। এ সমস্যার সমাধান অবশ্যই এডা-নির্দেশিত শ্রমশিল্প-বর্জন ও গ্রাম-প্রত্যাবর্তন নয়। তার এ মোহের বিনাশ ঘটতে বেশি দেরি হয় না, যখন দূরের গ্রামে স্বামীর সঙ্গে সংসার গড়তে যায় সে। এ আশাভঙ্গের কাহিনী অবশ্য ওয়েস্কারের শেষ নাটক ‘আইম্ টকিং অ্যাবাউট্ জেরুজালেম’-এ বর্ণিত হয়েছে। যাই হোক, মোটকথা, শ্রমশিল্পজগতে শ্রমিকের শ্রমপদ্ধতিকে আরও মানবোচিত করার দাবি না তুললে, শ্রমিক-আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সাধনের মূল হাতিয়ার—অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীই—দুর্বল হয়ে পড়বে। এ আশংকার এত বিস্তারিত আলোচনা ‘চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি’তে অবশ্যই নেই ; কিন্তু তার ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। এডার শেষ কথা : “How can we

care for a world outside when the world inside is in disorder ?"

রাজনীতি থেকে পলায়নী প্রবণতাতেও মানসিক মুক্তি মেলে না। সেরা-হ্যারির পুরনো বন্ধু মন্টি সস্ত্রীক এসেছে কাহ্‌নদের বাড়িতে। হ্যারি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বাকশক্তিহীন-প্রায়। মন্টি শাক-সবজীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যস্ত; কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছে অনেককাল। পারস্পরিক স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে অতীতের রাজনৈতিক জীবনের কথা এসে পড়ে। যেহেতু সেরা আজও কমিউনিস্ট ও মন্টি পার্টিত্যাগী, ব্যাপারটা অস্বস্তিজনক হয়ে ওঠে। অন্য প্রসঙ্গে আলোচনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলেও, রাজনীতি যাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, তাদের অতীতের স্মৃতির অর্থই কমিউনিস্ট পার্টির কথা। তাই মন্টি অবশেষে সেরাকে বোঝাতে চায় কেন সে পার্টি ছেড়েছে। সোবিয়েতের তথাকথিত ইহুদী-বিদ্বেষের কথা বলে, পার্টি কর্মীদের উগ্র স্বভাবের কথা বলে। জবাবে সেরা বলে—"And supposing it's true, Monty ? So ? What should we do ? Bring back the old days ?" মন্টি নিরুপায় হয়ে বলে—"সমস্যার কোনো সমাধান নেই।...একজন মানুষ এর বেশি কি করতে পারে ? সেরা, বিশ্বাস করো। একটা বাড়ি, কয়েকটি বন্ধু আর নিজের পরিবার—এর থেকে বড় জীবনে আর কি আছে ?"

সেরা: আর যখন তোমার পরিবারের ওপর কেউ অ্যাটম বম ফেলবে ?

মন্টি: (অনুনয়ের ভঙ্গিতে) বলো কি করতে পারি আমি ?...আমি নেহাতই সামান্য। কাকে আমি বিশ্বাস করব ? এ জগতটা বিরাট আর ঘৃণ্য উন্মাদ রাজনীতিবিদে ভর্তি! আমি তাদের তো বিশ্বাস করতে পারি না, সেরা।"

মন্টির স্বচ্ছ যুক্তির আড়ালে তার নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলো অদ্ভুত-ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অতীতকে অস্বীকার করতে গিয়েও, সে দিন-গুলির উদ্দীপনা, ভ্রাতৃত্ববোধের স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে: "All the songs we sang together and the strikes and the rallies...... Everyone in the East End was going somewhere. It was a slum, there was misery but we were going somewhere. The East End was a big mother."

এডার অবসাদজনিত রাজনীতিস্পৃহাহীনতা, মন্টির পার্টিত্যাগোত্তর অতীতমুখী আকুলতা, আমাদের দেশেও পরিচিত ঘটনা। রনি শেষ দৃশ্যে ব্যর্থ-বিহ্বল হয়ে যখন মায়ের কাছে দাবি জানাচ্ছে : "Take me by the hand and show me who was right and who was wrong. Point them out. Do it for me. I stand here and a thousand different voices are murdering my mind."—তখন তার এই আকুতিতে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের রাজনৈতিক দ্বিধা-সংকোচের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই। ঠিক এই কারণেই চরিত্রগুলি সার্থক সৃষ্টি। আসলে সমস্যাটির একদেশদর্শী সমাধান না দিয়ে, বিভিন্ন কোণ থেকে তার সামগ্রিক চেহারাটা তুলে ধরার ফলেই 'চিকেন্ স্যুপ্ উইথ্ বার্লি' একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাটকে পরিণত হয়েছে।

ওয়েস্কারের ত্রয়ীর পরবর্তী নাটকগুলি সময়ানুক্রমিক সূচীরক্ষার প্রচলিত রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই দ্বিতীয় নাটক 'রূট্‌স্' যদিও এই ত্রয়ীর অন্তর্গত, সময়কালের সুনির্দিষ্ট কোনো চিহ্ন তাতে নেই। ঘটনাগুলি পূর্ববর্তী নাটকের উল্লিখিত তিনদশকের মধ্যবর্তী বলে মনে হয়। 'রূট্‌সের' চরিত্ররাও নূতন ও অপরিচিত। স্বচ্ছন্দে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটক বলে অভিহিত করা যায়। 'চিকেন্ স্যুপ্ উইথ্ বার্লি'র সঙ্গে এর ক্ষীণ সংযোগ রক্ষা করছে রনি, যে স্বয়ং এ নাটকে অনুপস্থিতই রয়ে যায়, কিন্তু যার অস্তিত্ব নাটকের মূল কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নর্ফকের গ্রামের মেয়ে বীটি ব্রায়ান্ট লণ্ডনে চাকরি করতে গিয়ে রনি কাহ্‌নের সঙ্গে প্রণয়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। রনিকে গ্রামের বাড়িতে সপ্তাহান্ত কাটাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে, বীটি ছুটিতে বাড়ি ফেরে। রনির আগমনের অপেক্ষায় বীটির উৎসাহ এবং অবশেষে তার আসার পরিবর্তে এক হৃদয়বিদারক পত্রের প্রেরণ—যে চিঠিতে রনি জানায় যে তার পক্ষে বীটির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা নানা কারণে আর সম্ভব নয়—এই কাহিনীই 'রূট্‌স'-এর মূল কাঠামো। 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'তে যেমন শ্রমিকসম্প্রদায়ের একটা বিশেষ অংশের সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছিল, এ নাটকে আধুনিক ইংলণ্ডের গ্রামীন শ্রমজীবীর প্রতিনিধিস্বরূপ একটি পরিবারের এক মর্মান্তিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বীটির গ্রাম্য মানসিকতা লণ্ডনের আবহাওয়ায় ও রনির পরিচালনায় চিন্তাশীলতার রূপ গ্রহণে প্রস্তুত হচ্ছে। স্বভাবতই তার মা-বাবা-বোনদের

আচার-ব্যবহার, রুচি, কথাবার্তা—সবকিছু সম্পর্কেই বীটির মত স্বতন্ত্র। উভয় পক্ষ থেকেই পারস্পরিক বুঝবার অক্ষমতাটা বীটি ও তার মায়ের কথোপকথনেই পরিস্ফুট। উভয়েরই সংলাপ বিরুদ্ধাভিপ্রায়প্রসূত। বীটির কথার বহুলাংশই রনি-সম্পর্কিত, নূতন সদ্য-আস্বাদিত সাংস্কৃতিক জগতের আলোর চমকে দীপ্ত। অপর পক্ষে তার মা, গ্রামের বাসি ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বীটিকে ক্লান্ত করে তুলছে। শেষে মেয়ের বিরক্তির সুস্পষ্ট প্রকাশে মা বলে ওঠে: "I don't know what's gotten into you gal, no I don't." মায়ের হাল্কা সুরের আধুনিক গান শুনবার প্রবণতার বিরুদ্ধে বীটি নূতন আমদানী রুচিবোধের পরিচয় দেয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে। 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট' চিত্র-রচনা করে ঘর সাজায়। রনির নজির উল্লেখ করে সস্তা 'কমিকের' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। শুনে তার ভগ্নীপতি জিমি ঠাট্টা করে বলে: "What's alive about a person that reads books and looks at paintings and listens to classical music ?" এই নূতন রুচিবোধের সমর্থনে অবশ্য বীটি নিজের ভাষা খুঁজে পায় না; রনির উক্তির শরণাপন্ন হতে হয়। অধিকাংশ সময়ই সে রনির ভাষায় কথা বলে। তার উদ্দীপনা, ছুটোছুটি ও কর্মতৎপরতায়, আমরা 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'র অল্পবয়সী রনির উদ্দামতার ছায়া খুঁজে পাই। বোঝা যায়, শুধু রনির কথাই নয়, তার চরিত্রের আকর্ষণীয় গুণগুলিও মেয়েটিতে সংক্রামিত হয়েছে। কারণ সমস্ত নাটকের অন্যান্য চরিত্রদের প্রাণহীন নিশ্চল ঔদাসীন্যের মধ্যে একমাত্র বীটিই জীবন্ত ও চারিপাশের ঘটনায় তার মন সংবেদনশীল। পরিবেশের সঙ্গে তার বিরোধটা গ্রাম-শহরের পুরাতন সংঘাতের পুনরুত্থান বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। আসলে সংঘর্ষটা বুদ্ধিবাদী শ্রমজীবী ও তার নির্মনন সহকর্মীদের মধ্যে—যে সংঘর্ষ ইংলণ্ডের গ্রাম ও শহর, উভয়ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান সত্য বলে পরিগণিত হচ্ছে। বীটি একজায়গায় মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলছে: "You give me nothing that was worth while, nothing...... I can't even speak English proper because you never talked about anything important....It makes no difference country or town. All the town girls I ever worked with were just like me." জীর্ণ রুচিহীন অতীতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বীটি যত স্পষ্ট হতে পারে, বিকল্প নূতন রুচিবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতার সমর্থনে সে ততটা আত্ম-

নির্ভরশীল নয়; রনির শরণাপন্ন হতে হয়। নূতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধগুলি স্পষ্টতই তার এখনও পর্যন্ত আয়ত্বে আসেনি।

কিন্তু এই সংঘর্ষের অন্তরালে ইংলণ্ডের গ্রামীন শ্রমজীবীশ্রেণীর যে চেহারা চোখে পড়ে তা সত্যিই মর্মান্তিক। তাদের আর্থিক দারিদ্র্য হয়তো কিছুটা দূর হয়েছে; দু-একজনের ঘরে টেলিভিশন্ এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। শহরে শ্রমিকধর্মঘট হচ্ছে শুনে, তা ভেঙে দু-পয়সা বেশি রোজগার করার উৎসাহ প্রকাশ করতে জিমি দ্বিধা বোধ করে না। বিশ্বব্যাপী কি ঘটছে, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেও এরা আত্মসন্তুষ্ট। বীটির জ্ঞানাহরণের প্রচেষ্টাকে তাই এরা বিদ্রূপ দৃষ্টিতে দেখে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, জনগণের ধনতন্ত্র ইত্যাদি মুখরোচক সংজ্ঞার্থের আড়ালে শ্রমিকসাধারণকে ক্রমশই একটা চিন্তাশূন্য অর্থরোজগারসর্বস্ব মানসিকতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এদের এই সাংস্কৃতিক দারিদ্র্যের জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জার অভাব, নিজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসচেতনতা, এ যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থ-আস্ফালনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। অর্থপ্রাপ্তির আশায় উৎকোচের পরিবর্তে মানুষের চিন্তাশক্তিকে জড়পদার্থে পরিণত করার এ জাতীয় দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। কমিউনিস্টরা একটা জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী; তাই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবীর সংগ্রামেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতকলা—এক ব্যাপক জগতে তাদের আগ্রহ। ঠিক এই কারণেই পূর্ববর্তী নাটকের শুরুতে সেরা কাহ্নের সংসার ও পরিবেশকে যত জীবন্ত ও বহুমুখী বলে মনে হয়, 'রুট্স্'-এর বীটি ব্রায়ান্টের পরিবার তাদের পাশে ততই ম্লান ও নির্জীব হয়ে বিলীয়মান হয়ে পড়ে।

'রুট্স্'-এর অবিস্মরণীয়তা তার শেষাংশে। সারাদিন রনির আগমনের অপেক্ষায় তার সম্বর্ধনার প্রস্তুতির ব্যস্ততায় ক্লান্ত বীটি যখন রনির কাছ থেকে চিঠি পেয়ে জানতে পারে তাদের দুজনের সম্পর্ক আর স্থায়ী হবে না, তখন এ জাতীয় নাটকের চিরাচরিত পরিণতি অনুসারে আমরা আশা করি যে বীটি এবার ভেঙে পড়বে। কিন্তু বীটি সত্যানুসন্ধানের সংগ্রামে সৎ ও মননশীল। তাই চিঠিটা পড়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ এতদিনের নিরুদ্ধ জগৎটা তার কাছে আলোকিত হয়ে ওঠে। রনির সঙ্গে এযাবৎকালীন সম্পর্কটা নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেয়: "He always

wanted me to help him but I never could....He gimme a book sometimes and I never bothered to read it....He used to beg me to discuss things but I never saw the point on it." রনির অপেক্ষায় উপস্থিত বীটির মা-বাবা, বোন, ভগ্নীপতি—প্রত্যেকেই ঘটনাটাকে অবধারিত ভেবে, বীটির উন্নাসিকতার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে মনে করে যারপরনাই আনন্দিত। তাকে সান্ত্বনা দিতে কেউই এগিয়ে আসে না। বীটি ক্লান্ত হয়ে বলে : "So you're proud on it? You sit there smug and you're proud that a daughter of yours wasn't able to help her boy-friend." তার উদাসীন আত্মীয়স্বজনকে ধিক্কার দিতে দিতে বীটি অনুভব করে : "কৃষক-পরিবারে জন্ম হলেও, আমার কোনো শেকড় নেই···পৃথিবীটা দুহাজার বছর ধরে বড় হয়ে উঠছে, অথচ আমরা কিছুই জানি না। আমরা নিজেরা কি, কোথা থেকে এসেছি—কিছুই জানি না।···Education cut only books and music—its asking questions all the time." প্রায় নিজের মনেই বীটি সংস্কৃতি, সুস্থ রুচিবোধ, এক কথায় চিন্তাশীলতার শেকড়ের অভাবের কথা বলে চলে। বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন আবিষ্কার করে ফেলে বীটি। নিজের কথা যেন ও নিজে এই প্রথম শুনছে। চারিদিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলে—"শুনছ? শুনতে পাচ্ছ? আমি কথা বলছি। আমি কথা বলছি।" স্বর্গীয় কিছু যেন উন্মোচিত হয়েছে ওর সামনে, এই ভঙ্গিতে সে উদ্দীপ্ত হয়ে বলে ওঠে : "I'am not quoting no more···it's happening to me, I can feel it's happened, I'm beginning, on my own two feet—I'm beginning." রনির বচন-উদ্ধৃতির প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে, বীটির নিজের ভাষায় চিন্তা প্রকাশ করার ক্ষমতার জন্মলগ্নে, 'রুট্‌স্'-এর যবনিকাপাত। নাটকটির নাম হয়তো 'এক বুদ্ধিবাদীর জন্ম' দেওয়া যেত। কিন্তু 'রুট্‌স্' কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বীটির আলোকপ্রাপ্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল তার জীবনযাত্রার মূল শিকড়—তার পরিবার; অন্ধ, চিন্তাশূন্য, আত্মসন্তুষ্ট ব্রায়ান্ট পরিবার। বীটির নিজের ভাষায় : "It's not only the corn that need strong roots, you know, it's us too." তাই নাটকের বক্তব্যর সমস্ত প্রবণতাটা মানবজীবনের চিন্তাশক্তির এই শিকড়ের প্রয়োজনীয়তার উপরই গিয়ে পড়েছে।

নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে ত্রয়ীর মধ্যে 'রূট্স্' সর্বশ্রেষ্ঠ। নাটকটি স্পষ্টতই 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'র মতো প্রকাশ্য রাজনীতি সম্পর্কিত নয়। অবশ্য রাজনৈতিক চিন্তাটা বক্তব্যের অধঃস্রোতরূপে বয়ে চলেছে। বীটির সঙ্গে তার পরিবারের দ্বন্দ্বটা আসলে সমকালীন সমাজব্যবস্থাসৃষ্ট সমস্যারই রাজনৈতিক সমালোচনা। এর তুলনায় 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম্' দুর্বল বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানের পরমুহূর্তেই ডেভ্ ও এডার গ্রামে সংসারস্থাপনের চেষ্টা ও বিফলতার কাহিনীই এ নাটকটির উপপাদ্য। গত শতাব্দীর ইংরেজ কবি উইলিয়ম মরিসের কায়িক শ্রমকে আনন্দদায়ক করে তোলার বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ডেভ্ স্বাধীন সূত্রধরের কাজ নিয়ে নিজেদের জেরুজালেম সৃষ্টি বা সমাজতন্ত্রকে বাস্তব ঘরোয়া রূপ দেবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। সে ব্যর্থ হয় নানা কারণে—তার সঙ্গীদের ভগ্নোৎসাহকারী মনোভাব, নিজের অক্ষমতা এবং সর্বোপরি তার কর্মসূচীর অবাস্তবতা। 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'তে এডা, শহরের শ্রমশিল্পসমাজের মানবতাবিরোধী আবহাওয়ার বিরুদ্ধে যে তীব্র আক্রোশ প্রকাশ করেছিল, তার প্রতিধ্বনি এ নাটকের প্রতি ছত্রে পরিব্যাপ্ত। বক্তব্যে নূতনত্ব না থাকলেও সংলাপ-রচনায় ও চরিত্র-সৃষ্টিতে ওয়েস্কার তাঁর পূর্বেকার নৈপুণ্য বজায় রেখেছেন।

আর্নল্ড্ ওয়েস্কারের রাজনৈতিক মত জানি না। তবে স্পষ্টতই তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনটি নাটকেই চরিত্রদের ব্যক্তিগত প্রবণতার সংঘর্ষে সমস্যার সৃষ্টি হলেও, তার অন্তরালে সর্বত্রই এক সর্বশক্তিমান সমাজ-ব্যবস্থা সর্বগ্রাসী দৈত্যের মতো বিরাজ করছে। 'রূট্স্'-এ ব্রায়ান্ট পরিবারের অজ্ঞতা, রুচিহীনতা ও বীটির প্রতি সহানুভূতিশূন্য মনোভাব, এই ব্যবস্থারই হতভাগ্য পরিণাম। এদের চিত্রায়ণে, প্রচলিত মামুলি 'ভিলেন' রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও যেমন নেই, দয়া-দাক্ষিণ্যর ভাবপ্রবণতায় সিক্ত করার অপচেষ্টাও তেমনি অনুপস্থিত। একটা নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনাভঙ্গি লক্ষণীয়। পরস্পরবিরোধী ও সূক্ষ্ম পার্থক্যসম্পন্ন চরিত্রদের এই জাতীয় নিরাসক্ত অকপট বিশ্লেষণেই ওয়েস্কারের কৃতিত্ব। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, চিরায়ত সাহিত্যের গভীর জীবনবোধ ও ব্যাপক জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি ওয়েস্কারের নাটকে অনুপস্থিত; সমসাময়িক ইংলণ্ডের একটি বিশেষ শ্রেণীর কয়েকটি সমস্যার বিবরণমাত্র পাওয়া যায়। এ সমস্যাগুলি একটি দেশের বিশেষত্বরূপে

বর্ণিত হলেও, বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যসাধনের পথে সবচেয়ে ক্ষিপ্রগামী শক্তি হবে শ্রমিক-সাধারণের মননশীলতার উন্মীলন। লেনিনের কথাগুলি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : "Without knowledge the workers are defenceless; with knowledge they are a force." সৎ বুদ্ধিবাদীতে রূপান্তরে বাধাগ্রস্ত হয়েই ডেভ্-এডা বর্তমান শ্রমশিল্প সমাজ থেকে পালিয়ে যায়, বীটি ব্রায়াণ্ট তার পরিবার থেকে বিচ্যুত। এদের বৈশিষ্ট্য এরা কেউই শ্রেণীত্যাগী, আদর্শচ্যুত হয়ে উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশাধিকারলাভে ব্যগ্র নয়, যেমন আকাঙ্ক্ষী 'অ্যাংগ্রি ইয়ং মেন'দের উপন্যাস-নাটকের চরিত্ররা। ডেভ্ গ্রামে গিয়ে স্বাধীন শ্রমজীবী হবার চেষ্টা করে; ব্যর্থ হয়ে সে ফিরে আসে স্বসমাজে। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রামে উদাসীন হয়ে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার বিপদ সম্পর্কেও ওয়েস্কার সচেতন। তাই 'রুট্‌স্'-এ অনুপস্থিত রনির চিঠিতে তার আত্ম-সমালোচনা হৃদয়ঙ্গমযোগ্য : "If I were a healthy human being it might have been alright but most of us intellectuals are pretty sick and neurotic...and we couldn't build a world even if we were given the reins of government." সুতরাং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে লালিত আধুনিক শ্রমশিল্প সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমণকে ওয়েস্কার গান্ধীবাদী বর্জনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক; তার মননবিরোধী ও বুদ্ধিনিরোধক মূল্যবোধের বিপক্ষে সুস্থ যুক্তিনির্ভরশীলতা সৃষ্টির চেষ্টাতেই নাটকের চরিত্ররা সংগ্রামে ব্রতী। অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে এ সংগ্রাম স্বতন্ত্র হতে পারে না; বরং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রচেষ্টারই একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে তা পরিগণিত হওয়া উচিত।

তবুও, একদিকে রনি, ডেভ্ ও এডার দ্বিধা-সন্দেহ ও যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন, যাতে আমাদের নিজেদের কোনো কোনো সময়ের হতাশা ভাষা পায়, আর অন্যদিকে অভিজ্ঞতায় জর্জরিতা বৃদ্ধা সেরার অবিচলিত, সন্দেহ-উদাসীন আদর্শানুরক্তি—এই উভয়পক্ষেই আমাদের সহানুভূতির পাল্লা দোদুল্যমান। কারণ এদের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরবিরুদ্ধ বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও, আসলে পরস্পর-পরিপূরক। বিশ্বাসশক্তির স্থৈর্য ও যুক্তিপ্রদর্শনের সাহসের সমন্বয়েই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের আশ্বাস নিহিত রয়েছে। তাই 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম্'-এ ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের অন্তিম পর্যায়ে

দাঁড়িয়েও ওয়েস্কারের চরিত্ররা সমাজতন্ত্রে স্থিরবিশ্বাসী। রনি তার বাবার কথা স্মরণ করে বলে : "The difference between capitalism and socialism, he used to say was that capitalism contained the seeds of its own destruction, but socialism contained the seeds of its own purification." ওয়েস্কারের তিনটি নাটকে বর্ণিত নানা হতাশা, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে এই আশার বাণীটিই একমাত্র আলোক যা মোহভঙ্গকেও সত্যাকৃতিতে রূপান্তরে সক্ষম।

The Wesker Trilogy. Arnold Wesker. Jonathan Cape. London. 21/s.

শুধু ফুল

কৃষণ চন্দর

—কি ধরনের ঘর ভাই তোমার? বাড়িভাড়ার দালাল আমাকে জিজ্ঞেস করল। সে "তুমি" সম্বোধন করল আমার নোংরা পা-জামার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে।

—আমি এমন একটা ঘর চাই যাতে ঘর একটি হলেও তার সঙ্গে যেন আলাদা একটা বাথরুম থাকে। আর সেই ঘরের সামনে যেন সবুজ ঘাসে ভরা আঙিনা থাকে। এবং সেই সবুজ ঘাসকে ঘিরে থাকে ফুলগাছ। সেই আঙিনার মাঝে এমন একটি জায়গা থাকে যেখানে বসে রোদ পোহানো যায়। সেই সবুজ ঘাসের ওপর মাঝে-মাঝে যদি কোনো সুন্দরীকে বসতে দেখি তাহলে ভালোই হয়।

আমার পছন্দসই বাড়ির একটি ছবি তুলে ধরলাম।

—মশাই, বাসাবাড়ির খোঁজ না করে নিজের বুদ্ধির ইন্‌সিওর আগে করান।

লোকটা খুব সমঝদার মনে হচ্ছে। আড়চোখে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে একবার দেখে নিলাম ওকে।

দালাল আমার কাছে এসে আস্তে বলল, ভাড়া কত দেবে?

—পঁচিশ টাকা।

—পঁচিশ টাকা! বলেই লোকটা হাঁচি ফেলে আবার বলল, পঁচিশ টাকায় শুধু ঐ ঘাস পাবেন, বাড়ি নয়।

—বাড়ি খোঁজার জন্য তোমাকে দৈনিক তিন টাকা করে দিচ্ছি। এই ধরনের কথা এখন বলা তোমার উচিত হয়নি! আর কোনো কথা না বলে চলো বাড়িগুলো দেখাবে।

দালালটি তিন টাকার দড়িতে বাঁধা। তাই আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার মতো হাঁটতে আরম্ভ করে দিল। ভাবলাম, প্রত্যেক মানুষের গলায় দড়ি বাঁধা আছে। তিন টাকার দড়ি অথবা তিনশো বা

তিন হাজার বা তিন লাখের। যে দামেরই হোক না কেন দড়ি একটা বাঁধা আছে। সত্যি কথা বলতে কি আমি একটা দড়ি খুঁজছি, তবে মোটা টাকার দড়ি নয়, খুঁজছি গলায় দেওয়ার জন্য। আমি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি আত্মহত্যা করার। হাঁটার সময় মন আমাকে প্রশ্ন করল, মরবেই ঠিক করলে যখন তখন আর বাসা খুঁজছ কেন? কিসের প্রয়োজনে?

আমি মনকে বললাম, দেখ, এ-ব্যাপারে তুমি নাক গলিওনা। তোমার জন্যেই আজ আমার এই দশা। তোমারই জন্যে আমি এক বাজে প্রেমিকার পেছনে ছুটেছি…তোমারই জন্যে আমি একটা বাজে চাকরি গ্রহণ করেছি… তোমার কথা শুনে চলাতেই আমার ভাগ্যে জুটেছে কয়েকটা অপদার্থ বন্ধু… সারা জীবন তুমি আমাকে ভুল পথে চালিত করলে। তাই বলে দিচ্ছি আজ তোমার কোনো অধিকার নেই আমার এ-ব্যাপারে নাক গলানোর। কে তুমি? কি অধিকার আছে তোমার আমাকে উপদেশ দেওয়ার।

—কই আমি তো কোনো কথা বলিনি তোমাকে। মন আবার বলল, শান্তভাবে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে মরবেই যখন ঘরের কী দরকার? একটা পিস্তল যোগাড় করলেই তো পারো। তাছাড়া নদী-খাল-বিল-রেলগাড়ি-বিষ এসব তো আছেই।

—তুমি একটি আস্ত আহাম্মক। তুমি আজও আমাকে চিনলে না। আমার মতো মানুষ কি কখনও একটা সাধারণ অথচ সস্তাধরণের মৃত্যুবরণ করতে পারে! আমি মরতে চাই সানন্দে, সুন্দর পরিবেশে। একটি পরিপাটী করা ঘর…নীলাভ আলোতে ঘরটা থাকবে স্বপ্নময়। ওপরের ফ্যানটা ঘুরবে। শুধু আমার মৃত্যু মুহূর্তে ফ্যানটা বন্ধ করব আর তাতে দড়ি বেঁধে ঝুলব। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও জানলা দিয়ে যেন দেখতে পাই আঙিনা, কুচি কচি ঘাস, ঘাসের আলিম্পনকে ঘিরে নানান রঙের ফুল। রোদ পোয়ানোর জায়গাটা। আর সেই মুহূর্তেই যদি দেখতে পাই পাশের বাড়ির সুন্দরী তন্বী তার রেশমী-কালো চুল এলিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে তখন নিশ্চয়ই বেশ লাগবে আমার।

—ওমা! রাত্রে রোদ কোথায় পাবে! তাছাড়া সেই অন্ধকার মাঝ-রাতে সুন্দরীই বা আঙিনায় বসে থাকবে কেন তোমার জন্যে?

—তাহলে আমি দিনেই আত্মহত্যা করব। আমি যাই করি ইউ শাট্-আপ।

মন চুপ করে গেল। ততক্ষণে একটি বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি। বেশ চমৎকার বাড়ি। গোল একটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম একটি সুন্দর ঘরে। প্রত্যেকটি দরজা-জানলার রঙ মনোরম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রঙের কারিগর যেন তার প্রাণের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে তুলেছে এই ঘরটাকে। পাশেই আর একটি ঘর। দরজা-জানলা সব নাকি সেগুন কাঠের। দালাল আমাকে বলে দিল তুটো ঘর পাশাপাশি। একটা আমার জন্যে আর একটা বউয়ের জন্যে। বউ! বিয়ের পরে দিন কয়েক যাকে স্বামীরা সব সময় ঘিরে থাকে তারপর সারা জীবন ঝগড়া ঝাঁটিতে কাটে। জীবন সেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে। খাটে বিছানা পাতা আছে। বা! ঘরের একটি দরজা খুললেই সোজা বাথরুমে যাওয়া যায়। বাথরুম বটে! আরশির খেলা। মনে হয় এটি যেন দিনের পর দিন বসে উপন্যাস পড়ার জন্যে করা হয়েছে। মনে মনে বললাম, চমৎকার। আত্মহত্যার পক্ষে এর চেয়ে সুন্দর ঘর আর হয় না। তারপর তাড়াতাড়ি দালালের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাড়া কত?

—চারশো টাকা।

মুখটা আমার ঘোড়ার মুখের মতো লম্বা হয়ে গেল। দারুণ চটে গিয়ে বললাম, গবেট কোথাকার! আমি তো তোমাকে পঁচিশটাকার বাসা খুঁজতে বলেছি।

দালালটি আমাকে কোনো কথা না বলে যত তাড়াতাড়ি পারল সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিচে দাঁড়াল।

দালালটি তারপরে যে-বাড়ি দেখাল সেটাও ভালো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। আলো বাতাস আছে। বাথরুম, রান্নাঘর, বারান্দা এবং আঙিনায় ভরে আছে সবুজ ঘাস।

—ফুল গাছ কোথায়?

—ফুল গাছ তুমি লাগিয়ে নিতে পার। রোদপোয়ানোর ব্যবস্থাও হতে পাবে টাকা ঢাললে। তারপর আপনি বউকে পাশে বসিয়ে রোদ পোয়াবেন।

—ফুল গাছ লাগানোর মতো অত সময় নেই আমার। আর কি বললে, বউকে পাশে বসিয়ে রোদ পোয়াব?…আবে মিঞা! বউ যদি থাকত আমার তাহলে কি আগে রান্নাঘর খুঁজতাম না! যাক, আমি যে কাজের জন্য ঘর খুঁজছি সেটা হয়তো এই ঘরেও হতে পারে। আঙিনায় আমি না

হয় কয়েকটা ফুল গাছের টব রেখে দেব। রোদপোয়ানোর একটা মামুলি ব্যবস্থাও করব। শেষ পর্যন্ত এক সুন্দরীর বসে থাকাও না হয় কল্পনা করে নেব। ভালো কথা, ভাড়া কত ?

—আড়াই শো টাকা।

—মূর্খ কোথাকার। আড়াই শো টাকার বাড়ি দেখাচ্ছ কেন ? আমি তো শুধু পঁচিশ টাকারটা চাই।

দালাল নিরুত্তর রইল। মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তৃতীয় যে ঘরটি আমাকে দেখাল সেখানে প্রথমেই পরে বাথরুম তারপর সিঁড়িতে উঠে পাই একটি ঘর। তারপাশে রান্নাঘর। যদিও বাথরুমটা তার পাশেই হওয়া উচিত ছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, এই অঞ্চলে যতগুলো বাড়ি আছে তার প্রত্যেকটাতেই এই অবস্থা। ঘরের পাশেই কিচেন, আর নিচের তলায় বাথরুম।

—কারণটা কি ?

—কারণ হল বউ রান্নাঘর থেকেই যাতে বাথরুম, শোয়ার ঘর ও সিঁড়ি দেখতে পায়।

—ভাগ্যিস আমি একটি বউ পুষিনি। আমি কিন্তু কারোর চাউনিকে ভয় করিনা। রান্নাঘর ও বাথরুমে আমার অত দরকার কিসের। আমি না হয় বাথরুমের কাজটা রান্নাঘরেই সারব। দুটোই আমার কাছে সমান।

—ওসব তুমি আর এ-বাড়ির মালিক বুঝবে। বাড়িটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একশটি টাকা বের করো।

—আবার একশ টাকা কিসের।

বিরক্ত হয়ে সে বলল, একশ টাকা, মানে এক মাসের ভাড়া।

—ওরে বাবা! আমি হাত জোড় করে বললাম, আমি তোমার কাছে শুধু পঁচিশ টাকা ভাড়ার একটি ঘর চাইছি। তুমি আমাকে এত ঘোরাচ্ছ কেন ?

—আমার কাজ বাড়ি দেখানো। কি করে জানব শেষ পর্যন্ত আপনার কোন্‌টা পছন্দ হবে। আমার তো একটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখছি তো পঁচিশ টাকা ভাড়ায় বাড়ি খুঁজতে গিয়ে লোকে পছন্দ করে চারশো টাকার

ঘর, আর তাতেই থাকে। আবার চারশো টাকার বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে পঁচিশ টাকার বাড়িতেই আস্তানা গাড়ে। ভাড়াটিয়াদের মন বোঝা ভার।

এরপর দালাল আমাকে যে-বাড়িটি দেখাল সেটি পাঁচতলা-জাহাজের মতো দেখতে। বাড়িটার ওপরে জাহাজের ছবি আছে, লেখা আছে এস. এস. আত্মারাম মুলতানী। এ-বাড়ির ভেতরে মাংস, পেঁয়াজ এবং মদ খাওয়া নিষেধ।

—বউকে নিয়ে শোওয়া নিষেধ নয়তো ?

দালাল আশ্চর্য হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি বলে গেলাম, এখানে হয়তো চিন্তা করাও বারণ। আকাশের দিকে তাকানো, সশব্দে খিল আঁটা, বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়েশুয়ে সিগারেট টানা, কাঁধে তোয়ালে ফেলে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ব্রাশ করতে করতে কোনো যুবতীব দিকে তাকানো—এ সবই হয়তো নিষেধ। মশাই, আমি একটি ভালো বাসা খুঁজতে বেরিয়েছি। বিনোবা ভাবের আশ্রমে ঢুকতে নয়। কথাগুলো বলতে বলতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। দালাল লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে আমার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

এরপর দালালটা আমাকে যে-ঘর দেখাল তা দেখে সত্যিই মনে হল বাসাটার ভাড়া পঁচিশ টাকা। শুধু একটি ঘর।

বারান্দা নেই, ঘাস নেই, ফুল নেই। ঘরটা চারতলায়। খিড়কির রড-গুলো মোটা। বাড়িওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে জানলা টপকে পালানোর উপায় নেই। দরজা দেখে মনে হয় তিরিশ বছর আগে একবার রঙ করা হয়েছিল, এখন সে-রঙেব কোনো চিহ্ন নেই। আশ্চর্য, একটি পাখা ঝুলছে। আমি আমার কল্পনায় যে বাসাটির ছবি এঁকেছিলাম তার থেকে আঙিনা-ঘাস-ফুল এবং সুন্দরীর ছবি ছেঁটে ফেললাম। আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য শুধু একটি পাখাই যথেষ্ট। ঠিক করলাম এই ঘরটাই নিয়ে নেব।

—কিন্তু বাথরুম কোথায় ?

—ঐ পাশে আছে। এক কোনের দিকে তর্জনী দেখাল।

আমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখি সেখানে রয়েছে একটি মুটকী। তার চোখগুলো বড় বড়। সবেমাত্র কেউ যেন পাঁক থেকে তুলে এনেছে। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতের রঙ বদলে ফেলেছে। ঠোঁট ঘোড়ার

ঠোঁটের মতো পুরু। আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম, নতুন ভাড়াটে মনে হচ্ছে তোমাকে।

—মনে হচ্ছে কিনা জানিনা। আমি বাথরুমের দরজাটা খুঁজছি। আচ্ছা, এই বাথরুমটা কার? আপনার না আমার?

—এটা আমাদের দুজনেরই। তোমার এবং আমার।

"তোমার এবং আমার" কথাটা সে এমন ভাবে বলল যেন আমরা পরস্পরের জনম-জনমকে সাথী। সারাজীবনের জন্য আমার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক সেই মুহূর্তেই পাতানো হয়ে গেল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে আরো দুপা পেছিয়ে গেলাম। সেও এগিয়ে এসে বলল, চলে এস, ভাবনার কিছু নেই। দুজনেই মিলেমিশে কোনো ভাবে কাজ চালিয়ে নেব।

তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসল যেন মুরগীকে কেটে তার ছটফটানি দেখে কসাই হাসছে। আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম দরজার কাছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দালালকে বললাম, এটাও পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। দেখ, আমাকে যদি পঁচিশ টাকা ভাড়ার ঘর না দেখাতে পারো তাহলে আমার তিনটাকা ফেরৎ দাও।

—ভদ্র পাড়ায় পঁচিশ টাকার ঘর পাওয়া যায় না। দুর্গন্ধ বস্তিতে থাকতে রাজি থাক তো বলো পঁচিশ টাকার মধ্যে একটি ঘর পাইয়ে দিচ্ছি।

—চলো আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। তাড়াতাড়ি ঘর দেখাও।

তারপর সে আমাকে নিয়ে গেল একটি নোংরা বস্তিতে। সেখানকার গলিতে সূর্যের আলো ঢোকে না। সেই বস্তিতে নিয়ে গিয়ে দুর্গন্ধী-বস্তির দালালের সঙ্গে আড়ালে দু-চার কথা বলে নিল। তারপর ওরা দুজনে আমার কাছে ফিরে এল। আমার দালাল বলল, এ-লোকটা যে বলছে পঁচিশ টাকার ঘর বস্তিতে পাওয়া যায় না।

—তাহলে কত টাকার পাওয়া যাবে?

—ষোল টাকার আছে। তার চেয়ে বেশি টাকার ঘর নেই।

—তাহলে ষোল টাকারটাই দেখাও।

—ষোল টাকার ঘরও বেশি নেই, মাত্র একটি আছে। কিন্তু সে ঘরটা তোমার মনের মতো নয়।

—কেন নয়? আমি বস্তির দালালের দিকে তাকিয়ে বললাম।

নোংরা বস্তির দালাল থুতনী নেড়ে বলল, বাবু, ঐ ঘরের ভাড়াটে কালকেই মারা গেছে।

—তাহলে তো ভালোই হল, ঘরটা তো খালি হয়ে গেছে।

—তা খালি হয়েছে বাবু। দুর্গন্ধী বস্তির দালাল মুখে খৈনী পুরে বলল। কিন্তু ভাড়াটে যে আমাদের মতোই একজন গরিব মজুর ছিল। চুড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করত।

—মজুর ছিল তাতে ক্ষতি কি। চুড়ি তৈরি করত কিন্তু চুরি তো আর করত না।

—না বাবু, সেকথা নয়। দুর্গন্ধী বস্তির দালাল নিজের কোমর চুলকোতে চুলকোতে বলল, চুড়ি তৈরির মজুর ছিল বটে।...কিন্তু ওর যে ওই ফুঁ দিতে দিতে বুকের একটা রোগ হয়েছিল। খুব খারাপ রোগ।

—তাতে কী হয়েছে? প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো অসুখে পড়ে। এখন প্রত্যেক অসুখেরই পেছনে একটা কারণ থাকে। কারও ফুঁ দিয়ে অসুখ করে আবার কারও অতিরিক্ত খাবার খেয়ে।

—তুমি ঠিক বুঝতে পারছনা বাবু। বস্তির দালাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, ব্যাপারটা হল লোকটা পাঁচ বছর ধরে এই অসুখে ভুগছিল। রোগে ধুঁকে ধুঁকে কাজ করত। ওর বাঁচার বড্ড সাধ ছিল আর ছিল একটা বউ চারটে ছেলেমেয়ে। ও মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর খালি করিয়ে নেওয়া হল, কারণ ওর বউ আর ছেলেমেয়েদের মাসে ষোল টাকার মতো ঘর ভাড়া দেওয়ার অবস্থা ছিল না। ওরা এখন এর চেয়ে খারাপ একটা বস্তিতে চলে গেছে, সেখানে ভিখিরি আর টাঙাওয়ালারা থাকে। তাই বলছিলাম এই ঘর তোমার উপযুক্ত নয়।

ছোট্ট একটা ঘর। দরজাটা নড়ছে। জানলাগুলো কালো হয়ে গেছে ধোঁয়ায়। জলের কল দিয়ে যে জল পড়ছে তার রঙ ইঁটের গুঁড়োর মতো। নলের মুখ দিয়ে খুব পাতলা করে জল পড়ছে। ঘরের ভেতর হঠাৎ একটা গোলাপ ফুলের টব দেখতে পেলাম।

—একি, এখানে গোলাপ গাছ!

নোংরা বস্তির দালাল তার হলদে রঙের দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, বাবু এই টবটা তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে! আকাশ থেকে যেন পড়লাম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। লোকটা তো আমার সামনেই মারা গেছে। মরার সময় আমাকে শেষ কথা বলে গেছে—এ-ঘরে নতুন ভাড়াটে যে আসবে তাকে এই টবটা দিয়ে বলো, প্রত্যেক দিন যেন একটু জল দেয় যাতে এই গোলাপ গাছটা বেঁচে থাকে···লোকটা পাগল ছিল বাবু!

তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রচণ্ড একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল, বুকে আমার প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। ঘরের কোণে পড়ে আছে একটি গোলাপ ফুল। দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সেই ফুলের ওপর। ঘর আর ঘরের বাইরে চারিদিকেই রয়েছে নোংরা এবং অন্ধকার। অন্ধকার আর নৈরাশ্য। তার মাঝে শুধু একটি গোলাপ। মৃত্যুর সময়, ক্ষুধার সময়, জঘন্য অসহনীয় পরিবেশে, এই দরিদ্র মানুষের পরিবেশে—একটি গোলাপ। যেখানকার ঘরগুলোর ইঁটে নোনা ধরে খসে পড়ছে, যেখানে রঙের কোনো বাহার নেই, সেখানে মাত্র একটি গোলাপ।

আমি ওই ঘরটাই ভাড়া নিয়ে নিলাম। আজো সেখানে আছি।

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ : **বোম্মানা বিশ্বনাথম্‌**

সাহিত্যে ধর্মচেতনা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

কে কখন পৃথিবীর কোন্ দেশে সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং তাঁর আত্মচেতনার স্বচ্ছতায় মানবজীবন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল একথা ঠিক নির্ভুলভাবে বলা যেতে না পারলেও একটা কথা আমরা সকলেই নিঃসংশয়ে বলতে পারি, তিনি জীবন ও জগতের বিভিন্ন ঘটনা ও বস্তুগুলিকে অতিপ্রাকৃতের চিন্তা বা কল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পার্থিব মূল্যে সমৃদ্ধ এক একটি পৃথক সত্তারূপে দেখবার প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেবার মতো মানসিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিগত সামর্থ তখন লাভ করতে পারেন নি। পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যই আকারগত অথবা বস্তুগত উপাদানের দিক থেকে মূলত ধর্মনির্ভর। সাহিত্য সাধনার আদিযুগে কোনো সাহিত্যিকই তাঁর জীবনচেতনার বা সমাজচেতনার গভীরে ধর্মচেতনার অবাধ এবং অসংযত অনুপ্রবেশকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। যে-যুগে জীবনের ভালোমন্দকে দেবদেবীর ইচ্ছাধীন বলে মনে করে ও যে কোনো প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার পেছনে এক উদ্ধত অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়াশীল অস্তিত্বের কল্পনা করে মানুষ তৃপ্তি পেত, সে যুগে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র জীবনানুভূতির আশা করা হয়তো সম্পূর্ণ বৃথা।

প্রাচীন সাহিত্য প্রধানত ধর্মনির্ভর হলেও ভাববস্তুর দিক থেকে তাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। এক শ্রেণীর ধর্মনির্ভর সাহিত্য আছে যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্রকে অবলম্বন করে তার মাধ্যমে ধর্ম-অধর্ম বা পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করে তোলা এবং পরিশেষে ধর্মের হাতে অধর্মের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটানো। আমাদের দেশের 'রামায়ণ' 'মহাভারত', হোমারের 'ইলিয়াড' 'ওডেসি', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'প্যারাডাইস রিগেইন্‌ড' প্রভৃতি কাব্য ও মহাকাব্যগুলি সাহিত্যে স্থূল ধর্মনির্ভরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে স্বচ্ছন্দে পরিগণিত হতে পারে। সকল

মহাকাব্যেই দেখা যায়, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যাবলীর সমস্ত বাস্তবতা ও মানুষের অপরাজেয় পৌরুষের সমস্ত লৌকিক সত্যতাকে এক অলৌকিক মায়াজালে আচ্ছন্ন ও অবলুপ্ত করে দিয়ে কতকগুলি দুরন্ত পৌরাণিক দেবতা বা উপদেবতা পাতায় পাতায় আধিপত্য করেছে এবং তাদের এই অবাঞ্ছিত অশোভন আধিপত্যের দ্বারা কাব্যরসকে রীতিমত ক্ষুণ্ণ করেছে। মিল্‌টনের 'প্যারাডাইস রিগেইন্‌ড'-এ শয়তানের সঙ্গে খ্রীস্টের যুদ্ধ নিতান্ত হাস্যকর। 'মহাভারত'-এ ধর্মের ধ্বজাধারী কূচক্রী কৃষ্ণের কুটিল ইঙ্গিতে কর্ণ, দুর্যোধনের মতো বীরদের পতন ও পরাজয় মর্মবিদারক। হোমারের 'ইলিয়াড'-এ প্যারিস ও হেলেনের প্রেমাবেগ বিশুদ্ধ ও স্বতোৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে শুধু ধর্মের সম্মতি না থাকার ফলে তা ট্রোজনদের শোচনীয় ধ্বংসের কারণ হওয়াটা লেখকের সমকালীন ধর্মবোধ ও নগ্ন নীতি-চেতনারই পরিচায়ক। আবার কতকগুলি ধর্মমূলক সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, ধর্ম-অধর্মের কোনো দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা না করেই কোনো এক বিশেষ ধর্ম বা দেবদেবীর জয়গান করা। ভারতের বিরাট বৈদিক সাহিত্য, বাংলার বৌদ্ধ চর্যাপদ, নাথগীতিকা, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব কবিতা ও শাক্ত পদাবলী, ইংলণ্ডের এ্যাংলো-স্যাকসন যুগের যাবতীয় কবিতা, খ্রীষ্টীয় নবম শতকের জর্মান কবিতা প্রভৃতি এই ধরনের সাহিত্যের নিদর্শন।

আর এক শ্রেণীর ধর্মমূলক সাহিত্য আছে যারা যে কোনো রকমের স্থূল ধর্মনির্ভরতাকে কৌশলে পরিহার করে অতি সূক্ষ্মভাবে ধর্মকে প্রতীকরূপে প্রয়োগ করে তার মাধ্যমে স্বতন্ত্র এক বক্তব্যকে ব্যঞ্জিত করে তুলতে চেয়েছেন। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' ও চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্‌'কে এই শ্রেণীর সাহিত্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। Inferno, Purgatorio ও Paradiso নামে তিনটি ভাগে বিভক্ত এই রূপকধর্মী মহাকাব্যে দান্তে মৃত্যুর পর মানবাত্মার সমুচিত শাস্তি ও অনুশোচনার বিভিন্ন স্তরভেদ করে স্বর্গের পথে কাল্পনিক অধিগমণকেই বাণীরূপ দান করেছেন। দান্তে কল্পনা করেছেন, উত্তর গোলার্ধের নিচে অবস্থিত ও ভূগর্ভের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত প্রসারিত নরক হচ্ছে ফানেলের মতো ও মুখওয়ালা এমন এক বিশাল গর্ত যেখানে মৃত্যুর পর মানবাত্মারা অবস্থান করে। কিন্তু রূপকের দিক থেকে বিচার করলে এই নরক প্রতিটি মানবাত্মারই গভীরে অবস্থিত পঙ্কিল কামনা বাসনায় পূর্ণ এক একটি পাপের অন্ধকার গর্ত যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে নিক্ষেপ

করে। দান্তে কল্পিত 'পারগেটারিও' হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো এক দ্বীপে অবস্থিত এক বিশাল পর্বতের উপর এমন এক স্থান যেখানে মৃত্যুর পর একমাত্র অনুতপ্ত আত্মারাই অবস্থান করে। আসলে কিন্তু পারগেটারিও হচ্ছে মানবমনের সেই সমুন্নত স্তর যেখানে মানুষ আপন পাপকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক তীব্র অনুতাপের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়। তারপর পরিশেষে দান্তে মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদদের মতো দশটি স্বর্গের কল্পনা করেছেন। "From the thraldom of this corruption to the liberty of eternal glory" অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ এবং পাপ-জগতের বন্ধন হতে অনন্ত মুক্তির চিরন্তন গৌরবের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হবার পর মানবাত্মা যে স্বর্গসুখ লাভ করে তার তারতম্য অনুসারে দশটি স্তর আছে। ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে একে একে সব স্তর ভেদ করে তবে আত্মা পরম আনন্দ লাভ করে। দান্তে নিজেই এই মহাকাব্যের নায়ক, খ্রীষ্টীয় পাপচেতনাসম্পন্ন প্রতিটি মানবাত্মার মূর্ত প্রতীক-রূপে শয়তান-শাসিত ভুলের ভয়ানক অরণ্য থেকে ঈশ্বর-শাসিত সেই পরম সুখের স্বর্গরাজ্যের পথে অক্লান্ত অভিসারে এগিয়ে চলেছে। এই কাব্যে প্রসিদ্ধ ল্যাটিন কবি ভার্জিলকে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দান করেছেন দান্তে। এখানে ভার্জিল হচ্ছেন মানুষের সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানসত্তা ও শিল্পসত্তার প্রতীক যে জ্ঞান ও শিল্পপ্রতিভা মানুষ ঈশ্বরের করুণা ব্যতিরেকেই নিজের স্বাধীন চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা লাভ করে। কিন্তু দান্তের মতে শিল্প ও দর্শন যত বড়ই হোক না কেন তা কখনো ধর্মের সমপর্যায়ে উন্নীত হবার গৌরব লাভ করতে পারে না। এই জ্ঞান ও প্রতিভা ঈশ্বরানুভূতির সঙ্গে সার্থক-ভাবে সংমিশ্রিত নয় বলেই মানুষকে তা স্বর্গলাভের অধিকারী করে তুলতে পারে না। কাব্যে তাই ভার্জিল স্বর্গপথের পথিক হয়েও স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন না; তবে তিনি মৃত আত্মাগুলিকে আপন আপন পাপকর্মের প্রতি সচেতন করে দিয়ে তাদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করেছেন প্রচুর। এইভাবে দেখা যায় 'ডিভাইন কমেডি'র প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার অন্তরালে এক একটি রূপকাত্মক অর্থ অতি সুন্দরভাবে আত্মগোপন করে আছে। Can Grande della Scala নামক একজন অনুরাগী পাঠককে লেখা একখানি চিঠিতে দান্তে নিজে একথা স্বীকার করে গেছেন :

"The subject of the whole work, then, taken merely in the literal sense is "the state of the soul after death straight-

forwardly affirmed", for the development of the whole work hinges on and about that. But if, indeed, the work is taken allegorically its subject is : "Man, as by good or ill deserts, in the exercise of his free choice, he becomes liable to rewarding or punishing justice". মানুষের ইচ্ছাশক্তি মূলতঃ স্বাধীন। দান্তের মতে এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের উপরেই নির্ভর করছে তার পাপপুণ্য।

জিওফ্রী চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স'-এর নামকরণের মধ্যে যে ধর্মগন্ধিতার আভাস পাওয়া যায় কাহিনীর মধ্যে কোথাও সে আভাস সত্যমূর্তি লাভ করবার সুযোগ পায়নি কখনো। সমসাময়িক ইতালীর কবি ও কথা-সাহিত্যিক বোকাশিওর 'দি দেকামেরন' থেকে গল্প বলার এই অভিনব রীতি সম্পর্কে বিশেষ প্রেরণা লাভ করলেও এখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভূত পরিচয় দিয়েছেন চসার। তাছাড়া গল্প বলতে গিয়ে শুরুতে মানবজীবনের সমস্ত আশা আকাংক্ষা ঈশ্বরের উপর নিঃশেষে ছেড়ে দিয়ে যে ঈশ্বর প্রশস্তি গেয়েছেন বোকাশিও, তা কাহিনীর সাহিত্যরসের দানা বাঁধার পথে একান্ত প্রতিবন্ধক। সাহিত্যে ভক্তিরসের কোনো স্থান নেই ; তাই তাকে অন্য কোনো রসের আশ্রয়ে সাহিত্যে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু বোকাশিও প্রথমেই ভক্তিভাবের উচ্ছ্বসিত প্রাবল্যে ফেটে পড়েছেন।

"Ladies, it is most meet and right, that everything we do, should be begun in the name of Him who is the maker of all things. Certain it is, that all earthly things are transitory and mortal; attended with great troubles, and subject to infinite dangers which we who live embroiled with them and are even part to them, could neither endure, nor find a remedy for, were it not for the especial grace of God that enables us." (The Decameron, Novel I)

বোকাশিওর এই উগ্র ও অত্যধিক ঈশ্বরনির্ভরতা কিন্তু চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স'-এর মধ্যে একেবারে নিরুক্ত ও নিরুচ্চার। এখানে লণ্ডন থেকে ক্যান্টারবেরির সেণ্ট টমাস চার্চের পথে একদল তীর্থযাত্রী একে একে যে কাহিনী শুনিয়েছে তা তৎকালীন ইংলণ্ডের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের

দৈনন্দিন বাস্তব জীবনেরই সুখ-দুঃখের কাহিনী। তাতে কল্পনার বর্ণালী অনুরঞ্জন নেই এতটুকু। এখানে নাইট বলেছে তার বীরত্বের কথা, জমিদার বলেছে তার প্রেমের কথা, বাথের স্ত্রী বলেছে তার পাঁচ পাঁচটি স্বামীর ব্যবহারের কথা ও বিবাহ সম্পর্কে তার স্বাধীন মন্তব্য—এমনি করে এক একজন মানুষের জীবনের কথা এক একটি কাহিনী হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের কয়েকটি সাধারণ মানুষ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ যে জ্ঞান লাভ করেছে সেই জ্ঞানের কথাই চসার যথাসম্ভব আত্মনিরপেক্ষ হয়ে বিশেষ সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

দুই

'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তে ধর্মকে যত সূক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবেই প্রয়োগ করুন না কেন, অন্যত্র যখন তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেন, la sua voluntade e´ nostra pace, অর্থাৎ তোমারই ইচ্ছার উপর আমাদের সকল শান্তি নির্ভর করছে, তখন তাঁর উৎকট ধর্মাসক্তি ও অকুণ্ঠ ধর্মনির্ভরতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। একদিকে মানবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে অকপট স্বীকৃতিদান ও অন্যদিকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার স্থিতি-স্থাপকতার উপর জীবনের ভালোমন্দ সবকিছুর জন্য অকুণ্ঠ নির্ভরতা দান্তের কাব্যপ্রত্যয়ের মধ্যে এক জটিল বৈপরীত্যের উদ্ভব করেছে। এদিক থেকে ভার্জিলের কবিদৃষ্টি কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ এক মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা সমৃদ্ধ। তাই তিনি অকুণ্ঠভাবে বলতে পেরেছেন :

> "Felix qui potuit rerum cognoscere causas
> Quique metus, et inexorable fatum."

সেই মানুষই প্রকৃতপক্ষে সুখী যে কার্যকারণ নিয়মকে জানতে পেরেছে এবং নির্মম নিয়তি ও সকল রকমের ভয়কে পদানত করতে পেরেছে। মানুষের এই নির্ভীক ও দুর্বার আত্মশক্তির প্রতি অকপট বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই ভার্জিলের কাব্যপ্রত্যয় সমস্ত সংশয় ও বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পেরেছে এতখানি।

মানবজীবনের উত্থানপতনে মানবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিবেশ-প্রভাব উভয়েরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, একথায় শেক্স্পীয়ার মূলত

বিশ্বাসী হয়েও মাঝে মাঝে শিশুসুলভ এক সকরুণ অসহায়তায় ঈশ্বরের কোলে ঢলে পড়েছেন। 'কিং লীয়ার'-এ তিনি বলেছেন:

> "As flies to wanton boys, are we to to the gods ;
> They kill us for their sport."

আবার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত যুবরাজ হ্যামলেট কাতরভাবে বলে উঠেছে:

> "O God O God !
> How stale, flat, unprofitable seems to me
> All the uses of the world."

পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ইওরোপীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মগত সংস্কার ও বিশ্বাসের যে একাধিপত্য চলে তা একমাত্র বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও তার ক্রমোন্নতির দ্বারাই কিছুটা প্রশমিত হয়। রেনেসান্স বা নবজাগরণের ফলে মানুষের মনের অন্ধকার দিগন্তে যে স্বাধীন চিন্তার অভ্যুদয় হয়, তার স্বচ্ছ আলো মানুষকে কিছুটা সত্যসন্ধিৎসু করে তুললেও তার মনের উপর থেকে ওই ধর্মগত একাধিপত্যকে প্রশমিত করতে পারে নি বিন্দুমাত্র। পরে মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রচলিত ধর্মচেতনার বলিষ্ঠ দেহ থেকে ক্যাথলিক কুসংস্কারের কালো খোলসটাকে ছাড়িয়ে নূতন একটা পোশাক পরিয়ে দেয় মাত্র। প্রভূত সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই ধর্মসংস্কার চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত করতে সক্ষম হয় নি। একমাত্র ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব ও টমাস হাক্সলের কার্যকারণ নিয়ম সম্পর্কে সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বহু চিন্তাশীল মানুষের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং তখন থেকে অনেকে ক্রমশ ঈশ্বরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকেন। তাছাড়া বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ ও দর্পিত পদক্ষেপে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোসহ অন্যান্য বাস্তব অবস্থাগুলি একে একে ধ্বসে যাওয়ার পর নূতন যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে নূতন যে সব বাস্তব অবস্থা গড়ে ওঠে, তার ফলে মানুষের প্রচলিত জীবনভঙ্গিমার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তিত জীবন-ভঙ্গিমা এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে তার ভাবজগতে। প্রাচীনকালে মানুষ জগৎ ও জীবনের যে সব বস্তু বা ঘটনাকে এক অসহায় মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সহজভাবে গ্রহণ করত, এখন সেগুলিকে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে লাগল। এই নূতন যুগসন্ধিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর যাঁদের আস্থা অবিচল ও

অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল তাঁরাও যুক্তিসিদ্ধ এক চেতনার স্বচ্ছ আলো দিয়ে ধর্মের স্বরূপটিকে বিচার করতে শুরু করলেন।

তাঁরা বুঝতে পারলেন, ধর্ম মানেই আগেকার সেই অন্ধ সংস্কারপ্রবণতা ও কতকগুলি অতিপ্রাকৃত উপদেবতায় বিশ্বাস নয়; ধর্মচেতনা আসলে হচ্ছে মানুষের নীতিচেতনারই পরিণত রূপ। মানুষের মনে ন্যায় অন্যায় ভালো মন্দ প্রভৃতি বিষয়ে যে সহজ ও সাধারণ নীতিবোধ আছে, ধর্মের ঈশ্বর হচ্ছেন সেই চূড়ান্ত নীতির প্রতীক। দার্শনিক কাণ্ট বললেন, ধর্ম হচ্ছে নীতি। ফিক্‌টে বললেন, ধর্ম হচ্ছে জ্ঞান; এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে এমন এক বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চারিত করে, যার সাহায্যে মানুষ জীবনের অনেক মৌল সমস্যার সমাধান ও বিশ্বজীবনের সঙ্গে এক আত্মিক সঙ্গতি খুঁজে পায় এবং যা একান্ত-ভাবে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটায়:

"The essence of religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish object of desire."

স্বার্থান্ধ আবেগানুভূতিগুলিকে এক আদর্শ ও মহত্তম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল ধর্মের প্রকৃত কাজ। ধর্ম সম্বন্ধে এই দার্শনিক প্রত্যয় কিন্তু কোনো কাব্য বা সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় নি। বরং যে সব ধর্মপন্থীর দল ধর্মকে নীতির প্রতীক হিসেবে না দেখে সমগ্র বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত এক অনন্ত অদ্বৈত সত্যের প্রতি আত্মিক প্রবণতারূপে গণ্য করেন তাঁদের মত বিশেষভাবে প্রভাবিত করে অনেক কবিকে। এই সব কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থ, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ ও জর্মান কবি শিলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন সর্বেশ্বর-বাদী। ওয়ার্ডসোয়ার্থের বিশ্বাস ছিল, এক সর্বব্যাপী ঐশ্বরিক সত্তা প্রকৃতি-জগৎ ও মানুষের মনোজগতের সমস্ত বস্তু ও ঘটনার অন্তস্থলে ঘূর্ণীভূত কারণ-রূপে নিহিত থেকে সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করছে, যার:

"...Dwelling is in the light of the setting sun
And the round ocean and the living air,
And the blue sky and in the mind of man:
A motion and a spirit that impels

All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things."

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ও মানুষের অন্তরে বিরাজিত এই ঐশ্বরিক সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন ব্রহ্ম যিনি মানব মনের চেতনায় এক পরম আনন্দানুভূতি-রূপে প্রতিফলিত এবং যিনি "অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান" প্রতিটি বস্তুর অন্তরে তার চূড়ান্ত সত্যরূপে সমাহিত। যিনি বিশ্বসাথে যোগে বিহার করেন এবং যাঁকে স্পর্শ করা না গেলেও সকল দেহেই তিনি সহজভাবে ধরা দিয়েছেন। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই ধর্মগত প্রত্যয়ের প্রাণনালী থেকে রস সংগ্রহ করেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয় প্রধানত পরিপুষ্ট লাভ করেছে। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাঁদের যে আত্মীয়তাবোধ তাঁদের অনেক কবিতাকে মহত্বের গৌরব দান করেছে, সে আত্মীয়তাবোধ মূলত এই ধর্মচেতনার উপরই নির্ভরশীল, তা কখনোই স্বতোৎসারিত বা বিশুদ্ধ আবেগানুভূতি সঞ্জাত নয়। অনেক সময় তাঁদের ধর্মচেতনা ও জীবনচেতনা ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত হয়ে এক নীরস জ্ঞানগত কৃত্রিমতায় ঘনীভূত ও প্রকট মূর্তি ধারণ করে মূল কাব্যরসের সঙ্গে সম্মুখ বিরোধে অবতীর্ণ হয়েছে।

ক্যাজামিয়াঁর মতে কেন্দ্রীয় ধর্মাবলম্বী ইয়েট্সের অতীন্দ্রিয় ধর্মপন্থিতা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও সর্বেশ্বরবাদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো তাঁর এই সর্বেশ্বরবাদ তাঁর কাব্যে কোথাও উগ্রতায় প্রকটিত হয়ে উঠতে পায়নি ; বরং তা তাঁর অতীন্দ্রিয় ভাববস্তুর কাছে গোপনে আত্মসমর্পণ করে এক স্বপ্নমেদুর কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন, অজস্র প্রতীকী বস্তুর প্রান্তরালে সহজ সৌন্দর্যে অবগুণ্ঠিত। শিলার তাঁর কবিতায় ঈশ্বরের শক্তিমত্তা সম্পর্কে অনেক কথা বললেও ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা সম্পর্কে একেবারে নীরব। তাঁর মতে যে ঈশ্বর মানুষের জন্মের পূর্বেও মানুষকে ভালোবাসতেন তিনি স্বর্গ থেকে এক ঐশ্বরিক শৃংখলারূপে নেমে এসে মানুষের বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ শক্তিসমূহকে সংহত ও শৃংখলাবদ্ধ করে সৃষ্টির পথে চালনা করেন।

ব্রাউনিংয়ের ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদ কিন্তু এদের সকলের থেকে পৃথক। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর মানব-জগৎ ও প্রকৃতি-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষ শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম—এই তিনটি গুণের দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করতে পারে। এদের মধ্যে প্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট গুণ, কারণ এই প্রেমই

মানুষের শক্তি ও জ্ঞানকে উন্নত করে। যে ঈশ্বরের ইচ্ছাচক্রে মানুষের ভাগ্য গঠিত তাঁর মঙ্গলময় আশীর্বাদকে বিশ্বের ভালো মন্দ সব কিছুর মধ্যে নিহিত দেখেছেন ব্রাউনিং।

"All I could never be
All men ignored in me
This, I was worth to God, whose wheel the pitcher shaped."

ব্রাউনিংয়ের সকল শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবকল্পনা ও আদর্শ প্রেম সম্পর্কে সকল চেতনা এই উগ্র ঈশ্বরানুভূতি থেকে যে উৎসারিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ কারো থাকতে পারে না।

তিন

যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে একেবারে বিশ্বাস করেন না, দার্শনিক প্রত্যয়ের দিক থেকে তাঁদের সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—একজন বস্তুবাদী ও অপরজন নাস্তিকতাধর্মী অস্তিত্ববাদী। বস্তুবাদীদের মূল কথা হল, বস্তু-জগতের ভিতরে বা বাইরে আর কোনো সত্য নেই। আমরা যাকে চেতনা বা আত্মা বলে থাকি তা যে সকল উপাদান নিয়ে কোনো বস্তু গঠিত, বস্তুর সেই সব উপাদানগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এক শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের এদেশে চার্বাক দর্শনে এই জড়বাদী বস্তুধর্মিতার কথা সুন্দর-ভাবে উল্লিখিত আছে:

"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে…" অর্থাৎ জল, মাটি, অগ্নি, বায়ু পৃথিবীর এই চারটি মৌলিক পদার্থ থেকেই চৈতন্যের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্ত্যে অষ্টাদশ শতকে যদিও ফরাসী বস্তুবাদীরা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম ও ফিউডাল পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তথাপি আমার মনে হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র কার্ল মার্কসই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধর্মের সমস্ত অসারতা প্রমাণ করে তার প্রকৃত স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করেন। মার্কসের মতে—

"Religion is nothing but the fantastic reflection in man's mind of those external forces which control their daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatural forces."

ধর্ম হচ্ছে মানুষের মনে এমন এক অদ্ভুত মানসিক ক্রিয়া যার মধ্যে যে

সকল পারিপার্শ্বিক পার্থিব শক্তি তার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, সেইসব শক্তিগুলি এক একটি অতিপ্রাকৃত শক্তিরূপে প্রতিফলিত হয়। মার্কস বললেন, আদিমকালে মানুষ প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে যে অসহায়তা অনুভব করত, সেই অসহায়ভাবোধ থেকেই ধর্মবিশ্বাসের প্রথম উদ্ভব হয়। আবার আজকের দিনে সমাজে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী অনুরূপ এক দুর্বলতা ও অসহায়তা অনুভব করছে এবং এই দুর্বলতা ও অসহায়ভাবোধের পূর্ণ সুযোগ নিয়েই সেই পুরনো ধর্মবিশ্বাস এক দুষ্ট কীটের মতো তাদের মনের মধ্যে গোপনে পুষ্টিলাভ করে তাদের সমস্ত শক্তি ও সাহসকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলছে। এই ধর্মবিশ্বাস তাদের শেখাচ্ছে, যে সুযোগ ও সম্পদের অধিকার থেকে এ জীবনে তারা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত, যা তারা লাভ করতে পারছে না তাদের শক্তি দিয়ে তা তারা মৃত্যুর পর সব পাবে ঈশ্বরের অবিসংবাদিত মধ্যস্থতায়। এই-ভাবে ধর্ম তাদের এক ভ্রান্ত ও মোহপ্রসারী আশার মোহিনী মায়ার মধ্যে ঠেলে দিয়ে তাদের সংগ্রামী শক্তিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। তাই তিনি বললেন, "Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart, of the heartless world. It is the opium of the people." ধর্ম হচ্ছে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম হচ্ছে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনের মর্মবাণী, ধর্ম হচ্ছে সেই আত্মঘাতী অহিফেন যা সেবন করে মানুষ তার সমস্ত কর্মশক্তিকে নিজের হাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

নাস্তিকতাধর্মী বা জড়বাদী অস্তিত্ববাদের মুখপাত্ররূপে জঁ। পল সার্তর তাঁর 'd' Existentialisme est un humanisme' গ্রন্থে ঘোষণা করলেন, ঈশ্বর বলে কোনো কিছু নেই। কোনো পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ঈশ্বর কখনো মানুষ সৃষ্টি করেন না বা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না। মানুষের জন্মের আগে বা মৃত্যুর পরে অথবা তার জীবনের অলক্ষ্য ঊর্ধ্বে কোনো ঐশ্বরিক সত্তা উপস্থিত থেকে তার সমগ্র অস্তিত্বকে চূড়ান্তভাবে পরিবৃত্ত করে নি। মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে সে নিজে দায়ী এবং মানুষ যে আছে, তার এই অস্তিত্বই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা; এই অস্তিত্বের অন্তস্থলে কোনো স্বরূপ বা সত্তা আছে কিনা সেটা বড় কথা নয়, কারণ "existence is prior to essence."

ঈশ্বর নেই বলেই এমন কোনো নৈতিক অজুহাত নেই যার দ্বারা মানুষ

তার কর্মাকর্মকে ব্যাখ্যা করতে পারে। আসলে মানুষ তার সারাজীবনের সমস্ত কর্মের জন্য সে নিজে দায়ী। সার্ত্রর বলেন :

"The first effect of existentialism is that it puts everyman in possession of himself as he is, and places the entire responsibility for his existence squarely upon his shoulders···Thus we have neither behind us, nor before us, in a luminous realm of values, any means of justification or excuse."

উজ্জ্বল মূল্যের এক স্বর্ণজগতে এমন কোনো চূড়ান্ত সত্তা অধিষ্ঠিত নেই যাকে উদ্দেশ্য করে আমরা মহাভারতের দুর্যোধনের মতো জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে নিশ্চিন্তে বলতে পারব :

"জানামি ধর্মং ন চ প্রবৃত্তিং জানাম্যধর্মং ন চ নিবৃত্তিং
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত অবস্থার যে মহাসত্যে উপনীত হয়, সে সত্য আমাদেরি ঐচ্ছিক কর্মের একান্ত প্রতিফল ছাড়া আর কিছু নয়। অবাধ অপ্রতিরুদ্ধ স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে চারিদিকের শূন্যতাকে ভেদ করে দিনে দিনে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে আমাদের যে অস্তিত্ব এক মহাশিল্পীর মতো আমরাই তাকে তিলে তিলে গড়ে তুলি, আমাদেরি কামনার কারুকার্য দিয়ে তাকে আমরা অলঙ্কৃত করি, আশা ও উদ্দেশ্যের রসে তাকে সঞ্জীবিত করি, শক্তি ও সাধনা দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জর্মান কবি মেরিয়া রিল্‌কে তাঁর 'Die Sonette an Orpheus' কবিতায় মানুষের এই অবাধ উন্মুক্ত অস্তিত্বের জয়গান গেয়ে মানবজীবনে যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যকে নিন্দিত করেছেন, কারণ তা মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ ব্যাহত করে :

"It is life, it thinks it knows best as it orders, produces and destroys with equal resolve."

কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেও মানুষের অস্তিত্বকে চারিদিকের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে অবাধ স্বাধীনতার শূন্যে সংস্থাপিত করার ফলে যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের অজানিতে, সেই সমস্যার দ্বারা তাঁদের অস্তিত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারেনি। জাঁ পল সার্ত্রের 'দি এজ্ অফ্ রিজন' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ক্রনেট নায়ক ম্যাথিওর

কাছে অস্তিত্ববাদের এই অপূর্ণতার কথাটিকে ব্যক্ত করেছে স্পষ্ট ভাষায়: "you live in a void, you have cut your bourgeois connections, you have no tie with the proletariat, you're adrift, you're an abstraction, a man who is not there…you renounced everything in order to be free. Take one step further, renounce your freedom : and everything shall rendered unto you". ম্যাথিও নিজেও পরে স্বীকার করেছে তার উদ্দেশ্যহীন এই নির্বিশেষ স্বাধীনতা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। বস্তুত সমাজ ও সামাজিক পরিবেশের সুষ্ঠু সহযোগেই আমাদের অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে সার্থকতা লাভ করতে পারে।

সাহিত্যে ধর্মচেতনার সঙ্গে জীবনচেতনার যুগান্তকারী সংঘর্ষে প্রথম শহীদ হচ্ছে এসকাইলাসের 'প্রমিথিয়াস বাউণ্ড' নাটকের নায়ক বন্দী প্রমিথিয়াস। দেবরাজ জিয়াসের আদেশ অমান্য করে মানবজাতিকে জ্ঞানের আলো দান করে যে অপরিসীম শাস্তির বোঝা মাথা পেতে নিয়েছিল প্রমিথিয়াস, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। দূর পৃথিবীর কোনো এক নির্জন দুর্গম প্রান্তে স্কাইথিয়া পাহাড়ের একটি বিশাল প্রস্তরস্তূপের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঝড়, জল, বজ্রপাত প্রভৃতি সমস্ত বিপর্যয় নীরবে সহ্য করবে, তবু স্বর্গে গিয়ে জিয়াসের দাসত্ব করবে না। জিয়াসের চর হারমিসকে তার শেষ কথা বলে দিল প্রমিথিয়াস : "In sooth all gods I hate…I shall never exchange my fetters for slavish serrility. 'Tis better to be chained to the rock than bound to the service of Zeus.

প্রমিথিয়াসের নির্ভীক উক্তির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন এসকাইলাস ধর্ম-নিরপেক্ষ স্বাধীন মানবতার জয়গান গেয়েছেন অন্যদিকে তেমনি মানবতা নিরপেক্ষ দেব-মহিমার অসারতাকে সপ্রমানিত করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে গ্যয়েটেও 'প্রমিথিয়াস' নামে একটি কবিতায় এক আশ্চর্য প্রত্যক্ষ-ভাষিতার সঙ্গে বলেছেন, যে ঈশ্বর আশাহত মানুষের অবাস্তব কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এবং নির্বোধ শিশু ও ভিখারীদের অহেতুক বিশ্বাসের রসে সঞ্জীবিত, তিনি জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কখনই সে ঈশ্বরের শরণাগত হবেন না।

"I sit here, make men in my image, a race which shall be like me to suffer, to weep, to enjoy and be glad and to ignore you as I did."

ঈশ্বরের কাছে না গিয়ে তিনি এই জগতে থেকেই তাঁর আদর্শ দিয়ে এমন সব মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা তাঁর মতো হাসি কান্না ও সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসবে এবং তাঁর মতোই ঈশ্বরকে অস্বীকার করবে।

চার

অনেকে মনে করতে পারেন, যে সব সাহিত্য ধর্ম বা ঈশ্বরকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তারাও ধর্মের দ্বারা নঞর্থক (Negative) দিক থেকে প্রভাবিত। তাঁদের মতে সাহিত্যে ধর্মসম্বন্ধীয় কোনো কথাই থাকবে না। কিন্তু যাঁরা ধর্মের কোনো কথার একেবারে অবতারণা না করে সাহিত্য রচনা করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁরা একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের অনেকে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বহিরঙ্গগুলিকে যথাযথ চিত্রিত করতে গিয়ে তাঁদের সমস্ত প্রতিভাকে এমনভাবে নিঃশেষিত করে ফেলেছেন যে অন্তর-জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হননি। আবার অনেকের প্রতিভা অতি তীক্ষ্ণ এক আত্মসচেতনতা ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি আবেগানুভূতিকে বিশ্লেষণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু হঁথানের 'স্কারলেট এণ্ড দি ব্ল্যাক' ও এমিল জোলার 'জারমিনাল' ছাড়া এমন জীবনধর্মী ও বাস্তবানুগ সাহিত্য খুব কমই পাওয়া যায় যেখানে লেখক দুই দিক থেকেই কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। বস্তু-জগৎ ও মনোজগৎ—এই দুই-এর সুষ্ঠু সামঞ্জস্যসাধনের উপরই মানব-জীবনের ভারসাম্য নির্ভর করে। সুতরাং যাঁরা বাস্তবানুগ জীবনধর্মিতাকে আজ সাহিত্যে অবিসম্বাদিত আদর্শ বলে মেনে নিতে সম্মত তাঁরা নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করবেন না যে, জীবনের বাহির ও ভিতর, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুটিকেই সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পরিস্ফুটিত করার যে সমান্তরালবর্তিতা, তাই হবে মহৎ সাহিত্যের সৌধ রচনার পক্ষে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ ভিত্তি।

আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন যাঁরা ধর্মকে একেবারে উহ্য বা অনুপস্থিত না রেখে বা ধর্মকে অস্বীকার করবার কোনো চেষ্টা না করে সমাজ ও জীবনকে চিত্রিত করতে গিয়ে সমসাময়িক জীবনের খাতিরেই বাধ্য হয়ে ধর্মকে তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। যে সব জীবন ও সমাজের কথা সাহিত্য বলতে চায় সেই সব জীবন ও সমাজের সঙ্গে ধর্ম যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে

জড়িয়ে থাকে তাহলে সাহিত্যে ধর্মের এই অবাঞ্ছিত অথচ বৈধ অভ্যাগমকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না। ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী'র মধ্যে দেখা যায়, পর পর দুবার চার্চ থেকে বিশপ ডেকে ধর্মীয় আচার আচরণের দ্বারা মৃতপ্রায় এম্মা বোভারীকে সারিয়ে তোলার চেষ্টার মধ্যে তৎকালীন একটি কুসংস্কারপ্রসূত সামাজিক রীতিই প্রতিফলিত হয়েছে এবং শেষের দিকে মুমূর্ষু এম্মার পাশে বিশপ ও কেমিষ্ট হোম্মার মধ্যে ধর্মগত বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিয়ে বিতর্কটিকে লেখক বিশেষ আত্মনিরপেক্ষভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসে বিপ্লব মন্ত্রের মূর্ত প্রতীক পাভলভের মা শোষিত ও ক্ষুধিত জনগণকে মুক্তির বাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ও খ্রীষ্টের বাণী (God's truth, Christ's truth) শুনিয়েছেন। এখানেও লেখক আত্মনিরপেক্ষভাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, তখনকার দিনে ঐ সব মানুষের মধ্যে জীবনসত্যের সঙ্গে ধর্মের সত্যকে একাত্ম করে দেখবার একটা বিশেষ প্রবণতা ছিল। 'রেজারেকশান্' উপন্যাসে টলস্টয় কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁর আত্মগত খ্রীষ্টীয় ধর্মচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। পাপের অন্ধকার ও দুঃসহ শাস্তির বোঝা ঠেলে শুচিশুভ্র চৈতন্যের নির্মল আলোকের মধ্যে কিভাবে মানবাত্মা নবজন্ম লাভ করে, তা পরিব্যক্ত করবার জন্য 'রেজারেকশান্' নামকরণটিকে বেছে নিয়েছেন লেখক। এখানে একটি নৈতিক ভাববস্তু ধর্মীয় নামকরণের মধ্যে অতি সহজেই দ্যোতিত হতে পেরেছে। শেষের দিকে নিউ টেষ্টামেণ্টের কতকগুলি নীতি-উপদেশ সংযোজিত করে কাহিনীকে যেভাবে অহেতুক ঋষিসুলভ ধর্মচেতনার দ্বারা কণ্টকিত ও খ্রীষ্টীয় ক্ষমাগুণ প্রচারের দ্বারা উৎপীড়িত করেছেন তাতে উপন্যাসের সাবলীল রসস্রোত ব্যাহত না হয়ে পারেনি ; তাতে 'রেজারেকশান্' মহৎ উপন্যাসের গৌরব থেকে বঞ্চিত না হয়ে পারেনি। সহসা ধর্মচেতনার দ্বারা তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় বলে গেছেন টলষ্টয় :

"Five years ago faith came to me ; I believed in the doctrine of Jesus, all my life suddenly changed. I ceased to desire that which previously I desired, and on the other hand I took to desiring what I had never desired before. That which formerly used to appear good in my eyes appeard evil, that which used to appear evil appeared good."

পরিবর্তনশীল সমাজের পটভূমিকায় প্রচলিত ধর্মচেতনার সঙ্গে নবলব্ধ জীবনচেতনার সংঘর্ষের ফলে যে সংশয়ের ও যুগযন্ত্রণার সৃষ্টি হয় ডস্টভয়স্কি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তাকে রূপায়িত করলেও বহুক্ষেত্রে তিনি জীবন ছেড়ে ধর্মের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। 'দি কারামাজোভ ব্রাদারস'-এ আইভান কারামাজোভের মতো তাঁর কোনো কোনো নাস্তিক চরিত্র ধর্মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেও দ্মিত্রি কারামাজোভের মতো যারা ধর্মবিশ্বাসী ; এবং অপরাধী ও স্বভাবত পাপাত্মা হলেও যাদের অপরাধপ্রবলতা খ্রীষ্টীয় পাপ-চৈতন্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ, সেই সব চরিত্রের উপর তিনি তাঁর সমস্ত সহানুভূতি নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন :

"Unless you sin, you will not repent : unless you repent you shall not be saved."

খ্রীষ্টের অনুকরণে দ্মিত্রির এই নীতি-উপদেশ লেখকেরই উপদেশ। কিন্তু অসংখ্য অন্যায় করেও সকল মানুষ কেন অনুতাপের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে সাধু হয় না, ঈশ্বর মঙ্গলময় হওয়া সত্বেও কেন মানুষ মানুষের হাতে শোষিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হচ্ছে প্রতিদিন, অথবা ক্ষমার দ্বারা সমস্ত অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার হয় কিনা—এইসব মৌল প্রশ্নগুলির জবাব দিয়ে যেতে পারেননি ডস্টভয়স্কি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "I am till now a child of the times, a child of disbelief and doubt, and I know I shall remain such till the grave."

কিন্তু যদিও নিজেকে সংশয় ও অবিশ্বাসে ক্ষতবিক্ষত যুগমানসের সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছিলেন, তথাপি তাঁর সাহিত্য এই সাক্ষ্য দান করে যে, তিনি সমস্ত সংশয়ের কুয়াশা সরিয়ে ধর্মের মধ্যেই তাঁর আকাংক্ষিত সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বাস্তববাদী প্রসিদ্ধ রুশশিল্পী রেপিণ ডস্টভয়স্কি সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন, "Dostoyevsky is a great talent in art, a profound thinker and a warm heart, but he is a broken and down-cast man, one who is afraid to tackle the vital problems of human life and looks backwards the whole time."

তাঁর শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্যই মানুষের অমিত প্রাণশক্তির প্রবল বেগটিকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে ধর্মের মোহ মেদুর আশ্রয়ে অসহায়ভাবে ঢলে পড়েছিলেন ডস্টভয়স্কি। তিনি কখনই একথা বিশ্বাস করে যেতে পারেননি, মানুষই একদিন এইসব অত্যাচার অবিচারের

অবসান ঘটিয়ে স্বর্ণযুগ নিয়ে আসবে পৃথিবীতে। তিনি শুধু বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর মঙ্গলময়। "Thou art just Lord, for thy ways are revealed." এ্যালোশা কারামাজোভের মুখে বাইবেলের এই কথাটি প্রতিধ্বনিত করে তাঁর মনের গভীরতম বিশ্বাসের কথাটিকেই বলে গেছেন ডস্টভয়স্কি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরও সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মূলে অনুরূপ এক ধর্মচেতনার অন্তঃসলিলা অবাধে বয়ে চলেছিল। তিনিও অন্তরে বাইরে ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করতেন সব সময়।

"যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥"

তোমার কল্যাণতম যে রূপ, আমার কাছে আজ তা দীপ্যমাণ প্রত্যক্ষ। যে পুরুষ সমগ্র বিশ্ব চরাচরে বিরাজিত, আমার মধ্যেও সেই পুরুষ অভিন্নভাবে বিদ্যমান। ঈশোপনিষদের এই বাণীতে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ যাঁর অধিকাংশ কাব্যপ্রেরণার একমাত্র উৎসস্থল ছিল সর্বব্যাপী এক অখণ্ড ঐশ্বরিকসত্তা এবং যাঁর একমাত্র মনের কথা হল, "শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক"। কিন্তু তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে কতকগুলি ঘটনার রূঢ় আঘাতে তাঁর ধর্ম-নির্ভর কাব্যপ্রত্যয় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় সহসা। তখন তিনি বুঝতে পারেন, জীবনে শুধু শান্তিই সত্য নয়, শুধু অবিমিশ্র ভালো দিয়েই এ জগৎ গঠিত নয়; ভালো, মন্দ, ললিত-কঠোর, বিরোধ-বিষমতা সব কিছুর দ্বৈত অস্তিত্বের অসম সংমিশ্রণেই এই জগৎ ও জীবন গঠিত। তখন ঈশ্বরের ক্ষমাগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে মনে, সভ্যতার ভয়াবহ সংকটে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এইসব অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর উগ্র ধর্মচেতনাকে পরিহার করে চলতে পারেননি কখনো রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ব্রহ্মবাদের উপর অবিচল আস্থার বিরতি ঘটেনি কখনো এতটুকু। তথাপি তার 'রূপনারানের কূলে' নামক ছোট কবিতাটি তাঁর সাময়িক সত্যোপলব্ধির এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

"রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়
রক্তের অক্ষরে জানিলাম আপনার রূপ
চিনিলাম তারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়
সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম।"

উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাসী কবি র‍্যাঁবোও সাম্রাজ্য, শোষণ, রক্তপাত

ও অত্যাচার সমন্বিত মানবসভ্যতার ঘনীভূত সংকটে ক্ষুব্ধ হয়ে সব কিছুর ধ্বংস প্রার্থনা করেন এবং মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানে ধর্মের শোচনীয় অক্ষমতা ও ব্যর্থতার কথা বুঝতে পেরে নিতান্ত সঙ্গতভাবেই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর 'Les Premieres Communious' কবিতার প্রথমেই তিনি বলেছেন, "Really it is idiotic, these village churches where fifteen ugly brats, dirtying pillars and pronouncing divine prattle with thick burt, listen to a black grotesque with sweaty shoes."

কোনো সাহিত্যে লেখকের আত্মসাক্ষিক ধর্মপ্রীতি বা ধর্মনির্ভরতা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ যে সাহিত্যে কোনো অদৃশ্য ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত সত্তাকে মানব জীবনের নিয়ন্ত্রক ও প্রযোজক কর্তারূপে উপস্থাপিত করা হয়, প্রাকৃত বস্তু বা ঘটনাকে প্রাকৃত কারণ দ্বারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয় না, সে সাহিত্যের পরিণতি পাঠকের মনে বিষাদাত্মক বা হর্ষাত্মক কোনো বিশুদ্ধ রস বা আবেগানুভূতির সঞ্চার করতে পারে না। মানুষ যখন জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও কার্যকে ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য ও অপরিহার্য বিধান বলে মেনে নেয় তখন স্বভাবতই যে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির উপর কোনো ব্যক্তিগত প্রত্যাশা আরোপ করে না। তখন মানুষ এক সহজ উদাসীনতায় ও ভক্তি-স্রাবী ভাবালুতায় জীবনের সব কিছুকে গ্রহণ করে নেয়। তাই দেখা যায়, ধর্মনির্ভর সাহিত্য মানুষের মনে একমাত্র যে রসের সৃষ্টি করতে পারে তা ভক্তিরস বা শান্ত রস। সাহিত্যে এই দুটি রসই নিকৃষ্ট, তাই এদের কোনো সম্মানযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট নেই সেখানে। চারদিকের সামাজিক পরিবেশ ও বিভিন্ন ঘটনার সহিত জীবনের দৈনন্দিন সংঘাতের ফলে ভাবগত প্রতিক্রিয়ারূপে অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে যে রসক্ষরণ হয় সেই রসই সাহিত্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠ রস। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে যে সত্য মানুষ উপলব্ধি করে অন্তরে, সেই সত্যই হচ্ছে সাহিত্যের সত্য। জীবন কখনো আঘাত সহ্য করে, কখনো সে আঘাত দেয়, কখনো সে সকাম, কখনো নিষ্কাম, কখনো সে অন্যায় করে, কখনো সে অন্যায়ের প্রতিকার করে—এমনি করে সুখ ও দুঃখ, বিরোধ ও বিষমতার বিচিত্র তরঙ্গ তুলে জীবনের যে দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি, সকল যুগের সাহিত্যে সেই অগ্রগতিকেই অনুভব করতে চায় মানুষ সমস্ত অন্তর দিয়ে। জীবন ও তার সমস্ত জৈবিকতা থেকে উৎসারিত যে সহজ চেতনাপ্রবাহ মানুষের প্রতিটি স্নায়ু ও শিরায় সতত প্রবাহিত, সেই চেতনার কথা না বলে যখন কোনো সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে প্রথমে কোনো ধর্মতত্ত্ব বা দর্শনতত্ত্বকে আশ্রয়বাক্যরূপে গ্রহণ করে ক্রমে তার থেকে জীবন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস পান, তখন তিনি একই সঙ্গে জীবন ধর্ম ও শিল্প ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন।

পারমাণবিক বাস্তবতা

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

১৯৫১ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের আমেরিকান 'কলিয়ার্স' পত্রিকাখানা পাশে রয়েছে। এতে জে. বি. প্রিস্টলে-র একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক যুদ্ধে সোভিয়েত দেশ জয় করেছে এবং সেখানে শিল্পকলার "মুক্তি" এসেছে।

প্রিস্ট্‌লে মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি এখন শান্তি আন্দোলনে।

মস্কোয় মার্কিন অ্যাটমবোমা বর্ষণের 'ফোটো' শোভিত মার্কিন এম্-পি-র (মিলিটারি পুলিশ) বুটের তলায় "অবলুণ্ঠিত" সোভিয়েত দেশের মানচিত্রের প্রচ্ছদপটে সজ্জিত সেই যে 'কলিয়ার্স' পত্রিকায় "তৃতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রিম দৃশ্য", তুলে ধরে ১৯৬০ সাল নাগাদ সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়েছিল, সে পত্রিকাখানা উঠে গেছে। কিন্তু

"১৯৬১ সালের কর্মসূচী সংক্রান্ত বিবৃতিতে" ইউ-এস এয়ারফোর্স অ্যাসোসিয়েশন "সোভিয়েত ব্যবস্থাটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার...জাতীয় লক্ষ্য" ঘোষণা করেছেন, সেই পরিকল্পনা রয়েছে। সেই অ্যাসোসিয়েশনটি মার্কিন বিমানবাহিনীরই বেসরকারী মুখপত্র, তা কারও অজানা নয়। সে-মুখপত্রের সুবিদিত পৃষ্ঠপোষক হলেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মারণাস্ত্র শিল্পের শিরোমণিগণ। তাতে ঘোষিত "জাতীয় লক্ষ্য" অনুযায়ী সামরিক প্রস্তুতি এবং মূল কৌশলগুলি নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনায়কদের অসংখ্য উক্তিতে—সেই যে পরিকল্পনাটিকে "পৃথিবীর উপর মৃত্যু পরোয়ানাস্বরূপ অতি ভয়ঙ্কর দলিল" বলে ধিক্কার দিয়েছেন, বিভীষিকায় শিউরে উঠেছেন বৃটিশ দার্শনিক—আজ শান্তি-সৈনিক—বার্ট্রাণ্ড রাসেল। সেই রাসেল ১৯৪৮ সালে "নিবর্তনমূলক" যুদ্ধের জন্যে, মস্কোয় অ্যাটম-বোমা বর্ষণের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কেন ?

১৯৫৯ সালে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে এই 'কেন'র জবাবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "তখন প্রারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল শুধু এক পক্ষে, তাই সম্ভাবনা ছিল রুশেরা নতি স্বীকার করবে" (বারুচ পরিকল্পনায়—যাতে পশ্চিমী সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুণ 'আন্তর্জাতিক' নিয়ন্ত্রণের নামে বোমার উপর এবং পৃথিবীর সমস্ত পারমাণবিক কাঁচামালের উপর একচেটিয়া দখল থাকত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রেরই হাতে)।

প্রশ্ন : "ধরুন যদি তারা নতি স্বীকার না করত···তাহলে আপনি ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করতে বলতেন রুশদের উপর—ঐ অস্ত্রের বিভীষিকা সম্বন্ধে আপনি আমার সঙ্গে কথায় যে শব্দগুলি ব্যবহার করলেন তা সত্ত্বেও ?"

তার জবাবে রাসেল বলেন : "হ্যাঁ, তাই···তখন ভেবেছিলাম, এবং আশা করেছিলাম রুশরা নতি স্বীকার করবে, কিন্তু হুমকি তো দেওয়া চলে না যদি না সেটা কার্যে পরিণত করার জন্যে প্রস্তুত থাকা যায়।"

জে. বি. প্রিস্ট্‌লে তো নিশ্চয়ই নিজের ধারণা অনুযায়ী মানবিক শিল্প-কলারই "মুক্তি" সাধনের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর অ্যাটমবোমা-বর্ষণের দাবি জানাচ্ছিলেন ! আবার এখনও মানবিকতারই প্রেরণায় পারমাণবিক শান্তি চাওয়া হচ্ছিল। এই "দুই মানবিকতা"র মধ্যে একটা প্রভেদও নিশ্চয়ই রয়েছে। ইতিমধ্যে এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে তাৎপর্যসম্পন্ন যা ঘটেছে তা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন নতি স্বীকার করেনি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল

মত বদলেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে "নিবর্তন-মূলক" পারমাণবিক যুদ্ধের পরিকল্পনাটাকে দানবীয় কিংবা "পৃথিবীর উপর মৃত্যুপরোয়ানাস্বরূপ" মনে করছিলেন না, কারণ, তখন তাঁর "আশা ছিল" অপর পক্ষের আত্মরক্ষা করবার, আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আঘাত হানবার ক্ষমতা ছিল না।

পারমাণবিক কর্মনীতি কোন্‌টা কখন কেন মানবিক কিংবা দানবীয় গণ্য হচ্ছে?

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতির 'বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটি'র সভাপতি জেরোম্‌. বি. ভাইস্‌নার-এর মতো ব্যক্তির হিসাবও দেখা যেতে পারে। তাঁর মূল ন্যায়-নীতিজ্ঞান, চিন্তা-ভাবনার গতিবিধি কোন্‌ নিরিখে চলে, তা বলা বাহুল্য: ("দেশের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্যে যারা অনেকে গত পনর বছর যাবত কঠোরভাবে কাজ করেছেন তাঁদের থেকে খুব একটা পৃথক নয় আমার অভিজ্ঞতা")। সেই ভাইস্‌নার বলেছেন: "আমাদের প্রত্যেকটি অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোভিয়েতকে অগ্রসর হতে দেখেছি, ফলে, কাল-গতিতে একমাত্র লক্ষণীয় ফল হয়েছে এই যে, আমাদের উভয় জাতিই ক্রমে অধিকতর ধ্বংসশক্তিসম্পন্ন এমন সব অস্ত্রশস্ত্র সৃষ্টি করেছে যার বিরুদ্ধে কোনো আত্মরক্ষাব্যবস্থা হয় না" ('আর্মস কণ্ট্রোল অ্যাণ্ড ডিসআর্মামেণ্ট': আমেরিকান ভিউজ অ্যাণ্ড স্টাডিজ। ডি. জি. ব্রেনান সম্পাদিত। জোনাথান কেপ)।

ভাইস্‌নারই বলেছেন: "যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি দেখা যাচ্ছে যে, ত্বরান্বিত বেগে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা চলতে দেওয়া হলে এক-একটি বছর কাটবে আর আমাদের দেশের নিরাপত্তা হবে আরও কম, বেশি নয়।"

এ উপলব্ধি কি ঘটত যদি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক একচ্ছত্রাধিপত্য না ভাঙত? রাসেলই তো বলেছেন, "পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল শুধু এক পক্ষে···তাই আশা ছিল···।"

কিন্তু এখন অপর পক্ষ হয়তো পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্বই লাভ করেছে। পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্ব আজ যে রকেটের উপর নির্ভরশীল তার আয়তন আর নির্ভুলতার শ্রেষ্ঠত্ব তো তর্কাতীতই হয়ে গেছে। সেই অপর পক্ষ সর্বতোভাবেই অন্তত সমতা লাভ করেছে, তা নিয়ে তো কথাই নেই। নইলে কি ভাইস্‌-

নারদের ও "ওয়াকিবহাল মহলে" ঐ উপলব্ধি ঘটত ? রাসেল মত বদলাতেন ? প্রিষ্টলে শিল্প-কলার মুক্তি-সাধনের লড়াইয়ে অ্যাটমবোমার হাতিয়ার ত্যাগ করতেন ?

পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে নাগাসাকি হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত 'পরীক্ষা' দেখিয়ে কম আহ্বান জানানো হয়নি নতি স্বীকার করবার জন্যে !

জাতিসংঘের 'রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা কমিশন'-এর সুপারিশ অনুসারে ১৯৪৬ সালের ২৪এ জানুয়ারি তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে 'পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশন' বসাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল ; সেই বছরই মার্চ মাসে আমেরিকার ফুলটন-এ গিয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হিটলারের "পবিত্র আর্যজাতি" স্থলে "ইংরেজী ভাষাভাষী জাতিগুলিরই" পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার একমাত্র অধিকার ঘোষণা করে, কম্যুনিস্টবিরোধী জেহাদ ঘোষণা করে বললেন, তাঁরা যাকে বলেন "স্বাধীনতা আর মানবাধিকারের মহান নীতি" তার পক্ষে যে কোনো বাধা এলে পৃথিবীর সর্বনাশ হবে—চার্চিলদের অ্যাটমবোমার ঘায়ে পৃথিবীটা ফিরে যাবে প্রস্তরযুগের বর্বরতার মধ্যে। সেই বছরই জুন মাসে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বারুচ পরিকল্পনা মারফত সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সমস্ত দেশের পারমাণবিক শক্তির মূল কাঁচামাল (ইউরেনিয়ম ইত্যাদি) মার্কিন-নিয়ন্ত্রিত সংস্থার হাতে নেবার প্রস্তাবে অ্যাটমবোমা বিনষ্ট করবার কাজ অনির্দিষ্ট এবং অসম্ভব করে রেখে সেই প্রস্তাবের পিঠেপিঠেই বিকিনিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মার্কিন পারমাণবিক যুদ্ধের মহলা দেখানো হল—তবু সোভিয়েত ইউনিয়ন নতি স্বীকার করল না। হিরোশিমা-নাগাসাকি বিস্ফোরণে 'ঠাণ্ডাযুদ্ধের' বিকট ঘোষণার পর প্রস্তরযুগীয় বর্বরতা বর্ষণের চার্চিলী দম্ভোক্তি দিয়ে বিকিনির বিকট গর্জন তুলে বারুচ পরিকল্পনারূপী 'চরমপত্র' দিয়েও পারমাণবিক-অস্ত্রবিহীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে নতি স্বীকার করানো গেল না।

তখনকার রাসেল এবং প্রিস্টলেরা যে-মানবতার জিগির তুলে, আর শিল্পকলার যে-মুক্তির ধ্বজা উড়িয়ে প্রচার চালাচ্ছিলেন তা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পারমাণবিক শক্তি আয়ত্ত করা থেকেও নিরস্ত করা গেল না, বরং সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক শক্তি-দৈত্যটাকে বোমায় পুরে হিরোশিমা নাগাসাকি আর বিকিনির দানবদের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে প্রহরাও

বসাল, তেমনি সর্বপ্রথম তারাই সে দৈত্যটাকে বশ মানিয়ে, লাগিয়ে দিল মানুষের সেবায়: সেই হল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বা শান্তির কর্মনীতির সঙ্গে পারমাণবিক শক্তির সেই পরম-কল্যাণরূপ মিলে পৃথিবীতে শান্তির কামনা বৃহত্তম গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করল। ট্রুম্যানেরা আর চার্চিলেরা, তখনকার রাসেলেরা আর প্রিস্ট্লেরা মানবতা এবং মুক্তির নামে যে দানবীয় পৈশাচিকতার কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে, সমগ্র পৃথিবীকে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে 'চরমপত্র' দিচ্ছিলেন, তা প্রত্যাখ্যান করবার হিম্মত পৃথিবীতে এসেছিল এইভাবেই।

রাসেলেরা আর প্রিস্টলেরা সেদিন যদি অপপ্রচারের আঘাতে আঘাতে, "প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের" ঝড় তুলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরস্ত্র করে নিরস্ত্র রাখতে পারতেন তাহলে ট্রুম্যান-চার্চিলদের মনস্কামনা পূর্ণ হত— সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক শ্মশানে পরিণত হত, সোভিয়েত ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত পৃথিবী থেকে।

এবং সোভিয়েত ব্যবস্থাটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জাতীয় লক্ষ্য গ্রহণ করে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পেণ্টাগনের মুখপত্রগুলি ও মুখপাত্রদের আজ এত কঠিন অবস্থায় পড়তে হত না, সেদিনকার রাসেলদের আর প্রিস্ট্লেদের অ্যাটমবোমার মানবিকতা, সংস্কৃতির অভিযান যদি সফল হত।

তা সফল হয় নি। তাই ইতিমধ্যে নতুন নতুন '১৯৪৮-এর রাসেল' আর নতুন নতুন '১৯৫১-র প্রিস্টলে'র বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম জার্মানিতে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে পৃথিবীর চিরশত্রু জার্মান সমরবাদ আর নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রটিকে। পশ্চিম জার্মান সশস্ত্র শক্তির মোট ১৪০জন জেনারেল আর অ্যাডমিরালের প্রত্যেককেই হিটলারের জেনারেল আর অ্যাডমিরালদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই জেনারেলরাই অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার প্রধান প্রধান পদে। সেই জেনারেলদেরই একজন— হেউসিঙ্গার—এখন ওয়াশিংটনে ঐ সামরিক চুক্তি সংস্থার স্থায়ী সামরিক (পরিকল্পনা রচয়িতা) কমিটির চেয়ারম্যান। সেই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে রকেট অস্ত্রশস্ত্র এবং অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা তুলে দেওয়া হচ্ছে সেই নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রের হাতে—যারা জার্মানির "১৯৩৭ সালের সীমান্ত অনুযায়ী রাইখের উত্তরাধিকারী" হিসাবে নিজেদের জাহির করছে দম্ভভরে, যারা

হিটলারের পরাজয়ের প্রতিশোধ প্রকাশ্যেই দাবি করছে, যাদের সীমান্ত-পরিবর্তন প্রস্তুতি আর প্রতিহিংসা কামনা দেখে আজ সেই রাসেলেরা এবং প্রিস্টলেরাও সন্ত্রস্ত।

হিটলারেরই সেই যুদ্ধযন্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেও নিশ্চেষ্ট থাকতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে—যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ একই দানবের আক্রমণে সৈন্যক্ষয়ই হয়েছিল মার্কিন-বৃটিশ যুক্ত অঙ্কের বারো গুণ বেশি, নিযুত-নিযুত নরনারী আর শিশু হয়েছিল অপহৃত, নির্যাতিত এবং গণহত্যার শিকার; যে-সোভিয়েত ইউনিয়নে বোধহয় একটি পরিবার নেই যার প্রিয়জন নিহত হয় নি ঐ দানবদের হাতে, সেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরস্ত্র; আপেক্ষিক-নিরস্ত্র থাকতে আহ্বান জানাতে পারে কে? সে জেনে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, সেই ১৯৪৮-এর রাসেল আর ১৯৫১-র প্রিস্টলের অ্যাটমবোমার মানবতা আর অ্যাটমবোমার সাংস্কৃতিক মুক্তিরই সেবাইত।

পশ্চিম জার্মানিতে পুনরুজ্জীবিত নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রটাতে তৃতীয় মহাযুদ্ধেরই সর্বনাশ ঠাসা রয়েছে। সেই একই হেউসিঙ্গার আর স্পিডেলরা তার আস্ফালন করছে। মার্কিন-বৃটিশ-ফরাসী যুদ্ধকামীরাই এই পুনরুজ্জীবনদাতা। কাইজারের আমল থেকে ছয়-পুরুষের মৃত্যু-ব্যবসায়ী ক্রুপ্‌স্ এবং হিটলারের যুদ্ধযন্ত্রের সমস্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি সেখানে পুনরুজ্জীবিত এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ঐ একই মার্কিন-বৃটিশ-ফরাসী আনুকূল্যে। তা তো রোধ করা সম্ভব হয় নি। এটাই বাস্তবতা।

শুধু তাই নয়। তার পেছনে এবং নেতৃত্বে রয়েছে আরও বড় যুদ্ধ-যন্ত্র—পেন্টাগন, যার ফাশিস্ট প্রকৃতি দ্রুত বাড়তে দেখে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটের 'পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটি'র সভাপতি ম্যান্‌স্‌ফীল্ডের মতো ব্যক্তিকেও প্রকাশ্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে হয়েছে। সেই পেন্টাগনের উদ্যোগে মার্কিন সরকারী কর্তৃপক্ষ কি ভাবে পারমাণবিক মহাযুদ্ধ অনিবার্য করে তুলবার মনোবিকার সৃষ্টি করছে সমগ্র দেশে, তা নিজের চোখে দেখে বিবরণ লিখে পাঠিয়েছেন লণ্ডনের 'নিউ স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক কিংস্‌লে মার্টিন, যাঁকে "কমিউনিস্ট ঘেঁষা" নাম দিতে ৎশোম্বেরও আটকাবে। সে-দেশে

'কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান', 'জন বার্চ সোসাইটি', 'আমেরিকান ফ্যাশিস্ট পার্টি' প্রভৃতি মিলে সরকারী কর্মনীতি দিয়ে তৈরি জমিনে যে-ব্যাপক ফ্যাশিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তা দেখে মার্কিন "মুক্ত গণতন্ত্রের" বহু প্রচারককেও আজ পশ্চিমে, এ দেশে, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতি তো রোধ করা যায় না। এটাই পৃথিবীর বাস্তবতা।

তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিপদে ঠাসা এই বাস্তবতা। আজ তৃতীয় মহাযুদ্ধ মানে যে-মৃত্যু তা কোটির অঙ্কে প্রকাশ করতে হলেও ক-কুড়ি কোটি, সেই পদ্ধতির শরণ নিতে হয়। পেণ্টাগণ আর নাৎসী যুদ্ধযন্ত্র মিলে মানুষের সভ্যতার কেন্দ্রগুলিকে, আশা-আকাঙ্ক্ষার বনিয়াদগুলিকে, স্বপ্নের সূত্রগুলিকে, জীবনের অঙ্কুর অবধি এই যে পারমাণবিক ভস্মস্তূপে পরিণত করতে চাইছে—সেই ধ্বংসস্তূপের উপর অবশিষ্ট প্রাণ আর প্রাণীদেহেও পুরুষানুক্রমিক পারমাণবিক মৃত্যুধারা সঞ্চারিত করে দিতে চাইছে, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর চেষ্টা কি আর হয়েছে কখনও কিংবা হতে পারে?

এই নিদারুণ সর্বনাশকে নিয়তির মতো দুর্বার বলে মেনে নিতে হবে?' এই নিদারুণ বাস্তবতাকে ঝুঁটি ধরে টান মেরে বদলে দেবার যে কোনো উপায় অবলম্বন করা হবে না? পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আবেদনে, দাবিতে, ক্রোধে দানবকে নিরস্ত্র করা যায় নি। সে পৃথিবী থেকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সমস্ত অস্ত্রকে বিদায় করতে দেবে না কিছুতেই। সে তার হাইড্রোজেন-বোমারু বিমানবহর সর্বক্ষণ উড়িয়ে রেখে, ঐ মৃত্যুবর্ষী শকুনীর ঝাঁকটার পরিচালক মণ্ডলীটিকে গর্তে লুকিয়ে রেখে সেখান থেকে পৃথিবীকে আক্রমণ করতে চাইছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ দিয়ে। সে-দানবটাকে তো অন্য কোনো উপায়ে নিরস্ত করা যায় নি। তার বিকারগ্রস্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল করার কোনো উপায় থাকলে তো তা প্রয়োগ করা চাই-ই। পৃথিবীর উপর তৃতীয় মহাযুদ্ধের আক্রমণ চালাতে গেলে গভীরতম বিবরেও মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের সোনার তাল আর তাদের শিরোমণিদের জীবন রক্ষা পাবে না, তাদের মাথায় এই উপলব্ধিটা সবলে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো পথ নেই। সর্বমানবের শুভেচ্ছায় তো ফল হয় নি। এই তো সেদিনও ঐ-দানব জাতিসংঘের দরবারে দাঁড়িয়ে, জাতিসংঘেরই ঘোষিত অনুজ্ঞা উপেক্ষা করে বলেছে, "না, হাইড্রোজেনবোমা প্রয়োগ করার অধিকার আর দায়-দায়িত্ব" ছাড়ব না। জাতিসংঘেরই অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে বলেছে, "না, আফ্রিকায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ

করতে থাকব, আফ্রিকা থেকে পারমাণবিক যুদ্ধ ঘাঁটি অপসারিত করব না।”

সেই দানবের মাথায় যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, গভীরতম বিবরে প্রবেশ করেও সে পৃথিবীতে সর্বনাশ ছড়িয়ে দেবার পর নিস্তার পাবে না, একমাত্র তবেই তার মাথা একটু ঠাণ্ডা হতে পারে। একমাত্র তবেই সে বুঝবে যে—আমেরিকার চার, আট, কিংবা ষোল কোটি মানুষকে বলি দিয়েও সে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়ে কোথাও গিয়ে নিস্তার পাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ কিংবা আরও কিছু বেশি পরিমাণ মেগাটন মাত্রার বিস্ফোরণ তার মাথায় সেই উপলব্ধিটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তাতে পৃথিবীর কয়েক কুড়ি কোটি মানুষের জীবন বাঁচবে, কিন্তু “তার ফলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয়তা এত সামান্য যে বৃটিশ বিজ্ঞানী মহলগুলিও মনে করছেন যে, এ বুঝি সেই নিউট্রন বোমা” (স্টেটস্‌ম্যান) এবং বৃটিশ সরকার প্রথম দফায় অনেক আতঙ্কের অপপ্রচার চালাবার পর তাঁদের সরকারী বিজ্ঞানীরাও বলেছেন যে, সোভিয়েত পঞ্চাশ মেগাটন পরীক্ষার পর দুধে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের পরিমাণ কমে গেল! সোভিয়েত সরকার যে যুদ্ধবিকারগ্রস্তদের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে—প্রস্তাবিত জার্মান শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে কেনেডি আর আদেনাউয়ার আর ম্যাকমিলান আর দ্যগলদের সরকারগুলির উগ্রতম যুদ্ধ-প্রস্তুতির মুখে—ঘন ঘন প্রকাশ্য পারমাণবিক আক্রমণ হুমকির পর বাধ্য হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আবার আরম্ভ করবার সিদ্ধান্তের সঙ্গেই বলেছিলেন, তেজস্ক্রিয় কণাপাত যাতে সর্বনিম্ন মাত্রায় হয়, সে দিকে নজর রাখা হচ্ছে, তার সত্যতা এবং কার্যকারিতা তো বৃটিশ সরকারী বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতিতে (এবং আমাদের দেশে অধ্যাপক সত্যেন বসুর মতো বিজ্ঞানীর বিবৃতিতে) প্রমাণিত হল।

পেণ্টাগন আর পশ্চিম জার্মান যুদ্ধযন্ত্র অতর্কিত আক্রমণের যে হিসাব কষছিল তাতে অন্তত কিছু গোলমাল বেধে যাবার প্রমাণ আছে। “সীমাবদ্ধ” পারমাণবিক আক্রমণ চালিয়ে বার্লিন সমস্যা “সমাধানের” পথ নির্দেশ করা হচ্ছিল ‘ওঅল স্ট্রীট জার্নাল’-এর মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী আমেরিকান পত্রিকায়, কিন্তু তা ছাড়াই পশ্চিমীদের আলাপ-আলোচনায় বসবার দিকে ঝোঁকটাই বরং ইতিমধ্যে বেড়েছে। কত মেগাটনের কটা আঘাত অতর্কিতে হানলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাল্টা আঘাত হেনেও আর এঁটে উঠতে পারবে

না বলে যে-মার্কিন হিসাব চলছিল সেটা পঞ্চাশ এবং আরও বেশি মেগাটন বোমার অস্তিত্বের ফলেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে অনেকেই মনে করতে আরম্ভ করেছেন যে, বড় বিপদ কোন্‌টা—সোভিয়েত পারমাণবিক পরীক্ষার বিতর্কমূলক তেজস্ক্রিয়তা, না, মার্কিন-পশ্চিম জার্মান অতর্কিত আক্রমণ দিয়ে বাধানো তৃতীয় মহাযুদ্ধে কয়েক কুড়ি কোটি মানুষের মৃত্যু !

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরারম্ভের সোভিয়েত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার (৩০শে আগস্ট) অনেক আগে থেকেই সারা পৃথিবীর জানা ছিল যে, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো মুহূর্তে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ করবে। বহু সরকারী বিবৃতিতেও তার আভাস এবং পেণ্টাগনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহল থেকে প্রকাশিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সবারই জানা ছিল। তবু শত সতর্কতা সত্ত্বেও যেটুকু তেজস্ক্রিয়তা উদ্ভূত হতে পারে তার অনিষ্টকারিতা জেনেও, বহু সৎ শুভেচ্ছাপ্রণোদিত নরনারীও ভুল বুঝে বিক্ষুব্ধ হতে পারেন তা বুঝেও ('মার্কিন পরীক্ষা' অচিরেই আরম্ভ হত, তখন সেই "সুযোগে" সোভিয়েত 'পরীক্ষা' পুনরারম্ভ করতে কারও ভুল বোঝাবুঝিরও যুক্তি থাকত না) সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অগ্রণী হয়ে 'পরীক্ষা' আরম্ভ করলেন—সেটা অকারণে নয়। অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কার শত পরিস্থিতিগত প্রমাণ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট তথ্যও ছিল: আমেরিকান এয়ারফোর্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিকল্পনা, পশ্চিম জার্মানিতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমক্রেটিক এবং ফ্রী ডেমক্রেটিক পার্টির নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠনের আগে দুই পার্টির মধ্যে গোপন রফার প্রকাশিত ব্যবস্থাবলী ইত্যাদি। তৃতীয় মহাযুদ্ধ অর্থাৎ পৃথিবীর পারমাণবিক সর্বনাশের আশঙ্কায় আমাদের দেশের সরকারী নেতারাও যেসব কথা বলে থাকেন, তা তো শুধু কথার কথা নয়। এবং সে আশঙ্কা থাকলে সোভিয়েত দেশের মানুষের, তাদের সরকারের কতখানি সতর্ক এবং সক্রিয় হওয়া কর্তব্য তা কি তাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভীষণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় না ?

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার বাস্তব সামরিক প্রয়োজনই ছিল, সেটা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কেনেডি এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানের বিবৃতিতেও স্বীকৃত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, এখন তাঁদেরও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করবার "প্রয়োজন হতে পারে।" আগে তাঁরা বলছিলেন, সোভিয়েত 'পরীক্ষার' কোনো সামরিক

প্রয়োজন ছিল না—ওটা নাকি শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্যে, যদিও যারা আক্রমণেচ্ছু তারা ছাড়া আর কারও আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

পশ্চিমীরা এবং তাঁদের সমর্থকেরা বলেছিলেন, সোভিয়েত 'পরীক্ষা'র ফলে সর্বনাশ হয়ে গেল, তবু এখন তাঁরা সেই 'পরীক্ষা'ই চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন! এমনকি বলছেন, "পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করবার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ চালিয়ে যাব।" তাতে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন না, কি বিপদ দেখছেন না, তাঁরা এর আগে যা করছিলেন সেটা পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার আশঙ্কায়, না শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করবার কোনো বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে? বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে তার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা স্থাপন করার যে-প্রস্তাব করা হয়েছিল কেনেডি-ম্যাকমিলান যুক্ত বিবৃতিতে গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ঠিক সেই প্রস্তাবেরই ভিত্তিতে 'পরীক্ষা' নিষিদ্ধ করবার সোভিয়েত পরিকল্পনাটিকে মার্কিন-বৃটিশ পক্ষ গত ২৭শে নভেম্বর জেনেভায় প্রত্যাখ্যান করলেন—সেটা কি তাঁদের 'পরীক্ষা'র বিরোধী মনোভাবের পরিচয়? সোভিয়েত 'পরীক্ষা'র বিরুদ্ধে তাঁরা যত প্রচার চালাচ্ছিলেন, সেটাকে তাঁরা নিজেরাই তো অপপ্রচারের ভস্মরাশি বলে প্রতিপন্ন করে দিলেন। কিন্তু সেই অপপ্রচারেরই ভস্মরাশি উড়িয়ে উড়িয়ে আমাদের দেশকেও 'ঠাণ্ডাযুদ্ধের' বিষের আবহাওয়ায় দূষিত করে তুলবার কি ব্যর্থ সমারোহই না দেখা গেল!

সাম্প্রতিক সাহিত্য

সিভিলিয়নের আত্মকথা

প্রদ্যোৎ গুহ

প্রাচ্যবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠির মধ্যে জন বিমসের নাম হয়তো অপরিচিত নয়। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর ভারততত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে।

গ্রীক, লাতিন, জর্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ প্রভৃতি ইওরোপীয় ভাষা ছাড়াও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় বিমস্ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তিন খণ্ডে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ (১৮৭২-৭৯) রচনা করেছিলেন। তাঁর বাংলাভাষার ব্যাকরণ (১৮৯১) ১৯২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নিযুক্ত আই. সি. এস. শিক্ষানবীশদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। বিমস্ তুর্কী ভাষা থেকে বাবরের স্মৃতিকথার ইংরেজি তরজমা করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভূগোল (অসমাপ্ত) রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। এসব তথ্য হয়তো অনেকের জানা ছিল কিন্তু বিমস্ যে একটি আত্মচরিত রচনা করে গিয়েছিলেন এবং তা যে পূর্ব-ভারত সম্পর্কে একটি তথ্যের স্বর্ণখনিবিশেষ তা হয়তো অনেকেই জানতেন না।

বিমস্ তাঁর আত্মচরিত লিখতে শুরু করেন ১৮৭৫ সালে কিন্তু কাজের চাপে লেখা এগোয় মন্দ-মন্থর গতিতে এবং শেষপর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৬ সালে অবসর গ্রহণের পর পুনরায় তিনি লেখার কাজে হাত দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লেখা শেষ করে যেতে পারেন নি। ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিমস্ তাঁর আত্মচরিত প্রকাশের জন্য লেখেন নি, লিখেছিলেন প্রধানত নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য যাতে তাঁর "উত্তরপুরুষেরা জানতে পারে তাদের পূর্বপুরুষরা কিভাবে দিনযাত্রা নির্বাহ করত।" বিমসের পাণ্ডুলিপি তাই এতকাল পারিবারিক দলিল-দস্তাবেজের মধ্যেই চাপা পড়েছিল।

সম্প্রতি ফিলিপ মেসন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে প্রাক্তন সিভিলিয়ানদের চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদির খোঁজখবর করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান পান এবং পড়ে মুগ্ধ হয়ে যান। মেসন তাঁর বইয়ে পাণ্ডুলিপিটি থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রধানত মেসনের এই আবিষ্কারের ফলেই বিমসের মৃত্যুর ৫৯ বৎসর পরে তাঁর সেই অসমাপ্ত আত্মচরিত 'জনৈক বেঙ্গল সিভিলিয়নের স্মৃতিকথা' নামে বিলেত থেকে এই বছর প্রকাশিত হয়েছে।

বিমস্ ছিলেন কোম্পানি-নিযুক্ত সিভিলিয়নদের শেষ দলের অন্যতম। কার্যব্যাপদেশে তিনি প্রথমে পাঞ্জাবে, পরে ওড়িষ্যা এবং সর্বশেষে বাংলাদেশে প্রায় ৩৫ বৎসরকাল কাটিয়েছেন। ১৮৯৩ সালে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার হিসাবে কাষ অবসর গ্রহণ করে তিনি বিলেত ফিরে যান। মধ্যে কিছুকাল তিনি 'বোর্ড অব রেভিনিউ'তেও কাজ করেছেন।

বিমস্ 'প্রাসাদপুরী' কলকাতা সে পৌঁছেছিলেন ১৮৫৮ সালের ১৮ই মার্চ। তখনও তথাকথিত 'মিউটিনি'র হাঙ্গামা সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নি। রানী ভিক্টোরিয়া সম্রাজ্ঞী পদে বৃতা হয়ে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেন নি। তখনও ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্ব চলছে।

বিমস্ তাঁর আত্মচরিতের ভূমিকায় লিখেছেন, "যে ভারতবর্ষে আমি আমার জীবনের এত বড একটা অংশ কাটিয়ে এসেছি আজ তা একটা বিপুল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তখন জীবনযাত্রার যে অবস্থা ছিল, যে সব প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল তার অনেক কিছুই আজ আর নেই। আমার জীবনের যে অংশ ভারতে অতিবাহিত হয়েছে তার বিবরণ সেই অধুনা বিলুপ্ত অবস্থার বিবরণ হিসাবেই হয়তো কাজে আসবে।"

বিমস্ সত্যিকথাই লিখেছেন। তিনি যে সময় ভারতবর্ষে এসেছিলেন তা ছিল একটা পর্বান্তের যুগ। 'মিউটিনি' পরবর্তীকালে, ১৮৫৮-৫৯ সালে, ভারতবর্ষ শুধু যে তার নামমাত্র সার্বভৌমত্ব হারিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে উঠেছিল তাই নয়, তখন একশ বছরের কোম্পানির শাসনেরও অবসান হয়েছিল। কোম্পানির আমল ছিল বৃটিশের রাজ্যবিস্তারের কাল। 'মিউটিনি'-পরবর্তীকালে যে যুগের সূচনা হল তাকে বলা যেতে পারে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহতিসাধনের যুগ। সেই যুগে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা কিভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করল, শাসন এবং বিচারব্যবস্থা কিরকম ছিল,

দেশের অবস্থা কি ছিল, সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত বিশেষ করে পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িশ্যা ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় তার একটা প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায় বিমসের আত্মচরিতে।

বিমস্ কার্যব্যাপদেশে যখনই কোনো নতুন অঞ্চলে গেছেন আত্মকাহিনীতে তার বিবরণ দিতে গিয়ে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সাধারণ লোকেদের জীবনযাত্রার ধরন, ভূমিব্যবস্থা এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেকালে রাজপুরুষরা এবং সাধারণভাবে শ্বেতাঙ্গ-সমাজ কিভাবে দিন কাটাত তারও একটা তথ্যনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায় বিমসের স্মৃতিকথায়। ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিমসের আত্মচরিতের গুরুত্ব এই কারণেই।

ভারতবর্ষে বিমসের কর্মজীবনের শেষ পনেরো বছর কেটেছে বাংলাদেশে। তার মধ্যে মাত্র এক বছরের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই এক বছর তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে। বাকী চোদ্দ বছর তিনি কাটিয়েছেন চুঁচুড়া, বর্ধমান, ভাগলপুর ও কলকাতায়। আত্মকাহিনীর এই অধ্যায় বিমস্ লিখে যেতে পারেন নি—এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ আফশোসের কথা। এই সময় বাংলাদেশে শ্বেতাঙ্গদের ইলবার্ট বিলবিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়েছিল। এডুকেশন কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করছিল। বিমস্ কমিশনে সরকারের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তার বিবরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাছাড়া, এই অধ্যায় লিখিত হলে তাতে নিশ্চয়ই সেকালের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেত।

বিমসের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের হলেও তাঁর কলম ছিল সাহিত্যিকের। তাঁর আত্মকাহিনী তাই উপন্যাস ফেলে রেখে পড়তে হয়। নীলকরদের অনাচারের কাহিনী আমাদের অজানা নয়, কিন্তু বিমস্ যখন তাদের ছবি আঁকেন তা যেন ইতিহাসের পাতা থেকে কায়া পরিগ্রহ করে উঠে আসে। সেকালের অযৌক্তিক লবণ আইনের বিরুদ্ধে বিমস্ যে সংগ্রাম করেছিলেন, যার ফলে এই আইনের কড়াকড়ি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল তার বিবরণও গল্পের মতো পড়া যায়। কিভাবে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করা হত এই প্রসঙ্গে বিমস্ তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। উদয়গিরির বৌদ্ধ (জৈন ?) ধ্বংসাবশেষ বিমস্ আবিষ্কার করেছিলেন। তারও মনোজ্ঞ বিবরণ আছে এই

স্মৃতিকথায়। আর এই সব তথ্যের মাঝে মাঝে বিমস্ কালি-কলমে নানা মানুষের এমন সব জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কলকাতা-সমাজের প্রজাপতি-স্বভাবা লুলু, কিংবা 'প্রাচীন নাবিক' অ্যালফ্রেড বণ্ড কিংবা পরোপকারী শ্রীমতী হাওয়েকে ভোলা অসম্ভব।

গ্রন্থ-পরিচিতিতে ফিলিপ মেসন ঠিকই লিখেছেন, লেখার ক্ষমতা বিমসের প্রায় বিধিদত্ত। তাঁর মন স্বচ্ছ, কী বলবেন তিনি তা ভাল করেই জানেন এবং নির্দিধায় তা বলেন। ট্রলপের মতো তিনি দ্রুত লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, থেমে থেমে 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বা কলমের পেছন কামড়ে কামড়ে' তাঁকে লিখতে হত না।

তাঁর ইংরেজি সহজ-সরল, মোটেই ভিক্টোরীয় যুগের মতো কটমট নয়। কার্লাইল রাস্কিনের যুগের লেখক হলেও তাঁর ভাষা সুইফট, ডিফোর মতোই সরল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন।

Memoirs of a Bengal Civilian : John Beames. Chatto & Windus, London. 30 Sh.

পুস্তক পরিচয়

ইলিশমারির চর ॥ আবদুল জব্বার। ইউনিভার্সাল বুক ডিপো। পাঁচ টাকা ॥

নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় বাংলাসাহিত্যের কৌলিন্যের সার্থক উত্তরসূরী আবদুল জব্বার। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ইলিশমারির চর' সাহিত্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। বইটি পশ্চিম বাংলার মৎস্য-জীবীদের জীবনযন্ত্রণার চিত্রল শব্দলিপি।

উপন্যাসটি নদীমাতৃক। জয়নদ্দি-হরেন-কানাই-কাশেম ও তাদের প্রতি-দিনের জগতের শক্তিশালী পরিপ্রেক্ষিতই হল নদী। মূল চরিত্র জয়নদ্দি পুরুষানুক্রমে মৎস্যজীবী তাই তার জীবনসংগ্রামে নদীর ভূমিকা অবধারিত ও অনস্বীকার্য। গ্রামীন সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে মহাজন তরবদির বলি হয় ধর্মপ্রাণ, সহজবিশ্বাসী মৎস্যজীবীরা। জয়নদ্দি, হরেন ও কানাইয়ের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের মূল্যে কামড় বসায় তরবদি। সহস্রবাহুতে শোষণ করে।

তরবদির শোষণের ভয়াবহ রূপ চঞ্চল করে জয়নদ্দিকে। সে মহাজন তারিণীর কাছে নৌকা জমা নেয়, তরবদির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারপর গ্রামে দেখা দেয় অন্য এক চেতনা। তারিণীর শিক্ষিত ছেলে রতন, তার বন্ধু আনোয়ার, মেয়ে রোহিণীর সঙ্গে আসে শিক্ষা ও শ্রেণীচেতনার ঢেউ। প্রচলিত জীবনস্রোতে বাধা পড়ে। অন্ধ আদিমতা, তাড়ির নেশা ও ধুঁকে ধুঁকে নিজেদের নিঃশেষ করার দিন শেষ হয়ে দেখা দেয় জীবনের মূল্য নির্ণয়ের নতুন ক্ষণ। মাঝে মাঝে মামলাবাজ তরবদির অসুস্থ উন্মত্ততা প্রকট হয়। গ্রামে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় অন্যতর চেতনার জোয়ার আসে। কার্তিকের শেষ। একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। সমুদ্রযাত্রার দিন আসে। জয়নদ্দি-হরেন-কাশেমরা পাঁচপীরের নাম করে নৌকা ছাড়ে বদর

বন্দর। আর চোখের জল মুছতে মুছতে যে যার বাড়ি চলে যায় সিন্ধু, শাকিনা, কাশেমের মা, জয়নদ্দির মা।

একটার পর একটা দিন এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। ইতিমধ্যে লোভী তরবদির অনুচরেরা একদিন গভীর রাতে হানা দেয় সিন্ধুর ঘরে। সন্তানসম্ভবা সিন্ধুর আর্তনাদ তাদের জান্তব পিপাসাকে আরও প্রকট করে, প্রাণহীন সিন্ধুর দেহটাকে খালের ধারে পুঁতে রাখে। তরবদির এই চক্রান্ত ধরা পড়ে যখন সমুদ্র থেকে ফিরে আসে জয়নদ্দির দল। প্রতিশোধের জ্বালায় পাগল সাজে হরেন। তারপর একদিন পাগলামির ভান করে খুন করে হরেন তরবদিকে। মহাজন তারিণীর ব্যবস্থায় ছাড়া পায় হরেন।

পরদিন ভোর না হতেই শাকিনা ডেকে তোলে জয়নদ্দিকে। এতদিনের পরিশ্রমে ছোটখাটো মহাজন হয়েছে সে। মায়ের পায়ে সালাম করে তারা বেরিয়ে পড়ে নদীতে।

জয়নদ্দি নৌকোয় উঠে দাঁড়ায়। আশ্চর্য হয়ে দেখে ইলিশমারির চরের সবুজ গাছপালার মাথার ওপর দূরে পুবদিগন্তে রক্তিম আলোর বন্যা ভাসিয়ে দিয়ে উঠেছে নতুন দিনের সূর্য। এক দার্শনিক ভাবনায় ভরে ওঠে তার প্রাণমন।

এই হল কাহিনী। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে লেখকের মুন্সীয়ানাকে বার বার অভিনন্দন জানাতে হয়। মূল চরিত্র জয়নদ্দি, স্ত্রী শাকিনা, যৌবনমুখর সিন্ধু, মহাজন তরবদি, রতন, রোহিণী প্রভৃতি চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি পাঠককে কাহিনীর দিগন্তে পৌঁছে দেয়। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কোথাও কোথাও প্রকট হলেও ইলিশমারির চরের মৎস্যজীবীদের জীবন বর্ণনায় এর প্রয়োজন ছিল মনে হয়।

শিল্পী খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ চিত্রটি সুন্দর।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

চর্যাপদের হরিণী ॥ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। তিন টাকা ॥

শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পকে ইতোমধ্যেই গতানুগতিক কথা-সাহিত্যধারা থেকে পৃথক করে তোলার সাধনায় বিশিষ্ট। তিনি ইদানিং নানা বিতর্কের কেন্দ্রবর্তীদের অন্যতম কতকটা এই কারণেই। বর্তমান

গল্পগ্রন্থের শেষ গল্পটি সেই বিতর্কাবর্তের মূল কেন্দ্রের একটি বলে খ্যাতি ও বহুল পরিমাণে অখ্যাতি দুইই অর্জন করেছে। আমরা গল্পগ্রন্থের সমস্ত গল্পগুলির পটভূমিকায় নাম-গল্পটির আলোচনা করব। গল্পগ্রন্থটির মধ্যে গল্পকার দীপেন্দ্রনাথের একটি বিবর্তন লক্ষণীয়। ভাসানের লেখক ধীরে ধীরে ঘাম নরকের প্রহরী এবং চর্যাপদের হরিণী লিখছেন। কয়েকটি পৃথিবী এসব গল্পের আগে লেখা। একটা কথা এরই সঙ্গে মনে হবে, সেটা হল কয়েকটি পৃথিবী এবং চর্যাপদের হরিণীই এই গ্রন্থের মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী গল্প। তার মধ্যে কয়েকটি পৃথিবী এই গ্রন্থের দুর্বলতম রচনা। তথাপি এ কথা ঠিক নয় যে কয়েকটি পৃথিবী গল্পে বাস্তবকে অধ্যয়নের প্রকরণগত দুর্বলতাকে অনুধাবন করেই লেখক চর্যাপদের হরিণীর নিরীক্ষামূলকতার দিকে ঝুঁকেছেন। এ ঝোঁক বা প্রবণতার উৎস অন্যত্র।

এই ঝোঁক সার্থক কি অসার্থক সে আলোচনার পূর্বে, দীপেন্দ্রনাথের বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধে দু একটি কথা—তাঁর গল্পগুলির প্রসঙ্গেই—আলোচিত হওয়া দরকার। ভাসানের মতো আবহাওয়া-পরিবেশপ্রবল গল্পে দীপেন্দ্রনাথের শক্তির সম্ভাবনার বিকাশে আমরা নিশ্চয় চমৎকৃত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা তখনো অমোচিত যে বাস্তবতা বলতে বিশিষ্টভাবে তিনি কী বুঝছেন? যখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু সাহিত্যে পরিবেশ-অঙ্কনে নানা সিদ্ধির পরিচয় দিচ্ছিলেন, তখন ভাসানের মতো গল্পে দীপেন্দ্রনাথের নিজস্ব সাফল্য অবশ্যই শ্রদ্ধেয়—বিশেষ যখন দেখা যায় যে একই সময়ে জন্মভূমি এবং নতুন সাহিত্য শারদীয় সংখ্যায় সমরেশবাবুর গঙ্গা ও দীপেনবাবুর ভাসান প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষনীয়—এই সাফল্য সত্ত্বেও তিনি চর্যাপদের হরিণীর মতো বিতর্ক সৃষ্টিকারী গল্প লিখেছেন। সাফল্যের স্বর্ণসড়ক পরিহার করে এই কণ্টক-সাধনার মূলে নিশ্চয় নির্বুদ্ধিতা নয়। সে কারণের মূল সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে ভাসান ছাড়া বাকি সব গল্পেই লেখক যা ধরতে চেয়েছেন তা হল মানুষের বিশ্লিষ্টতার যন্ত্রণা। একমাত্র ভাসানেরই বিষয়বস্তু ছিল মানুষের জীবন-জীবিকার সমগ্রতাকে মেঘনার মেঘ-বৃষ্টি-রোদের রূপকে ধারণ। ঘাম, নরকের প্রহরী এবং চর্যাপদের হরিণীর বিষয় হল সে ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ভগ্নাংশ-স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতনতা। কাটামুণ্ডুর চোখের জলে প্রকৃত প্রস্তাবে খণ্ডিত জীবনের বেদনা। বিষ্টুচরণের শেষ স্বপ্নের দর্পণের মিত-পরিসরে তার জীবনের ভাঙাচোরা রূপের ছায়া। সুধা এবং তৃপ্তির নাটকীয় বক্তৃতার মধ্যেও

তাই—জীবনের ভগ্নাংশে বিক্ষিপ্ততার আভাস। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভাসান গল্পে জীবন-জীবিকার সমগ্রতাকে সার্থকভাবে ধারণ করেও, জীবনের বিশ্লিষ্টতার যন্ত্রণাকেই বাস্তবাধ্যয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে তাঁর মনে হল কেন? এ প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর অবশ্য শিল্পীর কাছেই লভ্য। কিন্তু শিল্প-গ্রাহীদের নিজেদের কাছেও এ উত্তর হয়তো একেবারে দুর্লভ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, স্বাধীনতার পরবর্তী কালে মধ্যবিত্ত মানসে নানা ব্যর্থতার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি ভগ্নাংশেই ছিল ভাঙনের স্বাক্ষর। জীবনের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট এই কয়েক বছরে কী আকার ধারণ করেছে, কী পরিমাণে বেড়ে উঠেছে রাশি রাশি আত্মপ্রবঞ্চনার নিদর্শন, তার জন্য পৃথক আড়ম্বর না করে দুটি সম্প্রতি প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। এ বছরের শারদীয় সংখ্যা নতুন সাহিত্যে রণজিৎ দাশগুপ্তের কলিকাতা মহানগরীর সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের কয়েকটি দিক,—প্রবন্ধটি প্রথম মন্তব্য প্রসঙ্গে, এবং উক্ত সংখ্যা চতুষ্কোণে অশোক রুদ্রের মার্কসবাদীর আত্মজিজ্ঞাসা প্রবন্ধটি দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রচুর আলোকসম্পাতী প্রবন্ধ। তথ্যে পরিসংখ্যানে এবং ব্যাখ্যায় প্রবন্ধ দুটি আজকের জীবনের নাগরিক ব্যর্থতার স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে কথা মার্কসবাদীদের অধিকতর প্রণিধানযোগ্য সেটা হল এই—শ্রমিক আন্দোলন এখনো মধ্যবিত্ত নেতৃত্বাশ্রয়ী বলেই এখনো আন্দোলনের কোনো প্রবল জাহ্নবীধারা গড়ে ওঠেনি। বামপন্থী লেখকমানসে এদিক থেকে কোনো সম্বল নেই। যা আছে তা ইতঃস্তত কয়েকটি অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভের স্মৃতিমাত্র। এর প্রেরণা বেশিদূর নয়। তার থেকে অনেক বেশি প্রবলাকারে সচেতন শিল্পীমানসে অনুভূত হয়েছে জীবনের ভগ্নাংশিক বিক্ষিপ্ততা যার প্রামাণিক স্বরূপ উক্ত প্রবন্ধ দুটিতে ধৃত। কাটামুণ্ড-চেহারার জীবনের যথার্থ বাস্তব অধ্যয়ন সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে নরকের প্রহরীর লেখক পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত সঙ্কটের চেহারা আঁকিতে গিয়ে চর্যাপদের হরিণী লেখেন। যে ভাঙা আয়নায় ভুতো মুখ দেখত এবং ক্রুদ্ধ হত, সুধাময়ের স্বগত অবগাহনে সেই ভাঙা দর্পণেরই অন্তার্থ। তাই সুধাময়েরও মনে পড়ে যায় অনিবার্যভাবে কাটামুণ্ডের প্রতীক। শুধু অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ তাড়নায় ভুতো যেখানে অশ্রুময়তায় স্পষ্ট—সুধাময় সেখানে নিজেই সেই ভাঙা দর্পণটা বলে গল্পের ঋদ্ধতা পরিস্ফুত হয়েছে। দর্পণ এবং প্রতিবিম্ব উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ এই বোধ নিয়ে দীপেনবাবু অগ্রসর হয়েছেন বিমূঢ়, বেপথু, বহু

ইতিনেতির কাটাকুটিতে জটিল বাস্তবের সমগ্রতাকে রূপায়িত করার জন্ম। সুধাময় উকিলবুদ্ধি কি কফিবুদ্ধি (ভাসান) নয়। কলকাতার প্রতিদিনও তরঙ্গসঙ্কুল মেঘনা নয়। বরঞ্চ চতুর্দিকবর্তী মন্থর ক্লান্তিতে সুধাময়েরাও এখানে অকিঞ্চিৎকর। তাই সময়-সচেতন সুধাময়দের চিন্তায় নিজেকেই ব্যঙ্গ করার প্রবণতা। এই ব্যঙ্গর দৌলতেই গল্পটিতে যা কিছু রক্তসঞ্চার হয়েছে। নতুবা গল্পটি একটি বিশেষ দুর্বলতার দুর্ভোগ বহন করছে। সে দুর্বলতা হল বস্তু-সম্পর্ক-শূন্যতা। দীপেনবাবুই পরবর্তী কয়েকটি গল্পের সার্থকতার মূলে দৃঢ় বস্তুভিত্তি। জটায়ু, স্বয়ম্বর সভা তার প্রমাণ। এই বস্তুভিত্তিকতার গুণেই সেখানে গাল্পিক সার্থকতা নূতন আস্বাদ বিতরণে সক্ষম হয়েছে। চর্যাপদের হরিণী গল্পের চূড়ান্ত দৌর্বল্য এইখানে যে সুধাময় চিন্তার সাহায্যে যে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করতে চেয়েছে তা বাস্তব-ভূমির দ্বারা সমর্থিত হয়নি। এই ত্রুটির জন্মই যে প্রতীক নির্বাচিত করা হয়েছে তা গল্পের প্রসঙ্গ-প্রকরণের প্রয়োজনে স্বভাবজ নয়। বরঞ্চ মনে হয় আরোপিত। চর্যাপদের হরিণ-হরিণী লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ প্রতীক না হওয়ায় লেখক নিজেই প্রতীক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গল্পের সাবলীলতার ধারাতেও ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। অবশ্য এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়—এই গল্পটির তাৎপর্য গল্পটির নিজস্ব ব্যর্থতাতেও হারায় না। এবং এই একটি গল্পের সার্থকতায় ও ব্যর্থতায় নব নিরীক্ষার সার্থকতা অসার্থকতার কিছু প্রমাণিতও হয় না।

গল্প গ্রন্থটির সার্থকতম গল্প ভাসান এবং নরকের প্রহরী। মানুষের যন্ত্রণাকে দীপেনবাবু মানুষ হিসাবেই অনুধাবন করতে চান। এখানে তিনি কোনো ব্যাখ্যাসূত্রের ধার ধারেন না। গভীর পর্যবেক্ষণ ও শান্ত সহানুভূতির আলোকে তিনি যখন মানুষের যন্ত্রণাময় জীবনের পাতাগুলি একে একে খুলতে থাকেন তখন তাঁর শক্তির বিশিষ্টতা স্বতঃস্বীকার্য। একটা মেলায় ছুটো সার্কাসের কতকগুলি মানুষকে নিয়ে তিনি যে গল্প (নরকের প্রহরীতে) গড়ে তুলেছেন তা শুধুমাত্র গরীব মানুষের দুর্দশার গল্প নয়—তার রসসিদ্ধিতে অজানিতে সৃজিত হয়েছে আধুনিক জীবনের রূপক। ফেণিলোচ্ছল মুহূর্ত-সর্বস্ব জীবনের বিকার, কাটামুণ্ডুর খণ্ডিত জীবনের যন্ত্রণাকে দেখেও চিনতে পারে না—সে বাবা বলে উপহাস করে। এখানে বেদনার চূড়ায়িত মুহূর্ত সৃজনে তিনি সিদ্ধকাম। কিন্তু এই সিদ্ধিতেই তিনি থেমে থাকেন নি। এবং এইখানে বলা যেতে পারে দীপেন-বাবুর লেখক-সততা। তিনি যেমন ভাসানের সাফল্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েননি,

তার পরে ঘাম লিখেছেন, তেমনি নরকের প্রহরীর সাফল্যেও আবিষ্ট না হয়ে তিনি বাস্তবকে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করার ব্যাপারে অনলস থেকেছেন। লিখেছেন চর্যাপদের হরিণী। যে নির্বস্তুকতার জন্ম গল্পটি ব্যর্থ হয়েছে সেই শূন্যতা পূরণের জন্ম তিনি প্রয়াসশীল—সে নিদর্শনও অবিদ্যমান নয়। বাস্তবকে নানা দিক থেকে একজন লেখক ধরবার চেষ্টা করেন। যখন তিনি শক্ত মুঠোয় তাকে ধরতে পারেন তখন তাঁর প্রসঙ্গ প্রকরণ সবই সার্থক। দীপেনবাবু নিজের সাফল্য এবং ব্যর্থতা থেকেই সে শিক্ষা গ্রহণ করছেন ও করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নায়কত্ব বাংলাদেশে যে বিরল সংখ্যক মনস্বীর জীবনে, কর্মে যুক্তি এবং মননশীলতার যথার্থ বিকাশ সম্ভব করেছিল, ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তাঁদেরও মধ্যে বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্য অর্জনের মূলে ছিল তাঁর চরিত্র। সমাজতত্ত্বের প্রতি সহজাত আকর্ষণ বশে ও মার্কসবাদের অধ্যবসায়ী ছাত্ররূপে ধূর্জটিপ্রসাদ 'সবুজপত্র'গোষ্ঠীর মধ্যেও স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত ছিলেন। সেই একই কারণে পরবর্তীকালে 'পরিচয়' পত্রিকার আসরেও তিনি ছিলেন স্তম্ভবিশেষ। সুধীন দত্তের সম্পাদনাভার ত্যাগের পরও 'পরিচয়' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রীতি, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

তাঁর বিশাল ও কর্মময় জীবনের অধিকাংশই কেটেছে উত্তর প্রদেশে সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির অধ্যাপক রূপে। অধ্যাপনাসূত্রে ছাত্রসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ আর ঘনিষ্ঠ। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাফল্য প্রায় প্রবাদে পরিণত। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত ছাত্রফেডারেশানের সম্মেলনে ধূর্জটিপ্রসাদের বিখ্যাত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতার পরিচয় আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। কর্মব্যপদেশে তাঁকে কয়েকবারই বাইরে যেতে হয়েছে। ব্রুসেলসে আন্তর্জাতিক সমাজ-তান্ত্রিক এ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন, মস্কোয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কংগ্রেস, প্যারিসে ইউনেস্কো সেমিনার, বান্দুং সম্মেলন প্রভৃতি বিবিধ আন্তর্জাতিক অধিবেশনে তাঁকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। হল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়েব আমন্ত্রণে ভিজিটিং প্রফেসর রূপে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত বৈদগ্ধ্য ও যথার্থ রসগ্রাহীর মূর্ত রূপ। সংস্কার এবং ভাবালুতার বিরুদ্ধে যুক্তি আর মননের শাণিত অস্ত্র প্রয়োগে চিরদিনই তিনি

অকুণ্ঠ ছিলেন। বাংলাদেশের ভাবরাজ্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনায় তাঁর অবদান সামান্য নয়। উদার প্রগতিশীল একটি জীবনদর্শনের আলোয় জগৎ ও জীবনকে দেখার বাসনায় বহুবারই তিনি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন। আবার তথাকথিত সহজ-সরল-জনপ্রিয় প্রগতিশীলতার চোরাবালিতে পা দিতেও তাঁর অনীহা ছিল। তাই কল্লোলযুগের বহু চক্কানিনাদিত 'বস্তী-সাহিত্যে'র মারাত্মক কতকগুলি ভানকে তিনিই নির্মম সমালোচনা করতে পেরেছিলেন। অবশ্য ধূর্জটিপ্রসাদও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সময় ও পরিবেশগত প্রভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জাগতিক সমস্ত ব্যাপারেই কৌতূহল বজায় রেখে যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ের সাধনায় মূলত তিনি বিকাশশীল মানবসভ্যতার পক্ষেই তাঁর সমর্থন ঘোষণা করে গেছেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একত্রে একটি গ্রন্থ রচনা করে ধূর্জটিপ্রসাদকে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বহুপূর্বে রচিত নিবন্ধাবলী আজও মৌলিক, আজও পথনির্দেশক। 'টেগোর : এ স্টাডি' পুস্তিকাটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্যতম আকর-গ্রন্থ। তাছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহুবিধ প্রবন্ধাবলী বিষয়ের গুরুত্বে, বক্তব্যের ব্যঞ্জনায়, স্টাইলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের গৌরব বিশেষ।

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত প্রমুখ অনেকানেক মনস্বীর সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদও প্রবন্ধকার হিসেবে, তাঁর বিশেষ কালগত ভূমিকার জন্য আমাদের দেশের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী।

এমনই আর-এক কীর্তি তাঁর 'অন্তঃশীলা'-'আবর্ত'-'মোহনা' উপন্যাসত্রয়ী। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিতীয় যে কথাসাহিত্যিক সেদিন বাংলাসাহিত্যে স্বীকার করেছিলেন, তিনি ধূর্জটিপ্রসাদ। সেই প্রবল শরৎচন্দ্রীয় তথা কল্লোলীয় ভাবালুতার দিনে উপন্যাসের নতুন সংজ্ঞা উপলব্ধিতে ধূর্জটিপ্রসাদই বাংলাদেশকে বাধ্য করেছেন। বিষয়ে, বিন্যাসে, ভাষা ব্যবহারে, সমস্যার উপস্থাপনায়, এক কথায় উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন—আজও তা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং অবজ্ঞাত হলেও রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের হাতে যে নতুন কথাসাহিত্যের আন্দোলন জন্মগ্রহণ করল—তা পরবর্তীকালেও নানা বিচিত্র

গতির মধ্য দিয়ে বিকাশমান। উপন্যাসত্রয়ীর নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাই ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের অশেষ ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন।

সম্বর্ধনা

বীর এসেছিলেন, ইউরি গাগারিন। কলকাতা প্রস্তুত ছিল। আর ময়দানের সমাবেশে প্রত্যক্ষ করলাম মাটির সঙ্গে মহাকাশের যোগ। মহাজাতি সদনে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির প্রীতি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সত্যেন বসু বললেন "রুশ আর মানুষ" এক হয়ে গেছে।

এক হয়ে যাচ্ছে। দেশ আর দেশের ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচেছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষের দুর্জয় পাদস্পর্শ নিছক কল্পনা থাকছে না। অতীতের রূপকথা ভবিষ্যতের বাস্তবতার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। ইউরি গাগারিন সভ্যতার অমোঘ বিজয়বার্তা এবং বিশ্বমানবসংহতির বাণী দেশে দেশান্তরে বহন করে বেড়াচ্ছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির মানপত্রে বলা হয়েছে "আজ পৃথিবীর একদল পরাভববাদী হাহাকার করছেন, বিশ্বের ধ্বংস আসন্ন—মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সমগ্র মানবতা অনিবার্য বিনাশের পথে অগ্রসর। কিন্তু আপনার স্বদেশবাসী বৈজ্ঞানিকদের কল্পনাতীত সাফল্যে আপনি এবং আপনার মিত্র মেজর গেরম্যান তিতভের সার্থক মহাশূন্যবিজয়ে এ আশংকা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম মহাকাশযাত্রীরূপে সমগ্র প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করবার গৌরবে এই সত্যই আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মানবতা আজ আত্ম-ধ্বংস চায় না—দূরদূরান্তে গ্রহেগ্রহে বিপুলতম আত্মবিস্তার ও বিকাশের পথে সে অগ্রসর। ৎসিওলকোভস্কির গাণিতিক দিব্যদৃষ্টি আজ বিশ্বমানবের প্রত্যক্ষ সত্য। এই নূতন ইতিহাস রচনার পথে প্রথম পদচিহ্ন আপনিই অংকিত করেছেন। মানুষের চিরসঞ্চিত স্বপ্ন ও সাধনা রূপায়িত হয়েছে···।"

নাট্যপ্রসঙ্গ

২৭শে নভেম্বর গেরোসিম লেবেদফ দিবস উপলক্ষে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভা মঞ্চে এক সময়োপযোগী আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশে

নবনাট্য আন্দোলন নতুন চলচ্চিত্রের আন্দোলনের মতোই ক্রমশ এক ঘটনা হয়ে উঠছে। কিন্তু এই আন্দোলন সম্পর্কে জীবনবিমুখতা, ঐতিহ্যহীনতা ও আঙ্গিক সর্বস্বতার অভিযোগ এরই মধ্যে উঠেছে। এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের পক্ষে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপক্ষে উৎপল দত্ত মুখ্য আলোচক ছিলেন। নবনাট্য আন্দোলন ও দর্শক সমাজ এই আলোচনা থেকে প্রভূত উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

শুধু নাট্যপরিবেষণ নয়, দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন তথা দর্শক রুচি গড়ে তোলার পেছনে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের এ জাতীয় প্রয়াস অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমশই তাঁরা এক গৌরবময় ভূমিকার অধিকারী হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে। এই দলটির কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। বাংলা দেশের গণনাট্য আন্দোলন ও সাম্প্রতিক নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে এঁদের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত ভূমিকাও স্মরণ করি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে 'বহুরূপী' জীবিত থেকেও যেন নেই। শম্ভু মিত্র মহাশয় ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তৃপ্তি মিত্র পেশাদারী নাটকে অভিনয় করে এবং 'বহুরূপী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গুণী ব্যক্তি একে একে দল ছেড়ে হয়তো এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে ফেলেছেন। কচিৎ দু-একটি অভিনয়, তাও পুরনো নাটকের অভিনয় মারফৎ মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার হলে 'বহুরূপী' নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ছোট-বড় বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের আদর্শ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিপুল আবেগে যখন দেশে এক নবনাট্য আন্দোলনে ক্রমঅগ্রসরমান, তখন 'বহুরূপী'র প্রয়াসও সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে, আমরা সেই আশা রাখি। কারণ প্রথমাবধি যত সীমাবদ্ধতাই থাক, 'বহুরূপী' ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যদি এই আন্দোলনের সহযাত্রী হন তাহলে এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে অনেক শক্তিশালী হবে।

খুবই আনন্দের বিষয় যে দীর্ঘদিন বাদে আবার এই সম্প্রদায় সম্প্রতি একটি নতুন নাটক, 'বিসর্জন', মঞ্চস্থ করেছেন। 'পরিচয়' 'বহুরূপী'র পুরনো বন্ধু। তাই 'বহুরূপী'র প্রতিটি উদ্যোগ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করি। 'বিসর্জন' দেখার সুযোগ আমরা এখনও অর্জন করি নি। তাই সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা সম্ভব হল না। আমরা ভরসা রাখি 'মুক্তধারা'র মতো এই নাটকটি 'কাঞ্চনরঙ্গ'র বন্যায় তলিয়ে যাবে না। বরং 'বিসর্জন' 'বহুরূপী'র জীবনে

নতুন প্রতিষ্ঠা এনে দেবে। বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা রূপে এঁরা সর্বতোমুখী প্রচেষ্টায় নবনাট্যআন্দোলনকে, নিজেদেরও অগ্রসর করতে তৎপর হবেন।

এই ক্রমবর্ধমান নবনাট্য আন্দোলনে 'শৌভনিক' সম্প্রদায়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে যাত্রার ঐতিহ্য অদ্যাবধি জীবন্ত। তদুপরি নাট্যগোষ্ঠী ও দর্শক সমাজ উভয়েরই আর্থিক অবস্থা খানিকটা 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতন্ত্রীয়', অর্থাৎ সংকটাপন্ন। এই বাস্তব কারণগুলির সম্মুখীন হয়েই 'শৌভনিক' এ দেশে মুক্তাঙ্গন রীতিতে নাট্যপ্রদর্শনের এক বলিষ্ঠ আন্দোলন শুরু করেছেন। ১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁরা একটি 'মুক্ত অঙ্গন'-ও বেশ কিছুদিন হল পরিচালনা করছেন। শুধু 'শৌভনিক' নয়, বহু নাট্য প্রতিষ্ঠানই নামমাত্র চাঁদার বিনিময়ে এই মঞ্চ ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের দেশে জাতীয় থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হবে জানি না। কিন্তু এই 'মুক্তাঙ্গন' মঞ্চ, সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতিই সে অভাব আজ খানিকটা পূরণ করতে পারছে। সৎ উদ্যোগ যে কোনো প্রতিকূলতাই সহ্য করে না; শিল্পী তাঁর সৃষ্টি নিয়ে, দেশবাসী তাঁদের সাংস্কৃতিক আগ্রহ নিয়ে যে নিজেরাই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেন এই ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ।

তাছাড়া এই মুক্তাঙ্গন রীতির প্রভাবে আমাদের যাত্রা ও থিয়েটার যে অনেকখানিই পুনর্গঠিত হতে পারে—তারও সম্ভাবনা অস্বীকার করি না।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'; গোর্কীর 'মা'; ইবসেনের 'গোষ্টস্'; রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'মুক্তির উপায়', 'রাজা ও রাণী', 'বাঁশরী' প্রভৃতি নাটক 'শৌভনিক' সম্প্রদায় এই মুক্তাঙ্গন রীতিতেই মঞ্চস্থ করেছেন। নাটক নির্বাচনেই এই গোষ্ঠীর বৈদগ্ধ্য ও সমাজ সচেতনতার যথার্থ পরিচয় পাই। 'মৃচ্ছকটিক', 'মা' ও 'গোরা' যাঁরা পর্যায়ক্রমে অভিনয় করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে নতুন কিছুই বলার অপেক্ষা রাখে না। 'দ্বিতীয় মহীপাল', 'মা-হিংসী', 'ফানুষ' প্রভৃতি নতুন নাটকও এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন!

গেরোসিম লেবেদেফ ও মুক্ত অঙ্গন প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মরণে ২৭শে নভেম্বর 'শৌভনিক' সম্প্রদায় তাঁদের মঞ্চে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনীর আয়োজন করেছিলেন। নতুন নাটক 'ন'ন'না'-'র কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য এইদিন অভিনীত হয়েছে। ৯ই ডিসেম্বর থেকে নাটকটির সম্পূর্ণ প্রদর্শন শুরু হবে।

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব

নবগঠিত সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে কয়েকটি অসামান্য চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁরা পরিচয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। বাংলা দেশে এ যাবৎ যতগুলি চলচ্চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, গুণগত বিচারে এটি নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম প্রধান বলে বিবেচিত হবে। উৎসবের বাইরে 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস'-এর অতিরিক্ত দুটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে উদ্যোক্তারা বিরল সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

সম্প্রতি তরুণ পরিচালক আঁদ্রে মুঙ্কের জীবনাবসান হয়েছে। শেষ দিনে তাঁর 'ব্যাড লাক' প্রদর্শিত হল। এই অসাধারণ চলচ্চিত্রটির পরিচালক মুঙ্কের অকাল জীবনাবসানে আমরা আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছি। প্রসঙ্গত বলা দরকার আইজেনস্টাইনের সহযোগী প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান এডুয়ার্ড টিসে-রও সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। রুশ চলচ্চিত্রের স্তম্ভবিশেষ এডুয়ার্ড টিসেকে বাদ দিয়ে আইজেনস্টাইনের কোনো চলচ্চিত্রের কথাই যেন ভাবা যায় না। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি।

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে মোট পাঁচটি পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি ও কয়েকটি শর্ট দেখানো হয়েছে। কার্টুন, ডকুমেন্টারি ইত্যাদি শর্টসিরিজে কয়েকটি ছিল নিরীক্ষামূলক।

আঁদ্রে ওয়াজদার 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস' এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল। ওয়াজদার 'কানাল' আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-জগতে ওয়াজদা, মুঙ্ক প্রভৃতি তরুণ পরিচালক 'পোলিশ স্কুল' নামে এক স্বতন্ত্র স্কুল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস্'কে বলা হয় 'পোলিশ পটেমকিন'।

আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত এই 'পোলিশ স্কুল' চলচ্চিত্রের আন্দোলনে কি অসামান্য সিদ্ধিলাভ করেছেন প্রদর্শিত প্রতিটি ছবিই তার প্রমাণ। অবশ্য 'আওয়ার্স অব হোপ' ও 'এ্যাটেনশন' আমি দেখি নি।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে এদেশে কত ভুল, মিথ্যে ধারণা প্রচারিত হয় তার উদাহরণ এই ছবিগুলি। বাস্তবতার কি গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য অন্বেষণে এঁরা নিয়ত নিরীক্ষাশীল তারও প্রমাণ বিশেষত ওয়াজদা ও মুঙ্কের দুটি ছবি। আর 'নাইট ট্রেন' এবং 'ইভ ওয়ান্টস্ টু স্লীপ'ও অন্য কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের দেশে এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলির সম্পর্কে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের নবজাত ও গৌরবময় চলচ্চিত্রের আন্দোলনেও অনিবার্যভাবেই বাস্তবতা, আঙ্গিক, দর্শকরুচি প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক সমস্যা এসেছে। অত্যধিক সরলীকরণের প্রভাব দেখেছি 'তিন কন্যা'য়, ও আঙ্গিকসর্বস্বতার ফল প্রত্যক্ষ করেছি 'কোমল গান্ধার'-এ। অথচ সময় ও সমাজের প্রতি অনুগত থেকে, আঙ্গিক বিষয়ে চূড়ান্ত আধিপত্য অর্জন করে, জীবনের মৌলিক সমস্যা ও সর্বব্যাপী রূপকে ফুটিয়ে তোলার পারদর্শিতা আবার এই তরুণ পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে দেখা গেল। আমাদের দেশেও সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখ তাঁদের সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধান্বিত হতে বাধ্য করেছেন। আশা করব এঁদেরই কেউ বা যোগ্য কোনো ব্যক্তি অচিরে বিশেষত 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস' ও 'ব্যাড লাক' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করবেন।

প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হয়ে গেল। ১১ থেকে ১৯শে নভেম্বর ক্যাথিড্রাল রোডের আকাদেমী ভবনে অনুষ্ঠিত শ্রীমতী অর্জুন রায়ের প্রদর্শনীটি ছিল সত্যিই বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের চারিপাশে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট যে অনুপম শিল্পসম্ভার ছড়িয়ে আছে, শ্রীমতী রায়ের শিল্পী চোখ তা আবিষ্কার করেছে ও স্রষ্টার হাতের সামান্য স্পর্শে সেই অবজ্ঞাত শিল্পকর্মই হয়েছে এই প্রদর্শনীর সম্পদ। গাছের ডাল, কাঠের টুকরো বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে দর্শকের সামনে এক জগৎ উদ্‌ঘাটিত করেছে।

সমকালীন শিল্পীসংঘ কয়েকজন সাম্প্রতিক শিল্পী প্রতিষ্ঠিত এক উল্লেখযোগ্য শিল্পসংস্থা। ৩০শে অক্টোবর থেকে ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত আকাদেমি ভবনে এঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পকর্মের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল। চিত্রকর্ম ছাড়া ভাস্কর্যের কয়েকটি নিদর্শনও ছিল। সোমনাথ হোড় প্রমুখ স্বপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ব্যতীত অপেক্ষাকৃত নবাগত কয়েকজন শিল্পীর কাজও এই প্রদর্শনীর সম্পদ।

অজয় মুখোপাধ্যায় তরুণ শিল্পী। আকাদেমি ভবনে ৯ থেকে ১৫ই নভেম্বর এঁর চিত্রের একটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অধিকাংশ সাম্প্রতিক শিল্পীর মতোই অজয় মুখোপাধ্যায়ও চিত্রকলার বিষয় ও প্রকরণের প্রাসঙ্গিক সমস্যায় আক্রান্ত এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসও তাঁর আছে।

১লা থেকে ৭ই নভেম্বর আকাদেমি ভবনে প্রখ্যাত শিল্পী তুফান রাফাইয়ের

চিত্রকর্মের একটি উপভোগ্য একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাফাইয়ের প্রদর্শনীটি বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত একথা 'পরিচয়' পাঠকদের অজানা নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

৩রা ডিসেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী।

এই রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে তিনি অনুপস্থিত। মহাকাশ-বিজয়ী ইউরি গাগারিন মানবসভ্যতার বিপুল অগ্রগতি, বিশ্বমৈত্রী ও দৃপ্ত শান্তির বার্তা বহন করে যখন কলকাতার বুকে এসে দাঁড়ালেন, তখনও তিনি ছিলেন না। কলকাতার উপকণ্ঠে হিন্দ মোটর কারখানার শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর বর্বর পুলিশী হামলা, স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে মালিকপক্ষ এবং সরকারের যৌথ প্রয়াসে মধ্যযুগীয় অন্ধকার—আর মানুষ বাঁচার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সেখানেও তিনি থাকতে পারেন নি।

তাই বারবার আজ মানিকবাবুকেই মনে পড়ছে। একদিকে সভ্যতার নিশ্চিত অগ্রগতি, অন্যদিকে অবক্ষয়ী পশুশক্তির শেষ আস্ফালন—বিকাশ আর বিনাশের এই দুই পরস্পরবিরোধিতার সামনে দাঁড়িয়ে আজ বারবার তাঁর কথাই মনে পড়ে।

দেশবাসী মানিকবাবুকে শ্রদ্ধা করেন, চোখের মণির মতো তাঁরা এই মহৎ মানুষ ও গুণী শিল্পীর স্মৃতিকে রক্ষা করছেন। কিন্তু সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীরা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন?

কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েক হাজার মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মানুষের জীবন, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ যেখানে সংকটাপন্ন, সেখানে সমাজ ও সভ্যতার ধাত্রীপুরুষ সাহিত্যিককুল নীরব থাকেন কি করে?

সৎ, বিবেকবান সাহিত্যিকদের কাছে তাই আমাদের আবেদন—আসুন আমরা দল বেঁধে সেই নিপীড়িত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াই। আসুন আমরা বলি—ভালোবাসি, ঘৃণা করি। কাল্পনিক বা দূরবর্তী বিপদের আশঙ্কায় ঘরে মুখ না লুকিয়ে আসুন বাংলা-দেশের লেখক ও শিল্পীরা একত্রে আবার মানুষের পাশে দাঁড়াই।

আজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। কিন্তু বাংলাভাষায় ছোটো বকুলপুরের যাত্রী কি আর লেখা হবে না?

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ-নাটিকা 'স্পেশাল ট্রেন'

মিছিল ও ধর্মঘটের শহর কলকাতায় গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে নতুনতর ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই দিনটি ছিল 'হিন্দ মোটরস দিবস'। বি-পি-টি ইউ-সির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা এই দিনটিতে সভা শোভাযাত্রা ও অর্থসংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দ মোটরস্-এর ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন ও একাত্মতা জানিয়েছিলেন। যদি শুধু এইটুকুই হত তবে তা কলকাতার পক্ষে নতুন কোনো ব্যাপার হত না। কলকাতার সংগ্রামী ঐতিহ্যে এ-ধরনের বহু দিবসই রক্তের অক্ষরে চিহ্নিত। কিন্তু গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখটি আরো একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। কীর্তিমান নট উৎপল দত্ত ও তাঁর সহকর্মীরা এইদিন হিন্দ মোটরস্-এর শ্রমিকদের সংগ্রামকে উপজীব্য করে একটি পথ-নাটিকার অভিনয় করেছেন।

নাটিকাটির নাম 'স্পেশাল ট্রেন'। সরাসরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিনা মঞ্চে, বিনা আলোকসম্পাতে, বিনা মেক্-আপে, বিনা আবহসঙ্গীতে প্রায় আধঘণ্টা ব্যাপী অভিনয়। যান্ত্রিক সহায়তা নেওয়া হয়েছে শুধু একটি লাউডস্পীকারের। তাও পুলিশের আপত্তিতে ডালহৌসি স্কোয়ারের অনুষ্ঠানে এই যান্ত্রিক সহায়তাটুকুও পাওয়া যায় নি। এমন অনাড়ম্বরভাবে, এমন রাস্তার ওপরে জনতার ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের একটি নাটিকার অভিনয় যে সম্ভব তা নিজের চোখে না দেখলে আর নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত।

অভিনয় বললাম বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, অভিনয় বলে মনেই হয় নি। বাস্তব ঘটনাগুলোই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। অথচ, যাকে বলা হয় নাটকের 'অ্যাক্‌শন', তার বিশেষ সুযোগ এই পথ-নাটিকায় ছিল না। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রধানত কথোপকথনের মাধ্যমে এই নাটকের বিস্তার। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা ছিল যে নাটক শেষপর্যন্ত না ময়দানের বক্তৃতার চেহারা নেয়। কিন্তু নাটক শেষ হবার পরে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমরা আর শুধুমাত্র শ্রোতা নই, হিন্দ মোটরস্ শ্রমিকদের লড়াইয়ে আমরাও সামিল হয়েছি, সাতান্ন দিনের অকম্প্র ধর্মঘটের গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত। কলকাতার রাস্তাই কিছুক্ষণের জন্যে হয়ে উঠেছিল হিন্দ মোটরস্-এর লড়াইয়ের ময়দান। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা ব্যঙ্গবিদ্রূপে চটুল হয়েছি, উত্তেজনায় অস্থির, আবেগে টলোমলো, প্রতিজ্ঞায় কঠোর। তারই মধ্যে কেউ একজন ঝুলি হাতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর

আমরা পকেট খালি করে সমস্ত পয়সা সেই ঝুলির মধ্যে ফেলেছি। আর তারপরেও শান্ত হতে পারি নি। ধর্মঘটী শ্রমিকের গলায় গলা মিলিয়ে শ্লোগান তুলেছি—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

খুব সম্ভবত এমনটিই হয়ে থাকে। উপলক্ষটি ছিল আমাদের কাছে খুবই বাস্তব। আর নাটকের চরিত্রগুলো আমাদের কাছে এতই পরিচিত ছিল যে তাদের মুখের একটি-দুটি কথা থেকেই আমরা অকথিত অনেক ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। অর্থাৎ, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ ঘটতে পেরেছিল। তাই কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে পেরেছিলাম যে আমরা কলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। কিছুক্ষণের জন্যে ভাবতে পেরেছিলাম যে হিন্দ মোটরস্ শ্রমিকদের লড়াই আমাদেরও লড়াই।

অথচ পরে ভেবে দেখেছি, উৎকর্ষের বিচারে এই নাটকটিকে সেরা নম্বর দেওয়া চলে না। দোষত্রুটি অনেক। খুঁটিয়ে বিচার করতে বসলে ফিরিস্তিটা খুবই দীর্ঘ হবে। কিন্তু সে-আলোচনায় এজন্যে যাব না যে আমরা যারা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হ্যাজাকের আলোয় নাটিকাটির অভিনয় দেখতে দেখতে কখন যেন নিজেরাই নাটিকার কুশীলব হয়ে উঠেছিলাম—সেই আমরাই হচ্ছি প্রমাণ যে খুব মোটা কথা খুব মোটা দাগে তুলে ধরতে পারলেও নাটকীয় সার্থকতা লাভ করা চলে। নাটকের উৎকর্ষ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কবিতর্ক ভাড়া-করা পেশাদারী মঞ্চের শৌখিন কেদারাটি না পেলে ঠিক যেন জাঁকিয়ে বসতে পায় না।

৬ই ডিসেম্বরের স্মরণীয় দিনটিতে কলকাতার পাঁচটি বিভিন্ন জায়গায় এই পথ-নাটিকার অভিনয় হয়েছিল। সকাল সাড়ে-সাতটায় গড়িয়াহাট মোড়ে, সাড়ে-আটটায় হাজরা মোড়ে, বিকেল সাড়ে-পাঁচটায় ডালহৌসি স্কোয়ারে, সন্ধে সাড়ে-ছটায় ময়দানের মনুমেণ্টের নিচে, সাড়ে-সাতটায় শ্যাম স্কোয়ারে। সারা শহর জুড়ে যেন এক নতুন ধরনের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানটি হবার কথা ছিল পাঁচমাথার মোড়ে। কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে, যানবাহন বন্ধ হবার যোগাড়। শেষপর্যন্ত সবাই মিলে মস্ত একটি মিছিল করে হাজির হয়েছিল শ্যাম স্কোয়ারে। পথ-নাটিকা শুধু আর পথেই থাকে নি, ময়দানে ও স্কোয়ারেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাটিকাটি রচনা করেছেন উৎপল দত্ত। প্রধান একটি চরিত্রের অভিনয়েও তিনি ছিলেন। একটি কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে আমাদের দেশের

একজন সেরা নাট্যকার ও অভিনেতার এমন সচেতন আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত কলকাতার মতো শহরেও বোধ হয় এই প্রথম। আর উৎপল দত্তর সঙ্গে তাঁর যে সব সহকর্মী যোগ দিয়াছিলেন, তাঁদের কৃতিত্বও কিছুমাত্র কম নয়। সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চক্রবর্তী, রমাবন্ধু চৌধুরী ও বিধান মুখোপাধ্যায়।

নাটিকাটি শুরু হচ্ছে কারখানায় অবস্থানকারী পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও লেবর অফিসারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। তারই মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের যাতায়াত। যেমন, একজন নিরীহ ট্রেনযাত্রী, একজন দালাল এবং সবার শেষে একজন ধর্মঘটী মজুর। চরিত্রগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধুই কথা বলেছে। কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি, কথাগুলো কোনো সময়েই বক্তৃতার মতো শোনায় নি। হিন্দ মোটর ওয়ার্কস ও তার শ্রমিকদের ধর্মঘট—দুই দিকেই এমনভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে একদিকের শোষণ ও অপর দিকের সংগ্রাম সম্পূর্ণ একটি পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। এই পথ-নাটিকাটির অসাধারণ সাফল্যও এই কারণেই।

ইলিয়া এরেনবুর্গের বিখ্যাত উপন্যাস 'প্যারীর পতন'-এ সিয়েন কারখানায় ধর্মঘটের একটি ছবি আছে। এই ধর্মঘট চলার সময়ে কারখানার ভেতরে মঞ্চ খাড়া করে নাটকের অংশবিশেষ অভিনীত হয়েছিল। যে অভিনেত্রীটি শ্রমিকদের ডাকে বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছিল তার নাম জেনেৎ। "নিষ্ফল বসন্ত থেকে কিছুটা অংশ সে অভিনয় করল। অভিনয়ের শেষে প্রশংসা আর অভিনন্দনের ঝড় উঠল যেন। হাততালির শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল অনেক মানুষের চিৎকার। জোনতের মনে হল, ফ্যাঁৎ অভেঞ্জুঁয়ার জনসাধারণ জেগে উঠেছে, এগিয়ে চলেছে জয়ের পথে—সে আর এখন সামান্য অভিনেত্রী জেনেৎ নয়, বীরনেত্রী আন্দালুসিয়া ডাক দিচ্ছে জনসাধারণকে।" উৎপল দত্তর স্পেশাল ট্রেনও এমনি এক সংগ্রামের ডাক, জয়ের ঘোষণা। আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি, তাঁর প্রয়াস শিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধকে ঘনিষ্ঠতর করবে এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অন্যান্য শিল্পীদের দ্বারা অনুসৃত হবে।

অমল দাশগুপ্ত

গন্ধর্ব-র নবনাট্যোৎসব

তরুণ নাট্যগোষ্ঠী গন্ধর্ব-কে সাধুবাদ জানানো আগেই দরকার ছিল। যদিও নিছক সাধুবাদের জন্য নিশ্চয়ই এই দুঃসাহসিক নাট্যপ্রযোজনায় তাঁরা হাত দেন নি। গত ১৬ই এপ্রিল থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়মাস ধরে গন্ধর্ব নাট্যসম্প্রদায় মিনার্ভা মঞ্চে বারোটি একাঙ্ক নাটক অভিনয় করলেন। নামকরা লেখকদের পেশাদারী নাটক নির্বাচনে এঁদের ঝোঁক ছিল না। তরুণ ও তরুণতরদের রচনাকেই গন্ধর্ব মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এবং এর কারণ, পরীক্ষামূলক নাট্যপ্রযোজনাতেই এঁদের আগ্রহ। গতানুগতিক অভিনয় কিংবা প্রযোজনা দুই-ই এই সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বর্জন করেছেন। নতুনতর জীবনবোধে অনুপ্রাণিত এই নাট্যসম্প্রদায়ের তরুণ শিল্পীরা কোনো গোঁড়া আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ নন। কিন্তু জীবনের প্রতি আনুগত্য এঁদের রয়েছে। এবং এই আনুগত্যই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে দিয়েছে সার্থকতা। নবনাট্য আন্দোলনের যে ধারা আজকের বাংলা নাটককে জীবনমুখী করেছে, গন্ধর্ব তারই উত্তরাধিকারী। জীবনের জটিল প্রশ্নের গ্রন্থি উন্মোচনের দায়িত্ব নিয়েছেন এযুগের সাহিত্যশিল্পী। নাটকের বক্তব্য ও আঙ্গিকেও তারই সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস আমাদের আশান্বিত করে।

গন্ধর্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে এই নাট্যোৎসবের প্রস্তাবনায় পূর্বগামীদের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল : গন্ধর্বের 'নবনাট্য উৎসব' যে রুচিবৈচিত্র্য এবং সংস্কারবিহীন জীবনাভিমুখীনতার দাবি রাখছে, তা অন্যান্য নাট্যোৎসব থেকে বর্তমান উৎসবকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করবে। নাটক নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, "ট্রাডিশনকে বাদ দিয়ে জীবনের সঙ্গে যোগহীন উৎকট পরীক্ষামূলক নাটক করার মোহ আমাদের নেই। বাংলা নাটকের মৌল সুরের সঙ্গেই নবতর বুদ্ধিবাদী তথা জীবনবাদী নাটক সৃষ্টি করাকেই আমরা অভিষ্ট মেনেছি।" আমি আনন্দিত যে গন্ধর্ব-র এই বক্তব্য তাদের প্রযোজিত নাট্যোৎসবে সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে সার্থকতা লাভ করেছে। এই নাট্যোৎসবে বারোটি একাঙ্ক অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি কাব্যনাট্য। একটি রাম বসু-র 'নীলকণ্ঠ' অপরটি কৃষ্ণ ধরের 'একরাত্রির জন্য'। এ ছাড়া বাকী দশটি একাঙ্ক জীবনরীতিসমৃদ্ধ

হলেও শিল্পরীতিতে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। প্রতীকী, প্রহসন এবং মনস্তাত্ত্বিক নাটকও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

অতনু সর্বাধিকারী-র 'অন্তস্বর', গিরিশঙ্করের 'রক্তকরবীর পরে', অমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার রঙ', সুরঞ্জন মিত্রের 'নেপথ্য দর্শন', চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দেবরাজের মৃত্যু', মনোজ মিত্রের 'পাখির চোখ', তৃপ্তি চৌধুরীর 'মাটির রঙ সবুজ', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সূর্যের মতো সমুদ্র', ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'একচক্ষু' ও মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'উড়ো পাখির ছায়া' অভিনীত নাটকগুলির নাম। এই নাট্যোৎসবের নির্দেশনামায় ছিলেন তরুণ শক্তিমান অভিনেতা ও পরিচালক শ্যামল ঘোষ। মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীতে হৃদয় কুশারী, আলোকসম্পাতে রঞ্জিত মিত্র এবং শব্দপ্রক্ষেপনে প্রভাত হাজরার কর্মকুশলতা উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিল। মঞ্চসজ্জার দিক থেকে 'অন্তস্বর' ও 'একরাত্রির জন্য' এবং সর্বাঙ্গীন প্রযোজনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'সূর্যের মতো সমুদ্র' এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছে। 'সন্ধ্যার রঙ', পাখির চোখ', 'একচক্ষু' এবং 'রক্তকরবীর পরে' তিনটি বিভিন্ন স্বাদের নাটক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দর্শকদের চিন্তিত করেছিল। এবং নতুনতর নাট্য আঙ্গিক পরিবেশনে গন্ধর্বগোষ্ঠীর এই উৎসব নাট্যানুরাগীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভিন্ন নাটকের অভিনয়কর্মে যাঁদের পরিশ্রমী নিষ্ঠা এই উৎসবকে সাফল্য দিয়েছে তাঁদের মধ্যে মমতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা চক্রবর্তী, বিষ্ণু ভাওয়াল, মনোজ মিত্র, গিরিশঙ্কর, কণিষ্ক রায়, অবনী ভট্টাচার্য, দেবকুমার ভট্টাচার্য ও অসিত দে-র নাম উল্লেখ্য। তবে যৌথ প্রচেষ্টাতেই উৎসব সার্থক হয়। তাই স্বতন্ত্র নামোল্লেখে এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই যে অনুল্লিখিত অন্যান্য শিল্পীদের যত্ন ও নিষ্ঠা ছাড়াই গন্ধর্ব-র ছয়মাসব্যাপী এই নাট্যোৎসব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত।

সুমিত্র রায়

প্যাট্রিস লুমুম্বার স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রবীণ ও নবীন কবিদের
প্রগতিশীল কবিতার সংকলন

হায় ছায়াবৃতা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

'যুগান্তর' ও 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে অভিনন্দিত, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত যে গ্রন্থ মাত্র ২০ দিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে বাংলা কবিতা পুস্তকের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

●

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

পুরু অ্যান্টিক কাগজে ছাপা। বোর্ড বাঁধাই। তিন রঙে অসামান্য প্রচ্ছদ।
উপহার ও সংরক্ষণ উপযোগী

●

মূল্য : এক টাকা

পরিবেশক

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

লেখকদের প্রতি নিবেদন

- অনুগ্রহ করে কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হরফে লিখবেন
- রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন
- এতৎসম্পর্কিত চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে লিখবেন
- উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে লেখা সম্পর্কে মতামত জানানো বা অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হয় না
- সম্পাদকীয় দপ্তর তিন মাস পরে অমনোনীত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দায়ী থাকবেন না

গ্রাহকদের সুবিধার্থে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত ২৯শ বর্ষের বর্ষসূচীর প্রথম পৃষ্ঠাটি আমরা আর একবার প্রকাশ করলাম।

বর্ষসূচী

শ্রাবণ ১৩৬৬—আষাঢ় ১৩৬৭ [১৮৮১—৮২]

বর্ষসূচী

শ্রাবণ ১৩৬৭—আষাঢ় ১৩৬৮ (১৮৮২-৮৩)

পৌষ ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পৌষ **সূচীপত্র** ১৩৬৮

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩১ । সংখ্যা ৬
পৌষ, ১৮৮৩ । ১৩৬৮

ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতার তাৎপর্য প্রসঙ্গে

অংশু দত্ত

৯ই ডিসেম্বর ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি আফ্রিকার রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি এবং বিশ্বরাজনীতিতে আফ্রিকার ভূমিকা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন নতুন করে চিন্তা করবার সুযোগ দিয়েছে। আমাদের নিম্নলিখিত আলোচনা তাই সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাত্রের কাছে প্রাসঙ্গিক হবে, তাছাড়া ভারতবাসী হিসাবে আমাদের ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তথা সমগ্র পূর্ব-আফ্রিকার রাজনীতির ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার বিশেষ প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এই বিশেষ প্রয়োজনটির কথা বলে আমাদের বক্তব্যের অবতারণা করা যাক। ট্যাঙ্গানাইকার ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে এই বিশেষ প্রয়োজনের স্বভাবসিদ্ধতা বোঝা যাবে। পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের মাঝামাঝি ট্যাঙ্গানাইকার সমুদ্রতীর, অনতিদূরে জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপ। যার ওপর সবচেয়ে বড় বন্দর হল দার-এস-সালাম। আরব সাগরে নৌবাহন করার পক্ষে এদের উপযোগিতা অপরিসীম। তার ওপর আছে আরব সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নিয়মিত মৌসুমী বায়ু, যার কল্যাণে কোনো রকম যান্ত্রিক শক্তি ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র পালের ওপর নির্ভর করে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে আরব সাগর পাড়ি দিতে পারত। বহুদিন থেকে এমন নৌবাহন চলে আসছে। এবং কোনো কোনো পুরাণে পূর্ব-আফ্রিকার কিছু কিছু ভৌগোলিক উল্লেখও পাওয়া যায়। ভারত ও পূর্ব আফ্রিকার যোগাযোগ নিকটতর হয় এই উভয় অঞ্চল ইওরোপীয় অধিকারে আসার পর থেকে। ট্যাঙ্গানাইকা অবশ্য প্রথমে জার্মান উপনিবেশ ছিল। প্রথম

মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর এখানে বৃটেনের ম্যাণ্ডেট শাসন প্রবর্তিত হয়। সে যাই হোক বৃটিশ শাসনের তাগিদে বহু ভারতীয় এখানে আসে। এর মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল ব্যবসায়ী। কিন্তু তা ছাড়াও ছিল রেলপথ ও অন্য পরিবহন ব্যবস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী অফিসের নিম্ন ও মধ্যপদস্থ কর্মচারী। ফল হয়েছে এই : আজ সংখ্যার দিক থেকে এরা নেহাৎ নগণ্য নয় (১৯৪৮ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০-এরও বেশি), আর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে) এদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে।[১] টাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা পাওয়ার পর এঁদের তীব্র আফ্রিকান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে সে কথা বলা বাহুল্য। এখনই অনেক অঞ্চলে আফ্রিকান সহযোগ ভারতীয় একচেটিয়া কারবারীদের কোনঠাসা করেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর আফ্রিকার প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই বাড়বে। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে থাকার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হটিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা বর্ণ-সংঘর্ষের রূপ নেবে কি না। স্পষ্টই বোঝা যায়, সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। আশার কথা, পূর্ব আফ্রিকার অন্য দেশগুলির তুলনায় ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণ-সম্পর্ক (অর্থাৎ আফ্রিকান-ভারতীয়-ইওরোপীয় সম্প্রদায়ত্রয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ) অনেক স্বাস্থ্যকর। কেনিয়ার মতো ট্যাঙ্গানাইকায় আফ্রিকান কোনো সমাজ এত শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়নি। কেনিয়ায় এসেছে বহু ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক। বিস্তৃত এলাকা তাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। ফলে অনেক আফ্রিকান উপজাতি জমিচ্যুত হয়ে অন্য উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ভিড় বাড়িয়েছে, ইওরোপীয় আবাদে অস্থায়ীভাবে বাস করেছে ; এবং কেউ কেউ শহরে ছিন্নমূল আফ্রিকানদের দলে এসে মিশেছে। আফ্রিকান বিক্ষোভ ও অশান্ত প্রতিবাদ, আফ্রিকান অগ্রগতিতে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সক্রিয় বাধাদান, ভারতীয়দের ত্রিশংকুর মতো অবস্থা, এই সমস্ত উপাদান কেনিয়ার বর্ণ-পরিস্থিতিকে জটিলতর করেছে। ট্যাঙ্গানাইকা বিশাল দেশ (পশ্চিমবঙ্গ,

---

১। শ্রীকোন্দোপির হিসাব অনুসারে এশীয়গণ (যাদের মধ্যে ভারতীয়রা সর্বাধিক) ট্যাঙ্গানাইকার আমদানী বাণিজ্যের ৫০% এবং রপ্তানী বাণিজ্যের ৬০% নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া, এদের কারো কারো হাতে আছে ছোটখাট বাগিচা ও কলকারখানা।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সমান হবে)। সেখানে উচ্চ মালভূমিতে কিছু কিছু ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক স্থায়ীভাবে বসবাস করছে সত্য কথা। কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তা কিছুই নয়। এমনকি শুধুমাত্র সংখ্যার হিসাবেও কেনিয়ার ইওরোপীয় বাসিন্দারা ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় বাসিন্দাদের চেয়ে বেশি হবে। অতএব ট্যাঙ্গানাইকার রাজনীতিতে ইওরোপীয়রা আফ্রিকান-বিরোধী চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি।

এ ছাড়া ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় সমাজের পক্ষে কেনিয়ার ইওরোপীয় সমাজের মতো যূথবদ্ধ হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এখানে ছিল জার্মান প্রভুত্ব। এবং সরকারী আনুকূল্যে অনেক জার্মান ঔপনিবেশিক এদেশে বসবাস সুরু করে। ম্যাণ্ডেট শাসনে অবশ্য ইংরেজ নাগরিকেরা ট্যাঙ্গানাইকায় বসতি করতে আসে। কিন্তু কেনিয়ার মতো সুসংবদ্ধ ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় ট্যাঙ্গানাইকায় জন্ম নেয়নি।

এর সঙ্গে যোগ করতে হয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা। ট্যাঙ্গানাইকা প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশন্সের ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের অধীনে অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দ্বিবিধ ব্যবস্থায় যদিও শাসনক্ষমতা বৃটেনের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, তবু লীগ অফ নেশন্স ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দেশের শাসন, রাজনৈতিক প্রগতি ও বর্ণসম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা ও উপদেশদানের অধিকার ছিল। আন্তর্জাতিক জনমতের সক্রিয় ভূমিকায় বৃটেনের পক্ষে ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের যথেচ্ছ সুযোগ-সুবিধা দান সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বর্ণবৈষম্য যে ছিল না তা নয়। সরকারী বেসরকারী অফিসে, বর্ণের ভিত্তিতে দক্ষিণার তারতম্য ছিল, হোটেল রেস্তোঁরা রেলস্টেশন প্রভৃতি সর্বজনগম্য স্থানে আফ্রিকানদের ইওরোপীয়দের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হত না। হাসপাতালে ইউরোপীয় রোগী এবং জেলখানায় ইউরোপীয় কয়েদীরা সুখসুবিধা পেত। এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৫২ সালে সরকারী স্কুলে গড়পড়তা আফ্রিকান ছাত্রের জন্য যা খরচ করা হয় ইওরোপীয় ছাত্রের জন্য খরচ করা হয় তার আটাশ গুণ বেশি টাকার। কিন্তু কেনিয়ার মতো এত চরম প্রভেদ, এমন অন্ধ আফ্রিকান বিদ্বেষের গোঁড়ামী ট্যাঙ্গানাইকায় জন্ম নিতে পারেনি।

এককথায়, এতকাল পর্যন্ত ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণসম্পর্ক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঈর্ষা দ্বেষ ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও,

প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়নি। এর পেছনে বিশ্বরাজনীতির প্রভাব ও আভ্যন্তরিক কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু ইদানীংকালে বোধহয় এর পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে আফ্রিকান রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ট্যাঙ্গানাইকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নাম ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান জাতীয় ইউনিয়ন (ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন, সংক্ষেপে টি. এ. এন. ইউ. বা 'টানু')। এর নেতার নাম শ্রীজুলিয়াশ নিয়েরেরে। শ্রীনিয়েরেরের নেতৃত্বে 'টানু' অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৫৪ সালে এর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই সারাদেশে 'টানু'র শাখা-সংগঠন বিস্তৃত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ট্যাঙ্গানাইকার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 'টানু' সমস্ত আফ্রিকান আসন এবং বেশ কিছু এশীয় ও ইওরোপীয় আসন দখল করে। ১৯৬০ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে 'টানু'র সভ্য ও সমর্থকেরা ৭১টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসনে নির্বাচিত হন।

শুধুমাত্র আফ্রিকানরা এই দলের সভ্যপদ পেতে পারলেও একে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া উচিত হবে না। আগে বলা হয়েছে, এশীয় ও ইওরোপীয় আসনগুলিতেও 'টানু' সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের বহু নেতা শ্রীনিয়েরেরে তথা 'টানু'র নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। এঁদের পক্ষে এ কাজ সহজতর হয়েছে, কারণ 'টানু' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণ ও জাতি-আশ্রয়ী রাজনীতির নিন্দা করেছে। 'টানু'র শৈশবে জুলিয়াস নিয়েরেরে বলেন, ট্যাঙ্গানাইকার রাজনীতিতে জাতি বা বর্ণের স্থান নেই। অল্প কিছুদিন আগে যখন ট্যাঙ্গানাইকার বিধানসভায় নাগরিকতা-আইন আলোচিত হচ্ছিল, তখন কিছু কিছু চরমপন্থী আফ্রিকান সদস্য দাবি তোলেন যে, বর্ণের ভিত্তিতে ট্যাঙ্গানাইকার নাগরিকত্ব নির্ধারিত করা হোক। শ্রীনিয়েরেরে এ দাবি খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করেন এই কথা বলে যে, দেশের প্রতি আনুগত্য ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা উচিত হবে না।

শ্রীনিয়েরেরে ও তাঁর সহযোগী নেতারা একাধিকবার বলেছেন স্বাধীন ট্যাঙ্গানাইকায় অনাফ্রিকান সম্প্রদায়সমূহের কোনো ভয়ের কারণ নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রগতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতীয় ও ইওরোপীয় নেতারাও

মোটামুটি 'টানু'র সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। 'টানু'র সমর্থনে ভারতীয় ও ইওরোপীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচনে জয়লাভ এবং শ্রী নিয়েরেরের মন্ত্রিসভায় ভারতীয় ও ইওরোপীয় মন্ত্রিগণের অংশগ্রহণ এই সহযোগিতার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সহযোগকে স্থায়ী করতে হলে ভারতীয় ও ইওরোপীয়দের সমস্ত রকমের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধার মোহ ছাড়তে হবে। এক স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রে স্থবিধাভোগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো স্থান নেই, একথা অনাফ্রিকানরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারেন ততই মঙ্গল। একথা ঠিক যে অনাফ্রিকান নেতৃবৃন্দ আফ্রিকার নেতৃত্বের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা শুধু ওপরতলার নেতৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। সাধারণ ভারতীয় ও সাধারণ ইওরোপীয়কে নিজেদের ট্যাঙ্গানাইকার অধিবাসী বলে মনে করা দরকার। যে পরিমাণে তারা বৃহত্তর ট্যাঙ্গানাইকান সমাজের অংশীদার হতে চাইবে ও তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং যে পরিমাণে ট্যাঙ্গানাইকার আফ্রিকানরা অনাফ্রিকান সম্প্রদায়সমূহকে আত্মীকরণ করতে চাইবে; সেই পরিমাণে ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণসম্পর্ক উন্নত হবে। অবশ্য ব্যাপারটা লিখতে যত সহজ, কাজে তত অনায়াসসাধ্য নয়। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর (বিশেষত যদি তাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাত্রার মানে স্থস্পষ্ট পার্থক্য থাকে) সমীকরণ এক জটিল ও বহুবিলম্বিত প্রক্রিয়া। হাজার বছর একসঙ্গে বাস করেও ইহুদী ও ইওরোপীয় খ্রীষ্টানরা একীভূত হয়নি। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পার্শীরা এসেছে ১২ শ বছর আগে, তবু তাদের পৃথক সত্তা এখনও যায়নি। অতএব, অন্তর্বিবাহ ইত্যাদির ফলে ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্বের অবসান অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে এমন আশা করার কোনো কারণ নেই। নাতিদূর ভবিষ্যতে যেটা সম্ভব সেটা হচ্ছে পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব অস্বীকার না করে ট্যাঙ্গানাইকার সামগ্রিক স্বার্থে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ মিশিয়ে দেওয়া। ট্যাঙ্গানাইকার ভারতীয়গণ আপন স্বার্থে এই উদ্দেশ্যে কাজ করবেন এমন আশা আমরা ভারতবর্ষ থেকে করতে পারি। ভারত সরকার আর একবার ট্যাঙ্গানাইকার ভারতীয়দের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে পারেন (ইতিপূর্বে শ্রীনেহেরু সাধারণভাবে আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের তা বলেছেন)

যে তাদের নিজদের ট্যাঙ্গানাইকার মানুষ বলে মনে করতে হবে এবং স্বকীয় পরিশ্রম, উদারতা ও অনসূয়া দিয়ে আফ্রিকানদের সম্প্রীতি জয় করতে হবে।

স্পষ্টত ট্যাঙ্গানাইকায় যদি আফ্রিকা-ভারতীয় সম্পর্ক পারস্পরিক প্রীতি ও বিবেচনার ভিত্তিতে সুসংগঠিত হতে পারে, তবে পূর্ব আফ্রিকার অন্যত্র প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা সহজতর হবে। পক্ষান্তরে যদি তা না হয় এবং যদি বর্ণসংঘর্ষে সেখানকার ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ভারতবর্ষ এক দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হবে। সংখ্যাল্পতার সুযোগ নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার করা হলে তাদের সমর্থনে কথা বলার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের থাকবে। অথচ তা করতে গেলে অতি সুনিশ্চিতভাবে আমরা আফ্রিকা (বিশেষ করে পূর্ব আফ্রিকায়) ভারতবিরোধী মনোভাব শক্তিশালী করব। একথা ঠিক যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নির্যাতনের প্রতিবাদ আমরা করেছি, যদিও সে প্রতিবাদ খুব কার্যকর হয়েছে এমন দাবি কেউ করবে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সে প্রতিবাদ বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী ইওরোপীয় শাসকদের বিরুদ্ধে, যে ইওরোপীয় শাসনকর্তারা আফ্রিকানদেরও শোষণ ও উৎপীড়ন করছে। এবং সে প্রতিবাদে আর কিছু না হোক প্রায় সারা পৃথিবীর সমর্থন আমরা পেয়েছি। ট্যাঙ্গানাইকার ব্যাপার একটু অন্য ধরণের হবে। এখানকার ভারতীয়দের একটা বড় অংশ অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের শোষণ করছে। আমরা জানি অনেক সময় শোষিত-নির্যাতিতদের প্রতিবাদ তথাকথিত শোভনতার সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। তা ইতিহাসেরই নিয়ম। কোনো কোনো নির্দোষ ব্যক্তিও লাঞ্ছিত হতে পারেন। কিন্তু এই অজুহাতে যদি কোনো বিদেশী সরকার কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘু শোষকসম্প্রদায়ের পক্ষে এগিয়ে আসে, তবে তার পক্ষে অন্যদেশের সমর্থন পাওয়া দুষ্কর। এমনকি, ভারতবর্ষের প্রগতিবাদী শক্তিসমূহও সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। অতএব, এই উভয় সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে যদি ট্যাঙ্গানাইকায় অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব না হতে দেওয়া যায়। অবশ্য এই ব্যাপারে ভারতের কর্মোদ্যম সীমিত। তবু নানা পরোক্ষ উপায়ে আমরা সেই উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারি।

ট্যাঙ্গানাইকার, তথা সমগ্র পূর্ব আফ্রিকার রাজনীতির ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার "বিশেষ প্রয়োজন" আমাদের এইখানে।

দুই

অন্য অনেক আফ্রিকান রাষ্ট্রের তুলনায় ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল মাত্র ৪টি: উত্তর পূর্বে মিশর ও ইথিওপিয়া, পশ্চিমে লাইবেরিয়া ও দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে তার সঙ্গে যুক্ত হল পূর্বতন ইতালীয় উপনিবেশ লিবিয়া, ১৯৫৬ সালে সুদান টিউনিসিয়া ও মরক্কো, ১৯৫৭ সালে ঘানা, ১৯৫৮ সালে গিনি, আর তারপর ১৯৬০ সালে ক্যামেরুন্স, টোগোল্যাণ্ড, মালি যুক্তরাষ্ট্র (যা থেকে পরে সেনেগাল বিচ্ছিন্ন হয়), নাইজার, দাহোমে, উর্ধ্ব ভলতা মরিতানিয়া, কোৎ দিহ্বোয়ার, কঙ্গো (পূর্বতন বেলজিয়ান), নাইজেরিয়া, সোমালিয়া ও মাদাগাস্কার। ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে স্বাধীনতা পেল পশ্চিম আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশ সিয়েরা লিওন। সর্বশেষে ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা এল ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে, অর্থাৎ যখন ইতিমধ্যেই ২৪টি আফ্রিকান দেশ স্বাধীন হয়েছে।

তবু মনে রাখা দরকার আফ্রিকা মহাদেশের (বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার) বিচারে ট্যাঙ্গানাইকার স্বরাজপ্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হলেও, পূর্ব আফ্রিকার অন্য দেশের পূর্বসূরী হল স্বাধীন ট্যাঙ্গানাইকা। সুদান, বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড (যে দেশ ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন সোমালিয়া গঠন করেছে) ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ ছাড়া উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকা হল প্রথম দেশ যেখানে আফ্রিকানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেল। শুধুমাত্র এইজন্যই ট্যাঙ্গানাইকার আঞ্চলিক নেতৃত্ব করার সুযোগ ছিল। এছাড়া অবশ্য অন্য কারণও রয়েছে। প্রথম হল, এ দেশের আয়তন, দ্বিতীয় লোকসংখ্যা, তৃতীয় ভৌগোলিক অবস্থান। এ সমস্তই হল ট্যাঙ্গানাইকার নেতৃত্বের পক্ষে অনুকূল। আর এর সঙ্গে বোধকরি যোগ করা যায় ট্যাঙ্গানাইকার ঐক্য। উগাণ্ডায় আফ্রিকান জাতীয় আন্দোলন বরাবর উগাণ্ডার আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং যদি মনে রাখা যায় যে বুগাণ্ডা হল উগাণ্ডার সমৃদ্ধতম অঞ্চল এবং বাগাণ্ডা উপজাতি (বুগাণ্ডার অধিবাসী) উগাণ্ডার একক বৃহত্তম উপজাতি ও সমগ্র উগাণ্ডার অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ, তবে এই ক্ষতির পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে। কেনিয়ার উপক্রত রাজনীতিতে 'কানু' (কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল

ইউনিয়ন) ও 'কাডু'র (কেনিয়া আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন) বিরোধ ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে। জাঞ্জিবারে আরব-আফ্রিকান বিভেদ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অংশগ্রহণ করছে। ট্যাঙ্গানাইকার আফ্রিকান নেতৃত্বের ঐক্যের একমাত্র তুলনা মেলে নায়াসাল্যাণ্ডে। কিন্তু নায়াসাল্যাণ্ড ট্যাঙ্গানাইকার তুলনায় খুবই ছোট দেশ। তাছাড়া ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক ঐক্য শুধু আফ্রিকানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রীজুলিয়াস নিয়েরেরে ও 'টান্থু'র নেতৃত্ব ভারতীয় ও ইওরোপীয়েরা পর্যন্ত মেনে নিয়েছে। এমন সমর্থন নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকান নেতা শ্রীহেস্টিংস বাণ্ডার ভাগ্যেও জোটেনি। তাই, সব মিলিয়ে ট্যাঙ্গানাইকা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার নেতৃত্ব দিতে পারে। এবং এদেশের অপেক্ষাকৃত সম্প্রীতিময় বর্ণসম্পর্ক এই বিরাট এলাকার পক্ষে আশীর্বাদের মতো হবে।

আফ্রিকান-ভারতীয়-ইওরোপীয় বোঝাপড়াকে অন্য দেশে সম্প্রসারিত করার সুযোগও বর্তমান। পূর্ব আফ্রিকার নেতারা সেখানকার বিভিন্ন দেশ নিয়ে এক পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন। কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার নেতারা এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। উগাণ্ডায় বাগাণ্ডা নেতৃত্ব সে দেশের অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে এক রাষ্ট্র গঠন করতেই গররাজী। অতএব, পূর্ব-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার কথা ওঠে না। তবে উগাণ্ডার কোনো কোনো অ-বাগাণ্ডা নেতা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

ভবিষ্যতের যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে বর্তমান পূর্ব আফ্রিকান হাই কমিশন। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী। অবশ্য এর আগে, এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে (যথা, দেশরক্ষা, ডাক ও তার, শুল্ক ও আবগারী, আয়কর, বিমান-পরিবহন, মুদ্রা, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি) কেনিয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানাইকার জন্য সাধারণ শাসন প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু ১৯৫৮ সালেই পুরোদস্তুর পূর্ব-আফ্রিকান আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হল। এবং ৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাই কমিশনের এক্তিয়ারে-আসা বিষয়গুলির শাসনভার পেলেন। এর সঙ্গে বোধহয় পূর্ব-আফ্রিকান আপীল আদালতের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯০৯ সালে আদালত স্থাপিত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর এক্তিয়ার এডেন, উগাণ্ডা, কেনিয়া, জাঞ্জিবার,

ট্যাঙ্গানাইকা, সেচেলেস দ্বীপ ও বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন অবশ্য শেষোক্ত দেশ স্বাধীন সোমালিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পূর্ব-আফ্রিকান আপীল আদালতের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছে।

সে যাইহোক, আইন প্রণয়ন, বিচার ও কার্যনির্বাহী এই তিন বিভাগেই পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো এখনই চালু রয়েছে। অতএব, প্রচলিত ব্যবস্থাকে অল্প স্বল্প পরিবর্তিত করে এক পূর্ণায়তন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হওয়ার কথা নয়।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠন মিলে এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে যার সংক্ষিপ্ত নাম হল প্যাফমেকা (পি. এ. এফ. এম. ই. সি. এ. : প্যান আফ্রিকান মুভমেণ্ট অফ ইষ্ট অ্যাণ্ড সেনট্রাল আফ্রিকা। অর্থাৎ পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার একীকরণ আন্দোলন)।

এই আন্দোলনে কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার সোৎসাহ সমর্থন আছে একথা আগে বলা হয়েছে। উগাণ্ডার নেতৃত্ব কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। যদিও ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে জাঞ্জিবারের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে যুক্ত, তবু সেখানকার আরব সুলতান ও অভিজাতেরা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে জাঞ্জিবারের অন্তর্ভুক্তি সুনজরে না দেখতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের পক্ষে জাঞ্জিবারকে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। এবং খুব সম্ভবত সে চেষ্টায় তারা সাফল্যলাভও করবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার সমর্থন আসছে নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানদের কাছ থেকে। এই ছোট্ট দেশটি বহু-বিতর্কিত মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অংশীদার (অন্য দুই অংশীদার হল উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া)। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশি, আফ্রিকানরা অনেক বেশি অনাচার ও বৈষম্যনীতির শিকার। তাই নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকানরা দাবি করেছে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে দেবার। বেশ কিছু ইওরোপীয় বাসিন্দা থাকায় উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকানদের আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নায়াসাল্যাণ্ডের সৌভাগ্যক্রমে সেখানকার ইওরোপীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা নগণ্য। উত্তর রোডেশিয়ার মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদও সেখানে নেই। তাই নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকান অগ্রগতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। নায়াসাল্যাণ্ডের পক্ষে পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি মুক্তি

পাওয়ার সামিল। তাই এখানকার আফ্রিকান নেতারা নায়াসাল্যাণ্ড সহ পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছেন। অনুমান করা শক্ত নয় যে কেনিয়ার আফ্রিকানদের সমর্থনের পেছনেও অনুরূপ মনোভাব রয়েছে। কেনিয়া হল 'শ্বেত' ঔপনিবেশিকদের শক্ত ঘাঁটি : সংখ্যায়, সমগ্র অধিবাসীর শতকরা-অনুপাতে, জমির মালিকানায়, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে এবং রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতায়। একলা হাতে লড়ে প্রতিক্রিয়ার এই ঘাঁটিকে উৎখাত করতে কেনিয়ার আফ্রিকানদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলির আফ্রিকানদের সহযোগিতায় এ কাজ সহজতর হবে তাতে সন্দেহ কী? প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র শুধু সেই সহযোগিতাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবে মাত্র।

তিন

ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা আর একটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে : তা হল সারা পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের মুমূর্ষু অবস্থা। আজ আফ্রিকার অধিকাংশ স্বাধীন হয়েছে। পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি, আলজেরিয়া, উগাণ্ডা, কেনিয়া, জাঞ্জিবার, উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া, নায়াসাল্যাণ্ড, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি স্পেনীয় পকেট, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুটোল্যাণ্ড ও সোয়াজিল্যাণ্ড ছাড়া অন্য সব দেশ স্বাধীন হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। উগাণ্ডা আগামী বছরে স্বাধীনতা পাবে বলে ঠিক হয়েছে। রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির স্বাধীনতাও আসন্ন। পূর্বোক্ত তালিকায় অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের নামও যোগ করা যায়, কারণ আন্তর্জাতিক আইনের বিধানে সে দেশ স্বাধীন হলেও সেখানে আফ্রিকানরা কোনো ক্ষমতা পায়নি। আর উল্লেখ করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন শাসিত দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার, যার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউনিয়ন সরকারের সঙ্গে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বহুদিন যাবৎ বাদ-বিতণ্ডা চলছে।

এতগুলি দেশে আফ্রিকানরা এখনো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে বঞ্চিত হলেও যেসব দেশে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছে তাদের তালিকা হবে বৃহত্তর, তাদের আয়তন ও লোকসংখ্যা হবে আরও বেশি। এ সব দেশের বেশির ভাগ স্বাধীনতা পেয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে এবং আগামী কয়েক

বছরে আলজেরিয়া, কেনিয়া, জাঞ্জিবার, নায়াসাল্যাণ্ড ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির ভাগ্য নির্ধারিত হবে বলে আশা করা যায়। একদিক দিয়ে বলা যায়, ঘানা পশ্চিম আফ্রিকায় যে প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করে, পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকা থেকে সেই প্রক্রিয়ার শুরু। পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা ও পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকার অবস্থার তুলনা করার ইচ্ছা এক্ষেত্রে স্বভাবত আসে। উভয়তঃ আমরা এমন দেশের উল্লেখ করছি যে দেশ সমগ্র অঞ্চলের স্বাধীনতার পুরোধা। দুই দেশেই আমরা বিশেষ বকমের যোগ্য নেতৃত্বের (দলীয় ও ব্যক্তিগত) পরিচয় পাই।

এইখানেই কিন্তু এদের সাদৃশ্যের পূর্ণচ্ছেদ। ঘানা ও ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ভিন্ন। ঘানা ছিল বৃটেনের গোল্ডকোস্ট উপনিবেশ, ট্যাঙ্গানাইকা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে বৃটেন-শাসিত অছি-অঞ্চল। ঘানার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য বহু পুরাতন : ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ফান্তি কনফেডারেশন' থেকে তার জন্ম। ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু মাত্র কয়েক বছর আগে। এদেশের প্রথম ও অধুনা বৃহত্তম রাজনৈতিক দল 'টানু'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৪ সালে। ঘানার রাজনৈতিক আন্দোলন অনেক সময় শাসনতন্ত্র-সম্মত পথে না গিয়ে জন-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে (যথা শ্রীনক্রুমার নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের সারাদেশব্যাপী ধর্মঘট, যখন নক্রুমাসহ বহুলোককে গ্রেপ্তার করা হয়)। পক্ষান্তরে ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে মসৃণ। প্রতিবাদ, ধর্মঘট ও জনবিক্ষোভের পথে 'টানু' বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে কখনও নামতে হয়নি। ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়ের কথা মনে রাখলে এই অবাধ ও অনুপক্রত রাজনৈতিক প্রগতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনোত্তর রাজনীতিতেও এই দুই দেশের পার্থক্য দেখা যাবে বলে মনে হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সমবায়ে এক বৃহত্তর রাষ্ট্রগঠন শ্রীনক্রুমার স্বপ্ন ছিল। প্রস্তাবিত ঘানা-গিনি-মালি ইউনিয়ন গঠন অবশ্য সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের দিকে এক ধাপ অগ্রগতি। কিন্তু শ্রীনক্রুমার যতটা আশা ছিল তার সামান্য অংশই কার্যকরী হয়েছে। এর একটা বড় কারণ, ঘানার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিকাংশ হল ভূতপূর্ব ফরাসী উপনিবেশ এবং সে হিসাবে তাদের সরকারী ভাষা, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক ধারা পর্যন্ত ভিন্নধর্মী। এক অসাধারণ

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঘানা-গিনির সংযুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। পরে অবশ্য মালি প্রজাতন্ত্রের নামও এর সঙ্গে যুক্ত হল। কিন্তু বাস্তবে তিনটি দেশের সাধারণ শাসন কাঠামো স্থাপনের কাজ বিশেষ এগিয়েছে বলে জানা যায়নি। এর তুলনায় পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা সহজতর হওয়া সম্ভব। এ সব দেশের সমস্যা অনেকখানি এক ধরণের। এদের রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটি একখাতে বয়ে গেছে। এরা সকলেই ছিল বৃটিশ-শাসিত উপনিবেশ, আশ্রিতরাজ্য কিংবা অছি-অঞ্চল। এবং সবচেয়ে বড় কথা এদের অনেকের ঘনিষ্ট সহযোগের ভিত্তিতে গঠিত ইষ্ট আফ্রিকা হাই কমিশন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ চালাচ্ছে। তাই স্বাধীনোত্তর কালে ট্যাঙ্গানাইকার পূর্ব আফ্রিকা একীকরণের প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অনেকখানি থাকবে।

এসব পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের পূর্বেকার বক্তব্য এখনও বলবৎ আছে। অর্থাৎ ঘানার স্বাধীনতা যেমন পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তেমনি পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশের অগ্রগ। পরোক্ষভাবে বলা যায়, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে পূর্ব আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীরে এই প্রথম ফাটল ধরল (বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ও সুদানকে এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না)। এবং এই ফাটল যে আরো বেড়ে গিয়ে অন্য দেশকে গ্রাস করবে সেকথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ট্যাঙ্গানাইকা অবশ্য কেনিয়া, উগাণ্ডা কিংবা জাঞ্জিবারের মতো বৃটিশ-শাসিত অঞ্চল ছিল না। আন্তর্জাতিক আইনে ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক অবস্থাকে অছি-অঞ্চল বলা হবে : এমন অঞ্চল যার শাসন পরিচালনা ছিল বৃটেনের হাতে, কিন্তু যার শাসন কর্তৃপক্ষকে তত্ত্বাবধান করার ও উপদেশ দেবার ক্ষমতা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের ছিল। ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এই অছি-ব্যবস্থার গুণাপগুণ বিচারের সুযোগ দিচ্ছে।

অছি-ব্যবস্থাকে ভালো করে বুঝতে গেলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে তার ভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে তেমনি তার ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট সম্পর্কেও পরিপূর্ণ অবহিত থাকা দরকার। অছি-ব্যবস্থার পূর্বসূরী ছিল ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মান ও তুর্কী উপনিবেশসমূহ নিয়ে মিত্রপক্ষের মধ্যে প্রচুর

তর্ক-বিতর্কের অবতারণা হয়। কতকগুলি দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ও অষ্ট্রেলিয়ায় ঐ সব উপনিবেশ সরাসরি দখল করার পক্ষে ছিল। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি উইলসনের নেতৃত্বে আর একদল তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এই দুই বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে এক রকমের আপোষ হয় ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

পরাজিত শত্রুর উপনিবেশগুলি বিভিন্ন বিজেতাশক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল। স্থির হল, এদের শাসন পরিচালিত হবে লীগ অফ নেশন্সের তত্ত্বাবধানে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার অসম মানের জন্য এ সমস্ত উপনিবেশকে (যাদের নাম হল ম্যাণ্ডেট বা 'ন্যাস' অঞ্চল) তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। 'ক' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট : যে সব দেশের অধিবাসীরা অল্প দিন বাদেই স্বাধীনতা আশা করতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়। ভূতপূর্ব তুর্কী সাম্রাজ্যের আরব-অধ্যুষিত উপনিবেশগুলি এই শ্রেণীতে পড়ল [সিরিয়া-লেবানন (শাসক : ফ্রান্স), প্যালেস্টাইন ও ইরাক (শাসক : বৃটেন)]। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া জার্মানীর অন্য সব আফ্রিকান উপনিবেশ 'খ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট পর্যায়ে পড়ল। কয়েকটি মৌলিক নীতি অনুসারে এখানকার শাসনকার্য পরিচালিত হবে বলে ঠিক হল। এই 'খ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট শাসনের প্রবর্তন করা হয় নিম্নলিখিত দেশসমূহে : বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড, ফরাসী টোগোল্যাণ্ড, বৃটিশ ক্যামেরুন্স, ফরাসী ক্যামেরুন্স, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি (শাসক : বেলজিয়াম) এবং ট্যাঙ্গানাইকা (শাসক : বৃটেন)।

এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের জার্মান উপনিবেশগুলিকে 'মিত্রপক্ষীয়' নেতারা 'গ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট বলে বর্ণিত করলেন। শাসক দেশগুলি এইসব অঞ্চলকে নিজ দেশের অংশ হিসাবে শাসন করতে পারবেন বলে ঠিক হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনে বিশ্বজনমতকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করেছে বলে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থাকে অভিনব আখ্যা দেওয়া যায়। একথা ঠিক যে, লীগ অফ নেশন্স তথা স্থায়ী ম্যাণ্ডেটস কমিশনের ক্ষমতা ছিল অতিমাত্রায় সীমিত। বলতে গেলে শুধুমাত্র উপদেশ দেবার ও সমালোচনা করবার অধিকার তাদের ছিল। তবু বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করা বড় সহজ কথা নয়। এবং এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে লীগ অফ নেশন্সের সমালোচনায় ম্যাণ্ডেট শাসক তার নীতি বদলিয়েছে। অতএব ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার প্রবর্তকদের বৈপ্লবিক

পরিকল্পনা কিংবা বিশ্বপ্রেমী সদিচ্ছা ছিল একথা বলা না গেলেও, এ ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক জগতে কোনো পরিবর্তনই আনেনি এমন যুক্তি দিয়ে একে নস্যাৎ করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লীগের অপমৃত্যুর আগেই একটি ম্যাণ্ডেট শাসিত অঞ্চল (ইরাক) রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা পায়। যুদ্ধোত্তর কালে বাকি 'ক' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটগুলিও স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হল। অন্য ম্যাণ্ডেট-শাসিত দেশগুলি (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া) নিয়ে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের অধীনে অছি-ব্যবস্থার শুরু। ১৯৪৬ সালে অছি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত নিম্নলিখিত অছি-অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে:

বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড : ১৯৫৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘানার সহিত সংযুক্ত।

ফরাসী টোগোল্যাণ্ড : ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে।

ফরাসী ক্যামেরুন : ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে।

বৃটিশ ক্যামেরুন : উত্তরাংশ স্বাধীন নাইজেরিয়ার সঙ্গে ও দক্ষিণাংশ স্বাধীন ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রের (পূর্বতন ফরাসী ক্যামেরুন) সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

সোমালিল্যাণ্ড : অছি-অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র এই দেশটি ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইতালীর পরাজয়ের পর ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডকে অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সালে এ দেশটি স্বাধীনতা পায়।

রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি : শীঘ্রই স্বাধীনতা পাবে বলে স্থির হয়েছে।

ট্যাঙ্গানাইকা : ৯ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা পেল।

সামোয়া : আগামী বছরে স্বাধীনতা পাবে।

ট্যাঙ্গানাইকা ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির স্বাধীনতা লীগ পরিচালিত 'খ' শ্রেণীর সমস্ত ম্যাণ্ডেটের স্বাধীনতা সমাধা করবে।

'গ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট-অঞ্চলগুলি অবশ্য এতটা ভাগ্যবান নয়। এদের মধ্যে একমাত্র পূর্বোক্ত দেশ সামোয়ার স্বাধীনতা স্থিরীকৃত হয়েছে। নাউরু (অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড ও বৃটেনের পক্ষে শাসন পরিচালনা করে অস্ট্রেলিয়া) ও পূর্ব নিউগিনির (শাসক : অস্ট্রেলিয়া) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু বলা মুস্কিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অছি-অঞ্চল (ক্যারোলিন, মার্শাল ইত্যাদি

দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত) লীগ অফ নেশন্সের আমলে জাপানের শাসনাধীনে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে এই অঞ্চলটিকে একটি বিশেষ শ্রেণীর অছি-দেশে (ষ্ট্র্যাটেজিক এরিয়া) রূপান্তরিত করে। এর শাসনভার দেওয়া হয়েছে আমেরিকান সরকারের হাতে এবং এর ওপর সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধান-ক্ষমতা কিছুটা সঙ্কুচিত করা হয়েছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে এই অঞ্চলটা প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হওয়ায় এর ভবিষ্যৎ কী হবে বলা যায় না। বাকি থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন এই দেশটিকে অছি-ব্যবস্থার মধ্যে আনতে অনিচ্ছা জানিয়ে একে নিজের 'পঞ্চম-প্রদেশ'-এ (ইউনিয়নে মোট ৪টি প্রদেশ আছে) পরিণত করতে চেয়েছে। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এতে আপত্তি জানালেও ইউনিয়ন সরকার তাতে কর্ণপাত করে নি।

এই গেল অছি-অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক প্রগতির খতিয়ান। ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আসে মোট ১৫টি দেশ। এর মধ্যে এতদিন পর্যন্ত পরাধীনতা-মুক্ত হয়েছে ৮টি দেশ। টাঙ্গানাইকা সহ আরও তিনটি দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। বাকি থাকে মাত্র ৪টি অঞ্চল,' অদূর ভবিষ্যতে যাদের স্বাধীনতা-অর্জনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যদি ধরে নেওয়া যায়, শুধুমাত্র কিংবা প্রধানত অছি ও ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থার কল্যাণে পূর্বোক্ত দেশগুলির স্বাধীনতা এসেছে, তবে লীগ ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পক্ষে তার চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে।

দুঃখের বিষয়, এমন কথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থা অবশ্যই উল্লিখিত দেশগুলির স্বাধীনতা-অর্জনে কিছুটা সাহায্য করেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর সমর্থন এসেছে অন্যখান থেকে। অথবা ভাষান্তরে বলা যায়, যে শক্তির প্রভাবে গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ সারা পৃথিবীর পরাধীন অঞ্চল সমূহ নিজ নিজ আত্মস্বাতন্ত্র্য অর্জন করছে, তারই এক প্রকাশ হল ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থা। এটা কি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয় যে, যে সময়ে মোট ৮টি ম্যাণ্ডেট বা অছি-শাসিত অঞ্চল স্বরাজ পেল, সে সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত) দুই ডজনেরও বেশি উপনিবেশ (যারা ম্যাণ্ডেট বা অছি-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না) স্বাধীন হয়েছে ? একথা অবশ্য ঠিক যে ইরাক ১৯৩২ সালে ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়, কিন্তু তাতে লীগ অফ নেশন্স-এর কতটা হাত ছিল তা বিতর্কের বিষয়।

একথা ঠিক যে, সোমালিল্যাণ্ড অছি-অঞ্চল ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পাবে বলে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ স্থির করে। কিন্তু এর পেছনে বড় কারণ যে সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধ, সেকথা সুবিদিত।

ইচ্ছা থাকলেও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ যে কোনো অছি-অঞ্চলের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে পারে না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গেছে ট্যাঙ্গানাইকার ইতিহাস থেকে। ১৯৫৪ সালে ট্যাঙ্গানাইকায় জাতিসঙ্ঘপ্রেরিত এক মিশন প্রস্তাব করে, এই অছি-দেশটিকে ২০ বছর বাদে স্বাধীনতা দেওয়া হোক এবং শাসক-রাজ্য বৃটেন এই উদ্দেশ্যে রীতিমত এক পরিকল্পনা তৈরি করে সেই পরিকল্পনা-অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকুক।

জাতিসঙ্ঘের ইতিহাসে এই প্রস্তাব রীতিমত অভিনব। সম্ভবত যারা পৃথিবীর মানুষদের স্বাধীন ও আত্মনির্ভর দেখতে চায় তারা প্রায় সকলেই একে অভিনন্দন জানাল। প্রতিবাদ আসল কয়েকটি উপনিবেশ-শাসনকারী দেশ এবং বিশেষ করে বৃটেনের কাছ থেকে। সেই প্রতিবাদে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হল। এই ঘটনা ঘটেছে ১৯৫৪-৫৫ সালে এবং পূর্বোক্ত প্রস্তাব-অনুসারে ১৯৭৫ সাল ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির বছর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আফ্রিকায় 'পরিবর্তনের হাওয়া' (না ঝড়?) বয়ে গেছে। ১৯৫৫ সালে ঝানু বৃটিশ শাসকদের মনে হয়েছিল ১৯৭৫ সাল বড় বেশি কাছে। কয়েক বছর যেতে না যেতে সকলের (এমন কি বৃটিশ শাসকদেরও) মনে হল ১৯৭৫ সাল বড় বেশি দূরে।

উপরিউক্ত উদাহরণটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা সরলীকরণে যথার্থ সাহায্য করে। এর থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি: সাধারণভাবে সমালোচনা ও সুপারিশ করা ছাড়া অন্যভাবে অছি-অঞ্চলের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা জাতিসঙ্ঘের সাধ্যায়ত্ত হয় নি। এবং এতদুদ্দেশ্যে জাতিসঙ্ঘকৃত কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্যে সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে অছি-শাসকেরা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যল্পকালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন দিকে মোড় ঘুরেছে যে অছি-অঞ্চল ও উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেবার আয়োজন করতে হয়েছে। অবশ্য উল্লিখিত আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জাতিসঙ্ঘে যথাযথভাবে প্রতিফলন হওয়া স্বাভাবিক: জাতিসঙ্ঘে যা সমালোচনা হয়, তা সদস্য রাষ্ট্রেরা

করে থাকে। প্রস্তাব যা ওঠে, তা আসে সদস্য রাষ্ট্রদের কাছ থেকে এবং যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাও নির্ধারিত হয় সদস্য রাষ্ট্রদের ভোট অর্থাৎ মতামত দ্বারা। অতএব আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে অছি-পরিষদ ও জাতিসঙ্ঘকে পৃথক করে বিবেচনা করা ভুল হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে অছি-ব্যবস্থা হল মহাযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক নীতিগুলির প্রতিষ্ঠানগত রূপমাত্র। আর সেক্ষেত্রে, জাতিসঙ্ঘের সমালোচনা ও সুপারিশকে বলা যায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহাওয়ার ব্যারোমিটার।

তুলনাটা অবশ্য যত মুখরোচক, ততটা যথাযথ হল না। ব্যারোমিটারের পারা আবহাওয়ার সূচকমাত্র। তার ঊর্ধ্ব বা অধোগতি আবহাওয়াকে কোনো অংশে প্রভাবিত করে না। জাতিসঙ্ঘ সম্পর্কে আমরা এমন কথা বলতে পারি না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় জাতিসঙ্ঘের আলাপ-আলোচনা, বাদ-বিতণ্ডা, সুপারিশ প্রভৃতি থেকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর এদের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। অর্থাৎ এ হল এমন এক ব্যারোমিটার যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে সেই পূর্বাভাসের মারফৎ আবহাওয়াকে কিছুটা পরিমাণে রূপান্তরিতও করে থাকে। আর যে পরিমাণে এই রূপান্তরণ ঘটে, সেই পরিমাণে জাতিসঙ্ঘ বিশ্বরাজনীতির নিরপেক্ষ ব্যারোমিটারের কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়।

অছি-অঞ্চলগুলির স্বাধীনতায় জাতিসঙ্ঘের অবদান সম্পর্কে এই হল আমাদের নিবেদন।

চার

ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা গেল।

আমাদের প্রথম বক্তব্য ছিল, ট্যাঙ্গানাইকান-ভারতীয় সম্পর্ক আমাদের দেশের সঙ্গে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার সম্পর্কের চাবিকাঠি। এবং আজ যদি আমরা ট্যাঙ্গানাইকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবে আগামীকাল এর প্রভাব গিয়ে পড়বে অন্যান্য দেশের ওপর। এমন প্রভাব ট্যাঙ্গানাইকা থেকে অন্যত্র সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, কারণ পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার নেতৃত্ব অনেকাংশে ট্যাঙ্গানাইকার হাতে আসবে।

বর্তমান প্রবন্ধে এ-কথাও বলা হয়েছে যে ট্যাঙ্গানাইকান-ভারতীয় সম্পর্ক বিষিয়ে উঠবে যদি প্রথমোক্ত দেশে আফ্রো-ভারতীয় প্রতিযোগিতা প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়। অতএব, শুধু ট্যাঙ্গানাইকা-প্রবাসী ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যই নয়। এদেশের সঙ্গে সারা মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার সুসম্পর্ক বজায় রাখবার জন্যও বটে, ট্যাঙ্গানাইকায় বর্ণসম্পর্ক সুপথে চালিত করতে হবে।

এই প্রবন্ধের অন্যতম সিদ্ধান্ত হল এই যে, ঘানার স্বাধীনতা যেমন সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক মুক্তির অগ্রদূত ছিল, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তেমনি মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার মুক্তিদূত। কিন্তু ঘানার পক্ষে পশ্চিম আফ্রিকায় এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যত না সহজ হয়েছে, ট্যাঙ্গানাইকার পক্ষে মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন তার চেয়ে কম কষ্টসাধ্য হওয়া সম্ভব।

আফ্রিকা তথা পৃথিবীর রাজনীতিতে এ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এবং ভারতবর্ষের পক্ষে এ সম্ভাবনার তাৎপর্য উপলব্ধি যে বিশেষ প্রয়োজন সে কথা কি নতুন করে বলতে হবে? পূর্ব-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র হবে আয়তনে ভারতবর্ষের অর্ধেক এবং আরব সাগরকে বাদ দিলে একে আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলা চলে। এই দেশে থাকবে তিন চারটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর—মোম্বাসা, দার-এস-সালাম, জাঞ্জিবার। অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এমন অধিবাসীবৃন্দ যাদের উচ্ছল প্রাণশক্তি, কর্মোৎসাহ ও স্বভাবজ বুদ্ধি এক সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে।

সর্বশেষে ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা পরাধীন দেশগুলির মুক্তি প্রক্রিয়ায় অছি-ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ট্যাঙ্গানাইকা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম অছি-অঞ্চল। এ দেশের স্বাধীনতার পর আফ্রিকায় আর একটি মাত্র দেশ, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, অছি-ব্যবস্থার মধ্যে রইল। আর এই দেশটির স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু এই সব দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি অছি-ব্যবস্থার জন্য কতখানি তা বিতর্কমূলক। অছি-ব্যবস্থা তথা সারা জাতিসঙ্ঘকে, বিশ্বরাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অবিধেয়। কারণ বিশ্বরাজনীতির সর্বজনগ্রাহ্য মূলসূত্রের সাংগঠনিক রূপ হল জাতিসঙ্ঘ। অথচ, এই জাতিসঙ্ঘই আবার বিশ্বরাজনীতির অন্যতম ফোরাম। তাই, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মারফৎ জাতিসঙ্ঘ অছি-শাসিত দেশগুলির স্বাধীনতা কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে বলতে হবে। কিন্তু শেষ বিচারে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সামগ্রিক ধারাই যে পরাধীন জগতে 'পরিবর্তনের 'ঝড়' বইয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ৯ই ডিসেম্বর ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা প্রাপ্তি সে পরিবর্তনের একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

কর্তার ভূত

বিষ্ণু দে

কেন এ ভূতের ভয়? কর্তার ভূত-কে
বলো না সাবেক সুরে: ভূত মোর পুত্।
কি হবে হরদম এই রামনাম ব'লে?
যদিই কর্তা আজও লাফ দেন পুঁটকে
অথবা ফচ্‌কে ঘাড়ে, বলো তো তাহলে
সমুদ্রপারের কোন্ সাহেব অদ্ভুত
আংরেজি মন্তরে আজ নামাবে ভূতকে?

সে কবে মিশেছে তার শ্মশানের ছাই
সারাটা দেশের সারা বিশ্বের মাটিতে।
ফুঁ দিলেই উড়ে যায়, এত ঘটা ক'রে
কাকে যে তাড়াও তুমি তাড়ীয়াল ভাই রে।
হাওয়াকে তড়পে তুমি যন্তরমন্তরে
ভাবো কি গলিয়ে নেবে গলির ভাঁটিতে?
রাম বা লক্ষ্মণ কবে খুঁটে খায় ছাই?

ছাড়ো এ ভূতের খেলা, ঘাটে বা কবরে
কর্তার টিকিও নেই, গোরস্থান তুলে
ভূতকে পাবে না, ভূত ছেড়ে বলো কাপে
রামনাম সৎ হায়, সততার জোরে

দেখবে ভূতের ভয় সোজা যাবে ভুলে
কারণ ভূতের মাথা তোমারই গর্দানে।
ভূত কি থাকে রে বোকা, শ্মশানে কবরে ?

ক্ষেমাঘেন্না ছেড়ে দিয়ে বলো সোজাসুজি :
চাও সুখ চাও স্বস্তি সচ্ছল আরাম।
তবেই দেখবে কর্তা নিজেই কবরে
পাশ ফিরে নিরুদ্দেশ, এবং যা বুঝি,
দুনিয়ার সব লোক তোমার জবরে
নিশ্চয় ফেলবে হাঁফ—আরে রাম রাম!
আমরাও ওরে দাদা সুখ স্বস্তি খুঁজি।

শতাব্দীর অস্থি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শতাব্দীর পূত অস্থি সংরক্ষিত মনন-কৌটায়
ছয়ঋতু পরিক্রমা ছয়'দিক সকাল-সন্ধ্যায় ;
কালস্পর্শী অন্ধকারে চলে ফেরে ক'জন সৈনিক,
শিরস্ত্রাণ শূন্যশির বর্মহীন তার চতুর্দিক।
সুদীর্ঘ চত্বরে তারা, আত্মমগ্ন, দুয়নভস্তল
বিস্ফারিত, আদিগন্ত খরস্রোত, জল ছলছল
বহে যায় ইতিহাস বর্ষে বর্ষে, নিষ্করুণ স্থির ;
পালটায় মানচিত্র, শতাব্দীর মন···শতাব্দীর।

প্রাচীন অক্ষরে লিপ্ত অস্থিলিপি, জন্মের সংস্কার ;
দিনরাত্র ধূসরতা স্তূপে স্তূপে পর্বত-প্রবাল,
রাখি সাধ আজন্মের, ক্ষুদ্র ইচ্ছা, হৃদয়ের ভার
তীব্র স্রোতে বহমান, বর্ষে বর্ষে সেই লিপিকাল
যাদুঘরে, পাঠোদ্ধার, ক'খণ্ড শিলার বিন্যাস,
ক'জন সৈনিক ভ্রষ্ট শতাব্দীর পূতঅস্থিনাশ।

তিমিরায়ণ

শেখ আব্দুল জব্বার

দুর্জ্ঞেয় মহারাত্রে আলোর মিনার চেয়ে হত, ক্লান্ত মানুষের যে-সব স্থাপত্য
আজো এই পৃথিবীর বুক জুড়ে আছে—
তাদের সবার মুখে নশ্বরতার রেণুই প্রসাধিত, আর
সব মূঢ়-জড়তার সীমার বাইরে যে বোধের আকার—
প্রবাল দ্বীপের মতো জেগে উঠেছিল ;
আজো যাকে ডুবিয়ে রেখেছে তলে সময়ের সমুদ্রের অন্ধকার ঢেউ

যে সব সত্যের দিকে মুখ রেখে আজো যাকে বলি আমরা
আরাধিত, এই সেই তিমির হন্তারক আলো—
সেই চেতনারও 'পর দেখিয়াছি বারবার শূন্যতার
তির্যক, বর্শার ফলার মতো নক্ষত্রের আঁধির ভিতরে
তিমির বিলাসী সব মানুষ-কীটেরা খেলা করে—সংক্রান্তির লগ্ন চেয়ে
মহাউত্তরায়ণের সীমান্ত রেখায়…
যদিও কোথাও আজো নব ধ্রুব আছে, এর-ও অন্ধকার আছে জেনে
তার চোখ কোনো দিন স্থির হয় নাই, অবিরাম পেয়ে পেয়ে পর্যটনের ঢের
অপার বিস্ময়

পৃথিবীর এই সব মহামূঢ় শিকারীর মতো তিমির হননে অগ্রসর—
আবিশ্ব বিপর্যয় ও ব্যর্থতার ঘোষণায় সূচিত মূল্যরা—বারবার ভেঙে ভেঙে
চুরমার হয়ে গেছে,
নিজের আদল আর মুখোস হারিয়ে ফেলে অদ্ভুত সুন্দর হতে—
সূর্যের অন্ধকারে তুমুল জটিল এই পৃথিবীর মতো ;
যেখানের চেতনার স্থাবর নৈরাজ্যে আত্মবিলাপের মতো মানুষের ভাষা
অব্যর্থ বিলোপের গুহার গভীরে শব্দিত হতে হতে স্থির হয়ে যায় ;—

আর অগুদল আসে নাটকের তৃতীয় অংকের প্রখর আলোয়
জ্যোতির্ময়,
যার মুখ পানে চেয়ে নড়ে ওঠে মহাবিশ্ব প্রগাঢ় আশ্বাসে
অন্য কোনো মহাতিমিরায়ণের সূচনার বোধে।

কেননা আমরা গান শুনব

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সূর্য উঠলে পবিত্র অরণ্যে আমরা গান শুনব। প্রৌঢ় বৃক্ষেরা
বিমর্ষ, শুভ্রতা হারিয়ে পাহাড় বিষণ্ণ, বাতাস মুমূর্ষুর শ্বাস ;

কয়েকটি সুন্দর হরিণ, স্বর্গীয় পাখি এবং একটি কোমল বৃক্ষশিশু
মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ;

দূরে শববাহকের ধ্বনি,
শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসের মিছিলের মতো বাতাস

কয়েকটি মৃত হরিণ, নিহত পাখি এবং একটি ছিন্নমূল বৃক্ষশিশুর
শিয়রে আমরা বসে-আছি
কেননা সূর্য উঠলে পবিত্র অরণ্যে আমরা গান শুনব।

স্ট্রাইকের পর

কালিদাস দত্ত

সুব্রত চৌধুরী লিস্টটা তৈরি করে উঠে দাঁড়াল। লিস্টের ওপর শেষবার দ্রুত চোখ বুলোতে বুলোতে কলিং বেল টিপল। বেয়ারা এল না। "বেয়ারা" বলে চেঁচিয়ে উঠবার পূর্ব মুহূর্তে মনে পড়ল বেয়ারা নেই, আসবে না। "ইডিয়ট্‌স্। ওয়েট, আ' উইল টিচ্ য়্যু এ গুড লেস্‌ন্"—বিড় বিড় করে আওড়াল—"শুয়োরের বাচ্চা"।

বাইরে বেরিয়ে এসে লিস্টটা সেন্ট্রির হাতে দিল, "এটা গেটে টাঙিয়ে দাও, জলদি।"

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। চারদিন চার রাত ঘুম নেই, প্রায়-নেই আর কি। বন্দী হয়ে আছে এই কামরায়—অফিস বিল্ডিং-এ। স্নায়ুর ওপর অমানুষিক চাপ পড়েছে, এখন বাঁচলে হয়। টয়লেট রুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিল, আয়নায় তাকাল। চেহারাটা শুকিয়ে গেছে, চোখের কোলে আরও গাঢ় হয়ে কালি জমেছে, অত্যাচারের মাত্রা একটু বেশি হয়েছে। শরীর তো! চুলে চিরুনি বুলিয়ে বাসি নেকটাইটা ঠিক করল।

এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ গাঙ্গুলি আর একটা শুয়োরের বাচ্চা, ওর বাবাও শুয়োরের বাচ্চা ছিল—অ্যাসিট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরী তার 'বস্' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করল। কাল রাত্রে স্পেশাল গার্ডের এস্‌কর্টে গাঙ্গুলি বাড়ি গিয়েছিল। কি? না, ভয়ঙ্কর জরুরি দরকার: চৌড্রি, আমি ভোর হবার আগেই চলে আসব। তুমি একটা ডিসচার্জ লিস্ট তৈরি করো। দেখো, আমি যাচ্ছি, কেউ যেন না জানে। মিসেস গাঙ্গুলি ভয়ঙ্কর অসুস্থ, তিনবার টেলিফোন করেছে।

ভোরের নাম করে আজ বেলা দশটায় এসেছে। কী? না, এই বুড়ো বয়েস সে নতুন বিয়ে করেছে, আমি ব্যাচেলর। কিন্তু আমার ইয়ে তোমার চাইতে কিছু কম নয়। আমিও চার দিন চার রাত বিনতাকে দেখিনি, ছুঁই নি। ভাগ্যিস মিসেস সান্যাল হাতের কাছে ছিল। রিপাল্‌সিভ মিসেস

সান্যাল। কুৎসিৎ। ওকে স্ববার্বান অফিসে ট্র্যান্সফার করব। পঁচিশ পার হয়নি, এরই মধ্যে তিনটে বিইয়েছে।

গাঙ্গুলির চেম্বারে এসে বলল, "স্যর, আমি যাচ্ছি।"

গাঙ্গুলি খাচ্ছিল। বললে, "খুব দেরি কোরো না। অবশ্য, একটু ঘুম দরকার। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ফিরো। একজন একজন করে ডেকে স্ক্রুটিনাইজ করতে হবে, বণ্ড সই করাতে হবে। ওরা গেটের বাইরে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটের মধ্যেই ফিরচো তাহলে, কেমন?"

"দুটোর মধ্যেই ফিরব! যাচ্ছি, স্যর।"

চেম্বার থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরাল। বস্ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তটা দ্বিতীয়বার স্মরণ করল, তারপর ফটকের দিকে এগোল।

"এই, মিঃ চৌধুরী।"

অফিস বিল্ডিংটা নিঝুম, নিথর। বাইরে ছশো সাতশো মেয়ে পুরুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জটলা করছে, চেঁচাচ্ছে। গেটে সন্থ টাঙানো লিস্টটা একে একে দেখছে, বাইরের এক ঝাঁক হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, খিস্তি করছে। একটি রোগা, অ্যানিমিক, ফ্যাকাশে মেয়ে কাঁদছে। ওরা সবাই ভাবছে, আমবা হেরে গেছি, আমাদের এবার কেটে কুচি কুচি করা হবে। পরস্পর পরস্পরকে গাল দিচ্ছে, দোষারোপ করছে, স্বার্থপরের মতো কেউ কেউ পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে—কেন না ডিসচার্জ লিস্টে নাম নেই—ফিরে এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছে বিজয়ী ভঙ্গিতে। শালা, কখন ভেতরে ঢুকতে দেবে কে জানে। ব্যাটা সেন্ট্রি রাইফেল উঁচিয়ে আছে, যেন ওর বাপের জমিদারী।

"এই, মিঃ চৌধুরী রে—"

ওরা মিঃ চৌধুরীকে দেখল, খিস্তি করার ইচ্ছে সত্ত্বেও করতে পারল না, একজন পাশের লোক শুনতে না পায় এমন অনুচ্চ স্বরে গালাগালি দিয়ে চার-পাশে ভয়ে ভয়ে তাকাল। স্বার্থপর একজন সবার সামনেই হাত তুলে নমস্কার করল, চৌধুরী দেখল না, পাশ থেকে কে যেন হাতে থুতু লাগিয়ে স্বার্থপরটার মাথায় সজোরে চাঁটি মেরে চট্ করে হাতটা গুটিয়ে নিল, স্বার্থপর বাপ তুলে গালাগাল দিয়ে চতুর্দিকে খুঁজেও 'চাঁটিমার'কে দেখতে পেল না। কিছু জনের মধ্যে অহেতুক বীরত্ব এবং কিছু জনের মুখে চোখে উদ্বেগের কালো শুকনো ছাপ—এর মধ্য দিয়ে চৌধুরী কোনো দিকে না তাকিয়ে স্পেশাল গার্ড

দেওয়া মোটরে উঠে ভাবল, বিনতার বাড়ি যাব। যাবই। ফিরে এসে এই স্কাউণ্ড্রেলদের শিক্ষা দেব। ন্যাংটো করে চাবুক মারব, কত ধানে কত চাল হয় টের পাওয়াব। এখন বিনতার ওখানে। বিষ্টি পড়ছে, ওরা ভিজুক, এর পর রোদ উঠলে রোদে পুড়বে, মাল সব তৈরি হয়ে থাকবে, আমি ছাল ছাড়াব আর কাবাব বানাব। দাঁড়াও। তাতানো শিকে নরম মাংস এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে জ্বলবে, ভাজা ভাজা হবে। এখন বিনতার বাড়ি।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দেবার সময় অবশ্য টালার কথাই বলল, কারণ ড্রাইভার বাড়ি চেনে, অফিসের গাড়িতে অন্যত্র গেলে সন্দেহ হবে, দরকার নেই, বাড়িতে বুড়ি ছুঁয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বিনতার বাড়ি আসা যাবে, এখন টালা।

"চৌধুরী একবার ডাকাল না পর্যন্ত—ব্যাটার গাট্‌স্ আছে।"

"তেল হয়েছে।"

"হবারই কথা, এমন জানলে আমিও—"

"চোপরাও শা—। মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।"

"মিস্ সেন, আপনি কাঁদবেন না। এত লোক ডিসচার্জড কখনো হয়? ভয় দেখাচ্ছে। আমরা হেরে গেছি কিনা?"

"হেরেছি মানে? আপাতত যুদ্ধ বন্ধ। আবার হবে।"

"আমার খুব ভয় করছে অজয়দা। আমাদের যে আর কেউ নেই। বুড়ো বাবা, কচি কচি ভাইবোন—"

"এই তো আমরা আছি, এত জন আছে। ভয় কি সবিতা?"

"রোকো। এখানে, ওই দোকানটার সামনে একটু দাঁড়াও।"

সুব্রত চৌধুরী নামল, দোকানে ঢুকল, বললে, "ক্যামেরাটা হয়েছে? অ্যাদ্দিন আসা হয়নি, ব্যস্ত ছিলুম।"

"হ্যাঁ, স্যর। কবে হয়ে গেছে, ভাবলুম—"

দোকানের ছোকরা স্বত্বাধিকারী আলমারি থেকে ক্যামেরাটা বের করল, তোয়ালে দিয়ে মুছে, লেদার কেসে ভরতে ভরতে বলল, "শাটার-টা একেবারে জখম হয়ে গিয়েছিল, বদলাতেই হল। ভালো হয়েছে, একেবারে নতুনই হয়ে গেল। এত দামী রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা যাকে তাকে দেবেন না স্যর। প্রায় শেষ করে দিয়েছিল আর কি। না, কুড়ি নয়, পঁচিশই দেবেন, কুড়ির

মধ্যে সারা গেল না। আপনি দেখবেন কেমন কাজ দেয়, একটু এদিক ওদিক বুঝলে এখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবেন—"

ঠোঁটের সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখ কুঁচকে আসছিল। অনেক কষ্টে তাকিয়ে আর একটা দশ টাকার নোট বের করল চৌধুরী, ক্যামেরাটা নিল। পঁচিশ টাকা, তা হোক, লাখ টাকার কাজে লাগবে। বিনতার একটা ফটো তুলব। "দু রোল ফিল্মও দিয়ে দেবেন।" দুটো নোটই বের করল চৌধুরী।

"আবার আসবেন, স্যর। কোথায় ডেভেলপ করান ?"

"নিজেই করি। অনেক দিনের কাল্‌চার।"

"তবে তো কথাই নেই। তবু দরকার হলে আসবেন। নিন।"

চেঞ্জ নিল, দেখল না, পকেটে রাখল মুঠো করে। "আসব।"

পাশের দোকান থেকে এক টিন সিগারেট কিনে মোটরে উঠল। বলল, "চলো, সোজা টালা।"

মোটরের দরজায় জোরে ধাক্কা দিল। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। চৌধুরী বলল, "পাঁচটার সময় এসে নিয়ে যাবে ড্রাইভার।"

ভোরের নাম করে গাঙ্গুলি বেলা দশটায় এসেছে, আমিও দুটোয় বলে পাঁচটায় যাব। জন্তুগুলো ততক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে তৈরি হোক। চৌধুরী ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে বিনতার কথা মনে পড়ে গেল, বলল, "থাক, তোমাকে আর আসতে হবে না ড্রাইভার। আমি ট্যাক্সি করেই যাব।" এখন আর ভয়ের কিছু নেই।

"জী সাব।"

সেন্ট্রি সমেত মোটর উল্টোমুখো হয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল।

সুব্রত চৌধুরীর ইচ্ছে হল, ঐ যে দূরে ট্যাক্সিটা আসছে ওইটে করেই বিনতার বাড়ি যায়। ভাবতে ভাবতে সে বাড়িতে ঢুকল, যদিও ভাবল, এ বাড়িতে ঢুকে কি লাভ, এখানেও তো ওরা, মানে ওদের একজন আছে।

"একি, এমন শুকিয়ে গেছিস ?"

"এখনই ফিরব, ফিরতেই হবে।"

"সে কি ? স্নান কর, খা, একটু জিরো। চেহারা কী হয়েছে !"

"খাব না, অফিসেই খাব, স্নানও অফিসে সেরেছি। শুধু একটু দেখা করে গেলাম। রাণু জয়েন করেছে ?"

"না, যায় নি। এখন যাচ্ছে। তুই বোস, এখানেই অল্প একটু কিছু নিয়ে আসি। এখুনি বেরুবি বলছিস? বাবা, কী লাটসাহেবের চাকরি তোর। একটু জিরোবার ফুরসৎ নেই।"

মা বেরিয়ে গেলেন। সুব্রত চৌধুরী টিপয়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সেটিতে হেলান দিল। ফিল্মের একটা রোল বের করে ক্যামেরায় 'লোড্' করল। বিনতার জন্য ওর মনটা ছটফট করছিল। একটু কিছু মুখে ছুঁইয়েই উঠতে হবে। বিনতাকে একটা টেলিফোন নিতে বলব, চৌধুরী ভাবল।

"একি, এসব কি? এসব আমি এখন খাব না।"

চৌধুরীর মন ছটফট করছিল বিনতার জন্য। খেতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট। ও ঠিক করে রেখেছিল, বিনতাকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে খাবে। মায়ের প্রাণ, একেবারে মাছ ভাত নিয়ে হাজির। কি মনে করে প্লেটে হাত ধুয়ে চৌধুরী টিপয়ের ওপর রাখা ভাতের থালায় হাত দিল। চাট্টি খেয়ে নেওয়া যাক, গায়ে বল পাচ্ছি না, চৌধুরী ভাবল, খেলে বল পাব। ঝক্কি আছে না?

"সুব্রামনিয়াম তো তোর বন্ধু। একটু ফোন করে বলিস, রাণু তোর বোন, মায়ের পেটের বোন। রাণু নাকি এখনও বলে নি, কী বোকা মেয়ে।"

"কেন?"

"এই তো মাসখানেকের চাকরি। থাকবে?"

"স্ট্রাইক করার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল? ওর স্ট্রাইকের বন্ধুরা চাকরি রাখতে পারছে না? তাদের ধরুক। তাছাড়া ওর চাকরি যাওয়াই উচিত। আমি চাই না আমার বোন সামান্য কেরানীর চাকরি করে। তাতে আমার প্রেস্টিজ থাকে না। ভিন্ন অফিসে হলেই বা কি, জানাজানি হতে কতক্ষণ? চাকরি ওর যাওয়াই ভালো, একটু শিক্ষাও হবে।"

"তুমি তা হলে বাপু ডেকে বলে দাও। ওই তো রাণু বেরোচ্ছে। রাণু, শুনে যা তোর দাদা কি বলছে—"

রাণু বেরোচ্ছিল। এল। দাদাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। অনিচ্ছুক ঘোড়ার মতো।

সুব্রত চৌধুরী হেসে বলল, "তা হলে, রাণু, চাকরি রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরতে হচ্ছে? স্ট্রাইকের বন্ধুরা চাকরি টেঁকাতে পারবে না।

কেমন? কিন্তু, সুব্রামনিয়ামকে আমি জানাচ্ছি না যে সুব্রত চৌধুরীর বাড়িতে একজন মোটাবুদ্ধির স্ট্রাইকার আছে।"

অপমানে, রাগে রাণুর মুখ লাল হয়ে গেল। বলল, "আমি তো মিঃ সুব্রামনিয়ামকে অনুরোধ করার জন্য কাউকে ধরি নি। চাকরি গেলে আমার যাবে। একটা মাস্টারি অন্তত জুটবে, সে বিদ্যে বাবাই দিয়ে গেছেন। যারা স্ট্রাইকার আমি তাদের শ্রদ্ধা করি, এখনও করি। যারা করে নি, তাদের আমি ঘৃণা করি, এখনও করি, সব সময়ই করব।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল চৌধুরী। চিৎকার করে কি বলতে গিয়ে বিষম খেল, আরও ক্রুদ্ধ হল, বলল, "সে রকম ঘৃণিত লোকের বাড়িতে থাকতেও ঘৃণা হওয়া উচিত, নয় কি? এ বাড়ি আমার—আমারই টাকায় তৈরি। তোমার বাবার নয়।"

"ছি, ছি খোকা—"

"থামো। তোমারই জন্য—"

"আগেই যেতাম, এই চারদিন ধরে সেই কথাই ভাবছি। শুধু তোমাদের মাথা কাটা যাবে বলে অ্যাদ্দিন যাই নি। এবার যাব। আজই আমার জিনিসপত্তর নিয়ে আমি হোস্টেলে চলে যাব।"

"তুই কি পাগল হলি রাণু?"

"তুমি চুপ করো মা, তুমিই আমার সমস্ত সম্ভ্রমটুকু নষ্ট করেছ।"

রাণু বেরিয়ে গেল। সুব্রত চৌধুরী গ্লাসে হাত ডোবাল।

"তুই কিছু বললি না, বাধা দিলি না?"

"যাবে কোথায়? তুমি ক্ষেপেছ, চাকরি থাকলে তবে তো হোস্টেলে যাবে। চাকরিই থাকবে না।"

আঃ, এই তো মা, এই তো বোন। এতদিন যাদের জন্য তুমি কী না করেছ, আজ অপমান করার সময় তারা এতটুকু ভাবে না। আজ তাদের রুচির সঙ্গে আমার রুচি মেলে না, তাদের নীতিবোধ উচিতবোধ আমাকে ঘৃণা করে। আমিই যাকে বানালুম, সেই আজ আমায় চোখ রাঙায়। না, রাণুকে আমি বানাই নি। ওই একই হল, আশ্রয় তো দিয়েছি। তাছাড়া কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো। আমি মনে মনে ভাবছি, ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। ত্থাট্‌স্ অল।

"মাঈজী নহী-ঈ।"

"কোথায় গেছে?"

"পোরী।"

"একাই?"

"জী নেহি। বদ্রীদাস সাহাবকো সাথ।"

"বেশ্যা।"

মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল এখানে একটু জিরিয়ে যাবে, বিনতাকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে খাবে। স্নায়ুগুলোর ওপর চাপ চলেছে, একটু রিল্যাকস্‌ড্‌ হয়ে নেবে। বিনতার একটা ফটো তুলবে ভেবেছিল, আর তুলেছে। চৌধুরী ভাবল, বিনতা গৃহস্থ বেশ্যা, হাফ্‌ গেরস্থ, কিন্তু সে যে এত নীচ অ্যাদ্দিন জানতুম না। ছি ছি বিনতা, তোমার ওই হাসি, আদর, মমতা, সহানুভূতি—সবই তাহলে বানানো? সুব্রত চৌধুরীর কান্না পেল। শেষে বদ্রিদাস···

তুমি ফিরে এস, তারপর তোমাকে দেখব। তোমাকে জখম করব। চৌধুরী রুমালে চোখ মুছল। নিজেকে অসহায় শিশুর মতো মনে হল। কেউ কারো নয়। টাকা দিয়ে কাউকে পুরো কেনা যায় না—ইত্যাকার দার্শনিক-তত্ত্বে তার মনটা প্রথমে ভারী পরে ক্রুদ্ধ হল।

"এই, চৌধুরী ফিরল রে—"

"বাব্বাঃ, কি গটমট করে চলছে। রেগে টং ব্যাটা"—

সুব্রত চৌধুরী কোনোদিকে তাকাল না। কোনোদিন তাকায় না, কেন না বন্‌ অফিসার। দোতলার উঠে গাঙ্গুলির ঘরে গেল। গাঙ্গুলি বললে, "বাঃ, এরই মধ্যে? ছুটোও বাজেনি দেখছি। আই মাস্ট সি সো ছাট ইউ গেট দ্য লিফ্‌ট্‌ সুন। এই ছাখো, সেণ্ট্রাল থেকে সেই ইন্‌স্‌ট্রাকশন এসেছে। নিজের ডিসক্রিশন অনুযায়ী সমস্ত ইনডিভিজুয়াল কেস ডাল করবে। তুমিই এখন সুপ্রীম অথরিটি। আমি এই লিস্টটার ইণ্টারভিউ নিচ্ছি, তুমি এই লিস্টটা নাও। প্রোভোকেটরদের নাম জানার চেষ্টা করবে এবং এমন দু চারটি কথা বলবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন স্ট্রাইক করার প্রবৃত্তি না হয়। ওদের সাধ মিটিয়ে দিতে হবে, মোর‍্যাল ভেঙে গুঁড়োতে হবে। অ্যাণ্ড হোয়েন য়্যু

ক্যাইণ্ড এ হার্ডনাট, ক্র্যাক ইট রুথলেসলি। আই মাস্ট্ সে, তুমি পারবে, ওন্ট্ য়্যু ?

"আ'-উইল স্তর। পারব। আমাকেই সব লিস্ট দিন, আমিই সবার ইণ্টারভিউ নিচ্ছি। আপনি রেস্ট নিন স্তর। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে। য়্যু শুড টেক রেস্ট।"

"একা পারবে ?"

"এ আর এমন কি ? আপনার আণ্ডারে অনেকদিন আছি, শিখেছি।"

"রাইট। আমার একটু বাড়িও যাওয়া দরকার। আচ্ছা নাও। শুধু মিস চক্রবর্তী, ওই যে রিসেপশনের মিস্ কমলা চক্রবর্তী, শুধু তার ইণ্টারভিউটা আমি নেব। ওকে ডাকিয়ে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

"আচ্ছা।"

বান্চোৎ। মনে মনে উচ্চারণ করল সুব্রত চৌধুরী। তারপর নিজের চেম্বারে চলে এল।

"কান ধরুন।"

ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সুব্রত চৌধুরী ভাবল, যে, এই শুয়োরের বাচ্চারা স্ট্রাইক করেছিল। তুমিই এখন সুপ্রীম অথরিটি—ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এত দিন, এই দশ বছর, এই শুয়োরের দল যা খুশি তাই করেছে। পুঁচকে ছেলে আর পুঁটকি মেয়েরা নাক উঁচিয়ে চলে গেছে, ওদের চুলও ছোঁয়া যায় নি। কারণ, সেণ্ট্রাল বোর্ড ছিল সুপ্রীম অথরিটি, বিচার ওই পর্যন্ত গড়াত। আজ এই হাজার হাজার স্ট্রাইকারের বিচার সেণ্ট্রাল করতে পারছে না, সম্ভব না। তাই আমাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে। শ্যামল সেন, অমিতাভ সান্যাল, মঞ্জু ব্যানার্জি, বিশাখা সেনগুপ্তার মাংসে আজ শিককাবাব বানাব। এফোঁড়, ওফোঁড় করে নরম মাংসে গরম শিক গুঁজব। তারপর গরমে, ঈষৎ ক্রমশ-উষ্ণ গরমে নাড়াচাড়া দিয়ে তাতাব। চেয়ে চেয়ে দেখব, কেমন ঝলসে, লাল হয়ে, রস গড়িয়ে, তারপর শুকোতে, টানটান হতে শুরু করে। কমলা চক্রবর্তী—ওঃ, ওই কমলা, শুয়োরের বাচ্চা গাঙ্গুলির ঠিক চোখ পড়েছে জানতুম। কমলা চক্রবর্তীকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। অ্যাসিট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরীর ঘরনী হতে পারলে ওর চোদ্দ পুরুষের স্বর্গে স্থান হত। আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না। স্বজাতি ছাড়া আমি বিয়ে করব

না। খান্‌কি মাগী। স্বজাতি গাঙ্গুলি তোকে বিয়ে করেছে? তার বিছানায় শুতে, তার বাচ্চাকে পেটে ধরে ডাস্টবিনে ফেলতে ধর্মে, রুচিতে বাধেনি? তোমার ইন্টারভিউ আমার হাতে পড়ার দরকার ছিল। তোমার স্বজাতি গাঙ্গুলি তোমাকে আজীবন, এই বিয়ের পরেও আটকে রাখছে। সেইটেতেই বেশি সুখ, না? চৌধুরীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। অবশ্য, তুমি আজ জানলে দুঃখিতই হবে মিস কমলা চক্রবর্তী, যে, আমিও তোমায় বিয়ে করতুম না। আমার 'বস্' যা করছে, তোমাকে নিয়ে আমিও সেইটুকুই করতুম। তারপর কৃষ্ণা ভৌমিক—

"কান ধরুন।"

"আমি, আমি আপনার বাবার বয়সী, আমাকে—"

"শাট্ আপ্। তুই আমার বাবার ইয়ের বয়সী। কান ধরো—"

খোঁচা খোঁচা তিন চারদিনের আকামানো দাড়ি, সবই প্রায় পাকা, দুর্ভাবনায় চোখ বসা, মাথায় চিরুনী পড়েনি, জামা কাপড় ময়লা, বোধ হয়, যা পরেছিলেন সেই ভাবেই এসেছেন, পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় কৃপানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চোখের মণিতে ঘষে-ছড়ে-যাওয়া-হাতে যেমন ভাবে রক্ত বিন্দু বিন্দু ফুটে ওঠে তেমনি অশ্রুতে ভরে গেল। অপমানে তাঁর মুখ লাল হল, তারপর ভয়ে আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কানে হাত দিলেন কৃপানন্দবাবু। এতক্ষণে চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর আকামানো দাড়িতে।

"তা হলে এখনো আপনি বলবেন না, কার উস্কানিতে স্ট্রাইক করেছেন?"

কৃপানন্দবাবু শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে কণ্ঠার কাছে শিউরে উঠছে। খুব কষ্ট পাচ্ছেন। চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। দেব?

"বেশ। এবার যেই আমি বলব এক, আপনি বসবেন, দুই বললে উঠবেন। আমি দশ বার এক দুই বলব।"

রকিং চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পাছাটা দোলাচ্ছে সুব্রত চৌধুরী। সাপের মতো চোখ দিয়ে উপভোগ করছে কৃপানন্দবাবুর যন্ত্রণা। ভালো লাগছে। বেশ একটা তৃপ্তি। অফিসার হওয়ায় বেশ সুখ আছে। এরপর কৃপানন্দ তোমাকে দিয়ে তোমার মেয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাব। দেখে মনে হচ্ছে তুমি অরাজী হবে না।

নাকের পাশে, চোখে দুচার ফোঁটা থুতু ছিটকে লেগেছিল। একটা বিচ্ছিরি পচা পচা ঘ্রাণ। স্ট্রাইকের দুর্ভাবনায় নিশ্চয়ই তিনদিন দাঁতে বুরুশ ছোঁয়ায়নি। ন্যাস্টি। মুখ মুছল সুব্রত চৌধুরী। রুমালে আর একবার ভালো করে মুখ মুছল। বিনতার বাড়ি যাবার আগে রুমালে দামী সেন্ট ঢেলেছিল। ভাগ্যিস সেন্টটা ঢেলেছিল রুমালে, নইলে বমি হয়ে যেত।

"উঁহু, হাত নামাবেন না। ধরে থাকুন। বেশ দেখাচ্ছে এখন আপনাকে। ইস্কুলের নিচু ক্লাসের ছোট্ট নটি বয়টি। এইবার আমি এক বলছি। রেডি, এ—ক—"

কৃপানন্দবাবু দাঁড়িয়েই রইলেন। শুধু একটু কেঁপে উঠলেন। অসহায় চোখে সুব্রত চৌধুরীর চোখের দিকে তাকালেন। সুব্রত চৌধুরী দৃষ্টি সরিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে/চেয়ারের হাতল থেকে নামল।

"তা হলে মিঃ মুখার্জি, চাকরিটা খোয়াতে তোমার আপত্তি নেই— ?"

কৃপানন্দবাবু কাঁপতে কাঁপতে বসলেন। দুপায়ের ওপর ভর রাখতে পারলেন না, টলে মাটিতে পাছা ঠেকিয়ে বসে পড়লেন, কান থেকে হাত খুলে গেল, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"রাইট্। দ্যাট্স্ লাইক এ গুড্ বয়। এদিকে সরে আসুন। আসুন। হুঁ। টেবিলের কাঁচের ওপর ওখানে কি দেখতে পাচ্ছেন, ভালো করে হেঁট হয়ে দেখুন। আচ্ছা, এবার কান থেকে হাতটা নামাতে পারেন। চশমাটা পরেই দেখুন। বার করুন চশমা—"

কৃপানন্দবাবু চশমা বের করে পরলেন। টেবিলের ওপর ঝুঁকে দেখলেন। তারপর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"কি দেখলেন ওটা ? বলুন ?"

ভাঙা, ধরা, বসা, শুকনো গলায় প্রায় আওয়াজ বেরুল না। কৃপানন্দবাবু বলার চেষ্টা করলেন, "জলের মতো যেন কি।"

"জল নয়। ওটা থুতু। সীতা মুখার্জি আপনার কে হয় ? জনমদুখিনী সীতা ?" বিশেষণটা প্রয়োগ করতে পেরে উল্লাস বোধ করল চৌধুরী।

"আমার মেয়ে।"

"কদ্দিন চাকরি করছে এখানে ?"

"বছর তিনেক।"

"তার চাকরিটা গেছে। আপনারটাও বোধহয় যাবে। আমি অবশ্য রাখবারই চেষ্টা করব। আপনার চরিত্র এবং আপনার মেয়ের চরিত্র হেভেন অ্যাণ্ড হেল তফাৎ। অমন মেয়ে আপনার কি করে হল? অত্যন্ত পাজি মেয়ে। মুখের ওপর থুতু ছুঁড়ে সে চাকরিটা খুইয়েছে, আপনারটাও প্রায় খতম করে গেছে।"

কৃপানন্দবাবু মাথা নিচু করে রইলেন।

ওই থুতুটা চেটে তুলে নিলে আপনার চাকরি থাকবে। এই আমার হাতে বণ্ড। বণ্ডটা আপনাকে দেব, চাটুন। ঘেন্নার কি আছে, ও তো আপনারই মেয়ে, ধরতে গেলে আপনার মুখেরই থুতু। আপনার থুতুতেই তৈরি।"

সুব্রত চৌধুরী আনন্দে পা দোলাচ্ছে। সীতা মুখার্জিকে প্রায় নিরামিষ প্রস্তাবই একটা দিয়েছিল। সীতা মুখার্জির নাগাল আর পাওয়া যাবে না। তার বাপ এখনও হাতের মুঠোয় আছে। লিস্টে সীতা মুখার্জির পর অন্য লোকের নাম ছিল। কেউটের বাচ্চাটা বাপকে বুঝিয়ে হাত করার আগেই সুব্রত চৌধুরী কৃপানন্দবাবুকে ডাকিয়েছে।

"আপনার মেয়ের এটুকু শিক্ষা থাকা উচিত ছিল যে টেবিলটা থুতু ফেলবার জায়গা নয়। আশা করি আপনি বাড়ি গিয়ে মেয়েকে কিছুটা সভ্যতা-ভদ্রতার তালিম দেবেন। আঃ, দেরি করবেন না। আপনাকে আমি জোর করছি না। হয় ওটা চেটে সাফ করুন—এই বণ্ড পেপার নিন, নয় ঘর ছেড়ে চলে যান, আপনার নামের পাশে আমি ঢেঁড়া টেনে দি।"

তুমি একদিন বলেছিলে তিরিশ বছর কেরানীর কাজ করছ। ইঞ্জিনীয়ারিং আর কেরানীর কাজ এক নয়। গাঙ্গুলির সামনে বলেছিলে। আশা করি, কেরানী হওয়ার জন্য আজ তোমার অনুতাপ হচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ার হতে পারলে—অবশ্য তোমার জন্যই তোমার ইঞ্জিনীয়ার হওয়ায় বাদ সেধেছে—কেমন সবাইকে মুঠোর মধ্যে পেতে, আরাম হত, আনন্দ হত। কৃপানন্দবাবু ঝুঁকছে না? হ্যাঁ, ঝুঁকছে। তা হলে দেখছি রাজী। উপায় কি?

সুব্রত চৌধুরী কোমরে ঝোলানো ক্যামেরাটা ঠিক করে নিল।

"গুড্"—সঙ্গে সঙ্গে 'ক্লিক্' করে একটু শব্দ হল। কৃপানন্দবাবু চমকে মাথা তুললেন। ঘরের চারপাশে তাকালেন। তাঁর কেমন ভয় হচ্ছে,

তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই কেউ ঘটনাটা দেখেছে, যদিও তিনি জানেন ঘরে তৃতীয় কেউ নেই। সুব্রত চৌধুরী বণ্ড পেপারটা তাঁর হাতে দিল, "কালকে ভর্তি করে আনবেন। চাকরিটা যাতে থাকে দেখব।"

চাকরিটা রাখতে হবে কৃপানন্দবাবুর, কারণ তা হলেই সীতা মুখার্জিকে একদিন শায়েস্তা করার সুযোগটা থেকে যাবে।

"ভয় নেই, আপনার মেয়ে সীতা মুখার্জি ছাড়া ঘটনাটা আর কেউ জানবে না। সীতা মুখার্জির থুতু সীতা মুখার্জির পূজনীয় পিতৃদেব চাটছে এই ফটো দেখে আশা করি তার একটু শিক্ষা হবে। বাকিটা আপনি দিয়ে দেবেন। ডেভেলপ করিয়ে ফটোর একটা কপি আমি যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব।"

মৃত ব্যক্তির মতো কৃপানন্দবাবু তাকালেন সুব্রত চৌধুরীর দিকে, তিনি ঘটনাগুলো সঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না। কিছু তাঁর মাথায় ঢুকছে না। তিনি রেগে যেতে, অভিশাপ দিতে, কিছু একটা করতে ভুলে গেছেন। তাঁর মাথার মধ্যে শুধু একটা জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছে, সীতার চাকরি নেই, বিরাট একটা সংসার মাথার ওপর, রিটায়ার করার আর মাত্র কয়েক বছর বাকি। তিনি পরাজিত, এই মুহূর্তে কিছুই তাঁর করার নেই, সই করা ছাড়া।

"যান।"

পেছন ফিরতে গিয়ে কৃপানন্দবাবু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে চাপা স্বরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সমস্ত পিঠটা জোয়ারের স্রোতের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আঃ, কিছু করার নেই।

"ডোণ্ট ক্রিয়েট এ সীন। উঠুন। বাইরে আপনার বন্ধুরা আছে। তারা শুনলে আশা করি আপনার সম্মান বাড়বে না। উঠুন। অযথা সময় নষ্ট করবেন না। গেট আপ্।"

কৃপানন্দবাবু উঠলেন, জামার হাতায় চোখ মুছলেন, মাথা নিচু করে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। সুব্রত চৌধুরীকে নয়, নিজেকেই তিনি বারংবার অভিশাপ দিলেন।

"তা হলে মিস্ মঞ্জু ব্যানার্জি, তুমি মাথা নিচু করে ফের এলে? তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আর রাস্তায় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াতে পারলে না? তুমি

আসবে আমি জানতুম, কারণ তোমার বাড়ির খবর, তোমার রুগ্ন বাবা, কাচ্চাবাচ্চা ভাইবোনের কথা জানিয়ে একটা লিফটের জন্য তুমিই আমাকে একবার মিনতি করেছিলে। লিফট তোমার হতো। কেন হয়নি, তা তুমি জানো। এখন তোমার চাকরিটা থাকবে কিনা ভাবছি। উঁহু, কেঁদ না, কেঁদে কোনো লাভ নেই। স্রুব্রত চৌধুরীকে তুমি চেনো। বড়োই খারাপ লোক। তোমার ভাগ্যের দোষে এখন তারই হাতে তোমার চাকরি, আর তুমি নির্বোধ নও, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, অ্যাভারেজ মেয়ের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী, সুন্দরীও। আমার একটা প্রস্তাব আছে, কেউ জানতে পারবে না, আশা করি, তোমার আপত্তি হবে না।"

মঞ্জু ব্যানার্জি টেবিলের কোনায় হাত রেখে টাল সামলাল। স্রুব্রত চৌধুরী বুড়ো কবিরাজের চোখ নিয়ে রোগিনীর দিকে তাকাল। না, সীতা মুখার্জি নয়।

"উঁহু, বোসো না। দাঁড়াও, দাঁড়িয়েই থাকো।"

দাঁড় করিয়ে রেখে তোমাকে ক্লান্ত, অবসন্ন করব। তোমার মনোবল তাতে ভাঙবে। তারপর, তোমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেওয়াই সহজ। সাপুড়ের মতো স্রুব্রত চৌধুরী মঞ্জু ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে আছে। ঘামে মুখ, কপাল, ব্লাউজের হাতা, চিবুক, গলা ভিজে গেছে। কপালে, গালে, কতগুলো চুল ঘামে লেপ্টে আছে। কাঁপছে। অজ্ঞান হয়ে না যায়।

"তা হলে তুমি চাকরিটা ছেড়ে দিতে রাজি?"

"না, না—"মঞ্জু ব্যানার্জি শিউরে উঠল, "না, দয়া করে আমার চাকরিটা নষ্ট করবেন না, আপনার পায়ে পড়ি—"

"জানতুম, তুমি এ কথা বলবে, কারণ তুমি নির্বোধ নও। কিন্তু পায়ে—না, অত নিচে তোমাকে নামতে হবে না।"

"কি চান, কি চান আপনি আমার কাছে?"

"আমি?" স্বব্রত চৌধুরী হাসল, "না, আমি কিছুই চাই না। এই বিভাগ, যেখানে তুমি চাকরি করো, সে তোমার কাছে কিছু অবশ্যই চায়। সে চায় সেই বিভাগকে তুমি খুশি করবে। আর তুমি জানো, কাগজেও আজ দেখেছো, বিভাগের সর্বেসর্বা প্রতিভূ এখন আমরা, আমি। বিভাগকে খুশি করার অর্থ এখন আমাকেই খুশি করা, নয় কি?"

মঞ্জু ব্যানার্জি সুব্রত চৌধুরীর চোখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। সুব্রত চৌধুরী রকিং চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পাছা দোলাচ্ছে। ক্যামেরাটা নাড়াচাড়া করছে, মৃদু হাসছে। একদিন এই মঞ্জু ব্যানার্জি, তার মনে পড়ল, নাক ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল। বলেছিল, ফের যদি আপনি আমাকে এমন কথা বলেন, আমি সকলকে জানাব। তখন সেণ্ট্রাল ছিল সবার ওপর, দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। সুবিধে মতো জোট বেঁধে যা খুশি তাই বলে, তুমি, তোমরা, সবাই পার পেয়েছ। তুমি, তোমার ঐ বন্ধুরা সবাই কৃমির কীটের মতো, অতি নগণ্য সামান্য কর্মচারী। তোমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলা অপমানজনক, মানহানি-কর, কেননা আমি, চৌধুরী, মানে আমরা, যাদের—অর্থ এবং মেয়েই পরম ও চূড়ান্ত দর্শন, তারা অপ্রকাশ্যে অন্ধকারেই ওটা সারতে চাই। আর ঈশ্বরের কী কুরুচি—তোমরা এই কীটেরা মেয়েমানুষ। সেই অসার দম্ভে তখন ফণা তুলেছ। কিন্তু আজ ? আজ আমিই অথরিটি। আজ তুমি একথা কাউকে জানাতে পারবে না, জানালেও কেউ শুনবে না, তোমাদের জোট এখন ভেঙে গেছে। আর সেণ্ট্রাল ? হা হা, তোমার নামে একটি রিপোর্টেই তোমার চাকরি নষ্ট হবে, কারণ, তোমরা আইন অমান্য করে বে-আইনী স্ট্রাইক করেছ। আদালতও তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

"বলো, তোমার অফিসকে তুমি খুশি করবে ?"

"কি ভাবে, বলুন"—আবার কাঁদছে মঞ্জু ব্যানার্জি। আমরা হেরে গেছি। পরাজিতের ওপর বিজয়ীর জিঘাংসা। সব যুগেই হয়েছে, আজও হচ্ছে। ঈশ্বর সাক্ষী, সুব্রত চৌধুরী, একদিন তুমিও হারবে, তুমি, তোমরা, তোমাকে এই অত্যাচারের অধিকার যারা দিয়েছে—তারা, সবাই, তোমাদের সবাই। এই কথাগুলি ভেবেও মঞ্জুর দুঃখ হল না। সে হাসতে পারল না। শুধু একটা করুণ ভঙ্গি করল, যার অর্থ, আজ আমাকে দয়া করুন।

"দ্যাট্স্ লাইক এ গুড গার্ল" সুব্রত চৌধুরী চেয়ারের হাতল থেকে নেমে দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। হাসছে অর্থপূর্ণ চোখে, "জানতুম, তুমি রাজি হবে, কারণ তোমার বুদ্ধি আছে, গোঁয়ার্তুমির কোনো মানে হয় না। তোমাকে আমি যেমন কিছু দিচ্ছি, চাকরিটা দিচ্ছি, তোমাকে খুশি করছি, তেমনি তুমি আমাকে করবে—রেসিপ্রোকাল, দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে, বিজনেস্। সবই বলব। ধীরে ধীরে বলব, তাড়ার কিছু নেই। এই নাও, তোমার বণ্ড পেপার। সই করে, ফিলআপ করে, কাল ফেরৎ দিয়ে যাবে। তার আগে,

তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তোমার একটা ফটো নেব। এটা খুব ভাল ক্যামেরা, আজই সারিয়ে এনেছি, অন্ধকারেও ছবি ওঠে, কেউ জানবে না। তোমার ছবি নিতে চাইছি, কারণ তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে। নেব ?"

একটা বেড়াল ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করছে। থাবা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উলটিয়ে পালটিয়ে দেখছে।

"নিন্—"

এইবার চরম মুহূর্ত। সীতা মুখার্জির ঘটনাটা মনে পড়ল। সুব্রত চৌধুরী ঘেমে উঠল। ভাগ্যিস মঞ্জু ব্যানার্জি মাটির দিকে চোখ করে আছে, দেখতে পাবে না। মঞ্জু ব্যানার্জি অবশ্য সীতা মুখার্জি নয়, কারণ তা হলে এর আগেই থুতুটা ছিটকে এসে চোখে, ঠোঁটের কোণে, নাকের পাশে লাগত, বাকিটা টেবিলে পড়ত। তবু পা তিনেক পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখল, ক্যামেরাটা তুলল। বললে, "মিস্ ব্যানার্জি, তোমার সাধারণ ফটো আমার কাছে ডজন কয়েক আছে, মানে, তোমার অজ্ঞাতসারেই আমি তুলেছি। এখন যদি কিছু মনে না করো, যদি দয়া করে অনুমতি দাও, তোমার খালি গায়ের একটা ছবি নেব।"

"না, না, পারব না, আমি পারব না"—চকিতে মঞ্জু ব্যানার্জি ঘুরে দাঁড়াল। বাহুর ভাঁজে চোখ ঢাকল। কাঁদছে। কাঁদবেই তো। রাইট। এই কান্নাটা, এই প্রতিরোধ, ওর এই অনিচ্ছুক যন্ত্রণা উপভোগ্য। সুন্দর। এটা না থাকলে নারীত্ব কিছু না, তোমাকে ভালো লাগত না। তুমি ফেরাও, তাই তুমি টানো। নতুবা আমি ফেলে দিতুম নিজেই। "নাউ ওপন্, আন্-বাটন্ দ্যাট্—"

না, থুতু ছিটকে আসেনি। জানতুম আসবে না। কারণ সবাই সীতা মুখার্জি নয়। একে দিয়ে এখন যা খুশি তাই আমি করিয়ে নিতে পারি, কারণ, ওর আত্মবিশ্বাস ভেঙেছে, ভয়ে, আতঙ্কে এখন ও চূড়ান্তভাবে নিজেকে অসহায় বোধ করছে। মঞ্জু ব্যানার্জি এখন কথা শুনবে, বেশ কিছুদিন শুনবে, সব কিছুই করবে, কারণ বাঁচাটাই এখন ওর কাছে বড়ো কথা। গোঁয়ার্তুমি দিয়ে সীতা মুখার্জির মতো ও আত্মহত্যা করতে চায় না, বাঁচতে চায়। নইলে—

সুব্রত চৌধুরী হাসল, গলাটা মোলায়েম করল, গলায় স্নেহ ঢেলে দিয়ে বললে, "পারবে, খুব পারবে। আমি একটু সাহায্য করব ?"

এক পা এগিয়ে এল সুব্রত চৌধুরী, আতঙ্কে দু পা পেছিয়ে গেল মঞ্জু ব্যানার্জি, "না, না—দাঁড়ান--"

এক হাতে চোখ ঢাকল। কম্পিত, শিহরিত অন্ত হাতের আঙুল ছুঁইয়ে, নখ বসিয়ে বোতামটা টান দিয়ে ছিঁড়ল। আঃ, ঈশ্বর।

"মুখ থেকে হাত নামাও। নামাও। উঁহু, চোখ বুঁজে থাকলে হয় না, মঞ্জু—আমার মঞ্জুরানী! তাকাও বলছি, তাকাও, লুক ইনটু মাই আইজ—ওক্-কে—এই তো। হোয়াট এ বিউটি—দি লাভলিয়েস্ট থিং অন আর্থ—।" আর দাঁত কিড়মিড় করে মনে মনে বলল, কেমন লাগছে, মঞ্জু ব্যানার্জি? সাধ মিটেছে স্ট্রাইকের? 'বস' খুশি হবে, বিভাগে আমার উন্নতি হবে। আর, এই পদ্মকলি ফটো দেখিয়ে তোমাকে চিরদিন ব্ল্যাকমেল করব।

সব শুনে রাণুর মনটা খারাপ হয়ে গেল, ঘৃণায় শরীরটা রি রি করে কেমন বমি বমি ঠেকল, কান্না পেল। নিজের হাতটা তার কামড়াতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছে হল, একটা ছুরি হাতের তালুর ওপর বসিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের করে দেয়, তা হলে বুঝি শরীর একটু শান্ত হয়, শীতল হয়। এই—এই হয়! অপদার্থ একক হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতার এই চূড়ান্ত বিকৃতিই অনিবার্য। বিকৃতি, বিকৃতি। ওদের এই সভ্যতা, সমাজ, অর্থনীতি, তার বশম্বদ অনুচর—সব একটা বিকৃতি। পাকাটে ডালিম ছিল, এখন পচা, এই অফিসারগুলো সেই পচা ডালিমের এক একটা বীচি।

"তোদের সুব্রামনিয়াম কী বললে?"

"এখনও বলে নি কিছু, বণ্ডটা সই করে আনতে বলল। ইউনিয়নের কয়েকজনকে অবশ্য বণ্ড দেয় নি। এখনও শুরু করে নি, গভীর জলের মাছ।"

"আমাদের খিদিরপুরের মিঃ খাবেকেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, চুপচাপই আছে। একটু ভয় পেয়েছে মনে হয়। তবে, যাই বলিস, ডালহৌসির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরীর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। ইউনিয়ন থেকে দিল্লিতে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, নিউজ পেপারেও ঘটনা সব জানানো হয়েছে। তারপর আরও কি করেছে শোন—"

বলে শীলা রাণুর মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে কি বলল। পচা ডালিমের এক একটি অসার বীচি—রাণুর আবার মনে পড়ল কথাটা।

শীলা থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। বললে, "তুই দেখিস নি রক্ষে। দেখলে কিন্তু সুব্রত চৌধুরীকে অমনটি মনে হয় না। মোটেই, যেন কত সাধু

পুরুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। একেশ্বরের বদমাইস, ছোটলোক। ওর আণ্ডারে থাকলে চাকরিটা ছাড়তেই হত। কিন্তু যাই বলিস, চেহারাখানা ডন জুয়ান। তোর সঙ্গে যা মানাত না—!”

“আঃ, কী যে বাজে রসিকতা শিখেছিস—”

মাথটা ঘুরছিল রাণুর। রমি আসছিল, কান্না-কান্না, রাগ, হিংস্রতা—সব মিলিয়ে একটা অনুভূতি ওকে কম্পিত করছিল, বিবর্ণ করছিল।

“কিরে, কি হল?”

“এক গ্লাস জল খাওয়া, বাড়ি যাব। বাড়ি থেকে ওগুলো নিয়ে আসি।”

“আয়। সঙ্গে যাব আমি?”

“না। সুটকেসটা নিয়ে আসি, এখুনি আসব। যদ্দিন সিট না পাচ্ছি তোর সিটেই ভাগাভাগি করে থাকব। তুই-ই যখন সুপারিনটেনডেণ্ট তখন—”

“আয়। হবেই একটা কিছু ব্যবস্থা। কিন্তু হঠাৎ? কারণটা তো বললি না বাড়ি ছাড়ার?”

“বলব, এসে বলব।”

সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় রাণুর দু চোখ ফেটে জল এল। মাকে জানায় নি। মা শুয়েছেন। চুপি চুপি নিজের ঘর থেকে সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঝি দেখেছে, কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় নি, একটু অবাক চোখে তাকিয়েছে, রাণু হেসেছে, যেন একটা সাধারণ ব্যাপার। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার চোখ উপচে জল পড়ল। এই বাড়িকে এই মুহূর্তে সে ঘৃণা করছে, আবার ছেড়ে যেতে কষ্টও হচ্ছে। মার জন্ত কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে, কোথায় কোন্ অজানা সমুদ্র সে এবার পাড়ি দিতে চলেছে। একটা সান্ত্বনা, সেটা সমুদ্রই, পঙ্কিল ডোবা কি পুকুর নয়।

প্যাসেজে সুব্রতর সঙ্গে দেখা। দূর থেকে দেখেই চোখ মুছেছিল রাণু। সুব্রত শিস দিতে দিতে ফিরছিল। মনটা খুশি খুশি। খুশি হবার কথাই। যুদ্ধে জয়ী বীরের মতো সে ফিরছে। ফটোটা এখুনি ডেভেলপ করতে হবে। গাঙ্গুলিকে এক কপি দেব, হেঃ হেঃ। বাক্‌রোধ গলে যাবে। না, দেব না। হ্যাঁ দেব, না, দেব না। বিনতা। পুরী। ছুটি নেব।

“একি, কোথায়?”

"হোস্টেলে। এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। ভালোই হয়েছে, দেখা হল। সব কিছু রেখে যাচ্ছি। শুধু এই স্যুটকেসটা—আমারই কেনা—"

"অ। চাকরিটা তাহলে আছে? আশ্চর্য, কি করে থাকল?"

"বাঃ, থাকবে না কেন?" জোর করে হাসার এবার চেষ্টা করল রাণু, হাসলও, খুব খুশি, খুব আনন্দিত, বিজয়ীর মতো মুখভঙ্গি করে, মাটিতে পা ঠুকে তাল দিতে দিতে।

সুব্রত চৌধুরী ভয় পেল। সন্দিগ্ধ চোখে, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে, মুখে গর্বোদ্ধত ভাব রেখেই তাকাল রাণুর দিকে। ভয় দেখাচ্ছে? না, ভয় দেখাচ্ছে না। নিজেকে কেমন অসহায় বোধ হচ্ছে। মনে হল বলে, ছেলেমানুষী রাখো রাণু, পাগলামির একটা সীমা আছে। বলতে পারল না, অহঙ্কারে বাধছে। আঘাতেরও ভয় আছে।

"সুব্রামনিয়াম কিছু বলল না? কিছুই না?"

"কি আবার বলবে?"

তারপর চকিতে, একমুহূর্তে কি যেন মনে পড়ে গেল। বললে, "ও হ্যাঁ। শুধু একটা ফটো নিয়েছে—নেকেড, স্টার্ক নেকেড, মানে—একেবারে নগ্ন।"

থেমে, চিবিয়ে, প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে ওজন করা হিসেবী কথাগুলো শেষ করে সুব্রতর মুখের দিকে রাণু তাকাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, একটা জটিল অপারেশন শেষ করে একমুহূর্ত যেমন ডাক্তার তাকায় রোগীর মুখের দিকে। সুব্রতর মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন। রাণুর মনে হল, সুব্রত পড়ে যাচ্ছে। পড়বেই। সুব্রত একদিন পড়তই। তবু রাণুর কষ্ট হল, ওর দাদা সুব্রত, যে নিজেরই মায়ের পেটের ভাই, একই রক্ত, তবু, জাতে কত আলাদা—তা হোক, ওকে, এই ক্রম-নিঃসঙ্গ সুব্রতকে আঘাত দিতে, তারপর সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়া বৈজ্ঞানিকের স্থির অবিচল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে রাণুর বুক চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে চাইল।

নিঃসঙ্গ দাদার মুখের দিকে শেষবার তাকাল রাণু। তারপর চোখের জল হাত দিয়ে সরিয়ে, শান্ত নম্র পায়ে গেট পার হল। একটা অচেনা উদ্বেগে, নির্মম আঘাত দেওয়ার রূঢ় ব্যথায় এবং মুক্তির সুতীব্র যন্ত্রণামুখর আনন্দে রাণু কেঁপে উঠল। একটি মুহূর্ত। পরক্ষণে দ্রুত পা ফেলল। মনে হল, একটা ভূতুড়ে দমবন্ধ শ্মশান পার হয়ে সে জীবনের দিকে ছুটছে, যেখানে তার বন্ধুরা সবাই অপেক্ষা করছে।

একটি যুদ্ধের ইতিহাস

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

অনন্ত
অসীম
প্রথম
দ্বিতীয়
তৃতীয়
চতুর্থ
সুলতা
দণ্ডধর
মলিনা
বিচারক
মুনশী
আরও দু-একজন
এবং অসংখ্য লোক

যবনিকা সরে যাওয়ার আগে

কণ্ঠস্বর। সমস্তপঞ্চকে সেই ভীষণ গদাযুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে দুই পক্ষ। এক পক্ষ ভীম, আর এক পক্ষ দুর্যোধন। সে যুদ্ধের কারণ ছিল—মহাকাব্যের কারণ। তারপর যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। কারণ হয়ে উঠেছে জটিল। যুদ্ধের পদ্ধতি? সে যেন আরও জটিল। নাই বা বললাম সে কারণের ইতিহাস। যুদ্ধের কথাটাই হোক।

যবনিকা সরে যায়

চেয়ার, টেবিল, অনন্ত

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) কে ওখানে ?

অসীম। (প্রবেশ করিয়া টেবিলের নিকট আসে) আমি। অসীম।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) তারপর কি মনে করে ?

অসীম। কথাটা তোমার ঠিক নয়।

অনন্ত। কেন ? (যেমন কাজ করিতেছিল তেমনই কাজ করিয়া যায়)

অসীম। কেন আবার কি। ঠিক নয়।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) তবে কোন্‌টা ঠিক ?

অসীম। প্রতিবাদে যে কথাটা বলা হল সেইটে।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) আমি তা মানি না।

অসীম। মানি না বললেই চলে কি ? মানতে হয়।

অনন্ত। (মুখ তুলিয়া) মানলুম না। (পুনরায় কাজে মন দেয়)

অসীম। কেন মানবে না শুনি ?

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) আমি যে কথাটা বলেছি, সেটা আমার মত বলে।

অসীম। লোকে যে মতটা মানে সেটা বলে না।

অনন্ত। আমি কিন্তু বলি।

অসীম। (দশ টাকার নোট বাহির করিয়া) তা হলে দশটা টাকা দিই ?

অনন্ত। কেন ?

অসীম। তোমার ঐ মতটার দাম।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) ওটা তোমায় এমনি দিলাম। তুমি ব্যবহার করতে পারো।

অসীম। ভেবে দেখ। দামটা আমি বাড়াচ্ছি—কুড়ি…তিরিশ…পঞ্চাশ…

এপাশ-ওপাশ হইতে কয়েকজনের প্রবেশ

প্রথম। নীলাম হচ্ছে না কি ?

অসীম। হ্যাঁ। (অনন্তর কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। সে কাজ করিয়া চলিয়াছে)

দ্বিতীয়। কিসের ?

অসীম। ওঁর একটা মত আছে, সেইটের।

তৃতীয়। মত ? জিনিসটা কি রকম ?

অসীম। শুনতেও ভালো—বলতেও ভালো।

চতুর্থ। তাই না কি ! তা হলে একটা দাম দিই ?

অসীম। দিতে পারো। (অনন্ত একমনে কাজ করিতেছে)

তৃতীয়। বিড্ কত যাচ্ছে ?

অসীম। পঞ্চাশ।

দ্বিতীয়। বেশ। আমার একটা রইল। ষাট।

প্রথম। সত্তর।

চতুর্থ। আশি।

তৃতীয়। নব্বুই।

দ্বিতীয়। একশো।

অসীম। দুশো। (অনন্ত নিজের কাজ করিতেছে)

প্রথম। তিনশো।

চতুর্থ। পাঁচশো।

তৃতীয়। সাতশো।

দ্বিতীয়। নশো।

প্রথম। হাজার।

অসীম। সুলতা বলছিল তোমার নাকি ওদেশে যাবার খুব ইচ্ছে।

অনন্ত। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) তুমি সুলতাকে চিনলে কি করে ?

অসীম। সুলতা টিউশানির মাইনে পায় নি। তাই ঘর ভাড়ার টাকাটা তোমার কাছে চেয়েছিল।

অনন্ত। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তুমি সুলতাকে চিনলে কি করে ?

অসীম। টাকাটা তুমি যোগাড় করতে পারো নি। তাই আর যাও নি।

অনন্ত। (প্রায় চিৎকার করিয়া) তুমি এত কথা জানলে কি করে।

অসীম। ঘর ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছি কি না, তাই।

অনন্ত। তাইতেই সে তোমাকে সব বলে দিল?

অসীম। এক দিনে তো বলে নি। সাতদিনে বলেছে। আমার যাতায়াত তো রোজ। (অনন্ত বসিয়া আবার কাজ করিতে আরম্ভ করে)

চতুর্থ। নীলাম কি বন্ধ হয়ে গেল?

অসীম। না না, কে বললে? শোনো তোমার ওদেশ যাওয়ার খরচা আমি দেব।

তৃতীয়। যাওয়ার খরচা, থাকা-খাওয়ার খরচা—দুটোই আমার।

দ্বিতীয়। ওর ওপর ফিরে আসার খরচাও ধরে দেব।

প্রথম। বোঝার ওপর শাকের আঁটি। ওটা তো দেবই—তার ওপর হাত-খরচা।

চতুর্থ। ওসব তো আছেই। তাছাড়া পুরো জেট-প্লেনখানা ছেড়ে রেখে দেব। যখন খুশি নিয়ে যাবে, যখন খুশি নিয়ে আসবে।

অসীম। ভেবে দেখ—যখন খুশি নিয়ে যাবে, যখন খুশি নিয়ে আসবে।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) আমি বেশ্যা নই। নিজেকে বিক্রি করি না।

অসীম। মলিনা কিন্তু করে।

অনন্ত। (মুখ তুলিয়া) কে করে?

অসীম। মলিনা।

অনন্ত। (কণ্ঠস্বরে যেন শাপ দেওয়া। উঠিয়া) তুমি গোয়েন্দা—না হিতাকাঙ্ক্ষী?

অসীম। তোমার পরিবার? ধ্বংস তার অনিবার্য। আর তুমি? আজ বাদে কাল শেষ হয়ে যাবে।

অনন্ত। তুমি যেতে পার। আমি তোমাকে চিনি না।

অসীম। চেনার তো কোনো দরকার নেই। আমি খদ্দের।

প্রথম। ঠিক কথা। খদ্দেরকে তো না চিনলেও চলে।

দ্বিতীয়। নিশ্চয়। সব ব্যবসাদার কি সব খদ্দেরকে চেনে?

তৃতীয়। তবু তো বেচাকেনা চলে।

চতুর্থ। তবু তো ব্যবসা এগোয়।

অসীম। তাই তো বলছি—মতাগতটা বিক্রি করে দাও, আমরা চলে যাই।

অনন্ত। সুলতা এখন কোথায়?

অসীম। এ-কদিন আমার ফ্ল্যাটে ছিল। এখন এখানে।

স্থলতার প্রবেশ

স্থলতা। (অসীমকে) বাঃ বেশ লোক যা হোক ! এই আসছি বলে ঢুকলে—আর বেরবার নাম নেই। কেমন আছ অনন্ত ?

অনন্ত। তুমি কি এদের সঙ্গে এসেছ।

স্থলতা। হ্যাঁ পরিচিত বন্ধুবান্ধব লোক।. বললেন, চল ঘুরে আসি।

অনন্ত। কত দিনের পরিচয় ?

স্থলতা। এই তো—দিন সাতেক।

অনন্ত। আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

স্থলতা। তোমার চিঠি যখন হাতে এল তখন কৌটির এই ফেস্‌-পাউডারটা মুখে লাগিয়ে দেখছি কেমন দেখায়।

অনন্ত। ও, চিঠি পৌছবার আগেই এদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে ?

স্থলতা। হ্যাঁ, ততক্ষণে চার মাসের বাড়ি ভাড়া মিটে গেছে। ভালো হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার পথে অনেক দিনের পছন্দ করা কখানা শাড়ি কিনে এনেছি। নিউ এম্পায়ারে যাব ছবি দেখতে। তৈরি হচ্ছি—এক হাতে কোটির ফেস পাউডার—এমন সময় আর এক হাতে এল তোমার চিঠি, আমাদের সেই পুরনো বাড়ি ঘুরে।

অনন্ত। চিঠিটা তুমি পড় নি স্থলতা ?

স্থলতা। পড়েছিলাম অনন্ত।

অনন্ত। তবে ?

স্থলতা। শুনলে তুমি দুঃখ পাবে অনন্ত।

অনন্ত। বলো না শুনি।

স্থলতা। পড়েছিলাম, কিন্তু কিছু মনে হয় নি।

অনন্ত। কিন্তু কেমন করে জানলে একথাটা শুনে আমার দুঃখ হবে ?

স্থলতা। দুঃখ তোমার হয়নি অনন্ত ?

অনন্ত। হয়েছে, কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?

স্থলতা। সত্যিই তো, আমি কি করে জানলাম ?

অনন্ত। তুমি আবার আমার চিঠিটা পড়ে দেখো স্থলতা।

স্থলতা। কিন্তু চিঠিটা তো হারিয়ে গেছে।

অনন্ত। চিঠিটা আমার মুখস্থ আছে—বলব স্থলতা ?

অসীম। বাজে কথায় কাজ কি। মতামতটা বিক্রি করে দাও—আমরা চলে যাই।

অনন্ত। টাকা আমি যোগাড় করেছিলাম সুলতা। এই দেখ টাকা। কাজটুক শেষ করেই নিয়ে যেতাম।

সুলতা। জানলে অনন্ত—ছোট্ বেলায় আমার চীনে লণ্ঠন কেনার খুব সখ ছিল।

প্রথম। চীনে লণ্ঠন?

সুলতা। হ্যাঁ, চীনে লণ্ঠন। কেমন যেন মনে হত চীনে লণ্ঠনের আলোয় সব বদলে যায়। সব কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়। সত্যি হয় নাকি?

সুলতা। একবার যেন হয়েছিল। খুব ছোটবেলায়—

তৃতীয়। তাই নাকি? কি হয়েছিল?

সুলতা। নকুড় মিস্ত্রীর ছেলেকে চীনে লণ্ঠনের আলোয় দেখেছিলাম।

চতুর্থ। কি রকম মনে হল?

সুলতা। মনে হল—কেমন যেন রাজপুত্র—রূপকথার রাজপুত্র।

অসীম। তারপর একদিন সত্যিই চীনে লণ্ঠন কিনলে, তাই না।

সুলতা। হ্যাঁ, একদিন চীনে লণ্ঠন কিনে ঘর সাজালাম।

অনন্ত। কিন্তু ছোটবেলার সে আলো আর আসে নি।

সুলতা। না, সত্যিই আসে নি অনন্ত। ভাঙা ঘর কেমন যেন আরও ভাঙা দেখাতে লাগল—আরও বিশ্রী।

অনন্ত। আমিও তো তাই বলছি সুলতা। ও চীনে লণ্ঠনের—

অসীম। তোমার ঐ বলার দাম কত?

প্রথম। একশো?

দ্বিতীয়। দুশো?

তৃতীয়। তিনশো?

চতুর্থ। চারশো?

অনন্ত। বলেছি তো তোমাদের আমি চিনি না।

সুলতা। কিন্তু সত্যি অনন্ত, তোমার ও বলার আর কোনো দাম নেই।

অনন্ত। কি বলছ সুলতা! এই তো সেদিন—

সুলতা। সেদিন পর্যন্ত তো দাম ছিল অনন্ত। কিন্তু তারপর—

অনন্ত। হ্যাঁ—তারপর সুলতা…?

অসীম। তারপর দিন সাতেক আগে হঠাৎ দামটা হারিয়ে গেল।

সুলতা। হ্যাঁ—ঠিক সাতদিন আগে—

অনন্ত। কিন্তু সুলতা—আমি চিঠিতে লিখেছিলাম—

সুলতা। তখনও চিঠির কথা আসে নি অনন্ত—তোমার কথাই আছে। বাড়িওলা সবে তাগাদা দিয়ে গেছে—তোমাকে খবর পাঠিয়েছি—এমন সময়—

অসীম। এমন সময় চীনে লণ্ঠনের আলোয় সব যেন কেমন বদলে গেল।

প্রথম। একশো চীনে লণ্ঠনের দাম কত?

দ্বিতীয়। কত আর হবে—হাজার—

তৃতীয়। তাহলে আমাদের ব্যবসাটা—

চতুর্থ। ঠিক। ব্যবসাটা আমাদের চীনে লণ্ঠন দিয়ে সাজিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

অনন্ত। সুলতা…!

সুলতা। সত্যি বলছি অনন্ত—বিশ্বাস করো। ছোটবেলার সেই চীনে লণ্ঠনের আলোটা হঠাৎ যেন ফিরে এসে সব কিছুকে পালটে দিয়ে গেল।

অনন্ত। তুমি বাইরে অপেক্ষা করো সুলতা। আমি এদের তাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

সুলতা। কিন্তু, তুমি তো চীনে লণ্ঠন নিয়ে আসবে না অনন্ত।

অনন্ত। না সুলতা, আমাদের পথ সূর্যের আলোর পথ। সে পথে তো চীনে লণ্ঠনের দরকার নেই।

সুলতা। কিন্তু অনন্ত, বাড়িওলা বাড়ি থেকে বার করে দেবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল। বললে জল বন্ধ করে দেব, আলো বন্ধ করে দেব। তোমাকে চিঠি লিখে একা ভাবছি। হঠাৎ তোমার ঐ সূর্যের আলোর পথে বাবাকে দেখলাম। মরবার আগে পর্যন্ত পাওনাদারের তাগাদা পেছনে নিয়ে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে বাবা অফিস করেছেন। মা অভাবের জ্বালায় বিশ্রী মুখ করে বিশ্রী কথাবার্তা বলে গেছেন। আর আমি? আমি নাকি ফোটা ফুলের মতো জন্মেছিলাম। কিন্তু সেই ফোটা ফুলের চেহারা নিয়ে দিনের পর দিন তোমার ঐ সূর্যের পথে ক্লেদাক্ত ঘর্মাক্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।

অসীম। তাই তো চীনে লণ্ঠনের আলো নিয়ে এলাম।

প্রথম। একশো—

দ্বিতীয়। দুশো—

তৃতীয়। তিনশো—

চতুর্থ। চারশো চীনে লণ্ঠনের আলো।

সুলতা। আর জানলে অনন্ত? সে আলোয় নীতি, মত, পথ, আমার ঘাম-ঝরা দিন, কালি-পড়া রাত, আর সেই সঙ্গে তুমি, সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

অনন্ত। কিন্তু সুলতা—আমি তো ভাবতেও পারি নি—নকল আলোর আলোয় এমনি করে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

প্রথম। তবে? কি তুমি ভেবেছিলে শুনি?

দ্বিতীয়। তুমি কি ভেবেছিলে রাতের পর রাত সুলতা একা কাটিয়ে দেবে?

তৃতীয়। তুমি কি ভেবেছিলে বিছানায় সুলতার পাশে শোবার মতো লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নেই?

চতুর্থ। তুমি জানতে না অসীম আছে? জানতে না তুমি, অসীম না থাকলে আমরা আছি?

অসীম। তুমি কি ভেবেছিলে স্বর্গ থেকে নেমে আসা সুলতা এখনও মর্ত্যের মাটিতে পা দেয় নি?

অনন্ত। আমি এটাকে সভ্য শহর বলেই জানতাম। কিন্তু এ তো দেখছি জঙ্গল।

প্রথম। গতিক কিন্তু সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ—আমারও কেমন মনে হচ্ছে—অনন্ত যেন পালাবার মতলব করছে।

তৃতীয়। পালালেই হলো। পালিয়ে একবার দেখুক না।

চতুর্থ। আমি আছি কি করতে? চোট করে দেব না।

অসীম। কি দরকার চোট করে দেবার। মতামতটা বিক্রি করে দাও—আমরা সবাই চলে যাই।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, চতুর্থ। (একসঙ্গে) কি আছে? বিক্রি করে দাও না? আমরা সবাই চলে যাই।

অনন্ত। আশ্চর্য সুলতা! আমি তো এতদিনেও কিছু জানতে পারি নি। এরা তো দেখছি সাতদিনে সব কিছু জেনে ফেলেছে।

সুলতা। জানবে না কেন ? অসীমকে যে আমি সব বললাম।

অনন্ত। আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলনি। অন্তত এই সব ভাবনার কথা।

সুলতা। তোমার সঙ্গে আমার শেষ যেদিন দেখা হয়েছে, সেদিনও তো বলার মতো অবস্থায় এসে পৌছুই নি। বাড়িওলা যখন তাগাদা দিয়ে চলে গেল, ভাবনা আরম্ভ হল তখন। তারপর এল অসীম। মনে হল এই হয়তো সুযোগ। ঘাম-ঝরা দিন, আর চোখে-কালি-পড়া রাতের এবার হয়তো শেষ।

অসীম। সুলতা বুদ্ধিমতীর মতো ভেবেছে অনন্ত। তুমিও বুদ্ধিমানের মতো ভাবতে আরম্ভ করো। আমাদের বুদ্ধি একটা নেবে অনন্ত ?

দ্বিতীয়। আমাদের সঙ্গে একটু বাইরে যাবে ? বারে ?

তৃতীয়। ভালো মাল···দু পেগ টেনে আসবে ?

চতুর্থ। মাথা দেখবে একেবারে সাফ হয়ে গেছে ? আসবে আমাদের সঙ্গে ?

অনন্ত। এরা তো তাড়ালেও যাবে না সুলতা। চলো আমরাই যাই।

সুলতা। এই সাতদিনের পরেও একথা বলতে পারছ অনন্ত !

অনন্ত। কেন পারব না। আমি তো ও-সাতদিনের কথাটা বুঝি!

অসীম। বোঝ বলেই তো বলছি। মতামতটা বিক্রি করে দাও।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, চতুর্থ। (একসঙ্গে) আমরা হিসেব মিটিয়ে চলে যাই।

অনন্ত। আজ আটদিনের দিন আমরা নতুন করে দিন আরম্ভ করব সুলতা।

সুলতা। চলো অসীম, আমরা এখান থেকে যাই। এ লোকটা মদ না খেয়েও মাতাল।

অনন্ত। কিন্তু তোমার ও-ঘাম-ঝরা দিনের কথা আমি বুঝি সুলতা। বিশ্বাস করো—তোমার ও-চোখে-কালি-পড়া রাতের অনুভব আমার অন্তরে।

সুলতা। কিন্তু তোমার অনুভবকে আমার তো বইবার ক্ষমতা নেই অনন্ত। তোমরা আসবে না অসীম ?

অসীম। শুনলে তো সুলতার কথা। অন্তত অনুভবটাকে বিক্রি করে দাও।

প্রথম ও দ্বিতীয়। (একসঙ্গে) ঠিক কথা। অন্তত অনুভবটাকে বিক্রি করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ। (একসঙ্গে) সঙ্গে সঙ্গে মতামতটাও বিক্রি হয়ে যাবে।

দণ্ডধরের প্রবেশ

দণ্ডধর। (প্রবেশ করিতে করিতে) কিসের ব্যবসা ? কিসের বেচাকেনা ? (প্রবেশ করিয়া অসীমকে দেখিয়া) এ কি, হুজুর ?

অসীম। হ্যাঁ দণ্ডধর, আমি।

দণ্ডধর। গরীবের ব্যবসায় আপনি হুজুর ?

অসীম। হ্যাঁ দণ্ডধর। কিছু কিনতে এলাম।

দণ্ডধর। কি বলছেন হুজুর! আপনি এলেন কিনতে আমার ব্যবসায় ? (অনন্তকে দেখাইয়া) বলেছেন এঁকে ?

অসীম। বলেছিলাম। উনি বেচতে রাজি নন।

দণ্ডধর। কি এমন জিনিস অনন্তবাবু যে হুজুরকেও বেচতে রাজি নন ?

অসীম। ওঁর একটা মত আছে—আমরা সেটা কিনতে চেয়েছি।

দণ্ডধর। কিন্তু অনন্তবাবু, আপনি বোধহয় জানেন না, একটু আগে আমার মতটা আমি ওঁদের বেচে দিয়েছি।

অনন্ত। খেতে আমরা দুটি প্রাণী সুলতা। যা হোক করে আমাদের চলে যাবে। মলিনা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তবুও—

সুলতা। ঐ যা হোক করে কথাটাতেই আমার আপত্তি অনন্ত।

অসীম। একটা কথা তুমি বার বার ভুলে যাচ্ছ অনন্ত। সাতদিন সাতরাত সুলতা আমার ভাড়া করা ফ্ল্যাটে কাটিয়েছে।

অনন্ত। কিন্তু তার আগের তিন বছর ? তখন আমি আর সুলতা ছিলাম, তুমি ছিলে না। তিন বছরের কাছে সাতদিন সাতরাত কতটুকু সময় অসীম ?

অসীম। দামটা আমি ডবল করে দিচ্ছি অনন্ত।

অনন্ত। আমি তো বলেছি। তুমি তোমার লোকজনদের নিয়ে চলে যেতে পারো। আমি তোমাদের চিনি না।

অসীম। বেশ তাই হোক। তবে বাজারটা একবার যাচাই করে দেখলে পারতে অনন্ত।

দণ্ডধর। আপনি তো আচ্ছা গাধা অনন্তবাবু!

প্রথম। দেশে তোমার বুড়ো বাপ-মা আছে অনন্ত।

দ্বিতীয়। তোমার বোনের নাম মলিনা।

তৃতীয়। সুলতাকে তুমি ভালোবাস অনন্ত।

চতুর্থ। ওদেশে যাবার ইচ্ছে—সেটাও খুব একটা ছোট কথা নয়।

অনন্ত। না না না, তবুও নয়! কিছুতেই নয়! আমি তোমাদের স্বীকার করি না—আমি তোমাদের চিনি না!

দণ্ডধর। আজ থেকে আপনার চাকরি নেই অনন্তবাবু।

প্রথম। দেখ অনন্ত—আজ থেকে তুমি বেকার।

দ্বিতীয়। তোমার রুজি-রোজগার চলে গেল অনন্ত।

তৃতীয়। ভেবে দেখ অনন্ত—তোমার ভিত শুদ্ধু নড়ে গেল।

চতুর্থ। অনন্ত তুমি বেকার···অনন্ত তোমার রুজি-রোজগার নেই···অনন্ত তোমার ভিত শুদ্ধু নড়ে গেছে।

অসীম। তাই তো বলছি অনন্ত, তোমার মতামতটা বেচে দাও। আমরা চলে যাই—সব যেমন ছিল তেমন হোক।

অনন্ত। (প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) আমি তা হলে যাচ্ছি সুলতা। তুমি যদি চাও আমার সঙ্গে আসতে পারো।

সুলতা। কথাটা তো কবার বললে অনন্ত।

অনন্ত। বেশ, তবে তাই হোক।

অসীম। অনন্ত—

অনন্ত। বলেছি তো অসীম, তোমার আমার মধ্যে পরিচয় নেই।

অসীম। কেন বলো তো?

অনন্ত। জঙ্গলের জানোয়ার আর স্বাধীন মানুষ—পরস্পরের মধ্যে কি পরিচয় আছে অসীম।

অসীম। স্বাধীন মানুষটি কি তুমি নাকি?

অনন্ত। নিশ্চয়। আমি, আমার আশ-পাশের লোক, আমাদের আদর্শ, সব মিলিয়ে নিশ্চয় আমরা স্বাধীন। (প্রস্থান)

অসীম। তবু শুনে রাখো অনন্ত। সুলতাকে দরকার হলে আমার ফ্ল্যাটে পাবে। মলিনাকেও দরকার হলে আমার আপিসের খাসকামরায় পাবে। আর আমাকে দরকার হলে বড় রাস্তার ব্যবসায় পাবে।
(ততক্ষণে অনন্ত চলিয়া গিয়াছে)

অন্ধকার

কণ্ঠস্বর। সমস্ত পঞ্চকের সেই ভীষণ গদাযুদ্ধ। দুই মহাবীর গদা হাতে নিয়ে দুটি বন্য বৃষের মতো ভীষণ গর্জন করতে করতে আক্রমণ করলেন

পরস্পরকে। গদার ঘূর্ণনে অন্তরীক্ষ ও ভূগর্ভ, মর্ত্যভূমি ও মহাসলিল প্রকম্পিত হলো। দেব, দৈত্য, দানব, নর, রাক্ষস ও নাগ, ত্রিভুবনের যাবতীয় অধিবাসী সমন্তপঞ্চকে নিজেদের দর্শকরূপে উপস্থিত করলেন।

আলো আসার আগে নানা কণ্ঠের স্বর

: কি দর যাচ্ছে?

: কোন্‌টার দর বলব বলো। এক এক জিনিস এক এক রকম।

: পর পর বলে যাও শুনি।

: বক্তৃতায় পঁচিশ, লিখে পঞ্চাশ, বই করে একশো, আর দল করে বেঁধে-ছেঁদে অন্য দেশে পাঠালে হাজার।

: দর কমাও দর কমাও, তোমাদের প্রতিপক্ষরা এমনি দিচ্ছে।

: এমনি দিচ্ছে? হঠাৎ?

: হঠাৎ তো নয়। তারা বরাবর এমনিই দিয়ে আসছে।

: কিন্তু কেন?

: তারা বলে ও-জিনিস বেচবার নয়, দেবার। ওটা নাকি সাধারণের সামগ্রী। তাই তো বলছি—দর কমাও, দর কমাও।

আলো আল্লে। বড় রাস্তার ব্যবসা

অসীম। এক নম্বরে কত গেছে?

প্রথম। চারশো পঁচিশ।

অসীম। দু নম্বরে?

দ্বিতীয়। চারশো পঞ্চাশ।

অসীম। তিন নম্বরে?

তৃতীয়। চারশো পঁচাত্তর।

অসীম। চার নম্বরে?

চতুর্থ। চারশো।

অসীম। কম কেন?

চতুর্থ। কখনো কম কখনো বেশি। ব্যবসার তো এইটেই নিয়ম।

: অনন্ত দেখা করতে চাইছেন।

অসীম। ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

মলিনার প্রবেশ

মলিনা। তুমি কি এখন খাসকামরায় আসবে অসীম? আমি কি তৈরি হয়ে থাকব?

অসীম। একটু বাদে যাব। অনন্ত এসেছে।

অনন্তর প্রবেশ

মলিনা। অনন্ত! (অনন্ত কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা অসীমের কাছে এগিয়ে আসে)

অসীম। তারপর অনন্ত, কি মনে করে?

অনন্ত। মলিনাকে নিয়ে যেতে এলাম।

মলিনা। কিন্তু আমি তো যাব না অনন্ত। আমি এখানে বেশ আছি।

অনন্ত। মলিনা এখানে কি করে অসীম?

অসীম। কেন? আমার খাসকামরার খাস চাকুরে।

অনন্ত। তার মানে দিনে মলিনা আর রাত্তে স্থলতা?

অসীম। তোমার যেমন ইচ্ছে মানে করে নিতে পারো।

অনন্ত। তোমার জামাকাপড় গুছিয়ে নাও মলিনা।

মলিনা। তোমায় তো বললাম অনন্ত—আমি যাব না।

অনন্ত। মলিনাকে কি তুমি বিয়ে করবে অসীম?

অসীম। কিছু তো ঠিক করি নি। কদিন যাক। তারপর হয় মলিনা, না হয় স্থলতা। কিংবা···হয়তো দুজনের কেউই নয়।

মলিনা। শুনলাম, তোমার নাকি চাকরি গেছে অনন্ত।

অনন্ত। তাতে কি এসে গেল। তোমার চাকরি তো রয়েছে।

মলিনা। সত্যি অনন্ত। অনেকদিন বাদে ভালো কাজ পেয়েছি। খাসকামরার খাসচাকুরে। ভালো খাওয়া, ভালো থাকা···আনন্দে অনন্ত···দেশে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাচ্ছি।

অনন্ত। জানি। তোমার টাকার ওপর অসীমের টাকা। দেশে এখন বেশ ভালো টাকাই যাচ্ছে।

মলিনা। আমার মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ অনন্ত।

অনন্ত। জিনিস বিক্রি করলে দালালে কমিশন কাটে। দেখছি কমিশনের ছাপ মুখের ওপর পড়েছে কিনা।

মলিনা। আমি তো কিছু বিক্রি করি নি অনন্ত। আমি যুবতী। যৌবনের ধর্ম পালন করছি।

অনন্ত। নিজেকে তুমি মিথ্যে বোঝাচ্ছ মলিনা। তোমার যৌবন তুমি বিক্রি করছ।

মলিনা। এতদিন তো দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে এলাম অনন্ত। কিছু লাভ হলো কি।

অনন্ত। তাই বলে এই বেচা-কেনার হাটে নামবে ?

মলিনা। সেটাই তো স্বাভাবিক। বেচা-কেনার কাল। ভালো দাম পাচ্ছি, বেচছি। আমি খুব সুখে আছি অনন্ত। তুমি যাও।

প্রথম। আমরাও তো সেই কথাই বার বার করে বলছি।

দ্বিতীয়। বলছি তো—তোমার মতামতটাও তুমি বেচে দাও।

তৃতীয়। বেচে দাও—দেখবে সুখের আর অবধি নেই।

চতুর্থ। বেচে দাও—দেখবে সুলতা, মলিনা সব তোমার কাছে ফিরে এসেছে।

অনন্ত। দেশে যার সঙ্গে দেখা করেছিলাম অসীম। দেখলাম, সেখানেও তোমার ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত।

অসীম। কেন—মা কিছু বললেন ?

অনন্ত। বললেন—অসীম আমার কেউ নয়—তবু যেন পেটের ছেলের চেয়েও বেশি।

অসীম। তোমার জামাকাপড়গুলো বদলে ফেল অনন্ত। বিশ্রী ভাবে ছিঁড়ে গেছে। (কলিং বেল টিপিতেই একজন লোক জামাকাপড় লইয়া আসে)

অনন্ত। (জামাকাপড় লইয়া অন্তরালে চলিয়া যায়। অন্তরাল হইতে) কি ভাবছ বলব অসীম ?

অসীম। কি বলো তো ?

অনন্ত। জামাকাপড় বদলে আমাকে সমান করে নিলে—তাই না ?

অসীম। যদি বলি, তাই ? খুব ভুল হবে কি ?

অনন্ত। কিন্তু সমান করে নেওয়ার জন্য এত আগ্রহ কেন ?

অসীম। সমান সমান না হলে লড়ায়ে মজা হয় না।

অনন্ত। (বাহিরে আসিয়া) সত্যিকারের সমান করে নিয়ে লড়াই করতে পারবে অসীম ?

অসীম। হুকুম করেই দেখ।

অনন্ত। তামিলটা কে করছে।

অসীম। কেন আমি—তোমার বান্দা।

অনন্ত। ঠাট্টা করছ?

অসীম। হুকুমটা করেই দেখ।

অনন্ত। তাহলে সত্যিকারের সমান হয়ে নিই। তারপর নতুন পর্যায়ে লড়াই। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।

অসীম। যা তোমার অভিরুচি।

অনন্ত। তাহলে হুকুমই একটা করছি—

অসীম। বললাম তো এক্ষুণি তামিল হবে।

অনন্ত। তোমার ব্যবসাটা এখন থেকে আমার।

অসীম। বেশ তাই হলো।

অনন্ত। (চারজনকে দেখাইয়া) এদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক অসীম?

অসীম। এদের আলাদা ব্যবসা। এদের ব্যবসার সঙ্গে আমার ব্যবসা মিলে এই বড় ব্যবসা।

অনন্ত। আজ থেকে এদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথম। মনে রেখ আমি কিং এণ্ড কিং—

দ্বিতীয়। আমি শমুলকা এণ্ড গোমূলকা—

তৃতীয়। আর আমি হরচন্দ্র এণ্ড সন্স—

চতুর্থ। আর আমি কে জানো তো? ব্রাদার্স লিমিটেড।

অসীম। তবু তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

অনন্ত। তোমার ব্যবসায় কর্মচারী কত অসীম?

অসীম। ছশো।

অনন্ত। তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক?

অসীম। যা সর্বত্র হয়ে থাকে। গোলোযোগের।

অন্তরালে

কমরেডস—লড়াই আমাদের শুরু। আপনারা প্রত্যেকে ভেবে দেখুন কমরেডস—ভালোভাবে বাঁচার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। অথচ মাইনে যা পাই তাতে কোনোমতে বাঁচাও সম্ভব

নয়—ভালোভাবে বাঁচা তো দূরের কথা। কমরেডস—আপনারা আপনাদের বাড়ির কথা ভেবে দেখুন—ভেবে দেখুন আপনাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা। অশিক্ষা-অনাদর-আবর্জনা তাদের জীবনের নিত্য উপকরণ। সভ্যজগতে বাস করেও সভ্যতার শরিক হবার ক্রয় ক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারে নি। তাই কমরেডস —আমাদের মজুরি বাড়ানোর দাবি, আমাদের পুজো বোনাসের দাবি। দাবি আমাদের জয়যুক্ত হবেই—কমরেডস—হার আমরা মানতেই পারি না।···ইন কিলাব জিন্দাবাদ···ইন কিলাব জিন্দাবাদ···আমাদের দাবি মানতে হবে···আমাদের দাবি মানতে হবে···

অনন্ত। তোমার সঙ্গে ওদের আয়ের তফাৎ কত অসীম ?

অসীম। অনেক।

অনন্ত। আজ থেকে তফাৎটা বাদ দিয়ে দাও।

অসীম। তাই দিলাম অনন্ত। (কলিং বেল টিপিলে একজনের প্রবেশ) আজ থেকে এই ব্যবসার সমস্ত আয় সবায়ের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হয়ে যাবে। (লোকটির প্রস্থান)

অন্তরালে

আমরা পেয়েছি কমরেডস। কিন্তু তবু এ পাওয়ায় বিশ্বাস নেই। ধর্মঘটের নোটিশ আমরা তুলে নিচ্ছি—কিন্তু দাবি হিসেবে এই পাওনাকে আদায় করে নেওয়ার কর্তব্য আমাদের রইল কমরেডস··· ইন কিলাব জিন্দাবাদ ···ইন কিলাব...

প্রথম ও দ্বিতীয়। (একসঙ্গে) এ রকম চুক্তি তুমি করতে পারো না অসীম—

অসীম। আমি তো করি নি—মালিক করেছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ। তোমার অনেক জোচ্চুরির হিসেব এখন আমাদের হাতে।

অসীম। সে হিসেবের বোঝাপড়া এখন মালিকের হাতে।

চারজন। (একসঙ্গে) আমরা বিশ্বাস-ভঙ্গের মামলা দায়ের করব।

অসীম। করতে পারো তোমাদের যা ইচ্ছে। মালিকের হুকুম তামিল করা ছাড়া এখন আর আমার কোনো কাজ নেই।

অনন্ত। সুলতাকে ডাকো অসীম।

অসীম। সুলতা—

সুলতা । ডাকছিলে অসীম ?

অসীম । আমি তো ডাকি নি—মালিক ডেকেছেন।

সুলতা । কে মালিক ? অনন্ত ?

অসীম । হ্যাঁ সুলতা।

অনন্ত । এখন আমাকে বিয়ে করবে সুলতা ?

সুলতা । নিশ্চয় করব। বিয়েতে তো আমার আপত্তি নেই অনন্ত। বর আমার মালিক হলেই হলো।

অনন্ত । এখন আমার সঙ্গে ফিরে যাবে মলিনা ?

মলিনা । না অনন্ত—সেটা আব হয় না। নিজেকে বিক্রি করেছি—কিন্তু কোথায় যেন অসীমকেই ভালোবেসেছি।

অনন্ত । দুটো বিয়ের যোগাড় করো অসীম।

অসীম । কার কার অনন্ত ?

অনন্ত । একটা তোমার আর মলিনার, আর একটা আমার আর সুলতার।

অসীম । বেশ তো—সামনেই আদালত—চলো যাওয়া যাক।

সামনেই আদালত

বিচারক। আজ কটা মামলা।

মুনশী । তিনটে হুজুর।

বিচারক। কি কি ?

মুনশী । দুটো বিয়ের, একটা বিশ্বাসভঙ্গের।

বিচারক। বিশ্বাসভঙ্গটাই আগে হোক। শেষে বিয়ে দেওয়া যাবে।

মুনশী । বিশ্বাসভঙ্গের মামলা হাজির ?

চারজন । (একসঙ্গে) হাজির হুজুর।

বিচারক। কিসের নালিশ তোমাদের ?

চারজন । (একসঙ্গে) বিশ্বাসভঙ্গের হুজুর—

বিচারক। নালিশ কার নামে ?

চারজন । (একসঙ্গে) প্রথমে ভেবেছিলাম অসীমের নামে, কিন্তু এখন দেখছি অনন্তর নামে।

বিচারক। নালিশের আবার আগে-পরে আছে নাকি ?

চারজন । (একসঙ্গে) প্রথমে মালিক ছিল অসীম হুজুর, কিন্তু এখন অনন্ত।

বিচারক। চুক্তিটা ভেঙেছে কে ?

চারজন । (একসঙ্গে) অনন্ত ।

বিচারক । কি করেছ তুমি ?

অনন্ত । তেমন কিছু তো করি নি ।

বিচারক । (অসীমকে) তুমি জানো ও কি করেছে ?

অসীম । ব্যবসার সমস্ত আয় সকলের মধ্যে সমান করে ভাগ করে দিয়েছে ।

বিচারক । এতে কোন্ চুক্তিটা ভঙ্গ হচ্ছে ?

চারজন । (একসঙ্গে) আঙ্কে লোয়ার কস্ট্ স্ এণ্ড হায়ার প্রফিটের চুক্তিটা ।

বিচারক । সর্বনাশ ! এ চুক্তি তো জাতির মেরুদণ্ড ! আসামী অনন্তরাম—
তোমার আজীবন কারাদণ্ড । (কলম ভাঙিয়া বাহির হইয়া গেলেন ।
মুনশীর ইঙ্গিতে দুইপাশ হইতে দুইজন পুলিস অনন্তকে লইয়া গেল)

মুনশী । আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে । ইওর অনার ফিরে এসেই
বিয়েটা দিয়ে দেবেন ।

অসীম । বিয়ে ? বিয়ে তো আর হবে না ।

মুনশী । বা রে ! আমার মিষ্টিটা—

অসীম । এই টাকায় কিনে খেও । (চারজনকে) কি রকম হল ?

চারজন । (একসঙ্গে) এমনটি কখনও হয় নি ।

অসীম । ব্যবসার কি খবর ?

চারজন । (একসঙ্গে) রেল কি চাক্কা নেহি চলে গা—

অসীম । মানে ?

চারজন । (একসঙ্গে) মানে আবার কি—ধর্মঘট ।

অসীম । চলো তাহলে ফেরা যাক ।

চারজন । (একসঙ্গে) চলো—

স্বলতা । আমি কি তোমার সঙ্গেই যাব অসীম ?

অসীম । নিশ্চয় !

স্বলতা । কিন্তু আমার দিনের আলোর অনন্ত অসীম—

অসীম । তার কথা তো শুনলে স্বলতা—

স্বলতা । কিন্তু আমার অনন্তর কথা আবার মনে পড়ছে অসীম । তোমার
সঙ্গে যাওয়া তো আমার হলো না । (প্রস্থান)

অসীম । স্বলতা—

মলিনা । আর আমি অসীম ?

অসীম । তোমাকে তো নিতে পারব না মলিনা।

মলিনা। কেন অসীম ?

অসীম । ঐ যে তুমি বললে—বিক্রিও করেছ—ভালোওবেসেছ।

মলিনা। তাহলে আমার দামটা মিটিয়ে দাও অসীম।

অসীম । নিশ্চয়। কটা দাম পাওনা আছে তোমার ?

মলিনা। খাসচাকুরে থাকাকালীন চারটের।

অসীম । এই নাও।

বড় রাস্তার ব্যবসা

অসীম । কই, এবার বোতল বার করো।

প্রথম ও দ্বিতীয়। তা না হয় করছি—কিন্তু ওদিকে—

অসীম । ওদিকে ? ওদিকে আবার কি ?

তৃতীয় ও চতুর্থ। ঐ যে বললাম—রেলকা চাক্কা নেহি চলেগী—

অসীম । মানে ?

চারজন। (একসঙ্গে) মানে—ধর্মঘট—

অসীম । ধর্মঘট ! যত সব ক্লীবের দল ! (টেবিলে আঘাত করিয়া বোতল ভাঙ্গে। পান করিয়া) লড়ায়ে আমার জিত।

এমন সময় মেঘ গর্জনের ন্যায়

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

: অনন্ত রামের—

: মুক্তি চাই—

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

অসীম । কি চাই তোমাদের ?

মলিনা। অনন্তরামের মুক্তি।

অসীম । কিন্তু মলিনা, তুমি ?

মলিনা। শুধু আমি নই অসীম, সুলতাও আছে।

অসীম । সুলতা তুমি ?

সুলতা। শুধু আমি নই অসীম—আমার সঙ্গে এরাও আছে।

: মলিনা বিক্রি করেও ভালোবাসতে পারে। তাইতো মলিনা আমাদের সঙ্গে। চীনে লণ্ঠনের আলোয় তোমার শয্যা স্থূলতার আশ্রয়—তাই সূর্যালোকের পথে সে আমাদের পতাকাবাহী।

অসীম। কিন্তু অনন্তরামের মুক্তি? সে মুক্তির মালিক তো আমি নই।

: তবু সে মুক্তি তোমাকেই এনে দিতে হবে। ও বিচারক তোমার—ও বিচারকক্ষ তোমার। ও বিচার তোমারই করা—ও রায় দেওয়াও তোমার। তাই প্রাণ দিয়েও ও মুক্তি তোমাকেই এনে দিতে হবে।

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

: অনন্তরামের—

: মুক্তি চাই—

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

(অসংখ্য লোকের মিছিল চারজনের সঙ্গে অসীমকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করিয়া দেয়। তারপর ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলের প্রস্থান। সঙ্গের চার জনের কোনো চিহ্ন নাই। মঞ্চে অসীম একা। যুদ্ধ-ক্লান্ত পরাভূত অসীম)

আলো কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে

কণ্ঠস্বর। আর সেই বিশাল প্রান্তরে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী যুদ্ধান্তে ভগ্নোরু হয়ে পড়ে রইলেন দুর্যোধন। কোথায় আজ তাঁর মিত্রেরা? কোথায় আজ তার স্বজনবর্গ? কোথায় তাঁর রাজ্য ও ধনসম্পদ? কঠিন প্রান্তরভূমি আজ তাঁর শয্যা, অনন্ত প্রসারিত অন্ধকার আকাশ আজ তাঁর চন্দ্রাতপ, হিংস্র শ্বাপদের দল তাঁর পরিচারক।

যবনিকা

শতবার্ষিকী বৎসরে আবেদন

যিনি সর্বদেশের মানুষের মহান বন্ধু, স্বাধীনতা ও বিশ্বমৈত্রীর অগ্রপথিক—সেই মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের স্বদেশবাসী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার জন্য আমরা, ভারতবর্ষের লেখক শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা, আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিউৎসবে রবীন্দ্রমেলায় সমবেত হয়েছি। যে মানুষ নিজের জোরে ও বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করেছেন, হৃদয় দিয়ে সৃষ্টির মাধ্যমে যে মানুষ মর্মজগৎ-কে মুগ্ধ করেছেন, সকল মহাদেশপরিব্যাপ্ত সেই মানুষের কণ্ঠস্বর তাঁর রচনায় প্রতিধ্বনিত। মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান নি কোনোদিন। তাঁর সেই বিশ্বাসে উদ্দীপিত আমরা এখানে সমবেত হয়ে সমস্ত মানুষের উদ্দেশেই জানাই আমাদের অভিনন্দন। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত দেশের জনগণ, আমরা আপনাদেরই অংশ, আপনারা আমাদের। আপনারাই আমাদের প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনার মহান উৎস।

আজ থেকে একশ বছর পূর্বে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই শহরে সমবেত হয়ে আমরা আপনাদের—সমস্ত দেশের লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণকে অভিবাদন করি। সৃষ্টি ও মানবপ্রকৃতির পথে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসাবে আপনাদের জানাই অভিনন্দন। শিল্প ও বিজ্ঞানের সহকর্মিগণ, আসুন আমরা শান্তি ও স্বাধীনতার ব্রতে নতুন করে আমাদের নিয়োজিত করি। কবির কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি—শান্তি এবং স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই শিল্প পায় কৈবল্য আর মানুষের ঐতিহ্য হয় নিরাপদ। আমরা ঘোষণা করি মানব উত্তরাধিকারের এই সংগ্রাম, মানবিক আদর্শপূর্তির এই যুদ্ধ, এই যুদ্ধই আমাদের যুদ্ধ, আমাদের একমাত্র যুদ্ধ, এই যুদ্ধই বরণীয় যুদ্ধ।

আফ্রিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং জনগণের উদ্দেশ্যে

'ছায়াবৃতা' মহাদেশের বন্ধু, আমরা, এই নগরী থেকে আমাদের মৈত্রীপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আফ্রিকার বন্ধুগণ, আধুনিক যুগের আলোর পথযাত্রী আপনাদের অভ্যুত্থানে আমরা উল্লসিত। ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে মুক্তিসংগ্রামে আপনারা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি, নতুন পৃথিবী রচনায় আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব, অপেক্ষা করে আছি আপনাদের জন্যে, সভ্যজগতে যে আনন্দ, উন্মাদনা এবং যৌবনোচ্ছল সজীবতা আপনারা এনে দেবেন, তার জন্যে। আপনাদের স্বচ্ছন্দ মহৎ অবদান ছাড়া এই সভ্যতা খণ্ডিত।

এশিয়ার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আপনাদের অভিনন্দিত করি এশিয়ার মহান দূত রবীন্দ্রনাথের নামে। আপনাদের শিল্পের ঐতিহ্য সভ্যতার বিকাশকে পরিপুষ্ট করেছে। আপনাদের রয়েছে মর্মলোকবিজয়ী ইতিহাস। আসুন, মানুষ এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে আমরা আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনি, মানুষ এবং তার ভবিষ্যতে রাখি আনত আস্থা। আসুন, সেই ভবিষ্যৎ আমরা নির্মাণ করি যা অতীতের এশিয়ার মতো মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর।

লাতিন আমেরিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আপনাদের ভাগ্য নতুন করে রচনা করার লগ্ন সমাসন্ন। আপনাদের স্বাধীনতা ও জাগতিক নতুন পৃথিবী নতুন নিয়তির জন্মদান করবে, নতুনতর মানবেতিহাসের সম্ভাবনাকে করবে সুনিশ্চিত। সেই সঙ্গে আপনাদের এই ইতিহাসরচনার আনন্দ, গৌরব ও মহান দায়িত্বভার আমরাও গ্রহণ করছি।

ইওরোপ এবং উত্তর আমেরিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আধুনিক ইতিহাস এবং মুক্তি ও সাম্য, মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার বার্তাবহ আধুনিক মানবতাবাদের জয়পতাকা উত্তোলনের গৌরব আপনাদের রয়েছে। এই শক্তি নিয়ে আপনারা পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলির সঙ্গে আরও এগিয়ে চলুন, এই আবেদন করি। আমাদের মহান রবীন্দ্রনাথের প্রিয় স্বপ্ন তাহলেই সার্থক হবে।

সর্বোপরি পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবী, কর্মী এবং জনগণ, আপনাদের প্রতি আবার আমাদের আবেদন এই, যে-ধ্রুব মন্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু শরণ্য, সেই মন্ত্রই হোক আমাদের পথের দিশারী। আসুন, মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের গুরুদেবের এই মানসিকতায় প্রণোদিত হয়ে আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিবাহী বর্তমানের জন্য, শিল্পীর ব্রত পালনের জন্য এবং যুদ্ধহীন মুক্ত শান্তির পৃথিবীর জন্য আত্মনিয়োগ করি।

শান্তি, শান্তি, চিরশান্তি।

পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব ও মেলার সমাপ্তি অধিবেশনে (১২ই নভেম্বর ১৯৬১) সারা বিশ্বের লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণের প্রতি এই আবেদনটি গৃহীত হয়। মূল ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছেন শিবশম্ভু পাল। —সম্পাদক

পুস্তক পরিচয়

দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ ॥ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সাড়ে ছয় টাকা ॥

পত্রলেখার বাবা ॥ সতীনাথ ভাদুড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চার টাকা ॥

সান্নিধ্য ॥ চিন্তামণি কর। ত্রিবেণী প্রকাশন। চার টাকা ॥

আলোচ্য তিনটি বইয়ের মধ্যে প্রথমটি উপন্যাস, দ্বিতীয়টি ছোটগল্পের সমষ্টি ও তৃতীয়টি স্মৃতিকথা। কিন্তু স্মৃতিকথা হলেও শেষের বইটিকে প্রায় কথাসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কেননা এই বইটির বিশিষ্ট রস প্রায় পুরোপুরি কথাসাহিত্যের।

এই তিনটি বইয়ের মধ্যে আরও একটি সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি বইকেই বলা যেতে পারে পোর্ট্রেট-গ্যালারি। নানা জাতীয় লোকের ভিড়ে এই তিনটি বই ঠাসা—অন্তত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বইটি।

বিশ্ববাবুর বইটিতে মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। কিন্তু তারা প্রায় সকলে একই ছাঁচে ঢালা। প্রথমত এরা সকলেই যুবক-যুবতী; দ্বিতীয়ত দেশোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করে নানা দুঃসাহসিক কাজে শুধু লিপ্ত নয় ক্ষিপ্তপ্রায়। তৃতীয়ত, বিচিত্র বিপদের সম্মুখীন হলেও কোনো-এক অদৃশ্য জাদুকরের আশীর্বাদে বিপদের স্পর্শ এরা সর্বদা এড়িয়ে চলে। এর পর বোধহয় এ কথা বলা বাহুল্য যে, যেহেতু এরা যুবক-যুবতী অতএব এদের পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণ কিঞ্চিৎ প্রবল। কিন্তু তবু এদের মিলন হয় না অর্থাৎ উপন্যাসটির পরিসরের মধ্যে। এই পরিসর নিতান্ত সামান্য নয়। স্মলপাইকায় ছাপা ডিমাই সাইজের চারশো তিন পাতা। আরো মাত্র দু-চার পাতা বাড়লে যে মিলন হত লেখক সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা যদিও সশস্ত্র পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ থেকে এরা অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পায় তবু শেষপর্যন্ত এইসব ঝামেলা বরদাস্ত করবার মতো শক্তি বা প্রবৃত্তি এদের কারও নেই। অতএব শেষপর্যন্ত এইসব দুঃসাহসিক

যুবক-যুবতীর নেতার বিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে স্বদেশ উদ্ধারের প্রশস্ততম উপায় জাহাজে চড়ে বিদেশে পলায়ন। এবং জলপথে নায়কনায়িকার মিলন। এর ব্যতিক্রম দু-একটি আছে, তা অতীব শাস্ত্রীয় এবং সে শাস্ত্র হল কামশাস্ত্র।

বইটির নামকরণে লেখক বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন—আর কোথাও নয়।

'পত্রলেখার বাবা' ও আরও আটটি গল্প নিয়ে দ্বিতীয় বইটি রচিত। এই নয়টি গল্পে এমন-সব নরনারীর সাক্ষাৎ মেলে যারা এই পৃথিবীরই লোক বলে মনে হলেও মাঝে মাঝে যেন একটু সন্দেহ হয় কেননা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এদের খাপখাওয়ানো একটু শক্ত। বাস্তব জগতের বাইরে না হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে এদের জীবনযাত্রা। সতীনাথবাবু জাগরীর জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এরপর মনে হয় যেন আরও কিছুদূর এগোলে তাঁকে ভিড়তে হবে সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন যাঁরা—তাঁদেরই দলে। কেননা বাংলা কথাসাহিত্যের পুরোনো ধারা নিঃসন্দেহে শুকিয়ে এসেছে—আর তাই তাগিদ এসেছে নতুন পথের সন্ধানের, যার ফলে হচ্ছে কিছু সৃষ্টি আর কিছু অপসৃষ্টি। এই তাগিদে প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লোকেরা যদি তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা করেন তাতে ক্ষতি কী?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন অন্তত একটি উপন্যাস প্রায় প্রত্যেক লোকেই লিখতে পারে। 'সান্নিধ্য' উপন্যাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু একটু এদিক ওদিক করে এরই মালমশলা নিয়ে একটি রীতিমত উপন্যাস লেখা যেতে পারত মনে হয়। বহুদিন আগে এই 'পরিচয়' পত্রিকাতেই রাখালচন্দ্র সেন 'সহযাত্রী' বলে একটি গল্প লিখে আমাদের চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন—এরকম গল্প আর কখনো পড়ি নি—বাংলাসাহিত্যের সত্যিকারের নতুন সৃষ্টি। অনেকেরই মনে হয়েছিল এটি গল্প নয় সত্যিকারের কাহিনী।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি করের 'সান্নিধ্য' পড়ে বার বার মনে পড়েছে সেই 'সহযাত্রী' গল্পটির কথা।

লেখক প্রখ্যাত শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষার জন্যে আড্ডা গেড়েছিলেন প্যারিস শহরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে। সে-সময়ে তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছিল নানাদিগ্‌দেশাৎ আগত বিচিত্র সব নরনারী। তাদের মধ্যে কেউ-বা

এসেছিল স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের থেকে পালিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে, কেউ-বা পূর্ব-ইওরোপ থেকে প্যারিসে বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যালয়ের আকর্ষণে।

এদের মধ্যে অনেকেই ছিল তরুণ-তরুণী। সুতরাং মন দেওয়া-নেওয়ার অবকাশ ছিল প্রচুর। এই টানাপোড়েনের মাঝখানে থেকে লেখক এদের নাড়ীর স্পন্দন যা অনুভব করেছিলেন বইটিতে দিয়েছেন তারই বিবরণ। এই বিবরণ শুধু মর্মস্পর্শী নয়, অনেক জায়গায় হয়েছে মর্মান্তিক। কেননা পরিবেশ ছিল শুধু রোমান্স নয় ট্র্যাজেডির উপযোগী।

এইরকম কাহিনীতে পলিটিক্স এসে পড়া অনিবার্য। এবং তা এসে পড়লে কোনো খাঁটি লেখক নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে। এমন কথা কিছু আছে এই বইটিতে যা 'পরিচয়'-এর অনেক পাঠক-পাঠিকার আছে অপ্রীতিকর বা অস্বস্তিকর লাগতে পারে।

চিন্তামণিবাবু যে খাঁটি কথাশিল্পী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-রকম বই কি তিনি আর একটিও লিখতে পারবেন ?

হিরণকুমার সান্যাল

রানীপালঙ্ক॥ বিজন ভট্টাচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। আড়াই টাকা॥

রাজনৈতিক ভূগোলের বিচারে অবশেষে বাঙলাদেশ দুটি ভাগে বিভক্ত হল, এবং ঢাকা-নবাবনগরের দক্ষদারুশিল্পী যোগীবরকে এসে উঠতে হল কলকাতার কোনো এক উদ্বাস্তু কলোনীতে। সঙ্গে রইল গ্রামসম্পর্কের লোকজন, নিজের সংসার ও অখণ্ড বাঙলার গাঙ-দরিয়ার খোলা মেজাজ।...কিন্তু নিজেকে যোগীবর মেলাতে পারে না এই নতুন কলোনী জীবনের অহেতুক, আরোপিত দারিদ্র্যে। আর তাই পদ্মার নাম তার মুখে আসে না, বলে—কালীদহ। বলে, "কালীদহ-ই তো, পদ্মা তো কমু না মুখে। হেই কালীদহেই না ডুবাইয়া আইলাম বেবাক স্বপ্ন সাধ।"...তথাপি রাত্রের কলোনীর উপর ভাড়াটে গুণ্ডার পাশবিক আক্রমণে, এবং দিনমানে শহর কলকাতার স্বর্ণমারীচের ডাকে ক্রমে ছত্রভঙ্গ-হয়ে-যাওয়া উপনিবেশের মানুষগুলোকে সে আবার জড়ো করে, জমিয়ে তোলার চেষ্টা করে। আশার কথা শোনায়। কিন্তু শান্ত জীবনের কথা শোনবার কান তখন আর নেই তাদের। ক্ষতবিক্ষত হয়ে হয়ে ততদিনে তারা 'গেরিলা' হবে স্থির

করেছে, অর্থাৎ গেরিলাযুদ্ধে একবার নেবে দেখবে বাঁচার এই লড়াই জেতা যায় কি না। আর অবশিষ্ট একটা অংশ আপোসে উঁচুমহলের চাবুকের তলায় আত্মসমর্পণ করেছে।—এই দুইদিকের দোলাচলে অভিজাত কাঠের কারিগর বৃদ্ধ যোগীবর সূত্রধর চিন্তিত হয়ে পড়ে। এবং আকস্মিকভাবে, একদিন, প্রায় সরাসরি ঐ অসুস্থ অক্ষম শরীরেই বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে। আপোসে সে রাজি নয়। কাজ সে পায়, এক কাঠের কারখানায়। কিন্তু তার ভিতরকার শিল্পীর সূক্ষ্মতা এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নির্মমভাবে আহত হয়। যোগীবর তবু সংসারে সুস্থতা আনবার চেষ্টায় অমানুষিক পরিশ্রম করে যায়। অতঃপর অসুখে পড়ে সে। এবং মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্নের মতো ভেসে আসে তার নিজের প্রথমজীবনের অপরূপ সৃষ্টি 'রানীপালঙ্ক'-র স্মৃতি, আচ্ছন্ন দৃষ্টির উপর দিয়ে বয়ে যায় সেই একতারা গ্রামের নদী—যার ঢেউয়ে নৌকায় "গোটা একটা ঝাড়লণ্ঠনের" মতো আলোয়-আলো ঐ রানীপালঙ্ক সে উপহার পাঠিয়েছিল "বড় রায় জগৎকিশোরের মেয়ের বিবাহবাসরে।" লেখকের বর্ণনায়—"উত্তাল তরঙ্গমালার ওপর দিয়ে ঢলকাতে ঢলকাতে, নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে সেই স্বর্ণ অতীত।" যোগীবরের স্ত্রী সৌরভা এই চোখের ভাষা আন্দাজে বুঝতে পারে, "মেঘনা আর পদ্মার বুকে পাহাড়ের মতো কালো কালো গয়নার নৌকোগুলো যখন আকাশ-গঙ্গা থেকে মর্ত্যের নদীর বুকে নেমে আসে, তখন এমনি করেই দেখতে হয় সেই নৌকো।" রানীপালঙ্কের কারিগর মৃত্যুশয্যায় শেষবারের মতো "তৈরি হয়ে নিল" সমৃদ্ধ যৌবনকালের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।...আরো বড়ো ঢেউয়ের থেকে বাঁচবার জন্য বোধকরি জীবনের দামে "তৈরি হয়ে নিল" ঢাকা-নবাবনগরের কাঠের যাদুকর যোগীবর সূত্রধর।

প্রসঙ্গত জানানো দরকার, 'রানীপালঙ্ক'-র যাবতীয় সংলাপ লিখিত হয়েছে বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষায়; অর্থাৎ ওখানকার মাটি-নদীর সকল সৌরভ সহজেই গ্রন্থটিকে পূর্ববঙ্গের মাধুর্যে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে (এবং সেদিক থেকে আমরা তাঁর 'নবান্ন'-র স্বাদ আবার পেলাম)। কিন্তু, যারা 'গেরিলা' হবে বলেছিল, তাদের কথা আর জানা গেল না কেন? অবশ্য পরিবর্তে, আমরা যোগীবরের ক্রমপরিণতি অনুধাবন করলাম, তবু দুঃখের দাহনে নিরুপায়ভাবে পুড়ে মরাটাই কি সত্য? তদুপরি, 'রানীপালঙ্ক' একটি আধা-যন্ত্রণা-বিলাস জাতীয় আচ্ছন্নতা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেছে,

যেটি অন্তত এই গ্রন্থে কাম্য ছিল কি? এবং নানা স্থানে 'নাট্যকার' বিজন ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এই উপন্যাসের আঙ্গিক সাফল্য কিছু কিছু খণ্ডিত হয়েছে মনে হল (যদিও ৫০-৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত শাণিত গৃহবিবাদটির নাটকীয়তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অবিকল। ঐ দৃশ্যটির মর্মান্তিক তীক্ষ্ণ বাস্তবতা এখনো যেন চোখে লেগে আছে)।

বক্তব্যের প্রয়োজনে উপন্যাসটির কোনো-কোনো স্থূলতা তবু অক্লেশে অগ্রাহ্য করা যায়। কেননা, 'রানীপালঙ্ক'-এ সময়োচিত mass literature-এর সবল লক্ষণগুলি আংশিকভাবে বর্তমান, মনে করি। এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে পারি, একতারা গ্রামের ঐ সুদূর করুণ "লাউগাছটিকে" আমরা চিনি।···

বিজনবাবুর এই উপন্যাস প্রচেষ্টায় ও বিষয়মহিমায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অতলান্ত ॥ ব্রজেন মজুমদার। দেড় টাকা॥

রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির ওপর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনকে অবলম্বন করেও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের দীর্ঘ পটভূমিকা থেকে নাটকীয় একটি মুহূর্তকে বেছে নিয়ে স্বল্প পরিসরে নাট্যরূপায়ণ কদাচিত দেখা গেছে। কথোপকথনের ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-জীবন-কাহিনী বর্ণনার প্রয়াস যে একেবারে হয় নি, তা বলা যায় না। কিন্তু সেগুলি নাটক নয়।

'অতলান্ত' নাটকের স্বল্প পরিসরে পাঞ্জাবের তথা ভারতীয় উপনিবেশ ভূমিতে ইংরেজ সরকারের দুর্দমনীয় ও অনপনেয় কলঙ্ক-চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু এই কলঙ্ক-চিত্রের বীভৎসতার চেয়েও বাংলাদেশের রাজনৈতিক কলঙ্কের চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলাই বা বলি কেন, তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিকের মানস পটভূমি চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। নাটকের কেন্দ্রীয় নাট্যিক মুহূর্ত যদি কিছু থাকে, তাহলে 'অতলান্ত' নাটকের এটিই কেন্দ্রীয় ও চরম মুহূর্ত।

ইংরেজের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজীকে সঙ্গে করে বিনা অনুমতিতে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবেন বলে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন, লেভিকে দিয়ে এই সংবাদ তিনি প্রেরণ করলেন। কিন্তু গান্ধীজী লেভির মারফৎ জানিয়েছেন যে তিনি এখন ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চান না।

গান্ধীজীর কাছে রবীন্দ্রনাথের সকল আশা চুরমার হয়ে গেল। এরপরে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন বাংলাদেশের দেশহিতৈষী নেতাদের সাহায্যে পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক সভা আহ্বান করবেন, এই উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে সংবাদ পাঠালেন। চিত্তরঞ্জনও এখন সভা ডাকতে নারাজ, মুখে আপত্তি জানালেন যে সভাপতি হবার মতো কেউ নেই। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ জানালেন সভাপতির জন্যই যদি সভা ডাকা না যায়, তাহলে তিনি নিজেই সভাপতি হবেন। "এ কিন্তু সব আপনার দায়িত্বে, আমাদের কিছু নেই এতে" এই বলে দেশবন্ধু বেরিয়ে গেলেন।

রাজনৈতিক লীলার ও মানসিক সংকটের দ্বন্দ্বে পড়েই রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা অত্যুচ্চ শীর্ষতায় আরোহণ করেছে। যৌবনে একদা গান রচনা করেছিলেন, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে", সেই বাণীকেই শিরোধার্য করে মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ অতন্দ্র রাত্রির ভয়ংকর জ্বালামুখিতা সহ্য করে, ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করলেন। ইংরেজের ব্যবহারের ও নীতির তীব্র ভর্ৎসনা করে বজ্রগম্ভীর স্বরে জানালেন মানব-সত্যের পটভূমিকায় এ অন্যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মানব-প্রেমিক ও স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মহনীয়তা চমৎকার উদ্‌ভাসিত হয়েছে।

নাটকের এই কেন্দ্রীয় মুহূর্ত শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছে। এর পূর্বে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের হাস্য পরিহাসিকতা, নাচে গানে নাটকের মাধ্যমে তাঁর আনন্দসত্তার প্রকাশ হয়েছে। এর ফলে পূর্বাংশ অত্যন্ত শ্লথ মন্থর। অন্য চরিত্রগুলিও যথাযথ ব্যক্ত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের বাগভঙ্গি ও রীতিকে যথাযথ ধরবার চেষ্টা করেছেন, তবে 'সাথে'র ব্যবহার বেমানান। আর অনেক চরিত্র এখনও জীবিত, তাঁদের সঙ্গে আমরা পরিচিত, নাটকে তাঁদেব উপস্থাপনা নাট্যরসেব অন্তরায় ঘটায় যখনই নাটকের ও বাস্তবের মানুষের তুলনা করি। এবং রবীন্দ্রনাথও এত কাছের মানুষ যে তাঁকে নিয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি কল্পনা করতে বাধে। ফলে নাট্য-রূপায়ণের দিক থেকে বাধা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ 'অতলান্ত'-র অতলান্ততা পাঠের আস্বাদনে, নাট্যশিল্পের যাথার্থ্যে নয়। তবু, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে এই মহান পুরুষের মানবিক অনুভূতি সর্বমুক্ত মানব-হৃদয়ে অনন্ত সত্তার সংবেদনা সৃষ্টি করবে।

বার্ণিক রায়

প্রসঙ্গক্রমে

সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার নব-জাগরণের চরিত্র সম্বন্ধে 'পরিচয়'-এ যে পুনরায় আলোচনা শুরু হয়েছে—তা দেখে আনন্দিত হলাম। মনে পড়ছে ১৯৪৯-এ কতকটা এ ধরনের বিষয় নিয়েই আলোচনা চলেছিল—নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা' এ-ব্যাপারে উজ্জ্বল স্মারক। আজ রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে আবার সেই আলোচনা উঠেছে—তাই সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে সাধারণভাবে কিছু ব্যক্তিগত মতামত জানাচ্ছি।

সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি, বাংলার নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে। কথাটির সত্যতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। সত্যিই বাংলার নবজাগরণ হয়েছে বুর্জোয়া শিক্ষা দীক্ষায়। কিন্তু কথা হল—"আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্যহীনতা, একঘেয়েমি"—"অতি দীর্ঘায়িত সামন্ত যুগের মন্থরতার প্রতিলিপি", উনিশ শতকে তার যে আমূল রূপান্তর দেখা গেল, তা কি শুধুমাত্র শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থাৎ ভাবজগতে? বাংলার নবজাগরণকে আমরা বলে থাকি পুরোপুরি উপরিতলের ব্যাপার—'বাবুকাল্চার'। যে বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষায় নবজাগরণ হল একটি পরাধীন উপনিবেশে—তা "মাটি থেকে রসগ্রহণ নয়, আকাশের সূর্যালোকের দিকে দুবাহু মেলে দেওয়া?"—একথা মেনে নিয়েই শ্রীসুশোভন সরকার বা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন। কিন্তু একথা মানতে আমার আপত্তি আছে। মার্কসবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে "যেমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের অভিমত সেই ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ধারণার ওপরে নির্ভর করে না, ঠিক তেমনি একটি রূপান্তরের যুগকে আমরা সেই যুগের নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করতে পারি না। পক্ষান্তরে, এই চেতনাকেই আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের স্ববিরোধের আলোকে, উৎপাদনের সামাজিক শক্তি সমূহ এবং উৎপাদনের সম্পর্ক সমূহের মধ্যে প্রচলিত সংঘাতের আলোকে।"

আমরা ঠিক এর উল্টো পথেই চলেছি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দ্বৈত রূপ ও তার চরিত্রের দিকে নজর না দিয়ে শুধুমাত্র ইডিয়লজির ক্ষেত্রে পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের দ্বন্দ্ব নিয়ে তর্কাতর্কি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা নয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মার্কসের ১৮৫৩ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মার্কস দেখেছিলেন ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে কলকাতায় ইংরেজের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছায় ও কৃপণভাবে শিক্ষিত হয়ে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে, যারা ইওরোপীয় বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত, সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন। নিঃসন্দেহে এঁরাই হলেন বাংলার নবজাগরণের প্রতিভূবৃন্দ। এবং এই কথাটির কিছু পরেই মার্কস লিখেছেন, "সেদিন দূরে নয় যখন রেলপথ ও বাষ্পীয়পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা রূপকথার দেশটা এইভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কস অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। করতেন লেনিনও। অল্পাধিক দূর ভবিষ্যতে এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির যে পুনরুজ্জীবন ঘটবে—এ বিশ্বাস তাঁদের দুজনেরই ছিল। কিন্তু এই "পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্তর্ভুক্তি"র অর্থ কী?

আমরা জানি, ইতিহাসে বুর্জোয়াসি কী বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছে। তারা পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকেও সভ্যতার, অর্থাৎ বুর্জোয়া হবার, আওতায় টেনে আনে, এক কথায় নিজের ছায়া (ইমেজ)-রই তারা একটি জগৎ গড়ে তোলে। জাতির বিচ্ছিন্নতা ও আত্মনির্ভরতার জায়গায় আসে বিশ্বের সকল জাতির পরস্পর নির্ভরতা। ভারতে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা পুরাতন এশীয় সামন্তবাদের জায়গায় আনল নতুন পুঁজিবাদ—যার জন্মস্থান ইওরোপ। আর ভারতে ইতিহাসের অচেতন যন্ত্ররূপে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কঠিন আঘাত হেনে, ভারতকে তার অতীত ঐতিহ্য এবং তার সমস্ত অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক করে দিল। শিল্পের কেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত করে, পূর্বতন বংশগত সম্পর্ক বা গৌরবের বদলে কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রচলন করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকেই পাল্টে দিল ব্রিটিশ বুর্জোয়াসি।

আমার তো মনে হয়, এই হল বাংলার নবজাগরণের যথার্থ পশ্চাৎভূমি। এই ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রামমোহন দেখেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া ভারতীয়

সমাজের জাড্য ভাঙা সম্ভব নয়। বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। জন স্টুয়ার্ট মিলের মূল 'সিসটেম অফ লজিক' সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য পুস্তক করেছিলেন তিনি। বোঝেন নি কে ?

কিন্তু পরাধীনতার পাশে থেকে মন কী তৃপ্ত হয় ? বরং নিজেদের গ্রহণ শক্তি দিয়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে বিচরণ করে মন শুধু অতৃপ্তিতেই ভরে ওঠে। পশ্চিমের এত আছে, আমাদের কী কিছুই নেই ? রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, "হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে, সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে ? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে ?"

এ-আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু যেখানে "আমরাই বা কীসে কম ?" এ-ভাব এসেছে—সেখানেই হয়েছে মুস্কিল। পরাধীনতার অধীনে থেকে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকাহিনী অনেকের কাছে মহান বলে ঠেকেছে। ঠেকেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছেও। এবং চিরপ্রগতিশীল রবীন্দ্রনাথও অনেক সময় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। ভারতবর্ষের আত্মীকরণ শক্তিকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ থেকে বিশ্বের ত্রাণকর্তার জন্ম হবে—এ বিশ্বাসকে প্রতিক্রিয়াশীল বলছি না। স্বদেশী যুগের হাওয়ায় তিনি যখন ভেসে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি "আমাদের সব ভালো, ইংরেজদের সব খারাপ" ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু তাই চূড়ান্ত নয়। "উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাই নি", এ যেমন তাঁর স্বীকৃতি তেমনি বৃদ্ধ বয়সে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে তিনি বলেছিলেন, "গদ গদ সেন্টিমেন্টালিসম্-এ ভারাক্রান্ত সে আবহাওয়া ক্রমে আবিল হয়ে উঠল, ধিক্কার এল মনে। সব বক্তৃতা দিতে উঠতেন—মাটি তো নয়, যেন মা'টি, কেঁদে ভাসায় আর কী। অসহ্য হয়ে উঠত আমার। কিছুতেই মিলতে পারলুম না। একটা সত্য আদর্শের দ্বারা চালিত, সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠ, সবল চরিত্র আমাদের দেশে একেবারে বিরল। সে সময়ে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল, যখন দেখলুম কত মৌখিক কত ব্যর্থ এসব গদগদ বক্তৃতা"—বস্তুত যে শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের হলো, সেই শিক্ষাই তাঁকে একদিন প্রাচ্যাভিমানের বিরুদ্ধে লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল—"অন্তরের গভীরতায় অনেকদিন থেকে আছে ইউরোপের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা, তার পরিবর্তে কোনো মূল্য না পাওয়াতেই একেবারে উল্টো দিকে দৌড় মেরেছে। বলে বসে, ওরা

বিদ্যে ভালো না, বুদ্ধি ভালো না, চরিত্র ভালো না—আমাদের যা কিছু সবই ওদের চেয়ে অনেক ভালো। সাংখ্য দর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্য থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণশক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্র মাত্র হয়ে রয়েছে।" রবীন্দ্রনাথও একদিন উল্টো দিকে দৌড় মেরেছিলেন, কিন্তু সে এক বিশেষ পর্বে—দেশের ভাবালু আবহাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত তিনি ওভাবে কোনো দিনই আর চিরন্তন আদর্শকে যুগোপযুগী করে তোলার চেষ্টা করেন নি, বরং partisan রূপেই লিখেছেন "বর্তমান যুগে ইউরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় ইউরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্ত জাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা! ইউরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়—তাকে স্বকীয় করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সহিত্য, ইউরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাঙলা দেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা।" (সাহিত্যের পথে)

এত বড় কথা যে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, তা কী শুধু প্রলাপ? তাঁর পায়ের তলায় কি ছিল না শক্ত মাটি? ছিল। জার্মান সাহিত্যের যখন স্বর্ণযুগ, তখন—এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন—জার্মানির অবস্থা "ছিল পুতিগন্ধময় ন্যক্কারজনক অবক্ষয়ী। কিন্তু তখনই জন্মেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন গ্যয়টে ও শীলার, ক্যাণ্ট ও ফিক্‌টে, এবং শেষতঃ হেগেল।" ভারতে যখন সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ছে, ধনতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে বিকৃতভাবে, একপেশে হয়ে—তখন সাহিত্যে শিল্পে যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বাঙালী মনের তাকে শুধুমাত্র পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের দ্বন্দ্ব বলা সঙ্গত নয়। এর ভিতরে রয়েছে পুরাতন সামন্ততন্ত্রীয় ছাপ এবং সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান ধনতন্ত্রীয় চিহ্ন। গ্যয়টে বা শীলারের নাটক কী আমরা অবক্ষয়ী সাহিত্য, সুতরাং উপযুক্ত ভিত্তিভূমি নেই, বলে উড়িয়ে দিতে পারি? তা কখনই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবেই উনিশ শতকের নবজাগরণ বিচারে আমাদের দেখতে হবে—বিকৃত ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। তাই হবে যথার্থ নবজাগরণের চিত্র॥

একটি প্রস্তাব

শম্ভুনাথ দাস

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমাপ্ত প্রায়। এক বছর ধরে নানা গুণীজন নানা দিক থেকে কবি সম্বন্ধে নানাকথা বলেছেন। রবীন্দ্রচর্চার সূত্রপাত আগে থাকতে শুরু হলেও এই বছর কবি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে কবির বাণী সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে পৌছেচে। আলোচনায় কবির বাণী নানাভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কবির উদ্ধৃতি সঠিকভাবেই হোক এটা সবারই কাম্য এবং একান্ত প্রয়োজন। কবির মুখে সামান্যতম শব্দের অপপ্রয়োগ অন্যায়। বিশেষতঃ যে সমস্ত ব্যক্তির উপর সমাজের লোকের আস্থা আছে, তাঁদের রচনায় এই ধরণের বিচ্যুতি নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। উদাহরণ-স্বরূপ বাঙলার অন্যতম বিদগ্ধ সমালোচক গোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' সংকলনটির কথা বর্তমানে আলোচ্য। এর মধ্যে চিন্মোহন সেহানবিশ-এর 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান রচনা আছে। কবির জীবনে আন্তর্জাতিক চিন্তার শুরু থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবর্তনের মাধ্যমে এর ক্রমবিবর্তন ধারার সঠিক পরিচয় সার্থকভাবেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু রচনাটির মধ্যে কবির মুখে এমন কতকগুলি শব্দ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার সন্ধান আমরা কোথাও পায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত সাফল্য সম্বন্ধে কবির অন্তিম উক্তি "ওরাই পারবে, দানবকে ঠেকাতে পারবে।" (পৃঃ ২৩৮) চিন্মোহনবাবু বিশ্বভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রশান্তবাবুর প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশান্তবাবুর উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

" "...রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] ছিল গভীর আস্থা"...যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা : "রাশিয়ার খবর বলো"। বললুম "একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে," মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "হবে না ? ওদেরই তো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।" " "(বি. ভা. ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৫০। পৃঃ ১৬৩) অর্থাৎ কবির মুখে "ওরাই পারবে" টুকুই আছে। এরপর "দানবকে ঠেকাতে পারবে" এই বাড়তি শব্দগুলো কেন চিন্মোহন বাবু বসিয়ে দিলেন ?

নির্মলকুমারী মহলানবিশ তার 'বাইশে শ্রাবণ'-এ এই দিনের ঘটনা নিম্নরূপে বর্ণিত করেছেন।" "৩০শে জুলাই [১৯৪১]...আমরা ঘরে ঢুকে সামনে যেতেই বললেন "কিহে প্রশান্ত আজকের কাগজে যুদ্ধের খবরটা কি?" উনি বললেন—একটু যেন খবর ভালো। আজকের কাগজ পড়ে তো মনে হচ্ছে যে, রাশিয়ান সৈন্য জার্মানদের একটু ঠেকাতে পেরেছে। অত তাড়াতাড়ি আর এগোতে পারছে না। শুনে কবির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বললেন, "পারবে, পারবে, ওরাই পারবে। ভারি অহঙ্কার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং, গোয়েরিং এখন দেখুক গোয়েরিং কী হয়। দুশমনরা।"" (দেশ ১২ই মার্চ, ১৯৬০। পৃঃ ৪৫১।৫২)

ইলিয়া এরেনবুর্গের কাছে প্রশান্তবাবু কবির এই একই কথাই বলেছেন··· "I knew the Russians will stop them···" (On Tagore—Ilya Ehrenburg in In Homage to Tagore pp. 74)

দেখা যাচ্ছে কোথাও "দানবকে ঠেকাতে পারবে" কথাগুলো নেই। উদ্ধৃতি করার মধ্যে কবির মুখে এই ধরণের শব্দ বসানোর কারণ কি? চিন্মোহনবাবুর রচনাটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন হীরেন্দ্র মুখার্জি এবং সম্পাদনা করেছেন সুশোভন সরকার। এঁদেরও কি দৃষ্টি এদিকে পড়েনি?

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণ (১৯২৬) কবির জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা, এসম্বন্ধে আলোচনা খুবই কম। কবির ভ্রমণসঙ্গীরা এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করে সেই অধ্যায়টি কিছুতেই জনসমক্ষে আনতে চান না। এই প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য আছে। তার আগে এই ভ্রমণকালে ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে কবিকে সচেতন করিয়ে দেন বিশ্বের অন্যতম শিল্পী রঁম্যা রঁলা। তাঁর একখানা চিঠি থেকে চিন্মোহনবাবু কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেটাও যথাযথ হয়নি এবং কোথা থেকে তিনি এটা সংগ্রহ করেছেন সেটাও ঠিক বুঝলাম না। চিন্মোহনবাবুর উদ্ধৃতি "···I am more solicitous of your glory than of your repose. I did not like it that the monsters should be able to abuse your name in history....The future will show you that I have acted as a vigilant and faithful guardian—"(pp. 226)।

রোঁলার চিঠিগুলি বিশ্বভারতী থেকে Rolland and Tagore বইতে

প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৫ সনে। এর আগে Alex Aronson তাঁর 'Rabindranath through western eyes' বই-এর মধ্যে ঐ চিঠিখানা নিজে অনুবাদ করে 'impublished letter' বলে প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৪৩ সনে। উদ্ধৃতিটি এইভাবেই পাওয়া যাচ্ছে…"However, I had no other interest in my mind but your glory, which I value more than your rest. I did not want devils misusing your sacred name in the annals of history…the future (the present already) will show you that I have acted as your faithful and vigilant guide." (Page no 67 of Rolland and Tagore, page 78 of Rabindranath through western eyes—by Alex Aronson এবং রবীন্দ্র জীবনী ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০৮)। চিন্মোহনবাবু উক্ত উদ্ধৃতি কোথায় পেলেন ? 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিঠি পৃষ্ঠা ৪৫'-এর কোনো অর্থ বুঝলাম না। হীরেনবাবু চিন্মোহনবাবুর বই থেকে তাঁর 'Himself a true poem' বইতে এই ভুল উদ্ধৃতিটাই দিয়েছেন (দ্রঃ pp 121)। চিন্মোহনবাবুর রচনাটিও ইংরাজিতে পুস্তিকাকারে বেরিয়েছে ; 'Tagore and the world' নামে। এই ধরণের ভুল উদ্ধৃতি কবি সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তি আনবে। তাই আশা করি চিন্মোহনবাবু তথা সম্পাদক গোপাল হালদার মহাশয় এবিষয়ে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করে ভ্রম সংশোধনের ব্যবস্থা অবিলম্বে করবেন।

দুই

চিন্মোহনবাবুর রচনায় কবির ইতালী ভ্রমণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কবির আন্তর্জাতিক চিন্তার একটা মোড় এই ইতালী ভ্রমণকালেই ঘুরে যায়। ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে—রোঁমা রঁলার সহায়তায়—কবি প্রথম উপলব্ধি করেন। কিন্তু কবির সেই ভ্রমণকথা, সেই উৎকণ্ঠিত দিনগুলির বিবরণ এখনও কেন প্রকাশ করা হল না ? এবিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া দরকার এবং বিশ্বভারতী তথা প্রশান্তবাবুর নীরবতা ভঙ্গ করার প্রয়োজন আছে।

নির্মলকুমারী মহলানবিশ-এর 'বাইশে শ্রাবন' থেকে জানতে পারি—"আমরা ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন য়ুরোপে ঘুরেছিলাম, তখন দেশে এবং বিদেশে কবিকে নিয়ে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইতালি গিয়েছিলেন বলে শুধু নয়, তিনি ইতালি থেকে বেরিয়ে গিয়ে

মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বলে। বিদেশে বিক্ষোভ হয়েছিল তিনি মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য, আর স্বদেশে বিরুদ্ধ সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি আতিথ্য ভোগ করার পরে মুসোলিনীর নিন্দা করে অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে।"

"আমার স্বামী জানতেন এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের গুরুত্ব কতখানি, তাই তিনি আর রথীবাবু—বিশ্বভারতীর যুগ্মকর্মসচিব—খুব পরিশ্রম হলেও প্রতিদিনকার বৃত্তান্ত যতটাসম্ভব ধরে রেখে প্রত্যেক সপ্তাহের ডাকে বিশ্বভারতীর বুলেটিনে ছাপাবার জন্যে দেশে পাঠিয়ে দিতেন। লিখতেন বেশীর ভাগই আমার স্বামী (অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) আর রথীবাবু টাইপ করতেন।"

"কিছুদিন পরে রথীবাবু শারীরিক কারণে কবির কাছ থেকে অনেকদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন আমরা দুজনে মিলে কত পরিশ্রম করে সেসব লেখা দেশে পাঠিয়েছিলাম তা কেন ছাপা হয়নি জানি না। বিশ্বভারতী পরিচালনার ভার তখন যাদের হাতে ছিল, একথার জবাব তারাই শুধু দিতে পারবেন। কিন্তু আমরা এক বছর পরে দেশে ফিরে শুনলাম, সে সব কাগজপত্র বিশ্বভারতীর আপিস ঘর থেকেই কোথায় হারিয়ে গেছে।"

"প্রশান্তচন্দ্র সে সব লেখার কোন কপি করে রাখার সময় পায়নি। ...আমি ঘুরতে ঘুরতে যে সব চিঠিপত্র সেই সময় আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে লিখেছিলাম আমার স্বামী সেগুলো সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে, তার উপর ভর করে আবার একটা ছবি দাঁড় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তখনও তিনি বিশ্বভারতীর কর্মসচিব। তাই বিশ্বভারতীর আপিসের দেরাজের মধ্যেই এই গোছাকারে সাজানো আমার চিঠিপত্রের ফাইলটা রেখেছিলেন—সময় পেলে লেখাটা আরম্ভ করবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলেন সেই ফাইলটাও কোথায় অন্তর্ধান করেছে।...এই চিঠিগুলোও যে কেমন করে হারিয়ে গিয়েছিল সে একটা রহস্য।...হঠাৎ একদিন প্রবাসী খুলে দেখলাম তিনি [রবীন্দ্রনাথ] শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দুঃখ করে চিঠি লিখেছেন যে, ১৯২৬ সালে য়ুরোপে ভ্রমণ কালে যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিলেন এবং স্বচক্ষে দেখেছিলেন......তারা এই বৃত্তান্তটা কোথাও প্রকাশ না করে কাউকে জানতে দিল না।...এর অল্পদিন পরেই রথীবাবু জানালেন যে বিশ্বভারতীর গুদামঘর থেকে বহু কাগজ-

পত্রের নিচে সেই টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্তটা পাওয়া গেছে।" (দেশ ১৩৬৬, পৃঃ ৯২১।৯২৩)

কবির European Tour-এর এই হল অবস্থা। কবির এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের গুরুত্ব প্রশান্তবাবু, রথীবাবু, নির্মলকুমারীদেবী সবাই উপলব্ধি করেছিলেন, যত্ন সহকারে প্রতিদিনকার বিবরণ টাইপ করে পাঠানোও হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্তও প্রকাশিত হল না কেন? প্রথমে এই "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" হারিয়ে যাওয়া, পরে নির্মলকুমারীর চিঠিপত্রের সাহায্যে লেখার চেষ্টা এবং সেই চিঠিগুলোও বিশ্বভারতীর আপিস থেকে অন্তর্ধান হওয়া, অবশেষে প্রশান্তবাবু জানাচ্ছেন "···২১০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে রয়েছি, একদিন টেলিফোনে অপরিচিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার কাছে লেখা কবির চিঠি আমার কাছে আছে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি তা প্রকাশ করতে পারি'···পরে বরাহনগরে আমার কাগজপত্র খোঁজ করে দেখলুম যে আমার কাছে লেখা কবির অনেকগুলি চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে না।" (দেশ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮০)

এইসব দেখে মনে হয় এর পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে ; এবং বিশ্বভারতীর কর্তাব্যক্তিরাই এর সঙ্গে জড়িত। প্রশান্তবাবু, নির্মলকুমারী এ বিষয়ে কেন কিছু লিখছেন না? তাঁরা শুধু বিভিন্ন চিঠিপত্র হারিয়ে যাওয়ার রহস্যজনক খবরই পরিবেশন করছেন। টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্তটা যখন পাওয়া গেল, তা এখনও প্রকাশিত হল না কেন? তাঁদের কি কোনো দায়িত্ব নেই?

আরও আশ্চর্যের বিষয় কবির সেই সময়কার ভ্রমণ বৃত্তান্ত যা অংশতঃ প্রকাশিত হয়েছে এবং কেউ কেউ সেই "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন উদ্ধৃতির মধ্যে অসঙ্গতি এবং উদ্ধৃতি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার উল্লেখের মধ্যে মারাত্মক গোলমাল দেখা যায়। যেমন ১৯৪৩ সনে প্রকাশিত Alex Brown-এর 'Rabindranath through Western eyes' বইটিতে সেই সময়কার ঘটনার যে বিবরণ এবং উদ্ধৃতি আছে সেইগুলো সবই P. C. Mohalanabis-এর Notes থেকে নেওয়া। উক্ত বইয়ের ৭২ পাতায় "that Mussolini had saved Italy from utter ruin" উদ্ধৃতি নেওয়া "From a conversation between Rabindranath and Romain Rolland at Villenevve on :5th

June, 1926 ; as recorded by P. C. Mohalanobis." তারপর ৭৩ পাতায় "I have been told that this is what actually happened : Mussolini has succeeded in bringing back law and order for the people. Now they are prosperous......and I was told that all this was due to the forceful personality of Mussolini." (Ibid) ৭৫ পাতায় "While I had been talking to the Duce my guide and interpreter (Professor Formichi) got extremely nervous from time to time so that I did not get an opportunity of having a quiet talk with the Duce." (Ibid).

মাত্র দু বছর পরে ১৯৪৫ সনে—একই Alex Aronson, Krishna Kripalani-র যুগ্ম সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে 'Rolland and Tagore' নামে একখানা বই বেরোয় এবং সেখানে 25th June 1926-এর Conversationটায় কিছু শব্দের অদলবদল করা হয়েছে। যেমন law and order for the people-এর স্থলে to the people (P. 91 of Rolland and Tagore), I was told-এর স্থলে I was assured. (P. 91) আর ৭৫ পাতায় উদ্ধৃতিটা এইভাবে পাওয়া যাচ্ছে "while I had been talking with the Duke, from time to time he got extremely nervous so that I did ইত্যাদি (P. 91, 92)। সব থেকে আশ্চর্য Rolland and Tagore বইয়ের "conversation as reproduced here is taken from the records of Rabindranath Tagore's European Tours as preserved in the archives of the Rabindra Bhavan, Santiniketan. We do not know who took down the notes of these conversations at that time. They are obviously incomplete and seem to have been taken down rather hurriedly" (P. XVI).

একই Aronson 1943 সনে জানাচ্ছেন Conversation P. C. Mohalanobis-এর Notes থেকে নেওয়া কিন্তু 1945 সনে সম্পাদক হিসাবে Aronson জানেন না "who took down the notes of these conversations." নির্মলকুমারীর লেখা থেকে জানি প্রতিদিনকার বিবরণ টাইপ করে পাঠানো হত এবং "টাইপকরা বিদেশী ভ্রমণবৃত্তান্ত" "কাগজের গাদার নিচে পাওয়া গেছে" এবং কোনো কপি না রেখেই এই বিবরণ

তাঁরা পাঠিয়েছিলেন। Rolland-এর সঙ্গে Conversations-এর সময় ভ্রমণ-সঙ্গীরা ভিন্ন অন্য কেউ কি ছিল? প্রশান্তবাবু বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'কবিকথা'য় জানাচ্ছেন "১৯২৬ সালে মুসোলিনীর নিমন্ত্রণে ইটালিতে গিয়েছিলেন।...প্রথম ভিলনিভিউএ দেখা হল রোঁমা রোঁলার আর দুহামেলের সঙ্গে। পরে দেখা হল মাদাম সালভাডোরি (Madam Salvadori) মাদাম সালভামিনি (Madam Salvamini) আঞ্জেলিকা ব্যালব্যানফ (Angelica Balbanoff) এই রকম সব লোকের সঙ্গে যাঁরা ইটালি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কবি তখন অস্থির হয়ে উঠলেন যে, এখন কি করা যায়। ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বারবার লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। শরীর খারাপ হয়ে গেল। আমরা ওঁকে ভিলনিভিউ থেকে জুরিখ, সেখান থেকে ইন্‌স্‌ব্রুক তারপর ভিয়েনা আর সেখান থেকে প্যারিস নিয়ে গেলাম।...তারপরে লেখাটা যখন শেষ করে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন তখন শান্ত হলেন।" .. (পৃষ্ঠা ১৬১, ১৬২)

তাই এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক P. C. Mohalonobis-ই Conversation-এর Notes নিয়েছিলেন এবং "টাইপকরা বিদেশী ভ্রমণবৃত্তান্তে"র মধ্য থেকেই Aronson তার বই-এ কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তথা প্রশান্তবাবু জানাবেন কি হুবহুর বাদে এই ধরনের বিস্মৃতির পিছনে কোন্ শুভ উদ্দেশ্য আছে? আর টাইপকরা ভ্রমণবৃত্তান্ত "seem to have been taken down rather hurriedly" হয় কি করে? 'Rolland and Tagore' বই-এর conversations অংশের আরম্ভ যেমন হঠাৎ, শেষও তেমনি হঠাৎ। Hurriedly-র দোহাই দিয়ে বিশ্বভারতী কি Census করে কবির রচনা প্রচার করছেন? Aronson-এর বই-এ উদ্ধৃত P. C. Mohalonobis-এর notes-গুলো কোথায় গেল?

Rolland-এর ১১ই নভেম্বর ১৯২৬ সালের এক পত্রে জানতে পারি "Circumstances have forced us to devote a large part of our conversations to discussing contemporary and depressing subjects—that unfortunate Italy"...(Rolland and Tagore

P. 64) আবার রোঁলার সঙ্গে আলোচনাকালে "One topic which constantly recurred was the growth of international understanding and amity. Rolland who was much disturbed by the reports which had been broadcasted all over world about the poet's supposed change of view about Fascism, told him about seriousness of the situation." (Annual Report 1927-28. The President's tour in Europe 1926 V. B. d. April 1928) কিন্তু এই সময়কার দুটি conversation-এর মধ্যে একটায় "Unfortunate Italy" বা "Seriousness of the situation"-এর কোনো উল্লেখ নেই, অন্যটি হঠাৎ শুরু হঠাৎ শেষ। তাই "hurriedly"-এর দোহাই দিয়ে "large part of our conversation"-এর "large part" এবং "constanty recurred"-এর অংশটুকু census করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কী প্রকাশ করলেন ?

সবশেষে কবির বিবৃতিটি Manchester Guardian-এ প্রকাশিত হয়। সেটা প্রশান্তবাবু বলছেন অসুস্থ কবিকে প্যারিসে আনা হল, "তারপর লেখাটা শেষ করে Manchester Guardian-এ পাঠিয়ে দিলেন।" অর্থাৎ প্যারিস থেকেই লেখাটা পাঠানো হয়। "আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বারবার লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না।" Annual report-এ দেখি Switzerland-এ থাকার সময় "immediately started writing about his experiences in Italy in the form of a letter to a friend in India. Rolland however did not think that the above letter was an adequate condemnation of the Fascist movement and the poet decided to delay its publication." এর পর Austria অবস্থান কালে "He could not wait any longer and gave full expression to his sentiments in the form of a letter to C.F. Andrews which was sent to India. This letter was published in Manchester Guardian early in August 1926." (Vide V. B. d. 1928 April)

তা হলে চিঠিটা কোথা থেকে কোথায় পাঠানো হল। প্যারিস থেকে না অষ্ট্রিয়া থেকে ? সোজা Manchester Guardian-এ না to C.F. Andrews

in India-তে? প্রশান্তবাবু 'কবিকথা'য় বলছেন "ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরম্ভ করেন" এবং "সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না।" এটা "in the form of a letter" না অন্য কোনো লেখা?

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতবাবু জানাচ্ছেন "রঁলার নিকট হইতে তিনি ফ্যাসিস্ত ইতালির স্বরূপ জানিতে পারেন।......কিন্তু কবি তখনো খোলাখুলি ভাবে ইতালি সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না। ভারতে তাঁহার কোনো বন্ধুকে তিনি যে পত্র দেন তাহাতে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলেন তিনি মুসোলিনীর ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাহার কার্যকলাপ ভালো কি মন্দ সেবিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই।" ...এবং ১০ই জুলাই ভিয়েনা যান এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর "তিনি তাহার রুদ্ধমনের সমস্ত শক্তিদ্বারা ফ্যাসিজমকে ধিক্কার দিয়া এক দীর্ঘপত্র এনড্রুজকে লেখেন। সেই পত্রখানি অগষ্টমাসের গোড়ায় Manchester Guardian-এ প্রকাশিত হয়।" (৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৯২, ১৯৩)

C.F. Andrews-কে লিখিত পত্রের সংবাদই আমরা জানি কিন্তু প্রভাত-বাবু কথিত "অত্যন্ত সাধারণভাবে লেখা" "ভারতে তাহার কোনো বন্ধুকে তিনি যে পত্র দেন", সেই চিঠিখানা কাকে লেখা এবং কোথাও কি প্রকাশিত হয়েছে?

এই সমস্ত নানা কারণে কবির ইতালি ভ্রমণকে রহস্যজনক করে তুলেছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং কবির সেই সময়কার ভ্রমণসঙ্গীরা। "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" প্রকাশিত না হওয়ার পেছনে যে একটা গভীর চক্রান্ত আছে সেটা অনুমেয়। এটা প্রকাশিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কবি মৃত্যুর দু মাস আগেও বলেছেন "এখন তাঁদের এই সংগৃহীত বিবরণের (European Tour) যথোচিত ব্যবহার হতে কোনো বাধা ঘটবে না" (২৪শে জুন '৪১)। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কি "বাধা" অপসারণ করে বিবরণটি প্রকাশ করবেন যাতে করে "যথোচিত ব্যবহার" করা সম্ভব হয়?

রবীন্দ্রচর্চার পথে এই বাধাকে অপসারণ করার জন্য পরিচয়-এর সম্পাদকদ্বয় ও পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আমার সবিনয় নিবেদন। এ বিষয়ে অবহিত হয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা কী অবলম্বন করা যায় চিন্তা করুন।

সংস্কৃতি সংবাদ

মুক্তির পথ

গোয়া মুক্ত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বুক থেকে ঔপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ চিহ্নের শেষ অবশেষটুকু এতদিনে লুপ্ত হল। আমাদের লজ্জা, আমাদের গ্লানির একটি স্মারক এতদিনে চূর্ণ হল। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি মহান পর্ব এতদিনে সমাপ্ত।

আজ স্মরণ করি সেই মহান দ্রষ্টাদের, যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্মরণ করি সেই বরণীয় যোদ্ধাদের, ত্যাগে ও সংগ্রামে যাঁরা ইতিহাস। স্মরণ করি দেশবাসীর বিপুল প্রাণশক্তিকে, ধ্রুবনক্ষত্রের মতো যা ইতিহাসকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করেছে। আর স্মরণ করি গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সেই শহীদ ও সৈনিকদের।

মাত্র কয়েকঘণ্টায় পাঞ্জিমের পতন হয়েছে। সালাজারের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, অমানুষিক বর্বরতা ইতিহাসের রথচক্রে পলকে বিচূর্ণ হয়েছে। 'নাটো'চিহ্নিত অস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে পড়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের বৃহন্নলা অভিভাবক এই নাটোচক্র শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণই হতে পারে নি।

আর সালাজার গোঁসা করেছেন। পর্তুগালে খ্রীষ্টমাস উৎসব বাতিল হয়েছে। পশ্চিমী জগতের দিঙ্মণ্ডল হায় হায় রবে আচ্ছন্ন। বিশ্বস্ত জমিদারীর বশম্বদ নায়েব হঠাৎ বিদ্রোহ করেছে—ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইঙ্গমার্কিন মনোভাব যেন তাই। প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে এমনকি পশ্চিমী সাংবাদিকরাও লাঞ্ছিত, অপমানিত করেছেন। আর স্বস্তিপরিষদের অধিবেশনে ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে সোভিয়েত ভেটোতে। বড় দুঃখে 'পশ্চিমী' গণতন্ত্র আজ আর্তনাদ তুলেছে পৃথিবীতে ন্যায়, অহিংসা, সম্প্রীতি আর রইল না। ইউ. এন. ওর অস্তিত্ব বিপন্ন। কারণ, গোয়া মুক্ত হয়েছে।

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত দেরিতে হলেও আজ গোয়ার ব্যাপারে

যে দৃঢ়তা দেখিয়েছে, আমরা তাকে অভিনন্দিত করি। ছদ্মবেশী গণতন্ত্রীর দল যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করে নির্লজ্জতা ও বর্বরতার কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে—আর একবার সাম্রাজ্যবাদীচক্র তার প্রমাণ দিল। আর ঔপনিবেশিকতার অবসান, বিকশিত জীবন ও শান্তি—অগ্রগামী এই মানবসভ্যতার পক্ষে, বিপন্ন মানবিক মূল্যবোধের পক্ষে, যাবতীয় পশুশক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ়, অকুণ্ঠ, অতন্দ্র যে মহান্ দেশ ও জনগণ—পুনরপি এই সংকটকালে তাকেও বীরের বেশে দেখা গেল। আশ্চর্য যে জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত এতবড় ঘটনার সমর্থনে কলকাতার পথেঘাটে কোনো সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত পোস্টার পড়ে নি; বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ বিবৃতি প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবত যে গোপন হস্ত এর উৎস, সে অধুনা সম্পূর্ণই আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাই জাতীয় ঘটনা তাকে বিচলিত করে না। কিংবা হয়তো সালাজারের মতো সেই অদৃশ্য হস্তও খ্রীষ্টমাসের উৎসব পরিত্যাগ করেছে অভিমানভরে। কারণ পশ্চিমী গণতন্ত্রের নাভিশ্বাসে তার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে থাকবে। আর ভারতবর্ষের সমর্থনে চীনের দৃপ্ত বিবৃতি তাই একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য হয় নি।

প্রায় সমকালেই পর্তুগালে সালাজারবিরোধী অভ্যুত্থান নতুন ইতিহাসের যবনিকা উন্মোচন করল। আর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তিকংগ্রেসের অধিবেশনে বিভিন্ন দেশাগত শতশত প্রতিনিধি গোয়ার মুক্তিতে উল্লাস প্রকাশ করে, পৃথিবী থেকে উপনিবেশবাদ ও যুদ্ধভীতি দূর করার জন্য পুনরায় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যুদ্ধজোটের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। সম্মেলনে সালাজারবিরোধী অভ্যুত্থানের অন্যতম সৈনিক ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিকে আলিঙ্গন করে জানালেন—সালাজারই পর্তুগাল নয়।

গোয়া মুক্তির সমকালেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ ভারতবর্ষে। একটি প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্রিকার ধারাবাহিক সোভিয়েত বিরোধিতা ও কোনো কোনো পরাভববাদীর সোভিয়েত বিরোধী বিবৃতি যে বাংলাদেশের মানসিকতার কোনো প্রতিনিধিত্ব করে না, তারও প্রমাণ দিয়েছেন কলকাতাবাসী নাগরিক। অপরিসীম আবেগে উদ্বুদ্ধ সেই দেশবাসী প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে যে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

মুক্ত মানবতা, বিকাশমান সভ্যতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা ছিল এই সম্বর্ধনার প্রেরণা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জগতে

পশ্চিমী ষড়যন্ত্রে বিপন্ন ভারতবর্ষের সুহৃদ এই দেশটির প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতাও ছিল এক প্রত্যক্ষ কারণ। মুক্তি ও শান্তির আন্দোলনে প্রথমাবধি প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি দেশবাসীর এই অনুরাগ ও আস্থা আজ তাই পশ্চিমী জগতকে পুনরপি চিন্তিত করেছে। প্রতাপান্বিত ইঙ্গ-মার্কিন কণ্ঠে আবার নরম স্বর বেরিয়েছে।

কিন্তু গোয়ার মুক্তি ও দেশবাসীর সোভিয়েত অনুরাগে ইতিহাসের যে অভিপ্রায় প্রকাশিত, শেষ পর্যন্ত তাকে ভিন্নমুখী করার সাধ্য কারোরই নেই। নানা জটিল ও অসমান পথ পরিক্রমা করতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মৈত্রীর পথই ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বকে পর্বান্তরে পৌঁছে দেবে।

•

বিয়োগপঞ্জী

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিচিত্র ও কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটেছে। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদে সন্ত্রাসবাদী দলের অন্যতম নায়করূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু। 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনা ও বন্দীদশায় আদালতে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে অসহযোগ তাঁর কীর্তি। পরবর্তীকালে বিদেশে ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার প্রয়াসেও তাঁর ছিল অগ্রগণ্য ভূমিকা। নানা রাজনৈতিক অভিযানের মধ্যে একসময়ে তিনি লেনিনের সংস্পর্শে আসেন।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্যত চিন্তানায়কের। এদেশে মার্কসবাদী ভাবধারা প্রচারে তাঁর অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় ভূমিকা বর্তমান। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ফ্যাসিবিরোধী, পরবর্তীকালের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসংঘের তিনি ছিলেন এক অগ্রগণ্য ব্যক্তি। 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। অতুলনীয় কর্মশক্তির অধিকারী পণ্ডিতমহাশয় লোকচক্ষুর অন্তরালে জ্ঞান ও রসসাধনায় নিরত ছিলেন। সম্পূর্ণ মহাভারতের সটীক অনুবাদ, ধ্রুপদী সাহিত্যের সুষ্ঠ ভাষান্তর ও বহুবিধ মৌলিক রচনা দ্বারা তিনি বঙ্গ-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

•

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয়ের জীবনাবসান হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম-পরিচালনার বাইরে ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিও তিনি আগ্রহী ছিলেন। ছাত্রসমাজ সম্পর্কে তাঁর আন্তরিকতা বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

•

চলচ্চিত্রপ্রসঙ্গ

পীপল্‌স্ সিনে সোসাইটি নামে নতুন একটি ফিল্ম সোসাইটি তৈরি হয়েছে। চেক কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে এঁদের উদ্যোগে 'বর্ন্ ইন নাইনটিনটুয়েন্টিওয়ান' দেখানো হল। ছবিটি চেক ও জার্মান যুগ্ম উদ্যোগে তোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ক্ষয় আর বিনাশের মধ্যেও প্রেম এবং মানবিক মূল্যবোধের অনির্বাণতা এই চিত্রের বিষয়। এক ধরনের কবিত্ব ও সারল্যে মণ্ডিত এই চলচ্চিত্রটি বহুলাংশে মনকে স্পর্শ করে।

পীপল্‌স্ সিনে সোসাইটির ঘোষিত কর্মপ্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনকে ব্যাপ্ত ও মৃত্তিকাসংলগ্ন করার ব্রত এঁরা গ্রহণ করেছেন। একথা সত্য এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলন মুখ্যত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীরও অগ্রগণ্য অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সর্বস্তরে সংরুচি ও উদ্দীপনার বিস্তার ব্যতীত আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব নয়। ভালো ছবি দেখানো, ছবির ভাষা বুঝতে সর্বতোমুখী সহায়তাই এই রুচিনির্মাণ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি হতে পারে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রশিল্পের চাবিকাঠি আজও যাঁদের হাতে—তাঁরা দেশবাসীকে স্বভাবতই মধ্যযুগীয় মানসিকতার পাঁকে ডুবিয়ে রাখতে চাইবেন। তাই প্রয়োজন হল শহরতলীতে, মফঃস্বল শহরে, গাঁয়ে, কারখানায় সৎ ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। পীপল্‌স্ সিনে সোসাইটি এই দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন। বহু ক্ষেত্রে ব্যবসাভিত্তিকভাবে, কোথাও বা নিজস্ব উদ্যোগে এঁরা জনসাধারণকে দেশ-বিদেশের মহৎ চলচ্চিত্রাবলীর সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ করে দেবেন। অবশ্য পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সোসাইটি দুটিও ইতিপূর্বে এই দায়িত্ব অল্পাধিক পরিমাণে পালন করতে সচেষ্ট ছিলেন।

তাছাড়া কলকাতা শহরেও সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের ছবি

ব্যবসাগত ভিত্তিতে দেখানো হয় না। কিন্তু চেক, পোলিশ ও রুশ চলচ্চিত্র উৎসব এবং আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত পূর্ব জার্মানির ছবিটি দেখে আমরা তাদের এতদ্‌বিষয়ক আধিপত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছি। কলকাতায় সম্প্রতি প্রদর্শিত চাঞ্চল্যকর 'দি ট্রুথ' ও 'দি এ্যাপার্টমেন্ট' ছবি দুটির উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ এই দুটি ছবিকে যদি মোটামুটি পশ্চিমীজগতের প্রতিনিধিস্থানীয় গণ্য করা যায় তাহলেই বোঝা যাবে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রাবলীর তুলনায় এই পশ্চিমী ছবি কত মামুলি, ফিকে। অথচ এই ছবিগুলি আজও এদেশে সাধারণভাবে অল্প পরিচিত। সম্প্রতি সিনে ক্লাব আঁদ্রে ওয়াজ্‌দার বিশ্ববিখ্যাত 'কানাল' চিত্রটির ব্যবসাগত ভিত্তিতে প্রদর্শনের আয়োজন করে দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ফিল্ম সোসাইটিগুলি যদি এই দায়িত্ব আরো বেশি করে গ্রহণ করেন তাহলে চলচ্চিত্র আন্দোলন যথার্থই শক্তিশালী হবে। পীপলস সিনে সোসাইটিও এই অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন।

তাঁদের আরও একটি প্রশংসনীয় কর্মসূচীর কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সীনে টেকনিশিয়ান্‌স্‌, যাঁরা প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রাণ —এই শিল্পের নানাবিধ অব্যবস্থার জন্য আজও প্রায় সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় দিন কাটাচ্ছেন। আর্থিক অসাচ্ছল্যের দরুন ও সুব্যবস্থার অভাবে ভালো বিদেশী ছবি দেখার অভিজ্ঞতা এঁদের অনেকের নেই বললেই চলে। যদিও ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাবের সংবিধানে সীনে টেকনিশিয়ানদের জন্য স্বল্প চাঁদায় সভ্যপদের ব্যবস্থা আছে, তথাপি সেই সুযোগ তাঁরা সবিশেষ গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ দেশবাসীর মনে চলচ্চিত্রবিষয়ক উৎসাহ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির সভ্যগ্রহণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফলে পূর্ণ চাঁদা দিয়েও অনেকে এই দুটি ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হতে পারছেন না। তাছাড়া সীনে টেকনিশিয়ানদের জন্য সভ্যসংখ্যা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদেরও বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

পীপল্‌স্‌ সীনে সোসাইটি এই টেকনিশিয়ানদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সংক্ষক সভ্যপদ সংরক্ষিত রাখছেন বলে জানা গেছে।

তাছাড়া চলচ্চিত্রোৎসাহী যাঁরা এতদিনেও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সোসাইটি দুটির সভ্যপদ পান নি, তাঁরাও এখানে সমবেত হতে পারবেন।

পীপল্‌স্ সীনে সোসাইটির এই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা যদি সুসম্ভব হয় তাহলে তাঁরা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রআন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন। এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবে কার্যকরী হয় কিনা আমরা তা সাগ্রহে লক্ষ্য করব।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও সীনে ক্লাব একই দায়িত্ব গ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যদি অগ্রসর হন, তবেই তা সম্ভব। কারণ এই ধরনের সংগঠনগুলির সম্পর্ক কখনই প্রতিযোগিতামূলক নয়, পরস্পরের পরিপূরক। ভরসা রাখি পীপল্‌স্ সীনে সোসাইটিও তা অনুক্ষণ মনে রাখবেন।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি সম্প্রতি নিও রিয়ালিস্ট স্কুলের অগ্রগণ্য পরিচালক ডি সিকার একটি চলচ্চিত্র উৎসব করলেন। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি উৎসবে ডি সিকার প্রদর্শিত চারটি ছবিই এদেশে ইতিপূর্বে ব্যবসাগত ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। অথচ ডি সিকার অন্য কয়েকটি ছবি আজও এদেশে প্রদর্শিতই হয় নি। তাই এই চলচ্চিত্র উৎসবে মন ভরে না। অবশ্য প্রতিটি ছবিই বারবার দেখা এক অভিজ্ঞতা।

সিনে ক্লাব দেখালেন ক্রেন্‌স্ আর ফ্লাইং। এই অসামান্য রুশ চলচ্চিত্রের পরিচালক হলেন কালাতোজভ।

একই সময়ে কলকাতায় রুশচলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বোন্দরচুকের 'ফেট অফ এ ম্যান' এবং কালাতোজভের 'দি আনসেন্ট লেটার' আমরা দেখেছি। আর দেখেছি কিছু শর্টস্, যার মধ্যে মে দিবসের ডকুমেণ্টারি চিত্রটি দেখার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। ফিল্ম সোসাইটিগুলির কাছে আমার বিনীত নিবেদন যেন তাঁরা এই ডকুমেণ্টারি চিত্রটি পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

কালাতোজভকে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠতম পরিচালকদের অন্যতম বলতে কারোরই দ্বিধা হবে না। 'দি আনসেণ্ট লেটার' ও 'দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং' দেখা বাস্তবিকই এক অভিজ্ঞতা। আর অবিস্মরণীয় শ্রীমতী সামাইলোভা— দুটি ছবিরই যিনি নায়িকা। 'দি আনসেণ্ট লেটার'-এর শেষাংশটি বাহুল্য। 'দি ক্রেন্‌স্ আর ফ্লাইং'-এর একদম শেষে বলাকার উপস্থাপনা খানিকটা যান্ত্রিকতাদোষে দুষ্ট। তা ছাড়া এ দুটি ছবির সাফল্য সীমাহীন। দুটি ছবিতেই ফোটোগ্রাফী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যায়। চরিত্রের মানস-

প্রবাহ বর্ণনায় এই ফোটোগ্রাফী ও কম্পোজিশন পরিচালকের অসীম কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছে। দুটি ছবিতেই প্রেমের দৃশ্য কবিতা হয়ে গেছে।

'কানাল', 'এ্যাশেস এ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস্', 'দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং' এবং 'বর্ন্ ইন নাইন্টিনটুয়েন্টিওয়ান'—এই ছবিগুলি একটি প্রবন্ধের বিষয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে কিভাবে নাড়া দিয়েছে, বাস্তবতা ও কল্পনার সুষ্ঠ বিন্যাসে চলচ্চিত্র কিভাবে জীবনশিল্প হয়ে ওঠে—আশা করব যোগ্যতর সমালোচক সে বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করবেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধী হোয়সিঙ্গারের প্রত্যার্পণের দাবি

১৯৪৩ সালের ৩০শে অক্টোবর মিত্রপক্ষীয় ঘোষণায় বলা হয়েছিল, জার্মান যুদ্ধাপরাধীরা যে-সব দেশে তাদের ঘৃণ্য অপরাধমূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত করেছে, সেই সেই দেশে তাদের বিচারের জন্যে ও শাস্তির জন্যে পাঠানো হবে।

১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তিতে এবং ১৯৪৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি ও ১৯৪৭ সালের ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা এই ঘোষণা পুনরায় সমর্থিত হয়।

উক্ত চুক্তি ও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষিত হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ও ভূতপূর্ব জেনারেল এবং বর্তমানে 'নাটো'র সামরিক নেতা আডলফ হোয়সিঙ্গারকে বিচারের জন্যে সোভিয়েত সরকারের হাতে প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে গত ১২ই ডিসেম্বর সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট মার্কিন গভর্ণমেণ্টের কাছে এক নোট পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে মস্কোয় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সোভিয়েত মন্ত্রণালয়ের বার্তা বিভাগ সোভিয়েত ও বৈদেশিক সাংবাদিকদের ঐ নোটের ও আডল্ফ হোয়সিঙ্গারের অপরাধ সম্পর্কিত বহু দলিলের অনুলিপি দেন। বিগত ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতায় সোভিয়েত কনসলেটে জেনারেলের

ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইংরেজী অনুবাদসহ উক্ত দলিলগুলির আলোক-চিত্রের এক প্রদর্শনী হয়। ঐ সব দলিল থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে হোয়সিঙ্গারের নেতৃত্বে তার অধীনস্থ বিভাগ 'বারবারোসা' 'সী লায়ন' 'শার্ক' 'অ্যাটিলা' 'মারিটা' 'টানেনবোম' নামে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইৎজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা রচনা করে। এবং হোয়সিঙ্গার তার বিভাগের প্রধান কর্তা হিসেবে এক নির্দেশনামা রচনা করে যে সামরিকভাবে অধিকৃত এই সমস্ত দেশের এলাকাগুলিতে সন্ত্রাসের বিভীষিকা কায়েম করতে হবে, জনসাধারণের উপরে নির্মম নির্যাতন চালাতে হবে। শুধু ঐ দলিলগুলির ভিতর দিয়েই নয়, হোয়সিঙ্গারের ভূমিকাসংক্রান্ত বহু ঘটনা কার্যত প্রত্যক্ষ করাবার জন্যে হিটলারের দস্তাবেজখানা থেকে উদ্ধার করা একটি মূল চলচ্চিত্রও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়।

হোয়সিঙ্গার ছিল হিটলারের কুখ্যাত "ব্লিৎসক্রিগ"-এর এক পরম উৎসাহী সমর্থক। সোভিয়েত-এর উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা রচনায় ও তাকে কার্যে পরিণত করার দিক থেকে সে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক উক্রাইন ও/বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে নিশ্চিহ্ন করে দেবার হিটলারি পরিকল্পনা এই হোয়সিঙ্গারই পেশ করে। নাৎসীবাহিনীর দ্বারা সামরিকভাবে অধিকৃত সোভিয়েত-এর এলাকাগুলির জনসাধারণের প্রতি বর্বরতম অত্যাচার চালাবার, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ধৃত সদস্যদের বিনাবিচারে গুলি করে হত্যা করার, প্রতিরোধ-আন্দোলনেরও গেরিলা-যোদ্ধাদের উপর নিষ্ঠুরতম অত্যাচার চালাবার প্রস্তাব ও নির্দেশ তারই। ১৯৪৩-৪৪ সালে কের্শ শহরে মুক্তি যোদ্ধাদের ও বেসামরিক নাগরিকদের বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয় হোয়সিঙ্গারের নির্দেশে। হিটলারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন এই হোয়সিঙ্গারকে হিটলারের পক্ষ থেকে নির্দেশ ও হুকুম দেবার অধিকারও দেয়া হয়েছিল।

নুরেমবুর্গ বিচারের সময়ে হোয়সিঙ্গার ছিল আমেরিকানদের হাতে। যদিও তখন তাকে যুদ্ধাপরাধে দায়ি করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে হোয়সিঙ্গারকে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কৃপাপুষ্ট এই ঘৃণ্যতম